শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান

[টি. টি. বি. এড ও পি. জি. বেসিক কোর্স]

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম. এ. (ডবল),
অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ,
হেতমপুর, বীরভূম।

ঋতেন্দ্রকুমার রায়, এম. এ. (কলিকাতা ও ঢাকা),
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষণ-প্রসঙ্গে
শিক্ষার ইতিহাস প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা

অমরনাথ ঘোষ, এম. এ., বি. টি.,
অধ্যাপক, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ
কলেজ অব এডুকেশন, যাদবপুর
বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্টজেভিয়ার্স
কলেজ, বি. এড বিভাগ,
কলিকাতা।

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১এ কলেজ রো
কলিকাতা—৭০০০০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রাকর :
শ্রীপরাণচন্দ্র রায়
সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৯ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদের কথা

'শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ করার সুযোগ পেয়ে আমরা আনন্দ বোধ করছি। গ্রন্থখানিকে আধুনিক চিন্তার আলোতে বিশেষভাবে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছি। প্রথম সংস্করণে যে যে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা নানা কারণে সম্ভব হয়নি, সেগুলোর ওপর বর্তমান সংস্করণে আমরা বেশী গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি। শিক্ষণের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভূত প্রভাব স্মরণ রেখে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষাগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। পুস্তকটির প্রথম অংশের প্রতিটি অধ্যায় বিশেষ করে পরিসংখ্যান অধ্যায়টিকেও পুনর্লিখিত করে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমরা আদর্শায়িত রূপটি গ্রহণ করেছি। এতেও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উপকার হবে বলে আশা করি।

গ্রন্থখানি পরিবর্তনের সময় আমরা বহু দেশী ও বিদেশী গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি। ঐ সকল গ্রন্থ রচয়িতা ও প্রকাশকদের আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থখানির উৎকর্ষে অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দের অভিমত ও অভিবাবন াাদরে গ্রহণ করার অঙ্গীকার রইল।

বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে গ্রন্থখানিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে নার্জী পাবলিশার্স-এর কর্ণধার শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

বর্তমান সংস্করণের গ্রন্থখানি পাঠ করে শিক্ষণ শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে আমাদের ম সার্থক হবে বলে মনে করি। ইতি

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত
খতেন্দ্র কুমার রায়
অমরনাথ ঘোষ

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

(Nature of Educational Psychology)

১। মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Psychology) ঃ

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মনোবিজ্ঞানের যথার্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সে কারণে প্রথমে আমরা প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা বিচার করে দেখব এবং তারপর মনোবিজ্ঞানের স্বরূপের যথার্থ সংব্যাখ্যা দেবার জন্য সচেষ্ট হব।

(ক) **মনোবিজ্ঞান হল আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of the soul) :** মনোবিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল '*Psychology*'; গ্রীক শব্দ '*Psyche*' এবং '*Logos*' থেকে এর উৎপত্তি। Psyche কথাটির অর্থ হল '*soul*' বা আত্মা এবং '*Logos*' কথাটির অর্থ হল *science* বা বিজ্ঞান। সুতরাং ইংরেজী Psychology কথাটির অর্থ দাঁড়াল 'আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান' (science of soul)। মনোবিজ্ঞানী মাহের (*Maher*) মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'মনোবিজ্ঞান হল দর্শনের সেই শাখা যা মানুষের মন বা আত্মা নিয়ে আলোচনা করে।' বস্তুতঃ, তিনি তাঁর সংজ্ঞায় 'মন' এবং 'আত্মা' উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানী, যাঁরা মনোবিজ্ঞানের উপরিউক্ত সংজ্ঞা সমর্থন করেন, মনে করেন যে, মনোবিজ্ঞানের কাজ আত্মার উৎপত্তি, স্বরূপ এবং পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা।

মনোবিজ্ঞান আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয় এবং সে কারণে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নি। প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাতে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন এবং অধিবিদ্যার (Metaphysics) অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞান হল একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা, সে কারণে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন বা অধিবিদ্যার শাখারূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। এছাড়া, আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। সে কারণে আত্মা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুরূপে পরিগণিত হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক

সমালোচনা

(empirical); সেহেতু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের উপরই মনোবিজ্ঞান নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞান যদি আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান হয়, তাহলে মনোবিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক বলা চলে না, কারণ অতীন্দ্রিয় আত্মা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের বিষয়বস্তু নয়। তাহলে মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপেও গণ্য করা যেতে পারে না। মনোবিজ্ঞান মনের বাহ্যপ্রকাশ অর্থাৎ মানুষের আচরণ, দেহগত ক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনা করে, কারণ এগুলিই পর্যবেক্ষণের ও পরীক্ষণের দ্বারা জানা যায়।

(খ) মনোবিজ্ঞান মনসম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of the mind—*Hoffding*)**:** এই সংজ্ঞাটিকেও মনোবিজ্ঞানের যথার্থ সংজ্ঞারূপে নিরূপণ করা যেতে পারে না। নিম্নোক্ত কারণে এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয়।

প্রথমতঃ, মন কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং আত্মা শব্দটিকে কেন্দ্র করে যে মতবিরোধ দেখা যায়, 'মন' শব্দটিকে কেন্দ্র করেও সেইরূপ মতবিরোধ দেখা যায়। মন বলতে মানসিক প্রক্রিয়া, মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তরালে কোন স্থায়ী মানসসত্তার অবস্থিতি, বা এই মানসসত্তা ও মানসিক প্রক্রিয়া উভয়কেই বোঝাতে পারে। কিন্তু মনকে কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা এই সংজ্ঞাটিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। সে কারণে মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল বলেন, "মন হল দ্ব্যর্থক শব্দ, এরই সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন আছে।"[1] দ্বিতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞান কি জাতীয় বিজ্ঞান—বিষয়নিষ্ঠ (Positive) না, আদর্শনিষ্ঠ (Normative)—এই সংজ্ঞাটিতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। মনোবিজ্ঞান বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান; মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেভাবে ঘটে, সেভাবে সেগুলি ব্যাখ্যা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। কোন আদর্শের (Norm) আলোকে মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা করে না।

সমালোচনা

তৃতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞানকে শুধু যদি মন সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে অন্যান্য বিজ্ঞান, যেমন—তর্কবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না, কেননা তর্কবিজ্ঞানী, নীতিবিজ্ঞানী প্রভৃতিও 'মন নিয়ে আলোচনা করে।[2] চতুর্থতঃ, মনোবিজ্ঞান যে মানুষের

1 "Mind is a vague word, itself in need of definition."
—McDougall : Outlines of Psychology Eleventh Edition Page 2.

2. এই প্রসঙ্গে ম্যাকডুগাল (McDougall) বলেন, "Secondly there are other sciences of mind than Psychology, such as Logic and Metaphysics and Epistemology and Theology, all of which claim to tell us about mind or minds."
McDougall ; *Outlines of Psychology*, P. 3.

আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে—এ সংজ্ঞাতে তারও কোন উল্লেখ নেই।

(গ) **মনোবিজ্ঞান হল চেতনা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of consciousness—*Angell*)**: এই সংজ্ঞাটিও নিম্নোক্ত কারণে সন্তোষজনক নয়।

সমালোচনা

প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞায় মনোবিজ্ঞান কি ধরনের বিজ্ঞান—বিষয়নিষ্ঠ না, আদর্শনিষ্ঠ, তা সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞাতে 'মন' ও 'চেতনা'—এই উভয় শব্দকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞান চেতনার স্তর ছাড়াও অবচেতন ও নির্জ্ঞান (unconscious) স্তর নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুতঃ, মনঃসমীক্ষক (Psycho-analyst) মনে করেন যে, মনের চেতনার স্তর নির্জ্ঞান স্তরেরই বাহ্য আচরণ মাত্র। আসলে নির্জ্ঞান স্তর নিয়েই মন। সেহেতু মনোবিজ্ঞানকে শুধু চেতনা সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। তৃতীয়তঃ, আচরণবাদীরা (Behaviourists) এই সংজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞান হল বস্তুনিষ্ঠ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সেহেতু মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল প্রাণীর আচরণ (behaviour)। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু যদি 'চেতনা' হয় তাহলে মনোবিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (objective science) রূপে গণ্য করা সম্ভব হয় না, কেননা 'চেতনা' বাহ্যপ্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু নয়। তাছাড়া, ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের চেতনাকেই সোজাসুজি জানতে পারে, অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার বাহ্য-আচরণের ভিত্তিতে তার চেতনাকে অনুমান করে নিতে হয়, অথচ মনোবিজ্ঞানী কতকগুলি সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেগুলি সকলের মন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ, যাঁরা আচরণবাদী বা মনঃসমীক্ষক নন, এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন। তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে প্রাণী-মনোবিজ্ঞান, শিশু-মনোবিজ্ঞান এবং বিকারগ্রস্ত মনসম্পর্কীয় বিজ্ঞানকে (Abnormal Psychology) মনোবিজ্ঞানের শাখারূপে গণ্য করা যাবে না। কেননা প্রাণী, শিশু বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্তর্দর্শনের (introspection) সহায়তায় নিজের মনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন এদের আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা। সে কারণে এই সংজ্ঞার সমালোচনা করে ম্যাকডুগাল বলেছেন, "মনোবিজ্ঞানের মনে করা উচিত নয় চেতনা প্রবাহের আত্মদর্শনমূলক

ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের সমালোচনা

ব্যাখ্যাই তার একমাত্র কাজ ; এ হল কাজের প্রাথমিক অংশমাত্র। এরূপ আত্ম-দর্শনমূলক ব্যাখ্যা, এরূপ বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান কখনও বিজ্ঞান হতে পারে না বা ব্যাখ্যা-মূলক বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে পারে না।'[1]

তাছাড়া, মনোবিজ্ঞান যে প্রাণীর আচরণ এবং দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে—এই সংজ্ঞাতে তার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই।

(ঘ) **মনোবিজ্ঞান হল মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of human behaviour—*Watson*) :** মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটিও সন্তোষজনক নয়। ওয়াটসন্ এবং তাঁর অনুরাগীবৃন্দের মতে 'আচরণ'ই হল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। আচরণ-বাদীরা নিছক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মানুষের এই আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগাল উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মনোবিজ্ঞানকে আচরণসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে আচরণ মানুষের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়েরই বাহ্য প্রকাশ।

ওয়াট্‌সনের সংজ্ঞার সমালোচনা

ওয়াট্‌সন মনোবিজ্ঞান থেকে মন, চেতনা এবং মানসিক প্রক্রিয়াকে বর্জন করেছেন। তাঁর মতে অন্তর্দর্শন মনোবিজ্ঞানের যথার্থ পদ্ধতি নয়। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ যা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি, তাই মনোবিজ্ঞানেরও পদ্ধতি। এই পদ্ধতির দ্বারা আচরণের প্রকৃতি ও নিয়ম নির্ণয় করা মনোবিজ্ঞানের কাজ। আচরণ বলতে ওয়াট্‌সন কি বোঝেন তা জানা দরকার। কোন উদ্দীপক (stimulus) মানুষের দেহযন্ত্রের উপর ক্রিয়া করার জন্য দেহে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাই হল আচরণ। অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হওয়ার ফলে দেহে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়াই হল আচরণ। আচরণবাদ অনুসারে মনোবিজ্ঞান হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া (stimulus-response) সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। মানুষের সব আচরণই, এমন কি হাঁচি, কাশি থেকে দর্শনের বই লেখা পর্যন্ত সবই 'উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া'—এই সাধারণ সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

আচরণের ব্যাখ্যা

1. "Psychology must not regard the introspective description of the stream of consciousness as its whole task but only as a preliminary part of its work. Such introspective description, such 'Pure Psychology' can never constitute a science or at least can never rise to the level of an explanatory science."

—*McDougall. Outlines of Psychology*, Page 7.

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ জীবদেহের প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। জীবদেহ এবং তার আচরণের অতিরিক্ত মন বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। চেতনারও কোন অস্তিত্ব নেই, মানসিক প্রক্রিয়াই আসলে দৈহিক প্রক্রিয়া। জীবের আচরণই হল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু, কারণ এই আচরণই পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু।

জীবের আচরণই মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু

উপরিউক্ত অভিমতের সমালোচনায় একথা বলা যেতে পারে যে, মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান হতে পারে না। মানুষের আচরণ তার চেতন মনেরই বাহ্য প্রকাশ। অন্তর্দর্শনের সাহায্যেই এই অভিজ্ঞতাকে জানা যায়। অন্তর্দর্শনের সাহায্যে আমরা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে জানি এবং এই সব মানসিক প্রক্রিয়া আমাদের কোন্ কোন্ আচরণের সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলি লক্ষ্য করি। পরে অপরের আচরণ দেখে তাদের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপগুলি অনুমান করি। সুতরাং আচরণ কখনও মানসিক প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত হতে পারে না। আচরণবাদীরা চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্তু দেহের আচরণকে দেহ কখনও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। চেতন মনকে বাদ দিলে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে কখনও ব্যাখ্যা করা যায় না।

আচরণবাদের সমালোচনা

মানুষ অচেতন জড়বস্তু নয়। তার আচরণ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। যখন কোন উদ্দীপক মানুষের উপর ক্রিয়া করে তখন কিভাবে আচরণের মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে, মানুষের মনই তা অনেক সময় নির্ধারণ করে। আচরণবাদীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির আচরণ কেবলমাত্র পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এ সত্য নয়, ব্যক্তির উপর পরিবেশের প্রভাব থাকলেও ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা, তার কর্ম, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। উদ্দেশ্য সাধনের যে অভিপ্রায় তাকে বাদ দিয়ে মানুষের কর্মকে নিছক দেহগত প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করা চলে না।

আচরণবাদীরা 'আচরণ'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মানুষ একটা দেহবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং আচরণের এই জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) কোন পার্থক্য থাকে না। মনোবিজ্ঞান মনেরই ব্যাখ্যা, নিছক জীবদেহের ব্যাখ্যা নয়।

(ঙ) মনোবিজ্ঞান হল জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Psychology is the positive science of the behaviour of living things

—*McDougall*)[1] : ম্যাকডুগালের উপরিউক্ত সংজ্ঞাটির সঙ্গে ওয়াট্‌সন প্রমুখ আচরণবাদীদের প্রদত্ত সংজ্ঞার ভাষাগত সাদৃশ্য থাকলেও, ম্যাকডুগাল প্রদত্ত সংজ্ঞাটি অন্যান্য সংজ্ঞার তুলনায় অনেকাংশে ত্রুটিমুক্ত।

ম্যাক্‌ডুগাল-এর সংজ্ঞার সমালোচনা

প্রথমতঃ, ম্যাকডুগাল আচরণ পদটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। ওয়াট্‌সন প্রমুখ মনোবিদ্‌রা জীবের আচরণকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে 'উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া' (stimulus-response) সূত্রের সাহায্যেই জীবদেহের আচরণ ব্যাখ্যা করা চলে। জীবদেহ যন্ত্রমাত্র এবং যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্কেব (mechanical causation) মাধ্যমেই জীবের আচরণের ব্যাখ্যাই যুক্তিসংগত। যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্ক পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারাই কার্যকে ব্যাখ্যা করে, কোন উদ্দেশ্যর সহায়তা গ্রহণ করে না। ম্যাকডুগালের মতে নির্জীব জড়বস্তু সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determination) ক্ষমতা আছে, জীব নিজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে এবং নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টার সহায়তায় সেই লক্ষ্যকে লাভ করতে চায়। সুতরাং জীবের আচরণের ব্যাখ্যার জন্য উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ সম্পর্কের (Teleological Causation) আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার। ম্যাকডুগাল বলেন, "উদ্দেশ্যর প্রকাশ বা কোন লক্ষ্য লাভ করার প্রচেষ্টাই হল আচরণের লক্ষণ ; এবং আচরণই জীবের বৈশিষ্ট্য।"[2] দ্বিতীয়তঃ, ম্যাকডুগাল জীবের আচরণকে মনের বাহ্য-প্রকাশরূপেই গ্রহণ করেছেন। জীবের আচরণের মাধ্যমে মনকে জানাই যে মনোবিজ্ঞানের কাজ, ম্যাকডুগালের সংজ্ঞায় তার পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে। তৃতীয়তঃ, 'আত্মা', 'মন', 'চেতনা' প্রভৃতি বিতর্কমূলক শব্দ পরিহার করার জন্য, এই সংজ্ঞা বিতর্কমূলক তাত্ত্বিক আলোচনার কোন অবকাশ রাখে নি।[3] চতুর্থতঃ, মনোবিজ্ঞানকে যদি 'মন' বা চেতনা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে জীবের আচরণ মনোবিজ্ঞানের

1. *McDougall—Outlines of Psychology* : Page 19.

2. "The manifestation of purpose or the striving to achieve an end is, then, the mark of behaviour, and behaviour is the characteristic of living things."
—*McDougall* : *Psychology* : Page 88.

3. "The definition of psychology as the positive science of behaviour seems, then, preferable to any other......because it makes use of no ill defined and problematical notions such as mind, or soul or consciousness, but only familiar fact of observation."
—Ibid : Page 20.

অন্তর্ভুক্ত একথা সুস্পষ্ট করে বলা হল না; বরং আচরণ মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু মনের বাহ্য-প্রকাশরূপে আচরণই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, একথা বলা হলে মনকে বা চেতনাকে এই সংজ্ঞার বহির্ভূত করা হয় না। পঞ্চমতঃ, মনোবিজ্ঞান যে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়, বিষযনিষ্ঠ কথাটির ব্যবহারের ফলে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনের কার্যকলাপ যেভাবে ঘটে, মনোবিজ্ঞান তাই আলোচনা করে; কোন আদর্শের আলোকে তাকে ব্যাখ্যা করে না।

পরিশেষে, জীবের আচরণ প্রত্যক্ষগোচর, সেহেতু মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু যে অতীন্দ্রিয় কোন বিষয় নয় এবং মনোবিজ্ঞানের পক্ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতো যে সার্বিক বা সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব—এই সংজ্ঞায় তাও স্বীকার করা হয়েছে।

(চ) **মনোবিজ্ঞান হল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of the activities of the individual in relation to his environment**— ***Woodworth***) : নিম্নোক্ত কারণবশতঃ এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক।

উডওয়ার্থ এর সংজ্ঞার সমালোচনা

প্রথমতঃ, উডওয়ার্থ (*Woodworth*)-এর মতে মানুষের আচরণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার জন্য প্রকাশ পায়, সেজন্য সেই আচরণকে বুঝতে হলে পারিপার্শ্বিককে বুঝতে হবে। তিনি মানুষের ক্রিয়াকলাপ বা আচরণের সঙ্গে পারিপার্শ্বিককে যুক্ত করে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সঠিক ব্যাখ্যার পথ নির্দেশ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা স্বীকার করে নেয় যে, মনোবিজ্ঞান বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান নয়। কোন আদর্শের আলোকে নয়, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবযুক্ত মানুষের ক্রিয়াকলাপের যথাযথ ব্যাখ্যা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। তৃতীয়তঃ, উডওয়ার্থ 'আচরণ' বা 'মন' শব্দটির প্রয়োগ না করে 'ক্রিয়াকলাপ' (activities) কথাটি প্রয়োগ করেছেন। 'ক্রিয়াকলাপ' কথাটিকে তিনি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। 'ক্রিয়াকলাপ' কথাটির মাধ্যমে মনোবিজ্ঞান যে সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ, যেমন—জ্ঞানসম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ, যথা—প্রত্যক্ষণ, কল্পনা, চিন্তা; আবেগ-সম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ, যথা—হাসা, কাঁদা; গতিসম্পর্কীয় ক্রিয়াকলাপ, (motor activities), যথা—হাঁটা, কথা বলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে—এই সংজ্ঞায় তা স্বীকার করা হয়েছে। **অনুভূতিও একপ্রকার ক্রিয়াকলাপ। উডওয়ার্থের মতে জীবনের যে কোন প্রকাশই তার ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত।**

চতুর্থতঃ, উডওয়ার্থ 'ব্যক্তি' (individual) কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'ব্যক্তি' বলতে কি কেবল 'দেহযন্ত্রটিকেই বুঝব? তাহলে অবশ্য এই সংজ্ঞাটি দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। ব্যক্তি বলতে, আচরণবাদীদের মতন তিনি মনকে বর্জন করেন নি, অথবা কেবলমাত্র দেহযন্ত্রটিকেই বোঝেন নি। 'ব্যক্তি' বলতে তিনি শুধু দেহকে না বুঝে, দেহ ও মনের সমন্বয়ে যে ব্যক্তি তাকেই বুঝেছেন। ব্যক্তির মন তার দেহের মাধ্যমেই কাজ করে। ব্যক্তির আচরণ বা ব্যবহার তার দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং একদিকে মানসিক প্রক্রিয়া ও অপরদিকে তার দৈহিক আচরণ—এই উভয় বিষয়কেই এই সংজ্ঞায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সবশেষে, 'পারিপার্শ্বিক' (environment) কথাটি নির্দেশ করে যে, মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বহির্জগতের একটা সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই ব্যক্তির মনের উপর ক্রিয়া করে।

মনোবিজ্ঞানের সন্তোষজনক সংজ্ঞা (Satisfactory definition of Psychology) ঃ

প্রশ্ন হল, মনোবিজ্ঞানের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি? পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির প্রত্যেকটির কিছু না কিছু দোষত্রুটি আছে সত্য, তাহলেও কোনটিই একেবারে ভ্রমাত্মক নয়। এক একটি সংজ্ঞা এক একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য প্রত্যেকটি সংজ্ঞার মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। কিন্তু কোন সংজ্ঞাই পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমরা এইবার মনোবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করতে পারি। এই সংজ্ঞাটি হল, **"মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা জীবের আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ শ্রেণীবিভাগ, গতি-প্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিণাম নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যে দেহগত প্রক্রিয়া সেগুলি বর্ণনা করে।"**

নিম্নোক্ত কারণে এই সংজ্ঞাটিকে মনোবিজ্ঞানের একটি সন্তোষজনক সংজ্ঞারূপে গণ্য করা যেতে পারে ঃ

প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive science), আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Normative science) নয়; কেননা,

মনোবিজ্ঞান কোন আদর্শের আলোকে তার আলোচ্য বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে না।

যে কারণে সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের অভিমতানুযায়ী মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব ঘটনা হওয়া উচিত অর্থাৎ সে ঘটনা যেন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের বিষয়বস্তু হতে পারে। আচরণ মনের বাহ্যপ্রকাশ এবং এই আচরণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের বিষয়বস্তু। এই সংজ্ঞাতে মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে—এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, এই সংজ্ঞায় 'আচরণ'কে আচরণবাদীরা (Behaviourists) যে অর্থে গ্রহণ করেছেন সেই অর্থে গ্রহণ করা হয় নি। আচরণের মাধ্যমে জীবের মন'কে জানাই যে মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করা যে মনোবিজ্ঞানের কাজ, তাও এই সংজ্ঞায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থতঃ, 'জীব' কথাটি বলতে এখানে 'পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত' যে জীব তাকেই বুঝতে হবে এবং 'আচরণ' বলতে পরিবেশ ও জীবের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ফলে জীবের মধ্যে যে আচরণের উদ্ভব ঘটে তাকে বুঝতে হবে। পঞ্চমতঃ, জীবের 'আচরণ' (behaviour) যে মনেরই প্রকাশ এই সংজ্ঞায় তারও উল্লেখ আছে।

সর্বশেষে, মনোবিজ্ঞান যে 'দেহগত প্রক্রিয়া' নিয়ে আলোচনা করে এই সংজ্ঞাতে তারও উল্লেখ রয়েছে।

২। শিক্ষার স্বরূপ (Nature of Education) :

ইংরেজী '*Education*' শব্দ ল্যাটিন *educere* শব্দ থেকে উদ্ভূত। '*educere*'

শিক্ষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

কথার অর্থ হচ্ছে কোন কৌশল আয়ত্ত করা বা তথ্য সংগ্রহ করা। আদিমকালে মানুষ জীবন সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য যে তথ্য আহরণ করত তাকেই বলা হত শিক্ষা। শিক্ষার এই প্রাচীন ব্যাখ্যাকে বর্তমানে সাধারণ অর্থে শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ বলে গণ্য করা হয়। 'শিক্ষা' বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে বিদ্যালয়ে বা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান। অর্থাৎ মানুষের যে অভিজ্ঞতা আমরা পুঁথিপত্রের সাহায্যে লাভ করি সে অভিজ্ঞতা বা তথ্যই হচ্ছে শিক্ষা। এ অর্থে শিক্ষাদ্বারা আমরা শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত করে তুলি। বলা বাহুল্য, এ হল শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ। এ শিক্ষা মানুষের জীবনের বিশেষ স্তরে সীমাবদ্ধ।

শিক্ষার এই সংকীর্ণ অর্থ থেকেই সৃষ্ট হয়েছে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের জাতিভেদ। যারা লিখতে পড়তে শিখেছে, গ্রন্থাধ্যয়ন যারা অভ্যাস করেছে তারাই শিক্ষিত। আর অন্য দিকে, যারা লিখতে পড়তে শেখেনি তারা অশিক্ষিত। শিক্ষা এখানে আক্ষরিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা লিখতে পড়তে শিখে বিশেষ বিদ্যাভ্যাস করেছে তারা জানে শিক্ষা তাদের অধিকার, অন্যদিকে যারা এ আক্ষরিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত তারা শিক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ

কিন্তু শিক্ষার স্বরূপ এ সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে নিহিত নেই। শিক্ষা জীবনের সমপর্যায়ভুক্ত। শিক্ষার পরিধি সমগ্র জীবনব্যাপী। শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত বা ব্যাপক অর্থ হল জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনে এবং নতুন আচরণের সৃষ্টি করে। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষের বা জীবনের বিশেষ স্তরে সীমায়িত নয়। প্রতিটি মানুষের জীবনে চলেছে শিক্ষার অন্তহীন, বিরামহীন প্রক্রিয়া। শিক্ষা প্রতি মানুষের জন্মগত অধিকার। অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও, শিক্ষিত হতে দোষ নেই। তাই ব্যাপক অর্থে, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বলে কোন ভেদ মানুষের মধ্যে নেই। বিশ্বপ্রকৃতিই একমাত্র শিক্ষক এবং প্রতিটি মানবসন্তান জীবন ভর শিক্ষার্থী।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানুষের জীবন-বিকাশের সঙ্গে সমার্থক। পৃথিবীতে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই তার জীবনে চলে বিকাশের লীলাখেলা, আর শেষ হয় মৃত্যুতে। শিক্ষারও শুরু জন্ম থেকেই আর শেষ মৃত্যুতে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আচরণের পরিবর্তন যদি অবাঞ্ছিত হয়, তবে সে পরিবর্তন শিক্ষা নয়। যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। কিন্তু সে পরিবর্তন যেন নীতিশাস্ত্রসম্মত হয়, মানুষের জীবনে বাঞ্ছনীয় হয়, সামাজিক আদর্শ লাভের পক্ষে সহায়ক হয়। মিথ্যা বলা, চুরি করা, প্রবঞ্চনা করা প্রভৃতি অপরাধমূলক অভিজ্ঞতাও আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনে, আচরণে সহায়তা করে, বাস্তবে কাজে লাগে। তা-বলে এ ধরনের অসামাজিক, অনৈতিক আচরণগুলিকে আমরা 'শিক্ষা' বলে অভিহিত করতে পারি না।

সকল আচরণই শিক্ষা নয়

আসল কথা, ব্যক্তির ও সমাজের অস্তিত্ব সংরক্ষণই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তির ও সমাজের প্রগতিও শিক্ষার অন্যতম কাজ। ব্যক্তির আচরণকে ব্যক্তি ও

সমাজের আদর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার প্রশ্নও এসে পড়ে। সুতরাং এ দু'য়ের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতির প্রয়োজনে সমাজ-স্বীকৃত আচরণকে গ্রহণ করাই শিক্ষা।

৩। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলি প্রয়োগের ফলে পৃথক বিষয় রূপে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা-বিশেষ।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানের শাখা বিশেষ

'শিক্ষা' বলতে আমরা মানবের আচরণের সার্থক ও সংহত পরিবর্তন বুঝি, আর মনোবিজ্ঞানকে আমাদের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করি। উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে, বস্তুনিষ্ঠভাবে (objectively) মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা আচরণের স্বরূপ, গতি ও নীতি আলোচনা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। শিক্ষাব ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে শিক্ষাদানে সহায়তা করা এবং শিক্ষাদান প্রসূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি মনোবিজ্ঞানের চাইতে সংকীর্ণ। মানবমনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনার সুযোগ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে নেই। শিক্ষাদানপদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত কিনা বা শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবমনের আচরণের মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন করে কিনা, শিক্ষাকে কিভাবে আকর্ষণীয়, আয়াসহীন করে তোলা যায়—এসব বিষয়েই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচনা সীমাবদ্ধ। যদিও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এতে করতে হয়, তবুও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষামূলক আচরণেব আলোচনাই প্রধান। তাছাড়া, দৃষ্টিভঙ্গীর (angle of vision) দিক থেকেও মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। মনোবিজ্ঞান আচরণের গতি-প্রকৃতি ও মৌলিক নিয়ম আবিষ্কারেই ব্যস্ত। কিন্তু শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, কিভাবে নতুন আচরণ সম্পাদন করা যায়, কিভাবে স্বল্প সময়ে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা প্রদান করা যায় ইত্যাদি। সুতরাং একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর আলোচনা করে।

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। জাড্ (C. H. Judd) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যা ব্যক্তির জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশের বিভিন্ন

স্তরে যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করে।" এই সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় যে জাড্ শিক্ষা কথাটিকে কতখানি ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

কোলেসনিক (*W. B. Kolesnik*) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "শিক্ষা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা ও উন্নত করতে মনোবিজ্ঞানের যে সব তথ্য ও নীতি সহায়ক, সেগুলির অনুশীলন হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান।"

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নিছক প্রয়োগশাস্ত্র নয়। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একমাত্র কর্তব্য নয়। একথা সত্য যে মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে শিক্ষায় বিশেষভাবে প্রয়োগ (application) করা থেকেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলাদা শাস্ত্র হিসেবে জন্ম লাভ করেছে। কিন্তু তবুও তা মনোবিজ্ঞানের নিছক ফলিত (applied) রূপ নয়। কারণ মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে প্রয়োগ করার সময় শিক্ষার যেসব বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিক্ষণের (learning) যে বিচিত্র গতিপ্রকৃতি ধরা পড়ে, তার সমাধান এবং সংব্যাখ্যানও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলিকেই নির্ভর করে গড়ে ওঠে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণার গভীর ও ব্যাপক ক্ষেত্র, নিজস্ব গঠন (structure) এবং কর্মের পরিধি (scope)।

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

৪। শিক্ষাতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান (Education and Psychology):

(ক) **শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Education & Psychology):** আমরা শিক্ষার স্বরূপ আলোচনা করেছি। শিক্ষার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করেছি, যে অভিজ্ঞতা কোন-না-কোন ভাবে আমাদের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম, সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা। আর মনোবিজ্ঞান হল, মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। অর্থাৎ মানুষের আচরণের মাধ্যমে মানসিক ক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি বা সূত্র নির্ধারণই মনোবিজ্ঞানের কাজ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ দুটি শাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক শুধু নিবিড় তা নয়, উভয় শাস্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানবসন্তানকে সুন্দর এবং সার্থক আচরণে অভ্যস্ত করা শিক্ষাতত্ত্বের উদ্দেশ্য। সুতরাং আচরণের ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূলক দিক হল

শিক্ষাতত্ত্বের বিষয়বস্তু। এজন্য শিক্ষাতত্ত্বকে আচরণের প্রয়োগশাস্ত্র বলা হয়। অর্থাৎ আচরণের মৌলিক সূত্রের জ্ঞান শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান থেকেই গ্রহণ করে এবং নতুন আচরণ সৃষ্টি করতে বা আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে প্রয়োগ করে। এ দিক থেকে শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আবার মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলির যাথার্থ্য বিচার করে। এদিক থেকে শিক্ষাতত্ত্বের কাছে মনোবিজ্ঞান ঋণী।

(খ) **শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা** (**Necessity of Psychology in Education**): মনোবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির জ্ঞান প্রতি শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদের কাছে অপরিহার্য। কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানই শিক্ষাদান কার্যে যথেষ্ট নয়। প্রাচীনপন্থী শিক্ষকগণ নিজেদের পাণ্ডিত্য বা গ্রন্থজ্ঞানের উপরই গুরুত্ব দিতেন, অর্থাৎ বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতাকেই যথার্থ শিক্ষার মাপকাঠি রূপে গণ্য করা হত। কিন্তু যে শিক্ষা গ্রহণ করবে তার কোন বিবেচনা তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বে ছিল না। অ্যাডাম্‌স (*Adams*) একটি সুন্দর কথা বলেছেন: 'The teacher teaches John Latin'—এই বাক্যটিতে শিক্ষাক্রিয়ার দুইটি কর্ম রয়েছে। একটি 'জন', অন্যটি 'লাটিন'। শিক্ষকের লাটিন (শিক্ষার বিষয়বস্তু) সম্বন্ধে যেমন গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি 'জন' সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান থাকা দরকার। জনের সম্পর্কে জ্ঞান থাকা মানে জনের মানসিক গঠন, প্রকৃতি, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা। সুতরাং শিক্ষাদানকার্যে শিক্ষকের 'লাটিন' জানাই একমাত্র কথা নয়, তার সঙ্গে 'জনকে'ও জানতে হবে। আর এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের তথ্যই তাকে সহায়তা করবে।

শিক্ষাকে আমরা তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করি: শিক্ষার লক্ষ্য (aims of education), শিক্ষার বিষয়বস্তু (subject-matter of education), শিক্ষার পদ্ধতি (methods of teaching)। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাদর্শন আলোচনা করে। মানুষের জীবনদর্শনই তখন শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে দার্শনিকগণ যে আলোচনা করেন, সে আলোচনা শিক্ষার আদর্শ নিরূপণ ও পথ পরিক্রমা নির্দেশে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ: ভাববাদ বিশ্বাস করে, এই বিশ্ব এক পরমসত্তার প্রকাশ। সে সত্তা ভাবমূলক এবং অবিনশ্বর, সত্য ও অনন্ত। পরমসত্তার সঙ্গে অভেদত্ব উপলব্ধি করাই জীবনের লক্ষ্য ও মুক্তি। আর শিক্ষার উদ্দেশ্যও এই পরমসত্তার জ্ঞান লাভ করা। অন্যদিকে জড়বাদ এই দৃশ্যমান জড়জগৎকেই মৌলিক সত্তা বলে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে

যে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলে নিয়োজিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আর শিক্ষা এ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে দর্শনশাস্ত্র প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করে।

কিন্তু তা বলে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের কি কোন বক্তব্য নেই? একথা স্বীকার্য যে প্রত্যক্ষভাবে মনোবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে না। কিন্তু পরোক্ষভাবে মনোবিজ্ঞানের উপর শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টি নির্ভরশীল। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করাই শিক্ষাতত্ত্বের একমাত্র সমস্যা নয়, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা তার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে একমাত্র সহায়ক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। কিভাবে শিক্ষার্থী এসব উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করবে তা মনোবিজ্ঞানই আলোচনা করে। তাছাড়া, দার্শনিক-চিন্তাপ্রসূত আদর্শগুলি মানবমনের মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন করে কিনা এসব মনোবিজ্ঞানই স্থির করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন ইউরোপে বিশ্বাস করা হত যে পাপ থেকেই আমাদের জন্ম, অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে পাপমোচন, তাই মানব-শিশুকে কঠিন শাসন ও রূঢ় শৃঙ্খলায় রাখা চাই। আমাদের দেশে ধারণা ছিল মানবের শত্রু হচ্ছে ষড়রিপু, অতএব ইন্দ্রিয়নিচয়কে দমন করা চাই। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এ ধরনের মানসিক গতি ও প্রকৃতিবিরোধী বক্তব্যকে বাতিল করে দিয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানেরও এক ভূমিকা রয়েছে যদিও তা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ।

শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে? কি কি আমরা শিখব, এটা নির্ভর করে কোন্ উদ্দেশ্য আমরা শিক্ষায় চরিতার্থ করতে যাচ্ছি। যদি ভাববাদী আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে থাকি, তবে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিই হবে আমাদের প্রধান পাঠ্য বিষয়। আবার জড়বাদী দর্শন যদি অনুসরন করি তবে জড়জগতের বিষয়গুলিই হবে আমাদের পাঠ্যবিষয়। সুতরাং শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণে দর্শনই প্রধান সহায়ক। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেরও বক্তব্য রয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু মানসিক বিকাশে কতটুকু সহায়ক, শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী কোন্ কোন্ বিষয় তাকে শেখাতে হবে, এসব বিষয় শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানই আলোচনা করে।

কিন্তু শিক্ষা-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও স্বতন্ত্র অধিকার। প্রতিটি শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি যে বিষয় শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে তাঁর নিজস্ব প্রাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করে না। কেননা, শিক্ষার্থীকে

কিভাবে মনোযোগী করে তোলা যায়, কি ভাবে তার আগ্রহের সঞ্চার করা যায়, তার গ্রহণ-ক্ষমতা কতটুকু, অর্থাৎ স্বল্পতম সময়ে কিভাবে শিক্ষাদান করা যায়, আর সে শিক্ষা শিশু-মনে কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী হবে—এসব প্রশ্ন প্রত্যেক শিক্ষককেই বিব্রত করে। আর সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন এখানে সহায়ক। শিক্ষামনোবিজ্ঞান বা মনোবিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এই শিক্ষাদান পদ্ধতিকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

শুধু তাই নয়, নানাদিক থেকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা আজ শিক্ষাকে সার্থক, আয়াসহীন, প্রাণবন্ত ও কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করছে। আমরা এক্ষণে সংক্ষিপ্তভাবে শিক্ষার সহায়ক মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি গবেষণার উল্লেখ করছি। শিক্ষাতত্ত্ব এ গবেষণাগুলির উপর নির্ভরশীল।

(১) **ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতি (Principle of individual difference):** গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক পার্থক্যের কোন বিবেচনা করা হত না। গ্রহণ-ক্ষমতা, আবেগ, আগ্রহ এসব দিক দিয়ে বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন। শিশুদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিগত বৈষম্য। আর সে বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষাকে আজ ব্যক্তিমুখী (individualised) করে তোলা হচ্ছে।

(২) **শিক্ষণের নিয়মাবলী (Principle of learning):** আধুনিক মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে, শিক্ষার বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা শিক্ষা লাভ করি। গতানুগতিক শিক্ষায় আমাদের ধারণা ছিল বক্তৃতার দ্বারাই সব বস্তুকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষাদানের একটি পূর্ব শর্ত হল শিক্ষণের নিয়মাবলী জানা।

(৩) **ব্যক্তির ক্রমবিকাশের নিয়ম (Developing or Genetic method):** শিক্ষা ব্যক্তির জীবন বিকাশের সঙ্গে সমার্থক। আর ব্যক্তির জীবনে বিকাশের বিভিন্ন স্তর (stages) বর্তমান। শিক্ষা এই বিভিন্ন স্তরেরই অনুগামী হবে। আমরা যদি শিশুর মধ্যে পরিণত মানুষের বুদ্ধিশীলতা আশা করি এবং সেভাবে শিক্ষাদান করি তবে শিক্ষা সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং শিশুর শৈশব স্তরে শিশুকে ইন্দ্রিয়ানুশীলনের শিক্ষা দেওয়াই সঙ্গত।

(৪) **বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ (Nature & Measurement of Intelligence):** শিশুর শিক্ষা গ্রহণ নির্ভর করে তার বুদ্ধির উপর। সুতরাং শিক্ষাদান কালে বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ জানা দরকার। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের ক্ষিপ্রতা তার বুদ্ধির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণা

বুদ্ধির প্রকৃতি এবং পরিমাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছে। আর এসব তথ্য অবলম্বন করে বুদ্ধি পরিমাপের নানা পন্থা ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষকের শিক্ষাদানের জন্য এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) **সহজাত প্রবৃত্তি** (Instinct), **প্রক্ষোভ** (Emotion), **বংশধারা** (Heredity) **এবং পরিবেশ** (Environment) **ইত্যাদি ঃ** শিক্ষা অনেকাংশে ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, বংশধারা এবং পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ, শিক্ষা শুধু একদিক থেকেই ব্যক্তির উপর প্রতিক্রিয়া করে না, ব্যক্তির প্রক্ষোভ, প্রকৃতি, পরিবেশ ও বংশধারা ইত্যাদিও শিক্ষার উপর প্রতিক্রিয়া করে ও প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এসব তথ্য আলোচনার দ্বারা শিক্ষার পথকে সার্থক করে তুলেছে।

(৬) **মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতি** (Psychological Testing) ঃ অধুনিক মনোবিজ্ঞান শুধু বুদ্ধির পরিমাপের পন্থা আবিষ্কার করেনি। তার অন্তহীন গবেষণার ফলে আমরা মানব মনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বস্তুগতভাবে অনেক তথ্য জেনেছি। শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণে কতটুকু সার্থকতা লাভ করল, অর্থাৎ, তার শিক্ষাগ্রহণ সফল হল কিনা এসব পরিমাপ করার ব্যবস্থা করেছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান। একে বলা হয় লব্ধশিক্ষার পরীক্ষা (Educational Testing)। তাছাড়া, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার লক্ষণ, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদিও মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিমাপ করা যায়। এসব গবেষণা কেবল শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন দ্বার খুলে দেয়নি, শিক্ষকের কাছেও উদ্ঘাটিত করেছে শিক্ষার নতুন দিগন্ত।

এসব বিষয় ছাড়াও শিক্ষার সহায়ক বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজ করে তুলেছে। মনোযোগ দেওয়া (Attending), মনে রাখা (Remembering), ভুলে যাওয়া (Forgetting) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া এবং নানা আচরণগত সমস্যার (Behaviour Problems) গতি-প্রকৃতি আলোচনার দ্বারা মনোবিজ্ঞান শিক্ষান্তরের সহায়ক হয়ে উঠেছে।

উপসংহারে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষার সহায়করূপে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একক হিসেবে কাজ করে না। মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে সহায়তা করে। শিশু-মনোবিজ্ঞান (Child Psychology) শিক্ষাক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তারই ফলস্বরূপ শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আবির্ভাব হয়েছে। তাছাড়া, পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology), প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞান (Applied Psycho-

logy[১], চিকিৎসামূলক মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology), প্রভৃতি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরম সহায়ক এবং শিক্ষা-পদ্ধতিকে সংশোধিত ও সার্থক করে তুলতে এদের দান অনস্বীকার্য।

৩। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি (Scope of Educational Psychology) ঃ

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি বলতে বুঝি এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা আলোচিত বিষয়-বস্তুর পরিসর। কোন বিষয় সম্বন্ধে স্বল্পতম সময়ে সহজভাবে সার্থক শিক্ষা কিভাবে প্রদান করা যায় এবং সেই শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীর মন কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে, তার সংব্যাখ্যানই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচী শিক্ষাদানের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বিস্তৃত। এবার আমরা এই সমস্যা-গুলিকে বিশ্লেষণ করে তার আলোচনা নীচে লিপিবদ্ধ করছি :

(ক) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান প্রথমতঃ শিশু-মনের আলোচনা করে। শিশু-মনের নমনীয়তা, তার উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি এ শাস্ত্রে আলোচিত হয়। কেননা, শিশুকে কেন্দ্র করেই শিক্ষার পরিধি ও সার্থকতা দুই-ই ব্যাপ্ত হয়।

(খ) শিক্ষাদানকালে দেখা যায় শিক্ষার্থীর মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার মধ্যে কতকগুলি সহজাত (innate) আবার কতকগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ (acquired)। এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীর অন্যান্য মানসিক ক্রিয়া, যেমন—বুদ্ধি, অনুভূতি ইত্যাদির সম্পর্ক নির্ণয় করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ।

(গ) শিক্ষাদানের সার্থকতা নির্ভর করে প্রধানতঃ প্রকৃষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতির উপর। এজন্য শিক্ষা-পদ্ধতিই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষণের (learning) মূলনীতিগুলি ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করা অপরিহার্য। শিক্ষণের অন্তরায় হল ক্লান্তি বা অবসাদ (fatigue) এবং বিরক্তি (irritability)। এগুলিকে কিভাবে দূর করে শিক্ষাপ্রদান কাজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়, তাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) সব রকম অভিজ্ঞতা আহরণের পথ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়। কাজেই শিক্ষাদানের প্রধান সহায়ক এই ইন্দ্রিয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়ানুশীলনকে কিভাবে শিক্ষায় প্রয়োগ করা যায় ইত্যাদি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

(ঙ) মানব-মনের প্রক্ষোভ, সহজাতবৃত্তি বা অন্যান্য আবেগ বা অনুভূতি যদি যথাযথভাবে প্রকাশপথ খুঁজে না পায় তবে শিশুর চরিত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়

এবং তার মধ্যে একটি অসমঞ্জস (maladjusted) ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

(চ) শিশুর বুদ্ধি ও ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তার আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদির বিবেচনা করে শিক্ষার বিষয়বস্তু কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং কিভাবে শিক্ষাদান করতে হয় এসব বিষয়ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

(ছ) যে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিক। সুতরাং বৃহত্তর সমাজ-জীবনে জীবিকা নির্বাহ করে যাতে দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে সে নিজেকে গঠন করতে পারে, সে শিক্ষাও তাকে প্রদান করা উচিত। এজন্য কোন্ বৃত্তি সে গ্রহণ করবে, কোন্ বৃত্তিতে তার স্বাভাবিক অনুরাগ আছে বা কোন্ বৃত্তি তার পক্ষে গ্রহণ করা উচিত হবে—এসব ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এজন্য বৃত্তি-নির্ধারণে নির্দেশদান (Vocational guidance) শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

(জ) এসব ছাড়াও শিক্ষার সহায়ক অন্যান্য আনুষঙ্গিক মানসিক প্রক্রিয়া, যেমন—চিন্তন, কল্পনা, মনোযোগ, স্মৃতি ইত্যাদিও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে। তাছাড়া, মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তি অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

৬। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (Short account of the origin of Educational Psychology) :

মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক তার বিষয়বস্তু অধ্যয়ন করে—প্রথমতঃ, পরিবেশের সঙ্গে মানব আচরণের বর্ণনা এবং এ পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিসাধন করার প্রচেষ্টা প্রক্রিয়া অধ্যয়ন, দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ পরিবেশে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সমাজ কি প্রতিক্রিয়া করে তা পূর্ব থেকে অনুমান করা, তৃতীয়তঃ, উপরিউক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও তার পরিবেশে অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধন।

শিক্ষাকে আমরা মানব আচরণের সার্থক ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করে থাকি। অতএব দেখা যাচ্ছে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। এখানে 'মনোবিজ্ঞান' অর্থে আমরা 'শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান' বোঝাচ্ছি। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্র প্রয়োগ করে থাকে। ইহা একটি ফলিত মনোবিজ্ঞান।

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল, শিক্ষা মনোবিজ্ঞাননির্ভর ছিল না। শিশু-মনোবিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে ছিল অজ্ঞাত—পাঠ্যসূচী ছিল সামাজিক চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—আর সে চাহিদা ছিল গতানুগতিক। শিক্ষক এধরনের পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীর উপর আরোপ করতেন—তার মানসিক চাহিদা, ক্ষমতা, কোন কিছুই শিক্ষক বিবেচনা করতেন না।

মনোবিজ্ঞানে মন ও আচরণ সম্বন্ধে নিত্যনতুন গবেষণা এবং বহুবিধ আবিষ্কার শিক্ষাপ্রদানে, পাঠ্যসূচী প্রণয়নে বিপ্লবাত্মক প্রভাব ও পরিবর্তন এনেছে। মনো-বিজ্ঞানের আবিষ্কাব ও গবেষণাব ফলে আজ আমরা জেনেছি শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীকে ইচ্ছানুসারে রূপ দেওয়া যায় না। তার প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, প্রবণতা, সামর্থ্য, গ্রহণ-ক্ষমতা প্রভৃতি অনুসারে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত কবতে হয়।

একথা ঠিক যে প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌দের চিন্তাধারায় শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছিল। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে গ্রীক দার্শনিক প্ল্যাটো (*Plato*) শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক সংব্যাখ্যানে বলেন, শিক্ষাকে চরিত্র গঠনের উপায় স্বরূপ মেনে নিলে, মানব-প্রকৃতির জ্ঞান ব্যতিবেকে শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। তাঁর 'Republic' গ্রন্থে তিনি মানব-প্রকৃতির একটি ব্যাখ্যা এবং সে প্রসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। প্ল্যাটোর ব্যাখ্যা অনুসারে শিক্ষকের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীব প্রকৃতি সম্বন্ধে সমানভাবে জ্ঞান থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাচীন শিক্ষায মনোবিজ্ঞানের কোন প্রভাব স্বীকৃত হয় নি। আসলে মনোবিজ্ঞান ছিল সেদিন দর্শনের কুক্ষিগত এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল সীমিত। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ মূলতঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দান।

সর্বপ্রথম রুশো (*Jean Jaques Rousseau*) শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন। শিক্ষাকে মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার মূলে রুশোর অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবহেলা মোটেই সমর্থন করেন নি। রুশোর মতে শিক্ষার্থী তার জীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী স্বাভাবিক নিয়মে শিক্ষা করবে। কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের আন্দোলনের যিনি পুরোহিত বলে খ্যাত তিনি হলেন পেস্টালৎসী (*Pestalozzi*)। শিক্ষাকে তিনি মানব প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ বলে ব্যাখ্যা করলেন এবং শিশুর মনকে জানা এবং মনোবিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মগুলিকে অনুসরণ করা সার্থক শিক্ষার শর্ত বলে ঘোষণা করলেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববস্তুর প্রত্যক্ষন, সক্রিয়তা (Activity), ভ্রমন, প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষন প্রকৃতিকে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। ফ্রয়েবেল (*Froebel*)-ও

এ মত অনুসরণ করে তাঁর 'শিশু-উদ্যান' (Kindergarten) পরিকল্পনা করেন। তিনি খেলা, গান করা, গল্প শোনা, গল্প বলা প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষা ও বিকাশ কিভাবে সহায়তা লাভ করে তার কথা বলেছেন।

এঁদের পর যাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান তিনি হলেন য়োহান ফ্রীডরিক হারবার্ট (*John Friedrich Herbeart*)। হারবার্টের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল সংপ্রত্যক্ষ (apperception)। আমাদের প্রাক্তন বা পূর্ব অভিজ্ঞতায় সংশ্লিষ্ট নতুন অভিজ্ঞতা বা সংবেদন স্পষ্ট হয়। সংবেদন শুধু সংবেদনেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার সঙ্গে ব্যক্তিমনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটে। তিনি তাঁর সমগ্র শিক্ষণ প্রণালীকে সংপ্রত্যক্ষণের উপব নির্ভর করে রচনা করেছেন।

এসব শিক্ষাবিদদের চিন্তাধারার প্রভাবে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষাকে আমরা আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে থাকি। প্রতিটি শিশুর জীবন বিকাশের নির্দিষ্ট গতি-প্রকৃতি বর্তমান, এবং শিক্ষা তার অনুগামী হয়ে জীবন বিকাশে সহায়তা করে।

৭। শিক্ষামনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ (Some objections to Educational Psychology) :

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ আমরা আলোচনা করা উচিত মনে করি।

আমরা একথা জেনেছি যে, বিষয় বস্তুতে প্রখর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ দক্ষতাই উপযুক্ত শিক্ষক হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। উপযুক্ত শিক্ষক হতে গেলে, শিক্ষা প্রদানকে সার্থক করে তুলতে হলে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষাকে শিশু-কেন্দ্রিক করা চাই। শিশুর জীবনধর্মী না হলে শিক্ষা কৃত্রিম হয়ে পড়বে। এ ধরনের শিক্ষা-চিন্তাকে অনেকে 'Soft pedagogy' বলে সমালোচনা করেছেন এবং সার্থক শিক্ষা-প্রদানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

যারা উপরিউক্ত অভিমতের সমালোচনা করেছেন তাঁদের অভিমত হল এই মনোবিজ্ঞান বিষয়নিষ্ঠ। শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। শিক্ষার্থীর বর্তমান আচরণের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা-প্রদান মনোবিজ্ঞানের কাজ, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ আচরণ বা জীবনের পরিণতি নিয়ে মনোবিজ্ঞানের পক্ষে কোন আলোচনা করা চলে না। কিন্তু শিক্ষক শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে চলেন, শিশুকে বিশেষ বিশেষ আদর্শে জীবন গঠন করার প্রেরণা শিক্ষক প্রদান করেন। মনোবিজ্ঞানে তাঁর দক্ষতা থাকা মোটেই অপরিহার্য নয়।

এ অভিযোগের মধ্যে কিছুটা যুক্তি বর্তমান। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় হল শিক্ষা-দর্শনের কাজ, শিক্ষা-বিজ্ঞান ফলিত মনোবিজ্ঞানের একটি বিভাগ নয়। আমরা শ্রেণী কক্ষকে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার করে তুলতে চাই না। কিন্তু এ অভিযোগ মোটেই সমর্থনীয় নয়। মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎকে নিয়ে আলোচনা করে না সত্য কিন্তু শিক্ষার্থীর বর্তমান সম্ভাবনা নির্ণয় করে থাকে। এ সম্ভাবনাগুলিকেই শিক্ষক ভবিষ্যৎ সংগঠনে কাজে লাগাতে পারেন। অন্যদিকে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেন। শিক্ষার্থী শিক্ষকের কর্মবস্তু (material), তিনি যদি শিক্ষার্থী সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই অর্জন না করেন, তবে তার কর্মবস্তুকে কিভাবে তিনি রূপ দেবেন? শিল্পীকে যেমন রঙ ও তুলির ধর্ম জানতে হয় শিক্ষককেও তাঁর ছাত্রের প্রকৃতি জানতে হয় এবং মনোবিজ্ঞানই তাঁর সহায়ক।

শিক্ষণ আর শিক্ষা সমার্থক নয়। শিক্ষণ শিক্ষার একটি অঙ্গ। শিক্ষা বলতে ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, আত্মিক বিকাশ আমরা বুঝে থাকি। এ বিকাশ প্রক্রিয়ার বর্ণনা আমরা মনোবিজ্ঞানেই লাভ করি। শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবে সম্ভব কিনা, মনোবিজ্ঞানই আলোচনা করে থাকে। বিষয় কঠিন বা নীরস হলে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি দ্বারা তাকে সরস ও সহজ করে উপস্থিত করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি

(Physiological Basis of Mental Life)

১। মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি (Physiological Basis of Mental Life) :

দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, বাইরের জগতের বিভিন্ন বস্তু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন ধরনের সংবেদন সৃষ্টি করে। বহির্জগতের আলোক বা বর্ণ আমাদের চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে, ফলে আমরা দৃষ্টিগত সংবেদন পাই। অনুরূপভাবে আমাদের কর্ণেন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে শ্রবণগত, নাসিকা উদ্দীপিত হলে ঘ্রাণগত, জিহ্বা উদ্দীপিত হলে স্বাদগত এবং ত্বক উদ্দীপিত হলে স্পর্শগত সংবেদন পাই। সুতরাং বিভিন্ন ধরনের সংবেদন ইন্দ্রিয়গুলির উদ্দীপনের উপর নির্ভরশীল। রাগ, ভয় ইত্যাদি আবেগের ক্ষেত্রেও দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে এবং দেহের কতকগুলি বাহ্যপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। দৈনন্দিন জীবনেও আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, মন পেশীর মাধ্যমে বাইরের জগতের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দেহ ও মন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত।

কিভাবে সংবেদন সৃষ্টি হয়

বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরও বিশেষভাবে প্রকাশ করছে যে, দেহের একটি বিশেষ অংশ স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System), দেহের অন্যান্য অংশের তুলনায় মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। আবার এই স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত যে মস্তিষ্ক তার সঙ্গে মানসিক ক্রিয়ার সম্পর্ক এতই গভীর যে মনের সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে অনুষঙ্গী হিসেবে কোন-না-কোন মস্তিষ্কের ক্রিয়া (brain process) সম্পর্কযুক্ত হয়ে আছে। এই জন্যই মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের স্নায়ু-তন্ত্রের গঠন, তার বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন এবং একেই আমরা মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি বলে অভিহিত করতে পারি।

স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

স্নায়ুতন্ত্রই মানব-জীবনের দৈহিক ভিত্তি

২। স্নায়ুতন্ত্রের বিভাগ (Division of the Nervous System) :

স্নায়ুতন্ত্র হল মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অংশ। দেহের সমস্ত অংশই স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে যোগ-সাধন করে, তাদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে এই স্নায়ুতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় আমরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি এবং পেশীর সাহায্যে বাইরের জগতের উপর ক্রিয়া করি। ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা, তাদের পরিচালনা করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। বস্তুতঃ স্নায়ুতন্ত্রই হল মানুষের সব অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া এবং অনুভূতির মূল।

মানবদেহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—(ক) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (Central Nervous System), (খ) **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র** (Autonomic Nervous System) এবং (গ) **প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র** (Peripheral Nervous System)।

স্নায়ুতন্ত্রের তিনটি বিভাগ

(ক) **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** : এই স্নায়ুতন্ত্রের অন্তর্গত হল মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)। এদের একত্রে মস্তিষ্ক-মেরবিক চক্রও (The Cerebro-Spinal Axis) বলা হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের আবার বিভিন্ন অংশ আছে, যেমন—সুষুম্নাশীর্ষক (Medulla Oblongata), সেতু মস্তিষ্ক (Pons Varolli), লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum), মধ্যমস্তিষ্ক (Mid brain) এবং গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum)।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্ক-মেরবিক চক্র

(খ) **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র** : এর দুটি বিভাগ ; যথা—সমবেদী (Sympathetic) এবং পরা-সমবেদী (Para-sympathetic)।

(গ) **প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র** : মস্তিষ্ক এবং সুষুম্নাকাণ্ড থেকে নির্গত স্নায়ু (Nerves) এই বিভাগের অন্তর্গত। এই স্নায়ু দু রকমের—মস্তিষ্ক-স্নায়ু (Cranial-nerves) এবং সুষুম্না-স্নায়ু (Spinal nerves)। এক কথায় এদের বলা হয় 'Cerebro Spinal Nerves.'

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সর্বপ্রথমে স্নায়ুতন্ত্রের যে ক্ষুদ্রতম অংশ 'নিউরন' তার সম্পর্কে আলোচনা করব :

৩। নিউরনের গঠন ও কার্যকলাপ (The Structure and Function of a Neurone) :

(ক) **নিউরনের গঠন** (The Structure of Neurone) : একটি

পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির স্নায়ুতন্ত্র বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য নিউরনের দ্বারা গঠিত। এই নিউরন সংখ্যায় বার মিলিয়ান অর্থাৎ বার লক্ষ কোটি বলে ধারণা করা
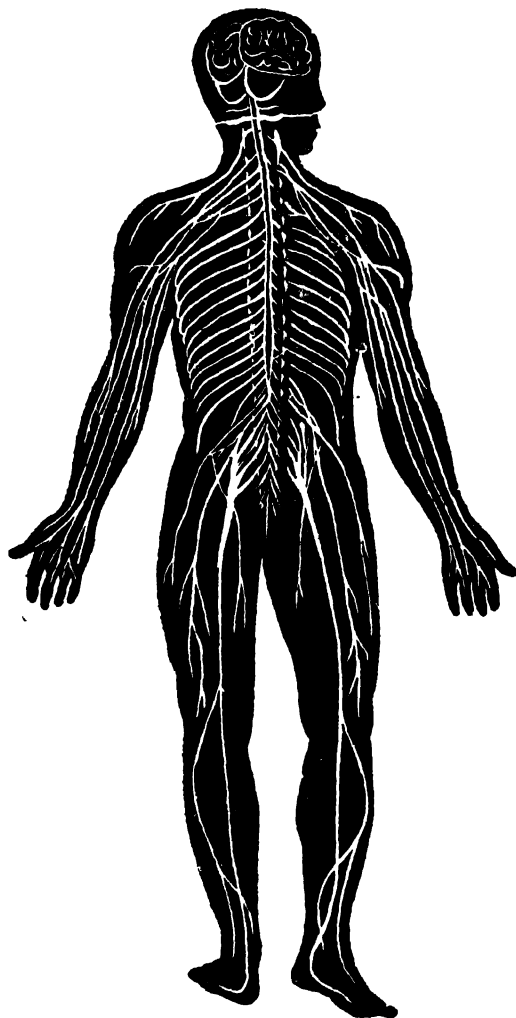
মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

হয়। নিউরন স্নায়ুতন্ত্রের ন্যূনতম বিভাজ্য অংশ। 'নিউরন হল স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম অংশ বা একক (Unit)।' মনোবিদ্ উড্‌ওয়ার্থের ভাষায় 'নিউরন হল আনুষঙ্গিক শাখা সমন্বিত স্নায়ু কোষদেহ' (A neurone is a nerve cell including its

branches)। দুটি নিউরন সংযুক্ত না হলে স্নায়ুতন্ত্র ক্রিয়া করতে পারে না। নিউরনের জটিল সংগঠনকে বুঝে নিতে হলে তার বিভিন্ন অংশগুলিকে বুঝে নিতে হবে। যথা—
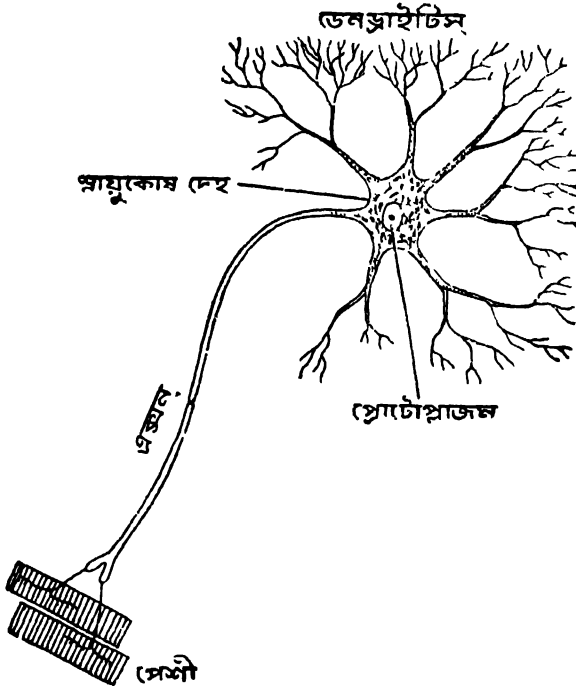
একটা শক্তিবাহী নিউরনকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে খুব বড করে দেখান হচ্ছে

(i) **কোষদেহ** (Cellbody): **এই** কোষদেহের চারটি অংশ আছে, যথা—(১) একটি কঠিন বহিরাবরণ, যাকে বলা হয় **cell wall** বা **কোষ প্রাচীর**; (২) এই আবরণের মধ্যে ডিমের সাদা অংশের বা অ্যালবুমেন-এর মতো একটা তরল পদার্থ আছে, যাকে বলা হয় **প্রোটোপ্লাজম** (Protoplasm) বা **প্রাণ-কোষ**। এই প্রোটোপ্লাজমই প্রাণীর জীবনী-শক্তিকে ধারণ করে থাকে। (৩) কোষদেহের কেন্দ্রস্থলে ঐ তরল পদার্থের মধ্যে রয়েছে একটা ঘন পিণ্ড যাকে বলা হয় স্নায়ুকেন্দ্র (Nucleus)। এই স্নায়ুকেন্দ্রটিই কোষদেহের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে। (৪) ঐ স্নায়ু-কেন্দ্রের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি ভাসমান পদার্থ থাকে, যাদের বলা হয় **অণুস্নায়ু** (Nucleoli)।

কোষদেহের গঠন

(ii) **স্নায়ুশাখা** (Nerve branches) : অধিকাংশ কোষদেহের দুপ্রকারের শাখা আছে। যথা—**অ্যাকসন** (Axon) এবং (২) **ডেনড্রনস** বা **ডেনড্রাইটিস** (Dendrons or Dendrites)।

স্নায়ু-শাখা
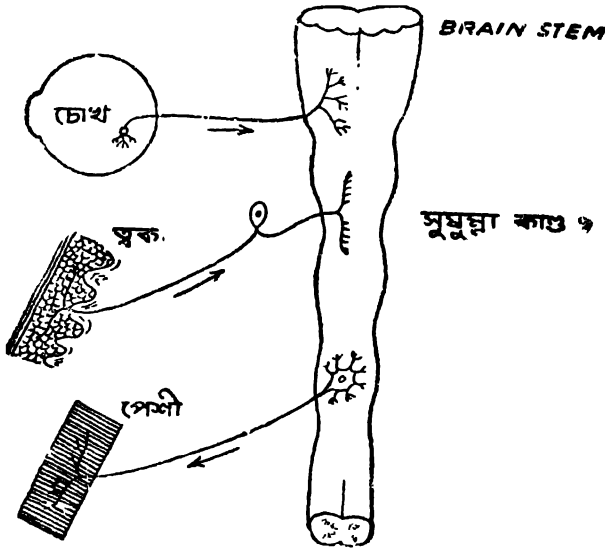
সংবেদনবাহী এবং শক্তিবাহী অ্যাকসন এবং তার স্নায়ুকোষ। তীরগুলি নির্দেশ করছে কোন দিকে অ্যাকসনের গতি

(১) **অ্যাকসন** (Axon) : প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে অ্যাকসন (axon) থাকে কিন্তু কোন কোন নিউরনে ডেনড্রন নাও থাকতে পারে। অ্যাকসন কোন রকম উদ্দীপনা গ্রহণ করে না, এক কোষদেহ থেকে অন্য কোষ দেহে উদ্দীপনা প্রেরণ করে। অ্যাকসন স্নায়ুকোষদেহ থেকে নির্গত একটি শাখা। অ্যাকসন খুব সূক্ষ্ম। এটি সরু এবং কখনও দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। অ্যাকসন সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর দ্বারা গঠিত। একটি স্নায়ু (Nerve) এই জাতীয় কতকগুলি স্নায়ুতন্তুর সমষ্টি। অ্যাকসন আকারে লম্বা। এর কোন শাখা-প্রশাখা নেই। এর শেষ প্রান্তটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এর আকৃতি দেখে একে প্রান্তগুচ্ছ (end brush) বলা হয়। অপর কোন নিউরনের ডেনড্রাইটিসের মধ্যে বা কোন পেশী, গ্রন্থি বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে গিয়ে এই শাখা-প্রশাখা শেষ হতে পারে।

অ্যাকসনের গঠন ও কার্য

(২) **ডেনড্রাইটিস** (Dendrites) : এগুলি কোষদেহ থেকে নির্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বিশেষ। এরা উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং দূরে অবস্থিত কোষদেহে তাকে প্রেরণ

করে। এগুলি দেখতে গাছের শাখার মতো। অ্যাকসনের তুলনায় ডেনড্রাইটিস-গুলির দৈর্ঘ্য কম এবং এরা সংখ্যায় বহু। অ্যাকসন মসৃণ, কিন্তু এগুলি অমসৃণ। ডেনড্রাইটিসগুলি কোষদেহের কাছাকাছি বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে একটি গুচ্ছ রচনা করে।

(iii) **নিউরনের শ্রেণীবিভাগ : (ক) গঠনের দিক থেকে নিউরনকে দুশ্রেণীতে ভাগ করা হয়**, যথা—**একশাখা সমন্বিত** (unipolar) এবং **বহুশাখা সমন্বিত** (multipolar)। একশাখা সমন্বিত নিউরন হল যার একটিমাত্র শাখা আছে। একটি অ্যাকসন কোষদেহ থেকে কিছু দূরে দুটি শাখায় নিজেকে বিভক্ত করেছে। বস্তুতঃ, মনুষ্যদেহে এই নিউরন দ্বিশাখা বিশিষ্ট (bipolar), কারণ কোষদেহ থেকে এককভাবে নির্গত হওয়া সত্ত্বেও কিছু দূরে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। বহুশাখা সমন্বিত নিউরন হল, যে নিউরনের একাধিক শাখা, অর্থাৎ একটি অ্যাকসন এবং একাধিক ডেনড্রন আছে। (খ) **কার্যের দিক থেকে নিউরনগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে**; যথা—(১) **অন্তর্মুখী** (afferent) **নিউরন**, (২) **বহির্মুখী** (efferent) **নিউরন** এবং **সংযোজক নিউরন** (Central or Associative or Correlative neurone)।

একশাখা সমন্বিত ও বহুশাখা সমন্বিত নিউরন

(i) **অন্তর্মুখী নিউরন :** অন্তর্মুখী নিউরনের কোষদেহ কোন-না-কোন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থিত। অন্তর্মুখী নিউরন গ্রহণেন্দ্রিয় (receptor) থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে বহন করে নিয়ে যায়। এই ধরনের নিউরনগুলি সংবেদন কেন্দ্র এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এগুলিকে সংবেদক (sensory) নিউরন নামেও অভিহিত করা হয়। অন্যান্য নিউরনের সঙ্গে এদের পার্থক্য হল যে, এগুলি সাধারণতঃ একশাখা সমন্বিত হয়। (ii) **বহির্মুখী নিউরন :** বহির্মুখী নিউরনের কোষদেহ মস্তিষ্কের বা সুষুম্না-কাণ্ডের কোন কেন্দ্রে অবস্থিত। বহির্মুখী নিউরনগুলি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে উদ্দীপনা মাংসপেশীতে বহন করে নিয়ে আসে। এই ধরনের নিউরনগুলি শক্তিকেন্দ্র (Motor Area) এবং মাংসপেশীর মধ্যে সংযোগসাধন করে। এগুলিকে প্রচেষ্টক বা চালক (motor) নিউরন নামেও অভিহিত করা হয়। (iii) **সংযোজক** বা **অনুষঙ্গ নিউরন :** সংযোজক নিউরনের কাজ অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী নিউরণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা। (iv) **সন্নিকর্ষ** (Synapse) **: একটি নিউরনের শেষ প্রান্তের সঙ্গে অপর একটি নিউরনের প্রথম প্রান্তের মিলন স্থল বা সংযোগ স্থলকে সাইন্যাপস বা সন্নিকর্ষ বলা হয়।** যদিও স্নায়বিক উদ্দীপনা

একটি নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে চালিত হতে পারে তবু গঠনের দিক থেকে দুটি নিউরনের মধ্যে কোন দেহগত সংযোগ নেই। অর্থাৎ একটি নিউরনের অ্যাকসনের প্রান্তভাগের শাখা-প্রশাখার কাছে রয়েছে আর একটি নিউরনের ডেনড্রাইটিস, অথচ এরা কেউ কাকে স্পর্শ করছে না; উভয়ের মাঝে একটু সামান্য ফাঁক আছে। এই ফাঁককেই সন্নিকর্ষ (synapse) বলে। স্নায়বিক উদ্দীপনাকে যখন একটি নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে যেতে হয় তখন মাঝের এই ফাঁকটুকু এক রকম লাফ দিয়েই পার হতে হয়। তবে এই ফাঁক এতই সামান্য যে, স্নায়ুপ্রবাহের একটি থেকে আর একটিতে চালিত হবার পথে কোন

দুটি নিউরনের মিলন স্থলকে সন্নিকর্ষ বলা হয়

সন্নিকর্ষের স্বরূপ
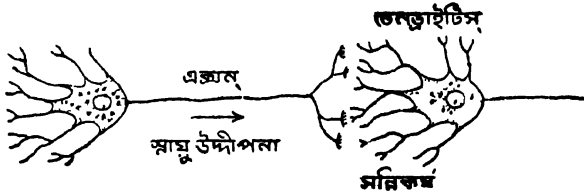
বাধার সঞ্চার হয় না। এই ফাঁক থাকার জন্যই স্নায়ুপ্রবাহ, একটি নিউরন থেকে অন্য নিউরনের ডেনড্রাইটিসের মাধ্যমে অন্য আর একটিতে সঞ্চালিত হতে পারে। এই সন্নিকর্ষের জন্যই একই উদ্দীপক বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়। যদি দুটি নিউরনের মধ্যে এই ফাঁক না থাকত তাহলে স্নায়ুপ্রবাহ প্রয়োজনবোধে ভিন্ন পথে চালিত হতে পারত না। ফলে, মানুষের আচরণ হতো যান্ত্রিক। দুটো গাছ পাশাপাশি থাকলে তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি পরস্পরের সংগে জড়াজড়ি করে থাকে; দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে, শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতার সম্বন্ধ রয়েছে; অথচ এদের সম্বন্ধ নিরবচ্ছিন্নতার সম্বন্ধ নয়; নৈকট্যের সম্পর্ক। একটি নিউরনের সঙ্গে অপর নিউরনের সম্পর্কও হল নৈকট্যের সম্পর্ক। এদের মধ্যে কোন আঙ্গিক সংযোগ নেই।

স্নায়বিক উদ্দীপনা যখন অ্যাকসন থেকে ডেনড্রাইটিসের দিকে যেতে থাকে তখন সন্নিকর্ষ ওর গতিবেগকে বাধা দিয়ে থাকে। তবে এই বাধার পরিমাণ বা মাত্রা অবস্থানুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। তবে এই গতিবেগের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, স্নায়ু-উদ্দীপনা যতবার সন্নিকর্ষকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, ওর বাধা সেই পরিমাণে হ্রাস পেতে থাকে।

(গ) **নিউরনের কার্যকলাপ** (The functions of neurones) : উদ্দীপন (Irritability) এবং পরিবহন (Conduction)—এই দুটি হল নিউরনের বিশেষ কাজ। উদ্দীপনা গ্রহণ ও প্রেরণ করা এবং দেহের একাংশ থেকে অপরাংশে উদ্দীপনাকে পরিবাহিত করার ব্যাপারে নিউরনগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিউরনগুলি স্নায়ুকোষ (Nerve-cell) এবং স্নায়ুতন্তুর (Nerve-fibres) দ্বারা গঠিত। এই স্নায়ুকোষগুলি এবং স্নায়ুতন্তুগুলি একটুতেই উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। বহির্জগতের যে কোন সামান্য উদ্দীপক এগুলিকে উত্তেজিত করে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে। সুতরাং, সামান্য কিছুতেই উদ্দীপিত হবার যে প্রবণতা (irritability) তা হল এগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরিবহন (conduction) ক্ষমতা। নিউরন-গুলি দেহের একাংশ থেকে আরেকাংশে উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। সময় সময় এই নিউরনগুলির কাজ হয়ে ওঠে স্বয়ংক্রিয়। বাইরের কোন রকম উদ্দীপকের সহায়তা ছাডাই এরা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। নিউরনের কোষদেহ সমগ্র নিউরনের পুষ্টিসাধন করে। উদ্দীপনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা সন্নিকর্ষের কাজ। উদ্দীপনা এবং পরিবহণের ফলে নিউরনে অবসাদ দেখা দেয়, তখন কোন উদ্দীপকই নিউরনকে উদ্দীপিত করতে পারে না। এই অবস্থাকে বলা হয় অবসাদ-কাল (Refractory period), সন্নিকর্ষের প্রতিকূলতাই এই অবসাদের কারণ মনে করা হয়।

উদ্দীপন এবং পরিবহণ হল নিউরনের প্রধান কাজ

স্নায়ু প্রবাহের একটি প্রধান নিয়ম, সম্মুখ পরিবহন নীতি (Law of Forward Conduction)। স্নায়ু-প্রবাহের গতি সব সময়ই একদিকে—প্রথম নিউরনের অ্যাকসন থেকে সন্নিকর্ষের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় নিউরনের ডেনড্রাই-টিসের দিকে অর্থাৎ সংবেদনবাহী নিউরন থেকে শক্তিবাহী নিউরনের দিকে ; এর বিপরীত দিকে, অর্থাৎ শক্তিবাহী নিউরন থেকে সংবেদনবাহী নিউরনের দিকে নয়। সন্নিকর্ষ স্নায়ু প্রবাহের এই বিপরীত গতিকে সব সময় বাধা দিয়ে থাকে। একে **সম্মুখ পরিবহননীতি** (Law of Forward Conduction) বলা হয়। সন্নিকর্ষ উদ্দীপনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। কোন গতি সন্নিকর্ষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে, আবার সন্নিকর্ষ কোন উদ্দীপনাকে ভিন্ন পথে চালিত করতে পারে।

সম্মুখ পরিবহন নীতি সন্নিকর্ষের কাজ

৪। স্নায়বিক শক্তির স্বরূপ (Nature of Nerve Impulse) :

স্নায়ুতন্তু উদ্দীপত হলে একটা শক্তি সঞ্চারিত হয় ; এই শক্তিই হল স্নায়বিক শক্তি

(Nerve impulse), যা স্নায়ুপথে পরিবাহিত হয়। বাহ্য উদ্দীপকের দ্বারা অন্তর্মুখী নিউরন উদ্দীপিত হয়। কিন্তু আসলে উদ্দীপক থেকে কোন শক্তি দেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না; 'স্নায়বিক শক্তি' দেহের মধ্যে উৎপাদিত হয়।

স্নায়বিক শক্তির পরিচয়

সব স্নায়বিক শক্তিই (Nerve impulse) একপ্রকারের। সংবেদনবাহী স্নায়ু একই প্রকারের স্নায়বিক শক্তিকে স্নায়ুপথে বহন করে, এদের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই।

স্নায়বিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। স্নায়বিক শক্তি তাড়িত-রাসায়ণিক তরঙ্গের (electro-chemical nerves) সগোত্রীয়। এই তরঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ, খুব কম শক্তিই এতে ব্যয়িত হয়, তাহলেও যে-কোন পেশী বা ইন্দ্রিয়কে এ শক্তি সক্রিয় করে তুলতে পারে।

স্নায়বিক শক্তি তাড়িত রাসায়নিক তরঙ্গের সগোত্রীয়

স্নায়ুগুলি সহজে ক্লান্ত হয় না। যদি ক্লান্ত হয়, সেই ক্লান্তি সহজেই তারা কাটিয়ে উঠতে পারে। স্নায়ু-প্রবাহের অবসাদ বা ক্লান্তি স্নায়ুর জন্য নয়, সন্নিকর্ষের প্রতিকূলতাই তার কারণ।

এই প্রসঙ্গে একটি নিয়মের কথা মনে রাখতে হবে; সেটিকে বলা হয় 'পূর্ণ বা শূন্য' (All-or-None Law) নিয়ম। উদ্দীপনার তীব্রতার একটা সর্বনিম্ন সীমারেখা আছে যেটা অতিক্রম করতে পারলেই একটা উদ্দীপক স্নায়ুতন্তুকে উদ্দীপিত করে স্নায়বিক শক্তি সঞ্চার করতে পারবে। তারপর আর উদ্দীপকের তীব্রতা বাড়িয়ে স্নায়ুতন্তুর প্রতিক্রিয়ার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটান সম্ভব হবে না। উদ্দীপক যদি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সেই বিশেষ মুহূর্তে স্নায়ুতন্তুটির পক্ষে যতটুকু প্রতিক্রিয়া করা সম্ভব, ততটুকু করবে, অর্থাৎ পূর্ণভাবে করবে। উদ্দীপনাকে কমান বা আংশিকভাবে পরিবাহিত করা সম্ভব নয়। বারুদকে পোড়াবার জন্য আগুনের প্রয়োজন। বেশী আগুন লাগালে বেশী বারুদ পুড়বে তা নয়। উদ্দীপকের পরিমাণের পার্থক্যের উপর প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে না; একেই বলা হয় **পূর্ণ** বা **শূন্য নিয়ম**।

'পূর্ণ বা শূন্য' নিয়ম

প্রতিক্রিয়াকারী নিউরনের সংখ্যার উপরই সংবেদনের বা প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা

1. "We call it the nerve current or nerve impulse, and as far as known it consists of electro-chemical waves in the nerve fibre, very weak, consuming very little energy, but capable of arousing a muscle or a nerve centre to action". —Woodworth : Psychology (Twelfth Edition), Page 253

নির্ভর করে। একটি তীব্র উদ্দীপক একসঙ্গে একাধিক নিউরনকে উদ্দীপিত করে এবং এই নিউরনগুলির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তীব্রতা দেখা দেয়। এই বিষয়টিকে **যোগ নিয়ম** (The Law of Summation) বলা হয়।

৫। প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠন ও ক্রিয়া (Structure and function of the different parts of the Central Nervous System) :
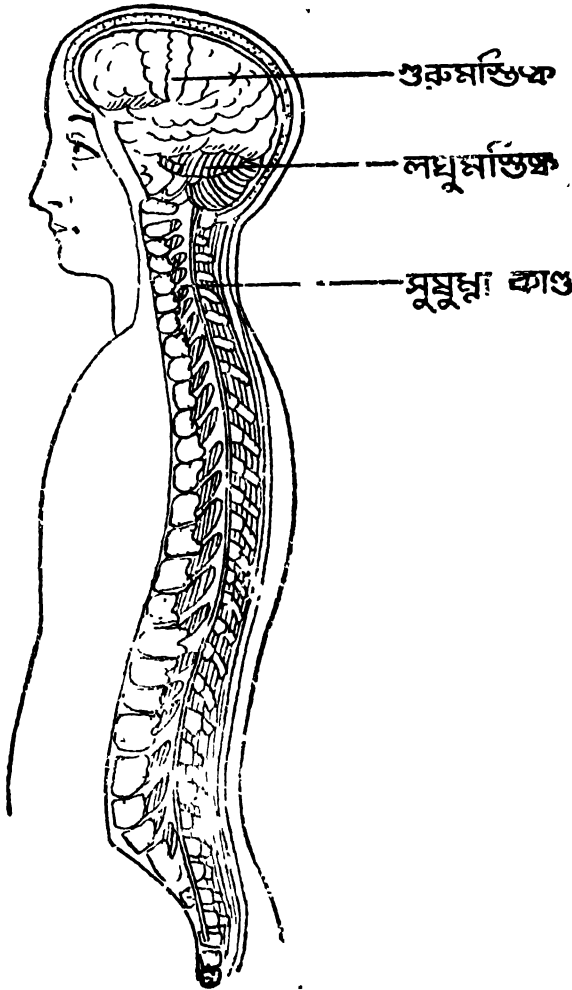
প্রধান স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্ক-মেরবিক চক্রের দুটি অংশ আছে; যথা—(ক) **সুষুম্নাকাণ্ড** (Spinal Cord) এবং (খ) **মস্তিষ্ক** (Brain)।

(ক) **সুষুম্নাকাণ্ড** (Spinal Cord): আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যেই সুষুম্না-কাণ্ডের অবস্থান। আমাদের পিঠের মাঝামাঝি নীচ থেকে উপর পর্যন্ত কতকগুলি খণ্ডাস্থি, মোটের উপর তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশ খানি, পরস্পর সাজানো। অস্থিগহ্বর থেকে আরম্ভ করে উপরের দিকে ক্রমশঃ মোটা হয়ে এই অস্থিমালা অধঃমস্তিষ্কে গিয়ে প্রবেশ করেছে, এটিই হল মানুষের মেরুদণ্ড। এটির আকার দণ্ডের মতো, তাই একে মেরুদণ্ড বলা হয়। যে খণ্ডাস্থি দিয়ে আমাদের মেরুদণ্ডটি গঠিত, সেই খণ্ডাস্থিগুলির ভেতরটা ফাঁপা। তার ফলে মেরুদণ্ডের নীচের প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে অধঃমস্তিষ্ক পর্যন্ত একটি নালীর সৃষ্টি হয়েছে। এই নালী বা ফাঁপা পথ ধরে একটা সাদা রঙের নরম রজ্জুর (cord) মতো পদার্থ মস্তিষ্ক থেকে অস্থিমালার সব চেয়ে নীচের অস্থি পর্যন্ত চলে গেছে। একেই সুষুম্নাকাণ্ড বা মেরুমজ্জা (Spinal Cord) বলে। সুষুম্নাকাণ্ডটি ধূসর এবং সাদা পদার্থ দ্বারা গঠিত। ধূসর পদার্থটি স্নায়ুকোষ (Nerve Cells) দ্বারা গঠিত। সাদা পদার্থটি স্নায়ুতন্তু (Nerve Fibres) দ্বারা গঠিত, এটি ধূসর পদার্থকে আবরকের মতো আবৃত করে রেখেছে। সুষুম্নাকাণ্ডের দুপাশে কিছুটা ব্যবধান রেখে সুষুম্না স্নায়ুগুলি (Spinal Nerves) অবস্থিত। প্রতি পাশে একত্রিশটি স্নায়ু অর্থাৎ মোট একত্রিশ জোড়া বা বাষট্টিটি সুষুম্না স্নায়ু আছে।

সুষুম্নাকাণ্ডের গঠন

সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্ক এবং দেহের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল। অসংখ্য বহির্মুখী স্নায়ু মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়ে এই সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই দেহের পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে; আবার অসংখ্য অন্তর্মুখী স্নায়ু এই সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মস্তিষ্কের বিভিন্ন সংবেদন কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেছে। সুতরাং সুষুম্নাকাণ্ড হল সেই পরিবহণ পথ (Conduction Path), যার মধ্য দিয়ে শক্তি মস্তিষ্ক থেকে দেহের বিভিন্ন অংশ বা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে মস্তিষ্কে বাহিত হয়।

সুষুম্নাকাণ্ড হল পরিবহণ পথ

সুষুম্নাকাণ্ডের পাঁচটি ভাগ—গ্রীবাদেশ (cervical region), বক্ষোদেশ (thorasic region), কটিদেশ (lumbar region), ত্রিকাস্থিদেশ (sacral region), এবং অনুত্রিকাস্থিদেশ (coccygeal region)। গ্রীবাদেশে আট জোড়া, বক্ষোভাগে বার জোড়া, কটিদেশে পাঁচ জোড়া, ত্রিকাস্থিদেশে পাঁচ জোড়া এবং অনুত্রিকাস্থিদেশে এক জোড়া সুষুম্না স্নায়ু আছে।

সুষুম্নাকাণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Reflex action) নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। বহির্জগতের

কোন উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের দেহের উপর ক্রিয়া করলে এবং তার ফলে স্নায়ু উদ্দীপিত হওয়ার জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেহে সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয়; যেমন—গরম পাত্রে হাত লাগা মাত্র হাত সরিয়ে নেওয়া। এখানে আমাদের ইচ্ছা কোন কাজ করার সুযোগ পায় না। সংবেদনবাহী স্নায়ু (Sensory Nerves) এবং শক্তিবাহী স্নায়ুর (Motor Nerves) মধ্যে সংযোগটি মেরুদণ্ডেই সংঘটিত হয়, মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না। সংবেদনবাহী স্নায়ু বাইরের জগৎ থেকে সংবাদ সুষুম্নাকাণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে এবং শক্তিবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ড তার যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়ে শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করে। নীচের চিত্রটি লক্ষ্য করা যাক: একটি জ্বলন্ত কাঠি আচমকা আমার আঙ্গুলে এসে লাগল। লাগা মাত্রই আমি আঙ্গুলটি সরিয়ে নিলাম। কারণ কি? জ্বলন্ত কাঠিতে আঙ্গুল লাগা মাত্রই যে উদ্দীপনা অনুভব করলাম, সেই উদ্দীপনাকে আঙ্গুলটির সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ু (afferent nerves) সুষুম্নাকাণ্ডে বহন করে নিয়ে গেল।

সুষুম্নাকাণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল

সংবেদনবাহী স্নায়ু ও শক্তিবাহী স্নায়ুর সংযোগ মেরুদণ্ডে সংঘটিত হয়

সুষুম্নাকাণ্ড সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র কিছু শক্তি প্রেরণ করল। বহির্মুখী বা শক্তিবাহী স্নায়ু সেই শক্তি যথাস্থানে বহন করে এনে আঙ্গুলের পেশীগুলিকে ক্রিয়াশীল করে তুলল, সঙ্গে সঙ্গে আমি আঙ্গুল সরিয়ে নিলাম। সুষুম্নাকাণ্ড যে সংবাদ পাওয়া মাত্রই পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে তার কারণ সংবেদনবাহী এবং শক্তিবাহী নিউরনগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থিত। প্রতিবর্ত ক্রিয়া ছাড়াও আরও কতকগুলি ক্রিয়া সুষুম্নাকাণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হাঁটা, সাঁতার-কাটা, সাইকেল চালান প্রভৃতি ঐচ্ছিক ক্রিয়া যেগুলি বারংবার অনুশীলনে বা শিক্ষার ফলে অভ্যাসে পরিণত হয়, সেই ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল হল সুষুম্নাকাণ্ড।
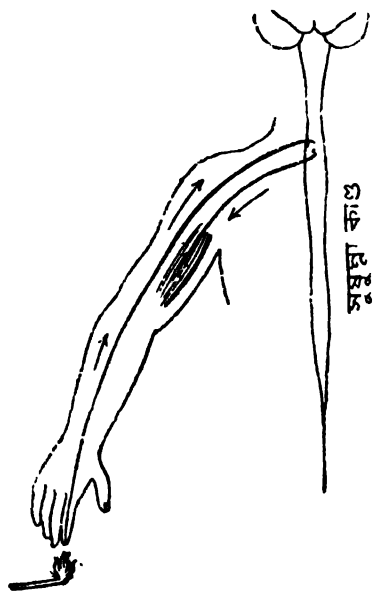
(খ) মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ (Different Parts of the Brain) **: মস্তিষ্কের** পাঁচটি প্রধান অংশ আছে। এই অংশগুলি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে :

(i) **সুষুম্নাশীর্ষক** বা **অধঃমস্তিষ্ক** (Medulla Oblongata)**:** সুষুম্নাকাণ্ড ঘাড়ের কাছে একটু স্ফীত হয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে, এই স্ফীত অংশটুকুকেই **সুষুম্নাশীর্ষক** বলা হয়। এই অংশটি ধূসর এবং সাদা রঙের পদার্থ দ্বারা গঠিত। ধূসর রঙের পদার্থকে সাদা রঙের পদার্থটি আবৃত করে রেখেছে। এ বিষয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এই অংশটি সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্কেব মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এরই মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগ সম্ভব হয়। যে সব স্নায়ু সুষুম্নাকাণ্ড থেকে মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে সেগুলির গমনপথ এই সুষুম্নাশীর্ষক। শ্বাস-ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন, গলাধঃকরণ, বমন, হাঁচি, কাসি, লালা-নিঃসরণ, পরিপাক প্রভৃতি কাজ এই অংশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

সুষুম্নাশীর্ষক বা অধঃমস্তিষ্ক
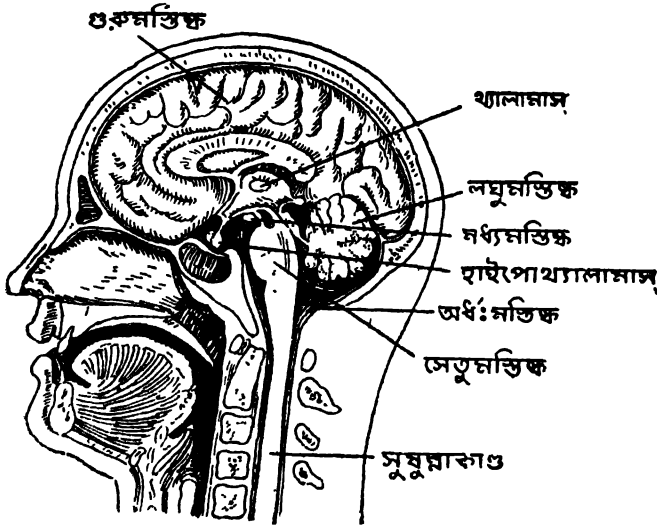
মানুষের মস্তিষ্কের ছবি

(ii) **সেতুমস্তিষ্ক** (Pons-varollii)**:** এই অংশটিকে সেতুমস্তিষ্ক বলার কারণ, এর আকৃতি অনেকটা সেতুর মত। সুষুম্নাশীর্ষকের সামনে এই নলাকৃতি স্ফীতাংশ সেতুর মতো আড়াআড়িভাবে চলে গেছে। লঘুমস্তিষ্কের (Cerebellum) দু'টি অংশকে যুক্ত করাই এর কাজ, সে কারণে একে যোজক নামেও অভিহিত করা হয়। গুরুমস্তিষ্ক থেকে যে সব স্নায়ু নির্গত হয়ে দেহের নিম্নাংশে ছড়িয়ে পড়েছে এই সেতুমস্তিষ্কের মধ্য দিয়েই সেগুলির গমনপথ।

(iii) **লঘুমস্তিষ্ক** (Cerebellum, Hind-Brain or Little Brain) : গুরুমস্তিষ্কের পেছনের দিকের যে অংশ, তাকেই লঘুমস্তিষ্ক বলা হয়। সুষুম্নাশীর্ষকের ঠিক উপরিভাগে এর অবস্থিতি। এর দুটি অংশ আছে। প্রতি অংশের সাদা স্নায়ুতন্তুর (White Nerve Fibres) গুচ্ছগুলি ধূসর রঙের কোষের দ্বারা আবৃত। এর দুটি অংশ সেতুমস্তিষ্কের দ্বারা যুক্ত, দৈহিক সংগতি বিধানই এর প্রধান কাজ। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পেশীসমূহ সঞ্চালিত করার সময় তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা এর কাজ। আমাদের অভ্যাসসিদ্ধ (habitual) কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে লঘুমস্তিষ্ক। হাঁটা, চলা, বসা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজগুলি করার সময় শরীরের যে ভারসাম্য তা লঘুমস্তিষ্কের দ্বারাই রক্ষিত হয়। এই অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে গতি বা চলন শক্তি, লেখা, দেখা, কথা বলার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। আমাদের দেহ সঞ্চালন কাজটি যাতে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয় লঘুমস্তিষ্ক সেদিকে লক্ষ্য রাখে। বস্তুতঃ, লঘুমস্তিষ্কের কল্যাণেই আমাদের চলা ফেরার মধ্যে একটা শ্রী খুঁজে পাওয়া যায়।

(iv) **মধ্যমস্তিষ্ক** (Mid-Brain or Inter Brain or Basal Ganglia) : লঘুমস্তিষ্কের উপরিভাগে এবং সম্মুখ দিকে এর অবস্থান। মধ্যমস্তিষ্ক হল মস্তিষ্কের মূলদেশ (base), এর দুটি প্রধান অংশ আছে, যথা—(১) থ্যালামাস (thalamus) এবং হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus)। থ্যালামাসের কাজ হল বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে আগত স্নায়ু-তরঙ্গকে গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন সংবেদন কেন্দ্রে (Sensory centres) পৌঁছে দেওয়া। হাইপোথ্যালামাসকে 'আবেগের কেন্দ্র' বলে অভিহিত করা হয়, কারণ এটি হল আবেগজাত প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করার কেন্দ্রস্থল। এই অংশ পরিপাক ক্রিয়া ও পেশীর ক্রিযাকেও নিযন্ত্রণ করে।

(v) **গুরুমস্তিষ্ক** (Cerebrum) : মস্তিষ্কের অংশগুলির মধ্যে বৃহত্তম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অংশ হল গুরুমস্তিষ্ক। এই গুরুমস্তিষ্ক দুটি 'সমান অর্ধাংশে' বা গোলার্ধে (Hemisphere) বিভক্ত। দক্ষিণ অর্ধাংশ বা দক্ষিণ গোলার্ধ শরীরের বামদিকের সঙ্গে এবং বাম অর্ধাংশ বা বাম গোলার্ধ শরীরের ডানদিকের সঙ্গে যুক্ত। এই দুটি অংশ একগুচ্ছ শুভ্র স্নায়ুতন্তুর দ্বারা সংযুক্ত, এগুলিকে বলা হয় 'Corpus callosum'. গুরু-মস্তিষ্কটি ধূসর পদার্থ (Grey matter) এবং শ্বেতবর্ণের পদার্থ (White matter) দ্বারা গঠিত। শ্বেতবর্ণের পদার্থটি স্নায়ুতন্তুর (Nerve fibres) দ্বারা গঠিত এবং ধূসর পদার্থটি স্নায়ুকোষ (Nerve-cells) দ্বারা গঠিত। মস্তিষ্কের

গুরুমস্তিষ্কের গঠন

শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সাদা পদার্থ এবং পঞ্চাশ ভাগ ধূসর পদার্থ। সমস্ত গুরুমস্তিষ্কটি একটি ধূসর পদার্থের আবরণের দ্বারা আবৃত, এটিকে বলা হয় **মস্তিষ্ক-আবরণ** (Cerebral Cortex)। এই আবরণের ভিতরে থাকে সাদা রঙের স্নায়বিক পদার্থ। এই মস্তিষ্ক-আবরণ বা কর্টেক্সে অনেক গভীর বলিরেখা বা ফাটল (Fissure) আছে এবং অনেক ভাঁজ (Convolutions) আছে। এই ভাঁজের সংখ্যা যত অধিক হয় মানুষের বুদ্ধির মাত্রাও সেই পরিমাণে বেড়ে যায়। গুরুমস্তিষ্কের প্রধান দুটি ফাটলের নাম রোলাণ্ডো ফিসার (Rolando Fissure) বা কেন্দ্রীয়
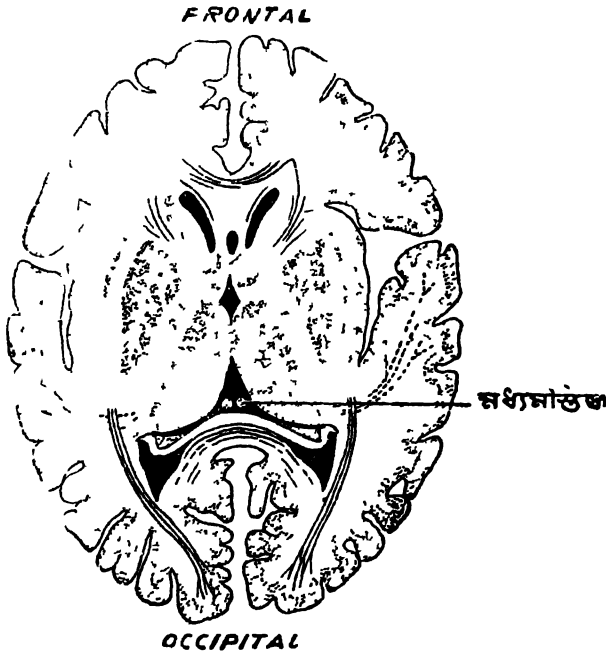
মস্তিষ্কের আড়াআড়ি ভাবে কেটে ছবি

ফিসার এবং সিলভিয়াস ফিসার (Sylvius Fissure)। এই দুটি ফাটল গুরুমস্তিষ্কের প্রধান দুটি অংশকে চারটি ভাগে ভাগ করেছে, যথা, সম্মুখভাগ বা ললাট অঞ্চল (Frontal Lobe), (২) মধ্য ভাগ বা শিরকুম্ভ অঞ্চল (Parietal Lobe), (৩) পশ্চাৎভাগ বা শিরনিম্ন অঞ্চল (Occipital Lobe) এবং (৪) নিম্নভাগ বা রগ অঞ্চল (Temporal Lobe)।

সংবেদন, চিন্তা, কল্পনা, ইচ্ছা, বিচারবুদ্ধির কাজ, আবেগ, সবগুলিরই কেন্দ্রস্থল হল গুরুমস্তিষ্ক। *Stout* বলেন, "সুষুম্নাকাণ্ড, মস্তিষ্কবৃন্ত, লঘুমস্তিষ্ক এবং অন্যান্য

নিউরনগুচ্ছের মধ্যে যেসব ক্রিয়া ঘটছে গুরুমস্তিষ্ক সেগুলিকে আরম্ভ করে, বাধা দেয়, সংযুক্ত করে বা পৃথক করে।"[1] কোন একটি লোক আগুনে হাত রাখার জন্য জ্বালা অনুভব করছে, তবু হাতটি সরিয়ে নিচ্ছে না। তার কারণ সুষুম্নাকাণ্ডে উদ্দীপনা পৌঁছনমাত্র সে হাত সরিয়ে নিত কিন্তু গুরুমস্তিষ্ক সেই প্রক্রিয়াতে বাধা দেওয়াতে সে হাত সরিয়ে নিচ্ছে না। মনোবিদ্ উডওয়ার্থ গুরুমস্তিষ্ককে সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া
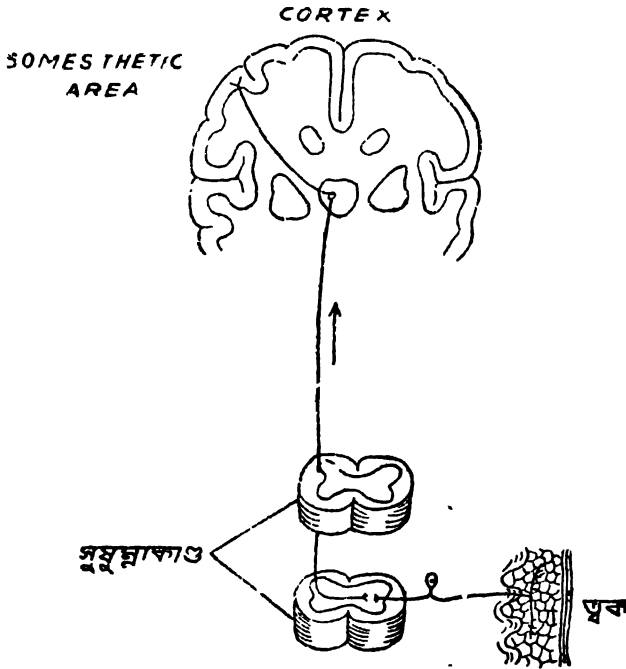
সংবেদন পথ (Sensory Path)
এই পথ ত্বক থেকে সুষুম্নাকাণ্ডে, সুষুম্নাকাণ্ড থেকে মধ্যমস্তিষ্কে এবং সেখান থেকে মস্তিষ্ক আবরণের স্পর্শকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছেছে

গুরুমস্তিষ্ক হল প্রধান সেনাপতির মতো; অধঃস্তন কর্মচারীর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয় পরোক্ষ ভাবে। সে কারণে, ইন্দ্রিয়গুলি থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্দীপনা গ্রহণ করা গুরুমস্তিষ্কের কাজ নয়। অপরের মারফত এ কাজ সাধিত হয়। এই গুরুমস্তিষ্কের তিনটি প্রধান অংশ আছে—(১) **সংবেদন কেন্দ্র** (Sensory Area), (২)

1. "........the Cerebrum initiates, or arrests, combines or separates processes occurring in the spinal cord, the bulb, the cerebellum and other groups of neurones." —*Stout : Manual of Psychology*, Page 68

শক্তি-কেন্দ্র (Motor Area) এবং (৩) **সমন্বয় কেন্দ্র** (Association Area)। দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে অসংখ্য অন্তর্মুখী স্নায়ু গুরুমস্তিষ্কের সংবেদনস্থলে এসে পৌঁছেছে এবং শক্তিকেন্দ্র থেকে অসংখ্য বহির্মুখী স্নায়ু নির্গত হয়ে ইন্দ্রিয়মূল ও দেহের বিভিন্ন মাংসপেশীব সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক—এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় থেকে সংবেদন গুরু-মস্তিষ্কের সংবেদনস্থলে এসে পৌঁছেছে, তার ফলে নানা ধরনের সংবেদন আমরা পাচ্ছি। আমাদের সংকল্প কার্যে পরিণত করতে হলে দেহের পেশীগুলিতে শক্তি বহন করে এনে সেগুলিকে সঞ্চালিত করা প্রয়োজন। গুরুমস্তিষ্কের শক্তি-কেন্দ্র থেকে শক্তি মাংসপেশীগুলিতে এসে সেগুলিকে সক্রিয় করে তুলছে, ফলে দেহগত ক্রিয়ার মাধ্যমে সংকল্প কার্যে পরিণত হচ্ছে। গুরুমস্তিষ্কের সমন্বয় কেন্দ্র (Association Area) মস্তিষ্কের নিম্নাংশ এবং সুষুম্নাকাণ্ডের ক্রিয়াগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।
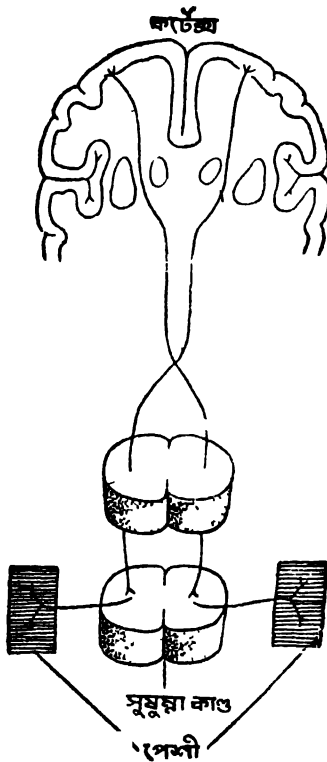
*প্রধান শক্তিবাহী পথ (The Principal Motor Path)

৬। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার আঞ্চলিকতা বা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কেন্দ্র নিরূপণ (Localisation of Functions of the Brain) :

স্নায়ু-তন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গুরুমস্তিষ্ক। সংবেদন, চিন্তা, কল্পনা, স্মৃতি, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার কেন্দ্রগুলি গুরুমস্তিষ্কেই স্থাপিত। একেই মস্তিষ্কের ক্রিয়ার আঞ্চলিকতা বলা হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি এবার আলোচনা করা যাক :

*শক্তিবাহী কেন্দ্র থেকে অ্যাকসনগুলি মস্তিষ্ক বৃন্তের মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের কোন অংশে নেমে এসে শক্তিবাহী নিউরন এবং পেশীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

(ক) **সংবেদন কেন্দ্র** (Sensory Area): সংবেদনকেন্দ্র মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মস্তিষ্কের বাইরের আবরণের (Cortex) কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। মধ্যমস্তিষ্কের কাছাকাছি কতকগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগে এই মধ্যমস্তিষ্ক অবস্থিত। চোখ, কান এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় থেকে স্নায়ু (Nerves) নির্গত হয়ে মধ্যমস্তিষ্কে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে আবার স্নায়ু নির্গত হয়ে মধ্যমস্তিষ্ক থেকে মস্তিষ্ক আবরণের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। এক হিসেবে মধ্যমস্তিষ্ককে মধ্যবর্তী সংযোগস্থল বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়গত সংবেদন সৃষ্টি করার ব্যাপারে মধ্যমস্তিষ্কের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি ইন্দ্রিয় মধ্যমস্তিষ্কের মারফত তার সংবাদ প্রেরণ করে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই মধ্যমস্তিষ্কের কোন একটি অংশের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন সংবেদন-কেন্দ্রগুলি এবার আলোচনা করা যাক:
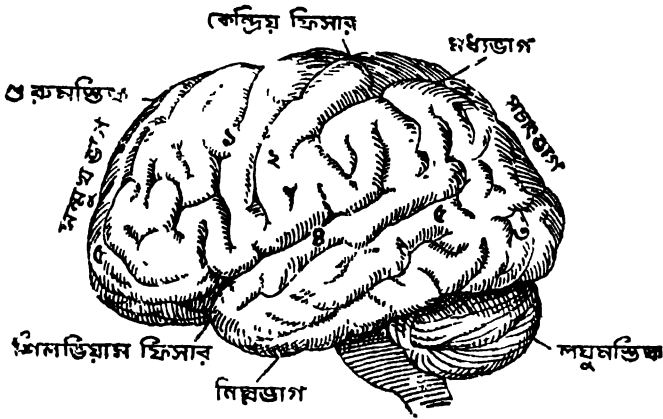
মানুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগ

(১) শক্তিবাহীকেন্দ্র, (২) স্পর্শকেন্দ্র, (৩) দর্শনকেন্দ্র, (৪) শ্রবণকেন্দ্র (৫) সমন্বয়কেন্দ্র

(i) **শ্রবণকেন্দ্র** (Auditory Area). গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগের বা বগ অঞ্চলের (Temporal Lobe) উর্ধ্বাংশে এবং শিলভিয়াস ফিসারের পাশে এই শ্রবণকেন্দ্রের অধিষ্ঠান। মস্তিষ্কের এই অংশই শ্রবণগত উদ্দীপনা গ্রহণের কেন্দ্রস্থল। সংবেদনবাহী স্নায়ু শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে মধ্যমস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মধ্যমস্তিষ্ক থেকে স্নায়ু এই অঞ্চলে এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

(ii) **দর্শনকেন্দ্র** (Visual Area): চোখের অক্ষিপট থেকে স্নায়ু মধ্যমস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশে গিয়ে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে সংবেদনবাহী স্নায়ু

গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাদ্‌ভাগের বা শিরনিম্ন অঞ্চলের (Occipital Lobe) নির্দিষ্ট অংশে গিয়ে পৌঁছেছে। গুরুমস্তিষ্কের এই অংশই দৃষ্টিগত উদ্দীপনা গ্রহণের কেন্দ্রস্থল।

(iii) **ঘ্রাণ এবং স্বাদকেন্দ্র** (Smell and Taste Areas) : গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগে বা রগ অঞ্চলে (Temporal Lobe) এই কেন্দ্রগুলির অধিষ্ঠান।

(iv) **স্পর্শকেন্দ্র** (Somesthetic Area) : রোলাণ্ডো ফিসারের পিছন দিকে অবস্থিত গুরুমস্তিষ্কের মধ্যভাগের বা শিরকুম্ভ অঞ্চলের (Parietal Lobe) নির্দিষ্ট অংশকে স্পর্শকেন্দ্রের অধিষ্ঠান বলে মনে করা হয়। এই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ত্বক বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সম্পর্কীয় সংবেদন পাওয়া যায় না।

(খ) **শক্তিকেন্দ্র** (Motor Area) : রোলাণ্ডো ফিসারের ঠিক সামনে, মস্তিষ্ক-আবরণের (Cortex) এক টুকরো অংশ আছে যাকে বলা হয় 'প্রি-সেণ্টাল জাইয়ার' (*'Pre-cetral gyre'*)। সেইটিই হল শক্তিকেন্দ্র। এখানে বড় বড় কোষ আছে এবং কোষ থেকে ছোট বড় নানা আকারের অ্যাকসন (Axon) মধ্যমস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ডে পৌঁছে গুচ্ছাকারে দেহের বিভিন্ন পেশীর কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই কেন্দ্রের কোন অংশ উদ্দীপিত হলে সেই অংশের সঙ্গে যুক্ত দেহের বিভিন্ন অংশগুলিও উদ্দীপিত হয়। এই কেন্দ্রের একেবারে ঊর্ধ্বভাগ উদ্দীপিত হলে আমাদের পা চলাফেরা করে। তার কিছু নীচের অংশ উদ্দীপিত হলে আমাদের বাহু নাড়াচাড়া করা সম্ভব হয়। এই *'Pre-central gyre'*-এর তলদেশের কাছের অংশটিই মাথা, মুখ, মুখমণ্ডলের নড়াচড়ার সঙ্গে যুক্ত। এই মণ্ডলের কোন অংশ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে দেহের কোন অংশে স্থায়িভাবে, নয়ত সাময়িক ভাবে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মস্তিষ্কের দক্ষিণ অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে শরীরের বাম দিকটি বিকল হয় এবং যদি বাম অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে দক্ষিণ অংশটি বিকল হয়। এই কারণে মস্তিষ্ক-আবরণের (Cortex) এই সরু অংশটিকে শক্তিবাহী কেন্দ্র বলা হয়।

অবশ্য পুরোপুরি শক্তিকেন্দ্রটি (Motor Area) আরও কিছু বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে। শক্তিবাহীকেন্দ্রের সংলগ্ন গুরুমস্তিষ্কের সম্মুখভাগের কিছুটা অংশকে *'Pre-motor Area'* বলা হয়। এই *'Pre-motor Area'*-ও শক্তিকেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। এই অংশের কাজ মস্তিষ্কের বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র ও পেশীর ক্রিয়াগুলির সংযোগ ও সমন্বয়সাধন।

(গ) **সমন্বয়কেন্দ্র** বা **নীরবকেন্দ্র** (Association or Silent Area) : **গুরুমস্তিষ্কের মধ্যভাগ, পশ্চাদ্‌ভাগ ও নিম্নভাগের উপরস্থ আবরণের একটা বড় অংশকে**

সমন্বয়কেন্দ্র বা নীরবকেন্দ্র বলা হয়। এই কেন্দ্র অন্যান্য অংশগুলির সঙ্গে নিউরনের দ্বারা নানাভাবে সংযুক্ত। এটা হল সংযোগসাধন ও সামঞ্জস্য-বিধানের কেন্দ্রস্থল। সুষুম্নাকাণ্ড, সুষুম্নাশীর্ষক এবং লঘুমস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের সমন্বয়সাধন করা এর কাজ। তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের সংবেদন গ্রহণ করা, ব্যাখ্যা করা, অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে এর সমন্বয় সাধন করার কেন্দ্রস্থলও এই সমন্বয় কেন্দ্র। 'সংবেদনকেন্দ্রের' সন্নিহিত এই 'সমন্বয়কেন্দ্রটি' যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সংবেদন সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই সংবেদনের অর্থ বোঝা যায় না। যেমন, 'অ্যাফেসিয়া' (Aphasia) রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অপরের কথা শুনতে পায় কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে না।

গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কর্মের কেন্দ্রস্থল, একেই বলা হয় **গুরুমস্তিষ্কের আঞ্চলিক ক্রিয়াবাদ** (Doctrine of the Localisation of the Brain)। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শারীর বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার আঞ্চলিকতার সমর্থনে কতকগুলি নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রথমতঃ, গুরুমস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশ অপসারিত করলে প্রাণিদেহের কোন বিশেষ অংশের কর্মশক্তি বিনষ্ট হয়, দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রয়োগ করলে দেহের অংশ বিশেষ স্পন্দিত হয়, তৃতীয়তঃ, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে মস্তিষ্কের কোন অংশ কোন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত জানা যায়, এবং চতুর্থতঃ, স্নায়ুগুলির গমনপথ অনুসরণ করে মস্তিষ্কের কোন অংশ কোন্ ধরনের ক্রিয়াকেন্দ্র তা জানা যায়। এই সব নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বিশেষ কার্যের অধিষ্ঠান কেন্দ্র।

মস্তিষ্কের ক্রিয়ার আঞ্চলিকতার সমর্থনে যুক্তি

কিন্তু ফ্রাঞ্জ (*Franz*) বিড়াল ও বানরের উপর, পাভলভ (*Pavlov*) কুকুরের উপর এবং ল্যাশলে (*Lashley*) ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে, গুরু মস্তিষ্কের কোন অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায় বা অপসারিত করা হয় তাহলে দেহের বিভিন্ন ক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু তা সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয় মাত্র। কারণ কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের অন্য একটি কেন্দ্র সেই বিকল কেন্দ্রটির কার্যভার গ্রহণ করেছে এবং দেহের যে শক্তিটি ব্যাহত বা বিনষ্ট হয়েছিল সেটির আবার আবির্ভাব ঘটেছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে একটা সামগ্রিক ঐক্য আছে এবং গুরুমস্তিষ্ক সমগ্রভাবে ক্রিয়া করে। এটিকে বলা হয় **সামগ্রিক ক্রিয়া মতবাদ** (Doctrine of Mass Function)।

মস্তিষ্কের কোন অংশ বিকল হলে অন্য কোন অংশ তার কাজ করে

সিদ্ধান্তে বলা যেতে পারে যে গুরুমস্তিষ্কের এক একটি অঞ্চল এক একটি বিশেষ ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল, এ যেমন অস্বীকার করা চলে না, তেমনি অপরদিকে এই সব বিভিন্ন ক্রিয়ার পশ্চাতে মস্তিষ্কের সামগ্রিক ঐক্যের বিষয়টিকেও উপেক্ষা করা চলে না[1]।

মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা স্বীকৃত হলেও মস্তিষ্কের সামগ্রিক ঐক্যকে অস্বীকার করা যায় না

৭। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System) :

ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে বলেই এই স্নায়ুতন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র বলা হয়। আসলে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র প্রধান স্নায়ুতন্ত্রেরই একটি অংশ কিন্তু এই স্নায়ুতন্ত্র প্রধান স্নায়ুতন্ত্রের (Central Nervous System) উপর নির্ভর না করে অনেকটা স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলি মস্তিষ্ক-বৃন্ত (Brain stem) এবং মেরুদণ্ডের কোষদেহ থেকে নির্গত হয়ে দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পেশী, গ্রন্থি, অন্ত্র প্রভৃতিতে গিয়ে পৌঁছেছে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলির সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের, ফুসফুস ও অন্ত্রের অনৈচ্ছিক পেশীর (involuntary muscles) এবং সনালী গ্রন্থি, বিশেষ করে দুগ্ধক্ষরাগ্রন্থি, লালাগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি এবং কতকগুলি অনালী গ্রন্থির সংযোগ আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন উত্তেজনা, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডে, অন্ত্রে ও গ্রন্থিতে যেসব পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্নায়ুগুলি খুব সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর (Nerve Fibres) দ্বারা গঠিত। খাদ্য পরিপাক-ক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া, রক্ত চলাচল প্রভৃতি এর নিয়ন্ত্রণাধীন।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের দুটি প্রধান বিভাগ আছে ; যথা,—(১) সমবেদী (Sympathetic) এবং পরাসমবেদী (Parasympathetic)। 'সমবেদী' বক্ষোদেশ ও কটিদেশের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু নিয়ে গঠিত এবং 'পরাসমবেদী' গ্রীবাদেশ, ত্রিকাস্থিদেশ (sacral division) এবং অনুত্রিকাস্থিদেশের (coccygeal division) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু দ্বারা গঠিত। এই দুটি বিভাগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সমবেদী (sympathetic) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্নায়ুগুলি হল উত্তেজক (excitatory), কিন্তু অপরদিকে পরাসমবেদী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্নায়ুগুলি

সমবেদী বিভাগ ও পরাসমবেদী বিভাগ

1. ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গল্ (*Gall*) সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে, মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বিশেষ বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্ফীতি লক্ষ্য করে তিনি অনুমান করেছিলেন যে, জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, দয়া, ভালবাসা বা অন্যান্য গুণের জন্য মস্তিষ্কে এক একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্র আছে। মানুষের মস্তিষ্কের গঠন দেখলেই তার চরিত্র অনুমান করে নেওয়া যায় কিন্তু যেহেতু এই মতবাদ কোন পরীক্ষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি, সেহেতু এই মস্তিষ্ক বিজ্ঞান (Phrenology) শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত বলে পরিত্যক্ত হয়।

হল 'বাধক' (inhibitory)। পরাসমবেদী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্নায়ুগুলি যখন ক্রিয়া করে, তখন যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেগুলি হল হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ কমে যাওয়া, চোখের মণি স্ফীত হওয়া, দৈহিক উত্তাপের হ্রাস, পাকস্থলীর হজমের কাজটির জন্য
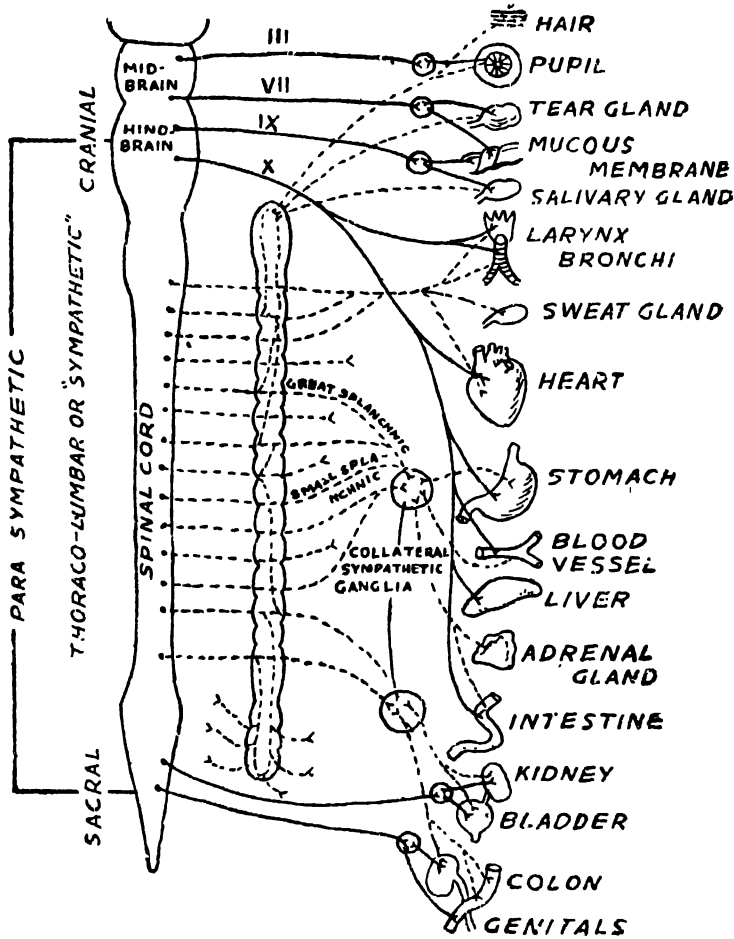
স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কল্পিত রেখাচিত্র

প্রয়োজনীয় রসক্ষরণ, পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য, যৌনগ্রন্থির ক্রিয়াবৃদ্ধি ইত্যাদি। মনে যখন আনন্দের সঞ্চার হয় তখন 'পরাসমবেদী' বিভাগ কাজ করে। 'সমবেদী' বিভাগের কাজ হল এর বিপরীত। এর কাজ হল হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ বৃদ্ধি করা, রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া, পরিপাক ক্রিয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

সমবেদী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্নায়ুগুলির সক্রিয়তার সঙ্গে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির রসক্ষরণের বিশেষ সংযোগ আছে। মনে যখন ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আবেগের সঞ্চার হয় এবং তার ফলে মনে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার হয়, তখন সমবেদী বিভাগ কাজ করে এবং এই সব আবেগের বেলায় যে দৈহিক উত্তেজনা দেখা দেয়, তার কারণ অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির রসক্ষরণের প্রভাব। যদিও দুটি বিভাগের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে তবু ক্ষেত্র বিশেষে 'সমবেদী' বিভাগ অবদমনের বা প্রশমনের কাজও করে থাকে। দেহ-মনের সুস্থতার জন্য এই দুটি বিভাগের ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি বা সুসমন্বয় থাকা একান্তই প্রয়োজন।

৮। প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System):

প্রান্তবর্তী স্নায়ুতন্ত্রের দুটি ভাগ—মস্তিষ্ক স্নায়ু (Cranial Nerves) এবং সুষুম্না-স্নায়ু (Spinal Nerves)। অসংখ্য স্নায়ু (nerves) আমাদের দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই স্নায়ুগুলি খুব সূক্ষ্ম সাদা রঙের সুতোর মতো। একটি স্নায়ু আবার অনেকগুলি সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্তুর (Nerve Fibre) সমষ্টি। কতকগুলি স্নায়ু সোজাসুজি মস্তিষ্ক থেকে নির্গত হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় **মস্তিষ্ক স্নায়ু** (Cranial Nerves)। মস্তিষ্ক-স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে অবস্থিত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়; যেমন—চোখ, কান, নাক, জিভের সঙ্গে সংযুক্ত। সবশুদ্ধ বার জোড়া মস্তিষ্ক-স্নায়ু আছে। কতকগুলি স্নায়ু নির্গত হয়েছে সুষুম্নাকাণ্ড থেকে, এগুলিকে বলা হয় **সুষুম্না স্নায়ু** (Spinal Nerves)। সুষুম্না স্নায়ুগুলি ত্বক, অন্ত্র, পেশী প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বসমেত একত্রিশ জোড়া সুষুম্না-স্নায়ু আছে।

মস্তিষ্ক স্নায়ু ও সুষুম্না-স্নায়ু

এই স্নায়ুগুলিকে কার্যের দিক থেকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যথা—(১) **সংবেদনবাহী, অন্তর্মুখী** বা **অন্তর্বাহী বায়ু** (Sensory or Afferent or In-carrying Nerves) এবং (২) **শক্তিবাহী, বহির্মুখী** বা **বহির্বাহী স্নায়ু** (Motor or Efferent or Out-carrying Nerves)। প্রথমোক্ত স্নায়ুগুলি ইন্দ্রিয় থেকে সংবেদন বা উদ্দীপনা সুষুম্নাকাণ্ডে এবং মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় এবং দ্বিতীয় ধরনের স্নায়ুগুলি সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্কের শক্তিকেন্দ্র (Motor Centres) থেকে স্নায়বিক উদ্দীপনাকে বহন করে নিয়ে আসে। আমি পথ দিয়ে চলেছি, হঠাৎ কেউ আমায় ডাকলো; বুঝলাম আমার এক পরিচিত বন্ধু। আমি বন্ধুটির দিকে অগ্রসর হলাম। যখন বন্ধুটি আমার নাম ধরে ডেকেছিল তখন শব্দতরঙ্গ আমার কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করল এবং সেখানে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করল অন্তর্মুখী স্নায়ুগুলি তা মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে গেল। মস্তিষ্ক নির্দেশ দিল বন্ধুর দিকে অগ্রসর

অন্তর্মুখী স্নায়ু ও বহির্মুখী স্নায়ু

হবাব জন্ম। সেই নির্দেশ-উদ্দীপনা বহির্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মাংসপেশীতে শক্তির সঞ্চার করে পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করায় আমি বন্ধুটির দিকে অগ্রসর হলাম।

৯। অনালী বা **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Ductless or Endocrine Glands) :**

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এমন কতকগুলি গ্রন্থি আছে যেগুলি দেহের গঠন, বুদ্ধির বিকাশ, দেহেব সুস্থতা ও কাযক্ষমতা এবং আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই গ্রন্থিগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে, এগুলি থেকে এক ধরনেব রাসায়নিক তরল পদার্থ ক্ষরিত হয এবং আমাদেব দেহের উপরে এই তবল পদার্থের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থিগুলিকে দু' শ্রেণীতে ভাগ কবা যেতে পারে, যথা, (১) **সনালী গ্রন্থি** (Duct glands) এবং (২) **অনালী গ্রন্থি** (Ductless glands)। সনালী গ্রন্থিগুলিব সঙ্গে নালিকা থাকে এবং এই নালিকা বেয়ে গ্রন্থিরস শরীরের বিভিন্ন অংশে এসে পতিত হয। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ রক্তস্রোতে হয় না, এদের ক্ষরণ হয় দেহের ভিতরে এবং দেহের বাইরে। লালা গ্রন্থি (Salivary gland), স্বেদ গ্রন্থি (Sweat gland), মূত্র গ্রন্থি (Kidney), অশ্রু গ্রন্থি

সনালী গ্রন্থির স্বরূপ
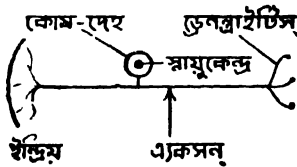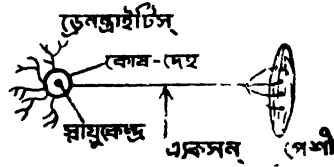
(Tear gland), পাচক গ্রন্থি (Gastric gland), দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থি (Mammary gland), প্রভৃতি হল সনালী গ্রন্থিব উদাহবণ। এই সব গ্রন্থি আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় কার্য সাধন করে। লালাগ্রন্থি খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে, স্বেদ গ্রন্থি ও মূত্র গ্রন্থি শরীরের দূষিত পদার্থকে দেহ থেকে নিষ্কাশিত করে দেহকে সুস্থ রাখে এবং দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থি স্তন্য দিয়ে নবজাত শিশুর জীবন রক্ষা করে।

এ ছাড়া, আর এক ধরনের গ্রন্থি আছে যেগুলির সঙ্গে কোন নালিকা সংযুক্ত নেই, যার মধ্য দিয়ে ওদের ক্ষরিত রস শরীরের বাইরে নিঃসৃত হতে পারে। এইগুলিকে বলা হয় 'অনালী গ্রন্থি' (Ductless glands)। এই সব গ্রন্থি থেকে যে

রস নিঃসৃত হয়, তা শরীরের বাইরে নির্গত হবার কোন পথ না পেয়ে সোজাসুজি রক্তস্রোতে পতিত হয় এবং দ্রুত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই গ্রন্থিগুলি থেকে নিঃসৃত রসকে **হর্মোন** (Hormone)[1] বলা হয়। এই গ্রন্থিগুলি ছোট ছোট রাসায়নিক কারখানার মতো কাজ করে। এরা রক্ত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, সেই উপাদানের সাহায্যে হর্মোন তৈরি করে এবং সেই হর্মোন রক্তস্রোতে ক্ষরণ করে। অনালী গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিও (Endocrine glands) বলা হয় কারণ, এরা এদের ক্ষরিত রস দেহ থেকে বাইরে নির্গত না করে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

অনালী গ্রন্থির স্বরূপ

আমাদের দেহের ক্ষেত্রে এই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থিগুলি দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে সহায়তা করে এবং দেহের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে। এই সমন্বয় সাধনের ক্রিয়া ছাড়াও শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজ এই গ্রন্থিগুলির দ্বারা সাধিত হয়। অনালী গ্রন্থিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থি হল—থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland), অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal gland), পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary gland), প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland), পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal gland) এবং গোনাড বা যৌন গ্রন্থি (Gonad or Sex gland)।

প্রধান অনালী গ্রন্থি

এইবার আমরা প্রধান প্রধান অনালী গ্রন্থিগুলির বিস্তৃত আলোচনা করছি :

(ক) **থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland) :** গলদেশে শ্বাসনালীর (Wind pipe) দু'পাশে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তার নাম **থাইরক্সিন** (Thyroxin)। দেহের সামগ্রিক বিকাশের কাজে এই গ্রন্থিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনীয় রস ক্ষরিত না হলে শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং এক প্রকার রোগ দেখা দেয় যার নাম ক্রেটিনিজম (Cretinism)। এই রোগে শিশু খর্বাকৃতি, ক্ষীণ দেহ, স্ফীতোদর এবং ক্ষীণবুদ্ধি হয়। পরিণত বয়সে যদি এই গ্রন্থির ক্ষরণ কম হয় তাহলে মিক্সেডেমা (Myxedema) নামক রোগের আবির্ভাব ঘটে। এই রোগে রক্তের চাপ কমে যায়, দেহের চামড়া শুষ্ক ও কুঞ্চিত হয়ে যায়, মাথার চুল উঠে যায়, দেহের রাসায়নিক কাজ (Metabolism or Chemical activity) ব্যাহত হয়, মুখ ও হাত স্ফীত

থাইরয়েড গ্রন্থির স্বরূপ ও কার্য

1. 'Hormone' from Greek hormao, excite.

হয়ে ওঠে, চেহারার লাবণ্য কমে যায় এবং কাজে আলস্য ও উদ্যমের অভাব দেখা দেয়। আবার এই গ্রন্থির ক্ষরণ যদি অতিরিক্ত মাত্রায় ঘটে, তাহলে ব্যক্তির রক্তের চাপ বেড়ে যায় ও নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত হয়। ব্যক্তি অত্যন্ত বেশী মাত্রায়
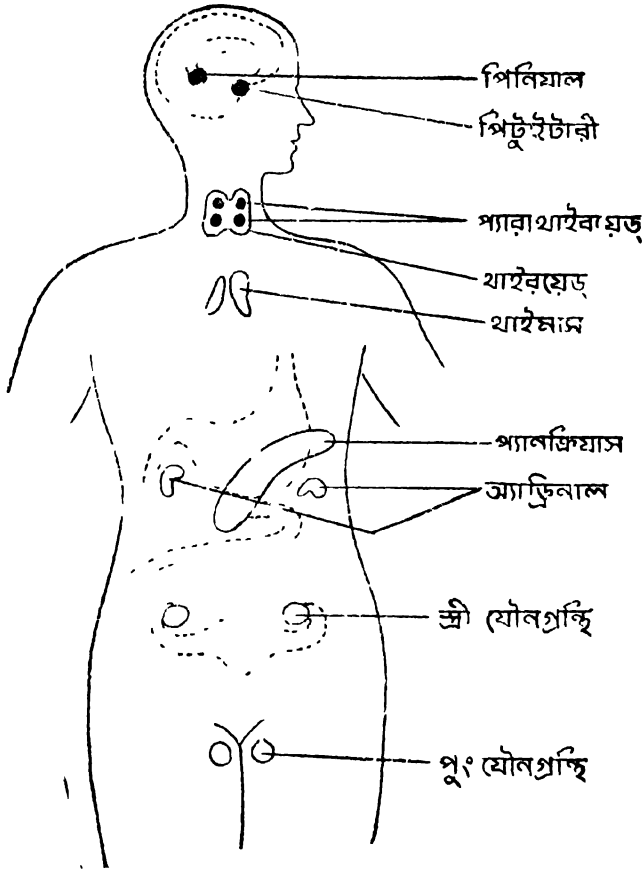
উত্তেজিত, অস্থির, চঞ্চল ও মানসিক উদ্বেগগ্রস্ত হয়; ক্ষুধা বেড়ে যায়, শরীরের ওজন কমে যায় এবং ব্যক্তি স্নায়ুদৌর্বল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে ভোগে। অর্থাৎ থাইরক্সিন রসের আধিক্য ঘটলে গলগণ্ড দেখা দেয়। এই গ্রন্থিটি নষ্ট হয়ে গেলে ব্যক্তি অলসপ্রকৃতি, জড়বুদ্ধি ও বেশীমাত্রায় ভুলোমনা হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর দেহের ও মনের বিকাশ নির্ভর করে; মুখের চেহারায় বুদ্ধি ও লাবণ্যের ছাপ পড়ে, ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও অনুভূতি-

প্রবণ হয়। সুতরাং ব্যক্তির বুদ্ধিগত (intellectual) ও মেজাজগত (temperamental) বৈশিষ্ট্যের উপর এই গ্রন্থির বিশেষ প্রভাব আছে।

(খ) **প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid Gland) :** এই গ্রন্থিগুলি সংখ্যায় চারটি। থাইরয়েড গ্রন্থির প্রত্যেকটির পাশে দুটি করে এদের অবস্থান। প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির কাজ থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের বিপরীত। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে রসের ক্ষরণ হয়, সে রস উত্তেজক কিন্তু প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে রসের ক্ষরণ হয়, তা হল বাধক। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করাই এর কাজ। এই গ্রন্থিটির প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য স্নায়বিক উত্তেজনার তীব্রতা, অনুভূতি প্রবণতা প্রভৃতি দেখা দেয়। এই গ্রন্থিটির সাধারণ ক্ষরণের অভাব হলে অস্থিরতা, অবসাদ, পেশীয় দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এই গ্রন্থিগুলি দেহের ক্যালসিয়াম ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে।

(গ) **অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (Adrenal Gland) :** অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি সংখ্যায় দুটি। প্রতিটি মূত্রাশয়ের (Kidney) উপরে একটি করে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির অবস্থান। প্রতিটি গ্রন্থির দুটি করে অংশ আছে, এর বাইরের অংশটির নাম অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স (Adrenal Cortex), এর ভিতরের অংশের নাম অ্যাড্রিনাল মেডুলা (Adrenal Medulla)। এর দুটি অংশ থেকে দুটি পৃথক রস বা হর্মোন ক্ষরিত হয়—বাইরের অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তার নাম কর্টিন (Cortin) এবং ভিতরের অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তার নাম অ্যাড্রেনিন বা অ্যাড্রেনালিন (Adrenin বা Adrenalin)। কর্টিন আমাদের দেহের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এই রস বা হর্মোন যদি দেহে একেবারেই না থাকে, তাহলে মৃত্যু ঘটতে পারে। এই রসটি স্বাভাবিক উত্তেজকের (ge[illegible]al stimulant) কাজ করে। এই রসটির ক্ষরণ যদি কম হয় তা[illegible] রক্তচাপের হ্রাস, দৈহিক দুর্বলতা, কাজে আগ্রহ এবং [illegible] অভাব, ক্লান্তিবোধ, পরিপাক-সম্পর্কীয় গোলোযোগ, যৌন বিষয়ে আগ্র[illegible] দেখা দেয়। আবার এই রসটির যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষরণ হয় [illegible] ক্ষেত্রে নারীসুলভ ভাব এবং নারীর ক্ষেত্রে পুরুষালী ভাবের সৃষ্টি হ[illegible] গলার স্বর গম্ভীর হয়ে যায়, গণ্ডদেশ স্ফীত হয়।

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির গঠন

কর্টিনের কার্য

অ্যাড্রিনাল মেডুলা থেকে যে রসের ক্ষরণ হয় তাকে ব[illegible] অ্যাড্রি[illegible]। এই গ্রন্থিরস অত্যন্ত উত্তেজক। এই রস যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষ[illegible] হয় তাহলে হৃৎস্পন্দনের গতি বৃদ্ধি পায়, রক্তের চাপ বেড়ে যায়, চক্ষুর তারকা (Pupil)

দুটি স্ফীত হয়, পরিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফুসফুসের মুখ প্রসারিত হওয়ার জন্য রক্তে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সঞ্চারিত হয়। এই রস ক্ষরণের ফলে যকৃৎ থেকে শর্করা নির্গত হয়, ফলে পেশীর ক্লান্তি দূরীভূত হয় এবং অত্যধিক কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। আবেগের (Emotion) সঙ্গে এই গ্রন্থি-রসের নিবিড় সম্পর্ক আছে। অত্যধিক ভয়, ক্রোধ, উদ্বেগ প্রভৃতি আবেগের ক্ষেত্রে রসটি অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষরিত হয়। আবেগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সক্রিয়তা ও শারীরিক শক্তি এই রসই যুগিয়ে দেয়।

অ্যাড্রিনালের কাজ

ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে লড়াই করার জন্য বা আত্মরক্ষা হেতু ভয়ে ভীত হয়ে পলায়নের জন্য উপযুক্ত শক্তি সৃষ্টির কাজে এই গ্রন্থি সহায়তা করে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ব্যক্তিকে বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত করে। সে কারণে ক্যানন (*Canon*) অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিকে জরুরী বা আপৎকালীন গ্রন্থি বলে অভিহিত করেছেন। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়, ব্যক্তি রোগ-সংক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার শক্তি হারিয়ে ফেলে, দেহের রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যাহত হয়, কাজকর্মে আগ্রহের অভাব দেখা যায়, পরিপাক ক্রিয়া ও হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং দেহের চামড়া তাম্রবর্ণ ধারণ করে।

(ঘ) **পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary Gland)** : অনালী গ্রন্থিগুলির মধ্যে পিটুইটারী গ্রন্থির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য গ্রন্থি বিশেষ করে থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল ও যৌন গ্রন্থিগুলিকে কিছুমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এই গ্রন্থিকে 'মুখ্য গ্রন্থি' (master gland) বলা হয়। মাথার মাঝামাঝি জায়গায় মস্তিষ্কের নীচে এই গ্রন্থিটির অবস্থান। এটি আকারে একটি ডিমের এবং পরিমাণে একটি মটর দানার মতো। এর দুটি অংশ আছে—সম্মুখ অংশ (Anterior Lobe) এবং পশ্চাৎ অংশ Posterior Lobe)। এই গ্রন্থির ক্ষরিত রসের নাম পিটুইটিন। সম্মুখ অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তা শরীরের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যদি এই রস প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষরিত হয় তাহলে শরীরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটে। সময় সময় এই বৃদ্ধি এতই অস্বাভাবিকভাবে ঘটে যে, একটি অল্পবয়স্ক কিশোরকেও সাত থেকে নয় ফুট লম্বা একটা দৈত্য বলে মনে হয়। অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য, বিরাট আকৃতির হাত, পা, অনাবশ্যক ভাবে দীর্ঘ দেহ হওয়া প্রভৃতি অস্বাভাবিকতা এই রসের ক্ষরণেরই ফল। আবার এই রস যদি অল্পমাত্রায় ক্ষরিত হয় তাহলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, দেহ খর্ব

পিটুইটারী গ্রন্থির গঠন ও বিভাগ

সম্মুখ অংশের ক্রিয়া

হয়, হাত, পা ও দেহের অন্যান্য অংশ অস্বাভাবিকভাবে ছোট হয়। শরীরের কাজ কমে যায় ও চলনে অস্থিরতা দেখা দেয়।

কি শারীরিক, কি মানসিক উভয় দিক থেকেই পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাৎ অংশ, তার সম্মুখ অংশ থেকে কম প্রয়োজনীয়। পশ্চাৎ অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তা অন্যান্য গ্রন্থিকে উদ্দীপিত কোরে, অন্ত্র, মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে সক্রিয় ক'রে তোলে, দেহের চলন ভঙ্গিমাকে নিয়ন্ত্রিত করে, প্রসব কালে স্ত্রীলোকের জরায়ুর পেশীকে সঙ্কুচিত কোরে সন্তান প্রসব ক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং যৌন ক্রিয়াশক্তিকে প্রভাবিত করে। এই গ্রন্থিই হল একমাত্র গ্রন্থি যার সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। এই গ্রন্থির ক্ষরণ মধ্য মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus) অংশের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

পশ্চাৎ অংশের ক্রিয়া

(ঙ) **পিনিয়াল গ্রন্থি** (Pineal Gland): এটি একটি অন্তঃক্ষরা বা নালিকা-বিহীন গ্রন্থি। মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে এর অবস্থান। এই গ্রন্থিটি শৈশবকালেই সক্রিয় থাকে এবং যৌবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থির ক্ষরণ জননযন্ত্রের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর সম্পর্কে অল্প খবরই জানা গেছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা খুবই গৌণ।

(চ) **যৌন গ্রন্থি** (Gonads or Sex Glands): শৈশবে এই গ্রন্থিগুলি সক্রিয় থাকে না, বয়ঃসন্ধিকালেই এগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। অনালী এবং সনালী দুভাবে যৌন গ্রন্থি কাজ করে থাকে। সনালী গ্রন্থি হিসেবে যৌন গ্রন্থি প্রজনন কোষ (Reproductive cells) উৎপাদন করে। অনালী গ্রন্থি হিসেবে যে রস ক্ষরণ করে তাতে জননেন্দ্রিয়ের বিকাশে এবং যৌন বিকৃতির প্রকাশে সহায়তা করে। পুরুষের যৌনগ্রন্থি বলতে বোঝায় অণ্ডকোষ এবং নারীর যৌনগ্রন্থি বলতে বোঝায় ডিম্বাশয়। উভয় ক্ষেত্রেই এগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। পুরুষের অণ্ডকোষ এবং স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয় থেকে যেমন প্রজনন কোষ নির্গত হয়, তেমনি রসও ক্ষরিত হয়। এই রস যে কেবলমাত্র পুরুষ ও নারীর যৌন বিকাশেই সহায়তা করে, তা নয়, এই রস দেহের গঠনে, বিকাশে ও সুস্থ স্বাভাবিক ক্রিয়াতে সহায়তা করে। পুরুষের গ্রন্থি থেকে যে হর্মোন বা রস ক্ষরিত হয়, তার নাম অ্যানড্রোজেন। এই হর্মোন পুরুষের লক্ষণ ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্ত্রীলোকের গ্রন্থি থেকে যে হর্মোন বা রস ক্ষরিত হয়, তার নাম এস্টোজেন এবং ত স্ত্রীলোকের লক্ষণ ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। পুরুষ-দেহে যদি স্ত্রী হর্মোনে আধিক্য ঘটে, তাহলে পুরুষের মধ্যে মেয়েলীভাব এবং স্ত্রীদেহের মধ্যে পুরু

হর্মোনের আধিক্য ঘটলে স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষালিভাব দেখা যায়। যৌন হর্মোনের পরিমাণ কমে গেলে, পরিণত বয়সে পুরুষের পুরুষসুলভ আচরণ ও স্ত্রীলোকের স্ত্রীসুলভ আচরণ যথার্থভাবে প্রকাশ পায় না।

(ছ) **প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি (Pancreas Gland) :** প্যানিক্রিয়াস যদিও সনালী (duct) গ্রন্থি, তবু এটি অনালী গ্রন্থির মতো কাজ করে। এর থেকে যে প্রয়োজনীয় হর্মোন ক্ষরিত হয়, তার নাম **ইনসুলিন** (Insulin)। রক্তের মধ্যে যে শর্করা আছে, সেই শর্করা যাতে দেহকোষ ব্যবহার করতে পারে এই গ্রন্থিরস তাতে সহায়তা করে। ইনসুলিনের অভাববশতঃ রক্তে শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়, যার ফলে ব্যক্তি বহুমূত্র (diabetis) রোগে আক্রান্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তির প্রস্রাবের সঙ্গে শর্করা নির্গত হতে থাকে। ফলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে, অধিকমাত্রায় ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, কাজে অবসাদ ও আগ্রহের অভাব দেখা দেয় এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ব্যাহত হয়। আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত ইনসুলিনের অবস্থিতির জন্যে রক্তে শর্করার পরিমাণ এমনভাবে হ্রাস পায় যে, প্রধান স্নায়ু তন্ত্রের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়, অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণা, উদ্বেগ, অস্থিরতা, প্রলাপ ও সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। প্যানক্রিয়াস থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তাকে শোধন করে বহুমূত্র রোগের অতি পরিচিত ঔষধ 'ইনসুলিন' তৈরি হয়। মানসিক রোগ নিরাময়ের জন্যও ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়।

প্যানক্রিয়াস গ্রন্থির কায

(জ) **থাইমাস গ্রন্থি** (Thymus Gland) **:** এটি একটি অন্তঃক্ষরা বা নালিকাবিহীন গ্রন্থি। এটির অবস্থান গলার নীচে। থাইমাস গ্রন্থির ক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছুই জানা যায়নি। সম্প্রতি জানা গেছে যে, এই গ্রন্থিটির স্বাভাবিক ক্রিয়া যখন ব্যাহত হয় তখন এটি এমন একটি পদার্থ ক্ষরণ করে, যেটি স্নায়বিক উত্তেজনা, যে স্থানে পেশীকে সক্রিয় করে তোলার কথা, সেইস্থানে বাধার সঞ্চার করে। এই রোগের নাম 'mysathenia gravis' এবং এই রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রে থাইমাস গ্রন্থিটিকে অপসারিত করে রোগীর যন্ত্রণার উপশম করা হয়। এই গ্রন্থির রসক্ষরণের উপর শরীর ও মনের বিকাশ নির্ভর করে।

থাইমাস গ্রন্থির কার্য

(ঝ) **যকৃত (Liver) :** যকৃত থেকেও এক ধরনের রস ক্ষরিত হয়, যা পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

গ্রন্থিগুলির পরস্পর সাপেক্ষতা : পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির ভূমিকা আমাদের দেহের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেহের

গঠন ও বিকাশ, পেশীগুলির সঞ্চালন শক্তি, পরিপাক ক্রিয়া, হৃদপিণ্ডের গতি, রক্তের চাপ, মানসিক শক্তির বিকাশ, কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ, দৈনন্দিন কাজের জন্য শক্তি রক্ষা করা, জরুরী অবস্থায় দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি বৃদ্ধি করে আত্মরক্ষা করা, সহনশক্তি, বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে চলা এবং যৌন বাসনা প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনালী গ্রন্থিগুলির বিশেষ প্রভাব আছে।

দেহের ক্ষেত্রে অন্তঃক্ষরা বা অন্তঃস্রব গ্রন্থির ভূমিকা

আমাদের মানসিক প্রকৃতির উপর অনালী গ্রন্থিগুলির বিশেষ প্রভাব থাকলেও মানসিক প্রকৃতির কোন একটি লক্ষণ দেখে, যেমন অত্যধিক চঞ্চলতা বা অস্থিরতা বা যৌন বাসনার তীব্রতা লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে না যে কোন একটি বিশেষ গ্রন্থি স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না। তাছাড়া ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক অস্বাভাবিকতার বাহ্যপ্রকাশ, সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক উপাদানের উপরেও নির্ভর করে।

এইসব অন্তঃক্ষরা বা অন্তঃস্রব গ্রন্থিগুলি যদিও বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে এবং সময় সময় এদের কার্যের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব দেখা যায়, তবু এদের মধ্যে, একটা সহযোগিতার ভাব আছে। যেমন, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থির কাজে সহায়তা করে, আবার পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাদবর্তী অংশ যৌন ক্রিয়াশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে যৌন গ্রন্থির সঙ্গে সহযোগিতা করে। এইভাবে গ্রন্থিগুলির কাজের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা কাজ করে না, তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া বা একতাবোধ আছে। একেই **অন্তঃক্ষরা** বা **অন্তঃস্রব গ্রন্থির ভারসাম্য** (Balance of Endocrine Glands) বলা হয়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভারসাম্য

১০। প্রতিবর্ত পথ বা প্রতিবর্তক বৃত্তাংশ (Reflex Arc) :

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য স্নায়বিক উদ্দীপনাকে একটি নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ স্নায়ুপথ অতিক্রম করতে হয়। সংবেদনবাহী স্নায়ু, সুষুম্নাকাণ্ডের অংশবিশেষ এবং শক্তিবাহী স্নায়ু এগুলি নিয়েই এই প্রতিবর্ত পথ রচিত। এই পথকে 'প্রতিবর্ত বৃত্তাংশ'ও বলা হয়; কারণ এই পথ আকারে একটি বৃত্তের চাপের (Arc) মতো। প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের পাঁচটি বিভাগ আছে, (১) গ্রাহক স্নায়ুপ্রান্ত—এটি কোন ইন্দ্রিয়ের যেমন—চোখ, কান, নাক, ত্বক, জিভের বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত থাকে। (২) অন্তর্মুখী বা সংবেদীয়স্নায়ু—উদ্দীপকের দ্বারা এর বহিঃপ্রান্ত উত্তেজিত হলে এতে স্নায়ু উদ্দীপনার

প্রতিবর্ত বৃত্তাংশের বিভাগ

সৃষ্টি হয়, যা সুষুম্নাকাণ্ডে পরিচালিত হয়। (৩) সুষুম্নাকাণ্ড—সংবেদীয় স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্ত এতে অবস্থিত, ফলে সংবেদীয় স্নায়বিক উদ্দীপনা এখানে পৌঁছায়। (৪) বহির্মুখী বা শক্তিবাহী স্নায়ু—এর অন্তঃপ্রান্ত সংবেদীয় স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্তে সংলগ্ন থাকে, ফলে সংবেদীয় স্নায়ু-উদ্দীপনা শক্তিবাহী স্নায়ুতে পরিচালিত হয়। (৫) সম্পাদক যন্ত্র—যেমন পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতি। শক্তিবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পেশী বা গ্রন্থিতে সঞ্চালিত হয় যার ফলে পেশীগুলি ক্রিয়াশীল হয় এবং গ্রন্থিগুলির রস ক্ষরণ হয়।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি সেই জাতীয় ক্রিয়া যা আমাদের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বহির্জগতের কোন উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে আমাদের স্নায়ু উদ্দীপিত হওয়ার জন্য যে, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেহে সৃষ্ট হয় তাকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয়, যেমন, জ্বলন্ত কাঠিতে হাত লাগা মাত্র আমরা হাত সরিয়ে নিই, উজ্জ্বল আলোক চোখে পড়তেই চোখ বুজি, চোখের মধ্যে ধুলোবালি পড়ার উপক্রম হলেই, চোখের পাতা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া
অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
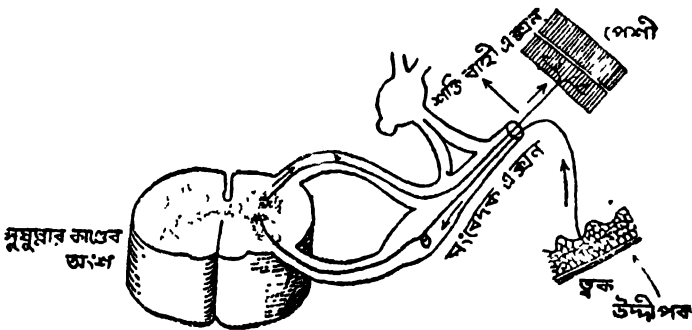
প্রতিবর্ত-বৃত্তাংশ

এখন দেখা যাক, এই জাতীয় কাজ কিভাবে ঘটে। জ্বলন্ত কাঠি হল বাইরের জগতের উদ্দীপক যা আমার ত্বকের সংস্পর্শে এসে ত্বকের সংবেদীয় বা অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করল, ফলে স্নায়বিক উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। একটি সংবেদনবাহী নিউরনের মাধ্যমে সেই স্নায়বিক উদ্দীপনা সুষুম্নাকাণ্ডে অবস্থিত সংবেদীয় স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। সংবেদীয় স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্তের পাশেই রয়েছে শক্তিবাহী স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্ত। ঐ স্নায়বিক উদ্দীপনা এবার শক্তিবাহী স্নায়ুর অন্তঃপ্রান্তকে উত্তেজিত করল। শক্তিবাহী বা ক্রিয়াজ নিউরনের (motor neurone)

মাধ্যমে স্নায়ুপ্রবাহ এসে পৌঁছল শক্তিবাহী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্তে যা পেশীতে বা গ্রন্থিতে (Glands) অবস্থিত, যার ফলে পেশীগুলিতে শক্তি সঞ্চালিত হল ও পেশীগুলি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল এবং আমিও চটপট হাত সরিয়ে নিলুম। একটি সন্নিকর্ষের (Synapse) মাধ্যমেই সংবেদনবাহী নিউরন এবং শক্তিবাহী নিউরন পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া কিভাবে ঘটে

এই সংযোগের কাজটি সংঘটিত হয় সুষুম্নাকাণ্ডের ধূসর পদার্থের পশ্চাদংশে, মস্তিষ্কে নয়। সাধারণতঃ, যে ক্রিয়া বিচার বিবেচনার সাহায্যে সম্পাদিত হয়, সে ক্রিয়ার স্নায়বিক উদ্দীপনা, অন্তর্বাহী স্নায়ু পরিবাহিত হয়ে সুষুম্নাকাণ্ড, লঘুমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক অতিক্রম করে গুরুমস্তিষ্কে পৌঁছয় এবং গুরুমস্তিষ্ক থেকে কোন বহির্বাহী স্নায়ুর মাধ্যমে পেশীতে শক্তি সঞ্চালিত হলে ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়। এ জাতীয় ক্রিয়া সময়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া মানুষের আত্মরক্ষায় সহায়তা করে, সে কারণে প্রতিক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হওয়া দরকার। এইজন্য সুষুম্নাকাণ্ডই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎস। সুষুম্নাকাণ্ডই প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং কাজটি যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়। প্রাণীর অন্যান্য ক্রিয়ার তুলনায় প্রতিবর্ত ক্রিয়া অনেক সরল ও দ্রুত, উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

সুষুম্নাকাণ্ডই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎস

পরীক্ষণের সাহায্যে কুকুরের সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কের সংযোগ ছিন্ন করার পরও দেখা গেছে যে, প্রতিবর্ত ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হচ্ছে এবং সেটি কোন ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে না। সে কারণে সুষুম্নাকাণ্ডকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎস মনে করা হয়

তৃতীয় অধ্যায়

শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর

(Different Stages of Child's Development)

১। ভূমিকা (Introduction) :

যদি প্রশ্ন করা হয়, বিশ্বে কোন্ বস্তুটি সবচেয়ে পুরাতন, তবে তার জবাব হবে 'শিশু'। মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু পরিবর্তন তার প্রতিফলন আমরা পরিণত মানুষের মনের এবং আচরণের উপর লক্ষ্য করি। কিন্তু শিশু এসব প্রভাব থেকে মুক্ত। তার নিজস্ব জগতে সে বাস করে, আপন প্রকৃতিতে সে আত্মভোলা। নিজেকে কেন্দ্র করেই এ পৃথিবীতে চলে তার পদক্ষেপ। খেয়াল ও কল্পনা নিয়ে তার জীবন। এই যে-শিশু তার দেশ ও কাল অনুসারে কোন পার্থক্য নেই। যে কৌতূহল এবং অবাক দৃষ্টি নিয়ে আদিম যুগের শিশু পৃথিবীর এই আকাশ ও আলোককে প্রত্যক্ষ করে উৎফুল্ল হয়েছিল, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুগে মানবশিশুর মনে সেই কৌতূহল, সেই অবাক দৃষ্টি লক্ষ্য করি।

শিশু পৃথিবীতে পুরাতন বস্তু

পুরাতন বলেই শিশুর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে বেশী। তার মন নিয়ে অনুধাবন করার অবসরও আমরা পাইনি, প্রয়োজনও বোধ করিনি। যা কিছু আমরা শিশুর সম্বন্ধে সুপ্রাচীন অতীতে বলে জেনে এসেছি, তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বা গবেষণার ফল নয়, তা ছিল শিশুর সম্বন্ধে আমাদের অন্ধ বিশ্বাস বা মনগড়া অভিজ্ঞতা।

কিন্তু আধুনিককালে বিশেষ করে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আজ আমরা পুরাতন শিশুকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। আজ আমরা জেনেছি শিশু-মন বলে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। শিশুর খেয়াল, আবদার, আবেগ, রাগ, দ্বেষ, কল্পনা ইত্যাদি পরিণত বয়সের মানুষের কাছে যতই অর্থহীন হোক না কেন, শিশুর কাছে এসব মূল্যহীন নয় এবং তার জীবন-বিকাশে এসব প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই শিশু-মনের আচরণ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের অন্তহীন জিজ্ঞাসা এবং তারই ফলস্বরূপ শিশু মনোবিজ্ঞান Child Psychology) বলে মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার আবির্ভাব হয়েছে।

শিশু-মনের আবিষ্কার ও শিশু মনোবিজ্ঞান

২। শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ (Theories of Child-nature) :

শিশু-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। বলা বাহুল্য, মনোবিজ্ঞানসম্মত

পদ্ধতিতে এ বিষয়ে আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীতেই শুরু হয়েছে। সুতরাং অনেক প্রাচীন অভিমতই বিজ্ঞানসম্মত নয়। যুক্তিবিচারে এই সব অভিমত অনেকাংশেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না।

শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রাচীন মত হল শিশুরা পাপী। প্রাচীন কালে পাশ্চাত্ত্য দেশে সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করে বলা হত, আমাদের আদি মাতা হলেন 'ইভ' এবং আদি পিতা আদাম। ইভের প্রবোচনায় আমাদের আদি পিতা আদাম স্বর্গস্থিত জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল পেড়েছিলেন। এ অপরাধে আমাদের আদি জনকজননী পৃথিবীতে নির্বাসিত হলেন। আর তাদের কৃত পাপের পরিণাম অগণিত মানবসন্তান। এ মতবাদের প্রভাব বহু শতাব্দী ধরে চলেছে। তাই শিশুর জীবন পাপ-পরিপূর্ণ, সে অপরাধপ্রবণ।

শিশু প্রকৃতি পাপপূর্ণ

আমাদের দেশে এ ধরনের পাপ সম্পর্কিত মতবাদ নেই। কিন্তু আমাদের দেশেও বিশ্বাস করা হত যে শিশুর জীবনে ষড়রিপুর প্রভাব বেশী। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির সর্বনাশী প্রতিক্রিয়া থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে।

অতএব শিশুকে কঠিন শাসন ও রূঢ় হস্তে দমন করা চাই। কঠিন শৃঙ্খলা আর অনুশাসনে শিশুর জীবন হল নিপীড়িত। শিশু শিক্ষায় শিশুর স্বতন্ত্র সত্তা হল অস্বীকৃত। পাপমোচন আর রিপু দমনই হল শিক্ষার লক্ষ্য।'

শিশু-প্রকৃতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতবাদ হল শিশুরা দেবতুল্য। স্বর্গের সুষমাই তাদের চরিত্রে বিরাজমান। ফরাসী দার্শনিক রুশো (*Rousseau*) এবং ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ (*Wordsworth*) এই মতের প্রধান প্রবক্তা। তাঁদের বিশ্বাস মানুষের স্বাভাবিক প্রভাব, সভ্যতার কৃত্রিম পরিবর্তন শিশুর সরল ও সৎ জীবনকে কলুষিত করে তোলে। রুশো সর্বপ্রকার সামাজিক প্রভাবমুক্ত মানুষের অস্তিত্বকে প্রাকৃতিক মানুষ (natural man) বলে অভিহিত করেছেন। আর শিশুর জীবনেই প্রাকৃতিক মানুষের চরিত্র ধরা পড়ে। কেননা, শিশু সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত। এজন্য রুশো শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাকেই মানবমুক্তির একটি প্রধান শর্ত বলে ঘোষণা করেন।

শিশু-প্রকৃতি দেবতুল

রুশোর এ মতবাদকে ব্যাখ্যা করে পরবর্তী স্তরে শিশু-চরিত্রকে উদ্দাম স্বাধীনতা-প্রিয় বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিশু-প্রকৃতি তার আপন খেয়ালধর্মী—তার নিজস্ব ইচ্ছা, আচরণ ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে।

শিশু-প্রকৃতি সম্বন্ধে তৃতীয় মত হল, শিশু আত্ম-কেন্দ্রিক (ego centric) এবং স্বার্থপর। এ মতবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা হলেন ইংরেজ দার্শনিক হবস

(*Hobbes*)। তাঁর মতে একমাত্র সামাজিক শাসন ও কঠোর শৃঙ্খলা শিশুকে তার আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি দেয়; প্রাকৃতিক শিশুর সংশোধিত ও মার্জিত রূপ হল সামাজিক শিশু।

শিশুরা স্বার্থান্বেষী

শিশুর প্রকৃতি নির্ণয়ে আর একটি মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মতবাদ হল স্ট্যানলি হল (*Stanley Hall*) প্রবর্তিত **পুনরাবর্তন মতবাদ** (Recapitulation Theory)। এ মতবাদ অনুসারে শিশুর প্রকৃতি হল মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। অর্থাৎ শিশুর প্রকৃতিকে বিচার করতে হলে আদিম মানবের সহজ সরল জীবন থেকে শুরু করে বর্তমান আণবিক যুগের জটিল ও সমস্যাসংকুল জীবন পর্যন্ত আলোচনা করা চাই। শিশু-প্রকৃতি মানব-জাতির ক্রমবিকাশের স্তরগুলি বহন করে। স্ট্যানলি হল শিশুর খেলার মধ্যেও মানবের অতীত কাহিনীর পরিচয় পেয়েছেন। পুনরাবর্তন মতবাদের আর একটি অনুগামী মতবাদ হচ্ছে হারবার্ট (*Herbert*) প্রবর্তিত কৃষ্টি যুগতত্ত্ব (Culture-epoch Theory)। ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে মানবজাতি যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে শিশুর জীবনে তারই পুনরাবৃত্তি এবং শিশুর জীবন বিকাশের সহায়ক। বলা বাহুল্য, এ ধরনের মতবাদে শিশু-প্রকৃতির স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি। শিশুর প্রকৃতি অতীতের সাক্ষী বহন করে বটে কিন্তু ছককাটা পথে তার প্রকৃতি সীমায়িত নয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত দুটি মতবাদ শিশু-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। এই দুটির একটি হল **বংশধারাবাদ** (Herditarianism) এবং অন্যটি **পরিবেশবাদ** (Environmentalism)। প্রথম মতবাদ অনুসারে শিশুর জীবনে বংশধারার প্রভাবই বেশী। শিশুর দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী প্রকৃতিপ্রদত্ত এবং শিশুর জীবনে প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্যের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়াই বেশী। আর শিশুর প্রকৃতিকে বিচার করতে গেলে তার বংশধারাকে জানা উচিত।

অন্যদিকে পরিবেশবাদীরা বলেন, শিশুর জীবনে পরিবেশের মূল্য বেশী। মানবশিশুর আচরণ প্রধানতঃ তার পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-প্রকৃতি বিচার করতে হবে, বংশধারার কোন মূল্য নেই শিশু-প্রকৃতিতে।

শিশু-প্রকৃতি বিচারে এই দুই আপাতবিরোধী মতবাদ নানা জোরালো তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে এ দুই মতবাদের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করা হয়। পরিবেশকে বংশধারার পরিপূরক বলে গণ্য করা

হয়। স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*)[1] বলেন "পরিবেশ বংশধারার পরিপূরক, বংশধারার কোন্ লক্ষণ কতটুকু বিকশিত হবে পরিবেশ তা নির্ধারণ করে। বংশধারার মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তার বিকাশ সাধনই শিক্ষার কাজ। আর শিক্ষা পরিবেশেরই একটি অঙ্গ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার কাজ সীমায়িত—শিক্ষার দ্বারা উন্নতি সম্ভব নয়, যদিও শিক্ষা একটি যুগের মানব-জাতিকে প্রভাবিত করতে পারে।"

বংশধারা এবং পরিবেশ

আধুনিক মনোবিজ্ঞান শিশু-প্রকৃতিকে বিশেষ কোন ধর্মীয়, মিষ্টিক (mystic) বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে না। বংশধারা এবং পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমেই শিশু-চরিত্রকে বিশ্লেষণ করা হয়।

৩। শিশুর চাহিদা (Child's needs) :

শিশু-মনোবিজ্ঞানের অক্লান্ত গবেষণার ফলে শিশু-মনের বিচিত্র লীলাখেলা সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য অবগত হয়েছি। শিশু ও তার সমস্যা নিয়ে পৃথিবীতে আসে এবং সে সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করে। তার কতকগুলির পিছনে প্রয়োজনের তাড়না বা চাহিদা আছে। আমরা নিম্নে শিশু-মনের চাহিদা এবং শিশু-মনকে অধ্যয়ন করার পদ্ধতিগুলিও (methods) আলোচনা করছি :

শিশু তার জন্মের পর মুহূর্তেই নানা আচরণের মধ্য দিয়েই তার জীবনসত্তার পরিচয় দিতে শুরু করে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল আচরণের মধ্য দিয়ে শিশু বিকশিত হতে থাকে। ম্যাকডুগাল বলেন : শিশুর আচরণের পেছনে সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) ক্রিয়াশীল। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিকে মানবের সকল আচরণের মূল বলে গ্রহণ করা যায় না। নিম্নতর প্রাণীর ক্ষেত্রে অন্ধ যান্ত্রিক সহজাত প্রবৃত্তি-মূলক আচরণের প্রভাবই আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু মানুষ উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। প্রয়োজনমত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যস্ত আচরণকে পরিহার করে নতুন আচরণকে সে গ্রহণ করতে অথবা তার আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে পারে। আচরণ পরিবর্তনের ক্ষমতাকে বলা হয় নমনীয়তা (plasticity)। একমাত্র মানবই এ ক্ষমতার অধিকারী। নিম্নতর প্রাণীর আচরণকে ছককেটে ব্যাখ্যা করা যায় বা তাদের আচরণেরও একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। শিশুর কতকগুলি আচরণের একটি তালিকা তৈরী করা যায়, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জীবনে দেখা দেয় আচরণের অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য; এবং তার আচরণ সহজ থেকে জটিল এবং জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে।

নমনীয়তা

1. Sandiford : Educational Psychology

নিম্নতর প্রাণীর সকল আচরণের মূলে রয়েছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি বা দৈহিক তাডনা। কিন্তু মানুষ আচরণ করে কেন? এ প্রশ্নের কোন সহজ জবাব নেই। তবে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পাবে যে বিভিন্ন ধরনের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করাব জন্যই মানুষ আচরণ করে। চাহিদা বলতে কি বুঝি? যা আমরা কামনা করি, যা আমাদেব প্রযোজন বা আমাদেব জীবনধারণের জন্য যা একান্ত আবশ্যক তার অভাবই হচ্চে চাহিদা (need)। যেমন ক্ষুধাত হলে আমাদের মধ্যে খাদ্যের চাহিদা দেখা দেয, বিপদেব সময় নিরাপত্তার চাহিদা দেখা দেয। তবে এ সম্বন্ধে একটি সাধাবণ মন্তব্য করা যেতে পাবে: মানব যখন কোন আচবণ করে তখন সে কোন না-কোন অভাববোধ কবে, আব সেই অভাবেব মূলে থাকে চাহিদা বা প্রয়োজন। কিন্তু অভাবের অপসারণ ও লক্ষ্যবস্তুব চিন্তা কবেই মানবমন ক্ষান্ত নয, সে তখন সক্রিয হযে ওঠে এবং একটা চাহিদা অনুভব করে। এই চাহিদা তাব মধ্যে একটা অস্বস্তিকব অনুভূতিব (mental test) সৃষ্টি করে, যার ফলে তাব দেহমনোগত সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চাহিদা চলতে থাকে তাব অস্বস্তিকব অনুভূতিও বাডতে থাকে। এ চাহিদার ফলে তার পরিবেশে পরিবতন সৃষ্টি হয এবং সঙ্গে সঙ্গে তার আচবণও পবিবর্তিত হয। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার চাহিদা বা প্রযোজনের তাডনা মিটে গিযে তাব পূর্বের দেহমনোগত সাম্যাবস্থা ফিরে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাণী নানারকম আচরণ করতে থাকে, তার প্রচেষ্টারও বিরাম দেখা যায় না। যে মুহূর্তে সে তার কাম্য বস্তুটি লাভ কবে, তাব চাহিদা দূর হযে যায, তাব অস্বস্তিকর অনুভূতি বিদূরিত হয়, এবং দেহমনোগত সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয।

এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে, এই চাহিদার কোন শ্রেণীবিভাগ (classification) করা যায় কিনা। নানাভাবে এই চাহিদার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। কেউ কেউ মানুষেব চাহিদাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—প্রাথমিক (Primary) এবং গৌণ (Secondary) মানুষের জৈবিক চাহিদা হলো প্রাথমিক, অন্যান্যগুলি গৌণ। কিন্তু অনেকে এই শ্রেণীবিভাগ স্বীকাব করেন না। কেউ বা মনে করেন মানুষেব সুখের চাহিদাই একমাত্র চাহিদা। কেউ বা মনে করেন মানুষের প্রধান চাহিদা হল আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশ (enhancement of self)। কেও বা আত্মরক্ষার চাহিদাকে দু'ভাগে ভাগ কবে, দৈহিক নিরাপত্তার ও প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার চাহিদা (need for emotional security), এবং আত্মবিকাশের চাহিদাকে, কোন কিছুকে আয়ত্ত করার চাহিদা (need for mastery) এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা হিসাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন। শিশুর

চাহিদার শ্রেণীবিভাগ

মধ্যে দৈহিক নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে, স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন আছে; সামাজিক নিরাপত্তার, আত্ম-স্বীকৃতির, নূতনত্বের (novelty), সক্রিয়তার (activity), স্বাধীনতার প্রয়োজন বা চাহিদা আছে। আসল কথা, শিশুর জন্ম-মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার দেহমনে অফুরন্ত চাহিদা অনুভূত হচ্ছে যার তর্কশাস্ত্রসম্মত কোন পরিসংখ্যান বা তালিকা প্রদান করা যায় না। ব্যাপক এবং সাধারণভাবে শিশুর চাহিদা কেন এবং কি তা আমরা আলোচনা করি মাত্র।

কেন শিশুর মধ্যে চাহিদা জাগে এবং তার কি প্রয়োজন? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, শিশুর প্রয়োজন জীবনে টিকে থাকা (survival)। তার জন্য সে চায় নিরাপত্তা (security), আর বিরক্তিজনক, অসুবিধাজনক পরিস্থিতি সে পরিহার করে চায় পরিতৃপ্তি (satisfaction)। এ জন্য প্রয়োজন নতুন উদ্দীপনার বা অভিজ্ঞতার (stimulation)।

৮ (ক) **শিশুর দৈহিক চাহিদা (Physiological needs):** শিশু জীবনে বাঁচতে চায় এবং এজন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাস-প্রশ্বাস, নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজন তার রয়েছে। শিশু তার জৈবিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হলে তার পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক্ষুধা বা তৃষ্ণার প্রয়োজন উপস্থিত হলে শিশু উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি চায়। তখন সে কান্নায় ফেটে পড়ে। তারপর যখন তার খাবার উপস্থিত হয়, তখন তার কান্না থেমে যায়।

জৈবিক প্রয়োজন

জৈবিক প্রয়োজনের সঙ্গে শিশু মনে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, যৌনসুখ প্রভৃতির প্রয়োজন দেখা যায়। অতি শৈশবেই স্নেহ, ভালবাসা এবং ভয়কে কেন্দ্র করে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি জেগে ওঠে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যাকে আশ্রয় করেই শিশুর প্রথম জীবনে এসব আবেগ আশ্রয় খোঁজে এবং শিশু-মনে নিরাপত্তা বোধের সৃষ্টি হয়। ডক্টর সুটি (*Suttie*) বলেন, শিশুর জীবনের পরবর্তী সামাজিক বিকাশের মূল, শিশু ও তার মায়ের গভীর ভালবাসার মধ্যে নিহিত। শিশুর পরিণত জীবনের ঘৃণা, উদ্বেগ বা ভয়ের কারণ শৈশবের এই আবেগজনিত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির অভাব। অতি শৈশবেই শিশুর যৌন-অনুভূতি হয় কিনা এ নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা বলেন, জন্মের মুহূর্ত থেকেই যৌনচেতনা বা 'লিবাইডো'র (Libido) প্রবাহ চলে। অতি শৈশবেই লিবাইডোর স্থান থাকে মুখে। এই সময় শিশু আঙুল চোষা, কামড়ান প্রভৃতির দ্বারা লিবাইডোর তৃপ্তি পায়। এটাকে বলে

ইন্দ্রিয় তৃপ্তি

মৌখিক রতি (Oral-erotic)। শৈশবের পরবর্তী স্তরে মাকে ভালবাসার মধ্যেই তার লিবাইডো পরিতৃপ্তি খোঁজে।

শিশুর দৈহিক চাহিদার বা প্রয়োজনের সবচেয়ে বড় কথা তার দেহকে রক্ষা করা এবং দৈহিক নিরাপত্তা রক্ষা করা। শৈশবে শিশু অত্যন্ত অসহায়। অন্যান্য ইতর প্রাণী জন্মের পর থেকেই আত্মনির্ভর হতে শেখে এবং মানব শিশুর মতো প্রকৃতির কোলে সে অসহায় নয়। কিন্তু শিশুর সবচেয়ে প্রয়োজন বিপদ থেকে রক্ষা এবং নিরাপত্তা বোধ। এই জৈবিক বা দৈহিক চাহিদাই শিশুকে পরনির্ভর করে তোলে। ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, শিশুর নিরাপত্তার অভাব এবং অবদমিত আকাঙ্ক্ষাই তার পরিণত বয়সে মানসিক বিকার সৃষ্টি করে। এজন্য শিশুর আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ প্রয়োজন এবং স্নেহ-ভালবাসা দ্বারা তার মনে নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি করতে হবে। হাডফিল্ড (*Hadfield*) বলেন, শিশুর জৈবিক প্রয়োজন কেবলমাত্র জৈবিক নয়, মানসিকও। কেননা, শিশুর প্রয়োজন শুধু নিরাপত্তা নয়, সে যে রক্ষিত হচ্ছে তার মধ্যে এ অনুভূতিরও প্রয়োজন।

দৈহিক নিরাপত্তা

২ (খ) **শিশুর পরিবেশগত প্রয়োজন** বা **চাহিদা** (**Environmental needs**): শিশু জন্মেই যে-পরিবেশে আসে তার সঙ্গে তার সঙ্গতি সাধন করতে হয়। ইতর প্রাণীরা অনুকূল পরিবেশেই জন্মে। তাই এদের প্রসঙ্গে পারিবেশিক প্রয়োজনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। পরিবেশকে আমরা মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করতে পারি, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ। অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই সামাজিক প্রয়োজন। কে তার আপন জন কে তার আপন জন নয়, এসব শিশু ভাবতে শেখে। এজন্য সে বিশেষ করে নিজের পরিজনকে ঘিরেই থাকতে চায়। এ সময়ে তার একটা অধিকারবোধও জন্মে। শিশু তখন মা-বাবা ও অন্যান্য পরিজনকে কেন্দ্র করেই সেই অধিকার লাভ করতে চায়। সে যেমন সকলের স্নেহ ভালবাসা পেতে চায়, তেমনি সেও সকলকে ভালবাসতে চায়। তার পরিবারের মধ্যেই এ চাহিদা পরিতৃপ্তি খোঁজে। এজন্য শিশুর জীবনে পরিবারের প্রভাব ও দান অপরিসীম। পরিবার থেকেই শিশু বিদ্যালয়ে বা বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করে। অপরের সাহচর্য ও সম্পর্ক এবং যৌথ জীবন যাপনের প্রয়োজন জীবনের শুরুতে নানাভাবে দেখা দেয়। সুষ্ঠুভাবে তখন শিশুকে পরিচালনা না করলে শিশুর পক্ষে সামাজিক চাহিদা ও তার নিজস্ব চাহিদার সার্থক সমন্বয় সাধন অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য এই সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। পরিণত জীবনে শিশু যাতে সমাজধর্মী হয়ে তার

সামাজিক প্রয়োজন

ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন করে, সে যাতে অসামাজিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে না ওঠে, এ হল শিশুর শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক পরিবেশেও শিশুর নিরাপত্তার প্রয়োজন জড়িত। যা ভয়ংকর বা বিরক্তিকর, যা শিশুর মনে ভয়ের উদ্রেক করে শিশু সর্বদা তা পরিহার করে। কিন্তু সে নতুন উদ্দীপকের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। এ সময়ে তার প্রধান আবেগ হল ঔৎসুক্য। প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে শিশু-মনে কৌতুহলের সীমা নেই। হাডফিল্ড বলেন, "শিশুই বৈজ্ঞানিক, প্রকৃতির সব কিছুকেই সে বুঝতে চায়। তার ইন্দ্রিয়বোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে, নতুনকে জানার ও আবিষ্কার করার প্রয়োজন সে অনুভব করে।"

প্রাকৃতিক প্রয়োজন

শিশুর এ চাহিদা বা প্রয়োজনের গুরুত্ব অসীম। শিশুর জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি না হলে, তার আবেগ অবদমিত হয়। বৈচিত্র্যের মধ্যে, নতুন উদ্দীপনের মধ্যে শিশুর প্রশ্নব্যাকুল যে-মন আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে, সে-মনের তখন অপমৃত্যু হয়। এজন্য আধুনিক শিশু-শিক্ষায় প্রকৃতিবীক্ষণ (Nature study) এবং ইন্দ্রিয়ানুশীলনের (Training of Senses) প্রচুর ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে শিশুর প্রাকৃতিক পরিবেশগত প্রয়োজন পরিতৃপ্তি লাভ করে।

(গ) **শিশুর মানসিক প্রয়োজন** বা **চাহিদা** **(Mental needs):** তিন চার বছর বয়সেই শিশুর মধ্যে অহংভাবের (Ego-Consciousness) সৃষ্টি হয়। এ সময়ে শিশু তার নিজের উপর খুব গুরুত্ব প্রদান করে। সব কিছু যেন তার নিজের। নিজেকে প্রকাশ করতে, নিজের কথা শোনাতে সে সদা ব্যস্ত। তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের (Self-Exhibition) এক প্রচণ্ড তাগিদ উপস্থিত হয়। তার আত্মসম্মানবোধ তখন খুব প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। সে তখন খুব জেদী। শিশুর এ আত্মসম্মান এবং অহংবোধকে কেন্দ্র করেই তার ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য গুণাবলী এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জেগে ওঠে। এজন্য শিশুকে তার আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। তা না হলে সে নিজেকে অবহেলিত মনে করবে, ভবিষ্যতে সে আত্মপ্রকাশ লাভ করতে পারবে না। সে দুর্বল এবং অসমঞ্জস (Mal-adjusted) ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে পড়বে।

মানসিক চাহিদা

সুতরাং শিশু-শিক্ষায় শিশুর স্বাধীন ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রয়োজন। খেলাভিত্তিক শিক্ষায় (Playway-in-education) খেলার উপর প্রচুর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কারণ, খেলার মধ্যে শিশুর আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এযাবৎ আমরা শিশুর চাহিদা বা প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছি এবং শিশু জীবনের পরবর্তী বিকাশধারায় এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করেছি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে দুটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

চাহিদার শ্রেণীবিভাগ

প্রথমতঃ, চাহিদার শ্রেণীবিভাগ তর্কশাস্ত্রসম্মত নয়। অর্থাৎ জৈবিক চাহিদার সঙ্গে পারিবেশিক বা মানসিক চাহিদা জড়িয়ে আছে বা মানসিক চাহিদার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জৈবিক প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, এ শ্রেণীবিভাগ সর্ববাদীসম্মত নয়। কেউ কেউ চাহিদাকে শুধু জৈবিক বা দৈহিক (Physiological or Physical) এবং মানসিক (Mental)—এই দু শ্রেণীতে ভাগ করেন। আবার কেউ কেউ চাহিদাকে সহজাত (innate) বা শিক্ষা-নিরপেক্ষ (unlearned) এবং শিক্ষালব্ধ (learned)—এই দু ভাগে ভাগ করেন। আর একদল চাহিদাকে ব্যক্তিগত (individual) এবং সামাজিক (social)—এই দু শ্রেণীতে ভাগ করেন। আসল কথা, শিশুর চাহিদার তাগিদকে তর্কশাস্ত্রসম্মতভাবে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ তার অজস্র উৎস এবং বিচিত্র প্রকাশপথ। আমরা কেবল আলোচনার সুবিধার্থে এই শ্রেণীবিভাগ করেছি।

৪। শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা (Childs need's and Education) ঃ

শিশুর অসংখ্য চাহিদার কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। শিশুর জীবনে তার চাহিদাগুলির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর এই সব চাহিদা শিশুর মধ্যে নানারকম আচরণ সৃষ্টি করে, যার মাধ্যমে শিশু তার অভাব-

আচরণ বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত

বোধকে দূর করতে সচেষ্ট হয়। এই সব আচরণ যে সব সময়েই বাঞ্ছিত হয়, তা নয়, অনেক সময় অনেক অবাঞ্ছিত আচরণ সৃষ্টি করে, যার সঠিক কারণ অনেক সময় শিশুর অভিভাবকবৃন্দ নিরূপণ করতে পারে না। সুস্থ স্বাভাবিক পথে শিশু তার চাহিদা মেটাতে না পারলে অসুস্থ অস্বাভাবিক পথে সেগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে সচেষ্ট হয়। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানের অসামর্থকে অপসঙ্গতি বলা হয় এবং এই জাতীয় শিশুদের অসমঞ্জস (maladjusted) শিশু বলা হয়। যেমন, কোন শিশু তার

আত্মস্বীকৃতি আদায়ের জন্য অবাঞ্ছিত আচরণ

সহপাঠীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আত্মস্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হযে কোন অবাঞ্ছনীয় কার্যের মাধ্যমে, যেমন—চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, সহপাঠীকে পীড়ন করা, প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মস্বীকৃতি লাভের জন্য সচেষ্ট হতে পারে। স্বাভাবিক পথে যে স্বীকৃতি মেলেনি অস্বাভাবিক পথে সে সেটি লাভ করতে চায়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই শিশুর বিকল্প আচরণটি

অবাঞ্ছনীয় হয় না। যে শিশু লেখাপড়ায় উৎকর্ষ দেখাতে ব্যর্থ হয়ে খেলাধূলার দক্ষতার মধ্য দিয়ে তার সম্পূরণ করে আত্মস্বীকৃতি আদায় করতে চায়, তার আচরণকে অবশ্যই অবাঞ্ছনীয় বলে অভিহিত করা চলে না।

চাহিদার পরিতৃপ্তির গুরুত্ব

শিশুর জীবনে তার প্রয়োজন বা চাহিদার পরিতৃপ্তির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই সব চাহিদার পরিতৃপ্তির মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে থাকে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদার গুরুত্ব

শিক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদা এবং তার পরিতৃপ্তির বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ। শিশুর চাহিদাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারলে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সহজতর হবে। চাহিদা আচরণ সৃষ্টি করে, এই আচরণকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হবে, শিক্ষার পথ সুগম হবে। এই কারণে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর চাহিদার পরিতৃপ্তির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুর স্বাভাবিক চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার কার্য পরিচালিত হলে, শিশুর শিক্ষা সার্থক হয়। তাই শিশুর চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা, তার চাহিদা অনুসারে শিক্ষা পদ্ধতি নিরূপণ করে তার চাহিদা অনুযায়ী সেই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা প্রভৃতি বিষয়ের দিকে শিক্ষকের মনোযোগ আজ বিশেষভাবে ধাবিত। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ এই সত্যকে উপলব্ধি করা গেছে যে, শিশুর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

শিক্ষক, পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দের কর্তব্য

শিশুর প্রয়োজন বা চাহিদাগুলি যাতে স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত হয়, সে ব্যাপারে শিক্ষক, পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। **প্রথমতঃ,** শিক্ষক, পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দের কর্তব্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা যাতে শিশুর প্রয়োজন বা চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তিতে অনাবশ্যক বাধার সৃষ্টি না হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** যদি প্রয়োজনগুলির পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সম্ভব না হয়, তাহলে যাতে শিশু বাঞ্ছিত বিকল্প আচরণে প্রবৃত্ত হয় সেদিকে মনোযোগী হতে হবে। গৃহের পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শিশু অবাঞ্ছিত আচরণে লিপ্ত না হয়। **তৃতীয়তঃ,** বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমন হওয়া দরকার যাতে শিশু তার প্রয়োজনগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত করার সুযোগ পায়। যেমন, শিশু তার সামাজিক নিরপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, নূতনত্বের চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদাকে

পরিতৃপ্ত করতে চায়। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে এমনভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে যাতে শিশু তার এইসব চাহিদাকে স্বাভাবিক পথে পরিতৃপ্ত করতে পারে। কোন চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে যদি অমার্জনীয় আচরণ দেখা যায়, তাহলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শিশুকে সেই আচরণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করে স্বাভাবিক আচরণে প্রবৃত্ত হবার জন্য তাকে উৎসাহিত করতে হবে। যেমন বিদ্যালয়ে যে শিশু লেখাপড়ায় তার দক্ষতা দেখিয়ে স্বীকৃতি লাভে অসমর্থ, সে যাতে খেলাধুলা, অভিনয়, অঙ্কন ও অন্যান্য সংগঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে আত্মস্বীকৃতি আদায় করতে পারে, তার দিকে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য থাকা দরকার। শিশু যাতে বিভিন্ন ধরনের সৃজনমূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, সেদিকে শিক্ষক, পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। **চতুর্থতঃ**, শিশুর অবাঞ্ছিত আচরণের মূলে যে তার প্রয়োজন বা চাহিদার অপরিতৃপ্তি—এই বিষয়টি স্মরণে রেখে শিশুর সমস্যামূলক আচরণের যথার্থ কারণ নিরূপণে সচেষ্ট হতে হবে এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় শিশুর অবাঞ্ছিত আচরণের যথার্থ কারণটি নিরূপণ করতে না পেরে পিতামাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকবৃন্দ শিশুকে অযথা পীড়ন করেন, শাস্তি দেন, যেগুলি শিশুর ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। **পঞ্চমতঃ**, শিশুর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠের বিষয়-বস্তু নির্বাচন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন। **ষষ্ঠতঃ**, শিশুর চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার পরিবর্তনের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। শিশুর চাহিদা পরিবর্তনশীল। কোন বিশেষ চাহিদা পরিতৃপ্ত হলে নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। কাজেই শিক্ষাকে এই চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলতে হবে। **সপ্তমতঃ**, শিক্ষককে যেমন শিশুর চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে, তেমনই নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি করতে হবে। **অষ্টমতঃ**, শিশুর প্রক্ষোভমূলক চাহিদা, ভালবাসা, স্নেহ প্রভৃতি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা এগুলিও যাতে শিক্ষায়তনের পরিবেশে সম্যক্ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে শিক্ষার্থীকে সেদিকেও নজর দিতে হবে। শিক্ষকের স্নেহ ভালবাসা লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি না হলে শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

নিজের দক্ষতা দেখিয়ে

শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে

৫। শিশুর পরিপক্কতা এবং শিখন (Maturation and Learning) :

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ-মনে নানা প্রয়োজনের তাড়না এসে

উপস্থিত হয়। আর এসব প্রয়োজনের সার্থক ও সুসংহত পরিতৃপ্তির মাধ্যমে শিক্ষার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে, শিশু পরিপক্কতা (maturation) লাভ করে।

পরিপক্কতার অর্থ

পরিপক্কতা শব্দের অর্থ হল পরিণতি লাভ। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে যে কোন পরিণতি লাভ করাকেই পরিপক্কতা বুঝায় না। পরিপক্কতা বলতে আমরা শিশুর দৈহিক বিকাশ বা দৈহিক বিকাশের প্রক্রিয়া বুঝি। মানব শিশু হঠাৎ প্রাপ্তবয়স্বতে পরিণত হয় না। ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে তার পরিণমনের ক্রিয়াকলাপ। এ কথা সত্য যে, তার দৈহিক বিকাশে নতুন কিছুই সৃষ্টি হয় না। সকল শক্তি, সকল সম্ভাবনাই সহজাত। কিন্তু এগুলি ধীরে ধীরে শিশুর জীবনে প্রকাশিত হয়। শিশুর হাত, পা, মাথার দৈর্ঘ্য ও ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তার স্নায়ুতন্ত্র বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিশু বসতে, উঠতে, চলতে শেখে। চার বছরের পর শিশুর পেশীগুলি পুষ্টিলাভ করে এবং শিশু অনেক দৈহিক নৈপুণ্য (Skill) লাভ করে। এভাবে শিশুর জীবনে চলে শরীরের যন্ত্রগুলির বৃদ্ধি। কিন্তু মেয়েরা এ সময় ছেলেদের চাইতে বেশী বর্ধিত হয়। কিন্তু পরে দেখা যায়, মেয়েরা ছেলেদের চাইতে কম বৃদ্ধি পাচ্ছে। যৌবন আগমনের কিছু পূর্বে শরীরের বৃদ্ধির হার খুব বেড়ে যায়। শরীরের ওজনও বাড়ে কিন্তু শরীরের দৈর্ঘ্যের তুলনায় কম। যৌবন আগমনের পরে দৈহিক বৃদ্ধির হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে এবং শেষে থেমে যায়। যৌবনই পরিপক্কতার পূর্ণ স্তর। এ সময়ে দেহে নানা পরিবর্তন ঘটে। আর এসব দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যেই সংঘটিত হয় শিশুর পরিপক্কতা।

মনোবিজ্ঞানে আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম যে-কোন অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষা বলা হয়। অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানই শিক্ষা। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা আমাদের যে পরিবর্তন আনি, তা শিক্ষণলব্ধ কার্য (learned activity)।[1] জন্মের পর থেকেই শিশুকে কোন-না-কোন ভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন

শিক্ষা

করতে হচ্ছে। পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল এবং শিশুকে নতুন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার আচরণকে পরিবর্জন বা পরিবর্তন করতে হয়। তাই শিখনের দ্বারা আমরা নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা আয়ত্ত করি, ফলে, আমাদের আচরণ দ্রুত সম্পাদিত হয় এবং উন্নততর হয়।

পরিণমন এবং শিখনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিশুর জীবনে পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রয়োজনের তাড়না উপস্থিত হয়। পরিবেশ এবং শিশুর প্রয়োজনের

1. "Learning is profiting by past experience."
"Learning is a change in performance,"

মধ্যে চলে প্রতিক্রিয়াশীল লীলাখেলা। ব্যাপক অর্থে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান, সকল নৈপুণ্য, সকল অভ্যাস, মানুষ ও বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি (acquaintance) সব শিখনলব্ধ। অতএব শিশুর জীবনে প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তার দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রয়োজনের তাগিদ উপস্থিত হচ্ছে, সেই অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাগিদের ফলে সে তাব আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে যাচ্ছে। উহাই শিখন। শিখন ও পবিপক্কতাব সঙ্গে সম্পর্ক তাই গভীব।

মানুষ এব' ইতর প্রাণীর উপব পরীক্ষণ কবে দেখা গেছে এদের শিখন-ক্ষমতা অনেকটা পবিণমনেব উপর নিভব করে। অসংঘটিত বা অপুষ্ট দেহে যেমন সুষ্ঠু মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি শিখনের-কাজেও এরূপ অপরিপক্ব দেহসম্পন্ন ব্যক্তি অপটু। পরীক্ষণ দ্বারা আরও প্রমাণিত হয়েছে, শিশুর গুরুমস্তিষ্কের (Ccrebrum) পরিপক্বতাব উপর তার বুদ্ধি ও শিখন ক্ষমতা নির্ভর করে।

কিন্তু পরিপক্বতা ও শিক্ষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্বেও এদের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমতঃ, শিশু তার স্বাভাবিক এবং জীবনধর্মী পবিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিপক্বতা লাভ করবে। এর মূলে শিশুর নিজস্ব কোন আয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। প্রাকৃতিক নিয়মেই শিশু কৈশোরে, যৌবনে উপনীত হবে। এই বিষয়টি শিশুর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করবে না। প্রাকৃতিক নিয়ম এখানে যান্ত্রিকভাবে শিশুকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সুতরাং পরিবেশের প্রভাব পরিপক্বতার উপর খুব বেশী নয়। শিখন ছাড়াও পরিপক্বতা প্রক্রিয়া চলিতে পারে। কিন্তু শিক্ষনের ক্ষেত্রে পরিবেশের মূল্য খুব বেশী। পরিবেশের উপব প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আচরণে পরিবর্তন আসে। তা ছাড়া, শিখনের মূলে শিশুর প্রচেষ্টা, সক্রিয়তা, অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। কিন্তু পরিণমনের ক্ষেত্রে এসবের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

উভয়ের পার্থক্য

৬। শিশুমনকে অধ্যয়ন করার পদ্ধতি বা আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি (Methods used in the Study of Children *or* Methods of Modern Educational Psychology) :

মনোবিজ্ঞান দীর্ঘদিন দর্শনশাস্ত্রেব (Philosophy) কুক্ষিগত ছিল। তার স্বতন্ত্রতা স্বীকৃত হবার পরেও মনোবিজ্ঞানের বিশেষ প্রগতি সম্ভব হয় নি। তার কারণ মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব কোন পদ্ধতি ছিল না। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। ফলে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা কার্যে অভাবনীয় উন্নতি

সম্ভবপর হয়েছে। শিশু-মনকে অধ্যয়ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানে গৃহীত হয়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলতঃ এবং প্রধানতঃ মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে আশ্রয় করেই নিজস্ব অধিকার লাভ করে। আমরা নিম্নে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে গৃহীত প্রধান পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি :

(ক) **অন্তর্দর্শন (Introspection) :** ব্যক্তি যখন নিজের মানসিক অবস্থার ও প্রক্রিয়ার স্বরূপ, তার গতি, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তখন তাকে বলা হয় অন্তর্দর্শন। অন্তর্দর্শন হল অন্তঃপ্রত্যক্ষীকরণ। কিন্তু যে-কোন অন্তঃপ্রত্যক্ষণই অন্তর্দর্শন নয়। কোন ব্যক্তি যখন নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করে, তখন তা অন্তঃ-প্রত্যক্ষণ হলেও অন্তর্দর্শন নয়। আবার যখন লোক সকাল বেলায় জলখাবারে কি কি খাবার খেয়েছিল তা স্মরণ করতে গিয়ে সেই খাদ্যের একটি প্রতিরূপ বা মানস প্রতিচ্ছবি (Image) মনের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করে তখনও মন অন্তর্মুখী, কিন্তু তাও অন্তর্দর্শন নয়। মনোবিজ্ঞানী স্টাউট (*Stout* -এর ভাষায় অন্তর্দর্শন হল, নিজের অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগী হওয়া (to introspect is to attend to one's own experience)। কোন কারণে হয়ত আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি, আমি নিজে অন্তর্দর্শনের সহায়তায় আমার ক্রোধের কারণ কি, কিভাবে ক্রোধ শুরু হল, কিভাবে ধীরে ধীরে তা প্রবলতর হতে লাগল এবং তারপর কিভাবে স্তিমিত হয়ে এল—এই সব কিছুই পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন আমরা বাইরের বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি ঠিক তেমনিভাবে অন্তর্দর্শনের ক্ষেত্রে মন অন্তঃইন্দ্রিয়ের রূপ ধারণ করে নিজের কার্যকলাপ নিজেই প্রত্যক্ষ করে। স্টাউট-এর ভাষায় অন্তর্দর্শন হল সুস্পষ্ট আত্মচেতনার একটি বিশেষ অবস্থা।

অন্তর্দর্শন পদ্ধতি হল ব্যক্তিনিষ্ঠ (Subjective) পদ্ধতি, বস্তুনিষ্ঠ (Objective) নয়। বাইরের জগতে বস্তুর সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। ব্যক্তি বাইরের জগৎ থেকে মনকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে একাগ্রচিত্তে মনোযোগের সঙ্গে নিজের মনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে।

(i) **অন্তর্দর্শনের গুণ (Merits of Instrospection) :** অন্তর্দর্শন মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি। যদিও মনোবিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণ (Observation) ও পরীক্ষণের (Experiment) সহায়তা গ্রহণ করতে হয়, তবুও মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে জানার এবং তাদের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় অন্তর্দর্শন। কেননা অন্তর্দর্শনের সহায়তায় মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রত্যক্ষ, সুনিশ্চিত, যথাযথ জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। ব্যক্তি তার নিজের অবস্থা ও

ক্রিয়াকলাপকে প্রত্যক্ষভাবে ও যতখানি সঠিকভাবে জানতে পাবে বাহ্য-পর্যবেক্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করে অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাকে ততখানি সঠিকভাবে জানা সম্ভব নাও হতে পারে এবং জানলেও জানতে হয় পরোক্ষভাবে।

(ii) **অন্তর্দর্শনের ত্রুটি (Demerits of Instrospection) :** অন্তর্দর্শনের মাধ্যমে আমবা যে মানসিক প্রক্রিযাগুলিকে পর্যবেক্ষণ কবি সেগুলি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তব বিষয়কে বর্জন করে যে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে জানতে চাই, তাব উপব দৃষ্টি নিবদ্ধ কবাও কঠিন। সে কারণে পদ্ধতি হিসেবে অন্তদর্শন সহজসাধ্য পদ্ধতি নয়।

মানসিক প্রক্রিযাগুলি চঞ্চল ও ক্ষণস্থাযী। আমাদেব চিন্তা, অনুভূতি, আবেগ, কামনা প্রভৃতি নিযত পবিবর্তনশীল। কোন একটি মানসিক প্রক্রিযাব স্বরূপ জানাব জন্য সচেষ্ট হতেই দেখা গেল সেটি বিলীন হযে গেছে। কোন ব্যক্তি যখন তাব রাগের স্বরূপটিকে জানতে চায, তখনই দেখা গেল রাগ একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। যেহেতু মানসিক প্রক্রিযা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেহেতু দুজন মনোবিজ্ঞানী একই মানসিক প্রক্রিযাকে পর্যবেক্ষণ করতে কখনই সক্ষম হবে না। ধরা যাক, দুজন মনোবিজ্ঞানী 'ভয' এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে জানতে চায়। কিন্তু উভযের ক্ষেত্রে এই মানসিক আবেগ ভিন্ন এবং একই আবেগকে তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ অন্তদর্শনের সহাযতায একই মানসিক প্রক্রিযাকে জানা সম্ভব নয়।

এটি অন্তর্দর্শনের স্বভাবগত ত্রুটি, সম্পূর্ণভাবে এব থেকে মুক্ত হওযা সম্ভব নয়। অবশ্য একাধিক বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর সমবেত সহযোগিতায় এই ত্রুটি অনেকাংশে দূর করা যেতে পাবে। সুতরাং অন্তর্দর্শনকে মনোবিজ্ঞানেব একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অন্তর্দর্শনেব পবিপূবক হিসেবে পর্যবেক্ষণকে গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন এবং এজন্য আচবণবাদীরা (Behaviourists) পর্যবেক্ষণকে মনোবিজ্ঞানেব স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ কবার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ অন্তর্দর্শনের উপরই নির্ভবশীল।

(খ) **পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method) :** কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কোন মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করার যে পদ্ধতি তাকে পবীক্ষণ পদ্ধতি বলা হয। স্টাউট বলেন: "পরীক্ষণ হল সেই অবস্থায পর্যবেক্ষণ যে অবস্থা আমরা নিজেরাই পূর্ব থেকে তৈরি করে রেখেছি।" পরীক্ষাগাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে ব্যক্তির আচরণ আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

মনোবিজ্ঞানে এই পরীক্ষা পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তার একটা সাধারণ

নিয়ম আছে। যে অবস্থাগুলির মধ্যে কোন একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে পরীক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলি পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। তিনি পূর্ববর্তী অবস্থাগুলির মধ্যে মাত্র একটি অবস্থার পরিবর্তন ঘটান ও অন্যান্য অবস্থাগুলিকে অপরিবর্তিত রাখেন এবং তারপর ফলাফল লক্ষ্য করেন।

মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ-কার্যে দুজন পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন হয়। একজন পরীক্ষক (Experimenter) এবং দ্বিতীয়জন হল পরীক্ষণ-পাত্র (Subject)। পরীক্ষক সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সৃষ্ট এক কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে পরীক্ষণ-পাত্রের উপর একটি উদ্দীপক প্রয়োগ করেন এবং তার প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেন। আর পরীক্ষণ-পাত্র অন্তর্দর্শনের সাহায্যে নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। সুতরাং পরীক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষণ উভয়েরই সহায়তার প্রয়োজন।

কখনও কখনও পরীক্ষণ-কার্য চালাবার জন্য যাদের উপর পরীক্ষণ-কার্য চালান হয়, তাদের দুদলে ভাগ করা হয়। যেমন, কোন কাজ করার উপর ছাত্রদের আগ্রহের অভাব আছে কিনা পরীক্ষক তা নির্ধারণ করতে চান। পরীক্ষক দু দল ছাত্র নির্বাচন করলেন। উভয় দলই শারীরিক উপযুক্ততা ও কর্মদক্ষতার দিক দিয়ে অভিন্ন। উভয়কে একই পরিবেশে, এই পদ্ধতিতে একই কাজ করতে বলা হল। কেবলমাত্র একটি দলের মধ্যে কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি করা হল, অপর দলটির ক্ষেত্রে তা হল না। যে দলটির মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হল তাদের বলা হয় **'পরীক্ষণ-মূলক দল'** (Experimental Group) এবং যাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় নি তাদের বলা হয় **নিয়ন্ত্রিত দল** (Control Group)। এই পরীক্ষণের ফলে যদি দেখা যায় যে যাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হয়েছে তারা অপর দলটির তুলনায় কাজটিকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন করবার বিষয়টির উপর আগ্রহের প্রভাব আছে।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Experimental method): প্রথমতঃ, আমাদের প্রয়োজনমত কৃত্রিম অবস্থাগুলি আমরা বার বার সৃষ্টি করতে পারি এবং যে মানসিক প্রক্রিয়াকে আমরা জানতে চাই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। পরীক্ষণ-কার্য আমাদের সময়ের সুযোগ এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী সম্পন্ন হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষণের ক্ষেত্রে যেহেতু অবস্থা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে, সেহেতু আলোচ্য বিষয়টিকে অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তর বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বতন্ত্র করে নিতে পারি।

পরীক্ষণ পদ্ধতির অসুবিধা (Defects of Experimental method): মনোবিজ্ঞানী স্টাউট-এর মতে পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হল, প্রাকৃতিক পরিবেশে বা স্বাভাবিক অবস্থায় মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যতখানি সহজ ও সরলভাবে নিজেদের প্রকাশ করে, পরীক্ষাগারের কৃত্রিম পরিবেশে প্রক্রিয়াগুলি ততখানি স্বতস্ফূর্তভাবে নিজেদের প্রকাশ করে না। স্বাভাবিকভাবে কোন লোক ভয় পেলে তার ভাবাবেগটিকে যেভাবে জানা যাবে, কৃত্রিম পরিবেশে, কৃত্রিমভাবে তার মনে ভীতি সঞ্চারিত করে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে ঠিক সেভাবে জানা যায় না।

(গ) **উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি (Genetic Method):** '*Genesis*' শব্দটির অর্থ জন্ম বা উৎপত্তি। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে মনের জন্ম বা উৎপত্তি থেকে আরম্ভ করে তার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা হয় তাকেই 'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি' বলে। দেহের মতো মনেরও ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবৃদ্ধি আছে। এ পদ্ধতির সাহায্যে শিশু মনের ক্রমবিকাশ শৈশব থেকে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত লক্ষ্য করা হয়। মনের বিকাশ বলতে পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত গুণগুলির বা ক্ষমতাগুলির বিকাশ বোঝায়। অর্থাৎ, বংশধারা সূত্রে প্রাপ্ত গুণ ও ক্ষমতা এবং পরিবেশের প্রভাব—এ দু'য়ের অভিঘাতে ব্যক্তি-মনের ক্রমবিকাশ ঘটে।

এ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশু মনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ এবং লিপিবদ্ধ করা হয়। মনের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বংশধারা এবং পরিবেশ—এই উভয়ের প্রভাব মানুষের মনের উপর কি ভাবে কাজ করছে, এসব প্রয়োজনীয় তথ্য 'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়। শিশুর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতা কিভাবে বিকাশ লাভ করে এই পদ্ধতির সাহায্যে তা জানা যায়।

একই শিশুকে তার শৈশবাবস্থা থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে, তার শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, সেহেতু একই শিশুকে সুদীর্ঘকাল ধরে পর্যবেক্ষণ না করে, বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি শিশুকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এক বয়স থেকে অপর এক বয়সের শিশুর আচরণের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলনামূলক ভাবে বিচার করে শিশু-মনের ক্রমবিকাশের মূল সূত্রগুলি এ পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়। শিশু-মনে বিভিন্ন প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার (general ideas) উৎপত্তি কি ভাবে ঘটে, শিশুর আবেগ, অনুভূতি কিভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শিশুর জীবনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে—শিশু-মন সম্পর্কীয় এসব প্রয়োজনীয় তথ্য এ পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায়।

(ঘ) **চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (The Clinical Method) :** বিভিন্ন প্রকারের মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতির সহায়তায় ব্যক্তির মানসিক ব্যাধির স্বরূপ ও কারণ জানা যায় এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্ভব হয়। ব্যক্তি যদি তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে না পারে তাহলে তার বাহ্যিক আচরণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং এই অস্বাভাবিক আচরণ অস্বাভাবিক মনেরই প্রকাশ বলে মনে করা হয়। এ পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক।

বর্তমান যুগে মানসিক ব্যাধি-চিকিৎসার শাস্ত্র (Psychiatry) মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। ফ্রয়েড, ইয়ুঙ, অ্যাডলার প্রমুখ খ্যাতনামা মানসিক ব্যাধি-চিকিৎসকদের গবেষণামূলক তথ্যাদির আবিষ্কারের ফলে এই চিকিৎসাশাস্ত্র জনহিতকর কার্যে উল্লেখযোগ্য সুফল প্রদানে সমর্থ হয়েছে।

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis), ফ্রয়েডের অবাধ সংসর্গ বা মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী (Free association) পদ্ধতি, প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test), প্রশ্ন-তালিকা (Questionnaire) , ব্যক্তিত্ব নির্ণেয়ক প্রশ্নাবলী (Personality inventory) প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্রের পদ্ধতি বর্তমানে মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(ঙ) **ক্রমবিকাশ-ইতিহাস সংগ্রহণ-পদ্ধতি (The Case History Method) :** 'উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পদ্ধতি' এবং 'চিকিৎসামূলক পদ্ধতির' সহকারী পদ্ধতিরূপে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয়। মনের ক্রমবিকাশের পথে কোন একটি বিশেষ অবস্থাকে জানতে হলে তার পূর্ববর্তী অতীত অবস্থাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে জানা সম্ভব নয়। 'ক্রমবিকাশ-ইতিহাস সংগ্রহণ-পদ্ধতির' সাহায্যে অতীত অবস্থার ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়।

অস্বাভাবিক, অসুস্থ বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার জন্যই এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়। যেসব ব্যক্তির মন বিকারগ্রস্ত এবং যাদের বাহ্য আচরণ অস্বাভাবিক, এরূপ ব্যক্তি-মনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। ব্যক্তির খোলাখুলি কথাবার্তা, যে পরিবেশে সে বাস করে এবং তার সামাজিক জীবন থেকে এই ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ঘটনাগুলি একত্র করে সুবিন্যস্ত করার পর মোটামুটি একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। ব্যক্তির অসুস্থতার কারণ দৈহিক, মানসিক না সামাজিক তা নির্ধারণ করার পর তার মানসিক সুস্থতা কিভাবে আসতে পারে তাও নির্ণয় করা যেতে পারে। অনেক সময়

দেখা যায়, ব্যক্তির এই মানসিক অসুস্থতার কারণ কেবলমাত্র তার নীতিজ্ঞানহীনতা বা দুশ্চরিত্রতা নয়, পরিবেশের প্রভাবও এজন্য দায়ী।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের দুষ্কর্মের কারণ অনুসন্ধান করা হয়। হয়ত কোন ভদ্রপরিবারজাত শিশু চুরি করেছে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী এই ঘটনার প্রয়োজনীয় বিবরণী সংগ্রহ করার জন্য সচেষ্ট হন। মনোবিজ্ঞানীকে শিশুর বিশ্বাস অর্জন করতে হয় তারপর খোলাখুলি কথাবার্তার মাধ্যমে তার পিতামাতা, শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সহায়তায় তার এই দুষ্কর্মের উৎসগুলি অতীত জীবন থেকে অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করতে হয় এবং তারপর সেগুলিকে সমাজসম্মত পথে পরিচালিত করতে হয়। এই পদ্ধতি যখন মনোবিজ্ঞানী প্রয়োগ করবেন তখন তাকে খুব সতর্ক হতে হবে। কেননা, ঘটনার ইতিহাস যাতে সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা যায় তার দিকে নজর দিতে হয়। অতীতে যেসব ঘটনা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি বা যার সঠিক ব্যাখ্যা করা হয়নি এমন সব ঘটনার উপরও এই পদ্ধতিকে নির্ভর করতে হয়।

(চ) পরিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতি (Statistical Method): পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রভেদ তা নির্ধারণ করার জন্য, ব্যক্তির বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি, যোগ্যতা, সামর্থ্য প্রভৃতি পরিমাপ করার জন্য, মানসিক শক্তির যথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করার জন্য এবং বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার গতি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

। ৭। শিশুর বিকাশ—শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক (Development of Child—Physical, Mental, Emotional and Social):

প্রতিটি শিশুই জন্মের মুহূর্ত থেকে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। গতকাল শিশুকে যেমন দেখেছি আজকে তার থেকে পৃথক দেখছি। আবার আগামীকাল হয়ত সে আরও পৃথক হয়ে যাবে। এই পার্থক্যের সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ করা না গেলেও, একে অস্বীকার করার উপায় নেই। একথা ঠিক যে, শিশুর এই পরিবর্তনের মধ্যেও তাঁর ব্যক্তি-অভিন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু তাহলেও তার আকর্ষণীয় বস্তু, খেলাধুলা, সঙ্গী এবং যেসব বস্তু তার সংবেদনশীল মনে সাড়া জাগায়, অনবরতই

পরিবর্তিত হচ্ছে। যে উদ্দীপক কোন এক বিশেষ সময়ে তার মনে সাড়া জাগায়, সেই উদ্দীপক হয়ত অন্য সময়ে তার মনে সাড়া জাগাতে পারে না।

শিশুর ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ কিভাবে ঘটে, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশের যথাযথ জ্ঞানলাভ করা দরকার।

(ক) **শিশুর শারীরিক বিকাশ (Physical Development of the child) :** শিশু জন্মগ্রহণ করার পরই তার শারীরিক বিকাশ সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমরা লাভ করি, কিন্তু শিশুর শারীরিক বিকাশ ভূমিষ্ঠ হবার দশমাস আগে তার মাতৃগর্ভকালীন অবস্থা থেকেই শুরু হয়। কাজেই শিশুর শারীরিক বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে শিশুর মাতৃগর্ভকালীন বা জন্ম-পূর্ব বিকাশ (Pre-natal Development)-এর জ্ঞান থাকা দরকার। পুং জনন কোষ স্ত্রীজনন কোষের সঙ্গে মিলিত হলে গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভসঞ্চারের সময় মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষ (fertilised egg) গঠিত হয় সেটি নিজধর্ম অনুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। একটি কোষ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে দুটি কোষে, দুটি কোষ আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে চারটি কোষে, এইভাবে বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই কোষ বিভাজনের ফলে আদি কোষটি ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহের আকার লাভ করে। সাধারণ অবস্থায় শিশু মাতৃগর্ভে ২৮০ দিন অবস্থান করার পর ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথম দুসপ্তাহ প্রস্ফুটিত ডিম্বকোষের (fertilised egg বা zygote) বিকাশের ক্ষেত্রে কোন বাহ্য-পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে। দু সপ্তাহের পর থেকে তার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময় বিকশিত ও বর্ধিত ডিম্বটি যাকে ভ্রূণ (embryo) নামে অভিহিত করা হয়, মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। প্রায় তিনমাসের পর থেকেই কোষগুলি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে। গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অষ্টম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কে ভ্রূণের আদি বা প্রাথমিক পর্যায় (embryonic stage) এবং নবম সপ্তাহ থেকে ভূমিষ্ঠ বা জন্ম হওয়ার সময় পর্যন্ত অবস্থাকে পরিপুষ্ট ভ্রূণের অবস্থা (natal period) বলা হয়। ত্রিশ সপ্তাহ ধরে এই ভ্রূণ ধীরে ধীরে মানব-শিশুর আকৃতি ধারণ করতে থাকে। এই সময় বিভিন্ন

শিশুর শারীরিক বিকাশ শুরু হয় মাতৃগর্ভে তার জন্মমুহূর্ত থেকে

কোষবিভাজনের ফলে আদিকোষ পূর্ণাঙ্গ মানবদেহের আকার লাভ করে

জন্মের তিনমাস পর থেকেই কোষগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে

কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় পেশী, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশুর উদ্দীপকের প্রতি বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া (specific reaction) করার ক্ষমতা থাকে না; দেহের সাহায্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া (mass activity) করার ক্ষমতা থাকে মাত্র।

জন্মের পরে শিশু যেমন বড় হতে থাকে তার উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে শিশুর জন্মের শুরুতে এই বৃদ্ধি যত দ্রুতভাবে ঘটতে থাকে, শিশু যত পরিণতির (maturity) দিকে এগিয়ে চলে, ততই এই বৃদ্ধির হার কমে যেতে থাকে। তবে বয়ঃসন্ধিকালে (Adolescence) এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। জন্মের সময় শিশু প্রাথমিক ইন্দ্রিয়-ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম সপ্তাহে ইন্দ্রিয় ক্ষমতার বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। ক্রমশঃ তীব্র আলো ও শব্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং শিশু গতিশীল বস্তু প্রত্যক্ষ করতে সচেষ্ট হয়। নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে শ্রবণগত সংবেদনের তুলনায় দৃষ্টি সংবেদনের ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। নবজাত শিশু মিষ্ট, তিক্ত ও লবণাক্ত স্বাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শিশু ত্বক সংবেদনের মধ্যে, বেদনাদায়ক উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা লাভ করে। নবজাত শিশু কিছু কিছু প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া (Reflex action) করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে চোখ বন্ধ করতে পারে, এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাতে পারে। নবজাত শিশুর প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ারও ক্ষমতা থাকে, তবে তা খুব সুস্পষ্ট নয়। শিশু যতই বাড়তে থাকে ততই সে তার হাত, পা, পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা লাভ করে। এই অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশু যতই নতুন নতুন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে ততই তার কৌতূহল পরিতৃপ্তি লাভ করে। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সে জ্ঞানলাভ করে। পেশীগুলিকে প্রয়োজনমত সঞ্চালিত করার ক্ষমতা নবজাত শিশুর থাকে না। দুমাসের শিশু মাটি থেকে মুখ তুলতে পারে। চার মাসের শিশুকে ধরলে বসতে পারে। সাত মাসের শিশু একা একা বসতে পারে, নয়-দশ মাসের শিশু কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে। এগার মাসে কোন কিছু অবলম্বন করে চলতে পারে। চৌদ্দ মাসে বিনা অবলম্বনে হাঁটতে পারে। তারপর ক্রমশঃ শিশু জটিল কার্য করার ক্ষমতার অধিকারী হয়। সে লাফাতে, দৌড়তে, উঠতে, নামতে প্রভৃতি নানা প্রকারের কার্য করার ক্ষমতা লাভ করে।

জন্মের পরে শিশুর উচ্চতা ওজন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি হতে থাকে

পেশী সঞ্চালনের বিভিন্ন স্তর

নবজাত শিশুর প্রথম দিকের আচরণ বিশেষধর্মী নয়, সামগ্রিক। নবজাত শিশুর প্রথম দিকের আচরণ সমগ্র দেহের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রথম দিকে কোন লক্ষ্য সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ঘটে না। সেকারণে এই সঞ্চালন সুনিয়ন্ত্রিত, সুসমঞ্জস ও সুসংহত নয়। ধীরে ধীরে, অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত, অসমঞ্জস অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত হয়ে ওঠে। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে শিশু প্রথমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সাধারণভাবে সঞ্চালিত করে, তারপরে ধীরে ধীরে প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য পৃথক পৃথক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালিত করতে শেখে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু পেশীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করতে শিক্ষা করে। চোখ ও হাতের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে শেখে, কোন জিনিস দেখে তাকে হাতে করে তুলে ধরতে শেখে। কাজেই শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করার ও পেশী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। শিশুর প্রথম দিকের আচরণ থাকে সাধারণ; কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার বা কোন সুনির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা শিশুর থাকে না। কিন্তু ক্রমশঃ যতই সে বড় হতে থাকে ততই তার সাধারণ আচরণগুলি বিশেষ ধরনের আচরণে পরিণত হয়। তারপর এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বিশেষ আচরণগুলিই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও জটিলতর আচরণে রূপান্তরিত হয়। যেমন, প্রথম শিশু লাফ দেওয়া এই বিশেষ আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল, তারপর দৌড়ান এই বিশেষ আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল। তারপর দৌড়তে দৌড়তে লাফ দেওয়া এই বিশেষ জটিল আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল। শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা এসে পড়ে। প্রথম দিকে হাত পা নাড়াতেই শিশুর খেলা সীমাবদ্ধ থাকে। ক্রমশঃ দৌড়ান, লাফান, ঠেলাঠেলি, এবং আরও পরে কপাটি খেলা, ফুটবল, ক্রিকেট, প্রভৃতি নানা ধরনের খেলা এসে পড়ে। তবে শিশুর শারীরিক বিকাশের প্রথম দিকে খেলাধূলার মধ্যে যত রকম বৈচিত্র্য দেখা যায়, ক্রমশঃ বয়স বাড়তে থাকলে, খেলা-ধূলার প্রকৃতিগত পার্থক্য বা বৈচিত্র্য হ্রাস পেতে থাকে।

শিশুর প্রথম দিকের আচরণ সামগ্রিক

শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ধীরে ধীরে বিশেষধর্মী হয়ে ওঠে

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্নধরনের খেলাধূলায় শিশু যোগদান করে

ছেলে ও মেয়ের শারীরিক বিকাশ একই গতিতে ঘটে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশের ব্যাপারে সমবয়সী মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ক্ষেত্রে এই

বিকাশ বেশী মাত্রায় দেখা যায়। তবে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শুরুতে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি দৈহিক পরিপক্কতা লাভ করে। বিশেষ কতকগুলি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার জন্য শারীবিক শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ব্যাপারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়। তবে যেসব জটিল সঞ্চালন-মূলক ক্রিয়া কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির উপব নির্ভব করে না, সেসব ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অধিকতর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কায সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

ছেলে ও মেয়ের শারীরিক বিকাশের পার্থক্য

সাধারণতঃ, শৈশবে ছেলেমেয়েরা সমান শক্তিশালী থাকে কিন্তু যৌবন সমাগমে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে যৌবনের শুরুতে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটতে থাকে এব পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলার নতুন পথ তাদের শিক্ষা করতে হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টিই তাদের যৌবন সমাগমের নির্দিষ্ট প্রতীক। ছেলেদের ক্ষেত্রে এইরকম নির্দিষ্ট কোন প্রতীক নেই। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ক্ষেত্রে এই যৌবনের সমাগম একটু দেরীতেই ঘটে থাকে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা তাই অনেক বেশি যৌন সচেতন হয়ে ওঠে। যৌবন সমাগমে ছেলেমেয়েদের উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি ঘটে। যৌবন সমাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আরও কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন, ছেলেমেয়েদের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে কেশোদ্গম হয়। পুরুষের স্বর মোটা ও মেয়েদের স্বর সরু হয়। পুরুষের স্কন্ধদেশ ও বক্ষোদেশ বিস্তৃত হয়। নারীর স্তনযুগল পরিবর্ধিত হয় ও নিতম্ব গুরুভার হয়। ছেলেমেয়েদের যৌন পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচরণের মধ্যেও উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় যৌন বিষয়ে উভয়ের মনে গভীর কৌতূহল এবং কতকগুলি চাহিদা বা প্রয়োজন দেখা দেয়। ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হলে তাদের এই সময়কার চাহিদা বা প্রয়োজনের দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া দরকার। এইসব চাহিদা স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত হবার সুযোগ না পেলে অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মনের স্থিরতা নষ্ট হয়, যার ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ব্যাহত হয়। সেই কারণে উপযুক্ত যৌন-শিক্ষার দ্বারা ছেলে-মেয়েদের যৌন কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন একান্ত প্রয়োজন। এই সময় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যৌন-উত্তেজনা দেখা যায়। যাতে ছেলেমেয়েদের মন সব সময় কামচিন্তায় ভরপুর না থাকে সেজন্য খেলাধুলা, সাহিত্য পাঠ, শিক্ষামূলক আলোচনা,

যৌবন সমাগমে ছেলে মেয়ের শারীরিক পরিবর্তন

শারীরিক ব্যায়াম এবং অন্যান্য নির্দোষ চিত্তাকর্ষক বিষয়কে তাদের শিক্ষা সূচীর অন্তর্গত করে তাদের মন থেকে কামভাব যতদূর সম্ভব দূর করা উচিত। এর ফলে ছেলেমেয়েরা তাদের মনের স্থিরতা ফিরে পাবে। ছেলেমেয়েদের এই সময়কার চাহিদাগুলিকে একটু উদারতার সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করলে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা যাতে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলার আয়োজনের মাধ্যমে সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। নার্শারী ও কিণ্ডারগার্টেন স্তরে যেসব কাজের মাধ্যমে শিশুর পেশীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। শিশু যাতে দৌড়ান, লাফান, ছোটাছুটির মাধ্যমে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধন করতে পারে সে দিকেও পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার সকলের দৃষ্টি রাখা দরকার। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ পরিপুষ্টি না ঘটলে সেগুলি নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম হয় না। ফলে ছাত্রজীবনে অনেক শিশুর মধ্যেই দৃষ্টি-শক্তির ও শ্রবণ-শক্তির দুর্বলতা ও নানা ধরনের শারীরিক ত্রুটি দেখা দেয়। অনেক শিশুর মধ্যে উচ্চারণের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। অনেকে অল্পবয়সে নানাধরনের শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের যথাযথ বিকাশ না ঘটার জন্যই এসব দোষত্রুটি দেখা দেয়। যেহেতু শিশুর মানসিক বা বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশ শারীরিক বিকাশের উপর অনেকাংশে নির্ভর, সেহেতু শিশুর শারীরিক বিকাশ যাতে কোন ভাবে ব্যাহত না হয় সেদিকে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলের একান্ত দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

শিশুর শারীরিক বিকাশের প্রতি পিতা-মাতার ও বিদ্যালয়ের কর্তব্য

(খ) **শিশুর মানসিক বিকাশ (Mental Development of the Child) :** নবজাত মানবশিশু জন্মসময়ে অত্যন্ত অসহায় ও পরনির্ভর থাকে। অপরের সহায়তা ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। নবজাত শিশুর মধ্যে হাঁচা, কাশা, চোখ বন্ধ করা প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে। এছাড়াও নবজাত শিশুর মধ্যে কতকগুলি আবেগজ প্রতিক্রিয়ার ও সহজাত প্রবৃত্তি-মূলক আচরণ করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এগুলিই শিশুর বেঁচে থাকার বা বাহ্য-জগতের সঙ্গে অভিযোজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য দরকার শিশুর নতুন আচরণ শিক্ষা করার। নতুন আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে শিশু জন্মায় এবং এই ক্ষমতার ক্রমবিকাশই শিশুকে বাহ্যজগতের সঙ্গে অভিযোজনে সমর্থ করে।

শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কিভাবে শিশুর মধ্যে শিখনের ক্ষমতার ক্রমবিকাশ ঘটে। শিশুর মানসিক ক্রমবিকাশেব প্রথম স্তবে দেখি সংবেদনের সংব্যাখ্যান বা অর্থ নির্ণযের প্রচেষ্টা। শৈশবে শিশু বিভিন্ন সংবেদনগুলিকে পৃথক করে তাদেব অর্থ নির্ণয করতে সমর্থ হয না, সংবেদনগুলি একটি অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতারূপে তার কাছে প্রকাশিত হয। কিন্তু ক্রমশঃ শিশু একটি সংবেদনকে অন্য সংবেদন থেকে পৃথক করতে শেখে, অর্থাৎ কিনা শিশু প্রত্যক্ষ করতে শেখে। সংবেদনের সংব্যাখ্যান হল প্রত্যক্ষণ। শিশু বিভিন্ন ইন্দ্রিযগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারে। নিজের মাতাকে শিশু অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তি থেকে পৃথক করতে পারে। এই ভাবে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিযের ক্ষমতা বর্ধিত হতে থাকে। ইন্দ্রিযগুলির ক্ষমত যতই বাডতে থাকে, শিশুর অভিজ্ঞতাও সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত রূপ লাভ করে। শিশু পূর্ব ও পরবর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন কার্য ও ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হয। যেমন, মায়ের হাতে দুধের বাটি দেখলেই শিশু মনে করে এবার তার ক্ষুধার উপশম হবে। প্রথম প্রথম শিশু বিভিন্ন ধবনের রঙ বা শব্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, ক্রমশঃ সে তাদের মধ্যে পার্থক্য নিধারণে সমর্থ হয। শিশু ক্রমশঃ পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিযে তার আচরণের মধ্যে পরিবর্তন আনযন করতে সক্ষম হয। কোন বিষয় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা যদি সুখপ্রদ হয তাহলে শিশু তাকে পেতে চায়, যদি দুঃখজনক হয় তাকে পরিহার করে। এই ভাবে শিশুর শিখন শুরু হয়। ছয় থেকে বার বছর বয়সে শিশু তার অতীত অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পাবে এবং তার সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। এই বযসে তার প্রশ্নের ধরন হল, এটা কি এ ধরনের নয়, বরং এটা কিভাবে ঘটেছে। কেন এটা এরকম? এটি শিশুর মানসিক বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর, কারণ, কৌতূহলের মধ্যে শিশুর জ্ঞান লাভের স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যুগিযে তার এই জ্ঞান-স্পৃহাকে বলবতী করে তুলতে পারেন। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে। সে অপরকে অনুকরণ করতে শেখে। সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে সমর্থ হয়, এবং কিছু কিছু দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য অর্জন করে।

সংবেদনের সংব্যাখ্যান প্রচেষ্টা

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় তার স্মৃতিশক্তির বিকাশ। স্মৃতিশক্তির জন্যই উদ্দীপকের অভাবেও শিশু বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম

হয়। খুব শৈশবে শিশু তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে বর্তমান অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাকে কাজে লাগাতে পারে না। কিন্তু বয়স যেই বাড়তে থাকে, শিশু কিছু কিছু অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে এবং জানা বিষয় চিনতে অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার (recognition) পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। শিশু তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে খাদ্যের অনুসন্ধান করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সঙ্গীর আগমন প্রত্যাশা করে, যে ব্যক্তিকে ভালবাসে তার কাছে ছুটে যায় এবং যে ভয় দেখায় তাকে দেখলে দূরে পালিয়ে যায়।

স্মৃতিশক্তির বিকাশ

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি লক্ষণ হল মনঃসংযোগের ক্ষমতার বিকাশ। অতি শৈশবে শিশুর মন থাকে অস্থির ও চঞ্চল। কিন্তু মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশু কোন একটি বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করতে শেখে। উদ্দীপক চিত্তাকর্ষক হলে শিশু সেই বিষয়ে সহজেই মনঃসংযোগ করতে পারে। যে ধরনের গল্প শুনতে শিশু আগ্রহী হয়, সেই ধরনের গল্পেতে শিশু সহজেই মনঃ-সংযোগ করতে পারে। অবশ্য পরে শিশুর চিন্তনশক্তির ক্ষমতা যখন বর্ধিত হয় তখন সে নীরস বিষয়ে মনঃসংযোগে সমর্থ হয়। তবে মনঃসংযোগের ব্যাপারে শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ক্রিয়া করে, যার জন্য কোন কোন শিশু সহজেই কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করতে পারে, যা অপর শিশু পারে না।

মনঃসংযোগের ক্ষমতার বিকাশ

শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতীকের (Symbol) প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। যেমন, যে পরিচারিকা রোজ দুধের বোতল নিয়ে আসে তাকে দেখেই শিশুর কান্না থেমে যায়। পরিচারিকা প্রতীক মাত্র, যে দুধ নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু দুধের অনুপস্থিতিতে শুধু মাত্র পরিচারিকাকে দেখে শিশু প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। প্রতীকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা বা প্রতীক ব্যবহারের ক্ষমতা শিশুর মানসিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

প্রতীকের প্রতি প্রতিক্রিয়া

শিশু মূর্ত (concrete) বস্তু ছাড়াও অমূর্ত (abstract) বস্তু নিয়ে চিন্তা করতে শেখে। শিশু গল্পে শোনা দেওয়া বা পরীর একটা কাল্পনিক অবয়ব মনের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করে। কোন সঙ্গীকে কিভাবে জব্দ করবে মনে মনে তার পরিকল্পনা করে। শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি উল্লেখযোগ্য স্তর হল ভাষা ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করা। শিশুর ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশে কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ছয় মাসের শিশু অস্ফুটভাবে কয়েকটি বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে।

অমূর্ত বস্তুকে নিয়ে চিন্তন

দু বছরের শিশু বয়স্কদের ব্যবহৃত শব্দ বলতে পারে। আবার তিন বছরের শিশু বেশ ভালভাবেই কথা বলতে পারে, বয়স্কদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে নিজের কৌতূহল প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে। চার বছরের শিশু অনর্গল কথা বলতে পারে এবং সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতে পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু জটিল বাক্য বলতে পারে, প্রবাদের ব্যবহার করতে পারে এবং সুযোগমত শব্দ নির্বাচন করে তার ব্যবহার করতে পারে। শিশু সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে পড়তে এবং সাত-আট বছর বয়স থেকে লিখতে শেখে। তবে শিশুর জীবনে ভাষা শিক্ষার ক্ষমতা নানারকম উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তি, কার্যক্ষমতা, বুদ্ধি, আগ্রহ, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ, সমাজের প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতি, প্রভৃতি শিশুর ভাষা-শিক্ষার ক্ষমতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

ভাষার ব্যবহার

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল তার মধ্যে প্রত্যয় (concept) বা সাধারণ ধারণার (general notion) বিকাশ। 'প্রত্যয়' কোন একটি জাতির সাধারণ গুণ নির্দেশ করে, যেমন, 'মানুষ', 'গরু' ইত্যাদি। মানুষ বলতে আমরা বিশেষ কোন মানুষের কথা চিন্তা করি না। 'মানুষ' বলতে মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি মানুষকেই বুঝি। প্রত্যয় বলতে আমরা একটা জাতির বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝি বা তাদের যে সাধারণ গুণাবলী আছে তাদের বুঝি। প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ না থাকার জন্য, প্রত্যয় সংবেদনের বিষয়বস্তু নয়। প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ সম্ভব হয় এবং প্রত্যয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষণ-লব্ধ, পরস্পর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা চলে। প্রত্যয়ের মাধ্যমেই চিন্তার মিতব্যয়িতা সংগঠিত হয়। প্রত্যয় মানসিক পরিশ্রম লাঘব করে। প্রত্যয় চিন্তার প্রয়োজনীয় বাহন। আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রত্যয়ের সহায়তায় শ্রেণীবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ করা সহজ হয়। প্রত্যয় বা সাধারণ ধারণা চিন্তাকে বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অতীত ও ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তাকে প্রসারিত করে। যুক্তি বা অনুমান গঠন করতে হলে প্রত্যয় অবশ্যই প্রয়োজনীয়। উন্নত চিন্তনক্রিয়ার জন্য প্রত্যয়ের ব্যবহার অপরিহার্য। প্রত্যয় গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় পৃথকীকরণ (abstraction) ও সামান্যীকরণ (generalisation) প্রক্রিয়া। শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই ক্রিয়াতেও শিশু দক্ষ হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ শিশু আরও জটিল ধারণা গঠন করতে শিক্ষা করে এবং দেশ, কাল ও কার্যকারণের ধারণা

প্রত্যয় বা সাধারণ ধারণার বিকাশ

শিশুর মনে গঠিত হয়। খুব ছোটবেলা থেকেই শিশুর মধ্যে দেশ বা স্থানের ধারণার সৃষ্টি হয়। যেদিন থেকে শিশু চলাফেরা করতে শেখে সেদিন থেকে তার মধ্যে স্থানের ধারণার সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ শিশু শূন্য স্থান ও পূর্ণ স্থানের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। সময় নির্দেশক শব্দ, যেমন, 'এখন', 'তখন', 'আগে,' 'পরে', প্রভৃতি শিশুর মনে সময়ের ধারণা সৃষ্টি করে। এই সব শব্দের সাহায্যেই শিশু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। তবে ঐতিহাসিক সময় সম্পর্কে ধারণা গঠন করা শিশুব পক্ষে সম্ভব হয় নয়-দশ বছর বযসে।

জটিল ধারণা গঠন

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সর্বপ্রাণবাদমূলক (animistic) ধারণা বর্জন করে প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে শিক্ষা করা। শিশু-মন শৈশবে সমস্ত বস্তুকেই প্রাণবান বা সজীব মনে করে। বই, খেলনা, চন্দ্র, সূর্য, সব কিছুবই প্রাণ আছে বলে সে মনে করে। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছব বয়স থেকে শিশু আর সব বস্তুকেই প্রাণবান মনে করে না। এই বয়স থেকে প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে জাগতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা তার মধ্যে দেখা যায়।

প্রাকৃতিক ঘটনাব সাহায্যে সব ঘটনা ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা

শিশুর প্রাথমিক চিন্তন হল প্রতিরূপমূলক এবং কল্পনাধর্মী। শিশু প্রতিরূপ-এর (image) সাহায্যে চিন্তা করে অতি শৈশব থেকেই। প্রতিরূপ হল মূর্ত বস্তুর মানসিক চিত্র। কোন শিশু কুকুর, বাড়ী বা তার কোন সঙ্গীর কথা চিন্তা করার সময় তার একটা মানসিক ছবি মনের সামনে তুলে ধরে। এ ব্যাপারে শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক বিকাশের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়ে। শিশু বস্তু-প্রতিরূপের ব্যবহার করে বেশী, প্রাপ্তবয়স্করা শব্দ-প্রতিরূপের ব্যবহার করে বেশী। কোন প্রাপ্তবয়স্ক উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে শব্দের সাহায্যেই চিন্তা করে। শিশুর অধিকাংশ জ্ঞান আসে সংবেদনের মাধ্যমে। কাজেই তার চিন্তন বস্তুর মানসিক ছবির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। প্রাপ্তবয়স্করা পুস্তক এবং ভাষার মাধ্যমেই তাদের অধিকাংশ জ্ঞান অর্জন করে, কাজেই বস্তুর জন্য তারা শব্দ-প্রতীকের ব্যবহার করে। শৈশবে শিশু দিবাস্বপ্নে মশগুল থাকে, শিশু অলীক কল্পনার জগতে বিচরণ করে। শিশু তার অলীক কল্পনার মাধ্যমে বহু অপরিতৃপ্ত কামনাকে পরিপূর্ণ করতে চেষ্টা করে। অনেক সময় শিশু বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। কোন শিশু হয়ত কুকুর দেখে ভয় পায়। স্কুল থেকে বাড়ি

শিশুর কল্পনাধর্মিতার বিকাশ

ফেরার পথে, সে দেখল একটা কুকুর তার দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে রয়েছে। বাড়িতে এসে সে গল্প ফেঁদে বসল যে তাকে অনেকগুলি কুকুর তাড়া করেছিল।

যুক্তিতর্ক করার, বিচার করার ও সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা

শৈশবে শিশুরা স্মৃতি এবং কামনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা কল্পনার সাহায্যে অনেক গল্প তৈরি করে এবং সেগুলিকে সত্য বলে মনে করে। তবে শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। যুক্তিতর্ক করার, বিচার করার বা সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা শিশুর মধ্যে আসে যখন তার সাধারণ চিন্তনের ক্ষমতা বেশ পরিণতি লাভ করে।

সাত-আট বছরের আগে শিশুর মধ্যে এই ক্ষমতা সাধারণতঃ দেখা দেয় না। চিন্তন, প্রত্যয় গঠন, যুক্তিতর্ক করা, সমস্যা সমাধান করা, জটিল চিন্তনের ক্ষমতা, ধারণার সাহায্যে অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা, এই সবই বিশেষ করে নির্ভর করে শিশুর বুদ্ধির উপর। শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটে, তবে ষোল বছরের পর শিশুর বুদ্ধি আর তেমন বাড়ে না। সব শিশুই সমান বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় না। বুদ্ধির দিক থেকে শিশুতে শিশুতে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়।

(গ) শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development of the Child) : শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে সঠিকভাবে বুঝে নিতে হলে, একদিকে যেমন তার বৌদ্ধিক বিকাশের প্রকৃতি জানা প্রয়োজন, তেমনি তার প্রক্ষোভ বা আবেগজ বিকাশকেও জানা দরকার। শিশুর চিন্তনশক্তির পূর্ণ বিকাশের বহু আগেই তার মানসিক জীবন প্রক্ষোভ বা আবেগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। প্রক্ষোভের বিকাশের প্রতি উদাসীন থেকে শিশুর শিক্ষার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, মানসিক সংগঠন, শিক্ষার অগ্রগতি সবই নির্ভর করে শিশুর

শিক্ষায় প্রাক্ষোভিক বিকাশের গুরুত্ব

প্রক্ষোভ বা আবেগের সুষ্ঠু প্রকাশের উপর। যদি কোন শিশুর মনে সব সময়ই ভয় বাসা বাঁধে, যদি সে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়, যদি সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ না হয়, যদি তার মন সব সময়ই নৈরাশ্য ও বেদনায় ভরপুর থাকে, যদি কাজে সে আনন্দ না পায়, যদি তার মনে সব সময়ই ক্রোধ সঞ্চিত থাকে, তাহলে সেই শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও তার শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। শিশুর প্রক্ষোভ বা আবেগগুলি যদি সুষ্ঠু প্রকাশের সুযোগ লাভ না করে, সেগুলি যদি সুসংযত ও সুসংবদ্ধ না হয়, তাহলে শিশুর মানসিক সংগঠনে বাধা দেখা দেয়।

প্রক্ষোভ বা আবেগ হল এমন এক ধরনের জটিল অনুভূতি যার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান; কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণা একে জাগরিত করে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য এমন কতকগুলি বিশেষ ধরনের দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্য আমরা নানারকম কাজে প্রবৃত্ত হই। ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি আবেগের উদাহরণ। প্রক্ষোভের দুটি দিক আছে, একটি মানসিক অপরটি শারীরিক বা দৈহিক। মানসিক দিক থেকে প্রক্ষোভ হল একটি জটিল অনুভূতি, যেমন, সুখ, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি। দৈহিক দিক থেকে কতকগুলি আন্তর (internal) ও বাহ্য (external) পরিবর্তন দেখা যায়। প্রক্ষোভের সময় হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পরিপাক যন্ত্র এবং অন্যান্য আন্তর যন্ত্রের ক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। বাহ্য-পরিবর্তনের অর্থ পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল, চোখের মণি স্ফীত হওয়া ইত্যাদি। প্রক্ষোভের সময় দেহের অভ্যন্তরে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় তার মধ্যে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র এবং অনালী গ্রন্থিগুলির ক্রিয়া প্রক্ষোভের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

প্রক্ষোভের প্রকৃতি—তার মানসিক ও শারীরিক দিক

প্রক্ষোভের বিকাশের আলোচনায় যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেটা হল আদিম বা মৌলিক প্রক্ষোভের সংখ্যা কয়টি? এই বিষয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। দার্শনিক ডেকার্ট (*Descartes*)-এর মতে বিস্ময়, ভালবাসা, ঘৃণা, কামনা, আনন্দ ও দুঃখ এই ছয়টি আদিম বা মৌলিক প্রক্ষোভ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত নয়। মনোবিদ্ ওয়াটসন (*Watson*)-এর মতে মৌলিক প্রক্ষোভ হল তিনটি—ভয়, ক্রোধ এবং আনন্দ। শিশু তিনটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উচ্চ শব্দ শুনলে শিশু ভয় পায়। হঠাৎ পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলেও শিশু ভয় পেয়ে থাকে। শিশুর চলাফেরায় যদি বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়। আবার তার গায়ে যদি হাত বুলানো যায় বা তাকে আদর করা হয় তাহলে সে আনন্দ পায়। সারম্যান (*Sherman*) ওয়াটসনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন যে শিশুর প্রক্ষোভমূলক বাহ্য আচরণ এতই সাধারণ যে তাই দেখে প্রক্ষোভের প্রকৃতি নিরূপণ করা শিশুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন। কোন শিশুর কান্না দেখে সে ভয়ে কাঁদছে বা ক্রোধবশতঃ কাঁদছে, নির্ধারণ করা কঠিন। ক্যাথারিন ব্রিজেস (*Katherine Bridges*)-এর মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ হল উত্তেজনা (excitement)। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল (*McDougall*)-এর মতে মানুষের মৌলিক প্রক্ষোভের সংখ্যা সতেরোটি।

শিশুর ক্ষেত্রে আদিম প্রক্ষোভের সংখ্যা

ওয়াটসনের অভিমত

সারম্যান ও ব্রিজেস-এর অভিমত

বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে যে প্রক্ষোভের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা খুবই সাধারণ প্রকৃতির। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে তার মধ্যে প্রক্ষোভের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। আমেরিকার ক্যাথারিন ব্রিজেসের গবেষণা থেকে জানা যায় যে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ হল সাধারণ উত্তেজনা। এই প্রক্ষোভ প্রথমতঃ দুটি পৃথক প্রক্ষোভে রূপান্তরিত হয়, অস্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ। শিশুর বয়স যখন তিন সপ্তাহ মাত্র তখনই এই অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দেয় এবং তিনমাস বয়সেই আনন্দ দেখা দেয়। শিশুর যখন ছয়মাস বয়স তখন আনন্দ উচ্ছ্বাসের রূপ নেয়। অস্বাচ্ছন্দ্য থেকে ৪ মাস বয়সে রাগ, ৫ মাস বয়সে বিরক্তি ও ৭ মাস বয়সে ভয় দেখা দেয়। ১১ মাস বয়স থেকে শিশুর আনন্দ বড়দের প্রতি অনুরাগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৫ মাস বয়সে ছোটদের প্রতি অনুরাগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ১৫ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে, শিশুর মধ্যে ঈর্ষা বা অসূয়া (jealousy) দেখা দেয়। এই প্রক্ষোভটি অস্বাচ্ছন্দ্যের একটি বিশেষ রূপ।

শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রক্ষোভ বিশেষধর্মী হয়ে পড়ে

ব্রিজেস এর অভিমত

শিশুর প্রক্ষোভের বিকাশ সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমতঃ, নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের সাধারণ রূপটাই ধরা পড়ে, প্রক্ষোভগুলির মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য করা যায় না। বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই প্রক্ষোভগুলির পার্থক্য বোঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ শৈশবে প্রক্ষোভের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি তেমন সংযত থাকে না, প্রকাশের মধ্যে তীব্রতা ও প্রাবল্য দেখা যায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তীব্রতা ও প্রাবল্য তিরোহিত হয়। প্রক্ষোভের বাহ্য-প্রকাশের মধ্যে যথেষ্ট সংযম দেখা দেয়। শিশু ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করে কাঁদে, হাত-পা ছোঁড়ে, অপরকে আক্রমণ করে, জিনিসপত্র নষ্ট করে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে। কিন্তু শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন ক্রুদ্ধ হলেও তার বাহ্য আচরণ সাধারণতঃ সংযত ও ভদ্র হয়। শিক্ষা, সামাজিক প্রভাব অর্থাৎ কিনা সমাজের লোকের নিন্দা, প্রশংসা এবং অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবের জন্যই তার আচরণে এই পরিবর্তন দেখা দেয়। ৮।৯ বছরের ছেলেমেয়েরাও তাদের প্রক্ষোভের প্রকাশকে অনেক সময় বেশ ভালভাবেই দমন করতে পারে, যার জন্য এই বয়সের শিশুদের মধ্যে কখন কি প্রক্ষোভ দেখা দেয় সব সময় নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। প্রক্ষোভের বাহ্য-প্রকাশের ক্ষেত্রে সংযমের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা না গেলেও, সব সময় বাহ্য-অভিব্যক্তি দমন করা

শিশুর প্রক্ষোভের বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

যুক্তিসঙ্গত নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করলে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। দুঃখের সময় মন খুলে কাঁদতে পারলে দুঃখভার লাঘব হয়, ক্রোধ প্রকাশিত হলে ক্রোধ প্রশমিত হয়। দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভকে যদি দমন করা যায় তাহলে এই অবদমনের ফলে মনের ভারসাম্য ব্যাহত হয়ে এমন এক অস্থিরতার সৃষ্টি করে যার ফলে শিশুর মানসিক সুস্থতা নষ্ট হয়ে যায়। শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে প্রক্ষোভ সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার অবহিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রক্ষোভের বাহ্য-প্রকাশকে সংযত করা প্রয়োজন

গুরুজনদের তিরস্কার ও নিন্দার ভয়ে অনেক সময় শিশুরা তাদের প্রক্ষোভের প্রকাশকে এমনভাবে অবদমিত করে যে এই অবদমিত প্রক্ষোভ শিশুর মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে তার স্বাভাবিক আচরণকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া প্রক্ষোভের সুষ্ঠু প্রকাশের পথ অবরুদ্ধ হওয়াতে শিশুর মনে এক গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যা তার স্বাভাবিক আচরণকে বিপর্যস্ত করে, তার ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশের পথে বাধা সঞ্চার করে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি কোন শিশু ভীত বা ক্রুদ্ধ হয় বা দুঃখ বোধ করে, সেই সময় প্রক্ষোভের বিষয়টি অপরের কাছে প্রকাশ করলে, প্রক্ষোভ অনুভব করার মিথ্যা কারণটি সম্পর্কে সে অবহিত হতে পারে। কাজেই সব সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে শিশুর প্রক্ষোভ প্রকাশের সুষ্ঠু পথ খুঁজে পায়। তৃতীয়তঃ, শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভ-অনুভবের মূলে থাকে বর্তমানের কোন উদ্দীপক। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতীত বা ভবিষ্যতের অর্থাৎ কি না বর্তমানে উপস্থিত নেই, এমন উদ্দীপকও প্রক্ষোভ সৃষ্টি করতে পারে। চতুর্থতঃ, শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভ অনুভব করার গণ্ডী থাকে খুবই সংকীর্ণ, কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দীপক তার মনে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে, কিন্তু যতই বয়স বাড়তে থাকে তার বোধশক্তি, চিন্তনশক্তি, মানসিক ক্ষমতার উন্নতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপকতার জন্য প্রক্ষোভের গণ্ডীও বেড়ে যায়। যে কোন উদ্দীপক তখন তার মনে বিশেষ কোন প্রক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে পারে। যেমন, শৈশবে যে চিত্র দেখে তার মধ্যে কোন প্রক্ষোভ জাগেনি, বড় হবার পর সেই চিত্র দেখেই তার মধ্যে বিস্ময়-ভাবের উদ্রেক হয়। ষষ্ঠতঃ, শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের মূলে থাকে শিশু নিজে, তার স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে ততই তার প্রক্ষোভের ব্যাপকতা চোখে পড়ে। তখন নিজেকে ছাড়াও অপরকে কেন্দ্র করে তার প্রক্ষোভ জাগে। ষষ্ঠতঃ, খুব শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভ অধিক সময় স্থায়ী হয় না, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের স্থায়ীরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। সপ্তমতঃ, অমূর্ত

শিশুকে প্রক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া দরকার

আদর্শের যেমন সত্য, শিব ও সুন্দরের চিন্তা করে বয়স্ক ব্যক্তিদের মনে যে রসের (sentiment) উদ্ভব হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তা হয় না।

যেহেতু প্রক্ষোভ অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা ও আচরণের গতি নির্ণয় করে সেহেতু প্রক্ষোভকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করার একান্ত প্রয়োজন। একটুতেই যারা রেগে যায় বা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বা সামান্য ব্যর্থতাতেই নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ে, সামান্য বিপদের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে যে সংযমের একান্ত অভাব, স্বীকার করতেই হয়। প্রক্ষোভকে সংযত করার ব্যাপারে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিশেষ বৈষম্য দেখা যায়। শিশুদের শেখাতে হবে কিভাবে তারা তাদের প্রক্ষোভকে সংযত করে মানসিক স্থিরতার পরিচয় দেবে এবং ভদ্রসমাজে নিজেদের আচরণকে সুন্দর ও মার্জিত করে তুলবে। আবার লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশুর প্রক্ষোভ মাত্রই যেন অবদমিত না হয়, যা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশকে ব্যাহত করবে। প্রক্ষোভের প্রকাশ মাত্রকেই রুদ্ধ করা হলে জীবন হয়ে পড়বে নীরস। ছাত্রদের মধ্যে যখন কোন প্রক্ষোভের তীব্র প্রকাশ ঘটছে তখন শিক্ষককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার তীব্রতা কমে যায়। প্রক্ষোভের প্রকাশসময়ে ছেলেদের কঠিন সমালোচনা বা উপহাস করে তাদের আত্মমর্যাদায় ঘা দেওয়া সব সময় যুক্তিযুক্ত নয়। শিশুর অনেক আচরণের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন তার আচরণের মূলে কোন্ ধরনের প্রক্ষোভের ক্রিয়া রয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তা না হলে অনেক সময় শিশুর আচরণের ভুল ব্যাখ্যা করা হবে এবং শিশুর সুশিক্ষার পথে বাধা দেখা দেবে।

(ঘ) **শিশুর সামাজিক বিকাশ (Social Development of the Child) :** সামাজিক বিকাশ বলতে বোঝায় সমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তি, সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশ। মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। মানুষ যে সমস্ত সহজাত প্রবণতা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সমাজের মধ্যে থেকেই তার সেই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিণতি লাভ করে। সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে, শিক্ষামূলক, কৃষ্টিমূলক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর পক্ষে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু প্রতিযোজন সম্ভব হয়। একেই বলা হয় শিশুর সামাজিকীকরণ বা সামাজিক জীব হিসাবে বসবাস করার যোগ্যতা অর্জন।

সামাজিক বিকাশের অর্থ

জন্মের মুহূর্ত থেকেই শিশুর সব সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয় না। ধীরে ধীরে সে যতই বড় হতে থাকে ততই সে তার চারপাশের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে

আসে। ছোটবড় নানা দলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ লাভ করে, নানারকম সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অনেক বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। এইভাবে তার সমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটে এবং শিশু সমাজের সঙ্গে প্রতিযোজনের যোগ্যতা অর্জন করে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে শিশু সামাজিক প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং শিশুর সামাজিকীকরণের মূলে রয়েছে এই প্রবৃত্তির প্রভাব। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই জাতীয় কোন সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য একটা সহজাত প্রবণতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই সহজাত প্রবণতাই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে শিশুকে একটি পূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত করে, তার সামাজিক চেতনাকে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সামাজিক আচরণের উপযোগী কতকগুলি সংলক্ষণ (traits) যেমন, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, দয়া, সঙ্ঘবদ্ধভাবে ক্রিয়া করার প্রবণতা, পারস্পরিক নির্ভরতাবোধ প্রভৃতি শিশুর মানসিক সংগঠনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলি অভিব্যক্ত হয়।

শিশুর মধ্যে সামাজিক আচরণের ক্ষমতা সুপ্ত থাকে, উপযুক্তপরিবেশে তার বিকাশ ঘটে

সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, ভাবধারা, আচরণছাঁদ প্রভৃতি যে পরিমাণে শিশু আয়ত্ত করতে পারে তার উপরই শিশুর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। যে শিশু সমাজের মধ্যে লালিতপালিত হয় না, সে সামাজিক আচরণ শেখে না। বন্য বালক, নেকড়ে পালিত বালক প্রভৃতির সুপরিচিত কাহিনী এই সত্য প্রমাণ করে। কাজেই শিশুর সামাজিকীকরণ এক হিসাবে এক ধরনের শিখন-প্রক্রিয়া—কতকগুলি সামাজিক অভ্যাস গঠনের প্রচেষ্টা। শিশু প্রথমে থাকে অহং-ভাবাপন্ন (egoist) এক আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর জীব। ধীরে ধীরে সামাজিকীকরণের ফলে তার আত্মকেন্দ্রিকতা অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে সমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটে। 'আমি', 'আমার' এই ধারণা থেকে 'তুমি', 'তোমার' এই ধারণায় সে উত্তীর্ণ হতে পারে। তবে সামাজিকীকরণের (Socialisation) সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণ (Individualisation) প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। একদিকে যেমন পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে শিশুর সমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটে, তেমনি শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে এই দুটি প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া নয়। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ ও অহংবোধের

শিশুর সামাজিকীকরণ সামাজিক অভ্যাস গঠনের প্রচেষ্টা

শিশুর সামাজিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে

বিকাশ একই সঙ্গে চলতে থাকে। একদিকে শিশু যেমন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজকর্ম করতে, অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শিক্ষা করে, তেমনই অপর দিকে নিজের মতামত বা নিজের স্বার্থরক্ষা করার, অপরের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হয়।

সদ্যোজাত শিশু জন্মের পরে প্রথম কয়েক মাস অপরের প্রতি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। সামাজিক প্রভাব গ্রহণের ব্যাপারে তার মধ্যে কোন রকম সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ৫ ৬ মাস বয়স হলেই শিশু পিতামাতা ও অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তি যাদের শিশু সব সময় দেখে, তাদের প্রতি মনোযোগী হয়। শিশু তাদের দেখে হাসে, অস্ফুট শব্দ করে, তাদের শব্দ ও ভঙ্গীর অনুকরণ করে। নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। বোধ হয় এই সময় থেকেই শিশুর সামাজিক চেতনা বিকশিত হতে শুরু করে। প্রথম প্রথম শিশুর মনোযোগ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু একবছর বয়স থেকেই তার মনোযোগ অন্য শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

জন্মের ৫।৬ মাস পর থেকেই শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ

কিন্তু দুবছর আড়াই বছরের আগে শিশু অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলধূলা করতে পারে না। অর্থাৎ তিন বছর বয়সের আগে পর্যন্ত শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার ভাব এতই প্রবল থাকে যে শিশু অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কোন কাজ করতে পারে না। কাজেই আড়াই বছর না হওয়া পর্যন্ত শিশুর সামাজিক মনোভাবের যথাযথ আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় না। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর শিশুর সামাজিক আচরণের সুষ্ঠু প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সময় শিশুরা ছোট ছোট দল গড়ে এবং একই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শেখে। দলের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রবলভাবে দেখা যায়। তাছাড়াও এই সময় শিশুরা ক্লাব, বা অন্যান্য বড় বড় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়। বড় বড় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়েও অনেক সময় সেই সংগঠনের শাখাস্বরূপ কোন ছোট দলের নেতৃত্ব করার সুযোগ লাভ করে। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধেরও বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশু অনেক সময় তার পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গী নির্বাচন করে, কোন্ দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে নিজেই বিবেচনা করে, এবং বিশেষ বিশেষ খেলাধূলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আট দশ বৎসর বয়স থেকে শিশু সামাজিক চেতনার

বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিশুর সামাজিক আচরণের সুষ্ঠু প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়

বিকাশে আরও অগ্রগতি ঘটে। শিশু সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, বৃহত্তর দল গঠন করে তার নেতৃত্ব করতে ইচ্ছুক হয়, এবং গোষ্ঠী-চেতনার ধারণা তার মধ্যে জাগ্রত হয়। শিশু অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, দল সম্পর্কে মর্যাদাবোধ ও আনুগত্যবোধ তার মধ্যে দেখা দেয় এবং শিশুর আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের স্থান দখল করে সমাজের প্রতি অনুরাগ। এই সময় শিশু খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রমোদানুষ্ঠান, প্রদর্শনী, দলগত ভ্রমণ প্রভৃতি বৃহত্তর সঙ্ঘবদ্ধ কার্যে যোগদানের জন্য উৎসাহিত হয়। এর ফলে শিশুর মধ্যে দলের প্রতি আনুগত্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি, আত্মত্যাগ মমতা, পারস্পরিক প্রীতি প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলির বিকাশ ঘটে। সাধারণতঃ নয় দশ বছর বয়সে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি বা মেয়েরা ছেলেদের প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করে না। কাজেই ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে দল বাঁধে, কিন্তু যৌবনের শুরুতে ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে, এবং মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলাধূলা বা সঙ্ঘবদ্ধ কাজ করতে উৎসাহী হয়।

আট দশ বছর বয়সে সামাজিক চেতনার বিকাশে অগ্রগতি

শিশুর সামাজিকতার বিকাশের গতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রথম প্রথম শিশু নিজদল বা অন্তর্গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করে। পরে বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে অপর দলের বা বহির্গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করে। যে গোষ্ঠীর সঙ্গে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে প্রাথমিক গোষ্ঠী বলে। পরিবার হল একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী। পরিবারস্থ সভ্যদের আচরণ শিশুর সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে। সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিরা সামাজিক আচরণের যে মান শিশুর সামনে উপস্থাপিত করে, তার দ্বারা শিশুর সামাজিক আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। শিশু যেমন দেখে, তেমনই শেখে।

শিশুর সামাজিক বিকাশের মূলে একাধিক বিষয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, বয়সের পরিণতি। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। তার ফলে শিশু সেই বয়সের উপযোগী সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, উন্নত বুদ্ধি শিশুর সামাজিকীকরণকে সহজতর করে তোলে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর পক্ষে সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে না। উন্নত বুদ্ধির ছেলেমেয়েরা সহজেই তাকে আয়ত্ত করতে পারে। যারা জড়ধী তারাই এ ব্যাপারে অসুবিধা ভোগ করে। তৃতীয়তঃ, শিশুর জন্মগত প্রবণতা, মেজাজ, প্রক্ষোভ প্রভৃতির উপরও শিশুর সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। চতুর্থতঃ, সামাজিক পরিবেশের

শিশু সামাজিক বিকাশের মূলে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব

প্রভাব। যে ছেলেমেয়ে যে রকম পরিবেশে লালিত পালিত হয়, তার সামাজিক আচরণও সে রূপ হয়। সেই পরিবেশের রীতিনীতি, আচরণ, ছাঁদ, কৃষ্টি, প্রথা, শিশুব সামাজিক আচরণকে নিযন্ত্রিত করে। দুটি ভিন্ন সমাজের ছেলে, যেমন একজন রুশ দেশীয এবং একজন ভারতীয ছেলের সামাজিক আচরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য কবা যায। আবার একই সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজেব মধ্যে থেকেও ভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যে বেডে ওঠা দুটি ছেলেমেযের সামাজিক আচরণের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। পঞ্চমতঃ, সামাজিক আচরণের বিকাশ শিখনের (Learning) দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক আচরণ কে কতখানি শিখতে পারল তার উপবে সামাজিক আচরণের বিকাশ নিভর করে। আবার সামাজিক পরিবেশ, শিশুব দেহ ও মনের বিকাশ, এগুলিব উপর এই শিখন নিভর করে। ষষ্ঠতঃ, সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী শিশুব সামাজিক আচবণে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায।

শিশুব পবিবারের সামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থাও (socio economic status) সামাজিক আচরণের বিকাশকে প্রভাবিত করে। নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের কোন শিশু উচ্চবিত্তসম্পন্ন সমাজের কোন ব্যক্তির সঙ্গে স্বাভাবিক সামাজিক আচরণ কবতে সক্ষম হয় না। তার আচরণে আত্মপ্রত্যযের অভাব ও হীনমন্যতাবোধ দেখা দেয। উচ্চবিত্তসম্পন্ন সমাজের ছেলেমেযেদের সামাজিক আচরণে অনেক সময উন্নাসিকতা, আত্মম্ভরিতা, ঔদ্ধত্য, অবহেলা, অমনোযোগিতা, অমিতব্যয়িতা, আত্মমুখীতার ভাব দেখা যায়। আবার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাবলম্বিতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, বিনয, উদারতা প্রভৃতি গুণগুলির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায। তবে এর ব্যতিক্রম অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। কাজেই পরিবারের অর্থ নৈতিক অবস্থা শিশুর সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

আমাদের কতকগুলি সামাজিক সংলক্ষণ (social traits) আছে যেগুলি সামাজিকতাবাদের ভিত্তিস্বরূপ। তার মধ্যে প্রথমেই সহানুভূতির (sympathy) উল্লেখ করা চলে। অপরের দুঃখে দুঃখবোধ, অপরের সুখে সুখবোধই হল সহানুভূতি। সমাজ-জীবনের সংগঠনে সহানুভূতির স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহানুভূতির প্রবণতা নিযে সব শিশুই জন্মায়। অনুকূল পরিবেশেই সহানুভূতি বিকশিত হয়। শিশুর মধ্যে এই সহানুভূতি উদ্রেকের একান্ত প্রয়োজন। খুব শৈশবে শিশুর মধ্যে সহানুভুতির প্রকাশ তেমন লক্ষ্য করা যায় না, কারণ অভিজ্ঞতার অভাবে শিশু বুঝে উঠতে পারে না, কোন কোন অবস্থায় অপরের দুঃখে তার দুঃখ বোধ করা উচিত।

সামাজিক সংলক্ষণের স্বরূপ ও ব্যাখ্যা

কিন্তু যতই তার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে, ততই সে বুঝে উঠতে শেখে কোন্ কোন্ অবস্থায়, অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে। তখনই অপরের দুঃখের সঙ্গে সে নিজের একাত্মতা অনুভব করে। এই একাত্মতাবোধ যত প্রবল হয়, ততই সহানুভূতির মাত্রা তীব্র হয়। শিশুর মধ্যে সহানুভূতির যথাযথ বিকাশ ঘটলেই সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার সঙ্গতিবিধানের বিষয়টি সহজতর হয়। কাজেই শিশুর মধ্যে যাতে সহানুভূতি সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় সেদিকে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

সহানুভূতি

শিশুর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে এই সহানুভূতি জাগ্রত করা কঠিন। বয়স্কব্যক্তিরা যদি শিশুদের সামনে সহানুভূতিমূলক আচরণ করেন তাহলেই শিশুরা সহানুভূতি-মূলক আচরণ শিক্ষা করতে পারে। তাছাড়া সহানুভূতিবিরোধী প্রক্ষোভগুলি, যেমন নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, ক্রোধ, স্বার্থপর মনোভাব প্রভৃতি যাতে শিশুর মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় জাগ্রত না হয় সেদিক লক্ষ্য রাখা যেতে পারে।

শিশুর সামাজিকতা বিকাশের মূলে রয়েছে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আগ্রহ। ২ ৩ বছর বয়স থেকেই শিশুরা অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের গণ্ডী ব্যাপকতর হতে থাকে। অপরের সঙ্গে দৈহিক উচ্চতা, বুদ্ধি, খেলাধূলা, পড়াশোনা, শখ প্রভৃতির মিলের দিকে লক্ষ্য রেখেই শিশুরা প্রথমতঃ তাদের বন্ধু নির্বাচন করে। তবে এগুলিই সব সময় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার একমাত্র কারণ তা নয়। একই দলভুক্ত হওয়ার জন্য, একই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কোন কোন বিষয়ে সাহায্যের ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং তার উপরেই বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

বন্ধুত্ব

শিশুদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাবও শিশুদের সামাজিক চেতনা জাগিয়ে তোলে। পরিবারের মধ্যে শিশুকে পিতামাতার প্রশংসা লাভের জন্য অন্য ভাইবোনের সঙ্গে অনেক সময় প্রতিযোগিতা করতে হয়। পিতামাতাও ভাইবোনের কার্যের তুলনামূলক আলোচনা করে এই প্রতিযোগিতার ভাব জাগিয়ে তোলেন। এই প্রতিযোগিতার ভাব বিশেষ করে দেখা দেয় যখন শিশু বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার মনোভাব বেড়ে চলতে থাকে। প্রতিযোগিতা মনোভাবের দোষ গুণ উভয়ই বর্তমান। প্রতিযোগিতার মনোভাব যেমন এক দিকে শিশুর পূর্ণ কর্মশক্তিকে জাগ্রত করে তাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিশুকে উৎসাহিত করে তেমনই অপরদিকে শিশুর মনে ঈর্ষা, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি অসুস্থ

প্রতিযোগিতা

উত্তেজনা সৃষ্টি করে তার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। আবার প্রতিযোগিতায় পরাজয় অনেক সময় শিশুর মনে ব্যর্থতার গ্লানি ও আশাভঙ্গের বেদনা ও লজ্জার সৃষ্টি করে। এর ফলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার উচিত শিশুর মনে সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করা এবং শিশুর মনে পরাজয়জনিত লজ্জা বা আত্মগ্লানি না জাগে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবের পরিবর্তে সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করাই ভাল। সহযোগিতার মনোভাব শিশুদের সামাজিকতাবোধের বিকাশে সহায়ক হয়। জন্মের প্রথম দুটি বছর শিশু আত্মকেন্দ্রিক থাকে, তখন তার মনে সহযোগিতার ভাব তেমন থাকে না। এর পর তার চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে সে আগ্রহী হয়, তখন তার মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিগত সফলতার প্রশ্নই বড, সহযোগিতার ক্ষেত্রে দলগত সফলতার প্রশ্নই বড়, কাজেই শিশুর মধ্যে সুশিক্ষার সাহায্যে যদি এই সহযোগিতার ভাব জাগ্রত করা যায় তাহলে শিশুর সামাজিক চেতনা বিকাশের পক্ষে তা একান্তভাবে সহায়ক হয়। তাছাড়া প্রতিযোগিতার যা কিছু দোষক্রটি, যেমন ঈর্ষা, ঘৃণা, রেষারেষি, অসুস্থ উত্তেজনা প্রভৃতি সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে। সহযোগিতার মনোভাব পারস্পরিক প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ঐক্যের ভাব সৃষ্টি করে সমাজ জীবনকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করে।

সহযোগিতা

খুব শৈশব থেকে শিশুর মধ্যে প্রতিরোধের মনোভাব জাগ্রত হয়। শিশুর ইচ্ছার প্রকৃতি ঠিকমত বুঝে না নিয়ে, তার ইচ্ছাবিরোধী কাজ করতে গেলে, শিশুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে, তার পক্ষে কষ্টসাধ্য এমন কোন কাজ করার জন্য তাকে বাধ্য করলে, সে প্রতিরোধ করে। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে এই প্রতিরোধের ভাব কমে আসে, এবং সহযোগিতার মনোভাবই তার মনে বেশী করে জাগ্রত হয়। এর একাধিক কারণ আছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক চেতনা বাড়তে থাকে, তার বুদ্ধি ও বোধশক্তির বিকাশ ঘটে, কর্মকুশলতা বাড়ে, এবং প্রতিরোধ সৃষ্টি করে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রবণতা হ্রাস পায়। তাছাড়া সহযোগিতার মনোভাব বেশী মাত্রায় দেখা দেওয়াতে যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ না করে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করার দিকেই তার প্রবণতা থাকে বেশী।

শিশুর মধ্যে প্রতিরোধের মনোভাব

শৈশবে শিশুদের মধ্যে আক্রমণের মনোভাবও জাগ্রত হয়। ক্রোধ থেকেই এই মনোভাবের সৃষ্টি। শৈশবে ঝগড়া, মারামারি প্রভৃতির মাধ্যমে এই মনোভাবের

প্রকাশ ঘটে। কিন্তু শিশু যতই বড় হতে থাকে তখন এই আক্রমণাত্মক মনোভাব অনেকটা মার্জিত রূপ গ্রহণ করে। দৈহিক স্তর অতিক্রম করে সেটি ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে অপরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতি নীতি, আচার-আচরণের একটা ভদ্রোচিত মান তাকে অসামাজিক পথে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত করে। পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে শিশুর আক্রমণাত্মক মনোভাব অসামাজিক পথে আত্মপ্রকাশ না করে। কিছু মাত্রায় প্রতিরোধ করার ও আক্রমণাত্মক মনোভাব ব্যক্তির মধ্যে থাকা ভাল। প্রতিরোধের মনোভাব থাকলে কোন বিষয় বিনা বিচারে গ্রহণ না করে, তাকে বিচার করে দেখার প্রবণতা জাগ্রত হয়। প্রতিযোগিতামূলক আচরণে সংযত মাত্রায় আক্রমণাত্মক মনোভাব সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন।

শিশুর মধ্যে আক্রমণাত্মক মনোভাব

৭। ব্যক্তির জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর (Different stages of individual's development) : শিশু তার জন্মের সময়েই প্রকৃতিদত্ত কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে আসে। এসব সম্ভাবনার সাহায্যেই শিশু পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে এবং নিত্য নতুন আচরণ করে। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণও পরিবর্তিত হয়।

কিন্তু শিশু যে সম্ভাবনা বা প্রকৃতিদত্ত উপকরণ নিয়ে জন্মায়, সেগুলি নবজাতকের (neonate) মধ্যে অত্যন্ত অপরিণত এবং অবিকশিত। কিন্তু নবজাতকের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তার দৈহিক ও মানসিক সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হতে থাকে তার আপন গতিতে। তারপর একদিন মানবাঙ্কুর আপন সত্তার বিকশিত রূপ নিয়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। নবজাতক হয় প্রাপ্তবয়স্ক। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে এই যে বিকাশের লীলাখেলা, তার মূলে রয়েছে প্রকৃতি স্বয়ং। সে সদাব্যস্ত, অদৃশ্য ফল্গুনদীর ধারার মতো প্রতিটি মুহূর্তে চলেছে তার বিকাশ-প্রক্রিয়া। সুতরাং ব্যক্তির জীবন-বিকাশে বয়স অনুসারে কোন স্তরভেদ করা চলে না। এই বিকাশ নিরবচ্ছিন্ন, তার গতিপ্রবাহ সদা চঞ্চল। এজন্য রেমণ্ট বলেন : "বিকাশ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, তার মধ্যে কোন বিরতি নেই। যে সমস্ত মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য পর্যায়ক্রমে ব্যক্তির জীবনে উপস্থিত হয়, তারা পরিপক্কতা লাভ করেই অন্য একটি বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়।"[1]

ব্যক্তির বিকাশ নিরবচ্ছিন্ন

1. "Development is a continuous process: there are no gaps. The various physical and mental functions, as they successively appear, ripen and pass into higher functions".

সুতরাং জীবন-বিকাশের স্তরভাগকে আমরা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি না এবং বিভিন্ন পণ্ডিত এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। বিশেষভাবে কোন্ বয়সে কতটুকু বিকাশ ঘটে এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। তবুও ব্যক্তিসত্তার বিকাশের শ্রেণীবিভাগ অর্থহীন নয়। বিকাশের একটি স্তর বা অবস্থা থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হবার মধ্যে কোন ফাঁক নেই বটে তবুও ব্যক্তিকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে অন্য স্তরে পৌঁছাতে হয়। মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিসত্তার সমগ্র বিকাশকেই বোঝাবার জন্য মানুষের জীবন বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেন: যেমন, শৈশবকাল, বাল্যকাল বা কৈশোরকাল, বয়ঃসন্ধি, বয়স্ক অবস্থা ইত্যাদি। আমরা বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করেছি: শৈশব, বাল্যকাল এবং বয়ঃসন্ধি। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে শিশুর বিভিন্ন বয়সের পরিবর্তন একই ব্যক্তিসত্তার পর্যায়কালীন প্রকাশ, একটি পরিবর্তনের সঙ্গে আর একটি পরিবর্তন যুক্ত হয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং একই ব্যক্তিসত্তাকে বিকাশের চরমসীমায় নিয়ে চলে।

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে

(ক) **শৈশব (Childhood)—এক থেকে ছয় বছর:** নবজাতকের জন্মের পূর্বেই মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তার বিকাশের অনেকটা অংশ সম্পন্ন হয়ে যায়। মাতৃগর্ভেই শিশুর হৃদ্‌স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য শুরু হয় এবং তার দেহের গঠন, স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয়নিচয় সৃষ্টি হয়।

জন্মের এক বছরে নবজাতকের মধ্যে মানসিক গুণাবলীর বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির তারতম্য বিশেষ বোঝা যায় না। তবে তীব্র আলো ও শব্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এ সময় তার দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে চলে যদিও দিনে পনের থেকে বিশ ঘণ্টা সে নিদ্রাবস্থায় কাটায়। এই সময় তার স্নায়ুতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ সাধিত হয়, স্নায়ুকোষের বৃদ্ধি হয়। দেহ সঞ্চালনের দিক থেকেও শিশুর বিকাশ এই বয়সে খুব দ্রুত হারে হয়ে থাকে।

দু বছরের মধ্যেই শিশু চলাফেরা করতে শেখে, দৌড়াতে পারে—অবশ্য মাটিতে পড়ে, আবার ওঠে (Period of toddlerhood)। দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ভাষার বিকাশ শুরু হয়। প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই সে অস্পষ্ট অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ আরম্ভ করে। এক বছর বয়সে সে মা-বাবা প্রভৃতি চার-পাঁচটি শব্দ সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। এর পরেই প্রায় দেড় বৎসর বয়স থেকেই তার ভাষার বিকাশ দ্রুততর হয়। এক বছরের পরেই শিশু নানা কথা বলার চেষ্টা করে যদিও এগুলির বেশীর ভাগ শব্দ বা উচ্চারণের সমষ্টি মাত্র। ত্রুটিপূর্ণ অস্পষ্ট

শব্দোচ্চারণই এ সময়ের বৈশিষ্ট্য। তিন বছরের মধ্যেই শিশু সর্বনাম শব্দ, বিশেষভাবে 'আমি,' 'আমার' ইত্যাদি বেশ উচ্চারণ করতে পারে।

শিশু যখন মায়ের কোল ছেড়ে হাঁটতে শেখে তখন সে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। সব কাজ সে নিজে করবার চেষ্টা করে। এ সময় সে স্বহস্তে খেতে চায়, গেলাস ধরবার চেষ্টা করে, নানাপ্রকার খেলনা নিয়ে খেলতে ভালবাসে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিজিবিজি আঁকতে বসে।

তিন বছরের পরই শিশুর জীবনে আসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সংকটময় অধ্যায়। এ সময়ে যদিও সে পরিপূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না এবং তাকে পরনির্ভর থাকতে হয়, তবুও শিশু-মনে স্বাধীন হবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা সে সময়ে দেখা দেয়। কান্না-কাটির দ্বারা নানা রকম জেদ সে প্রকাশ করে। সকলের স্নেহ-ভালবাসা তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হোক, শিশু এরূপ আশা করে। তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তার প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সে অনবরত কথা বলে যায়—গোলমাল চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কোনভাবে যদি সে বুঝতে পারে যে তাকে অবহেলা করা হচ্ছে তবে তার রাগের আর সীমা থাকে না।

তিন বছরের পরেই শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি বেশ পুষ্ট হয়ে ওঠে। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ সবই শিশু-মনে তখন আবেদনের ঢেউ তোলে; সীমাহীন ব্যাকুলতা নিয়ে এ পৃথিবীকে শিশু প্রত্যক্ষ করে। প্রত্যেকটি ঘটনা তার মনে কৌতূহল সঞ্চার করে। সব কিছুকে জানবার এবং বোঝবার জন্য শিশু প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে। হ্যাডফিল্ড (*Hadfield*) বলেন যে, এই অল্প বয়সের শিশুরাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক যেভাবে প্রতিটি ঘটনা বা বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন করেন শিশুও সেভাবে 'এটা কি,' 'এটা কেন' প্রশ্ন করে যায়।

শিশুর মনে কৌতূহল

অতি শৈশবে শিশু পরনির্ভর। অত্যন্ত অসহায় সে। সে সময় তার জীবনে প্রয়োজন নিরাপত্তার এবং ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তির। এ পরনির্ভর শিশু ধীরে ধীরে দু-তিন বছরের মধ্যেই যখন চলাফেরা করতে শিখল, তখন আপন স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এটা সত্য যে শিশুকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া যায় না, তবুও তার স্বাধীনতার মনোভাবকে আমাদের সম্মান দেখান উচিত। শিশু-মনে যদি স্নেহ, ভালবাসার দ্বারা নিরাপত্তা বোধের সৃষ্টি করতে পারা না যায়, তবে পরিণত বয়সে সে শিশু নিজেকে অসহায় মনে করে। আর অন্যদিকে শিশুর মধ্যে যে স্বাধীনতার স্পৃহা দেখা দেয় তারও যথোচিত মর্যাদা দিতে হয়। তা না হলে পরিণত বয়সে শিশু-মনে আত্মপ্রতিষ্ঠার অভাব দেখা দিতে পারে, যার ফলে সে হবে দুর্বল ও অসহায় প্রকৃতির মানুষ।

শিশুর পরনির্ভরতা

শিশুর শৈশবকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে অভিহিত করার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল এই যে, এ সময়ে শিশু-মনে অহং (Ego) ভাবের উদয় হয়। শিশুর সকল ভাব, সকল চিন্তা, সকল কর্ম, সকল আচরণ এই অহংকে কেন্দ্র করেই বর্ধিত হয়। 'শিশু তখন সর্বত্র 'আমি' এই উত্তমপুরুষকে খুঁজে বেড়ায়, আত্মপ্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। শিশুর এই অহং ভাব ত্রিধারায় বর্ধিত হয়।

শিশুর মধ্যে অহং ভাবের উদয়

প্রথমতঃ, শিশু তার পরিবেশ অনুযায়ী নিজের আচরণকে পরিবর্তিত করতে শেখে যদিও এ পরিবর্তন অনেকটা তার অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হয়। অপরের আচরণের ইঙ্গিতময়তা (Suggestibility) তার আচরণকে প্রভাবিত করে। পরিবারের পরিজনদের বিশেষভাবে মাতাপিতার আচরণকে সে গ্রহণ করে। সে মা-বাবাকে অনুসরণ করেই তার আচরণকে পরিবর্তিত করে অর্থাৎ তাদের আচরণের ইঙ্গিত শিশুর চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এর পরের অবস্থায় শিশু কিছুটা সচেতন ভাবে অনুকরণ করতে শিখে। সে তার কল্পনা-মন নিয়ে বাবার টেবিলে বসে কাজ করতে ভালবাসে, মায়ের সঙ্গে সমযোগী হয়ে আচরণ অভ্যাস করার প্রয়াস পায়। তারপর তার অহংভাব অন্য পথে প্রবাহিত হয়। এ অবস্থায় শিশু গল্প শুনতে ভালবাসে—যাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাদের প্রত্যেককে সে নিখুঁতভাবে বিবেচনা করে, যাঁরা তার কাছে বীরপুরুষ তাঁদের সঙ্গে সে একাত্মবোধ (identification) করে। অর্থাৎ অহং ভাবের একটি আদর্শ (ideal) সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে। শিশুর এই অহং বোধ থেকেই তার জীবনে নানা মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। পরিবেশের প্রভাব, বিশেষ ভাবে পরিবারের প্রভাব শিশুর জীবনে বেশী। সুতরাং শিশুর জীবনে অভিপ্রেত প্রতিফলন বা তার আচরণের সার্থক পরিবর্তন করতে হলে পরিবারকে দায়িত্ব নিতে হবে। 'মাতাপিতার ও অন্যান্য পরিজনদের সংযত ও সুন্দর আচরণ, নৈতিকভাব, শিশুর জীবনে অত্যন্ত প্রভাবশালী।

চার বছর পরেই শিশুর ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা খুব বৃদ্ধি পায়। ভাষার উপরেও তার বেশ অধিকার দেখা দেয়। এ সময়ে শিশুর জীবনে বুদ্ধির বিকাশ হয় কিনা এ নিয়ে মতানৈক্য বর্তমান। রুশো বলেছেন, এ সময়ে আমরা যেন শিশুকে বেশী কথা বলতে না দেই। কারণ শিশু বেশী কথা বললে তার চিন্তাশক্তির বিকাশ ব্যাহত হবে। কিন্তু ভাষাও যে চিন্তার বাহন এবং চিন্তা ও ভাষার মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক বর্তমান, এ মনস্তাত্ত্বিক সত্যটি সম্ভবতঃ রুশোর জানা ছিল না। অনেকে বলেন, এ সময়ে

শিশু-মনে যুক্তিপূর্ণ কোন চিন্তার বিকাশ ঘটে না, অমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করতেও সে পারে না। মনোবিজ্ঞানী পিয়াজ (*Piaget*) বলেন, শিশু এ সময় ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক (ego-centric), তার সকল আচরণে তার অহং বোধের প্রতিফলন। এর মধ্যে চিন্তার কোন স্পর্শ নেই, সবই আবেগজনিত। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী সুজান আইজ্যাক্স (*Susan Isaacs*) বলেন, শিশুর চিন্তাকে বয়স্কদের চিন্তনপ্রণালী দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বয়স্কদের চিন্তায় বিমূর্ত ধারণা (abstract idea) বর্তমান, কিন্তু শিশুর চিন্তায় অহংভাবই প্রধান। এ অহংভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সে কল্পনা করে জড় বস্তু নিয়ে তার পরিবেশের সকল বস্তুতেই প্রাণ বর্তমান। তার খেলনা থেকে শুরু করে আশেপাশের সব কিছুই প্রাণবন্ত। শিশুর এ মানসিক বৈশিষ্ট্যকে সর্বপ্রাণবাদ (animism) বলা হয়। কিন্তু আইজ্যাক্স এবং অন্যান্যরা মনে করেন, শিশুর চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধির বিকাশ এ সময়েই শুরু হয়। তার চিন্তা প্রতীকধর্মী, কল্পনাধর্মী। অলীক কল্পনা এবং দিবাস্বপ্নই শিশুর চিন্তার প্রধান আশ্রয়। শিশুর জীবনের এই স্তরে প্রাক্ষোভিক বিকাশও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিবারকে ছাড়িয়ে তার স্নেহ-ভালবাসা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তার সঙ্গী-সাথীদের প্রতি, অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ভালবাসা দেখা দেয়। তাছাড়া উদ্বেগ, লজ্জা, ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতি মনোভাবের বিকাশ ঘটে। শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াও দ্রুত সম্পন্ন হয়। শিশু অল্পতেই ক্রুদ্ধ হয়, আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্রোধ অপসৃত হয়। এই স্তরে সঙ্গে-সঙ্গে মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে শিশুর রস গঠন শুরু হয়।

শিশুর চিন্তায় সর্ব-প্রাণবাদ

এ সময়ে শিশুর মধ্যে সমাজ-চেতনা ও সামাজিক বুদ্ধির বিকাশ লক্ষণীয়। শিশু ধীরে ধীরে আত্ম-পর ভাবতে শেখে। অন্যের প্রতি সে হিংসা ও বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু এ সময়ে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা তার মধ্যে দেখা দেয়। শিশু যখন কাউকে আপন করে নিচ্ছে বা কারো প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছে তখন তার মধ্যে সমাজ-চেতনার বিকাশই হচ্ছে। যখন সে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয় তখন তার আত্মবোধের বিস্তার ঘটে, অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে সে তার আত্মীয়তা খোঁজে। সহযোগিতা, সহানুভূতি প্রভৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যও তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আবার বিবাদ, প্রতিযোগিতামূলক আচরণও এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়।

শিশুর মধ্যে সমাজ-চেতনা

এ সময়ে শিশু খেলাধুলায় মত্ত থাকতে ভালবাসে। শিশুরা যে কেন খেলে, এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। কিন্তু শিশুরা যে খেলে এটাই সত্য কথা। শিশুর কাজ

মানে তার খেলা। এই খেলাই তাদের সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। এই স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের মধ্যেই শিশুর কল্পনা বিস্তার ঘটে, সে তার মানসিক সমস্যার সমাধান করে এবং দেহ মনের ভারসাম্য বজায় রাখে। এজন্য কাল্ড-ওয়েল কুক (*Caldwell Cook*) শিশুর শিক্ষায় ক্রীড়া-ভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন এবং আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় এ নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া-ভিত্তিক শিক্ষা

শৈশবেই শিশুর মনে যৌন ভাব দেখা দেয়। আমাদের প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে বিশ্বাস করা হত যে শিশু-মনে কোন যৌনভাবের স্পর্শ নেই। কিন্তু আধুনিক ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ফ্রয়েড বলেন, পরিণত মানুষের যৌনতা (sexuality) এবং শিশুর যৌনভাবের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। পরিণত মানুষের যৌনতা বলতে বুঝি প্রজনন ক্ষমতা (reproduction) এবং এই ক্ষমতা বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আসক্তিতে তৃপ্তি খোঁজে। কিন্তু শিশুর যৌনবোধ তার নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করেই তৃপ্তি খোঁজে। একে ফ্রয়েড স্বরতিমূলক (Autoerotic) যৌনতা বলেছেন। আঙুল চোষা, কোন কিছু কামড়ান এবং নানা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে সে যৌন তৃপ্তি পায়। নিজের দেহের মধ্যে যৌন উত্তেজক কেন্দ্রের মাধ্যমে তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। ধীরে ধীরে এই যৌনতা তার নিজের দেহ থেকে দেহান্তরে বিস্তার লাভ করে। এ সময় পুরুষ-শিশু তার মাকে বেশী ভালবাসে, মেয়ে-শিশু ভালবাসে তার বাবাকে। মার প্রতি যে আসক্তি তাকে কেন্দ্র করে বাবার সঙ্গে পুরুষ-শিশুর, আর বাবার প্রতি যে আসক্তি তাকে কেন্দ্র করে মায়ের প্রতি মেয়ে-শিশুর একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে ওঠে। এই যৌনমূলক ভাবকে ফ্রয়েড বলেছেন, ইডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex)। ফ্রয়েডের মতে এ ধরনের যৌনভাব শিশুদের জীবনে সাত-আট বছর পর্যন্ত থাকে, তারপর এটা বিলীন হয়ে যায়। একে তিনি বলেছেন, যৌনতার সুষুপ্তিকাল (Latent Period)। যৌবন আগমনের সাথে সাথেই পরিণত বয়সের যৌন আচরণ স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে।

শিশুর মনে যৌন ভাব

মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, শিশুর জীবনে এই যৌনবোধ (libido) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মাতার প্রতি যৌনাকর্ষণ থেকেই শিশুর মনে এক ভয় মিশ্রিত আনুগত্য দেখা দেয়। ধীরে ধীরে এ আনুগত্যই ব্যক্তির জীবনে নীতিবোধ, বিবেকবোধ এবং সামাজিকবোধে রূপান্তরিত হয়।

শিশুর জীবনের এ বিচিত্র বিকাশ ধারা সম্বন্ধে আমরা প্রাচীনকালে বিশেষ অবহিত ছিলাম না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশোই সর্বপ্রথম মানব-বিকাশের স্তর সম্বন্ধে তাঁর 'এমিল' গ্রন্থে আলোচনা করেন। রুশোই সর্বপ্রথম এ সত্যটিকে অনুধাবন করেছিলেন যে শিশুর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে যে বিচিত্র আচরণ আবির্ভূত হয় এগুলি শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক এবং তার জীবনে মূল্যহীন নয়। তাছাড়া শিশুর বিকাশ-প্রক্রিযাব বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় আছে। বিভিন্ন স্তরের গতিপ্রকৃতি অনুযাযী শিশুর শিক্ষাধারা ও পবিবেশ নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। জীবনেব পরিণত স্তব হল শৈশব বা কৈশোবের পরিসমাপ্তি বা পূর্ণতা। সুতরাং জীবনের বিভিন্ন স্তরকে ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক বিকাশের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে।

রুশোর এমিল গ্রন্থে মানব বিকাশের স্তবেব আলোচনা

শিক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করে শৈশবকালকে প্রাক্-বিদ্যালয় স্তর (Pre-school stage) নামে অভিহিত কবা যেতে পারে। শিশুর জীবন বিকাশেব এই স্তবে শিক্ষাব গুরুত্বকে উপেক্ষা করা চলে না। দৈহিক বিকাশের ফলে শিশুব মধ্যে যে অভ্যাস গঠিত হয়, পিতামাতাব লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে শিশুব মধ্যে কোন কু-অভ্যাস গডে না ওঠে। তাহার বিকাশের সময় যাতে শিশুর উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়। শিশুর কল্পনা, কৌতূহল ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ যাতে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হয়, শিশুর সামাজিক বিকাশ যাতে সুষ্ঠুভাবে ঘটে, এইসব বিষয়ের প্রতি পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। মোট কথা শিশুব জীবনের কাঠামো তার শৈশবেই রচিত হয়। আমাদের দেখা উচিত শিশু যেন পরিবার, পরিবেশ বা বিদ্যালয়ে তার বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করতে পারে এবং একটি সুসংহত ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী হয়।

শৈশবের শিক্ষাব গুরুত্ব

প্রাক্-প্রাথমিক ঃ কিছু কিছু বিদ্যালয় আছে, যেখানে এই বয়সের শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। নার্শারী বা কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয়গুলির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সব বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের কৌতূহল প্রবৃত্তিকে বিকশিত করার, ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সজাগ করার এবং দলগত ক্রীড়ার মাধ্যমে শিক্ষার সামাজিক বিকাশের জন্য এইসব বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

(খ) বাল্যকাল (Boyhood)—ছয় থেকে বার বছর ঃ শৈশবে শিশু-চরিত্রে যে উদ্দামশীলতা এবং চঞ্চলতা লক্ষ্য করা যায় বাল্যকালে তা মোটামুটি একটি সংহত রূপ ধারণ করে। দৈহিক, মানসিক, বিশেষভাবে আবেগ ও প্রক্ষোভগত

দিক থেকে শৈশব এক সংকটপূর্ণ অবস্থা। নবজাতকের জীবন-বিকাশে শৈশব দেহ মনে পরিবর্তনের বন্যা নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু সাত-আট বছরের একটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে জীবনবন্যার কোন তাণ্ডব স্রোত লক্ষ্য করা যায় না। তার আচরণকে লক্ষ্য করলে মনে হয় বিকাশের স্রোত যেন তার দু কূলের গণ্ডীর বাঁধ মেনে চল্‌ছে। তার মধ্যে অস্থিরতা নেই, সে যেন স্থিতধী। পরিণত জীবনে ব্যক্তির আচরণমূলক অনেক সাদৃশ্য বাল্যকালে লক্ষ্য করে আর্নেস্ট জোন্স (Ernest Jones) বাল্যকালকে প্রাপ্তবয়সের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পুনরাবর্তন (Regression) মতবাদ অনুযায়ী জোন্স প্রাপ্তবয়সকে (Adulthood) বাল্যকালের পুনরাবৃত্তি বলে ঘোষণা করেছেন। মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, 'শিশুর শৈশবে যৌনভাবের যে লীলাখেলা প্রবল হয়ে দেখা দেয় বাল্যকালে তা ঘুমিয়ে থাকে। শিশু নিজ লিঙ্গ (Sex organ) সম্বন্ধে সচেতন হয় বটে কিন্তু কোন যৌন আকর্ষণ শিশুর মধ্যে দেখা যায় না।

প্রাপ্তবয়স বাল্যকালের পুনরাবৃত্তি

জীবন বিকাশের এই স্তরে দৈহিক বিকাশের হার আগের তুলনায় অনেক কমে যায়। তবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দৈহিক বিকাশ অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। ছেলেমেয়েদের দেহসঞ্চালনের ক্ষমতা, যেমন দৌড়নোর, লাফানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

মানসিক বিকাশের দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হয়। তাদের ভাষাগত উন্নতি আগের তুলনায় অনেক বেড়ে যায়। নতুন নতুন শব্দ সংযোজনে তাদের শব্দ ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাদের স্মৃতিশক্তিও খুব প্রখর হয়। বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারণাও অনেক বেড়ে যায়।

প্রক্ষোভমূলক জীবনের বিকাশও এই স্তরে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আনন্দ উচ্ছলতা বেশী পরিমাণে দেখা দিলেও, আগেকার ভয়, রাগ একেবারে থাকে না, একথা ঠিক নয়। শিশুসুলভ ভীতির পরিবর্তে বাস্তব ঘটনার পরিবেশ প্রসূত ভীতির ভাব তার মধ্যে জাগে। সে ভাইবোন বা সহপাঠীদের প্রতি ঈর্ষা বোধ করে। পিতামাতার প্রতিও প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

বাল্যকালকে শিশুর সমাজ-চেতনা এবং বুদ্ধি-বিকাশের কাল বলে অভিহিত করা হয়। পিয়াজের মতে শিশুর সমাজ-চেতনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। 'শৈশবে শিশু প্রধানতঃ আত্মকেন্দ্রিক, তার অহং এত প্রচণ্ড যে অন্যকে নিয়ে ভাববার তার সময় নেই। কিন্তু সাত-আট বছর বয়স থেকেই শিশু অন্যের প্রতিও মনোযোগী হয়ে ওঠে, তাদের মতামতের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা

করে। তার মন তখন অনেকটা সমাজ-মণ্ডিত (Socialised)। বন্ধুপ্রীতি, দলগঠনের আকাঙ্ক্ষা তাকে অনেকটা সামাজিক করে তোলে। অপরের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর তার শ্রদ্ধা এত বেড়ে যায় যে, সময় সময় শিশু পিতামাতা বা শিক্ষকের মতামতের চেয়ে বন্ধু-বান্ধব বা দলের সহযোগীর মতামতকে বেশী মূল্য দেয়। দলবদ্ধভাবে খেলাধুলা করার প্রবণতা এই বয়সে খুব প্রবলভাবে দেখা দেয়। শিশু দলের নেতার নির্দেশ মেনে চলতে চায়। আবার প্রয়োজন বোধ করলে এক দল ছেড়ে অন্য দলেও সে চলে যায়। এই বয়সে ছেলেমেয়েদের অনেক আচরণই তাদের দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্য এ বয়সকে দল গড়বার বয়স (gang age) বলা হয়। ম্যাকডুগ্যাল এই দল-প্রীতিকেই যৌথ-প্রবৃত্তি (gregarious instinct) বলে অভিহিত করেছেন। পারিবারিক গণ্ডীর সীমাকে অতিক্রম করে শিশু-মন তখন বাইরের জগতে ব্যাপ্ত হতে চায়। সে তখন সামাজিক আচার-আচরণ অনুকরণ করে। সে তখন বুঝতে পারে তার খেয়ালখুশীমত তার কাল্পনিক ইচ্ছা নিয়ে চলা যায় না। তাই সমাজের রীতিনীতি, অনুশাসন ও শৃঙ্খলা সে মেনে নেবার চেষ্টা করে। সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহানুভূতি প্রভৃতি সামাজিক প্রবণতা এই বয়সে লক্ষ্য করা যায়।

বাল্যকাল দল গড়ার বয়স

শৈশবে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ মূর্ত কোন বস্তুর মাধ্যমেই ঘটে থাকে। তার বুদ্ধি তখন থাকে কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত এবং আবেগধর্মী। কিন্তু বাল্যকালে শিশু যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তার স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ দেবার ক্ষমতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। কোন বস্তুকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে জন্মায়। অমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা এই বাল্যকালেই দেখা দেয়, কিন্তু ঠিক পরিণত মানুষের মতো যুক্তিপূর্ণ নয়। অর্থাৎ পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে বাল্যকালে শিশু কোন প্রতীক বা প্রতিরূপের (image) সাহায্যেই বেশী চিন্তা করে।

বাল্যকালে প্রতিরূপের সাহায্যে চিন্তা

বাল্যকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এ বয়সে শিশুর মন সঞ্চয়ী হয়ে ওঠে। সে সবকিছুই সংগ্রহ করে রাখার চেষ্টা করে। একে অনেকে শিশুর মালিকানাবোধের (Sense of proprietory) জাগরণ বলেছেন। সুজান আইজ্যাক্স বলেন: এ বয়সে শিশু তার নিজের ডেস্ক বইপত্র ইত্যাদির জন্য বেশ গর্ব বোধ করে। শিশুর মালিকানা বোধের জাগরণ শিক্ষার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য খুব সহায়ক। অর্থাৎ শিশুর মালিকানাবোধ অতৃপ্ত থাকলে বা অনাদৃত হলে তার মনের মধ্যে

শিশুর মালিকানা বোধের জাগরণ

ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আর অবদমিত এই ক্ষোভ চৌর্যবৃত্তি, অপরের সম্পত্তির প্রতি প্রতিহিংসা প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

এ সময়ে শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তার মনের সৃজনশীলতা। নতুন কিছু সৃষ্টি করার এক প্রবল তাড়না শিশু অনুভব করে। সে দল গঠন করে, কাঠের, মাটির নানা দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে। খেলাধুলা এবং সকলপ্রকার গঠনমূলক কাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত এবং জাহির করার প্রয়াস পায়। এজন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী এ সময়কে প্রভুত্ব এবং সংগঠনের বয়স (the age of mastery and achievements) বা জীবনের প্রস্তুতির স্তর (Prepration Stage) বলে বর্ণনা করেছেন।

শিশু মনের সৃজনশীলতা

বাল্যকালে যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার শুরু, সেহেতু শিক্ষাগত দিক থেকে জীবন বিকাশের এই স্তরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিশুর জ্ঞান ও মানসিক বিকাশ যদি যথাযথভাবে না হয়, জ্ঞান অর্জনের জন্য সমধিক আগ্রহ তার মধ্যে না জাগে তাহলে পরবর্তী কালের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বাল্যকালের মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিশুর জীবনে পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষাসূচী নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। শিশুর মধ্যে যাতে সমাজ-চেতনা বাস্তবরূপ পেতে পারে এজন্য তাকে সমবেত কর্মানুষ্ঠানের সুযোগ দিতে হবে। শিশুরা এ সময় অনুকরণ করতে এবং দুঃসাহসিকতাপূর্ণ রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে। সুতরাং শিশু যাতে অসঙ্গত আচরণ অনুকরণ না করে, সমাজ-বিরোধী ও নীতিবিরোধী রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়ে কুসঙ্গে মিশে বাজে আড্ডা না দেয়, কু-অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে না ওঠে এ সম্বন্ধে সমাজ ও শিক্ষক, অভিভাবক সকলের দায়িত্ব রয়েছে। এই সময় শিশুর পড়ার আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক শিশুর মধ্যে পড়ার অভ্যাস গঠনে সচেষ্ট হবেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যে প্রবণতা দেখা দেয় এই বয়সে, শিক্ষক তাকেও কাজে লাগাবেন। নানা সৃজনমূলক কাজের ব্যবস্থা করে শিক্ষক তার সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষাকেও চরিতার্থ করতে প্রয়াসী হবেন।

বাল্যকালে মাধ্যমিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিশুর জীবনে করণীয় বিষয়

শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশকে সঠিক পথে চালনা করতে হবে। শিশু যাতে ক্রোধ, ভয়, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলির প্রকাশকে সাধ্যমত সংযত করে, শিক্ষককে সেদিকে নজর দিতে হবে। শিশুর দলে মনের প্রবণতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে কোন সমাজবিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সে অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত না হয়। সহানুভূতি, সহযোগিতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি যাতে কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ

পায় সে দিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সময় শিশুকে গঠনধর্মী কাজে প্রচুর উৎসাহ দিতে হয়। সাজ-পোশাক পরে নিজেকে তারা জাহির করতে চায়। সুতরাং এদের এমন সব কাজের সুযোগ দিতে হবে যাতে তাদের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এ সময় বিদ্যালয়ে সঙ্গীত আসর বা নাচ-গান, বাজনা, অভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন। খেলাধুলা, সমাজসেবা, এন. সি. সি. প্রভৃতি গঠনমূলক ও শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে শিশুকে সদা ব্যস্ত রাখা চাই। শিশুর সঞ্চয়ী মনকেও অবহেলা করতে নেই। এ সময়ে শিশুকে দেশ বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে, দেশপ্রেমিক নেতাদের ছবি সংগ্রহ করতে, ফুলের বাগানে নানাজাতের ফুলগাছ সংগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন সংগ্রহণমূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। আসল কথা, নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর সঙ্গে সহপাঠ্য সূচীর প্রবর্তন এ সময়ে খুব প্রয়োজন। এই বয়সে শিশুরা শিক্ষকের জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই শিক্ষকের উচিত হবে নিজের আচরণের মাধ্যমে আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে শিশুর সামনে তুলে ধরা, অবশ্য শিশুর উপযুক্ত চরিত্র গঠনের জন্য আদর্শ মহাপুরুষের জীবনের সৎ বৈশিষ্ট্যগুলিও তার সামনে উপস্থাপিত করতে হবে।

(গ) **বয়ঃসন্ধি (Adolescence)[1]—বার থেকে আঠারো বছর :** শিশু-জীবন-বিকাশে বাল্য এবং যৌবনের মধ্যবর্তী দ্রুত পরিবর্তন কালকে আমরা বয়ঃসন্ধি কাল (Adolescence) বলে থাকি। ইহা একটি দৈহিক ও মানসিক বিকাশের বিচিত্র পরিবর্তনের কাল। বাল্যকাল থেকে যৌবনে অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়স্কের স্তর থেকে প্রাপ্তবয়স্কের স্তরে উন্নীত হওয়ার কালই বয়ঃসন্ধি। শিশুর দেহে এবং মনে তখন অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। এর ফলে সে নতুন করে তার জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে, অনেক মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, সময় সময় মানসিক ভারসাম্য (mental equilibrium) হারিয়ে ফেলে। [2]ডরোথি রোজার্স (Dorothy Rogers) মনে করে যে বয়ঃসন্ধিকাল যে জীবনের এমন একটা সময় যখন সমাজ ব্যক্তিকে শিশু হিসেবেও গণ্য করে না, আবার পরিপূর্ণ বয়স্কের মর্যাদা, ভূমিকা বা ক্রিয়াও তার ক্ষেত্রে আরোপ করে না। এখন আমরা বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন আলোচনা করছি :

বয়ঃসন্ধির প্রকৃতি

1. ইংরাজী 'adolescence' কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'adolescene' থেকে যার অর্থ হল পরিপক্কতার পথে বিকাশ (To grow into maturity).

2. Adolescence...is the period in his life when society ceases to regard a person as a child but does not yet accurd his full adult status, role and function. *D. Rogers* : The Psychology of Adolescence.

(i) বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক পরিবর্তন (Physiological Characteristics of Adolescence) : (ক) বয়ঃসন্ধিকালে দেহের সর্বাঙ্গে নানা পরিবর্তন উপস্থিত হয়। শরীরের মাংসপেশী, হাড়, গ্রন্থি, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। শরীরের ওজন ও দৈর্ঘ্যের হার বৃদ্ধি পায়। তবে শরীরের দৈর্ঘ্য ও ওজন সমান অনুপাতে বাড়ে না। তাছাড়া ছেলে ও মেয়েদেব মধ্যে এই দৈহিক বৃদ্ধির হাব সমান নয়। মেয়েরা প্রথম দিকে ছেলেদের চাইতে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সের পরই সাধারণতঃ ছেলেরা মেয়েদের চাইতে অধিক দীর্ঘ ও সবল হয়ে ওঠে। যৌবনাগমণের পর এ বৃদ্ধিব হার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে এবং একটি স্তবে এসে দৈহিক বৃদ্ধিব অর্থাৎ উচ্চতা থেমে যায়। (খ) বয়ঃসন্ধিকালে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও পাকস্থলীর ক্রিয়াব ক্ষমতা ও গতি বৃদ্ধি পায়। তার ফলে ছেলেমেয়েদেব ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। (গ) বয়ঃসন্ধিকালেব একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল দেহাকৃতির—বিশেষভাবে মুখমণ্ডলেব পবিবতন। এ সময়ে ছেলেদের মুখেব উপর একটা কাঠিন্যের ছাপ পড়ে। দেহের অন্যান্য অংশের মতো মুখের মাংসও দৃঢ় এবং উজ্জ্বল হয়। আর মেয়েদের মুখ কোমল, লাবণ্যময় এবং গোলগাল হয়ে ওঠে। (ঘ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদেব গলাব স্ববেবও পবিবতন হয়। এ সময়ের ছেলেদেব স্ববনালী দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় এবং তাদেব গলার স্বর কর্কশ ও ভারী হয়। মেয়েদের এ রকম উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন না হলেও তাদের স্বর অনেকটা তীক্ষ্ণ এবং মিহি হয়। (ঙ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদেব দেহে বোম বৃদ্ধি পায় এবং ছেলেমেয়েদেব শরীরেব বিশেষ বিশেষ স্থানে কেশোদ্গম হয়। বিশেষ কবে ছেলেদের এ সময় দাড়ি গোঁফ গজায়। (চ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদেব বনক্ষবা গ্রন্থির পরিবতন হয়। এ পরিবতনেব ফলে দেহের যৌন হরমোন নিঃসৃত হয় এবং যৌন অংশের ও দেহের পবিবতন লক্ষিত হয়। (ছ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদেব যৌন-অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে। ফলে শিশুর জীবনে যৌনপরিণতি (Puberty) দেখা দেয়। যৌনপরিণতি বা যৌবনাগম বলতে ছেলেদের বেলা বীর্যোৎপাদন ক্ষমতা এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি বা প্রথম ঋতু হওয়া বোঝায়।

(ii) বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন (Mental Changes in Adolescence) : (ক) বয়ঃসন্ধি কালকেই অনেকে বুদ্ধির চবম বিকাশের কাল বলে অভিহিত কবেন। তবে এ সম্বন্ধে সকল মনোবিজ্ঞানী এক মত নন। কেউ কেউ ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতি অবলম্বন কবে বলেন যে, বুদ্ধি-বিকাশের ক্ষেত্রে গতি ও প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বিদ্যমান। দৈহিক বিকাশের উপব বুদ্ধির কোন কার্যকারণ

সম্পর্ক নেই। অনেক সময় দুর্বল দেহধারী ব্যক্তিও প্রতিভার অধিকারী হয়, আবার অনেক সময় সুস্থ ও পূর্ণ বিকশিত দেহধারী ব্যক্তির মধ্যেও বুদ্ধি-বিকাশের অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, বুদ্ধি-বিকাশের একটি চরম সীমা আছে। বড় জোর আঠার বৎসর পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকাল এগার-বার বছর থেকে শুরু হয়ে কুড়ি-একুশ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে পারে।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল, বয়ঃসন্ধিকাল বুদ্ধির চরম বিকাশের কাল না হলেও এ সময় যে বুদ্ধি-বিকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বয়সেই শিশু-মনে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও আগ্রহ দেখা দেয়। ফলে স্মৃতিশক্তি, মনঃসংযোগ করা ও গ্রহণ-ক্ষমতা, ভাষার উপর দখল ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় এবং বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। ছেলেমেয়েরা এই সময় বস্তুর তাৎপর্য বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তার করতে শেখে এবং বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা করতে সক্ষম হয়। এই সময় তারা সব বস্তুর প্রতি আগ্রহ না দেখিয়ে বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও এই বয়সে পরিলক্ষিত হয়।

(খ) বয়ঃসন্ধিকালের প্রধান মানসিক পরিবর্তন লক্ষিত হয় ব্যক্তির অনুভূতির রাজ্যে। দেহের পরিবর্তন, ইন্দ্রিয়শক্তির পূর্ণতালাভ এবং যৌন-পরিণতি এ সময় মানসিক স্তরে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। বয়ঃসন্ধিকালের এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে হলিংওয়ার্থ (*Hollingworth*) বলেন, এ বয়সে ব্যক্তি নানা কৌতূহল, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার তাড়না অনুভব করে সকল কাজে সাহস ও বীরত্ব দেখায় এবং গুরুজনদের বিরক্তিকর শাসনের প্রতি কিছুটা অবজ্ঞা দেখায়। জীবন বিকাশের এই স্তরে কিশোরদের প্রক্ষোভমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সে কখনও আনন্দে মাতোয়ারা, আবার কখনও বা বিমর্ষ, কোথায় ভারাক্রান্ত। এই স্তরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতা ভাব (inferiority Complex) দেখা দেয়। কখনও তার মধ্যে আক্রমণাত্মকভাব দেখা দেয়। আবার কখনও খুবই মনমরা হতাশ ভাব। সতেরো-আঠারো বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নৈতিক সেন্টিমেন্টের বিকাশও এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে প্রক্ষোভের প্রকাশে ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ একটু অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে।

বয়ঃসন্ধিকালে প্রাক্ষোভিক বৈশিষ্ট্য

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়ের আত্মসচেতনতা প্রবল আকার ধারণ করে। তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সে সদা জাগরুক। আত্মসম্মানবোধ এত প্রচণ্ড যে, সে সকল ব্যাপারেই নিজের প্রাধান্য এবং স্বকীয়তা বজায় রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে চলাফেরা, কথাবার্তা, মেলামেশা প্রভৃতি আচরণে ব্যক্তি তার

বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করার জন্য ব্যগ্র হয়। মনোবিজ্ঞানী রস (Ross)[1] এই স্তরের মানসিক বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে এই বয়সে কল্পনা বিলাস মিলিয়ে যায়। সে বাস্তবের মুখোমুখী হয় (fantasies fade and reality is faced)। আঠার বছরের একজন যুবক একজন পরিপূর্ণ মানুষ ; জীবনের ব্যবহারিক সমস্যা নিয়ে সে ব্যস্ত। সে তার এই সব সমস্যার জ্ঞান এবং নিজের ব্যবহারিক কর্মকুশলতার জন্য গঠিত।

অনুভূতির দিক থেকে ব্যক্তি তখন ভাবালু, আবেগপ্রবণ এবং কল্পনাবিলাসী হয়। সে এ সময়ে নানা আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং মনে মনে কোন বীরের আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ কিনা এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বীরপূজার (hero worship) প্রবণতা দেখা দেয়। ষোল থেকে সতের বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুর মানসিক বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণ হয় ; বৌদ্ধিক কাজ করার ক্ষমতা প্রায় প্রাপ্ত বয়স্কদের মত হয়। বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। যে কোন আদর্শে জীবন বলি দেওয়ার জন্য সে উদ্যত হয়।

এ সময়ে ব্যক্তির সামাজিক চেতনার বিকাশও লক্ষণীয়। বহির্বিশ্বের প্রতি সমাজের প্রতি ব্যক্তির তখন প্রবল আকর্ষণ। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি প্রবণতা লক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে মানবতাবোধ দেখা যায়। সমাজের অনুশাসন, শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাকে সঙ্গতিসাধন করতে হয়। কিন্তু এ সঙ্গতিসাধন সহজভাবে তাব জীবনে চলে না। সে তখন নিয়ম লঙ্ঘন করার, প্রচলিত অনুশাসনকে অপসারিত করাব, তার নিজস্ব আদর্শ ও নীতিবোধ অনুসারে সমাজের নতুন কাঠামো সৃষ্টি করার প্রবণতা প্রদর্শন করে। এজন্য বাউলি (*Bowley*) বলেন, বয়ঃসন্ধিকালের তরুণদের সঙ্গে বাস করা খুব কঠিন ব্যাপার। তারা চিন্তাশীল ; তবে খুব আবেগপ্রবণ। অন্যের ত্রুটি ধরতে ব্যগ্র এবং বাক্‌পটু।

বয়ঃসন্ধিকালে সামাজিক বৈশিষ্ট্য

শিশুর যৌন-পরিণতি তাব অনুভূতি ও প্রক্ষোভের মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময়ে ব্যক্তির যৌন-চেতনা তার আবেগ ও আচরণে অভাবনীয় পরিবর্তন আনে। একথা উল্লেখযোগ্য যে যৌন-চেতনা বয়ঃসন্ধিতেই জেগে ওঠে না। মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, ব্যক্তির শৈশবেই যৌন-চেতনা থাকে তবে তা স্বরতিমূলক। শিশু নিজের দেহকে আশ্রয় করেই প্রধানতঃ যৌন-আনন্দ লাভ করে। বাল্যকালে শিশুর এ যৌনভাব স্তিমিত থাকে এবং শিশুর আকর্ষণ প্রধানতঃ সমলিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির

বয়ঃসন্ধিকালে যৌন-চেতনা

1. G. E. Ross: Groundwork of Educational Psychology.

মধ্যেই নিহিত থাকে। অর্থাৎ ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে মেশে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তারা আকর্ষণ অনুভব করে। অর্থাৎ ছেলেরা মেয়েদের প্রতি, মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এ সময়ে ছেলেমেয়েরা দিবাস্বপ্নে বিভোর। বাস্তবে যা সম্ভব হয়নি তার পরিতৃপ্তি সে দিবাস্বপ্নে লাভ করে। স্বপ্নেই আত্মগৌরবের অধিকারী হয়, তার বাঞ্ছিত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে সে লাভ করে। শিশু-মনে যৌন-পরিণতি বহুমুখী চাহিদা নিয়ে উপস্থিত হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার, কোন কিছু সৃষ্টি করার, সবকাজে দক্ষতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করার, প্রশংসা অজন করার একটা তীব্র তাড়না সে অনুভব করে। নানা সক্রিয় কাজের মধ্যে সে একদিকে যেমন গভীর আনন্দলাভ করে তেমনি অন্যদিকে সে মনে করে তার পরিবার, সমাজ তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান বা মর্যাদা প্রদান করছে না। এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকেই তার মনে অনেক সময় হীনমন্যতার ভাব জেগে ওঠে।

বয়ঃসন্ধিকালের যৌন-চেতনা ব্যক্তির দেহমনে এক পুলক সঞ্চার করে। অহেতুক কথাবার্তায়, সামাজিক মেলামেশায় সে এক অনাস্বাদিত আনন্দের সন্ধান পায়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এ সময়ে সত্যিকার কোন যৌন-চাহিদা দেখা যায় না। যৌন-কৌতূহলই তখন প্রধান, সে তখন প্রেম বা প্রণয়মূলক ব্যাপারকেই মূল্য দেয়, দৈহিক যৌন-পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হয় না।

(iii) বয়ঃসন্ধি যৌবনের পুনরাবৃত্তি (Adolescence is a recapitulation of Childhood) : আর্নেস্ট জোন্স পুনরাবর্তনবাদ (Theory of recapitulation) অনুসরণ করে বলেন, বয়ঃসন্ধি শৈশবের পুনরাবৃত্তি মাত্র। শৈশবে শিশুর দেহ যেভাবে দ্রুত বৃদ্ধি হয়, তার মানসিক জগতে যেভাবে নানা আলোড়ন এসে উপস্থিত হয়, এসব কিছুর সাদৃশ্য তিনি বয়ঃসন্ধিকালে খুঁজে পেয়েছেন। শৈশবে শিশুর দেহ ও মনে যে উদ্দাম গতি লক্ষ্য করা যায়, বয়ঃসন্ধিকালে যেন তারই পুনরাবির্ভাব ঘটে। শৈশবের ভাবপ্রবণতা, কল্পনা, যৌন-আচরণ ইত্যাদি শিশুর জীবনে যে মানসিক অসংগতির সৃষ্টি করে, বাল্যকালে তা স্তিমিত হয়ে যায়। বাল্যকালে প্রাপ্তবয়স্কদের মতো শিশুর জীবনে স্থৈর্য এবং ভাব-সংহতি দেখা দেয়। পরিবেশের সঙ্গে সে সংগতি সাধন করে নেয়, কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে শিশুর দেহে এবং মনে আবার শৈশবের দৈহিক ও মানসিক পরিণতি দেখা যায়। যে পরিবেশের সঙ্গে সংগতিস্থাপন করে শিশু তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, আকস্মিক পরিবর্তনে, পরিবেশের সঙ্গে তার আবার শৈশবের মতো বিরোধ উপস্থিত হয়। তাকে আবার নতুন করে আচরণ ও

পরিবেশের সঙ্গে সংগতিসাধন করতে হয়। ফলে, শিশু তখন আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে। পরিবেশ, সমাজ, পরিবার সকলের সঙ্গে তার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শৈশবের মতো আবার তার মধ্যে পরনির্ভরশীলতা ও নিরাপত্তার চাহিদা জাগে। বীরপূজা, দল ও বন্ধুপ্রীতির উপর গভীর আস্থাভাব, গৃহের বন্ধন ছিন্ন করার মনোভাব, প্রচলিত প্রথা ও পরিবেশকে অতিক্রম করার দুঃসাহসী প্রেরণা দেখা দেয়। শৈশবের স্তিমিত যৌনচেতনা আবার জেগে ওঠে এবং আবেগ ও প্রক্ষোভ জনিত নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। সুতরাং বয়ঃসন্ধিকাল শৈশবের পুনরাবির্ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু এ মতবাদ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তির জীবন-বিকাশে শৈশবের বহু পরে বয়ঃসন্ধির উপস্থিতি। কাল যে পরিবর্তনের বিচিত্র রূপ ও স্তর নিয়ে আসে তার সঙ্গে শৈশব-স্তরের অবস্থাগুলির প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। বয়ঃসন্ধি শৈশবের পুনরাবৃত্তি নয়, পুনর্জাগরণ বা নতুন অবস্থা। নতুন পরিবর্তনের মাঝে দৈহিক, মানসিক, বিশেষভাবে প্রক্ষোভ বা আবেগজনিত যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ঃসন্ধিকালে আমরা লক্ষ্য করি, শৈশবে তার অবস্থিতির কল্পনা করার অর্থ নতুন সম্ভাবনাকে পুরাতনকে দিয়ে ব্যাখ্যা করা, ছক কেটে শিশুর জীবনকে দেখা।

(iv) **বয়ঃসন্ধিকাল এবং যৌবনাগম** (**Adolescence & Puberty**)ঃ কোন কোন লেখক যৌবনাগম এবং বয়ঃসন্ধিকালকে ব্যক্তির জীবন বিকাশের একই স্তর বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু আসলে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং এ পার্থক্য পরিমাণগত এবং গুণগত দুদিক দিয়েই লক্ষ্য করা যায়। পরিমাণগত দিক থেকে বয়ঃসন্ধি যৌবনাগমের চাইতে ব্যাপক এবং গুণগত দিক থেকে যৌবনাগমের মতো বয়ঃসন্ধি শুধু দৈহিক পরিবর্তন সূচিত করে না, মানসিক পরিবর্তনও সূচিত করে। নিম্নের আলোচনা থেকে এ পার্থক্য আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে।

যৌবনাগমের অর্থ হল ব্যক্তির প্রজনন বা সন্তান উৎপাদন-ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। ছেলেদের ক্ষেত্রে তার প্রধান লক্ষণ বীর্যোৎপাদন আর মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি বা প্রথম মাসিক ঋতু। এ যৌন-পরিণতি মেয়েদের বেলা আট-নয় বছর বয়সে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে বার-তের বছর বয়সেও আসতে পারে, যদিও সাধারণ ক্ষেত্রে তা অনেক পরে আসে। সুতরাং দৈহিক পরিবর্তন বা শারীরিক ক্রিয়ার মধ্যেই যৌবনাগম কথার তাৎপর্য নিহিত। কিন্তু বয়ঃসন্ধি এই দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার সামাজিক, মানসিক এবং ব্যক্তিগত প্রক্ষোভজনিত সমস্যার দিকও রয়েছে। তাছাড়া, যৌবনাগম কোন্ বয়সে হয় বলা শক্ত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের যৌন-পরিণতি শীতপ্রধান দেশের ছেলে-

মেয়েদের চাইতে একটু আগেই হয়। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের চাইতে আগেই যৌন-পরিণতি ঘটে। আমরা সাধারণতঃ যৌন-পরিণতির সময় থেকে শুরু করে শিশু যতক্ষণ না পূর্ণ যৌবনে পরিণত হচ্ছে এ কালকে বয়ঃসন্ধি বলে অভিহিত করি। যৌবনাগম বয়ঃসন্ধিকালের অঙ্গীভূত দৈহিক বিকাশ ও পরিবর্তনের একটি দিক মাত্র।

(৫) বয়ঃসন্ধি পীড়ন ও কষ্টের কাল (Adolescence is a Period of 'stress & strain' or 'strife and strain') : বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তির দেহে এবং মনে যে পরিবর্তনেব আলোড়ন এসে উপস্থিত হয় তা উল্লেখ করে স্ট্যানলি হল (*Stanley Hall*) তাঁর '*Adolescence*' বইতে এ কালকে ঝটিকাক্ষুব্ধ বা পীড়ন ও কষ্টের কাল বলে অভিহিত করেছেন। এ সময়ে ব্যক্তির জীবনে দৈহিক ও মানসিক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ফলে, ব্যক্তির প্রক্ষোভজনিত আচবণেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। বাল্যকালে যে পরিবেশের সঙ্গে ছিল তার সহজ সম্পর্ক, সে পরিবেশই তার বয়ঃসন্ধিকালে নতুন সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়। এ সময় আবার ব্যক্তিকে কর্মমুখর হয়ে উঠতে হয়। তখন তার জীবনে যেন এক দুর্নিবার জোয়ার এসে উপস্থিত হয়। আর এ জোয়ারের বেগে পুরাতনকে ভাঙবার একটি প্রবল তাড়না ব্যক্তি অনুভব করে। তার বাল্যকালের দৈহিক ও মানসিক কাঠামো পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সে নিজেকে অনেকটা অসহায় মনে করে এবং নিরাপত্তার জন্য পর-নির্ভরশীল হতে চায়। সুতরাং এ সময় সে খুব আত্মকেন্দ্রিক এবং আবেগপ্রবণ হয়। সে মাঝে মাঝে অনুভব করে সমাজ বা পরিবার তার প্রয়োজন ও সম্ভাবনাশক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে না। ফলে, তার মনে একটি নিপীড়নমূলক মনোভাব (**Persecution mentality**) সৃষ্টি হয়। এটাই ক্ষোভের আকারে প্রচলিত প্রথা, অনুশাসন, রীতিনীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়। এটা আর কিছুই নয়, নতুন ভাব, নতুন প্রক্ষোভ বা আবেগের গর্ভ-যন্ত্রণা। এজন্য বয়ঃসন্ধিকাল সত্যই ঝটিকাক্ষুব্ধ, পীড়ন ও কষ্টের কাল।

কিন্তু এ ব্যাখ্যার মধ্যে কোন অসংগতি না থাকলেও এর মধ্যে অতিশয়োক্তি বর্তমান। বয়ঃসন্ধিকাল ব্যক্তির জীবন-বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরিণত মন ও দেহের অধিকারী হওয়ার জন্য এ স্তর অতিক্রম করা অপরিহার্য। যে দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তনের স্রোত বয়ঃসন্ধিকালে উপস্থিত হয় তা ব্যক্তির সর্বতোমুখী জীবন-বিকাশ সম্ভব করে তোলে। বয়ঃসন্ধিকাল 'কষ্ট এবং নিপীড়নের' কাল নয়, বৃহত্তর জীবনকে লাভ করবার বলিষ্ঠ সংগ্রাম মাত্র।

৮। বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা (Needs of Adolescence):

স্ট্যানলি হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ বয়ঃসন্ধিকালের বিভিন্ন সমস্যা ও চাহিদা নিযে প্রচুর গবেষণা এবং আলোচনা করেছেন। তাঁদের পরিবেশিত তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রধান প্রধান চাহিদাগুলি আমরা বিবৃত করছি।

(ক) স্বাধীনতা ও সক্রিয়তার চাহিদা (Needs for Freedom and Activity): বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক বিকাশে অনেক পূর্ণতা আসে। যে শিশু শৈশব থেকেই পরনির্ভর, এবার সে সর্বব্যাপারে স্বাধীন হতে চায। তার আত্মসম্মানবোধ তার মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে। দাযিত্ব বহন করার, নিজের মত প্রকাশ করার, দশ জনের মধ্যে একজন হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে এ সময়ে দেখা দেয। তখন সদা কর্মমুখর। স্থির ও শান্ত হযে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয। তার এই স্বাধীনতা ও সক্রিযতাবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিশুর এই স্বাধীন আচরণকে যথাযথ মূল্য দেওযা উচিত। অনেক সময তার কর্মমুখরতাকে দাবিযে রাখবার চেষ্টা করা হয, তাকে গৃহকোণে শান্ত হযে পাঠে মনোনিবেশ করতে উপদেশ দেওযা হয়। তার স্বাধীন মত প্রকাশকে অকালপক্কতা বলে অবজ্ঞা করা হয। কিন্তু এ সময পরিবার, বিদ্যালয বা সমাজের কতব্য হচ্ছে শিশুকে সক্রিযতার সুযোগ প্রদান করা। মুক্ত আকাশের নীচে শিশু যেন তার অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখী পাঠ্যসূচীতে শিশুর চাহিদা অনুযায়ী সাত ধরনের পাঠ্যবিষযের অবতারণা করা হযেছে। শিশুর সামর্থ ও চাহিদার স্বাধীনতা এতে আছে। তা ছাড়া সহপাঠ্যসূচীর ব্যাপক ব্যবস্থা থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয আচরণের সুযোগ রয়েছে। পরিবারেরও এ ব্যাপারে ছেলেমেযেদের সহাযক হওয়া উচিত। শিশুর মনে একমাত্র পরিবারই নিরাপত্তাবোধের সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের স্বাধীন ও সক্রিয় আচরণে সমর্থন জানাতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে আরোপিত শৃঙ্খলা অর্থহীন। এ সময়ে পরিবার এবং বিদ্যালয উভয়ের দেখা উচিত ছেলেমেয়েরা যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিযমনীতি মানবার চেষ্টা করে। কারণ, স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, অসংযত উদ্দাম আচরণ নয়। স্বাধীনতা হল স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা।

(খ) ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের চাহিদা (Need for Social Development): বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তির সমাজচেতনার বিকাশ খুব গভীর হয। তার আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ এ সময়ে তাকে শৈশবের মতো স্বার্থকেন্দ্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে না, তার সামাজিক বিকাশে সহাযতা করে। বৃহত্তর

সমাজ জীবন যাপনের প্রতি তার অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে অংশ গ্রহণ করতে চায়। সে তখন ভাবের দোসর খোঁজে, স্বাধীন ইচ্ছায় প্রভাবিত হয়ে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ গ্রহণ করে, অপরিচিতের মধ্যে আত্মীয়তা অনুসন্ধান করে। সীমাহীন, বন্ধনহীন এক বৃহত্তর পৃথিবীর আবেদন এসে তার মনে উপস্থিত হয়। গৃহের বন্ধন বা আকর্ষণ তখন তার কমতে থাকে। বাইরের আহ্বান তখন তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

বিদ্যালয় এবং পরিবারের তখন কর্তব্য হচ্ছে যৌথকর্ম, দল বেঁধে ভ্রমণ, বন-ভোজন, নাটক-অভিনয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক দল গঠন, বিদ্যালয় বিতর্ক সভা বা ছাত্র সংগঠন প্রভৃতি সমবেত কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহ ও সুযোগ প্রদান করা। এর ফলে ছেলেমেয়েদের সমাজচেতনা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে, তারা সামাজিক আচরণ ও অনুশাসনে অভ্যস্ত হয় এবং তাদের শক্তি ও উদ্যমশীলতা বিপথগামী বা বিনষ্ট হয় না। তারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সমাজে তাদের যে প্রয়োজন আছে তা অনুভব করে।

(গ) আত্মপ্রকাশের চাহিদা (Need for selfs-expression): বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা নানা আবেগ বা প্রক্ষোভের সম্মুখীন হয়। মানসিক তাড়নার ফলে তারা সব সময় নিজেকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করতে চায়। নানা ধরণের সৃজনীমূলক কর্মের মধ্য দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের মূল্যবোধকে সমাজের অন্য সভ্যদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা তার মূল্য উপলব্ধি করবে এটাই তার বিশেষভাবে কাম্য। এ সময় সৃজনশীল কর্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলে সহজেই এ চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়। এ চাহিদার তৃপ্তি ছেলেমেয়েদের ব্যক্তি সত্তার সুষম বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। যাদের এ চাহিদা অপরিতৃপ্ত থেকে যায় তারা দুর্বলচেতা, আত্মবিশ্বাস হীন ও নিষ্ক্রিয় হয়। অধ্যয়ন, খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয়, অঙ্কন এবং অন্যান্য কর্মে তারা আত্মপ্রকাশ (self-expression) খোঁজে।

(ঘ) আত্মনির্ভরতার চাহিদা (Need for self-dependence): এই আত্মপ্রকাশের চাহিদা থেকেই তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে। এবং কিভাবে স্ব-নির্ভর হওয়া যায় সে সম্পর্কে ভাবে। পরনির্ভর না হয়ে উপার্জনক্ষম হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করার প্রবল ইচ্ছা বয়ঃসন্ধিকালে দেখা দেয়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ও সমাজে নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন তার মনে জুড়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি ও উপার্জনের পথের দিকে তার মনোযোগ ধাবিত হয়। এ চাহিদাকে অনেকে

বৃত্তি গ্রহণের চাহিদা বলেও মনে করেন। এ ব্যাপারে পরিবার শিক্ষার সহায়ক হতে পারে, বিদ্যালয় বৃত্তি নির্বাচনে শিশুকে সহায়তা করতে পারে।

(ঙ) **নতুন জ্ঞানের চাহিদা (Need for new knowledge) :** বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করার জন্য এবং মানসিক শক্তিগুলি পরিণতিতে পৌঁছনোর জন্য তাদের কৌতূহল অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে। এর ফলে নতুন নতুন জ্ঞানলাভের জন্য, নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের মনে গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য তাদের মনে আকুলতা জাগে। তাদের অসীম কৌতূহল বিশ্বজগতের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারটি উদ্ঘাটন করে। তারা নানাভাবে কৌতূহলকে নিবৃত্ত করতে চায়। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের এই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাকে সঠিক পথে চালিত করতে পারার উপর তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে। পিতামাতা, অভিভাবকবৃন্দ ও বিদ্যালয়ের উচিত বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ করে দেওয়া।

(চ) **নীতিবোধের চাহিদা (Need for moral sense) :** বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হয়। ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিতের বোধ তার মধ্যে দেখা দেয়। নিজের এবং অপরের কাজকে এ নীতিবোধের মানদণ্ডে সে বিচার করে। সমাজের রীতি নীতির নৈতিক সমর্থনকে খুঁজে বেড়ায়। নিজে নীতি-বিরোধী কাজ করলে তার জন্য তার মনে অপরাধ বোধের সৃষ্টি হয়। বয়ঃ-সন্ধিকালের এই চাহিদাকে নীতিবোধের চাহিদা বলা যেতে পারে।

(ছ) **যৌনতৃপ্তির চাহিদা (Need for Sex-satisfaction) :** বয়ঃসন্ধিকালে প্রতিটি ব্যক্তির যৌনবোধ জাগে। শৈশবে এ যৌনতা নিজের দেহকে আশ্রয় করেই তৃপ্ত পায়। এ সম্বন্ধে শিশু-মনে বিশেষ কোন কৌতূহল দেখা যায় না। বাল্যকালে এ যৌনবোধ থাকে স্তিমিত। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে যৌনবোধ পরিপূর্ণ আকারে বিকশিত হয়, দেহ-মন যৌন আচরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। দেহের যৌন অঙ্গের পরিবর্তন তার মনোজগতে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। তখন প্রতিটি ব্যক্তি প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর চিন্তায় বিভোর হয়। সে সর্বদা তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর উপস্থিতি কামনা করে। কিন্তু যৌন চাহিদা প্রধানতঃ যৌন আচরণমূলক নয় বলেই অনেকে মনে করেন। কারণ, এ চাহিদা যৌন-কৌতূহলেই আত্মপ্রকাশ করে। বয়ঃসন্ধিকালের এ যৌন-কৌতূহলকে নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় যৌন-শিক্ষা।[1] কিন্তু দুঃখের

1. এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয় 'নিষিদ্ধ ফলের' মতো যৌন-শিক্ষা আমাদের সভ্য সমাজে 'নিষিদ্ধ কথা'। অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, বয়ঃসন্ধিকালে সহশিক্ষার (Co-education) প্রবর্তন করা উচিত। তখন ছেলে ও মেয়েরা পরস্পরের সম্বন্ধে অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল পোষণ করবে না। তা ছাড়া মাতাপিতা ছেলেমেয়েদের যৌন-শিক্ষা দিতে পারেন যাতে অশ্লীল পুস্তক বা ছবি, কুসঙ্গ প্রভৃতি থেকে তারা যৌন-শিক্ষা লাভ না করে।

(জ) **জীবন দর্শনের চাহিদা (Need for a philosophy of life) :** বয়ঃসন্ধিকালেই প্রতিটি ব্যক্তি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানারকম জিজ্ঞাসা তার মনে দেখা দেয়। জীবন ও জগতের রহস্য জানবার এবং সকল নীতিবোধের মর্ম উদ্ঘাটন করার জন্য সে নানা প্রশ্ন করে। আসল কথা দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনে তার মনে যে সংঘাত উপস্থিত হয় তারই প্রতিফলন এই জীবন ও জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের আকাঙ্ক্ষায় আমরা লক্ষ্য করি। এ সময় ব্যক্তি মনে মনে তার জীবন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আদর্শ সৃষ্টি করে ফেলে।

পরিবার বা বিদ্যালয়ের এ সম্বন্ধে প্রচুর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাতে একটা উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে ওঠে তার জন্য তাদের সক্রিয় সহযোগিতার ও সহানুভূতিমূলক মনোভাবের প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের দেশ বিদেশের খ্যাতনামা লেখকদের গ্রন্থগুলি পাঠ করার সুযোগ দিতে হবে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে যাতে তারা উপযুক্ত ধারণা গঠন করতে পারে তার জন্য তাদের সাহায্য করতে হবে, গতানুগতিক নিশ্চল ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে, প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাতে তারা উদার জীবন-দর্শন গড়ে তুলতে পারে, তার জন্য তাদের সকল প্রকারে সাহায্য করতে হবে। উপযুক্ত জীবনাদর্শ গঠন চরিত্র বিকাশের অঙ্গ। বয়ঃসন্ধিকালে শিশু দিবাস্বপ্নে বিভোর, সে কল্পনাবিলাসী। সুতরাং তার জীবনাদর্শ গঠন যেন অলীক কল্পনার পুঞ্জীভূত রূপায়ণ না হয়, বাস্তববিরোধী না হয়—এ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহে শিশুকে সহায়তা করা পরিবারের কর্তব্য, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব। উপযুক্ত পাঠ্যসূচীর সাহায্যে শিশু যাতে একটা জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর ফলে শিশু নৈতিক, সামাজিক আদর্শের সঙ্গে একটি ভাবসংহতি সৃষ্টি করতে পারবে। তা না হলে সে হবে একটি অপ্রতিযোজিত (mal-adjusted চরিত্রের অধিকারী, সময় সময় অপরাধপ্রবণ।

চতুর্থ অধ্যায়

বংশধারা ও পরিবেশ

(Heredity and Environment)

১। বংশধারার অর্থ (The Meaning of Heredity) ঃ

বংশধারার প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে উডওয়ার্থ এবং মাকুইস্ (*Woodworth and Marquis*) বলেন, "ব্যক্তি যখন তার জীবন শুরু করে তখন তার মধ্যে যে সব উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিই তার বংশধারা।"[1]

মনোবিজ্ঞানে বংশধারা শব্দটিকে 'ক্ষুদ্রতব' এবং 'ব্যাপকতর' অর্থে ব্যবহাব করা হয়। ক্ষুদ্রতর অর্থে বংশধাবা বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তির মধ্যে তাব শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারক কোষগুলির (cells) বণ্টনের বিষয়টিকে। এই কোষগুলির জন্যই সন্তানের সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপকতর অর্থে বংশধারা বলতে বোঝায় ব্যক্তির সেই সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে যেগুলি ব্যক্তি তার মাতাপিতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে। প্রত্যেক শিশুই তার পিতা, মাতা, পিতামহ, মাতামহ, পিতামহী, মাতামহী এদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই বৈশিষ্ট্য দু রকমের হতে পারে, জৈবিক (biological) এবং মানসিক (psychological)। শিশু তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে দেহগত বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন আকৃতি, গঠন, দেহের বর্ণ, গ্রন্থিগত (glandular) বৈশিষ্ট্য পায় সেগুলিকে জৈবিক বংশগতি বলা হয়। আর মানসিক বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় শিশুর জন্ম সময়ে তার মধ্যে যে মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন তার সহজাত প্রবৃত্তি, তার চিন্তন, কল্পনা, ইচ্ছা ও তার সহজাত বিভিন্ন ধরনের মানসিক শক্তি। বংশধারা হল ব্যক্তির সহজাত বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণের পর শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। বংশধারাসূত্রেপ্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জিত নয়, সহজাত, অর্জিত বৈশিষ্ট্য শিক্ষার ও অভিজ্ঞার মাধ্যমে লব্ধ। কাজেই বংশধারা হল সেই প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার কারণে ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে

বংশধারার ক্ষুদ্রতর এবং ব্যাপকতব অর্থ

---

1. "Heredity covers all the features that were present in the individual when he begins life."

—Woodworth and Marquis ; Psychology

কতকগুলি সাদৃশ্য নিয়ে জন্মায়। এই প্রক্রিয়া এমন সুনির্দিষ্টভাবে ঘটে যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই শিশুর সঙ্গে তার পূর্বপুরুষদের কিছু না-কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য দু-এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়, তবে একজাতীয় ব্যতিক্রম খুবই দুর্লভ। বংশধারা বলতে শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়কে বোঝায়, কেননা, শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে মাতাপিতার কাছ থেকে যে ক্রোমোজোম (Cromosome) এবং জীন (Gene) পেয়ে থাকে সেগুলিই শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই নির্ধারণ করে।

বংশধারা হল মাতাপিতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া ব্যক্তির সবরকম বৈশিষ্ট্য

২। বংশধারা কি? (What is Heredity?):

স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনের ফলেই সন্তানের জন্ম, পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনের ফলে মাতৃজঠরে প্রথম প্রাণের সূচনা ঘটে। পুং-জননকোষ বা শুক্রকীট স্ত্রী-জননকোষ বা ডিম্বাণু (ovum)-তে প্রবেশ করলে গর্ভসঞ্চার হয় এবং তখন একটি ডিম্বকোষ (fertilised egg বা zygote) গঠিত হয়। এই ডিম্বকোষটি স্বধর্ম অনুযায়ী নিজকে দ্বিধা বিভক্ত করতে থাকে। একটি কোষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি কোষ, দুটি কোষ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে চারটি, চারটি কোষ আবার আটটি কোষ, এই ভাবে কোষ বিভাজনের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু গর্ভসঞ্চারের ২৮০ দিন পরে ভূমিষ্ঠ হয়। গর্ভ-সঞ্চারের তিন মাস পর থেকেই কোষগুলি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি ধারণ করে।

আদিকোষ আত্মবিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়

শিশুর দৈহিক-মানসিক বিকাশ, বংশজ সংলক্ষণ (hereditary traits), ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির রহস্যের অনেকটাই নিহিত রয়েছে এই কোষ (cell)-এর মধ্যে। কাজেই এই কোষের পূর্ণ পরিচয় জানা একান্তই প্রয়োজন। পুং-জননকোষ বা শুক্রকীটের মস্তকে থাকে ওর কোষকেন্দ্র (nucleus)। স্ত্রী-জননকোষ বা ডিম্বাণুর মধ্যেও থাকে একটি কোষকেন্দ্র। কোষকেন্দ্রের চারপাশে থাকে এক প্রকার জলীয় পদার্থ। কোষকেন্দ্রটিই কোষের প্রাণস্বরূপ। পুং-জননকোষ এবং স্ত্রী-জননকোষের কোষকেন্দ্রে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূতোর মতো পদার্থ থাকে। এগুলিকে বলা হয় **কোষতন্তু** বা **ক্রোমোজোম** (chromosome)। মানুষের জননকোষে এই ক্রোমোজোমের সংখ্যা হল ২৪টি। পুং-জননকোষ ও স্ত্রী-জননকোষের মিলনে যে নতুন কোষটি তৈরি হয় তার ক্রোমোজোমের সংখ্যা হল

ক্রোমোজোম

২৪+২৪ অর্থাৎ ৪৮টি। অনেকে বলে থাকেন যে ২৩ জোড়া করে মোট ৪৬টি ক্রোমজোম থাকে। প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজোমের একটি আসে পুং-জননকোষ থেকে এবং আর একটি আসে স্ত্রী-জননকোষ থেকে। যখন প্রথম ডিম্বকোষটি নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে তখন নতুন কোষ দুইটির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৪ জোড়া বা ৪৮টি ক্রোমোজোম।

এই নতুন কোষ দুটি যখন আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয়, তখন সেই নতুন কোষগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৪ জোড়া বা ৪৮টি করে ক্রোমোজোম। কোষ দুপ্রকারের, দেহ-কোষ (body-cell) এবং জননকোষ (germ cell)। জননকোষে অর্থাৎ পুং-জননকোষে এবং স্ত্রী-জননকোষে কেবল ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে। দেহ-কোষগুলিতেই ২৪ জোড়া বা ৪৮টি করে ক্রোমোজোম থাকে। স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি কোষ ৪৮টি ক্রোমোজোম দ্বারা গঠিত, কিন্তু পুরুষ বা স্ত্রী প্রত্যেকের জননকোষে মাত্র ২৪টি করে ক্রোমোজোম থাকে, এবং পিতৃজননকোষ ও মাতৃজননকোষের মিলনে প্রস্ফুটিত ডিম্বকোষটিতে থাকে ৪৮টি ক্রোমোজোম। দেহকোষগুলি যেভাবে আত্মবিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমবিভক্ত হতে থাকে জননকোষগুলির সেভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে না। পরবর্তী বংশধর সৃষ্টির জন্য সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে।

জননকোষে মোট ২৪টি করে ক্রোমোজম থাকে

জননকোষ ছাড়া মানবদেহের সব কোষেই ৪৮টি করে ক্রোমোজোম থাকে। এই ক্রমোজোমগুলি আকার এবং গঠনের দিক থেকে বিভিন্ন। এই ক্রোমোজোমগুলি অসংখ্য গুটিকা বা দানার (beads) মত পদার্থ দিয়ে গাঁথা একটা মালার মতো। এই দানার মতো পদার্থগুলি প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমষ্টি (complex chemical compounds)। এগুলিকে বলা হয় জীন (Gene)। এই জীনই হল বংশগত সংলক্ষণের প্রকৃত বাহক। ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে জীনের ক্রিয়া।[1] জীন সব সময় জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে। এই জোড়ার একটি আসে মাতৃকোষ থেকে আর একটি আসে পিতৃকোষ থেকে। যেহেতু এক জোড়ার জীন একই ধরনের কাজ করে এবং যেহেতু প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম, সেহেতু কোন একটি জীন ত্রুটিপূর্ণ হলেও অন্যটি সমস্ত কাজ একাই করতে পারে। সময় সময়

জীন

1. সাম্প্রতিক ডঃ খোরানার জীন বিশ্লেষণ ও কৃত্রিম জীন উৎপাদনের আবিষ্কার বংশধারার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় অবদান রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জীনগুলি প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়, তখন সেই জীন দুটির ক্রিয়াও তদ্রূপ হয়। যেমন, যদি পিতা ও মাতা দুজনের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গ হবার জীন থাকে তাহলে তাদের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে তাঁদের সন্তানও হবে দীর্ঘাঙ্গ। কিন্তু অনেক সময় জীন দুটির প্রকৃতি ভিন্ন হতে পারে। এই দুটি জীনের মধ্যে সাধারণতঃ একটি বংশজ সংলক্ষণগুলিকে সক্রিয়ভাবে বহন করে, অপরটি নিষ্ক্রিয়ভাবে বহন করে।

একটিকে বলা হয় সক্রিয় (dominant) জীন। অপরটিকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় (recessive) জীন। যেমন, মাতাপিতার দুজনের জীন দুটির একটির মধ্যে যদি খর্বতার সংলক্ষণ সক্রিয়ভাবে থাকে, অপরটির মধ্যে দীর্ঘতার সংলক্ষণ নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে তাহলে, নবজাতক খর্ব হবে। দীর্ঘতর সংলক্ষণবহনকারী জীনটি নিষ্ক্রিয় হওয়াতে নবজাত সন্তানের মধ্যে তার কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে না। অনেক সময় পিতা ও মাতা দুজনে বাহ্যতঃ দীর্ঘকায় হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সন্তান যে খর্বকায় হয়, এর কারণ হল পিতামাতার উভয়ের জননকোষের দীর্ঘতার বাহক জীনটি নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য খর্বতার বাহক জীনটি সক্রিয়ভাবে ক্রিয়া করে, যার ফলে সন্তান খর্বকায় হয়।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় জীন

জীনগুলি কি ভাবে জোড় বাঁধবে সেই জোড় বাঁধার উপরই নির্ভর করে বংশগতি। কাজেই ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, স্বভাবগত সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে ক্রোমোজোম এবং জীনের জোড় বাঁধার প্রকৃতি। পুং-জননকোষ ও স্ত্রী-জননকোষের মিলনে যে নতুন কোষটি উৎপন্ন হয়, সেই কোষের অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সংগঠনের ব্যাপারটি একেবারেই আকস্মিকতার উপরে নির্ভর করে। জননকোষের মিলনের সময় কোন্ ক্রোমোজোম কোন্ ক্রোমোজোমের সঙ্গে জোড় বাঁধবে বা কোন্ জীন কোন্ জীনের সঙ্গে জোড় বাঁধবে, তাও একান্তভাবে আকস্মিকতার উপর নির্ভরশীল। কাজেই একমাত্র সমকোষী বা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট যমজ (identical twins) ছাড়া মাতাপিতার দুটি সন্তানের একেবারে অভিন্ন হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

জীনের সংগঠন একেবারেই আকস্মিক

ক্রোমোজোম বা জীনের সাদৃশ্যের জন্যই মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানদের এবং সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। যে ৪৮টি ক্রোমোজোম একত্রে শিশুর বংশধারার নির্ধারক সমস্ত সংলক্ষণগুলির বাহক, তার মধ্যে ২৪টি পিতার এবং ২৪টি মাতার কাছ থেকে পাওয়া, সে কারণে সন্তানের সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্য কিছু-না-কিছু থাকেই, আবার যেহেতু পিতা ও মাতা প্রত্যেকেই তাঁদের মাতাপিতার কাছ থেকে ২৪টি করে মোট ৪৮টি ক্রোমোজোম পেয়েছেন এবং তার মধ্যে ২৪টি সন্তানকে

দিয়েছেন সে কারণে সন্তানের সঙ্গে পিতামহ ও পিতামহীর সাদৃশ্যও থাকতে পারে। সন্তানেরা পিতা ও মাতার কাছ থেকে যে ৪৮টি ক্রোমোজোম পায়, সেগুলি প্রকৃতিতে ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকে। সে কারণে একই মাতাপিতার সন্তানদের মধ্যে কিছু-না-কিছু মিল থাকেই।

জীনের জন্যই মাতা-পিতার সঙ্গে সন্তানের ও সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য

সমকোষী বা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট যমজ সন্তানদের (identical twins) মধ্যে এই সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। পুং-জননকোষ ও স্ত্রী-জননকোষের মিলনে যে ডিম্বকোষটি গঠিত হয়, সেই কোষটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি-কোষে পরিণত হবার পরে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন না থেকে সম্পূর্ণ পরস্পর থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীকালে কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। সমডিম্বজ বা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট সন্তানের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি অভিন্ন হয় এবং সে কারণে সন্তানের বংশধারাও একই হয়। সমডিম্বজ যমজের ক্ষেত্রে দুটি সন্তানই হয় পুত্র, নয় কন্যা হবে, একটি পুত্র ও একটি কন্যা হতে পারে না। ভিন্ন কোষী বা সাধারণ যমজ সন্তানের (fraternal twins) ক্ষেত্রে বা দ্বিডিম্বজ (di-ovular) যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে দুটি পুংজননকোষ ও দুটি স্ত্রী জননকোষের মিলন প্রায় একই সময়ে ঘটে থাকে। এর ফলে যে দুটি যমজ সন্তানের জন্ম হয়, তাদের ক্রোমোজোমগুলি ভিন্ন হয়। সে কারণে তাদের মধ্যে শারীরিক মানসিক সব রকম পার্থক্য থাকতে পারে। সাধারণ যমজ সন্তানের মধ্যে একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হবার পথে কোন বাধা নেই।

সমকোষী যমজ

ভিন্নকোষী যমজ

সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট যমজ সন্তানের উপর বংশগতি ও তুলনামূলক পরিবেশের প্রভাবের বিচার করার জন্য এ জাতীয় যমজ সন্তানের দুটিকে দুটি ভিন্ন পরিবেশে রেখে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিভাবে ঘটে সে সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান কার্য চালান হয়েছে। এই সকল অনুসন্ধান কার্য শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[1]

---

1. সাধারণতঃ জীবের প্রকৃতি অনুসারে সন্তানসন্ততির বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়। কিন্তু দুটি কারণে প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। প্রথম হল জীনের সংবিকৃতি (mutation) আর দ্বিতীয়তঃ পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

কখনও কখনও জীনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দেওয়ার ফলে সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এই ধরনের পরিবর্তনই জীবের সংবিকৃতি (mutation) নামে পরিচিত। যেমন 'ছ' আঙুল বিশিষ্ট শিশু। যদি প্রাণী এই সংবিকৃতি নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন সাধন করে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে এই সংবিকৃতি তার বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে।

৩। শিশুরা কি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতে পারে? (Do children inherit specific traits ?) :

শিশু কি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা দক্ষতা (special ability) মাতাপিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারে? সঙ্গীতজ্ঞ মাতাপিতার সন্তান কি সঙ্গীতজ্ঞ হবার গুণটি বা বৈশিষ্ট্যটি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে পারে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে তিনটি বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, অনেক ক্ষেত্রে আমরা যে বৈশিষ্ট্য শিশু মাতাপিতার কাছ থেকে জন্মগতসূত্রে পেয়েছে মনে করি, পরিবেশের জন্যও শিশু সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। কোন একটি পরিবারে প্রতিটি শিশুই সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। তার কারণ এই নয় যে, শিশু সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। বরং এই কারণে যে, সেই পরিবারের অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গীত চর্চা শিশুর মনে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় সন্তান পিতামাতার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে, খুব শিক্ষিত মাতাপিতার সন্তান মূর্খ হয়ে থাকে। সুতরাং এই কারণেও মনে করা সঙ্গত নয় যে, সন্তান মাতাপিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবেই। তৃতীয়তঃ, মাতাপিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে দেখা গেলে সাধারণতঃ সেটিকে নিয়মের ব্যতিক্রমই মনে করা হয়।

সন্তান মাতাপিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, একথা বলতে যেন এই বোঝা না হয় যে মা ভাল রাঁধতে জানলে তাঁর মেয়েও ভাল রাঁধার ক্ষমতা নিয়ে জন্মাবে। যখন আমরা বলি, যে কোন শিশু জন্ম থেকেই কবি, লেখক বা সঙ্গীতজ্ঞ, তখন তার অর্থ বুঝে নিতে হবে এই ভাবে যে শিশুটির মধ্যে লেখার বা কবিতারচনা বা সঙ্গীতজ্ঞ হবার প্রবণতা বর্তমান এবং যদি পরিবেশের আনুকূল্য সে লাভ করে তাহলে অপরের তুলনায় এ বিষয়ে সে বেশী দক্ষতা দেখাতে পারবে। সঙ্গীতজ্ঞ মাতাপিতার সন্তানকে সঙ্গীতজ্ঞ হতে হলে, তার মধ্যে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। তবে নিয়মিত সঙ্গীতের অনুশীলন করা দরকার এবং অনুকূল পরিবেশের সহায়তা তার পক্ষে প্রয়োজন।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির অবর্তমানে কারও পক্ষে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই উত্তরাধিকারসূত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার প্রশ্নে এই কথা বলা যেতে পারে যে, শিশুরা খুব সীমিত অর্থে তার অধিকারী হতে পারে। যেমন,

স্বরযন্ত্রের উৎকর্ষের উপর সঙ্গীতের দক্ষতা নির্ভর করে এবং যেহেতু দেহের এই অঙ্গ কতকগুলি কোষের উপর নির্ভর এবং বংশগতিই কোন মানুষের মধ্যে কোষের বণ্টন নির্ধারণ করে সেই অর্থে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তি সঙ্গীত বা অন্য কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করতে পারে।

৪। বংশধারার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা ঃ

ব্যক্তির উপর বংশধারা বা পরিবেশ কার প্রভাব বেশী, নির্ধারণ করার জন্য কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী কয়েক পুরুষ ধরে বিভিন্ন পরিবারের বংশপঞ্জী আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের (*Francis Galton*) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাল্টন ৯৭৭ জন খ্যাতনামা ব্যক্তির একটি তালিকা তৈরি করেন। তারপর এদের নিকট আত্মীয় স্বজনের একটি তালিকা তৈরি করে তিনি দেখেন যে তাদের মধ্যে ৫৩৬ জন খ্যাতনামা ব্যক্তি। পক্ষান্তরে গ্যাল্টন ৯৭৭ জন সাধারণ ব্যক্তির একটা তালিকা তৈরি করে দেখেন যে তাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মাত্র ৪ জন খ্যাতনামা ব্যক্তি।

ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের গবেষণা

ডক্টর এ. ই. উইনসিপ (*A. E. Winship*) কোন এক এডওয়ার্ড পরিবার নিয়ে যে গবেষণা চালান, তার থেকেও তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের ব্যক্তিসত্তা নির্ধারিত হয় তার বংশগতির দ্বারা। রিচার্ড এডওয়ার্ড এলিজাবেথ নাম্নী এক খ্যাতনামা মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে কেহ বা খ্যাতনামা চিকিৎসক, কেহ বা সুবক্তা, কেহ বা নামকরা অধ্যাপক এবং কেহ বা খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুকাল পরে রিচার্ড একটি সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করেন এবং এই বিবাহের ফলে যে সন্তানদের জন্ম হয় তারা পরিণত বয়সে বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেনি।

উইনসিপের গবেষণা

এইচ. এইচ. গডার্ড (*H. H. Goddard*) কালিকাক পরিবার নিয়ে যে গবেষণা করেন তাতেও তিনি বংশগতির প্রভাবের গুরুত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। মার্টিন কালিকাক ছিলেন খুব সাধারণ একজন সৈনিক। সৈন্য থাকাকালীন তিনি নিম্নবংশজাত স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এক মহিলার প্রতি অনুরক্ত হন। এই মহিলাকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের শাখা গড়ে ওঠে। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তিনি একটি উচ্চ পরিবারের মহিলাকে বিবাহ

গডার্ডের গবেষণা

করেন। এই শেষোক্ত মহিলাকে কেন্দ্র করেও আর একটি পরিবারের শাখা গড়ে ওঠে। প্রথম মহিলার বংশ-শাখা আলোচনা করে তিনি দেখেন যে মোট ৪৮০ জনের জন্ম হয়েছে। তার মধ্যে ১৪৩ জন স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, ৪৬ জন খুব সাধারণ স্তরের ব্যক্তি, ৩৬ জন অসৎ চরিত্রের ব্যক্তি এবং ৩৩ জন পতিতা, ২৪ জন মাতাল, ৩ জন হিস্টিরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি। ৩ জন কোন-না-কোন অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি, ৮ জন পতিতালযের মালিক। দ্বিতীয় মহিলাকে কেন্দ্র করে যে পরিবারের শাখা ছড়িয়ে পড়েছে, তাব মধ্যে ৪৯৬ জনের খোঁজ পাওযা গেল। তাদের মধ্যে মাত্র ৫ জন অসৎ চরিত্রেব লোক এবং অবশিষ্ট সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তি।

কার্ল পিয়ার্সনের গবেষণা

কার্ল পিয়ার্সন গ্যাল্টন-পবিবাবের বংশপঞ্জী আলোচনা করে বংশগতিব প্রভাব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। গ্যাল্টন পবিবারের বংশপঞ্জী আলোচনা করতে গিযে তিনি দেখেন যে এই পরিবারের সভ্যবৃন্দ পব পব পাঁচ পুরুষ ধরে ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটিতে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত এবং সকলেই খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

ডাগডেল এবং ইস্টারব্রুকের গবেষণা

ডাগডেল (*Dugdale*) এবং ইস্টারব্রুক (*Esterbrooke*) নিম্নশ্রেণীর লোকের বংশপঞ্জী আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে, বংশগতিব প্রভাব ব্যক্তির উপর খুবই ব্যাপক। তাঁরা ইযুকস (Jukes) নামক এক ব্যক্তির বংশ তালিকা প্রস্তুত করেন। ইযুকস একজন অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তি ছিল এবং নিম্নশ্রেণীর এক মহিলাকে বিবাহ করেছিল। তার পরিবারের পাঁচ পুরুষের বংশপঞ্জী আলোচনা করে দেখা গেল যে ১৬৬৭ জনের মধ্যে ৩০০ জনের শৈশবেই মৃত্যু ঘটেছে, ৩১০ জন দরিদ্রগৃহে দিন যাপন করেছে, ৪০০ জনের ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটেছে, ৪০০ জন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন কবে জীবন নষ্ট করেছে, ৭ জন হত্যাকারী, ৬০ জন জন্ম থেকেই চৌর্য-কার্যে রত এবং গড়ে বার বছর জেল খেটেছে, ৩০ জন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী এবং মাত্র ২০ জন কোন বৃত্তি শিক্ষা করেছে।

যমজ সন্তান নিয়ে গবেষণা

ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশ, কোনটির প্রভাব বেশী নির্ধারণ করার জন্য, যমজ সন্তান (twins) নিয়েও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যমজ সন্তান দু ধরনের হতে পারে, সমকোষী (identical) এবং ভিন্নকোষী (fraternal)। পিতৃদেহ থেকে আগত জননকোষের সঙ্গে মাতৃদেহ থেকে আগত জননকোষের মিলনে যে ডিম্বকোষ গঠিত হয়, এবং তার থেকে যে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয় তাকে সমকোষী যমজ বলা হয়। পিতার দুটি

ভিন্ন জননকোষ যদি মাতার দুটি ভিন্ন জননকোষের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে মিলিত হয় তাহলে যে দুটি যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাদের বলা হয় ভিন্নকোষী যমজ।

থর্নডাইক, মেরীম্যান, গেসেল, থমসন, নিউম্যান, ফ্রীম্যান, ষ্টিফেনস, হলজিনগার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবের তুলনামূলক বিচার করবার জন্য যমজ সন্তান নিয়ে অনেক অনুসন্ধান কার্য চালান। গেসেল (*Gessel*) এবং থমসন (*Thompson*), দুটি সমকোষী যমজ ভগিনীকে শৈশব থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন। এই দুটি ভগিনীকে পৃথকভাবে শিক্ষা দান করে তাদের ব্যক্তিত্বকে ভিন্নভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা হলেও, উভয়ের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

নিউম্যান (*Newman*) সমকোষী দুটি যমজ ভ্রাতার সন্ধান পান যখন তাদের ২৬ বৎসর বয়স। দুটি ভ্রাতা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিতপালিত হয়েছিল, কিন্তু তবু তাদের দেহের গঠন, আকৃতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ অনৈক্য ছিল না। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যে উভয়ে সমান দক্ষতার অধিকারী ছিল। ষ্টিফেনস (*Stephens*) ও থমসন (*Thompson*) দুটি যমজ ভ্রাতার সন্ধান পেয়েছিলেন যারা ভিন্ন শহরে ভিন্ন পরিবারে লালিতপালিত হয়েছিল, কিন্তু দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে মানুষের উপর পরিবেশের তুলনায় বংশধারার প্রভাবই বেশী। তবে উপরিউক্ত ক্ষেত্রে সবগুলিতেই পরিবেশের তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ দুটি যমজ সন্তান দুটি ভিন্ন পরিবারে মানুষ হলেই, তারা যে ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হল বলা চলে না। অনেক সময় এইরূপ দুটি পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু যখন প্রকৃত ভিন্ন পরিবেশে দুটি যমজ সন্তানকে লালন-পালন করা হয়, তখন শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা দিতে পারে। গ্লাডিস (*Gladys*) এবং হেলেন (*Helen*) নামে দুটি সমকোষী যমজ, ঘটনাচক্রে দু-টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিতপালিত হয়। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা-মূলক বিচারে হেলেন গ্লাডিসের তুলনায় স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী ছিল। গ্লাডিসের মধ্যে সুলভ কমনীয়তা হেলেনের তুলনায় ছিল কম। হেলেন ছিল মার্জিতা, রুচিসম্পন্না, স্থিরচিত্তা; গ্লাডিস ছিল দুর্বলচিত্তা, অস্থিরপ্রকৃতির ও ক্ষীণকায়া। মানসিক শক্তির বিচারে হেলেন ছিল গ্লাডিসের চেয়ে উন্নত। হেলেনের বুদ্ধ্যঙ্ক ছিল ১১৬, গ্লাডিসের বুদ্ধ্যঙ্ক হল ৯২। হেলেনের হাতের লেখা ছিল বেশ পরিচ্ছন্ন ও পরিণত বয়সের হাতের

লেখা, গ্লাডিসের হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত কাঁচা। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সুতরাং উপরিউক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে বংশগতি পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে, যথার্থ পৃথক পরিবেশে সমকোষী যমজ সন্তানদের রেখে যদি লালনপালন করা যায় তাহলে উভয়ের শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে।

৫। বংশধারা সম্পর্কীয় কয়েকটি নীতির আলোচনা। (Discussion of some Laws of Heredity) :

(ক) জননকোষের ধারাবাহিকতা (Continuity of Germ Plasm) : জার্মান প্রাণীবিদ্ ভাইসম্যান (*Weisman*)-এর মতে জননকোষ বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হয় (transmitted), তার কোন বিনাশ নাই। পুং-জননকোষ ও স্ত্রী জননকোষের মিলনে যে প্রস্ফুটিত ডিম্বকোষটি গঠিত হয় সেটি নিজ ধর্ম অনুসারে নিজেকে বিভক্ত করতে থাকে এবং সংখ্যাতীতভাবে বিভক্ত হওযার ফলেই ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কয়েকটি কোষ ভ্রূণদেহে অবিকৃত ও অব্যাহত থেকে যায। এই কোষগুলিই নবজাত সন্তানের জননকোষরূপে ভবিষ্যৎ প্রজননের জন্য তার দেহে সুরক্ষিত থাকে। এই জননকোষগুলি দেহের বৃদ্ধিতে কোন অংশ গ্রহণ করে না এবং এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে ধারাবাহিকভাবে সংক্রমিত হতে থাকে। "কাজেই মাতাপিতাকে সন্তানের উৎপাদক অপেক্ষা জনন-কোষের তত্ত্বাবধায়ক বলাই সমীচিন"।[1] জনকের জননকোষ কেবল সন্তানের দেহ-কোষই সৃষ্টি করে তা নয, জননকোষও সৃষ্টি করে। সুতরাং দেহ জননকোষ ধারণ করে মাত্র, দেহের পক্ষে জননকোষ সৃষ্টি করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং বংশ-পরম্পরায় জননকোষের ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে।

(খ) অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় অসংক্রমণ (Nontransmission of Acquired Traits) : ভাইসম্যান-এর মতে ব্যক্তির অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় না। ভাইসম্যান এ সম্পর্কে একাধিক অনুসন্ধান কার্য চালান। তিনি কয়েক পুরুষ ধরে ইঁদুরের লেজ কেটে দিযে দেখলেন যে, কোন পুরুষেই এমন ইঁদুরের জন্ম হল না যার লেজ নেই। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে মাতাপিতার অর্জিত বৈশিষ্ট্যে তাদের জননকোষের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং মাতাপিতার অর্জিত বৈশিষ্ট্য সন্তানে সংক্রমিত হয না। মাতাপিতা সঙ্গীতজ্ঞ হলে যে

1. "Thus the parent is rather the trustee of the germ-plasm than the producer of the child."—Thomson and Geddes : Evolution, p. 116.

ছেলেমেয়েরা সঙ্গীতজ্ঞ হবেই, এমন কোন কথা নেই। ছেলেমেয়ে যে সঙ্গীতজ্ঞ হয় তার কারণ পরিবারের মধ্যে সঙ্গীতের পরিবেশ তাদের মনে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে।

৬। **মেণ্ডেল-এর নীতি (Mendel's Law) :**

অস্ট্রীয়াবাসী ধর্মযাজক গ্রেগর মেণ্ডেল (*Gregor Mendel*) বংশধারা সম্পর্কে আলোচনা করে কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মেণ্ডেল-এর নীতি বংশধারার ক্ষেত্রে সংরক্ষণমূলক প্রবণতার (Conservative Tendency in heredity) উপর আলোকপাত করে। মেণ্ডেল প্রচারিত তত্ত্ব মেণ্ডেলবাদ (Mendelism) নামে পরিচিত।

মেণ্ডেল মটরশুঁটি নিয়ে তার গবেষণা শুরু করেন। তাঁর গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল —দীর্ঘাকৃতির ও খর্বাকৃতির মটরশুঁটি মিশিয়ে, এই দো-আঁশলা বা সঙ্কর জাতীয় মটরশুঁটির বংশধারা কয়েক পুরুষ ধরে পর্যবেক্ষণ করা। তিনি দেখলেন যে দীর্ঘাকৃতি ও খর্বাকৃতির মটরশুঁটির সংমিশ্রণে যে মটরশুঁটি উৎপন্ন হল, তাদের সবগুলি দীর্ঘাকার হল। কিন্তু এরা শুদ্ধ (pure) নয়। দীর্ঘাকারত্ব প্রকট বা সক্রিয় (dominant) থাকায় খর্বাকারত্ব সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় (recessive) রয়েছে। এই দীর্ঘাকারবিশিষ্ট মটরশুঁটি থেকে যে মটরশুঁটি জন্মাল, তার শতকরা ২৪শ ভাগ শুদ্ধ (pure) দীর্ঘাকৃতির, শতকরা ৫ ভাগ মিশ্র (impure) দীর্ঘাকৃতির এবং শতকরা ২৫শ ভাগ শুদ্ধ খর্বাকৃতির। তৃতীয় বংশে দেখা গেল শুদ্ধ দীর্ঘাকারবিশিষ্ট মটরশুঁটি থেকে শুদ্ধ দীর্ঘাকারবিশিষ্ট মটরশুঁটি উৎপন্ন হয়েছে, শুদ্ধ খর্বাকার মটরশুঁটি থেকে শুদ্ধ খর্বাকৃতির এবং মিশ্র দীর্ঘাকৃতির মটরশুঁটি থেকে, শতকরা ২৫ ভাগ শুদ্ধ দীর্ঘাকৃতির, শতকরা ২৫ ভাগ শুদ্ধ খর্বাকৃতির এবং শতকরা ৫০ ভাগ মিশ্র দীর্ঘাকৃতিবিশিষ্ট মটরশুঁটি উৎপন্ন হয়েছে। একটা ছকের সাহায্যে বিষয়টা বুঝে নেওয়া যাক—
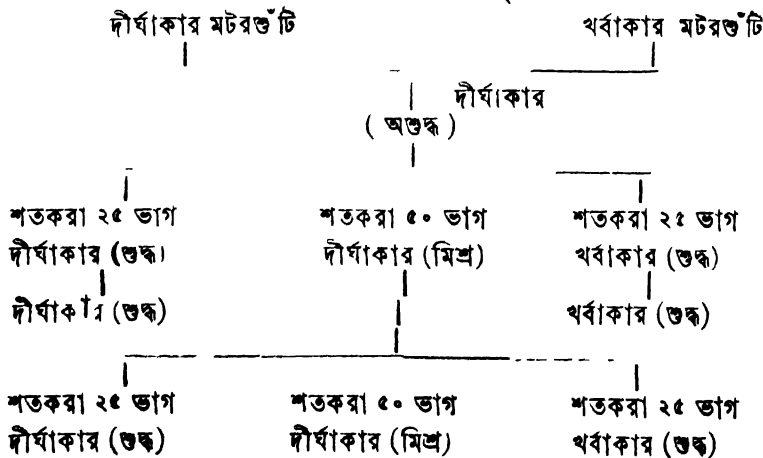
পরবর্তীকালে মেণ্ডেলের গবেষণার ফলাফলগুলিকে উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে বার বার প্রয়োগ করে, তাদের যাথার্থ প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য মেণ্ডেলের নীতির প্রয়োগক্ষেত্রের একটা সীমা আছে। এই নীতি সেই জাতীয় উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা এমন বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যে বৈশিষ্ট্যগুলি কখনও মিশে যেতে পারে না।

উপরিউক্ত গবেষণার ভিত্তিতে মেণ্ডেল সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রথম সঙ্কর জাতীয় জীব বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দু-টি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের যে-কোন একটির মাত্র আবির্ভাব ঘটবে, উভয়ের মিশ্রণ ঘটবে না। এই অনুমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল বংশধারা একক (heredity units) সূত্রের পরিকল্পনা। এই সূত্রটিকে বৈশিষ্ট্য-এককের সূত্র (Law of unit character) নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এই সূত্রের অর্থ হল প্রাণী উত্তরাধিকারসূত্রে মাতাপিতার যে বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেগুলির মূলে কোন বংশধারা এককের প্রভাব বর্তমান। এই বংশধারা একককে বর্তমানে জীন নামে অভিহিত করা হয়। এই জীনগুলি সব সময় জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে। যেমন, কটা চোখের বেড়াল এবং নীল চোখের বেড়ালের বাচ্চা কটা চোখের হবার কারণ মাতাপিতার কাছ থেকে পাওয়া কটা চোখের জীনটি। মেণ্ডেলের গবেষণার দ্বিতীয় অবদান হল সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় (dominant-recessive) জীনের পরিকল্পনা। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জীনটি সক্রিয় বা প্রকট এবং নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত হতে পারে। জীন সক্রিয় হলে নবজাত সন্তানের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে, নিষ্ক্রিয় হলে ঘটে না। যেমন, কটা চোখের বেড়াল এবং নীল চোখের বেড়াল। এদের সব বাচ্চাই হল কটা চোখের, কেননা, কটা চোখের জীন সক্রিয় এবং নীল চোখের জীন নিষ্ক্রিয়। তবে কটা চোখের যে বাচ্চা হল তার মধ্যে নীল চোখের জীনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে রয়েছে যেটি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে দেখা দিতে পারে।

বৈশিষ্ট্য এককের সূত্র

৭। পরিবেশের অর্থ (The Meaning of Environment) ঃ

সাধারণতঃ পরিবেশ বলতে আমরা বুঝে থাকি ব্যক্তির চারপাশের গণ্ডীটুকু; তার পরিপার্শ্বিক অবস্থা। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে 'পরিবেশ' কথাটিকে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানে 'পরিবেশ' বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত প্রভাব যেগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নির্ধারণ করে, ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনয়ন করে। কাজেই এই সব প্রভাব ব্যক্তির চারপাশের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত না

থেকে আরও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকতে পারে। মানুষকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয়। অনেক সময় মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। অনেক সময় মানুষকে তার শক্তি অনুযায়ী পরিবেশকে গঠন করে নিতে হয়।

পবিবেশ বলতে বোঝায় সেই সব প্রভাব যা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নির্ধারণ করে

সাধারণতঃ পরিবেশকে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক এই দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝায় এই পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যা মানুষকে প্রভাবিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থক্যেব জন্যই বিভিন্ন ব্যক্তির দৈহিক গঠন, বর্ণ এবং জীবনযাত্রার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ুর পার্থক্যের জন্য কোন একটি বিশেষ স্থানের অধিবাসী হয় অলস কিংবা কর্মঠ হয়ে উঠতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যে কেবল মাত্র মানুষের আকার, বর্ণ ও স্বভাবের উপরই প্রভাব বিস্তার করে তা নয়, মানুষের চোখ, কান, ত্বক এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের শক্তি ও সামর্থকে প্রভাবিত করে।

পরিবেশ—প্রাকৃতিক ও সামাজিক

প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও রয়েছে মানুষের সামাজিক পরিবেশ। পরিবেশের বিভিন্ন উদ্দীপকের প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া করার মানুষ অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যই মানুষ নিম্নতর প্রাণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। মানুষের কথা বলার, শোনার এবং পরিকল্পনার ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতার জন্য মানুষ নিজের জন্য একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সামাজিক পরিবেশ বলতে বোঝায় মানুষের অতীত ঐতিহ্য এবং বর্তমান মানব-সমাজ। অতীত ঐতিহ্য বলতে বোঝায় ভাষা, শিল্পকলা, ধর্ম, যেগুলি উত্তরাধিকার-সূত্রে মানুষ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে। মানব-সমাজ বলতে বোঝায় মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। পরিবার, বিদ্যালয়, গ্রাম, শহর, সব কিছুই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এসব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যেমন তার নিরাপত্তায় সহায়তা করে, তেমনি তার আচার-ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশেও সহায়তা করে।

মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয় কখনও বা নিজের প্রয়োজনে পরিবেশকে বদলাতে হয়। বস্তুতঃ, মানুষের জীবন তার পরিবেশের সঙ্গে এক নিয়ত সংগ্রামের কাহিনী। ব্যক্তির বিকাশে পরিবেশের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই শিশুর বিকাশে পরিবেশের অবদান কতটুকু সে সম্পর্কে শিক্ষক

যদি অবহিত না হন, তাহলে শিশুকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

৮। পরিবেশ না বংশধারা, কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ? (Which is more important—Heredity or Environment?) ঃ

ব্যক্তির জীবন-গঠনে ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশে, পরিবেশ না বংশধারা, কোন্‌টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ, এই নিয়ে শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

একদল শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, ব্যক্তির জীবন-গঠনে ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বংশধারাই (heredity) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পরিবেশের অবদান একান্তই মূল্যহীন। শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে শিশুর সেই বংশধারাই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের গতি নির্ধারণ করে, পরিবেশের এ ব্যাপারে করণীয় কিছু নেই। পরিবেশ ভাল বা মন্দ হওয়াতে কিছুই যায় আসে না। ব্যক্তির বংশধারার মধ্যে পরিবেশ কোন পরিবর্তন আনতে পারে না। ব্যক্তির বিকাশে ব্যক্তির সহজাত বা উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত স্বভাব বা প্রকৃতিই প্রধান উপাদান। বস্তুতঃ, বংশধারাবাদীরা (hereditarian) এই যুক্তি দেখান যে, একই পরিবেশে বিভিন্ন শিশুকে রেখে দেখা যায় যে, তাদের চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটেছে। তাঁদের মতে এর কারণ শিশুর বংশজ সংলক্ষণগুলিই (hereditary traits) তার চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ নির্ধারণ করে, পরিবেশের এ ব্যাপারে কোন অবদান নেই। বংশধারাবাদীরা শিশুর মানসিক-বিকাশে শিক্ষার গুরুত্বকে তেমন স্বীকার করেন না। যখন শিশুরা শিক্ষকের প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত করতে ব্যর্থ হয়, যখন সুঅভ্যাস গঠনে তারা অপারগ হয়, তখন শিক্ষকরাই মন্তব্য করেন যে, তাদের চরিত্র, শিক্ষা এবং আচরণ বংশধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং শিক্ষার দ্বারা কোন পরিবর্তন সংগঠন করা সম্ভব নয়। অনেক শিক্ষক এরূপও অভিযোগ করেন যে, এই জাতীয় শিশু ক্লাসের শিক্ষার মানকে নিম্নগামী করে দেয়। যার মধ্যে যে সম্ভাবনা নেই তার মধ্যে তা সৃষ্টি করা যায় না।[1] বংশধারা যদি অপরিবর্তনীয় হয় এবং শিশুর চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে বংশধারাই যদি একমাত্র উপাদান হয় তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে, শিক্ষার প্রভাবকে তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দেবেন না, তাঁদের মতে শিশু জন্মগতসূত্রে যে স্বভাবের অধিকারী হচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থা নির্ধারিত হওয়া দরকার; কারণ, শিশু পিতামাতার কাছ থেকে

বংশধারাবাদীদের যুক্তি

তুলনীয়: 1. you cannot make a silk purse out of a sows ears—(ইংরেজী প্রবাদ)

জন্মগতসূত্রে যে শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা বা সামর্থ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেগুলি শিশুর শিক্ষার সীমা নির্ধারণ করে। তাছাড়া একই পরিবেশের সুযোগ-সুবিধা বহু শিশুকে দেওয়া হলেও মাত্র কয়েকটি শিশুই ভবিষ্যৎ জীবনে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করতে পারে। এর কারণ শিশুর জন্মগত প্রকৃতি এবং প্রতিভা। সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, জন্মগত বৈশিষ্ট্য বা বংশজ সংলক্ষণই শিশুর চরিত্র, আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করে।

ফ্রান্সিস গ্যাল্টন (*Francis Galton*), রুশো (*Rousseau*), কার্ল পিয়ার্সন (*Karl Pearson*) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বংশধারাবাদী। এঁরা এঁদের অভিমতের সমর্থনে দুটি যুক্তির ধারা উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমতঃ, তাঁদের মতে শিশুর শারীরিক গুণের সঙ্গে তার নৈতিক গুণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। যেসব শিশুরা স্বাস্থ্যবান তাদের নৈতিক চরিত্র সৎ ও প্রসংশনীয়। শারীরিক গুণ যেহেতু বংশগত-সূত্রে প্রাপ্ত, নৈতিক গুণগুলিও বংশগতসূত্রে প্রাপ্ত। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সিস গ্যাল্টন এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা যেসব গবেষণা-কার্য চালিয়েছেন তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে উল্লেখযোগ্য মানসিক দক্ষতা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা যায়, শিক্ষার দ্বারা লব্ধ নয়।

আর একদল শিক্ষাবিদ্ যাঁদের পরিবেশবাদী (Environmentalist) রূপে অভিহিত করা যায়, তাঁরা শিশুর জীবন-গঠনে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবেশের প্রভাবের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, বংশধারার প্রভাব তাঁদের কাছে মূল্যহীন। তাঁদের মতে শিশু বিচিত্র সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং মানুষের সামর্থের গণ্ডীর মধ্যে তার যে-কোন বিকাশ সম্ভব। একটি মানুষ যা করেছে অনুকূল পরিবেশে অপর মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব। শিশুর মন একতাল নরম কাদার পিণ্ডের মতো। পরিবেশ তাকে খুশীমত যে কোন আকার দিতে পারে। মানুষের পরিবেশ তাকে যেমন গড়ে তোলে, মানুষ তেমনিই গড়ে ওঠে। খ্যাতনামা আচরণবাদী ওয়াটসন (*Watson*) একজন চরম পরিবেশবাদী। তিনি বলেন, "আমাকে যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া হয়, আমি তাকে ইনজিনিয়ার, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ যে কোন কিছুতে গড়ে তুলতে পারি।" শিশুর মানসিক বিকাশে তার পূর্বপুরুষদের প্রতিভা, সামর্থ, বৃত্তি, জাতির প্রভাব তিনি স্বীকার করতে চান না।

পরিবেশবাদীদের যুক্তি

বংশধারাবাদীরা শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে শিক্ষার কোন মূল্য দেন না। পরিবেশ-বাদীরা শিক্ষার উপরই সকল গুরুত্ব আরোপ করেন, বংশধারার উপর কোন গুরুত্ব

আরোপ করেন না। বস্তুতঃ, ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক গঠনের মূলে শিক্ষার অবদানই সবটুকু। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে মানুষ, একদিন বন্য পশুর সামিল ছিল। সেই মানুষ, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কৃষ্টি, কলা, সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্মের এক নতুন ইমারত গড়ে তুলেছে। বংশধারাই যদি বড় হত, তাহলে মানুষ সেই প্রাচীন অসভ্য বন্য পশুর পর্যায়েই থেকে যেত। এছাড়াও, অনেক শিশু, যাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছে উপযুক্ত পরিবেশে, উপযুক্ত তত্বাবধানে থাকার জন্য তারাও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই পরিবেশই মানুষকে গড়ে তোলে নয়ত তার ক্ষতি সাধন করে, বংশধারা নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার।

প্রশ্ন হল, বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদী উভয়ের অভিমতের মধ্যে, কোন্ অভিমত সন্তোষজনক? আমাদের মতে উভয় অভিমতই চরম অভিমত। উভয়েই মনে করে যে বংশধারা এবং পরিবেশ, দুই পরস্পরবিরোধী। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক গঠনে বংশধারা এবং পরিবেশ, উভয়ের অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণও বংশধারা ও পরিবেশ কোন একটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। মনোবিজ্ঞানী স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*)[1] বলেন, "বংশধারা এবং পরিবেশ হল অন্যোন্য নিরপেক্ষ উপাদান" (Heredity and Environment are correlative factors), অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনের বিকাশ বংশগতি এবং পরিবেশ—এই দুই উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অলপোর্টও (*Allport*)[2] ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনিও মনে করেন, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব (personality) তার বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এ প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। বংশধারা ও পরিবেশ উভয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে।

পরিবেশ ও বংশধারা, উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ

পরিবেশের সঙ্গে বংশধারার যথাযথ সম্পর্ক আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারব যদি আমরা একটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যাপারে, বীজ এবং জমি কার কতটুকু অবদান বুঝে নেবার চেষ্টা করি। ভাল বীজের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি লাভ করার শক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু ভাল

1. Sandiford : Educational Psychology.
2. Allport : Personality : A Psychological interpretation.

বা মন্দ কি ভাবে বীজ বেড়ে উঠবে নির্ভর করছে কিরকম মাটিতে সেই বীজ পোতা হচ্ছে। একটি উদ্ভিদ তখনই ভাল ভাবে বেড়ে উঠতে পারে যদি বীজটি ভাল হয় এবং জমিটিও ভাল হয়। বীজ এবং উপযুক্ত জমি এ দুটির কোন একটি ছাড়া কোন উদ্ভিদই ভালমত বেড়ে উঠতে পারে না। বীজ এবং জমি পরস্পর নিরপেক্ষভাবে ক্রিয়া করে না। বীজ এবং জমি পরস্পরনির্ভর। উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার উপরই উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ভর। যদিও রাশিয়ায় লাইসেন্‌কো (*Lysenko*), মিচুরিন (*Mitchurin*) প্রভৃতি এই মত সমর্থন না করে বলেন, পরিবেশের পরিবর্তন করে ব্যক্তি জীবনে বাঞ্ছিত নানা পরিবর্তন আনা সম্ভব। তবু আমরা মনে করি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে বংশধারা এবং পরিবেশ উভয়ই সমান প্রয়োজনীয়। সঙ্গীতের প্রতিভা নিয়ে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে, অনুকূল পরিবেশেই তার সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে পারে। কাজেই শিক্ষাবিদ্ এবং সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বংশধারা বা পরিবেশ কোন্‌টি বড় এ সমস্যা নয়। মানুষ বংশধারা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু একটি পরিবেশেই তার জন্ম হয়। এ অর্থে পরিবেশ তার দ্বিতীয় বংশধারা। বংশধারা স্থির, ব্যক্তির সম্ভাবনাকে বংশধারা সীমিত করে দেয়, কিন্তু পরিবেশ পরিবর্তনশীল। অপরিবর্তনীয় বংশধারা গতিশীল পরিবেশের মধ্যে কিভাবে সার্থকরূপ লাভ করতে পারে, এটাই মূল সমস্যা।

৯। শিক্ষার্থীর উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব: শিক্ষকের কর্তব্য (Influence of heredity and environment on child : Duties of a teacher) :

শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে যখন বংশধারা এবং পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই ক্রিয়া করে, তখন শিক্ষককে উভয় ব্যাপারেই সমান নজর দিতে হবে। শিক্ষককে যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশু তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সহায়তা লাভ করে তেমনি শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীর জন্মগত সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকৃতি জানার চেষ্টা করা এবং তাদের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ঘরে বাইরে শিশু নানা ধরনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। পিতামাতার এবং শিক্ষকের কর্তব্য হবে লক্ষ্য করা, কোন্ ধরনের কাজে শিশুর অনুরাগ বেশী, যাতে প্রয়োজন হলে শিশুর সহজাত আগ্রহ ও অনুরাগের স্ফুরণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশু জন্মসূত্রে যে সামর্থ, প্রবণতা এবং অনুরাগের অধিকারী হয়, উপযুক্ত পরিবেশে, শিক্ষার মাধ্যমেই তার যথাযথ বিকাশ সম্ভব করে তোলা যেতে পারে। উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামাতার কাছ থেকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লাভ করাই শিশুর ক্ষেত্রে বড় কথা নয়।

জগতে সামর্থের থেকেও বেশী মূল্যবান ব্যক্তির কৃতিত্ব ও সফলতা। কাজেই প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সেই সামর্থের বিকাশ। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শারীরিক ও বুদ্ধিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ঠিকমত কাজে লাগাতে শেখানই শিক্ষকের কর্তব্য।

কথনও কথনও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যাশিত উন্নতির অভাব দেখে শিক্ষক হতাশ হয়ে পড়েন এবং মনে করেন যে, বংশধারা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এমন সীমারেখা আরোপ করেছে যা শিক্ষার্থীর পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। একথা সত্য যে বংশধারা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যে সীমা আরোপ করে তা অতিক্রম করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় না, তবে শিক্ষকের কর্তব্য হবে সেই সীমারেখার মধ্যে শিক্ষার্থীর বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করা। শিক্ষকের কর্তব্য হবে বংশধারার প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করে শিক্ষার্থীকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না করা। আবার শিক্ষক যদি বংশধারার প্রভাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শিক্ষা ও অনুশীলনের উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে তিনি হবেন অতিরিক্ত আশাবাদী এবং সেক্ষেত্রে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে গিয়ে সময় ও অর্থের অযথা অপচয় ঘটবে। উত্তরাধিকারসূত্রে শিক্ষার্থী যে ক্ষমতা, অনুরাগ ও প্রতিভার অধিকারী নয়, শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা সৃষ্টি করা সাধারণ ভাবে সম্ভব হয়না। যে প্রতিভা শিক্ষার্থীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সেই প্রতিভার স্ফুরণে যত্নবান হতে পারেন। জন্মসূত্রে পাওয়া ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশের পথে যদি কোন বাধা দেখা দেয়, শিক্ষকের কর্তব্য হবে সেই বাধা দূর করা, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের পথে প্রতিরোধক প্রভাবগুলিকে অপসারিত করা। সেই কারণে শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর জন্মসূত্রে পাওয়া সামর্থ, অনুরাগ, ইচ্ছা প্রভৃতি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তার পরিবেশে সেগুলির বিকাশের যথাযথ সুযোগ করে দেওয়া।

কাজেই শিক্ষককে শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের দিকে বিশেষ করে মনোযোগী হতে হবে। শিশুর বিকাশের সীমারেখা বংশধারাই নির্ধারণ করে দেয়। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগে কার্যসিদ্ধি ঘটে না। যতটুকু সম্ভাবনা ততটুকুকেই বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া যায় মাত্র। শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে তার শারীরিক আকার, আকৃতি ও গঠনের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনেক সময় হীনমন্যতাবোধ দেখা দেয়, যা তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠন ও বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে, তার আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এই জাতীয় শিক্ষার্থীর মন থেকে হীনমন্যতাবোধ যতদূর সম্ভব দূর করার জন্য শিক্ষকের

সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শিশুর বুদ্ধির উপর শিশুর শিক্ষা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কাজেই শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ করা, তার বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করা। শিক্ষক হয়ত তার বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন না। কারণ বুদ্ধ্যঙ্ক পরিবর্তনশীল নয়। তবে অনেক মনোবিজ্ঞানী এই অভিমত স্বীকার করতে নারাজ হলেও বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তনশীলতার বিষয়টি বিতর্কমূলক। শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ জানা থাকলে শিক্ষকের অনেক উদ্বেগ ও অশান্তি দূর হবে। শিশুর মানসপ্রকৃতি নির্ভর করে তার বংশধারার উপরে এবং এই মানসপ্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষা বিশেষভাবে সম্পর্ক-যুক্ত, কাজেই শিক্ষকের কর্তব্য এই মানসপ্রকৃতির স্বরূপকে জানা।

বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করার জন্য শিক্ষকের কতকগুলি কর্তব্য আছে। কোন একটি শ্রেণীর সমান বয়সের ছাত্রদের চেহারা, দৈর্ঘ্য, ওজন, স্বভাব ইত্যাদি বিচার করে দেখলে তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, যাকে অবহেলা করলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। প্রতিটি ছাত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ, রুচি, প্রবণতা, চাহিদার কথা চিন্তা না করে সবাইকে এক দলভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়াও কোন যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি নয়। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপের জন্য নির্ভরযোগ্য অভীক্ষার ব্যবস্থা করা, যোগ্যতা নিরূপিত হবার পর তার যোগ্যতানুসারে তাকে সুযোগ দেওয়া, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও আগ্রহ অনুযায়ী তার পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করা, অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাধারণ ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা না দিয়ে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া, বুদ্ধি ছাড়াও মানসিক, প্রকৃতিগত ও আবেগগত পার্থক্যের কথা স্মরণ রেখে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া, বুদ্ধিগত যোগ্যতা ছাড়াও কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর দক্ষতাকে শিক্ষা ব্যবস্থায় মর্যাদা দেওয়া, পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর ছেলেদের প্রতিভাবান শিশুদের থেকে পৃথক করে শিক্ষা দেওয়া, এগুলি করলেই শিক্ষার্থীর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত যোগ্যতা ও সম্ভাবনার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা হবে। অসমঞ্জস ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশু সমাজের পক্ষে এক বিরাট সমস্যাস্বরূপ, অসমঞ্জস (maladjusted) শিশুদের মানসিক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। শিশুর মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Mental Hygiene) অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট।

পরিবেশের ব্যাপারেও শিক্ষকের করণীয় অনেক কিছু আছে। বিদ্যালয়ে সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত খেলাধুলার ব্যবস্থা করা

শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। শিক্ষার্থীর জন্মগত বৈশিষ্ট্য একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ গঠন করা, শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠাগারের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা, শিক্ষণ-সহায়ক আধুনিক উপকরণের ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে পরিমাপ। সঠিক নির্দেশ, উপদেশ ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচী অনুসরণে সহায়তা করা প্রভৃতির ব্যবস্থা পরিবেশের সাহায্যে বিকশিত হতে পারে। শিক্ষকের এ সত্য বিস্মৃত হলে চলবে না। শিক্ষকের একথা ভুললে চলবে না যে বংশধারার সূত্রে পাওয়া শিক্ষার্থীর সব সম্ভাবনাকেই উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে পরিস্ফুট করা যায়। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সমধিক। স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলেছেন, "শিশু জৈবিক উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সামাজিক উত্তরাধিকারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে" (Child is born with a biological heritage, but he is born into a social heritage).

শিশুর বুদ্ধির প্রভাব শিশুর শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পরিবেশের প্রভাবে শিশুর বুদ্ধির উন্নতি সাধিত হয় না। সাম্প্রতিকালে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী যদিও এর বিপরীত অভিমত পোষণ করেন, সে অভিমত এখনও পুরোপুরি সমর্থন লাভ করে নি।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ব্যক্তি জীবনের বিকাশের জন্য বংশধারা ও পরিবেশের সার্থক সমন্বয় প্রয়োজন, বংশগতি দিয়ে শিক্ষার্থীর জীবনের বিকাশ সুরু হলেও, পরিবেশের সার্থক নিয়ন্ত্রণ তার বিকাশের গতিকে নিরূপণ করে। এদের সার্থক সমন্বয় ছাড়া জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষককে এই সত্য সব সময়েই মনে রাখতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

স্মরণ ও বিস্মরণ

(Remembering and Forgetting)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে যা অনেক সময় আমাদের জাগ্রত চেতনায় সরাসরিভাবে থাকে না। অনেক কিছুর ভিড়ে তা মিশে থাকে। তাই অনেক কিছুর মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়, ঘটনা প্রভৃতিকে চিনে নিতে গেলে আমাদের একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। তাই—

১। স্মৃতি ও স্মরণক্রিয়া কাকে বলে? (What is Memory ?) :

অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব অবিকল পুনরুদ্রেক করার ক্ষমতাকে স্মৃতি (Memory) এবং এই প্রক্রিয়াকে স্মরণক্রিয়া (Recalling) বলা হয়। যেমন, কবিতা মুখস্থ করা। যেমন শোনা হয়েছিল তেমনভাবে মনে রাখা হল স্মৃতি এবং পরে সেটি আবৃত্তি করা হল স্মরণক্রিয়া।

স্মরণক্রিয়াকে সাধারণতঃ দু অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথম অর্থে স্মরণ-ক্রিয়া হল সংরক্ষণ বা ধারণ করা (Retention) এবং দ্বিতীয় অর্থে স্মরণক্রিয়া হল পুনরুদ্রেক (Recall)। একটি ছাত্র তার পঠ্য বিষয়টি বার বার পাঠ করে তাকে মনে ধরে রাখে এবং শিক্ষক যখন ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন তার উত্তর দেবার জন্য বিষয়টির পুনরুদ্রেক করে। প্রশ্ন হল, স্মরণক্রিয়াকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করা হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, স্মরণক্রিয়াকে পুনরুদ্রেক করা অর্থে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য পুনরুদ্রেক করতে গেলেই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করে রাখতেই হবে। মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*) এই অভিমতের সমর্থন করে বলেছেন, "সময় সময় 'স্মৃতি' শব্দটিকে সাধারণ-ভাবে 'ধৃতি' কথাটির সঙ্গে সমার্থক মনে করে ব্যবহার করা হয়। শব্দটির এই জাতীয় প্রয়োগ ব্যাপক ও অসুবিধাজনক। যথাযথ পুনরুদ্রেক অর্থেই এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখা ভাল……।"[1]

স্মরণক্রিয়াকে দু-অর্থে ব্যবহার

1. "Sometimes the word 'memory' is used as synonymous with retentiveness in general. This application of the term is inconsistently wide. It is better to confine it to ideal revival………"

—Stout : Manual of Psychology, Page 521.

সুতরাং স্মরণক্রিয়া হল, মনে সংরক্ষিত এমন একটি পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্রেক করা। অতীতে অভিজ্ঞতা যেভাবে হয়েছে তাকে ঠিক সেভাবেই পুনরুদ্রেক করতে হবে। যদি সেই অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় বা তার যদি কোনরূপ রূপান্তর ঘটে তাহলে তা স্মরণক্রিয়া না হয়ে, হবে কল্পনা। স্মৃতি হল পুনরুদ্রেকমূলক কল্পনা, কারণ এই প্রকার কল্পনায় অতীতের প্রতিরূপগুলির অবিকলভাবে পুনরুদ্রেক করা হয়। গঠনমূলক কল্পনায় প্রতিরূপগুলিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয় এবং একটি নতুন মানসিক চিত্র অঙ্কিত করা হয়।

২। স্মৃতির বিভিন্ন উপাদান (Factors of Memory) :

স্মরণরূপ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত উপাদানগুলি লক্ষ্য করি :

(ক) **শিখন** (Learning) : কোন বিষয় যদি পূর্বে আমরা না শুনে থাকি, বা দেখে থাকি বা শিক্ষা করে থাকি, তাহলে তাকে প্রতিরূপের সাহায্যে স্মরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন কিছু স্মরণ করতে হলে তাকে মনের খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে। এর জন্য আমরা কোন একটি পাঠ বার বার শিক্ষা করি। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে সংবেদন, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি প্রভৃতি ছাড়া শিখন সম্ভব নয়, সেহেতু শিখনকে স্মৃতির উপাদানরূপে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়।

(খ) **সংরক্ষণ** বা **ধারণ** (Retention) : যখন আমরা মন দিয়ে কোন বিষয় বার বার শেখার চেষ্টা করি, তখন বিষয়টি আমাদের মনে ধৃত বা সংরক্ষিত হয়, অর্থাৎ আমরা বিষয়টিকে মনে ধারণ করি। বিষযটি আমাদের চেতন মনের স্তর থেকে অবচেতন মনের স্তরে চলে আসে। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি মানসিক নিদর্শনরূপে বা প্রতিরূপের আকারে অবচেতন মনে রক্ষিত হয়। এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনরুদ্রিক্ত হয় বলেই স্মৃতি সম্ভব হয়। মন যে বিষয়বস্তুকে ধারণ করতে পারে অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেকের দ্বারাই সে কথা প্রমাণ করা যেতে পারে। মনে যা সংরক্ষিত নেই তাকে পুনরুদ্রেক করা সম্ভব নয়।

(গ) **পুনরুদ্রেক** বা **পুনরুৎপাদন** (Recall or Reproduction) : মনে সংরক্ষিত প্রতিরূপগুলিকে ব্যক্ত করার মানসিক ক্রিয়াকেই পুনরুদ্রেক বা পুনরুৎপাদন বলে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মনে জাগিয়ে তোলা বা মনে করাই হল পুনরুদ্রেক। অতীত বা পূর্ব অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করতে হবে। যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করার অর্থ ঘটনার বিন্যাসটিকে অপরিবর্তিত রাখা—ঘটনার পারম্পর্য বজায় রেখে ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে তার প্রতিরূপগুলিকে সেভাবে পুনরুদ্রেক করা। অনুষঙ্গের (Association) জন্যই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়।

(ঘ) **প্রত্যভিজ্ঞা** বা **পুনঃপরিজ্ঞান** (Recognition): অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলির পুনরুৎপাদনেই স্মরণক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। যে অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে পুনরুদ্রেক করা হল তাকে আমারই পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে চিনে নিতে হবে। একেই বলা হচ্ছে প্রত্যভিজ্ঞা বা পুনঃপরিজ্ঞান অর্থাৎ আমি পুনরায় পরিজ্ঞাত হলাম যে, এই অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ, যার পুনরুদ্রেক করা হয়েছে, তার সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপের প্রভেদ নেই। আমি হঠাৎ পথের মাঝে একটি ছেলের দেখা পেলাম এবং আমার স্মরণ হল যে কয়েক বছর আগে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছেলেটি আমার পাশে বসে ভোজ খেয়েছিল। এই যে ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলুম একেই বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞা হল একটা পরিচিতির বোধ বা চেতনা যার অভাব ঘটলে স্মরণক্রিয়া সুনির্দিষ্ট হয় না।

(ঙ) **স্থান-কাল নির্দেশ** (Localisation): নির্ভুল স্মরণক্রিয়া তখনই হয়, যখন ঘটনাটির স্থান-কাল নির্দেশ করা যায় অর্থাৎ স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুদ্রেক হয়। ঘটনাটি কোন্ সময়ে এবং কোথায় ঘটেছিল তা নির্ণয় করতে না পারলে স্মরণক্রিয়ার (Memorisation) সঙ্গে প্রত্যাশার (Expectation) প্রভেদ করা যায় না। বস্তুর পুনরুদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্থান-কাল নির্দেশিত না হয় তাহলে বস্তুর পরিচিতিবোধ ঘটে না, এবং এই পরিচিতিবোধই প্রত্যভিজ্ঞার মূল কথা।

(চ) **ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা** বা **ব্যক্তিগত অভেদ** (Personal Identity): স্মরণক্রিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে আশ্রয় করে সম্ভব হয়। বন্ধু পরিতোষের সঙ্গে দশ বছর আগে এক স্কুলে পড়েছিলাম, দশ বছর পরে আজ তার সঙ্গে আবার দেখা হল। আজকের আমি আর সেদিনের আমি যে এক, উভয়েই যে একব্যক্তি, পৃথক ব্যক্তি নয়—এই বোধ না থাকলে স্মরণক্রিয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা হল মনের অভিন্নতা, দেহের নয়।

স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া বলতে যদি আমরা বুঝি পূর্বোক্ত উপাদানের সমষ্টি তাহলে ভুল হবে। স্মৃতি হল পূর্বোক্ত উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া। স্মৃতি যদিও অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক তবু স্মৃতি-প্রতিরূপের মধ্যে কিছুটা নিজস্ব নতুনত্ব থাকে।

৩। সংরক্ষণ বা ধারণ-সমস্যা (Problem of Retention):

সংরক্ষণ স্মৃতির অন্যতম উপাদান। পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ যদি মনের মধ্যে সংরক্ষিত না হয় তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল, অতীত অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে কিভাবে সংরক্ষিত হয়? এ সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত

আছে ;. যথা--(১) **শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological Theory), (২) **মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ** (Psychological Theory)।

(ক) **শারীরবৃত্তীয় মতবাদ** (Physiological Theory of Permanent Cerebral Modification) : মিল (*Mill*), কারপেণ্টার (*Carpenter*), জেমস (*James*) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ এই মতবাদের প্রবর্তক। মিল ও কারপেণ্টার মনে করেন, যে, যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি উদ্দীপিত হওয়ার ফলে কম্পিত হতে থাকে। প্রত্যক্ষণ শেষ হয়ে গেলেও এই কম্পন ক্ষীণভাবে চলতে থাকে। যদি কোন ভাবে এই কম্পনকে আরও দ্রুত ও তীব্রতর করে তোলা যায়, তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয়।

মিল্ এবং কারপেণ্টার-এর অভিমত

জেম্‌স (*James*)-এর মতে মন এবং চেতনা সমার্থক শব্দ, যেহেতু মন এবং চেতনা সমব্যাপক। অচেতন মনের কোন অস্তিত্ব-সম্ভব নয়। কাজেই যা চেতনার বাইরে, তা মনেরও বাইরে, সুতরাং তাকে মানসিক বলা যেতে পারে না। অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ দৈহিক প্রক্রিয়া। প্রত্যক্ষণ কার্য সমাপ্ত হলে মস্তিষ্কে কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের পথেই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়।

জেম্‌স-এর অভিমত

সমালোচনা : অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও স্মরণক্রিয়ার ব্যাপারে মস্তিষ্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কিন্তু সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে একটি দৈহিক প্রক্রিয়া—এটা মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এ মতবাদ নিম্নলিখিত কারণে গ্রহণযোগ্য নয় :

(১) স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়া হল একটা মানসিক প্রক্রিয়া, সুতরাং দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না। মনের সাহায্যেই মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত।

(২) মিল এবং কারপেণ্টার যে স্নায়ু-কম্পনের কথা বলেছেন, তার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন কম্পন ধীর, কোন কম্পন দ্রুত, কখনও কম্পন ক্ষীণ, কখনও তীব্র, কিন্তু কম্পনের যদি কেবল মাত্র পরিমাণগত পার্থক্য থাকে, কোন গুণগত পার্থক্য না থাকে তাহলে কম্পনগুলির পারস্পরিক পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব নয়।

(৩) জেম্‌স-এর মতে মস্তিষ্কে স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হয় এবং এই স্মৃতিরেখাগুলির প্রভাবেই পুরাতন অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয়। কিন্তু মস্তিষ্কে স্মৃতিরেখা অঙ্কিত হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষণের দ্বারা সমর্থিত নয়।

(৪) মস্তিষ্ককেই যদি অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ কেন্দ্র বলে মনে করা যায়, তাহলে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য অভিজ্ঞতা ঘটে, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র পরিসরে এত অভিজ্ঞতা কিভাবে সংরক্ষিত হতে পারে ?

(৫) এই মতবাদ অনুযায়ী মস্তিষ্কের মধ্যে পরিবর্তনই স্মৃতিকে সম্ভব করে তোলে, কাজেই স্মরণ প্রক্রিয়াটি দৈহিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। এই মতবাদ জড়বাদের সমর্থক, সেহেতু জড়বাদের সব দোষ এই মতবাদেও বিদ্যমান।

৬) জেমস-এর মতে অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয় না, মনের বাইরে থেকে অর্থাৎ মস্তিষ্ক থেকে সেগুলি মনে আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, মনের মধ্যে যা সংরক্ষিত হয় না, তা মনের মধ্যে কিভাবে উদিত হতে পারে ?

(৭) মিল এবং কারপেণ্টার অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কথা বলছেন, তাহলে সিদ্ধান্ত করতে হয় সচেতন মস্তিষ্ক-ক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব কি সম্ভব ?

(খ) মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ (**Psychological Theory : Theory of Sub-conscious Mental Modification**) **:** এই মতবাদ অনুসারে স্মৃতি দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, মানসিক প্রক্রিয়া। অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূপের আকারে মনের অর্ধচেতন স্তরে (**Sub-conscious level**) রক্ষিত হয়। এই প্রতিরূপ বলতে বোঝায় অর্ধচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তন (**Sub-conscious mental modification**)। অবশ্য এর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের সংগঠনের কিছু পরিবর্তন ঘটে। পরে প্রতিরূপগুলি অবচেতন স্তর থেকে চেতন স্তরে আত্মপ্রকাশ করলেই আমরা অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি।

স্মৃতি দৈহিক প্রক্রিয়া নয়, মানসিক প্রক্রিয়া

আমাদের মতে এই মতবাদই সন্তোষজনক। মনের অবচেতন স্তরের কল্পনা ছাড়া স্মৃতিকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা আগেই দেখেছি, যা চেতনার বহির্ভূত তা মনের বহির্ভূত নয়। কোন অভিজ্ঞতা যখন চেতনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তখন মনের অবচেতন স্তরে একটি ছাপ হিসেবে সেটি সংরক্ষিত থাকে এবং ভবিষ্যতে কোন উদ্দীপক উপস্থিত হলে চেতনলোকে উদ্ভাসিত হয়।

মনস্তাত্ত্বিক মতবাদই সন্তোষজনক

৪। সংরক্ষণের প্রমাণ (Proof of Retention) :

আমরা যে কোন বিষয় শেখবার পর তা মনের মধ্যে সংরক্ষিত করতে পারি তা তিন ভাবে প্রমাণ করা চলে। যথা—

(ক) পরীক্ষার সময় আমরা শেখা বিষয়ের পুনরুদ্রেক করতে পারি। এই পুনরুদ্রেক সম্ভব হয় যেহেতু শেখা বিষয় আমরা মনের মধ্যে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

(খ) প্রশ্নের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে দেওয়া হয়েছে, এমন পরীক্ষায় যেসব প্রশ্নের উত্তর সত্য বা যথার্থ তাদের পাশে '*T*' এবং যেগুলি মিথ্যা তাদের পাশে '*F*' লিখতে হবে। এটা আমরা করতে পারি কারণ পাঠ্য-পুস্তক থেকে যে বিষয়গুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি আমরা চিনে নিতে পারি এবং যেগুলি পাঠ্যপুস্তক থেকে নেওয়া হয়নি তার সঙ্গে তুলনা করে বিচার করে দেখতে পারি। এই যে চিনে নেওয়া বা পুনঃপরিজ্ঞানের ব্যাপার, এটা সম্ভব হয় যদি শেখা বিষয় মনে ধরে রাখা যায়।

(গ) যে বিষয়টি একেবারে ভুলে গেছি, সেটি পুনরায় শিখতে গিয়ে দেখা যায় পূর্বের তুলনায় অনেকখানি সময় বেঁচেছে। এই সময় বাঁচাবার বিষয়টিকে কেবল-মাত্র ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এইভাবে যে, যা কিছু শেখা যায় তা মনে কোন না-কোন রকম ভাবে সংরক্ষিত হয়, এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে সংরক্ষণ সম্ভব।

৫। স্মরণক্রিয়ার শর্ত (Conditions of Remembering) :

স্মরণক্রিয়ার প্রধান উপাদান দুটি—(১) **সংরক্ষণ** বা **ধারণ** (Retention) এবং (২) **পুনরুদ্রেক** বা **পুনরাবৃত্তি** (Recall or Reproduction)। সুতরাং স্মরণক্রিয়ার শর্ত হল আসলে সংরক্ষণ বা ধারণ এবং পুনরুদ্রেকের শর্ত। সোজা কথায় বলা যায়, কোন্ কোন্ অবস্থায় আমরা অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করতে পারি এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় তার পুনরুদ্রেক করতে পারি, এই উভয় প্রকার শর্ত।

(1) **সংরক্ষণের শর্তাবলী বা কোন্ কোন্ অবস্থায় বিষয়টি মনে ধারণ করতে পারি?** প্রথমতঃ, দেহ ও মস্তিষ্কের সুস্থ ও সতেজ অবস্থা কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করার পক্ষে খুবই উপযোগী। দেহ যদি সুস্থ থাকেএবং সেই অবস্থায় যদি কোনকিছু শেখা যায় তাহলে তা সহজেই মনে রাখা সম্ভব হয়।

দেহ ও মস্তিষ্কের সুস্থ ও সতেজ অবস্থা

দ্বিতীয়তঃ, উদ্দীপকের তীব্রতার উপরও ধারণ করার শক্তি নির্ভর করে। বেশ জোরে কেউ যদি কথা বলে, খুব তীব্র আলোক যদি চোখে এসে পড়ে, তাহলে সেগুলিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে ধরে রাখা যায়। ক্ষীণ আলোক বা ক্ষীণ স্বর মনে যে ছায়াপাত করে তা অধিক কাল ধরে রাখা যায় না।

উদ্দীপকের তীব্রতা

তৃতীয়তঃ উদ্দীপক যদি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয় তাহলে বিষয়টিকে সহজেই মনে ধারণ করা যায়। যে চিত্রখানি বেশ স্পষ্ট, তাকে যেমন সহজে মনে ধারণ করা যায়, অস্পষ্ট রঙের কোন সংমিশ্রণের ছাপ মনে সেভাবে মুদ্রিত করা যায় না।

উদ্দীপকের স্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা

চতুর্থতঃ, উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব বিষয়টিকে মনে ধারণ করার অন্যতম উল্লেখযোগ্য শর্ত। যে গানের বেশ কয়েক সেকেণ্ডে মিলিয়ে যায় তাকে মনে রাখা যায় না। কিন্তু অধিক সময় ধরে যে গানের সুরটি কানে ভাসতে থাকে তাকে মনে ধরে রাখা যায়।

উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব

পঞ্চমতঃ, উদ্দীপকের পৌনঃপুনিকতা (frequency) বিষয়বস্তুকে মনে ধরে রাখার পক্ষে সহায়ক। কতবার ঘটনাটি ঘটেছে, তার উপর ধারণক্রিয়া নির্ভর করে। অনেকবার একটি কবিতা পড়ে তবে তাকে আমরা মনে রাখতে পারি। শিক্ষক মহাশয় বার বার পাঠ্য বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করে ছাত্রদের সেটি মনে রাখতে সহায়তা করেন।

উদ্দীপকের পৌনঃপুনিকতা

ষষ্ঠতঃ, উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা (Recency) বিষয়টিকে মনে রাখতে সহায়তা করে। কতকাল পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে তাও বিষয়টিকে মনে ধারণ করার অন্যতম শর্ত। যে ঘটনাটি কয়েক মাস আগে ঘটেছে তাকে যেমন সহজেই মনে ধরে রাখতে পারি, যে ঘটনা দশ বছর আগে ঘটেছে তাকে তেমন করে ধরে রাখা যায় না, কালের গতিতে মন থেকে তা মুছে যায়।

উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা

সপ্তমতঃ, বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ, বিষয়টিকে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। কোন একটি পাঠ শেখার সময় যদি ছাত্রের সে বিষয়ে মনোযোগ না থাকে, তাহলে সেই বিষয়টিকে মনে ধারণ করা যায় না।

মনোযোগ

অষ্টমতঃ, বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগও বিষয়টিকে মনে রাখার পক্ষে উপযোগী। সাধারণতঃ দেখা যায়, এক এক মানুষের এক এক বিষয়ে অনুরাগ থাকে। যার খেলাধুলার প্রতি অনুরাগ, সে বিভিন্ন খেলোয়াড়দের নামধাম, কবে কোথায় কোন্ খেলাটি হয়েছিল ইত্যাদি যত সহজে মনে ধরে রাখতে পারে অন্য ব্যক্তির পক্ষে, সে যে বিষয়ে অনুরাগী নয়, সেগুলিকে মনে রাখা সহজ হয় না।

অনুরাগ

নবমতঃ, সংরক্ষণের ইচ্ছাও বিষয়টিকে মনে ধরে রাখতে অনেকখানি সহায়তা করে। শিশুর মনে করে যে বিষয়টি পড়া যায় সেটাকে সহজেই মনে রাখা যায়।

সংরক্ষণের ইচ্ছা

দশমতঃ, বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি বিষয়টিকে মনে ধারণ করার পক্ষে খুবই সহায়ক। ভাল করে না বুঝে কোন পাঠ্য বিষয় বার বার পড়লেও তাকে মনে রাখা যায় না। কিন্তু বিষয়বস্তুটির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সংযোগের সম্পর্ক অবহিত হয়ে যদি বিষয়টিকে মনে রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে বিষয়টিকে সহজে মনে রাখা যায়।

বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি

একাদশতঃ, সংপ্রত্যক্ষ (apperception) সংরক্ষণের পক্ষে খুবই সহায়ক। সংপ্রত্যক্ষ মানে পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ করা।

সংপ্রত্যক্ষ

দ্বাদশতঃ, যে সব ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) অপেক্ষাকৃত বেশী তারা খুব তাড়াতাড়ি অধিক বিষয় শিক্ষা করতে পারে এবং মনে ধরে রাখতে পারে।

বুদ্ধ্যঙ্ক

ত্রয়োদশতঃ, বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তাও বিষয়টিকে সহজে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। যে বিষয় চিত্তাকর্ষক বা হৃদয়গ্রাহী হয় তাকে সহজেই মনে ধরে রাখা যায়।

বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তা

সর্বশেষে, ঘটনার গুরুত্ব সহজেই ঘটনাটিকে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। মানুষের জীবনে যে অজস্র ঘটনা ঘটে বা অসংখ্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তার কটিই বা সে মনে রাখতে পারে? যে সব ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ, যে সব অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য, যেগুলি আমাদের মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যায়, যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে সেগুলিকে সহজে মনে রাখা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তির মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটেছে সেই অভিজ্ঞতার কথা তিনি সুদীর্ঘকাল মনে ধরে রাখতে পারবেন।

ঘটনার গুরুত্ব

এ ছাড়াও জীবনের কোন কোন অবস্থা বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের পক্ষে উপযোগী বা অনুপযোগী। যেমন, শৈশবে যত শীঘ্র বিষয়বস্তু মুখস্থ করা চলে, বার্ধক্যে তেমন সম্ভব হয় না।

(ii) **পুনরুদ্রেকের শর্তাবলী বা কোন্ কোন্ অবস্থায় বিষয়টির পুনরুদ্রেক করা যায়? (Conditions of Reproduction):** কোন বিষয়ের পুনরুদ্রেক বিষয়বস্তুটিকে মনে ধারণ করার উপর নির্ভর করে। সুতরাং যে সব অবস্থা বা শর্ত বিষয়বস্তুকে মনে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন সেগুলি পুনরুদ্রেকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

সংরক্ষণের শর্তগুলি হল পুনরুদ্রেকের শর্ত

প্রথমতঃ, অভিভাবন (Suggestion) এবং অনুষঙ্গ (Association of Ideas) বিষয়টির পুনরুদ্রেকের পক্ষে সহায়ক। বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রতিরূপগুলি আমাদের মনের মধ্যে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে আছে। সে কারণে কোন একটি ঘটনা অভিভাবনের ফলে অন্য ঘটনাটির প্রতিরূপগুলিকে মনে জাগিয়ে তোলার জন্য স্মৃতিচিহ্নরূপে কাজ করতে পারে। উদাহরণ-

অভিভাবন এবং অনুষঙ্গ

স্বরূপ, শৈশবে যে বিদ্যালয়ে পড়েছি, তার সামনে পরবর্তীকালে গিয়ে দাঁড়ালেই স্কুল-জীবনের স্মৃতি মনে এসে যায়। বন্ধুর দেওয়া আংটিটি বন্ধুর স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে। পুনরুদ্রেকের জন্য যে অনুষঙ্গ কাজ করে, তা নিষ্ক্রিয় অনুষঙ্গ নয়, সক্রিয় অনুষঙ্গ (active association)। অর্থাৎ পুনরুদ্রেকের জন্য মানসিক সক্রিয়তার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, যে প্রসঙ্গে (Context) ঘটনাটি ঘটেছিল সেই প্রসঙ্গটিও ঘটনাটির পুনরুদ্রেক সহজ করে তোলে। কোন একটি ঘটনা মনে করতে চাইছি কিন্তু স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু যখনই মনে পড়ল যে ঘটনাটি আমার কলেজ-জীবনের প্রথম দিনটিতে ঘটেছে এবং কোন অধ্যাপক মহাশয় আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রসঙ্গে ঘটেছে তখনই ঘটনাটি মনে পড়ে গেল।

ঘটনাটির প্রসঙ্গ

তৃতীয়তঃ, মনের অনুরাগ যে বিষয়ের উপর নিবদ্ধ থাকে তার উপরই নির্ভর করে কোন্ বিষয়টির পুনরুদ্রেক হবে। অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে যখন আলমারিতে সাজান বইগুলির দিকে তাকালাম, তখন সেই মুহূর্তে আমার অনুরাগ সেদিকে ধাবিত হয় এবং সেই অনুযায়ী ঘটনার পুনরুদ্রেক হয় অর্থাৎ আমার বইগুলির বিষয়বস্তুর কথা মনে আসতে পারে। বইগুলি কোন্ দোকান থেকে কিনেছি সেকথা মনে জাগতে পারে বা বইগুলির কত দাম তাও মনে পড়তে পারে। যে বিষয়টির প্রতি আমার অনুরাগ সেটিই নির্ধারণ করে দেবে যে কোন্ ঘটনাটির পুনরুদ্রেক হবে।

অনুরাগ

৬। পুনরুদ্রেক বা পুনরুৎপাদন-সমস্যা (Problem of Reproduction):

স্মৃতি সম্ভব হয় যদি আমার মনের মধ্যে সংরক্ষিত বিষয়বস্তুকে প্রয়োজনমত পুনরুদ্রেক করতে পারি। কিন্তু এই পুনরুদ্রেক কিভাবে সম্ভব হয়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অভিভাবন প্রক্রিয়া (Process of Suggestion) এবং অনুষঙ্গের নিয়মের (Laws of Association) দ্বারাই একটি বিষয় আর একটি পুরাতন বিষয়কে মনে জাগিয়ে তোলে।

অভিভাবন ও অনুষঙ্গ

অভিভাবন প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝি? অভিভাবন প্রক্রিয়া হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিরূপ অপর একটি প্রতিরূপকে পুনরুদ্রিক্ত বা পুনরুৎপাদিত করে। অনুষঙ্গ হল একটি প্রত্যক্ষরূপ ও তার ধারণার মধ্যে 'সংযোগ' বা একটি ধারণার সঙ্গে আর একটি ধারণার সংযোগ। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যাক: আগ্রার তাজমহল ও তার

এদের স্বরূপ

স্রষ্টা সম্রাট শাহজাহান। তাজমহলের কথা ভাবলেই শাহজাহানের কথা মনে পড়ে যায়। উভয়ের মধ্যে যে মানসিক সংযোগ তাহল অনুষঙ্গ এবং প্রথমটির প্রতিরূপ যে দ্বিতীয়টির প্রতিরূপকে অবচেতন মনের স্তর থেকে চেতনস্তরে টেনে নিয়ে আসছে তাকেই বলা হয় অভিভাবন প্রক্রিয়া।

অভিভাবন-এর স্বরূপ

অনুষঙ্গ নিয়ম এবং অভিভাবন প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। দুটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ বা অনুষঙ্গ না থাকলে একটির আর একটিকে পুনরুদ্রেক করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অনুষঙ্গ নিয়মের মাধ্যমেই অভিভাবন প্রক্রিয়া ক্রিয়া করে। প্রতিরূপগুলি অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বলেই ওদের একটি অপরটিকে অভিভাবিত (Suggest) করতে পারে। যেমন, তাজমহলের প্রতিরূপ শাহজাহানের প্রতিরূপ অভিভাবিত করে, কারণ তাজমহলের সঙ্গে শাহজাহান অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ। সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতা কিভাবে অনুষঙ্গবদ্ধ হয় তার আলোচনা করলেই, অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক কিভাবে হয় তা জানা যাবে।

অভিভাবন ও অনুষঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত

যে নিয়ম অনুসারে পূর্ব অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিরূপগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে অনুষঙ্গ নিয়ম বলে।

আধুনিক মনোবিদ্যায় তিন প্রকার অনুষঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে—যথা, (১) **সান্নিধ্য অনুষঙ্গ** (Association of Contiguity), (২) **সাদৃশ্য অনুষঙ্গ** (Association of Similarity) এবং (৩) **বৈপরীত্য অনুষঙ্গ** (Association of Contrast)। এই তিন প্রকারের অনুষঙ্গের ভিত্তিতে আমরা তিনটি নিয়ম পাই। যথা—

অনুষঙ্গের তিনটি নীতি

(ক) সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contiguity): অতীতে যে সব বস্তু, স্থানের এবং কালের দিক থেকে পরস্পরের কাছাকাছি রূপে জ্ঞাত হয়েছে, তাদের প্রতিরূপগুলি সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম অনুসারে অনুষঙ্গবদ্ধ হয় এবং একটির প্রতিরূপ মনে জাগলে অপরটিরও মনে জেগে ওঠে। যেমন—কমলালেবুর প্রতিরূপ তার মিষ্টি আস্বাদ ও গন্ধের প্রতিরূপের কথা মনে জাগিয়ে তোলে। হেমলেটের প্রতিরূপ সেক্সপীয়রকে মনে জাগিয়ে তোলে; শান্তিনিকেতনের প্রতিরূপের কথা মনে হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিরূপের কথা মনে পড়ে যায়। এই সান্নিধ্য দুরকমের হতে পারে: (i) **স্থানগত**

সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম

সান্নিধ্য (Spatial Contiguity) এবং (ii) **কালগত সান্নিধ্য** (Temporal Contiguity)। স্থানগত সান্নিধ্যের উদাহরণ—যেমন, হাওড়া ব্রীজ ও হাওড়া স্টেশন, বোলপুর ও শান্তিনিকেতন। কালগত সান্নিধ্যের উদাহরণ—বিদ্যুতের চমক ও বজ্রধ্বনি। হাওড়া ব্রীজ এবং হাওড়া স্টেশন পরস্পরের কাছাকাছি। এদের একই সঙ্গে আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি, কাজেই স্থানগত নৈকট্য বা সান্নিধ্যের জন্য উভয়ের প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়। আবার বিদ্যুৎ চমকাবার অব্যবহিত পরেই আমরা বজ্রধ্বনি শুনতে পাই। এই অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হয়েছে, কাজেই কালগত নৈকট্যের জন্য উভয়ের প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে।

স্থানগত ও কালগত সান্নিধ্য

অভিজ্ঞতার স্থানগত সান্নিধ্যের জন্য যে অনুষঙ্গ হয় তাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন সমকালীন অনুষঙ্গ (Simultaneous Association) এবং কালগত সান্নিধ্যের জন্য যে অনুষঙ্গ হয় তাকে বলেছেন আনুক্রমিক অনুষঙ্গ (Successive Association)।

(খ) **সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Similarity)ঃ** যদি দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যে আকার বা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য থাকে, একটি অপরটির সাদৃশরূপে জ্ঞাত হয়, তাহলে প্রতিরূপগুলিও পরস্পরের সদৃশ হওয়ার জন্য পরস্পরের সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়। একটির প্রতিরূপ অপরটির কথা মনে জাগিয়ে তোলে। রামের সঙ্গে শ্যামের আকৃতিগত সাদৃশ্য পূর্বে জ্ঞাত হয়েছি, সে কারণে রামকে দেখলেই শ্যামের কথা মনে পড়ে যায়।

(গ) **বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contrast)ঃ** দুটি বিষয়ের মধ্যে বৈপরীত্য থাকলে একটির প্রতিরূপ অপর প্রতিরূপকে মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন—জীবনের দুঃখের দিনগুলির কথা মনে করলে সুখের দিনগুলির কথা মনে জেগে ওঠে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রির কথা মনে করিয়ে দেয়। সুন্দর-কুৎসিতের কথা, আলো-অন্ধকারের কথা, মোটা লোক-রোগা লোকের কথা মনে জাগিয়ে তোলে।

পূর্বোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ নীতি ছাড়াও আরও কয়েকটি নীতি আছে যেগুলি অনুষঙ্গকে সুদৃঢ় করে এবং বিষয়ের পুনরুদ্রেকের সহায়তা করে। যথা—

(i) **সাম্প্রতিকতার নীতি (Law of Recency)ঃ** কোন ধারণা অন্য আর একটি ধারণাকে সহজেই পুনরুদ্রেক করে যেহেতু সাম্প্রতিক উভয়ের মধ্যে অনুষঙ্গ ঘটেছে। যেমন—'উপন্যাস' কথাটি উচ্চারিত হলেই আমরা সেই উপন্যাসটির কথা স্মরণ করি যেটি সম্প্রতি পড়েছি।

(ii) পৌনঃপুনিকতার নীতি (Law of Frequency) : যে ধারণার সঙ্গে অন্য ধারণার বার বার অনুষঙ্গ ঘটেছে, তাদের একটি অপরটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন, আগুন দেখলেই দাহিকা শক্তির কথা মনে পড়ে।

(iii) প্রাথমিকতার নীতি (Law of Primacy) : প্রথম ছাপ বা অনুষঙ্গ মনের মধ্যে দীর্ঘকাল সংরক্ষিত হয় এবং সহজেই তার পুনরুদ্রেক করা চলে। যেমন, স্কুলের বা কলেজের প্রথম দিনটি।

(iv) সুস্পষ্টতার নীতি বা আগ্রহের তীব্রতা (Law of Vividness or the Intensity of Interest) : যে অভিজ্ঞতার ছাপ বা অনুষঙ্গ যত সুস্পষ্ট, তত সহজে তার পুনরুদ্রেক সম্ভব। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের দিনটি আজও আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে আছে এবং দিনটিকে আমি স্মরণ করতে পারি।

৭। অনুষঙ্গ-নীতিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ (Inter relation of Laws of Association) :

কোন্ নীতিটি মৌলিক

পূর্বোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। অনেকে মনে করেন এই তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম সমান মৌলিক। কিন্তু এ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্রশ্ন হল, এই তিনটি অনুষঙ্গ নিয়মের মধ্যে কোন্ নিয়মটি মৌলিক।

বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম মৌলিক নিয়ম হতে পারে না : বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contrast) স্বতন্ত্র ও মৌলিক নীতি হতে পারেনা। এক হিসেবে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়মকে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়মের (Law of Similarity) প্রকারভেদ বলেই মনে করা যেতে পারে। 'সাদা ও কালো'—এই রঙ দুটিকে আমরা পরস্পরের বিপরীত বলে মনে করি। কিন্তু এই বৈপরীত্যের পেছনে সাদৃশ্য আছে, কেননা, সাদা ও কালো উভয়ই বর্ণ, সুতরাং উভয়ের মধ্যে জাতিগত (generic) সাদৃশ্য আছে। অনুরূপভাবে, সুখ আমাদের দুঃখের কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ সুখ হল দুঃখের বিপরীত। কিন্তু এখানেও সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সুখ-দুঃখ উভয়ই অনুভূতি। এখানেও জাতিগত সাদৃশ্য আছে।

বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় নীতি মৌলিক নীতি নয়

মনোবিদ্ টিচ্‌নার (*Titchener*)-এর মতে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের প্রকারভেদ—এ যুক্তি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। সাদা কালোর প্রতিরূপ

জাগিয়ে তোলে, যেহেতু উভয়ই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়ের মধ্যে জাতিগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু অন্তর্দর্শনে এই বর্ণ ধরা পড়ে না। তাছাড়া, সাদৃশ্য অনুষঙ্গ চিন্তামূলক; বৈপরীত্য অনুষঙ্গ অনুভূতিমূলক, কেননা বৈপরীত্য অনুষঙ্গে বিরোধিতার বেদনা উপস্থিত থাকে। টিচ্‌নারের মতে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের (Law of Contiguity) প্রকারভেদ; কেননা, দুটি বিপরীত বিষয়ের ধারণার মধ্যে সান্নিধ্য আছে এবং ধারণা দুটি একসঙ্গে মনের মধ্যে গঠিত হয়; যেমন, অন্ধকারের ধারণা ছাড়া আলোর জ্ঞান হয় না।

এখন সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Similarity) এবং সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contiguity) এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি মৌলিক, সেটিই হল প্রশ্ন—এ বিষয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

মনোবিদ্ স্পেন্সার (*Spencer*)-এর মতে সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম হল মৌলিক নিয়ম এবং সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের মধ্যে মূলতঃ সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়মই ক্রিয়া করে।

স্পেন্সার-এর মতে সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নীতিই হল মৌলিক নীতি

স্থানগত সান্নিধ্যের মূলে আছে স্থানগত সাদৃশ্য এবং কালগত সান্নিধ্যের মূলে আছে কালগত সাদৃশ্য। আমি পূর্বে রাম ও যদুকে একসঙ্গে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। স্থানগত সান্নিধ্যের জন্য রাম ও যদুর প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে এবং রামকে দেখলে যদুর প্রতিরূপ মনে জেগে ওঠে। আসলে আমি যখন রামকে প্রত্যক্ষ করলাম, তখন মনের অবচেতন স্তরে রামের যে প্রতিচ্ছবিটি রয়েছে, রামের প্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যবশতঃ সেটি মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হল এবং রামের প্রতিরূপের সঙ্গে সান্নিধ্য সম্বন্ধে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে আছে যদুর প্রতিরূপ, সেহেতু যদুর প্রতিরূপও মনে ভেসে উঠল।

মনোবিদ্ জেম্‌স (*James*)-এর মতে সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contiguity) হল মূল নিয়ম এবং এই নিয়ম এবং নিয়মের সাহায্যেই সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জেম্‌স-এর মতে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়মটি ক্রিয়া করতে পারে; কেননা, দুটি সদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য অধিকমাত্রায় থাকলেও আংশিক

জেম্‌স-এর অভিমত অনুযায়ী নৈকট্য সম্বন্ধীয় নীতিই হল মূল নীতি

পার্থক্য থাকে। যেমন, 'হরেন' নামটি শুনলে 'হরেশের' কথা মনে পড়ে। উভয় নামের অক্ষরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে 'হরে' শব্দটিকে নিয়ে। কাজেই 'হরেন' শব্দটির 'হরে' শুনলেই, 'হরেশ' শব্দটির 'হরে'-র কথা মনে পড়ে যায় এবং শেষের 'হরে' শব্দটির সঙ্গে সান্নিধ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে রয়েছে 'শ' অক্ষরটি, কাজেই সান্নিধ্য অনুষঙ্গ

নিয়ম অনুসারে অবশিষ্ট অক্ষর 'শ'টি মনে পড়ল। শেষোক্ত নিয়মের জন্যই হরেন 'হরেশ'কে মনে পড়িয়ে দিল।

পূর্বোক্ত অভিমত দুটির কোনটিই যুক্তিযুক্ত নয়। 'নৈকট্য সম্বন্ধীয় নীতি' এবং 'সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নীতি'—দুটি ভিন্ন নীতি এবং একটিকে আর একটি থেকে অনুসৃত করা চলে না।

হ্যামিলটন (*Hamilton*) পূর্বোক্ত দুটি নিয়মকে একটি মূল নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করছেন। এই নিয়মটি হল সমগ্রীকরণ সম্বন্ধীয় নিয়ম (Law of Redintegration)।

হ্যামিলটন-এর সমগ্রীকরণ সম্বন্ধীয় নীতি

এই নিয়মের অর্থ হল—একটি সমগ্র অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ যদি মনে পড়ে, তাহলে সেই অংশবিশেষ সমগ্র অভিজ্ঞতাটিকেই মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। যেমন—বোলপুর, শান্তিনিকেতন, সব মিলে আমার একটি সমগ্র অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই বোলপুরের প্রতিরূপ মনে জাগলে শান্তিনিকেতনের প্রতিরূপ মনে জাগে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা একত্রে অনুভূত হলে, মনের সামগ্রিক অবস্থার (a whole mental state) অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কাজেই মনের এই সামগ্রিক অবস্থার অংশবিশেষ মনের সামগ্রিক অবস্থাটিকে না জাগিয়ে, অন্য অংশবিশেষকে জাগাতে পারে না। বস্তুতঃ, আমাদের মনের ধর্মই হল বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ সামগ্রিক রূপকে মনের মধ্যে ধরে রাখা।

হ্যামিলটনের মতে সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম, সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম এবং বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ নিয়ম—এই তিনটি নিয়মকেই সমগ্রীকরণ সম্বন্ধীয় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

পুনরুদ্রেকের প্রকারভেদ (Types of Reproduction): পুনরুদ্রেক দু প্রকার—প্রত্যক্ষ (direct) এবং পরোক্ষ (Indirect)। প্রথম ধরনের পুনরুদ্রেকের ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে মনে করবার জন্য অন্য ধারণার প্রয়োজন হয় না, যেমন হরির কথা বললেই মধুর কথা মনে পড়ে। পরোক্ষ পুনরুদ্রেকের ক্ষেত্রে অন্য ধারণার প্রয়োজন হয়। যেমন হরির কথা বললে যতীনের (মধুর ভাই) কথা মনে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রথমে মধুর কথা মনে পড়ে। তারপর যতীনের কথা মনে পড়ে। মনোবিজ্ঞানী মিচোটি আর পোর্টিচ (Michotte & Portych) দু-প্রকার পুনরুদ্রেকের উপর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।

৮। স্মৃতির প্রকার ভেদ (Kinds of Memory):

(ক) আসল স্মৃতি এবং অভ্যাসমূলক স্মৃতি: বার্গসোঁর (Bengson) মতে স্মৃতি দু প্রকার—আসল স্মৃতি (True Memory) এবং অভ্যাসমূলক স্মৃতি (Habit

Memory)। অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল কোন বিষয় নিছক মুখস্থ আওড়ান। এ হল দেহনির্ভর ও যান্ত্রিক। আসল স্মৃতি হল, স্বাধীনভাবে, কোন কিছুর উপর নির্ভর না করে বিষয়বস্তুকে স্মরণ করা। আসল স্মৃতি হল, অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বা মানসিক ছবি মনের সামনে তুলে ধরা ; অভ্যাসমূলক স্মৃতির সঙ্গে প্রতিরূপের কোন সম্পর্ক নেই। অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল নিছক কোন কিছু মুখস্থ করা।

অভ্যাসমূলক স্মৃতি ও আসল স্মৃতি

বার্গসোঁর মতে অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল দেহের প্রক্রিয়া এবং আসল স্মৃতি হল মনের প্রক্রিয়া। অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল যান্ত্রিক। একে অনেকে যান্ত্রিক স্মৃতি (Rote memory)-ও বলে থাকেন। কোন বিষয়ের বার বার পুনরাবৃত্তি করে তাকে মনে রাখা হল এই ধরনের স্মৃতির কাজ এবং এত ভালভাবে একে স্মরণ রাখা যায় যে বিনা প্রচেষ্টায় এর পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়। এখানে বিষয়বস্তুর অর্থ বোঝার বা তাৎপর্য উপলব্ধির কোন ব্যাপার নেই। না বুঝেই বিষয়বস্তুর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। কবিতা বা নামতা মুখস্থ করা এ ধরনের স্মৃতির উদাহরণ। এই ধরনের স্মৃতি সময়ের অপচয় রোধ করে, কেননা, ভাল করে মুখস্থ করা জিনিস সহজেই পুনরুদ্রেক করা চলে। কিন্তু মনের বিকাশ সাধনে এর কোন উপযোগিতা নেই। তবে বুঝে বুঝে মুখস্থ করা হলে তা কার্যকরী হয়।

অভ্যাসমূলক স্মৃতি দেহের এবং আসল স্মৃতি মনের প্রতিক্রিয়া

আসল স্মৃতির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। এ ধরনের স্মৃতি নিছক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নয়। এই ধরনের স্মৃতির বিকাশ সাধনে অনুষঙ্গ নীতির সহায়তা গ্রহণ করা হয়। এই ধরনের স্মৃতিতে বিষয়বস্তু বুঝে বুঝে পড়ার এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহের প্রয়োজন আছে। প্রায় সব মনোবিজ্ঞানীই স্মৃতির উপরিউক্ত প্রকারভেদ স্বীকার করেছেন। কিন্তু মান্ (*Munn*) উপরিউক্ত প্রকারভেদ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বার্গসোঁ উপরিউক্ত স্মৃতির প্রকারভেদ মেনে নিয়ে পরোক্ষভাবে দেহকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। কারণ বার্গসোঁর মতে আসল স্মৃতি হল মনের ক্রিয়া আর অভ্যাসমূলক স্মৃতি হল দেহের ক্রিয়া। মনোবিজ্ঞানী রস (*Ross*)-এর মতে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, সে পার্থক্য হল মাত্রাগত, স্বরূপগত নয়। তাঁর মতে মুখস্থর মাধ্যমে যখন আমরা কোন কিছু স্মরণ করি, তখন আসল শিখনের বিষয়ও স্মরণ করতে পারি এবং কোন অভ্যাসমূলক স্মৃতিই শুরুতে কখনও প্রতিরূপ ছাড়া ঘটতে পারে না।

আসল স্মৃতির উপযোগিতা

মনোবিজ্ঞানী মান্-এর অভিমত

মনোবিজ্ঞানী রস্-এর অভিমত

৯। স্মৃতি-প্রখরতার লক্ষণ (Marks of good memory) ঃ

স্মৃতি-প্রখরতা' অর্থে আমরা কোন এক বা একাধিক বিশেষ ঘটনা স্বল্পায়াসে স্মরণ করার কথা বলছি না। স্মৃতি-প্রখরতা অর্থে আমরা বুঝি স্মরণশক্তির তীক্ষ্ণতা, অর্থাৎ স্বল্পায়াসে বিষয়বস্তুকে মনে সংরক্ষিত করা এবং প্রয়োজনমত তার পুনরুদ্রেক করা। স্মৃতি-প্রখরতার কতকগুলি লক্ষণ আছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

স্মৃতি-প্রখরতার লক্ষণ

(ক) স্বল্পায়াসে এবং দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করা (Ease and rapidity of learning) ঃ যে ব্যক্তির স্মৃতি খুবই প্রখর সে অল্প চেষ্টায় এবং খুব দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় কোন একটা ছাত্র একটি পাঠ দশবার পড়েও আয়ত্ত করতে পারছে না ; সেক্ষেত্রে ছাত্রটি স্মৃতিশক্তির প্রখরতা নেই বলেই স্বীকার করতে হবে। অবশ্য এই শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ এবং অনুরাগের উপর। পাঠ্য বিষয়বস্তুটি যদি তৃপ্তিদায়ক হয় তাহলেও তাকে অল্প প্রচেষ্টায় এবং দ্রুত আয়ত্ত করা যেতে পারে।

(খ) দীর্ঘ সময় ধরে বিষয় বস্তুটিকে মনে সংরক্ষিত করা (The long duration of retention) ঃ যে ব্যক্তির স্মৃতি খুবই প্রখর সে যে কেবল স্বল্পায়াসে বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করতে পারে তা নয়, বিষয়বস্তুকে আয়ত্ত করার পর সুদীর্ঘ সময় ধরে তাকে মনে সংরক্ষিত করতে পারে। অবশ্য বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের দীর্ঘস্থায়িত্ব বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ, বিষয়বস্তুর আলোচনার পৌনঃপুনিকতা ও ব্যক্তির সহজাত মানসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে।

(গ) দ্রুত এবং যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক করা (Rapidity and accuracy of reproduction) ঃ যে ব্যক্তির স্মৃতি প্রখর, সে যে কেবল মাত্র স্বপ্লায়াসে এবং দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে মনে সংরক্ষিত করতে পারে তা নয়, প্রয়োজনমত, দ্রুত এবং যথাযথ ভাবে বিষয়বস্তু পুনরুদ্রেক করার শক্তিরও সে অধিকারী। প্রয়োজনমত বিষয়বস্তু পুনরুদ্রেক করতে না পারলে সেটিকে আয়ত্ত করার কোন অর্থই হয় না। যে ছাত্র পরীক্ষা চলাকালীন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল না, অথচ পরীক্ষা-গৃহের বাইরে এসে বিষয়বস্তুটিকে স্মরণ করল, তার স্মৃতিশক্তিকে প্রখর বলা যেতে পারে না।

(ঘ) প্রয়োজনমত দ্রুত প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুটিকে পুনরুদ্রেক করা বা স্মরণক্রিয়ার কার্যকারিতা (Re-serviceableness of memory) ঃ যে ব্যক্তির স্মৃতি প্রখর সে ব্যক্তি প্রয়োজনমত প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুটিকে স্মরণ করতে

পারে। যে প্রসঙ্গে যে বিষয়বস্তুটিকে স্মরণ করা দরকার তা যদি করা না যায়, তাহলে স্মৃতিশক্তিকে প্রখর বলা যেতে পারে না। যে ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি প্রখর সে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশ অনায়াসে এবং যথাযথভাবে পুনরুৎপাদন করতে পারে।

১০। স্মৃতি-প্রখরতার অনুকূল শর্তাবলী (Favourable conditions for memorization) :

কতকগুলি শর্ত বা অবস্থার উপর স্মৃতি-প্রখরতা নির্ভর করে। এই শর্তগুলি নিম্নরূপ :

(১) আগ্রহ (Interest) : কোন বিষয় কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করার জন্য বিষয়বস্তুতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকা প্রয়োজন। শিশুকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হবে।

(২) প্রেষণা (Motivation) : শিখনের জন্য প্রেষণার দরকার। প্রেষণাই আগ্রহ সৃষ্টি করে। স্মৃতি-প্রখরতার জন্যও এই প্রেষণার প্রয়োজন আছে।

(৩) অনুষঙ্গ (Association) : অনুষঙ্গ নীতির সহায়তায় বিষয়বস্তু কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি ঠিকমত অনুষঙ্গ ঘটে, তাহলে বিষয়বস্তুর পুনরুদ্রেক সহজতর হয়।

(৪) শিখন (Learning) : কোন বিষয়বস্তু কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করার জন্য শিখনের যথারীতি পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।*

(৫) মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা (Mental and Physical Condition) : যথাযথ শিখনের জন্য মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভাল থাকা দরকার। যে লোক ক্লান্ত বা রুগ্ন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে পারে।

(৬) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ (Peaceful environment) : স্মৃতি-প্রখরতার জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। হৈ চৈ, গোলমাল ইত্যাদিতে স্মরণ-প্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

১১। স্মরণপ্রক্রিয়াকে কি অনুশীলনের সহায়তায় উন্নত করা যেতে পারে? (Can memory be improved by Practice ?) :

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে শিখন, সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্রেক হল স্মরণক্রিয়ার বিভিন্ন উপাদান। মনোবিদ্ জেম্‌স (*James*)-এর মতে অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষিত করার ক্ষমতা মানুষের জন্মগত ক্ষমতা; একে পরিবর্তন করা যায় না। যেহেতু তাঁর মতে

* এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে।

অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের ব্যাপারটি মানসিক ঘটনা নয়, দৈহিক ঘটনা (physiological phenomena) এবং দেহযন্ত্রের মাধ্যমে এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়, সেহেতু অনুশীলনের সহায়তায় স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা সম্ভব নয়। শারীরিক সুস্থতার উপর সংরক্ষণের বিষয়টি কিছু পরিমাণে নির্ভরশীল হলেও এবং শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতা অনুসারে স্মৃতিশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেও অনুশীলনের মাধ্যমে এর উন্নতি সম্ভব নয়। তবে জেম্‌স (*James*) স্বীকার করেন যে, আমাদের মনোযোগ ও অনুরাগ বাড়িয়ে দিয়ে বিষয়বস্তুকে আমরা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পারি।

জেমস এর মতে অনুশীলনের সহায়তায় স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা সম্ভব নয়

মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*)-এর মতে অনুশীলনের ফলে সাধারণ স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব নয়, তবে অনুশীলনের সহায়তায় কোন একটি বিশেষ দিকে স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব। এজন্যই অভিনেতারা অভিনয়ে, পাদ্রীরা ধর্মোপদেশে এবং অধ্যাপকেরা তাদের বক্তৃতা-বিষয়ে স্মরণশক্তির উন্নতি করতে পারেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও মনোযোগ, অনুরাগ ও উভয়ের অনুষঙ্গই পরোক্ষভাবে স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করে।

স্টাউট-এর মতে অনুশীলনের দ্বারা বিশেষ কোন একটি দিকে স্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব

মনোবিদ্ জেম্‌স-এর মতে এসব ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃত স্মরণক্রিয়ার কোন উন্নতি সাধিত হচ্ছে না, বিষয়বস্তুটিকে আয়ত্ত করার পদ্ধতির যেমন—মনোযোগ, অনুরাগ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতি সাধিত হচ্ছে মাত্র।

কিন্তু মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*)-এর অভিমত সমর্থন করে আমরা একথা বলতে পারি যে, সাধারণভাবে স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা না গেলেও যেহেতু আনুষঙ্গিক কারণগুলির উন্নতির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ের সংরক্ষণ দৃঢ়তর এবং পুনরুদ্রেক দ্রুততর হয়, কোন একটি বিশেষ দিকে অনুশীলনের মাধ্যমে স্মৃতির উন্নতি সম্ভব। তবে সে উন্নতি পরোক্ষ এবং শর্তসাপেক্ষ; যেহেতু মনোযোগ, অনুরাগ এবং ভাবগুলির পারস্পরিক অনুষঙ্গই স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

স্টাউট এর অভিমত সমর্থনযোগ্য

১২। শিখন ও স্মরণক্রিয়া (Learning and Memory):

স্মৃতি বা স্মরণক্রিয়াকে অনুশীলনের সহায়তায় উন্নত করা যেতে পারে কিনা, এই প্রশ্নটি বিতর্কমূলক হলেও শিখনের পদ্ধতিকে নানাভাবে উন্নত করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, শিখনের সঙ্গে স্মরণক্রিয়ার সম্পর্ক কী? মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (*Woodworth*) স্মরণক্রিয়ার চারটি অংশের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) শিখন,

(২) সংরক্ষণ, (৩) পুনরুদ্রেক এবং (৪) প্রত্যভিজ্ঞা। সুতরাং শিখন স্মরণক্রিয়ার একটি পূর্ববর্তী শর্ত (antecedent condition)।

শিখন স্মরণক্রিয়ার পূর্ববর্তী শর্ত

শিখনের এ ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যে, শিখন হল কোন একটি ঘটনাকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ বা কোন একটি কার্য এমনভাবে সম্পাদন করা যাতে অব্যবহিত পরেই তাকে স্মরণ করা যেতে পারে। কাজেই শিখনকে স্মরণক্রিয়ার অংশরূপে গণ্য না করে, স্মরণক্রিয়ার মাধ্যমেই শিখনের যাচাই হয়, একথা বলাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় এবং শিখন ও সংরক্ষণ, বা শিখন ও পুনরুদ্রেক, অর্থাৎ পাঠ এবং আবৃত্তি, একটির পর আর একটি ঘটতে থাকে, সেহেতু ব্যবহারিক দিক থেকে শিখনকে স্মরণ-ক্রিয়ার একটি অংশ এবং সে হিসেবে তার প্রথম স্তর বলেই গণ্য করা সুবিধেজনক।

শিখন অনেক ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক হতে পারে—যেমন, সঙ্গীতের প্রতি সহজাত অনুরাগ আছে এমন কোন বালক কোন একটি গান শোনার অব্যবহিত পরে সেটি গেয়ে লোককে চমৎকৃত করে দিতে পারে। আবার শিখন ঐচ্ছিকও হতে পারে—যেমন, সেই একই বালক কোন একটি কবিতা বার বার পড়ে স্মৃতিতে তাকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করতে পারে। এই শিখন যখন ঐচ্ছিক হয়, তখনই আমরা কোন বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষিত করার কথা বলে থাকি (committing to memory or memorising)।

শিখন—ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক

১৩। স্বল্পায়াসে শিখন ও স্মরণ রাখার পদ্ধতি (Methods of Economy in learning and memorisation) :

প্রশ্ন হল, কিভাবে শিক্ষা করলে খুব অল্প আয়াসে কোন বিষয় মনে ধরে রাখা যায়? এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতির কথা বলা যেতে পারে না, যেগুলি সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। তবে সাধারণভাবে কয়েকটি নীতির আলোচনা করা যেতে পারে :

(i) যুক্তিনিষ্ঠ বা **অর্থপূর্ণ শিখন-পদ্ধতি (Logical Method) :** পাঠ্য বিষয়টির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে সেটি শিক্ষা করলে সেটিকে দীর্ঘকাল মনে রাখা সম্ভব। পাঠ্য বিষয়বস্তুর ভাবগুলিকে সুসংবদ্ধ করে, অন্য ভাবের সঙ্গে তার সাদৃশ্য এবং কার্যকারণ সম্পর্কটি নির্ধারণ করে বিষয়টি শিক্ষা করলে সেটি দীর্ঘদিন স্মরণে থাকে।

(ii) আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation) : স্থায়িভাবে কোন বিষয়কে মনে ধরে রাখার জন্য আবৃত্তি খুবই কার্যকরী। এই প্রসংগে সংস্কৃতশ্লোক 'আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং

বোধাদপি গরীয়সী' খুবই প্রনিধান যোগ্য। কোন একটি বিষয় পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার যদি বিষয়টিকে নিজের কাছে আবৃত্তি করা যায় তাহলে কি সাময়িক-ভাবে বা কি দীর্ঘকালের জন্য পাঠ্য বিষয়টিকে মনে সংরক্ষণ করা যায়। কোন্ অংশটি অধিগত হয় নি আবৃত্তিতে তা ধরা পড়ে এবং সে অংশ যে আবার পাঠ করা প্রয়োজন তা বোঝা যায়। আবৃত্তি মূল্যবান সময়ের অপচয় বন্ধ করে এবং বিষয়টিকে মনের মধ্যে গেঁথে দেয়।)

মনোবিজ্ঞানী গেট্স (*Gates*) ১৬টি অর্থহীন শব্দ এবং ১৭০টি শব্দের পাঁচটি সংক্ষিপ্ত জীবনীর অংশ নিয়ে এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালান। তিনি দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করেন। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থী তার কাজের উপর থেকে মাথা না তুলে বার বার পড়ে যাবে। অপর পদ্ধতি অনুসারে মাঝে মাঝে কাগজের দিকে না তাকিয়ে তা আবৃত্তি করতে হবে এবং পুনরুদ্রেক করার চেষ্টা করতে হবে। তাতে দেখা গেল যে, (আবৃত্তির পদ্ধতিই স্বল্পায়াসে স্মরণ রাখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে। যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে তাহলে এই পদ্ধতি সব সময়ই শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী।)

(এই পদ্ধতির সুবিধে হল—(১) শিখতে গিয়ে কোন্ কোন্ জায়গায় ভুল হচ্ছে তা টের পাওয়া যায় এবং তার উপর মনঃসংযোগ করা যায়। (২) বিষয়বস্তু আয়ত্ত হয়েছে, এই মনোভাব শিক্ষার্থীকে আরও উদ্যমশীল করে তোলে। (৩) ভুলগুলি স্থায়ী হবার পূর্বেই সেগুলিকে দূর করা সম্ভব হয়। (৪) যেহেতু ব্যবহারের জন্যই বিষয়বস্তু শেখা হচ্ছে, সেহেতু পুনরুদ্রেক সহজতর হয়। পরীক্ষণকার্যের ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে পাঠের তিন-পঞ্চমাংশ সময় যদি আবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়, তাহলে সুফল পাওয়া যায়।)

(iii) সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি (Spaced Repetition): একেবারেই একটি পাঠ শিক্ষা করার চেয়ে যদি কিছু সময়ের ব্যবধান রেখে আবার সেটি পাঠ করা যায় তাহলে সহজেই বিষয়টিকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করা যায়। যেমন, একটি বিষয় একেবারে মুখস্থ করার চেষ্টা না করে যদি কদিন ধরে দিনে দু-তিনবার করে পড়া যায় তাহলে সেটিকে মনে রাখা সহজসাধ্য হয়। এর কারণ একটানা পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুটা বিশ্রাম পেলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াশক্তি বর্ধিত হয়। একসঙ্গে শিক্ষা করাকে বলা হয় অবিরাম শিখন (**Massed learning**), আর সময় ভাগ করে অর্থাৎ সময়ের ব্যবধান রেখে শিক্ষা করাকে বলা হয় সবিরাম শিখন

(Distributed learning)। সবিরাম শিখনই কোন বিষয় শিখন-কার্যে ও তাকে তাড়াতাড়ি ধারণ করার পক্ষে উপযোগী।

(iv) **সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি ও অংশ অবধারণ পদ্ধতি** (Whole versus Part Learning) : (কোন দীর্ঘ ও জটিল পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করার জন্য তাকে কি সমগ্র হিসেবে শিক্ষা করলে সুফল পাওয়া যায় অথবা তাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক ভাবে আয়ত্ত করলে সুফল পাওয়া যায়। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, উভয় পদ্ধতিই সময় অনুযায়ী সুফল দান করে। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি অধিক কার্যকর। এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর হওয়ার কারণ, এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি অংশকে অপরাপর অংশের সঙ্গে সংযুক্ত, বা অনুষঙ্গরূপে শিক্ষা করা হয়। যে পাঠ্যসূচীর বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সেক্ষেত্রে অংশ অবধারণ পদ্ধতি সুফল দান করে না; কারণ অংশগুলিকে পৃথকভাবে শিক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং একটি অংশ অপরটির স্মারক হয় না। যে ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সংযোগ নেই সেক্ষেত্রে অংশ অবধারণ পদ্ধতি ভাল ফল দেয়। যেমন, নামতার ক্ষেত্রে এক এক ঘরের নামতা আলাদা আলাদা ভাবে শিখলে সহজেই মুখস্থ হয়।

অংশ অবধারণ পদ্ধতির তুলনায় সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি যে বেশী উপযোগী সে সম্পর্কে এভেলিং (*Aveling*) একটি পরীক্ষণকার্য চালান। ২৪০ পঙক্তির দুটি কবিতা শিক্ষার্থীকে দুভাবে শিখতে দেওয়া হল। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিদিন একবারে ৩০ পঙ্‌ক্তি করে পড়া, দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুসারে পুরো ২৪০ পঙ্‌ক্তি দিনে তিনবার করে পড়া। দুটি কবিতাই শিখবার পর দেখা গেল অংশ অবধারণ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীর ওটি শিখতে ১২ দিন (৪৩১ মিনিট) লেগেছে এবং সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি অনুসারে শিখতে কেবলমাত্র ১০ দিন (৩৫৮ মিনিট) লেগেছে। এতে দেখা যাচ্ছে সময়ের এক-পঞ্চমাংশ এই পদ্ধতির সাহায্যে সঞ্চয় করা যেতে পারে।

(অংশ অবধারণ পদ্ধতির অসুবিধা হল : (১) অংশ অবধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা করলে সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে অংশবিশেষের অর্থের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় না। অর্থাৎ সমস্ত কবিতার কাঠামোটি সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। তবে অংশ অবধারণ পদ্ধতিতে প্রতিটি অংশকেই প্রত্যক্ষ করা যায় বলে, প্রতিটি অংশই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। (২) অংশ অবধারণ পদ্ধতিতে প্রতিটি অংশ এক-একটি বিচ্ছিন্ন একক, কাজেই তাদের পারস্পরিক সংযোগ দুরূহ হতে পারে।

অংশ অবধারণ পদ্ধতিরও কিছু সুবিধা আছে। অংশ অবধারণ পদ্ধতি কার্যকর হয় যদি শিক্ষার্থীর বয়স খুব অল্প হয়, যদি শিক্ষার্থী অনভিজ্ঞ হয় বা তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে বা শিক্ষণীয় বিষয় তার কাছে খুব অপরিচিত বা দুরূহ বলে মনে হয়। *Pyne* এবং *Synder* পরীক্ষণকার্য চালিয়ে বলেছেন যে ২৪০ পঙ্‌ক্তি কবিতা মুখস্থ করার জন্য সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি (Whole Learning) খুবই উপযোগী। কিন্তু তার থেকে দীর্ঘতর কবিতা মুখস্থ করতে হলে অংশে অংশে ভাগ করে মুখস্থ করাতেই সুফল পাওয়া যায়।

(v) **মধ্যবর্তী পদ্ধতি** (Mediating method or Part Progressive method): শিক্ষণীয় বিষয় যদি দৈর্ঘ্যে বড় হয় তাহলে সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয় না। যদি শিক্ষণীয় অংশবিশেষ অত্যন্ত দুরূহ হয় তাহলে কেবলমাত্র দুরূহ বিষয়টুকুর অবধারণের জন্যই সমগ্র বিষয়টি পড়ার প্রয়োজন হয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য সমগ্র অবধারণ পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তন হল—কঠিন শব্দ বা বাক্যাংশগুলি প্রথমে আয়ত্ত করার পর সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

এই পদ্ধতিরই আর একটি রূপ হল শিক্ষণীয় বিষয় এক, দুই, তিন প্রভৃতি অংশে বিভক্ত করে নেওয়া। প্রথমে এক নম্বর অংশ বিচ্ছিন্নভাবে, তারপর দুই নম্বর অংশ বিচ্ছিন্নভাবে, তারপর উভয় অংশ একত্রে শিক্ষা করা হয়। এইভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টি মুখস্থ করা হয়। একে প্রগতিশীল পদ্ধতি (Progressive method) বলা হয়। এই পদ্ধতির অসুবিধা হল, কোন বিশেষ অংশের তুলনায় অপর অংশের পুনরাবৃত্তি বেশীবার ঘটে। সমগ্র-অবধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে শেখার তুলনায় এতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়।

(vi) অধিশিখন ও পর্যালোচনা (Overlearning and Review): এবিংহাউস (Ebbinghaus)-এর অভিমতানুযায়ী নির্ভুল পুনরাবৃত্তির জন্য যতবার শিক্ষা করা দরকার তার অধিক যে কোন শিখনই হল অধিশিখন। পাঠ্যবিষয়কে অধিশিখনের সহায়তায় মনে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করা যায় এবং মাঝে মাঝে পাঠ্য-বিষয়ের পর্যালোচনা করলে বিষয়বস্তুর পুনরুজ্জীবন ও পুনরুদ্রেক সহজতর হয়।

(vii) শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি (Classification Method): শিক্ষণীয় বিষয়কে শ্রেণীবদ্ধ করে শিক্ষা করলে সেটি সহজে স্মরণ রাখা সম্ভব হয়। যেমন—৬৫, ৭৫ ৮৫, সংখ্যাকে যত সহজে মনে রাখা যাবে ৬২, ৪১, ৮৭-কে মনে রাখা যাবে না।

(viii) স্মৃতি সঙ্কেত (Memorlyclue): কোন সঙ্কেত বা স্মৃতি-সহায়ক ছড়ার সহায়তা গ্রহণ করলে বিষয়বস্তু তাড়াতাড়ি স্মরণ করা যায়।

(ix) **শিক্ষা করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প (The will or intention to learn) :** ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু শিক্ষা করতে গেলে, তার থেকে কখনও ভাল ফল পাওয়া যায় না। কোন কিছু শিক্ষা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প থাকা চাই এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কোন কিছু আয়ত্ত করার চেষ্টা করলে তা অতি সহজেই আয়ত্ত করা যায়।[1]

১৪। বিস্মৃতি (Forgetfulness) :

(ক) বিস্মৃতির উপকারিতা : স্মৃতি এবং বিস্মৃতি উভয়ই আমাদের জীবনে খুব স্বাভাবিক ঘটনা। বিষয়বস্তুকে যদি মনে ধরে রাখতে পারি, তাহলে তা স্মরণে আসে আর যদি তাকে ধরে রাখতে না পারি তাহলেই তা ভুলে যাই।

স্মৃতির মত বিস্মৃতিরও প্রয়োজন আছে

স্মৃতিরও যেমন প্রয়োজন আছে, বিস্মৃতিরও ঠিক তেমনই প্রয়োজন আছে। রিবর্ট (*Ribbort*)-এর মতে স্মৃতির জন্য বিস্মৃতির প্রয়োজন। আমাদের মানসিক শক্তি সীমাবদ্ধ। অজস্র বিষয়বস্তুকে স্মরণে রাখা মনের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় যদি বিস্মৃত না হই তবে প্রয়োজনীয় এবং নতুন বিষয় মনে ধরে রাখা কিভাবে সম্ভব ? কাজেই বিস্মৃতি অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণে রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, কোন ছাত্র কোন বিষয় শিখতে গিয়ে অসতর্কতাবশতঃ কতকগুলি ভুল বিষয় শিখে ফেলেছে। এখন এই ভুলগুলি যদি সে বিস্মৃত না হয় তবে তার পক্ষে শুদ্ধ বিষয়গুলি শিক্ষা করা কখনও সম্ভব হবে না। এছাড়াও আমাদের জীবনের সব অভিজ্ঞতাই তৃপ্তিদায়ক নয় ; এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি খুবই বেদনাদায়ক। যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, কর্মে ব্যর্থতা, বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য ইত্যাদি। এই জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলি যদি আমরা বিস্মৃত না হই, তাহলে আমাদের সমস্ত জীবন দুর্বিসহ যন্ত্রণায় ভরে ওঠে। কাজেই বিস্মৃতি মানসিক জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে সহায়তা করে।

(খ) বিস্মৃতির অপকারিতা : প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয় বিস্মৃত হলে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। ফলে কর্মদক্ষতা (efficiency) হ্রাস পায় ; সময়ের অপচয় ঘটে। নানা কাজ বিপর্যস্ত হয়—নানা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

(গ) বিস্মরণের কারণ (Causes of Forgetting) : প্রশ্ন হল, আমরা ভুলে যাই কেন ? ভুলে যাওয়ার কারণ কি ? এর পশ্চাতে একাধিক কারণ

1, বিস্তারিত আলোচনার জন্য H. E. Garrett : Great Experiments in Psychology, Page 122 দ্রষ্টব্য :

বর্তমান। উদ্দীপক যদি তীব্র, সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, দীর্ঘস্থায়ী ও পৌনঃপুনিক হয়; উদ্দীপক যদি আমাদের মনোযোগ ও অনুরাগ আকর্ষণ করে এবং উদ্দীপকের ক্রিয়ার সময়টি যদি সম্প্রতি ঘটে থাকে তবে বিষয়বস্তুটিকে আমরা মনে ধরে রাখতে পারি। যেহেতু পূর্বোক্ত অবস্থাগুলি স্মৃতির সহায়ক সেহেতু পূর্বোক্ত অবস্থার অভাব বিস্মৃতি সূচনা করে।

যে অবস্থাগুলি স্মৃতির সহায়ক, সেগুলির অভাব বিস্মৃতির কারণ

উদ্দীপক সম্পর্কীয় ত্রুটি ছাড়াও বিস্মৃতির আরও কয়েকটি কারণ আছে। নিম্নে এগুলি পর পর আলোচিত হল :

(i) **পর্যালোচনার অভাব :** যে কোন বিষয়বস্তুর আলোচনার অভাব সেটিকে বিস্মৃত হবার অন্যতম কারণ। পাঠ্যবিষয় মনে রাখার জন্য সেগুলিকে মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন। আলোচনার অভাবে কালের গতিতে বিষয়টি ধীরে ধীরে মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অবশ্য মনোবিদ্‌রা আলোচনার অভাবকে বিস্মৃতির কারণ বলে মনে করেন না। কারণ, অনেক সময় আলোচনার অভাবেও বিষয়টি মনে সংরক্ষিত থাকে। এমনও দেখা যায়, যে কাহিনী মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করি, আকস্মিক-ভাবে মনে তা জেগে উঠেছে।

(ii) **পশ্চাদ্‌মুখী বাধ (Retroactive inhibition) :** কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় প্রথমটি শেখার পর কিছুটা বিরতি দিয়ে তবে দ্বিতীয়টি শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোন একটি বিষয় শেখার পরই যদি কিছু সময়ের বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় শিখি তাহলে দেখা যাবে যে, প্রথম বিষয়টির অংশ-বিশেষ ভুলে গেছি। এর কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টি মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে এবং পেছন দিক থেকে এসে প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। পরবর্তীকালে অধীত বিষয়ের অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মৃতিপথে আবির্ভাবে বাধা সৃষ্টি করাকে বলা হয় 'পশ্চাদ্‌মুখী বাধ' (retroactive inhibition)। কোন ছাত্র যদি প্রথমে কবিতা মুখস্থ করে এবং সময়ের কোন বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের একটি অংশ মুখস্থ করে তাহলে প্রথমটি মুখস্থ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে দেখতে পাবে, তার অংশবিশেষ সে ভুলে গেছে।

(iii) **আঘাতজনিত বিস্মরণ (Shock Amnesia) :** মস্তিষ্কে আঘাত লাগার জন্য বিস্মৃতি দেখা দিতে পারে। এই জাতীয় বিস্মৃতিকে বলা হয় 'আঘাত-জনিত বিস্মরণ'। দুর্ঘটনা, খেলাধুলা, যুদ্ধের সময় গোলাগুলির বিস্ফোরণ এই জাতীয় আঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

(iv) **অবদমন (Repression)** : ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করেন যে, স্মরণ করার অনিচ্ছা থেকেই বিস্মৃতি আসে। কোন ব্যক্তিকে হয়ত কোন কারণে আমরা পছন্দ করি না; দেখা যায় তার কথা আমরা ধীরে ধীরে ভুলে গেছি। একে বলা হয় অবদমন। অবদমন প্রক্রিয়া মনকে বেদনাদায়ক এবং অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা করে। অনেক মনোবিজ্ঞানী একে সক্রিয় বিস্মরণ (active forgetting) বলে অভিহিত করেছেন।

(v) **যথাযথ অনুষঙ্গ এবং অভিভাবন শক্তির অভাব (Want of proper association and suggestive forces)** : আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি অনুষঙ্গের প্রভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যদি এই অনুষঙ্গের অভাব ঘটে তাহলে একটি ঘটনা অভিভাবন প্রক্রিয়ার দ্বারা আর একটি ঘটনাকে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে না।

আমাদের অভিজ্ঞতাগুলির ছাপ চেতন মন থেকে ধীরে ধীরে চলে যায় অবচেতন মনে। কালের গতিতে এ ছাপ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে এবং অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে এগুলির সংযোগসূত্রও হয়ে আসে ক্ষীণ। তার ফলে বিস্মৃতি ঘটে।

(vi) **পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন** (Change of Environment) : এক একটি বিশেষ পরিবেশে আমরা এক একটি বিষয় শিক্ষা করি। অনেক সময় পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে বিষয়টি আমরা ভুলে যেতে পারি। ঘরে বসে যে ছাত্র একটি বিষয় শিখে নির্ভুলভাবে তার উত্তর দিতে পারে, স্কুলের ক্লাসে বা পরীক্ষার হলে সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে বিষয়বস্তু ভুলে যায়।

(vii) **আবেগজনিত প্রতিরোধ (Emotional Blocking)** : সময় সময় বিভিন্ন আবেগ, যেমন—রাগ, ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে আমাদের মনে এমন অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে, ভাল করে আয়ত্ত করা হয়েছে এমন বিষয়ও আমরা স্মরণে আনতে পারি না।

(viii) **মনোযোগের এবং অনুরাগের অভাব** : যদি কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের অনুরাগ না থাকে তাহলে সে বিষয় আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই। তাছাড়া, মনোযোগ সহকারে যদি কোন বিষয় আয়ত্ত করার চেষ্টা না করি তাহলে বিষয়টি সহজেই বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা থাকে।

(ix) **দেহ ও মস্তিষ্কের অসুস্থতা** : অসুস্থ দেহ নিয়ে ও ক্লান্ত মস্তিষ্কে যদি আমরা কোন কিছু স্মরণ করতে চাই তাহলে দেখা যায় আমরা কিছুতেই বিষয়কে

স্মরণে আনতে পারছি না। নেশাকারক বস্তুর দীর্ঘকাল ব্যবহার মস্তিষ্ককে দুর্বল করে বিস্মৃতি ঘটাতে পারে।

(x) বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব (**Want of verbal association**)**:** মনোবিদ্ ওয়াটসন (*Watson*)-এর মতে ভাষার অভাব অথবা বাচনিক অনুষঙ্গের অভাব বিস্মৃতিব কারণ। শৈশবের প্রথম কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা যে আমরা স্মরণ করতে পারি না তার কারণ ভাষাব অভাবের জন্য।

এই কারণগুলি ছাড়া বিস্মৃতির আরও অন্যান্য কারণ আছে। সকল প্রকার বৈস্মৃতি একটি মাত্র কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ঘটনাবিশেষে বিস্মৃতির কারণ ভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

১৩। স্মৃতি সম্বন্ধে পরীক্ষণ (Experiments in Memory)**:**

মনোবিদ্ এবিংহাউস্ (*Ebbinghaus*) স্মৃতি এবং বিস্মৃতি সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সর্বপ্রথম পরীক্ষণ কার্য চালান। তাঁর পরিচালিত পরীক্ষণ কার্যগুলি থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সব পরীক্ষণেব ক্ষেত্রে তিনিই একাধারে পরীক্ষক এবং একাধারে পরীক্ষণ-পাত্র। পরীক্ষাব উপকরণ হিসেবে তিনি কতকগুলি **অর্থহীন শব্দসমষ্টি** (nonsense syllables) যেমন—wok, pam, zur, yip, teg এবং সংখ্যা (digits) গ্রহণ করেন। অর্থযুক্ত শব্দসমষ্টি নিয়ে পরীক্ষণ কার্য চালনার অসুবিধা হল এই যে, শব্দ যদি অর্থবোধক হয়, তাহলে অর্থের সাহায্যে শব্দটিকে সহজে মনে রাখা সম্ভব হয়, কিন্তু অর্থহীন শব্দসমষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে কোন রকম অনুষঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। এবিংহাউস্ পরিচালিত পরীক্ষণের কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে:

অর্থহীন শব্দসমষ্টির সাহায্যে পরীক্ষণ

(i) পাঠ্যবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং মোট শিক্ষা করার জন্য কতখানি সময় লাগে? এবিংহাউস পাঠ্যবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং তা শিক্ষা করার জন্য কতখানি সময় লাগতে পারে সে সম্পর্কে একটি পরীক্ষণ পরিচালনা করেন। তিনি কতকগুলি অর্থহীন শব্দ নিয়ে মুখস্থ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি তখনই বিষয়টিকে আয়ত্ত হয়েছে বুঝতে পারবেন যখন তিনি সব কয়টি শব্দ, অর্থাৎ অর্থহীন শব্দসমষ্টির তালিকাটি নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন।

এবিংহাউস তাঁর পরীক্ষণের মাধ্যমে যে ফলাফল লক্ষ্য করলেন তা হল এই যে, অর্থহীন শব্দসমষ্টির তালিকায় শব্দের সংখ্যা যত অধিক হয়, সেটি মুখস্থ করতে তত বেশী সময় লাগে এবং সেটিকে অধিকবার আবৃত্তি করার প্রয়োজন হয়। তার শব্দের

সংখ্যা যত কম থাকে, সেটি মুখস্থ করতে তত কম সময় লাগে এবং সেই অনুপাতে আবৃত্তির সংখ্যাও অনেক কম লাগে।

সাতটি অর্থহীন শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি মুখস্থ করতে এবিংহাউসকে একবার মাত্র আবৃত্তি করতে হয় এবং সময় লেগেছিল মোট ৩ সেকেণ্ড, অর্থাৎ প্রতি শব্দ পিছু গড়ে '৪ সেকেণ্ড। বারটি শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি আয়ত্ত করতে সতের বার আবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছিল। সময় লেগেছিল ছয়ত্রিশ সেকেণ্ড, প্রতি শব্দ পিছু গড়ে সময় লেগেছিল ৩ সেকেণ্ড। আর ৩৬টি শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি আয়ত্ত করার জন্য পঞ্চান্ন বার আবৃত্তি করতে হয় এবং মোট সময় লাগে ৭৯২ সেকেণ্ড, প্রতি শব্দ পিছু গড়ে সময় লাগে ২২ সেকেণ্ড।

পূর্বোক্ত পরীক্ষণ থেকে একটি বিষয় জানা গেল যে, শব্দের সংখ্যা যত বেশী হবে, আয়ত্ত করার জন্য তত অধিক সময়ের প্রয়োজন হবে। সুতরা পাঠ্যতালিকা যদি দীর্ঘ হয়, সেটি আয়ত্ত করতে হলে, প্রতি শব্দ পিছু অধিক সময় ব্যয় করতে হয় এবং বেশীবার পুনরাবৃত্তিরও প্রয়োজন হয়।

শব্দের সংখ্যা যত বেশী হবে, সেটি আয়ত্ত করার জন্য তত অধিক সময়ের প্রয়োজন

(ii) সঞ্চয় প্রণালীর সাহায্যে স্মৃতি পরীক্ষণ (Memorization by Saving Method): যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষার্থী সম্পূর্ণ তালিকাটি নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারছে ততক্ষণ পরীক্ষক একটি অর্থহীন বর্ণসমষ্টির তালিকা পরীক্ষার্থীর সামনে আবৃত্তি করে যাবেন। দেখা গেল পরীক্ষণ-পাত্র ১২ বারে সম্পূর্ণ তালিকাটি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারল। ৩৪ ঘণ্টা পরে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে আগের যে শব্দ তালিকাটি সে আয়ত্ত করেছে তার কতটা মনে আছে পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখা গেল ১২টি শব্দের মধ্যে ৩টি শব্দ তার মনে আছে। পরীক্ষক আবার আগের দিনের মতো তালিকাটি পরীক্ষার্থীর সামনে আবৃত্তি করে যাবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষণ-পাত্র সম্পূর্ণ তালিকাটি আবার আয়ত্ত করতে পারে। দেখা গেল, দ্বিতীয় দিন তালিকাটি আয়ত্ত করতে তাকে অনেক বার কম আবৃত্তি করতে হয়েছে এবং তার অনেক কম সময় লেগেছে। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করে দেখা গেল পরীক্ষণ-পাত্র ৭ বারে সম্পূর্ণ তালিকাটি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারল। কিন্তু প্রথমবার পরীক্ষণ-পাত্রের লেগেছিল ১২ বার। অতএব পরীক্ষণ-পাত্র বাঁচাতে পেরেছে ১২—৭=৫ বার এবং পরীক্ষার্থীর মোট সঞ্চয় হল ১২-তে পাঁচ বা ৪১.৭% একেই বলে সঞ্চয় পদ্ধতির সাহায্যে স্মৃতি পরীক্ষা।

(iii) **আমরা কি হারে ভুলে যাই?—তার পরীক্ষণ:** কোন বিষয় শিক্ষা করার অব্যবহিত পরেই বিস্মৃতি বেশী মাত্রায় এবং দ্রুত ঘটে। ক্রমশঃ তা কমমাত্রায় এবং মন্দগতিতে ঘটে থাকে। যদি একটি অর্থহীন শব্দের তালিকা (যেমন—lut, fom, bot, muz, roz) মুখস্থ করার পরে, কিছু সময়ের বিরতি দিযে সেটা স্মরণ করার চেষ্টা কবা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, সম্পূর্ণ তালিকাটি আমরা স্মবণ করতে পাবছি না, অংশবিশেষ ভুলে গেছি। কত সময পরে কতটুকু স্মবণ করতে পারি, আর কতটুকু ভুলে যাই তা নিম্নোক্ত বর্ণিত মনোবিদ্ এবিংহাউস-এর তালিকা থেকে জানা যাবে।

শোনা ও মনে করার মধ্যে সময়েব ব্যবধান	মনে রাখার শতকরা হাব	ভুলে যাওযার শতকরা হার
২০ মিনিট	৫৮	৪২
১ ঘণ্টা	৪৪	৫৬
৯ ঘণ্টা	৩৬	৬৪
২৪ ঘণ্টা	৩৪	৬৬
২ দিন	২৮	৭২
৬ দিন	২৫	৭৫
৩১ দিন	২১	৭৯

উপরিউক্ত তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথম দিকে অর্থাৎ ২০ মিনিট থেকে ২ দিনের ব্যবধানে ভুলে যাওয়ার হার দ্রুত হচ্ছে, কিন্তু তাবপব অর্থাৎ ২ দিন থেকে ৩১ দিনের ব্যবধানে ভুলে যাওয়ায হার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে।

(iv) **স্মৃতি-প্রসর সম্বন্ধে পরীক্ষণ:** একবার কতটুকু মনের মধ্যে ধরে রাখা যায়?

কতকগুলি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি বা সংখ্যা একবার পরীক্ষণ-পাত্রের কাছে উপস্থাপিত করার পর পরীক্ষণ-পাত্র যতটুকু মনের মধ্যে ধরে রেখে তার নির্ভুল ও সুশৃঙ্খল পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাকেই স্মৃতি-প্রসর (memory-span) বলে। এই পরীক্ষণের দ্বারা জানা যায় বিভিন্ন ব্যক্তি কত বেশী সংখ্যক সংখ্যা বা অক্ষর শুধু একবার দেখার বা শোনবার পর মনে রাখতে পারে এবং নির্ভুলভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারে। কোন ব্যক্তির স্মৃতি-প্রসর নির্ণয় করতে হলে তাকে এমন সংখ্যা সারি বা অক্ষরের সারি দেওয়া হয় যার দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাওয়া হয়।

পরীক্ষা করে দেখা হয় পরীক্ষণ-পাত্র কতদূর পর্যন্ত নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। পরীক্ষক ৬টি বিভিন্ন তালিকা তৈরি করবেন, তন্মধ্যে প্রথমটি ৩টি অঙ্কের বা ৩টি অক্ষরের হবে এবং প্রতি লাইনে একটি করে সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে শেষ লাইনে অঙ্কের বা অক্ষরের সংখ্যা হবে ১২টি। তালিকাগুলি তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে যে, প্রথম লাইনের শেষ সংখ্যা বা বর্ণ যেন দ্বিতীয় লাইনের প্রথম অক্ষর বা সংখ্যা না হয়। পরীক্ষণ-পাত্র অক্ষর বা সংখ্যাগুলি দেখার বা শোনার পর কতদূর স্মরণ করতে পারছে তা তাকে বলতে বা কাগজে লিখতে বলা হয়।

সংখ্যা-সারি	**অক্ষর-সারি**
৬ ৩ ৯	প ক ভ
৮ ২ ৫ ৭	র ধ গ ন
৬ ১ ৩ ৭ ৯	ল ব ত ম চ
৪ ২ ৬ ৮ ৩ ৫	ট প ঞ থ ঝ চ
৭ ৪ ৯ ৫ ২ ৬ ৩	র দ হ ফ জ ক ঠ
৮ ৫ ২ ৪ ৩ ৭ ৯ ১	প ত ন ঞ চ ঝ ই অ
৭ ৫ ৩ ৬ ৪ ১ ৮ ২ ৯	উ ঐ ঢ হ থ ন ম ষ ধ
৫ ৩ ৮ ২ ৪ ৬ ৯ ১ ৭ ৯	প ক জ ঝ ঋ খ ক ম ঞ ত
৮ ১ ৬ ৩ ৫ ১ ৪ ২ ৪ ৬ ৭	জ ক ই উ ঋ ৯ গ ক ব ঞ ঝ
৯ ২ ৫ ৮ ১ ৬ ২ ৮ ৫ ১ ৬ ৩	থ প ল জ শ হ স র ড ণ ঝ গ

বয়স অনুযায়ী স্মৃতি-প্রসরের তারতম্য ঘটে। শ্রবণের দ্বারা স্মৃতি অনুশীলন এবং দর্শনের দ্বারা স্মৃতি অনুশীলন সংক্রান্ত পরীক্ষণ কার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে ৪ থেকে ৬ বছরের শিশুর গড়ে স্মৃতি-প্রসর হল ৪টি সংখ্যা, ৬ থেকে ৮ বৎসরের শিশুর হল ৫টি সংখ্যা, ৯ থেকে ১২ বছরের ৬টি সংখ্যা এবং ১২ বৎসরের ঊর্ধ্বে ৭টি সংখ্যা। মানসিক অবস্থা, মনোযোগ, অনুশীলন ও স্ত্রীপুরুষ ভেদেও স্মৃতি-প্রসরের তারতম্য দেখা যায়।[1]

(ৰ) আংশিকভাবে শিখলে বেশী মনে থাকে—না, সম্পূর্ণ শিখলে বেশী মনে থাকে—তার পরীক্ষণ (To determine the capacity of memorization

1. "Memory span differs with the individual, with age and with the type of material used. For example, the average span for auditory presentation and vocal recall of digits is four between four and five years, five between six and eight years, six between nine and twelve years and seven beyond twelve years."

—Munn : Introduction to Psychology, Page 316

by part and by whole method of learning) : অর্থহীন বর্ণসমষ্টির ১০টি অক্ষরবিশিষ্ট একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। সেটি পরীক্ষণ-পাত্রকে দুরকম ভাবে শিখতে বলা হবে। সম্পূর্ণ তালিকাটি পর পর পড়ে একেবার মুখস্থ করতে হবে। আবার তালিকাটি কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিয়ে আংশিকভাবে মুখস্থ করে সম্পূর্ণ তালিকাটি মুখস্থ করতে হবে। এই পরীক্ষণ-কার্য কবিতার সাহায্যেও করা যেতে পারে। যেমন, প্রথমে পরীক্ষণ-পাত্রকে নির্দেশ দিতে হবে পুরো কবিতাটি বার বার পড়ে মুখস্থ করার। তারপর কবিতাটি ছোট ছোট তিন চার ভাগে ভাগ করে নিয়ে একভাগ করে মুখস্থ করলেই পুরো মুখস্থ হয়ে যাবে। স্টপওয়াচ (stop-watch)-এর সাহায্যে শেখার সময় লিখে রাখতে হবে। একবার পড়েই পরীক্ষণ-পাত্রকে সেটা পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করতে হবে। যদি আটকে যায় তাহলে আবার প্রথম থেকে পড়তে হবে। যত বার পড়বে তার সংখ্যা লিখে রাখতে হবে, আর মুখস্থ হবার পরে সময়টা দেখে নিতে হবে।

এরূপ পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়, সম্পূর্ণ শিখন-পদ্ধতির (whole method) সাহায্যে আমরা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করতে পারি।

(vi) **পশ্চাদ্‌মুখী বাধ সম্পর্কে পরীক্ষণ (Experimeut on Retroactive inhibition)** : কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় প্রথমটি শেখার পর কিছুটা বিরতি দিয়ে তবে দ্বিতীয়টি শিক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোন একটি বিষয় শেখার পরই যদি কিছু সময়ের বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয় আমরা শিখি তাহলে দেখা যায় প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষের বিস্মরণ ঘটে। এর কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টিকে মনে রাখার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করছে এবং পেছন দিক থেকে এসে প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। একেই বলা হয় 'পশ্চাদ্‌মুখী বাধ' (Retroactive inhibition)।

এ সম্পর্কে পরীক্ষণ কার্য চালাবার জন্য দু দল পরীক্ষণ-পাত্র প্রয়োজন, যারা মোটামুটি বয়স, লেখাপড়া, বুদ্ধির দিক থেকে সমকক্ষ। প্রথম দলটিকে একটি তালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া হল এবং তারপর দ্বিতীয় একটি তালিকা মুখস্থ করার জন্য বলা হল। এরপর প্রথম তালিকার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করার জন্য বলা হল। দ্বিতীয় দলটিকে প্রথম তালিকাটি মুখস্থ করার পর দ্বিতীয় তালিকাটি মুখস্থ করতে না বলে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বলা হল। সে মনোযোগ বিশ্রামের জন্য দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে প্রথম দলের তুলনায় বিস্মৃতির সংখ্যা আমার

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনোযোগ ও আগ্রহ

(Attention and Interest)

১। মনোযোগের স্বরূপ (Nature of Attention) :

কোন বিষযে মনকে নিযুক্ত কবা অর্থাৎ কোন নির্বাচিত বিষযকে চেতনার কেন্দ্র স্থলে নিয়ে আসাই হল মনোযোগ। সব বিষযের প্রতি একই সমযে আমাদেব মন নিবিষ্ট করা কখনও সম্ভব নয। কাজেই সাধারণতঃ একটি বিষযের পরে আর একটি বিষযে আমরা মনঃসংযোগ করি। মনোযোগ বলতে আমবা সেজন্য সাধারণতঃ বুঝে থাকি অসংখ্য বিষযবস্তুর মধ্যে দু-একটি বিষয়কে নির্বাচন করে নিযে তার উপর মনকে নিবিষ্ট করা এবং অন্যান্য বিষয থেকে সামযিকভাবে মনকে দূরে সরিযে নেওযা। সুতরাং মনোযোগ হল চেতনাব ক্ষেত্রটিকে সঙ্কুচিত করে মাত্র দু-একটি বিষযবস্তুতে মন নিবিষ্ট করা।

কোন বিশেষ বিষযে মনঃসংযোগ করাই হল মনোযোগ

মনোযোগ শব্দটিকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার কবা হযে থাকে। প্রথমতঃ, মনোযোগ বলতে বোঝায কোন বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট চেতনা। মনোযোগ হল একটা মানসিক শক্তি। দ্বিতীযতঃ, মনোযোগ বলতে বোঝায় একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মনকে কোন একটি বস্তুর উপর নিবিষ্ট করা হয এবং তারই ফলস্বরূপ বস্তুটি পূর্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হযে ওঠে। তৃতীযতঃ, মনোযোগ বলতে কেবলমাত্র মানসিক প্রক্রিয়াকে না বুঝিয়ে, মানসিক প্রক্রিয়া এবং বস্তুর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চেতনা উভয়কে বোঝাতে পারে। এই মতানুসারে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চেতনা মনোযোগেরই অংশস্বরূপ।

বিভিন্ন অর্থে মনোযোগ শব্দটির ব্যবহার

সাধারণতঃ, তৃতীয অর্থেই মনোযোগ কথাটিকে গ্রহণ করা হয। সুতরাং মনোযোগ হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা কোন একটি বিষয়ের উপর আমাদের মনকে নিবিষ্ট করি এই উদ্দেশ্যে যে, বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে আমরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করব। আমি ঘরে বসে মনোযোগ দিয়ে একটি বই পড়ছি। বাইরের নানা রকম শব্দ, গোলমাল যদিও আমার কানে আসছে, তবু বইটির

মনোযোগ কথাটির সাধারণ অর্থ

প্রতি মনোযোগী হওয়াতে পাঠ্য বিষয়টি আমার চেতনার কেন্দ্রস্থল (focus of consciousness) এবং অন্যান্য বিষয়গুলি চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করে আছে।

২। মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attention) :

মনোযোগের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে :

মনোযোগ ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া

(ক) মনোযোগ একটি ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া,[1] সেহেতু এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে একটি বিশেষ দিকে চালিত করতে হয়। এই প্রক্রিয়া চেতনাকে বস্তুর উপরে কেন্দ্রীভূত করে বস্তুর ধারণাকে সুস্পষ্ট করে।

মনোযোগ নির্বাচনধর্মী

(খ) মনোযোগ নির্বাচনধর্মী (selective)।[2] একটি মাত্র বিষয় নির্বাচন করা ও অপরগুলিকে বর্জন করা বা চেতনার ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করাই হল মনোযোগের ধর্ম। যেমন, কোন ছাত্র যখন পাঠ্যবিষয়ের উপর মনকে নিবদ্ধ করে তখন সে অন্যান্য বিষয়—যেমন, পথ দিয়ে গাড়ি চলার শব্দ, পাখীর ডাক, নানা রকম গোলমালের শব্দকে চেতনার ক্ষেত্র থেকে বর্জন করে।

মনোযোগের সদর্থক এবং নঞর্থক দিক

(গ) মনোযোগের মধ্যে দুটি দিক আছে—একটি সদর্থক এবং আরেকটি নঞর্থক (positive and negative)। যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় সেটা হল সদর্থক দিক এবং অপর যে যে বিষয় থেকে মনকে সরিয়ে নেওয়া হয় সেটা নঞর্থক দিক।

মনোযোগের ক্ষেত্র সীমিত

(ঘ) মনোযোগের ক্ষেত্র খুব সীমিত বা সংকীর্ণ, যেহেতু একই সময়ে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের প্রতিই আমরা মনোযোগী হতে পারি।[3]

---

1. মনোবিজ্ঞানী স্টাউট (*Stout*) মনোযোগের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'মনোযোগ হল ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয়।

2. মনোবিজ্ঞানী ফ্লেচার (*Fletcher*) মনোযোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁর নির্বাচনধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি তাঁর সংজ্ঞায় বলেছেন, পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবেশের কোন কোন বিষয় যখন ইন্দ্রিয়ের উপর এসে আঘাত করে, তখন কোন কোন বিষয়কে পৃথক করে নেওয়া বা নির্বাচন করা এবং অবশিষ্টকে পরিহার করা মনোযোগের কাজ।

3. প্রশ্ন হল, একই সময়ে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আমরা মনোযোগী হতে পারি—এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। কেউ বলেন এক, কেউ বা বলেন দুই, কেউ বা বলেন ছয়। আসলে আমরা একের অধিক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না।

(ঙ) মনোযোগ হল অস্থির ও সঞ্চরণশীল। মনোযোগ বস্তু থেকে বস্তুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণতঃ কয়েক সেকেণ্ডের বেশি কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে আমরা মনকে নিবদ্ধ রাখতে পারি না। একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে বিষয়টি জানা যায়। যদি একটি ঘড়ি কানের কাছে ধরা যায়, আমরা ঘড়িটির টিকটিক শব্দ শুনি এবং মনে হয় শব্দ একবার তীব্র হচ্ছে একবার ক্ষীণ হচ্ছে, আসলে আমাদের মনোযোগের অস্থিরতা ও সঞ্চরণশীলতাই এর কারণ।

অস্থির ও সঞ্চরণশীল

(চ) মনোযোগ অস্থির ও সঞ্চরণশীল হলেও একটা ধারাবাহিক (continuous) এবং একত্ববিশিষ্ট (unified) ক্রিয়া। কতকগুলি বর্ণ বা সংখ্যার প্রতি একসঙ্গে মনোযোগী হলে বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে দৃষ্ট হয়।

(ছ) মনোযোগ হল অনুসন্ধানী (exploratory)। মনোযোগ নিত্য নতুন নতুন বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করে বেড়ায়। সাধারণতঃ বিষয়বস্তুতে নতুনত্ব বা অভিনবত্ব না থাকলে সে বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ানই মনোযোগের ধর্ম। মনোবিদ্ উডওয়ার্থের (*Woodworth*) মতে 'মনোযোগ' হল সচল, কারণ এ হল অনুসন্ধানী, অনবরত নতুনকে নিয়ে এ পরীক্ষা করতে চায়।[1]

অনুসন্ধানী

(জ) মনোযোগ উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া। মনোযোগ জ্ঞেয় বস্তুর অস্পষ্টতা দূর করে তাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে তোলে। মনোযোগ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চেতনার কারণস্বরূপ। কিন্তু তাই বলে মনোযোগ সুস্পষ্ট চেতনার সঙ্গে অভিন্ন নয়।

ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে তোলে

(ঝ) মনোযোগ হল এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে। যদি ক, খ, গ, ঘ—এই চারটি বিষয়ের প্রতি আমরা বার বার মনোযোগী হই তাহলে যে পারম্পর্য অনুযায়ী তাদের প্রতি মনোযোগী হব, সেই পারম্পর্য অনুযায়ী তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হবে।

পারম্পর্য অনুযায়ী সম্বন্ধ স্থাপন

(ঞ) মনোযোগ হল বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক মানসিক প্রক্রিয়া। কোন একটি গাছের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে গাছের বিভিন্ন অংশ, তার কাণ্ড, তার শাখা-প্রশাখা, ফল-ফুল প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগী হতে পারি। আবার এই বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে গাছের যে সামগ্রিক রূপটুকু ফুটে উঠছে তার প্রতি মনোযোগী হতে পারি।

বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক

1. "Attention is mobile because it is exploratory, it continually seeks something fresh for examination."—Woodworth.

(ট) মনোযোগের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়বস্তুর বিশেষ অভিযোজনের (special adjustment) প্রয়োজন হয়। যেমন, আমার মনোযোগের বিষয়বস্তু যদি আমার পেছনে থাকে তাহলে আমাকে ঘাড়টিকে ঘুরিয়ে সেই বস্তুটির প্রতি মনোযোগী হতে হবে। এমনিভাবে চোখে দেখার জন্য বা শব্দ শোনার জন্য সেই সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের উপর যাতে উদ্দীপকটি ক্রিয়া করতে পারে তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হয়।

মনোযোগের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের অভিযোজন

৩। মনোযোগের কারণ বা নির্ধারক (Conditions or Determinants of Attention) :

প্রশ্ন হল : অসংখ্য বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোন একটির প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয় কেন ? কোন্ কোন্ বিষয়ের দ্বারা আমাদের মনোযোগ নির্ধারিত হয় ? কোন একটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার কারণ কি ?

যে বিষয়গুলি মনোযোগ নির্ধারণ করে তাকেই বলা হয় মনোযোগের কারণ। এই কারণগুলিকে তিন দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। যথা—(ক) **উদ্দীপক সংক্রান্ত কারণ** বা **ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কারণ** (relating to objective conditions), (খ) **মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ** বা **ব্যক্তি-সাপেক্ষ কারণ** (relating to mental conditions or subjective conditions) এবং (গ) **দৈহিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ** (relating to physical conditions)।

মনোযোগের কারণ তিন প্রকার

(ক) **উদ্দীপক সংক্রান্ত কারণ** বা **ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কারণ :** ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কারণ হল সেই সব কারণগুলি যেগুলি বাইরের জগতের বস্তু বা উদ্দীপক-নির্ভর। যথা—(i) **তীব্রতা (Intensity) :** উদ্দীপকের মধ্যে যেটি বেশি তীব্র, সেটি সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন—ক্ষীণ, মৃদু স্বরের তুলনায় উচ্চস্বর সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে; উজ্জ্বল আলোক, তীব্র গন্ধ প্রভৃতির দিকে আমাদের মনোযোগ সহজেই ধাবিত হয়।

(ii) **আকার (Size) :** সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকার বস্তুর তুলনায় বৃহৎ বস্তু সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, হাতি ও ছাগলের মধ্যে হাতিই সহজে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। দৈনিক সংবাদপত্রে বড় অক্ষরে ছাপা বিষয় সহজে আমাদের নজরে পড়ে। ঐ একই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনদাতারা বড় বড় অক্ষরে লেখা পোস্টার ব্যবহার করে।

(iii) **গতিশীলতা (Mobility) :** স্থির বস্তুর তুলনায় গতিসম্পন্ন বস্তু সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বড় বড় শহরে গতিশীল বৈদ্যুতিক আলোর বিজ্ঞাপন-গুলো সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(iv) **নতুনত্ব (Novelty) :** যা কিছু নতুন, বৈচিত্র্যপূর্ণ তা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নতুন খেলনা, নতুন বই, নতুন পোশাক সহজেই শিশুর মনকে আকর্ষণ করে। চেনা পথে চলতে চলতে হঠাৎ একটা নতুন বাড়ি দেখে আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। নতুন খবর শোনার আগ্রহ আমাদের খুবই।

(v) **পরিবর্তনশীলতা (Change) :** পরিবর্তন যদি আকস্মিক হয় এবং অবিচ্ছিন্ন ধারায় না চলে তাহলে তা আমাদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করে। ঘড়ির টিকটিক শব্দ ক্রমাগত চলতে থাকলে তা আমাদেব মনোযোগ আকর্ষণ করে না। কিন্তু হঠাৎ শব্দ থেমে গেলেই আমাদের মনোযোগ সেদিকে ধাবিত হয়। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদ্দীপকের আকস্মিক আবির্ভাব মনোযোগের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

(vi) **পুনরাবৃত্তি (Repetition) :** পুনরাবৃত্তিও মনোযোগের অন্যতম কারণ। কোন একটি উদ্দীপকেব যদি পুনবাবৃত্তি ঘটে, তাহলে আমাদের মনোযোগ সহজেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়। শিক্ষক মহাশয় কোন একটি বিষয় যখন বার বার ব্যাখ্যা কবতে থাকেন তখন ছাত্রেব মনোযোগ সে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। তবে পুনবাবৃত্তি যদি বাব বার হতে থাকে তাহলে একঘেয়েমির জন্য সে বিষয় থেকে মনোযোগ অপসারিত হতে পারে।

(vii) **বৈসাদৃশ্য (Contrast) :** বৈসাদৃশ্য মনোযোগের অন্যতম কারণ। খুব লম্বা লোকের পাশে যদি কোন বেঁটে লোক, কিংবা খুব মোটা লোকের পাশে যদি কোন রোগা লোক দাঁড়ায়, তাহলে সহজেই আমাদেব দৃষ্টি সেদিকে ধাবিত হয়।

(viii) **গোপনতা (Secrecy) :** গোপন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ সহজেই ধাবিত হয়। কেউ যদি কোন খবর গোপন রাখতে চায় তাহলে স্বভাবতই সে বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয়। আমরা খবরটি শোনার জন্য উদগ্রীব হই।

(ix) **বিচ্ছিন্নতা (Separation) :** যখন একাধিক উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করছে তখন কোন একটি উদ্দীপককে অন্য উদ্দীপক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেতার এবং সরোদ, এই দুটি বাদ্যযন্ত্র

একসঙ্গে বাজান হচ্ছে। যদি সেতারের বাজনাটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শুধু মাত্র সরোদটি বাজতে থাকে তাহলে বিষয়টির প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয়।

(x) **সুসমঞ্জস রূপ** (Systematic form): যে সব বস্তু আমাদের দৃষ্টি-পথে বা যেসব শব্দ শ্রবণপথে উপনীত হয় তার মধ্যে যেগুলি সুসমঞ্জস বা সুসংহত সেগুলির প্রতি আমরা সহজেই মনোযোগী হই। যেমন, বেসুরো গানের তুলনায় সুরেলা গান মৃদুস্বরে গীত হলেও আমাদেব মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

(xi) **দীর্ঘস্থায়িত্ব** (Long duration): উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব মনোযোগকে সহজেই আকর্ষণ করে। কোন শিশু কেঁদে উঠেই থেমে গেলে আমাদের নজর সেদিকে নাও যেতে পারে। কিন্তু সে অনবরত যদি কেঁদেই চলে তার দিকে আমাদের মনোযোগ দিতেই হয়।

(খ) **মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ** বা **ব্যক্তি-সাপেক্ষ কারণ:** মনোযোগের ব্যক্তি-সাপেক্ষ কারণ হল সেগুলি, যেগুলি ব্যক্তিনির্ভর, বস্তুনির্ভর নয়। যথা—(i) **অনুরাগ** বা **আগ্রহ** (Interest): যার যে বিষয়ে অনুরাগ তার মনোযোগ সে বিষয়ে বেশি। এজন্যই দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রীড়ামোদী ব্যক্তি আগে খেলার খবরটি দেখেন এবং ব্যবসায়ী দেখেন বাজার দর।

(ii) **আবেগ** (Emotion): আবেগও মনোযোগ নির্ধারণ করে।[1] যাকে আমরা ভালবাসি তার সদ্‌গুণের প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয়। আর যাকে আমরা অপছন্দ করি তার দোষত্রুটিগুলিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(iii) **কামনা** (Desire): কামনা, বাসনা বা অভিপ্রায় মনোযোগ নির্ধারণ করে থাকে। যে ব্যক্তি অর্থের কামনায় উন্মত্ত, তার মনোযোগ সকল সময়ই অধিক অর্থ উপার্জন করার দিকে।

(iv) **অভিজ্ঞতা** (Experience): পূর্ব-অভিজ্ঞতাও মনোযোগ আকর্ষণ করার অন্যতম হেতু। যেমন, পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে শিকারী জানে বনে কোথায় সে শিকারের দেখা পাবে এবং সেখানে উপস্থিত হলেই তার মনোযোগ প্রত্যাশিত শিকারের দিকে ধাবিত হয়।

(v) **অভ্যাস ও শিক্ষা** (Habit and Education): অভ্যাস এবং শিক্ষাও মনোযোগ নির্ধারণ করে থাকে। ঘুম থেকে উঠেই যাঁর খবরের কাগজ পড়া অভ্যাস,

1. "And not only our interests but our general mind or attitude may affect the direction of our attention.

—Rex and Knight: A Modern Introduction to Psychology. Page 113.

দকালে তাঁর মনোযোগ খবরের কাগজের দিকেই সহজে যায়। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-সম্পর্কীয় বিষয়ে, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ গাছপালা, ফুল ইত্যাদিতে, প্রাণিতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন ধরনের প্রাণীতে মনোযোগী হয়ে থাকেন।

(vi) **মানসিক প্রবণতা** (Mental Disposition): জন্মগত মানসিক প্রবণতাও মনোযোগ নির্ধারণ করে। দক্ষ গায়ক, শিল্পী, চিত্রকর প্রভৃতি জন্মগত মানসিক প্রবণতার জন্যই নিজের নিজের বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হন।

(vii) **সহজাত প্রবৃত্তি** (Instinctive propensities): ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনাবেগ প্রভৃতি আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির নিকট যে বস্তুর আবেদন আছে, সেই বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়।

(viii) **মেজাজ ও মনোভাব** (Mood and attitude): ব্যক্তির মেজাজ ও মনোভাব মনোযোগ নিধারণের অন্যতম শর্ত। যে ব্যক্তির মেজাজ কোন কারণে তিক্ত, তিনি বাড়ীতে মৃদু হৈ চৈ হলেও তার প্রতি মনোযোগী হতে পারেন, যদিও সাধারণ অবস্থায় তিনি এই জাতীয় ঘটনার প্রতি মনোযোগী হন না।

(ix) **মানসিক সুস্থতা** (Sound condition of mind): রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যাধি প্রভৃতি কারণবশতঃ যদি মন চঞ্চল ও অস্থির হয় এবং মনের স্বাভাবিক সুস্থতা ব্যাহত হয় তাহলে কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব হয় না। সে কারণে মানসিক সুস্থতাও মনোযোগের একটি কারণ।

যদিও উদ্দীপক সংক্রান্ত কারণ ও মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ—উভয়ই মনোযোগ নির্ধারণ করে থাকে তবু মনে হয় মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণগুলিরই প্রভাব বেশি। মন যদি কোন কারণে উদ্বেগে ভারাক্রান্ত থাকে তাহলে তীব্র উদ্দীপক যেমন, কোনও উচ্চ শব্দ মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আবার যখন বন্ধুর প্রত্যাশায় বসে আছি তখন সে চুপি চুপি ডাকলেও সাড়া দিয়ে থাকি।

(গ) দৈহিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ: দৈহিক সুস্থতা মনোযোগের অন্যতম কারণ। দেহ অসুস্থ হলে মনের সুস্থতা ব্যাহত হয়। তাছাড়া কতকগুলি দৈহিক প্রক্রিয়া আছে যেগুলি মনোযোগের সহায়ক অবস্থা; যেমন, ইন্দ্রিয়ের বিশেষ অভিযোজন অর্থাৎ মনোযোগের বিষয়বস্তুর প্রতি দর্শনেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিবদ্ধ করায়, ব্যক্তির বিশেষ দেহভঙ্গী, যেমন—সঙ্গীত শ্রবণ করার সময় চক্ষু মুদ্রিত করে থাকা, কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবার সময় কান চুলকান, পা দোলান প্রভৃতি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব। এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে ব্যক্তির মনোযোগও নষ্ট হয়ে যায়।

মনোযোগের দৈহিক কারণ, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিশেষ করে গুরু-মস্তিষ্কের অনুষঙ্গ এলাকায় (association area) নিহিত। কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার অর্থ সেই সব স্নায়ুর ক্রিয়া, যেগুলি, ঐ বিষয়ের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে অনুষঙ্গ এলাকা, তার সঙ্গে যুক্ত এবং সেই সব স্নায়ুপথের নিষ্ক্রিয়তা যেগুলি ওর সঙ্গে যুক্ত নয়। গভীর মনোযোগের সময় শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। দৈহিক অসুস্থতা মনোযোগ ব্যাহত করে।

৪। মনোযোগের প্রকারভেদ (Types or Kinds of Attention) :

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মনোযোগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(ক) **ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ (Voluntary Attention, Non-voluntary Attention and Involuntary Attention) :** মনোযোগের ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করা বা না করার উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

(i) **ইচ্ছাকৃত মনোযোগ** (Voluntary Attention) : যখন আমরা স্বেচ্ছায় কোন বিষয়বস্তুর উপর মনোনিবেশ করি তখনই তাকে বলা হয় ইচ্ছাকৃত মনোযোগ। ইচ্ছাকৃত মনোযোগ হল স্বতঃপ্রসূত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং একে সক্রিয় (Active) মনোযোগও বলা যেতে পারে। বাইরে গোলমাল চলছে, তবু কোন ছাত্র যখন নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করে পুস্তকে মনঃসংযোগ করে, তখন তার মনোযোগ ইচ্ছাকৃত মনোযোগের দৃষ্টান্ত। নীরস বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি করার জন্য অনেক সময় আমাদের একরকম জোর করেই কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হয়।

(ii) **অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ** (Non-voluntary Attention) : বিষয়ের নিজ গুণে যখন আমাদের মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন বিষয়ে মনোযোগী হয়, তখন তাকে বলা হয় অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ। এই জাতীয় মনোযোগ হল নিষ্ক্রিয় (Passive)। ঘরে বসে বই পড়তে পড়তে তীব্র গন্ধ নাকে এল। তখন আমাদের মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতি ধাবিত হল। অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ নির্ধারিত হয় উদ্দীপকের দ্বারা। তীব্র উদ্দীপক স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই জাতীয় মনোযোগকে অভ্যাসসিদ্ধ মনোযোগও (habitual attention) বলা হয়। যেহেতু অভ্যাস ও মনোভাবের জন্যই এই ধরনের মনোযোগের উদ্ভব হয়।

(iii) **ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ** (Involuntary Attention) : মনোযোগী হবার ইচ্ছা নেই, তবু জোর করে কোন বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করা হলে তাকে ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ বলে। এক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মন বিষয়বস্তুর উপর নিবিষ্ট হয়। বিষয়বস্তুটি মোটেও আকর্ষণীয় বা প্রীতিকর নয়, তবু বিষয়টি একরকম জোর করেই মনকে আকৃষ্ট করে। অঙ্ক করার স্বাভাবিক ইচ্ছা নেই, বরং অনিচ্ছাই আছে, তবু পরীক্ষার কথা ভেবে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার প্রতি মনোযোগী হতে হয়।

(খ) বস্তুবিষয়ক মনোযোগ এবং ভাববিষয়ক মনোযোগ (Sensory Attention and Ideational Attention) : বিষয়বস্তুর স্বরূপের উপর এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি। যখন আমাদের মনোযোগ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে (sensible objects) আকৃষ্ট হয় তখন আমাদের মনোযোগকে বলা হবে **বস্তুবিষয়ক মনোযোগ**। যেমন—কোন ফুল, ফল, বাড়ি বা গাছের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

কিন্তু যখন আমাদের মনোযোগ ভাব, ধারণা বা অনুভূতির প্রতি ধাবিত হয় তখন তাকে বলা হবে **ভাববিষয়ক মনোযোগ**। যেমন—আমার মনোযোগ যখন সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির প্রতি, কোন কাব্যের আলোচনার প্রতি বা মৃত বন্ধুর প্রতিরূপের (image) প্রতি ধাবিত হয়।

(গ) **প্রত্যক্ষ মনোযোগ** এবং **পরোক্ষ মনোযোগ** (Immediate Attention and Derived Attention) : বিষয়বস্তুর আকর্ষণীয়তার উপর এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি। কোন বস্তু চিত্তাকর্ষক বা আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য যখন সহজেই আমাদের মনোযোগ তার দিকে ধাবিত হয় তখন তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ মনোযোগ। যেমন, কোন মধুর সঙ্গীত বা কোন অভিনব ঘটনা সহজেই আমাদের মনকে আকর্ষণ করে।

যখন কোন বস্তু নিজে চিত্তাকর্ষক বা আকর্ষণীয় না হয়েও অন্য চিত্তাকর্ষক বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তখন সেই মনোযোগকে বলা হয় পরোক্ষ মনোযোগ। কলম আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু যখন বলা হয় যে, এই কলমটি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করতেন তখন তার প্রতি আমরা মনোযোগী হই। সেরূপ, ছাত্র নীরস বিষয়ের প্রতি কেবলমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যেই মনোযোগী হলে, সেই মনোযোগ হয় পরোক্ষ মনোযোগ।

(ঘ) বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ এবং সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ (Analytical and Synthetical Attention) : মনোযোগের বিষয়বস্তুকে সমগ্র হিসেবে

অবধারণ করা হচ্ছে, কি হচ্ছে না, তার উপরে এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি। যখন কোন বস্তুকে 'সমগ্র' হিসেবে না দেখে তাকে পৃথক পৃথক অংশে বিশ্লেষণ করে তার প্রতি মনোযোগী হই তখন আমাদের মনোযোগ হয় বিশ্লেষণাত্মক। যেমন, একটি বৃক্ষকে তার বিভিন্ন অংশে (মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, ফুল-ফল প্রভৃতিতে) বিশ্লেষণ করে তার প্রতি মনোযোগী হওয়া।

মন যখন কোন বিষয়বস্তুর সামগ্রিক রূপটির প্রতি মনোযোগী হয় তখন সেই মনোযোগকে বলা হয় সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ। যেমন, একটি ঘরে নানারকম আসবাবপত্র সাজিয়ে আমরা যখন দেখি সাজানটা কিরকম হল, তখন সেই মনোযোগকে বলা হয় সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ।

দৈনন্দিন জীবনে বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি যে, বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ এবং সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ একই সঙ্গে কার্য করে।

(ঙ) **তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক মনোযোগ (Theoretical and Practical Attention):** যে মনোযোগের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা, তাকে তাত্ত্বিক মনোযোগ বলে। যেমন, নিছক জ্ঞানের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলের কোন একটি এলাকার বিবরণের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

যে মনোযোগের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ নয়, কোন কার্যকরী ফল লাভ করা, তাকে ব্যবহারিক বা কার্যকরী মনোযোগ বলে। যেমন, সুন্দরবন অঞ্চলের কোন একটি বিশেষ এলাকায় চাষ আবাদ করার জন্য তার বিবরণে মনোযোগী হওয়া ব্যবহারিক মনোযোগের উদাহরণ।

৫। শিশুর মনোযোগের বিকাশ (Development of Attention in child):

শিশুর মনোযোগের বিকাশের তিনটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়।

শৈশবে শিশুর মনোযোগ থাকে অনিচ্ছাকৃত। উদ্দীপক কতখানি আকর্ষণীয়, অর্থাৎ উদ্দীপকের প্রকৃতিই শিশুর মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্বতঃপ্রসূত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছা এই সময় শিশুর ক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়। স্বেচ্ছায় কোন বিষয়বস্তুর উপর মনোনিবেশ করা তখন শিশুর পক্ষে তেমন সম্ভব হয় না। এই কারণে এই সময় শিশুকে এমন কোন বিষয় শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা উচিত নয় যাতে শিশুকে জোর করে ইচ্ছা প্রয়োগ করে বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হতে হবে। স্বাভাবিকভাবে শিশু মনোযোগী

অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ

হবে এমন বিষয়ই তাকে এই সময় শিক্ষা দেওয়া উচিত। রঙিন ছবির বই, খেলাধুলার জিনিস, এগুলি সহজেই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং এগুলির সাহায্যেই শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

যখন শিশু আর একটু বড় হয় তখন তার মধ্যে ইচ্ছাকৃত মনোযোগ দেখা দেয়। এই স্তরে শিশু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের ইচ্ছাকে কোন বিষয়ের প্রতি প্রয়োগ করে তার প্রতি মনোযোগী হতে পারে। অনেক সময় অনেক পাঠ্যবিষয়ে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায় না, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণীয় বা প্রীতিকর নয় এমন বস্তুতেও সে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে ছাত্রজীবনে স্কুলে পড়া-শোনার ব্যাপারে নীরস বিষয়বস্তু অনুধাবনের জন্য অনেক সময় শিশুকে নিজের ইচ্ছাকে জোর করেই প্রয়োগ করে মনঃসংযোগ করতে হয়।

ইচ্ছাকৃত মনোযোগ

শিশু যখন আরও বড় হয়, অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোযোগ (habitual attention) দেখা দেয়। অভ্যাসমূলক মনোযোগ হল স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। উদ্দীপক তেমন আকর্ষণীয় বা প্রীতিকর না হলেও, ব্যক্তি বিনা চেষ্টায় তার প্রতি মনোযোগী হতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়। সংসারের নানান কাজ-কর্মে, নানারকম দায়িত্বপালনের ব্যাপারে, নিজের নেশার চাপে, পরিবেশের চাপে, শখ মেটাবার আগ্রহের জন্য ব্যক্তির মধ্যে এই অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা যায়।

অভ্যাসমূলক মনোযোগ

৬। মনোযোগের বিস্তার বা পরিধি (The span or Range of Attention):

আমরা একই সময়ে এক সঙ্গে যে কয়টি বস্তুর প্রতি মনোযোগী হতে পারি, তাই নিয়ে মনোযোগের বিস্তার বা পরিধি নির্ধারিত হয়। প্রশ্ন হল, কয়টি বস্তুর প্রতি আমরা একসঙ্গে একই সময়ে মনোযোগী হতে পারি? যখন আমরা একাধিক বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করি, তখন ঐ মনঃসংযোগ কি সমকালীন (simultaneous), না ক্রমিক? অর্থাৎ আমাদের মনোযোগ কি একই সময়ে একাধিক বস্তুর উপর নিবিষ্ট হয়, না পর্যায়ক্রমে একটির পর একটিতে নিবিষ্ট হয়? এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কারও কারও মতে আমরা একই সময়ে, একই সঙ্গে, একাধিক বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করতে পারি। আবার কারও কারও মতে আমরা

মনোযোগ সমকালীন না, ক্রমিক

পর্যায়ক্রমে একটির পর একটিতে মনঃসংযোগ করি। তবে এই সব পৃথক পৃথক মনঃসংযোগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত সামান্য যে, মনোযোগ পর্যায়ক্রমে না ঘটে সমকালীন হচ্ছে, এরূপই ধারণা হয়।

এ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তবে অনেকের মতে একসঙ্গে একটির অধিক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। মনোযোগের সময় চেতনার কেন্দ্রস্থলে একটি মাত্র বিষয় থাকাই সম্ভব, কাজেই একই সময়ে একটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়া যেতে পারে। বিভক্ত মনোযোগ কথাটি অর্থহীন। অনেক সময় দুটি কার্য এক সঙ্গে করা হলেও ব্যক্তির পক্ষে দুটি ক্ষেত্রে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

বিভক্ত মনোযোগের অসম্ভাব্যতা

অনেক সময় মন দ্রুত গতিতে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চালিত হওয়ার জন্য মনোযোগ বিভক্ত বলে ধারণা করা হয়। অনেক সময় একাধিক বিষয়ে মনঃসংযোগ করা হলেও আসলে বিভিন্ন বিষয়গুলি মনের কাছে একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। কাজেই একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ সম্ভব নয়।

ট্যাকিস্টোস্কোপ (Tachistoscope) বা ক্ষণদৃক যন্ত্রের সাহায্যে মনোযোগের বিস্তার বা পরিধি পরিমাপ করা যেতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, সাধারণ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি একবারে পাঁচ–ছয়টির অধিক বস্তুর প্রতি মনোযোগী হতে পারে না। এই যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি যে, কোনও ছবি খুব কম সময়ের জন্য এক ঝলক দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যায় এবং সে সময় সেই বস্তুটির উপর এমন ভাবে আলোকপাত করা হয় যাতে পরীক্ষণ-পাত্র একবারের বেশী দুবার বস্তুটির উপর মনোযোগ দিতে পারে না। কয়েকটি সংখ্যা বা অক্ষরযুক্ত কার্ড বেছে নিয়ে ট্যাকিস্টোস্কোপের জানালাটির দিকে পরীক্ষণ পাত্রকে মনোনিবেশ করতে হলে, সেই জানালার মধ্যে কার্ডগুলিকে আধ সেকেণ্ড ধরে দেখান হয়। কার্ড-গুলিকে সংখ্যা বা অক্ষরের অনুক্রম অনুযায়ী দেখান চলবে না। এলোমেলো ভাবে দেখাতে হয়। তারপর পরীক্ষণ-পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কয়টি সংখ্যা বা অক্ষর সে দেখতে পেয়েছে। যতগুলি সংখ্যা বা অক্ষর পরীক্ষণ-পাত্র নির্ভুলভাবে অবধারণ করতে পারে, তাই হয় পরীক্ষণ-পাত্রের মনোযোগের পরিধি বা বিস্তার। দেখা গেছে যে, সাধারণ মানুষ পাঁচ ছয়টির অধিক সংখ্যা বা অক্ষরের প্রতি মনোযোগী হতে পারে না।

দৃষ্টিগত মনোযোগের বিস্তার নির্ধারণ বিষয়ক পরীক্ষণ

উপরে যে পরীক্ষণের কথা বলা হল তা হল দৃষ্টিগত মনোযোগের বিস্তার নির্ধারক বিষয়ক পরীক্ষণ। পরীক্ষাটি যুগপৎ পদ্ধতির (simultaneous method

সাহায্যে করা হয়। আমাদের শ্রবণগত মনোযোগের বিস্তার দৃষ্টিগত মনোযোগের বিস্তারের তুলনায় অধিক। এ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পূর্বাপর উদ্দীপক উপস্থাপিত করার পদ্ধতির (method of successive stimuli) আশ্রয় নেওয়া হয়। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর আটটি শব্দের প্রতি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মনোযোগী হতে পারে। মেট্রোনোম (Metronome) নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। মেট্রোনোম বা মাত্রামাপক ঘণ্টা স্বল্প ব্যবধানে পর পর কয়েকবার দু-দফায় বাজান হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে দু-দফার ধ্বনির সংখ্যা সমান কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। দেখা গেছে যে, পরীক্ষণ-পাত্র দুইটির বেশী ধ্বনির প্রতি মনোযোগী হতে পারে না এবং ঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু যদি শব্দ ছন্দযুক্ত হয় তবে শ্রবণগত মনোযোগের বিস্তার অধিক হতে পারে।

শ্রবণগত মনোযোগের বিস্তার

একসঙ্গে কয়টি কাজের প্রতি আমরা মনোযোগী হতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ঐচ্ছিক ক্রিয়া একসঙ্গে একবারে একটিই করা যেতে পারে। কিন্তু একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া থেকে আর একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়ার দ্রুত মনোযোগ ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

পূর্বোক্ত পরীক্ষণগুলির ফলাফল থেকে যদিও একথা প্রকাশ পায় যে, ব্যক্তি একই সময়ে ছয়, সাত বা আটটি বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে, তবু আসলে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, মানুষ এক সময়ে একটি বিষয়েই স্পষ্টভাবে মনোযোগী হতে পারে। একই সময়ে সমান স্পষ্টতার সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়, তবে অনেক সময় একাধিক সংখ্যা, বর্ণ প্রভৃতি নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে একটি সমগ্র বিষয়রূপে জ্ঞাত হওয়ার জন্য মনে হয় যেন একই সময়ে একাধিক বিষয়ে সমান স্পষ্টভাবে মনোযোগী হওয়া সম্ভব, কিন্তু আসলে তা নয়।

৭। মনোযোগের স্থায়িত্ব (Duration of Attention):

অবিরতভাবে একটি বস্তুর প্রতি আমরা কতক্ষণ মনোযোগী থাকতে পারি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, বিশেষ অভ্যাস ছাড়া আমাদের মনোযোগ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে কোন একটি বস্তুতে অতি অল্পক্ষণের জন্যই স্থির রাখা সম্ভব। অস্থিরতা মনোযোগের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, মনোযোগ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছে এবং আবার ফিরে আসছে। কোন একটি বিন্দুর উপর যদি মনোযোগকে নিবিষ্ট করি তবে দেখা যাবে যে,

অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ অল্পক্ষণের জন্যই সম্ভব

নিমিষের মধ্যে মনোযোগ অন্য বস্তুর উপর নিবদ্ধ হয়েছে। মনোযোগের স্থায়িত্ব নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেসব পরীক্ষণকার্য চালান হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, হ্রাস-বৃদ্ধি বা দোদুল্যমানতাই মনোযোগের স্বভাব।

মনোযোগের এই অস্থিরতা সহজেই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। যেমন, আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে একটা টেবিলের উপর একটি ঘড়ি আছে যাকে একটু দূরে সরালেই দেখা যাবে যে, ঘড়ির টিক টিক শব্দ আমরা মাঝে মাঝে শুনছি আবার মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি না; এভাবে মাঝে মাঝে ঘড়ির শব্দ না শুনার কারণ হল মনোযোগের অস্থিরতা। ঘড়ির গতি ঠিকই আছে। কিন্তু মনোযোগের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য মনে হয় ঘড়ির গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে।

আরও একটি পরীক্ষণে দৃষ্টিগ্রাহ্য উদ্দীপকের (visual stimulus) সহায়তায় মনোযোগের এই অস্থিরতার পরিমাপ করা যেতে পারে। একটি ম্যাসন চাকতি (Masson Disc) এই পরীক্ষণে ব্যবহার করা হয়। এই গোলাকার সাদা চাকতির একটি ব্যাসার্ধের উপর একটি কালো রেখা আঁকা থাকে এবং এই কালো রেখাটির মাঝে মাঝে কতকগুলি সাদা রেখা আঁকা থাকে। যদি এই চাকতিকে যন্ত্রের সাহায্যে জোরে ঘোরান হয় তাহলে কালো রেখাটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং কতকগুলি ধূসর রঙের ক্ষীণ গোলাকার বৃত্ত দৃষ্টিগোচর হবে। যদি পরীক্ষণ-পাত্রকে এই ঘূর্ণায়মান চাকতির (Masson Disc) যেকোন একটি ধূসর বৃত্তের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য বলা হয় তাহলে সে দেখবে যে, বৃত্তটি একবার দেখা যাচ্ছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে যে আমাদের মনোযোগ কত অল্প সময়ের জন্য একটি বস্তুর উপর নিবদ্ধ থাকতে পারে।

মনোযোগের অস্থিরতার পরিমাপ

এই পরীক্ষায় মনোযোগের হ্রাস বৃদ্ধি কাইমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা যায়। মনোযোগের এই হ্রাস-বৃদ্ধির হিসেব থেকে জানা যায় যে, কোন বিষয়ে মনোযোগ একটানা ভাবে চব্বিশ সেকেণ্ডের বেশী চলতে পারে না। অবশ্য মনোবি টিচ্‌নার মনে করেন যে, অনুশীলনের সাহায্যে মনোযোগকে সুদীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী করা যেতে পারে। এক নাগাড়ে দু-তিন মিনিট তো সম্ভব বটেই, দুই-তিন ঘণ্টাও সম্ভব।

৮। মনোযোগের দোদুল্যমানতা (Oscillation of Attention)

দু'টি সমান শক্তিশালী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগের ঘোরাফেরা করাকে বলা হয় মনোযোগের দোদুল্যমানতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পাশের ঘ

বসে কেউ বাজনা বাজাচ্ছে, আর আমি ঘরে বসে কোন একটি গল্পের বই পড়ার চেষ্টা করছি, তখন মনোযোগ ঘড়ির দোলকের মতো একবার বই আর একবার বাজনা—এ দুটির মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকবে। পরীক্ষণকার্য চালিয়ে মনোযোগের এই দোদুল্যমানতা সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে।
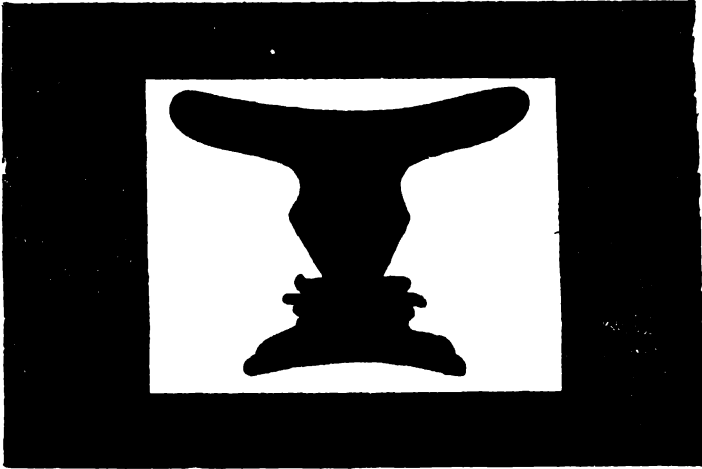
ফুলদানি না, দুটি মানুষের মুখ ?

উপরের ছবিটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কখনও এট একটি ফুলদানি আবার কখনও দুটি মানুষের মুখ চোখে পড়ছে। যদি আমরা
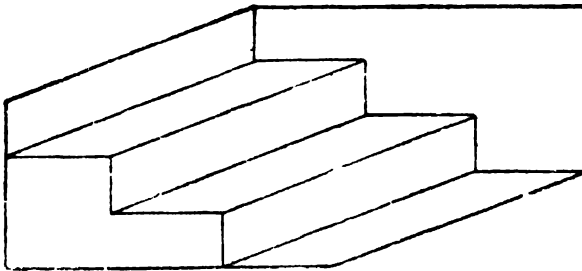
The reversible stairs

মনোযোগ ফুলদানির উপর রাখতে চাই, দেখা যাবে কিছু পরেই তা ফুলদানি থেকে মানুষের মুখের উপর সরে গেছে। আবার মানুষের মুখের দিকে নজর রাখতে গেলে মনোযোগ মানুষের মুখ থেকে ফুলদানির উপর সরে যাবে। একেই বলা হয়

মনোযোগের দোদুল্যমানতা। অনুরূপভাবে যদি ১৮১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছবিটির সিঁড়িটর দিকে ভাল ভাবে তাকান যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ওপরের দিক থেকে যেমন সিঁড়ি নেমে এসেছে ঠিক তেমনি নীচের দিক থেকে সিঁড়ি উপরের দিকে উঠে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে মনোযোগ সিঁড়ির এ দুটি দৃশ্যের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

৯। অমনোযোগ (Inattention) :

অমনোযোগ বলতে সাধারণতঃ আমরা মনোযোগের অভাবই বুঝে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হল, সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া কি সম্ভব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, স্বাভাবিক ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, অমনোযোগের অভাব নয়, স্বল্পমাত্রায় বা কম মনোযোগ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু থেকে মনকে অপসারিত করে অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হওয়া। অমনোযোগ মনোযোগের অভাব বা মনোযোগ হীনতা নয়, বিষয়ান্তরে মনোযোগ।

সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়

যেমন, যে ছাত্রকে আমরা অমনোযোগী বলি সে আসলে শিক্ষক মহাশয় যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন সেটির উপর মন নিবিষ্ট না করে, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হয়েছে। হয়ত সে ফুটবল খেলার কথা ভাবছে।

অমনোযোগী হল অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে মনোযোগ

স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মূর্ছিত অবস্থায় বা নিদ্রিত অবস্থাতেই মনের পক্ষে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া সম্ভব সাধারণতঃ, শিশুরা অমনোযোগী একথা আমরা বলে থাকি। শিশুর ক্ষেত্রেও সম্পূ অমনোযোগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল ও অস্থিরমতি, তাই তার মনোযোগ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে দ্রুত ধাবিত হয় এবং এই অবস্থাকেই আমর সাধারণতঃ অমনোযোগের অবস্থা মনে করে থাকি।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, অমনোযোগ মনোযোগের সহায়ক। কো বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হলে অপর বিষয় থেকে মনোযোগবে অপসারিত করা দরকার। কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনে নিবিষ্ট করার সময় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু থেকে অবশ্য মনোযোগকে সরিয়ে আনতে হয়। কোন ছাত্র যখন পাঠে মন নিবিষ্ট করতে চা তখন তার পক্ষে প্রয়োজন অন্যান্য বিষয় যেমন—খেলাধুলা গল্পগুজব, গান-বাজন আশপাশের হৈ চৈ ইত্যাদিতে মনোযোগী না হওয়া।

অমনোযোগ মনোযোগের সহায়ক

১০। প্রত্যাশামূলক মনোযোগ (Expectant Attention) :

প্রত্যাশামূলক মনোযোগ প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ নয় ; এ হল মনোযোগের জন্য পূর্ব থেকে একটা মানসিক প্রস্তুতি। সময় সময় আমরা পূর্ব থেকেই জানি কোন্ উদ্দীপকটি আমাদের কাছে উপস্থিত হবে এবং তার জন্য দৈহিক ও মানসিক একটা প্রস্তুতির ভাব আমাদের মধ্যে দেখা যায় যাতে উদ্দীপকটি উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমরা তাতে মন নিবিষ্ট করতে পারি। এই ধরনের মনোযোগকে প্রত্যাশামূলক মনোযোগ বলে। যেমন, কোন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে দেখবার জন্য আমরা পথের পাশে আগ্রহভরে অপেক্ষা করি। এই প্রত্যাশামূলক মনোভাবের জন্য যখন তিনি সত্যই আমাদের সামনে উপস্থিত হন, তখন তাঁকে ভালভাবে দেখার সুযোগ আমরা পাই। সুতরাং প্রত্যাশামূলক মনোযোগ কোন বিষয়বস্তুর উপলব্ধি এবং সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। উদ্দীপকের আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য দেহ ও মনে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা থাকে, প্রত্যাশামূলক মনোযোগের জন্য তা হ্রাস পায়। আকস্মিক ধাক্কা, যত মৃদুই হোক না কেন, ব্যক্তির মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করে দিতে পারে। অপর পক্ষে, প্রত্যাশিত ধাক্কা যত তীব্রই হোক না কেন দেহ মনের উপর ততখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং প্রত্যাশামূলক মনোযোগের একটা দৈহিক দিক আছে যেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে অতিরিক্ত প্রত্যাশার ভাব মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখার জন্য যখন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি, তখন যে কোন ব্যক্তিকে দেখামাত্রই মনে হয় আমার সেই পরিচিত ব্যক্তিটি বুঝি উপস্থিত হয়েছে। প্রুফ-সংশোধকের ভ্রান্তিও অনুরূপ কারণে ঘটে থাকে। পূর্ব থেকেই শুদ্ধ বানানটি দেখতে পাব এরূপ প্রত্যাশা করার জন্যই অশুদ্ধ বানান আমাদের চোখে পড়ে না।

প্রত্যাশামূলক মনোযোগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধে হল এই যে, এতে প্রতিক্রিয়া-কাল বিলম্বিত হয় না। উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রতিক্রিয়া করতে পারি। উদ্দীপকের উপস্থাপন এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান তাকেই প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction time) বলে। প্রত্যাশামূলক মনোযোগের জন্য প্রতিক্রিয়া-কাল কমে যায়। এ বিষয়ে ভুণ্ট্ (*Wundt*) একাধিক পরীক্ষণকার্য চালান। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পূর্ব থেকে সতর্ক করে দিয়ে যদি পরীক্ষণ-পাত্রকে কোন শব্দের উপর প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়, তাহলে পরীক্ষণ-পাত্রের প্রত্যাশামূলক মনোযোগের জন্য প্রতিক্রিয়া কাল কম হয়ে গড়ে ০.০৭৬ সেকেণ্ড; আর পূর্ব থেকে সতর্ক করে না দিলে, প্রতিক্রিয়া-কাল হয়

গড়ে ০.২৫৩ সেকেণ্ড। এ বিষয়ে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে প্রতিক্রিয়া-কালকে আরও কমিয়ে আনা যায় এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষণ-পাত্রের প্রত্যাশামূলক মনোযোগের জন্য দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি এত নিখুঁত হয় যে উদ্দীপক উপস্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষণ-পাত্র প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

১১। মনোযোগ এবং বিক্ষেপ (Attention and Distraction):

আমাদের কোন বিষয়ে মনোযোগ অনেক সময় অন্য বিষয়ের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। আবার যখন মন দিয়ে কোন বই পড়ছি, তখন পাশের ঘরের অন্য লোকের কথা-বার্তা ও পাশের বাড়ির রেডিওর গান মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে। কাজেই যা কিছু মনোযোগের পথে বাধা সঞ্চার করে তাকেই বিক্ষেপ (Distraction) বলা চলে। যে উদ্দীপকটি বিক্ষেপ সৃষ্টি করে তার লক্ষ্য, মনোযোগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চেতনার কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হওয়া।

মনোযোগের বিক্ষেপ অনেক সময় বাহ্য উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন, শিশু যখন পাঠ্যবিষয়ের প্রতি মনোযোগী তখন পথে যদি গান বাজনা করতে করতে কোন শোভাযাত্রা যায়, শিশুর মনোযোগ পাঠ্য বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে শেষোক্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় এক্ষেত্রে উদ্দীপকের চিত্তাকর্ষতাই বিক্ষেপের কারণ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বিক্ষেপ বাহ্য উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না, ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, যেমন—উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখভারাক্রান্ত মন, কোন অভাবিত বিপদের আশঙ্কা মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে।

মনোযোগের বিক্ষেপের কারণ

মনোযোগের উপর বিক্ষেপের প্রভাব নির্ধারণ করার জন্য মনোবিজ্ঞানীগণ একাধিক পরীক্ষণ-কার্য পরিচালনা করেন। এই পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে বিক্ষেপ যদি খুব তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী না হয়, তাহলে কাজের দক্ষতা কিছু পরিমাণে বেড়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় চারপাশের হৈ-চৈ-এর মধ্যেও কোন ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট কাজটি করে চলেছে। এর কারণ, যে উদ্দীপক মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে চায়, সেই উদ্দীপকটির বিরুদ্ধে অধিকতর মনোযোগ প্রয়োগ করে ব্যক্তি তার মনকে বিষয়বস্তুর উপর নিবিষ্ট রাখার জন্য সচেষ্ট হয়, যার ফলে বিক্ষেপ-সৃষ্টিকারী উদ্দীপকটি শেষ পর্যন্ত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কিন্তু এই বিক্ষেপ যদি খুব তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত বিক্ষেপ অধিকতর শক্তিশালী হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তির মনোযোগকে ব্যাহত করে। এর কারণ বিক্ষেপের

বিরুদ্ধে অধিকতর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করার জন্য তার অযথা অপচয় ঘটে এবং মনে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেয়। এজন্য বিক্ষেপ-সৃষ্টিকারী উদ্দীপকটিকে অপসারিত করার চেষ্টা করে বিষয়বস্তুর উপর মনোযোগকে ধরে রাখার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত।

নানাভাবে বিক্ষেপ দূর করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, কাজে অধিকতর প্রচেষ্টা। যেমন, চারপাশের গোলমালে যদি পড়ার অসুবিধে হয়, সেক্ষেত্রে বেশ চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করলে সেই অসুবিধে দূর করা যেতে পারে। অভ্যাসের দ্বারাও বিক্ষেপের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে যারা থাকে, তারা ক্রমশঃ রেলগাড়ির শব্দে আর তেমন অসুবিধে বোধ করে না, কারণ সেই শব্দের প্রতি অমনোযোগী হওয়ার অভ্যাস ক্রমশঃ তারা আয়ত্ত করে। আবার কাজের প্রতি আগ্রহকে বাড়িয়ে বিক্ষেপের প্রভাব অনেক কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

১২। মনোযোগের কার্যকারিতা (Uses of Attention) :

মনোযোগের নিম্নলিখিত কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়ঃ মনোযোগ সংবেদন ও ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে। মনোযোগের জন্য সংবেদন বা ধারণাকে আমরা মনের সামনে ধরে রাখতে পারি, নতুবা এগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিলীন হয়ে যায়। এজন্য মনোযোগের দ্বারা সংবেদন ও ধারণাগুলিকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করতে পারি এবং প্রয়োজনে এগুলিকে পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুদ্রেক করতে পারি। কারণ, মনের সামনে এভাবে যাদের আমরা ধরে রাখি, তারা মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যায় ও অন্য ধারণার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে এবং পরে অভিভাবন প্রক্রিয়ার ফলে একটির সহায়তায় আমরা অপরটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারি। তাছাড়া, ঐচ্ছিক মনোযোগ মনকে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হতে সহায়তা করে এবং তার ফলে মন তার অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হতে পারে। মানসিক পরিশ্রম লাঘব করার পক্ষে ঐচ্ছিক মনোযোগ একান্ত সহায়ক। তা না হলে, মন যে কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত এবং আমাদের সমস্ত মানসিক শক্তির অযথা অপচয় ঘটত। তাছাড়া, মনোযোগ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সহায়ক এবং এই প্রক্রিয়া কোন বিষয়বস্তুর সামগ্রিক জ্ঞানলাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

মনোযোগ ভবিষ্যৎ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্য দেহ ও মনকে প্রস্তুত করে তোলে এবং এর ফলে আমরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া করতে পারি, যার জন্য প্রতিক্রিয়া-কাল অযথা বিলম্বিত হয় না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের মূল্য (The importance of Attention in Education.) : শিক্ষা যেহেতু শিক্ষার্থীর আত্মসক্রিয়তার ফল স্বরূপ, সেহেতু শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের মূল্য অপরিসীম, শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রচেষ্টা ছাড়া শিক্ষা কখনই সার্থক হতে পারে না। যদিও শিক্ষার সঙ্গে নানাবিধ বিষয় যেমন—শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা সহায়ক উদ্দীপক প্রভৃতির নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ ভাবে স্বীকার করেছেন। মনোযোগী না হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ্যবস্তুকে উত্তম রূপে আয়ত্ত করা কখনও সম্ভব হয় না। মনোযোগের সহায়তায় শিক্ষার্থী তার ধারণাগুলিকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করতে পারে এবং প্রয়োজনে সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুদ্রেক করতে পারে। মনোযোগী হলেই শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন বিষয়কে সহজে, কম পরিশ্রমে শিক্ষা করা সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করার সময় পাঠ্যবস্তুতে শিক্ষার্থীর মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করার গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের উপর ন্যস্ত। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থী যদি অমনোযোগী হয় তাহলে শিক্ষাদান কার্য বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। প্রশ্ন হল, শিক্ষার্থীকে কি ভাবে মনোযোগী করে তোলা যেতে পারে, এ সম্পর্কে শিক্ষকের কর্তব্য কি ?

মনোযোগ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ-শর্ত

শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শিক্ষার্থীর মধ্যে ইচ্ছাকৃত বা ঐচ্ছিক মনোযোগের বিকাশ সাধন করা। একটা বিশেষ বয়সে শিক্ষার্থী ইচ্ছে করে কোন বস্তুতে মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে। মানসিক পরিশ্রম লাঘব করার পক্ষে ঐচ্ছিক মনোযোগ একান্ত সহায়ক। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা আদর্শ জাগ্রত করা, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলা। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে শিক্ষার্থী ইচ্ছাকৃত ভাবেই তার প্রতি মনোযোগী হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভুললে চলবে না যে মনোযোগের বিকাশের কয়েকটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তরে শিশুর মনোযোগ থাকে অনিচ্ছাকৃত। এই স্তরে স্বাভাবিক উদ্দীপকের দ্বারাই তার মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই শিক্ষকের কর্তব্য হবে, যে সব উদ্দীপক স্বাভাবিক ভাবে শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করবে তার মাধ্যমে এই সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করা। রঙীন চিত্রসম্বলিত গ্রন্থ, খেলাধুলা, শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে এমন সব শিখন সহায়ক উদ্দীপকের সাহায্যে যদি শিশুকে শিক্ষাদান করা যায় তাহলে শিখনকার্য ফলপ্রদ

শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা

প্রাথমিক স্তরে মনোযোগ সৃষ্টিতে শিক্ষকের কর্তব্য

হয়। এই স্তরে শিশুকে জোর করে মনোযোগী করে তুলতে গেলে, অনেক সময় তা অশুভ ফলদায়ক হয়। অন্য উপায় না থাকলেই কেবল মাত্র তখনই শিশুকে মনোযোগী হবার জন্য জোর করা বিধেয়।

শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলতে হলে আরও একটি বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া দরকার। একই সময়ে সমান স্পষ্টতার সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীকে একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনোযোগী হতে না বলা। বিশেষ প্রয়োজন না হলে একটির পর একটিতে মনোযোগী হতে বলাই বাঞ্ছনীয়। বিষয়বস্তু জটিল হলে তাকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়বস্তুতে মনোযোগী হওয়া সহজতর হবে।

একাধিক বিষয়ে মনোযোগ দাবী না করা যুক্তিসঙ্গত

মনোযোগ নির্ধারক শর্তগুলির কথা স্মরণে রেখে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হবেন। স্পষ্টতা মনোযোগ নির্ধারণ করে। শিক্ষকের হাতের লেখা যদি স্পষ্ট হয়, স্পষ্ট করে যদি তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় বুঝিয়ে বলতে পারেন শিক্ষার্থী অবশ্যই সেই শিক্ষকের প্রতি মনোযোগী হবে। নতুনত্ব, বৈচিত্র্য, পুনরাবৃত্তি মনোযোগ নির্ধারণ করে। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে যাতে অভিনবত্ব থাকে, শিক্ষক সেদিকে নজর রাখবেন। জটিল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলবে, তবে নীরস পুনরাবৃত্তি একঘেয়েমি সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীর মনোযোগ নষ্ট করে দেয়। শিখণ সহায়ক উপকরণের (Teaching aids) যথাযথ ব্যবহার শিক্ষাদান-কার্যের মধ্যে নতুনত্ব, বৈচিত্র্য ও গতিশীলতা সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। ইতিহাস ও ভূগোল পড়াবার সময় মানচিত্রের ব্যবহার, বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার সময় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রদর্শন সহজেই শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। পরিবর্তন যেহেতু মনোযোগ নির্ধারণ করে শিক্ষক তাঁর শিখণ পদ্ধতি দিয়ে বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন, পাঠদান কালে গলার স্বরের মধ্যে পরিবর্তন এনে, শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ অর্থাৎ শিক্ষার্থীর আগ্রহ, আবেগ, কামনা, অভ্যাস, জন্মগত প্রবণতা প্রভৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তোলা যায়। পাঠ্যবিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ বা আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে শিক্ষকের কাজ অনেক সহজ হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার দিকেও

মনোযোগ নির্ধারক শর্তগুলিকে কাজে লাগানো দরকার

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর রাখা উচিত। দেহ-মনের স্বাভাবিক সুস্থতা ব্যাহত হলে কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়।

মনোযোগ সঞ্চরণশীল; এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সরে যায়। শিক্ষার্থীর বয়সের সঙ্গে মনোযোগের চঞ্চলতা ও সঞ্চরণশীলতার নিবিড় সম্পর্ক আছে, কাজেই শিক্ষার্থীর বয়সোপযোগী পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করা একান্ত কর্তব্য। যে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মনোযোগকে ধরে রাখতে পারবে এমন বস্তুই নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন, তবে এক্ষেত্রে সব সময়ই যে শিক্ষার্থীর দাবিকে আমল দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। মনোযোগের এই চঞ্চলতাকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করাও দরকার। অভ্যাস ও আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে এই চঞ্চলতা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

মনোযোগের চঞ্চলতা দূর করা

মনোযোগ অনেক সময় অন্য বিষয়ের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। যেমন শ্রেণীকক্ষে যখন শিক্ষক শিক্ষাদানে রত, তখন শ্রেণীকক্ষের বাইরে গোলমাল হৈ চৈ শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী করে তোলে, এজন্য শিক্ষকের বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার যাতে বিক্ষেপ সৃষ্টিকারী উদ্দীপকগুলি অপসারিত হয়। যেখানে এই অপসারণ সম্ভব নয়, সেখানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষক বলে দেবেন কিভাবে এই বিক্ষেপ দূর করে মনোযোগী হওয়া যায়। অভ্যাসের দ্বারা বিক্ষেপের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অনেক সময় শ্রেণীকক্ষে বসে পথের গোলমালকে এড়াবার উপায় থাকে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রথমে জোর করে মনোযোগী হবার চেষ্টা করলে, পরে মনোযোগ দেবার প্রক্রিয়াটি অভ্যাসে পরিণত হবে। এই অভ্যাসমূলক মনোযোগ যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি করা যায়, তাহলে উদ্দীপক আকর্ষণীয় বা প্রীতিকর না হলেও শিক্ষার্থী বিনা চেষ্টায় তার প্রতি মনোযোগী হতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়। শারীরিক এবং মানসিক অবসাদ (fatigue)[1] শিক্ষার্থীকে অমনোযোগী করে তুলতে পারে। ঐ ধরনের অবসাদ দূর করার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তোলা যেতে পারে।

বিক্ষেপের কারণ অপসারিত করা প্রয়োজন

শেখার ব্যাপারে মনোযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কাজেই শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলতে না পারলে শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্য অফলপ্রসূ নিছক পরিশ্রমেই পর্যবসিত হবে।

1. এই গ্রন্থের 'কাজ ও অবসাদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩। আগ্রহ (Interest) :

আমরা ইতিপূর্বে মনোযোগের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি যে অনুরাগ বা আগ্রহ মনোযোগের মানসিক অবস্থা-সংক্রান্ত কারণগুলির অন্যতম। সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন ব্যক্তি একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রত্যক্ষ করে। সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে কেউ বা প্রথমে পড়ে খেলাধুলার কথা, কেউ বা রাজনীতির কথা, কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা। আসলে যার যে বিষয়ে আগ্রহ তাতেই সে আগ্রহ দেখায়। একজন কৃষক, একজন চিত্রকর ও একজন উদ্ভিদ-বিদ্যাবিদ্ একই সঙ্গে একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে যখন নীচের কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করে, তখন নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী তারা প্রাকৃতিক দৃশ্যটির ভিন্ন ভিন্ন দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিভাবে শিশুকে শ্রেণীকক্ষে তার পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলা যায়, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর কাছে এ অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সে কারণে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে :

আগ্রহ অনুযায়ী ব্যক্তি একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়

১৪। আগ্রহের অর্থ (Meaning of Interest) :

আগ্রহের অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। আগ্রহ বলতে আমরা বুঝতে পারি বাহ্যজগতের কোন বস্তু, যাতে ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করছে। সুতরাং এই অর্থে আগ্রহ হল আগ্রহ জাগায় এমন বস্তু (object of interest)। দ্বিতীয় অর্থে আগ্রহ হল একটা প্রক্রিয়া, এ হল মানুষের কাজের প্রকৃতি (nature of man's activity)। যেমন, আমরা বলি, সে আগ্রহের সঙ্গে কাজটা করছে। তৃতীয়তঃ, আগ্রহ বলতে বোঝায় মনের স্থায়ী প্রবণতা (enduring disposition)। যেমন, আমরা বলি, তার উপন্যাস পড়তে আগ্রহ আছে। ম্যাক্‌ডুগালের মতে আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ (latent attention)। মনোবিজ্ঞানী ড্রেভার (*Drever*)-এর মতে আগ্রহ হল গতিশীল মনোভাব (a disposition in its dynamic aspect)। মনোবিজ্ঞানী রস্ (*Ross*)-এর মতে মানুষের অনুরাগ জ্ঞান-মূলক নয়, ইচ্ছামূলক (Interest is Conative rather than Cognitive)।

আগ্রহের বিভিন্ন অর্থ

১৫। আগ্রহের উৎস ও প্রকারভেদ (Sources and Types of Interest) :

আমাদের সব আগ্রহের প্রাথমিক উৎস হল আমাদের জন্মগত প্রবণতা, তাড়না, সহজাত প্রবৃত্তি, কামনা ইত্যাদি। কৌতূহল, প্রবৃত্তি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, আত্মপ্রকাশের তাগিদ প্রভৃতি আগ্রহের প্রয়োজনীয় উৎস।

আগ্রহ দু রকমের হতে পারে—(১) স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষ (natural and direct) এবং অর্জিত বা অপর কিছু থেকে উৎপন্ন (acquired or derived)। আমাদের সহজাত প্রবণতার সঙ্গে যে বিষয়গুলি যুক্ত তার উপর স্বাভাবিক আগ্রহ নিভর করে। আমাদের অর্জিত মনোভাবের অর্থাৎ অনুভূতি, আবেগ প্রভৃতির উপর অর্জিত আগ্রহ নিভর করে। আমাদের জন্মগত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই আমাদের অনেক বিষয়ে আগ্রহশীল করে তোলে। কৌতূহলী হবার, সঞ্চয়ী হবার এবং নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্মগত আগ্রহ শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং তাদের আগ্রহ জাগ্রত করতে হলে স্বাভাবিক কাজেই তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে। শিশুদের অর্জিত আগ্রহ জাগ্রত করতে হলে প্রয়োজন কালে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। অর্জিত প্রবণতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। কারও মধ্যে দেশপ্রেমের আবেগ বর্তমান, কাজেই দেশের কল্যাণমূলক কাজে তার আগ্রহ দেখা যায়। কারও মধ্যে রয়েছে হীনমন্যতাবোধ, তাই অপরের সদগুণগুলির তুলনায় তার দুর্বলতাগুলি অনুসন্ধান করে বেড়ানতেই তার আগ্রহ। কাজেই মানুষের মনোভাব, মেজাজ, প্রবণতা এবং অর্জিত প্রবণতার দ্বারা আগ্রহ নির্ধারিত হয়। যখন আমাদের মনোভাব বন্ধুত্বভাবাপন্ন তখন আমরা কোন ব্যক্তির সদগুণগুলির দিকে নজর দিই এবং যখন শত্রুভাবাপন্ন তখন তার দুর্বল দিকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করি। যখন মন খুশীখুশী ভাবে পূর্ণ তখন সুন্দর বস্তু দেখলেই তাতে আগ্রহ প্রকাশ করি, কিন্তু যখন মন দুঃখে ভারাক্রান্ত তখন হতাশজনক ও বিষাদজনক কথাবার্তায় আগ্রহ প্রকাশ করি। আবার শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি নানারকম প্রবণতা অর্জন করে, যা তাকে সেই প্রবণতা অনুযায়ী বিষয়বস্তুতে আগ্রহী করে তোলে। যেমন, পকেটমার লোকের পকেটের প্রতি, দরজী অপরের পোশাকের প্রতি, মুচি অপরের জুতোর প্রতি আগ্রহশীল হয়। কাজেই মানুষের প্রায় আগ্রহই নির্ভর করে তার অর্জিত প্রবণতা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর।

আগ্রহ—স্বাভাবিক ও অর্জিত

১৬। আগ্রহ এবং মনোযোগ (Interest and Attention):

কোন বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ বা অনুরাগই আমাদের বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী করে তোলে। সুতরাং মনোযোগ এবং আগ্রহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। আগ্রহ ও উদাসীনতা হল পরস্পর বিরুদ্ধ। যদি আমি খড়ের কুঁড়ে বাস করি তাহলে আমার সব সময়ই আগ্রহ থাকে যাতে কাছাকাছি

কোথায়ও আগুন না লাগে এবং আগুন নিবারণ করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও আমি গ্রহণ করি। সুতরাং আগ্রহ হল এমন মনোভাব যার সঙ্গে ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্মপ্রবৃত্তি যুক্ত। যার প্রতি আমার আগ্রহ আছে আমার অনুভূতির উপর তা প্রভাব বিস্তার করে এবং মনে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির সঞ্চার করে। আগ্রহ মানুষকে সক্রিয় করে তোলে। যার প্রতি আমাদের আগ্রহ আছে তার প্রতি আমরা মনোযোগী হই ও তার জন্য পরিশ্রম করি এবং যার প্রতি আমাদের আগ্রহ নেই তাকে আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। এই আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী হতে পারে বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর জন্য গাড়ির প্রতি যে আগ্রহ তাহল ক্ষণস্থায়ী। আবার যে কৃপণ নির্বিচারে অর্থ সঞ্চয় করে চলেছে তার অর্থের প্রতি আগ্রহ হল দীর্ঘস্থায়ী। আগ্রহ অর্জিত হতে পারে বা জন্মগত হতে পারে। খাদ্যের প্রতি দার্শনিকের আগ্রহ হল জন্মগত বা সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আগ্রহ আর দর্শন আলোচনার প্রতি দার্শনিকের আগ্রহ হল অর্জিত আগ্রহ।

আগ্রহই মনোযোগ নির্ধারণ করে

আগ্রহের সঙ্গে ইচ্ছা, অনুভূতি ও কর্মপ্রবৃত্তি যুক্ত

আগ্রহ অর্জিত এবং জন্মগত

জৈবিক প্রবৃত্তি, মানসিক প্রবণতা, শিক্ষা, অভ্যাস, কৌতূহল, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে। বস্তু নিজ গুণেই চিত্তাকর্ষক বা আকর্ষণীয় হয়ে আগ্রহের সৃষ্টি করে না। কোন উপাদেয় খাদ্যের প্রতি আমারও আগ্রহ আছে, আমার বন্ধুরও আগ্রহ আছে। আমার আগ্রহ যেহেতু আমি ক্ষুধার্ত, আমার বন্ধুর আগ্রহ যেহেতু সে পেটুক। কোন বিষয়ের আলোচনা চলছে, কিন্তু আমি যখনই তাতে মনোযোগী হই যখন সে আলোচনায় আমার নাম উচ্চারিত হচ্ছে শুনতে পাই। আমার এই আগ্রহ উদ্ভূত হয় সহজাত আত্মপ্রীতি থেকে। যার ধূমপানের অভ্যাস, সে ধূমপান সম্পর্কীয় আলোচনাতেই আগ্রহ দেখায়। এই আগ্রহ তার অর্জিত। সুতরাং দেখতে পাই আগ্রহ এবং মনোযোগের মৌলিক শর্ত হল আমাদের সহজাত বা অর্জিত মনোভাব এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট উত্তেজনা। তবে ম্যাকডুগাল (*Mc Dougall*) মনে করেন যে এগুলিই একমাত্র যে মনোযোগ নির্ধারণ করে এ সিদ্ধান্ত সত্য নয়। আবার কারও কারও মতে সুখ-দুঃখও আগ্রহ সৃষ্টি করে যার জন্য আমরা কোন বিষয়ে মনোযোগী হই। অবশ্য সুখ দুঃখও আগ্রহের শর্ত, যদিও একমাত্র শর্ত নয়। আবার উদ্দেশ্যও আমাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, মুচি তাকায় লোকের পায়ের দিকে, নাপিত তাকায় মাথার দিকে। এক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ এবং মনোযোগ উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত।

আগ্রহ ও মনোযোগের মৌলিক গতি

মনোযোগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত হল আগ্রহ। মনোবিদ ড্রেভারের মতে আগ্রহ হল গতিশীল মনোভাব (a disposition in its dynamic aspect), কারণ যে বিষয়বস্তু আমাদের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে তাতেই আমরা মনোযোগী হই। আগ্রহই মনোযোগকে নির্বাচনধর্মী (selective) করে তোলে।

আগ্রহই মনোযোগকে নির্বাচনধর্মী করে তোলে

আগ্রহ যত অধিক হয় বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ ততই প্রবল হয় এবং বিষয়বস্তুর উপর তা স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়। সুতরাং আগ্রহ হল দীর্ঘস্থায়ী মনোভাব (enduring disposition) যা মনোযোগ নির্ধারণ করে।

আগ্রহ হল স্থায়ী মনোভাব

কোন কোন মনোবিদ্ মনে করেন যে, আগ্রহ এবং মনোযোগ অভিন্ন বিষয়। আগ্রহ হল মনোযোগী হবার উদ্দীপনা (impulse to attend)। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল পূর্বোক্ত মতের সমর্থন করে বলেন যে, 'আগ্রহ হল সুপ্ত বা অব্যক্ত মনোযোগ আর মনোযোগ হল সক্রিয় আগ্রহ'।[1] কিন্তু ম্যাকডুগালের এই অভিমত যথার্থ নয়। যদিও আগ্রহ সকল সময়ই আমাদের মনোযোগী করে তোলে তবু এমন অনেক বিষয় আছে যার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরাগ বা আগ্রহ নেই, অথচ বিষয়টি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, ঘরে বসে বই পড়ছি সে সময় হঠাৎ দরজাটি যদি বিকট শব্দ করে বন্ধ হয়ে যায়, আমরা তার প্রতি মনোযোগী হই, যদিও ঐ শব্দের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। আবার মনোযোগী হলেই যে তার প্রতি আগ্রহ আছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। যে কেরানী হিসাবের খাতার প্রতি খুব মনোযোগী তার যে সেই বিষয়ের প্রতি খুব আগ্রহ আছে তা বলা চলে না। আবার অধিক মনোযোগ আগ্রহ নির্দেশ করে না। **আগ্রহ মনোযোগ নির্ধারণ করতে পারে কিন্তু মনোযোগ সকল সময় আগ্রহ নির্ধারণ করে না**। আগ্রহ মনোযোগের একাধিক শর্তের মধ্যে একটি শর্ত। আগ্রহই মনোযোগের একমাত্র শর্ত নয়।

আগ্রহ এবং মনোযোগ অভিন্ন নয়

১৭। শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের মূল্য (The importance of interest in Education):

শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের বিশেষ মূল্য আছে। বস্তুতঃ, পঠনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগী না হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা আয়ত্ত করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

1. "Interest is latent attention and attention is interest in action."
—McDougall : Outlines of Psychology, Page 277

আবার আগ্রহ না থাকলে শিক্ষার্থী কখনই পঠনীয় বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে না। কাজেই শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের নিবিড় সম্পর্ক।

শিক্ষাবিদ্ মাত্রই শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের মূল্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে আগ্রহতেই শিক্ষার শুরু এবং শেষ। আগ্রহের মনস্তাত্ত্বিকতাই (Psychology of interest) হল শিক্ষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এবং ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার কাজ হল শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আলোচনা করা। যদিও কোন কোন শিক্ষাবিদ্ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে আগ্রহের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সমালোচনা করেছেন এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে 'কোমল শিক্ষাব্যবস্থা' (soft pedagogy) বলে বিদ্রূপ করেছেন, তবুও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ কিভাবে সঞ্চার করা যায় এবং বিষয়কে কিভাবে তার পাঠযোগ্য করা যেতে পারে, তাই হল শিক্ষার মূল কথা।

আগ্রহতেই শিক্ষার শুরু এবং শেষ

আগ্রহ কাজে সক্রিয়তা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। কোন কাজ করার জন্য যখন আমরা আগ্রহশীল হয়ে উঠি, তখন সে কাজ না করে আমরা থাকতে পারি না। আগ্রহই আমাদের উদ্যোগী করে তোলে। বিষয়বস্তুর দুরূহতা সত্ত্বেও যে শিক্ষার্থী তা শিখতে চায়, তার কারণ শিক্ষার্থীর পঠনীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে আগ্রহ শিক্ষার লক্ষ্য এবং উপায়, উভয়ই। শিশুর কাছে আগ্রহ হল উপায় এবং শিক্ষকের কাছে আগ্রহ হল লক্ষ্য। আগ্রহের সহায়তায় শিশুরা জ্ঞান অর্জন করে এবং তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, আর শিক্ষকের লক্ষ্য হল শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর মধ্যে তীব্র অথচ প্রীতিকর স্থায়ী আগ্রহের সঞ্চার করা, যাতে শিশু নিজে নিজেই জ্ঞান অর্জন করার ও উদ্দেশ্যসিদ্ধ করার জন্য উদ্দীপিত হয়। শিশুর এবং শিক্ষকের আগ্রহের পার্থক্য হল এখানেই।

আগ্রহ শিক্ষার লক্ষ্য এবং উপায়

শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যই হল শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলা। জার্মান শিক্ষাবিদ্ হারবার্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের বিশেষ ভূমিকা আছে বলে মনে করেন। শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য হল শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার করা। আধুনিক শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই-র মতে আগ্রহই শিক্ষাব্যবস্থার পথ নির্দেশ করবে। কেননা, ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাই হল আগ্রহ।

হারবার্ট ও ডিউইর অভিমত

পূর্বোক্ত অভিমতের সমালোচনা করে একদল শিক্ষাবিদ্ বলেন যে, শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষণীয় বিষয়কে আকর্ষণীয় করার জন্য তাকে সহজ ও সরল করার কোন যৌক্তিকতা নেই। পঠনীয় বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করার জন্য তাকে যদি অতিরিক্ত সোজা ও সরল করা হয়, কঠিন বা শ্রমসাধ্য বিষয় যদি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে সে হবে এক 'কোমল শিক্ষাব্যবস্থা' (soft pedagogy), যা শিক্ষার্থীর চরিত্রের দৃঢ়তাকে ক্ষুণ্ণ করবে, শিক্ষার্থীর উদ্যম, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকে নষ্ট করে দেবে। তাছাড়া, এর ফলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবেই। তাঁদের মতে বিদ্যালয়জীবনের শিক্ষা হল প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর উত্তর জীবনের প্রস্তুতি স্বরূপ এবং যেহেতু শিক্ষার্থীর উত্তর-জীবন নানারকম বাধাবিঘ্ন, ঘাতপ্রতিঘাত-পূর্ণ, সেহেতু কঠোর জীবন সংগ্রামের জন্য তাকে প্রস্তুত করতে হলে শিক্ষাকে অযথা চিত্তাকর্ষক করে তোলা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হবে না। কঠোর শাসন, নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে শিশুকে বিদ্যালয়জীবনে শিক্ষা দিতে হবে এবং বিদ্যালয়জীবনেই ভবিষ্যতের বিপদসঙ্কুল জীবনের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, যাতে উত্তর-জীবনে শিক্ষার্থী সাহসের সঙ্গে এই সব বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে পারে।

সমালোচনা

কোমল শিক্ষাব্যবস্থা

যাঁরা শিক্ষাব্যবস্থাকে আগ্রহভিত্তিক করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী, তাঁরা পূর্বোক্ত অভিমত সমর্থন করেন না। পূর্বোক্ত সমালোচনার উত্তরে তাঁরা বলেন যে, শিক্ষা কেবলমাত্র জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন। কাজ করার মধ্যে, সংগঠনের মধ্যে, আবিষ্কারের মধ্যে শিশুরা যে আনন্দ পায়, বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় যেন সে আনন্দ থেকে শিশু বঞ্চিত না হয়। এই অভিমতের সমর্থকদের মতে, আত্মপ্রকাশ ও আত্মসক্রিয়তার মূলে যে আনন্দ তা আগ্রহভিত্তিক এবং শিক্ষা ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে তার মূল্য অপরিসীম। শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলার অর্থ শিক্ষার মান অবনত করা, দুরূহ বিষয় পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া বা শিক্ষার্থীর চরিত্রের দৃঢ়তা নষ্ট করা নয়। যে আগ্রহ শিক্ষার্থীর মনে রয়েছে তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার কিভাবে করা যায় তার উপায় নির্ধারণ করা। শিক্ষার্থীকে যদি ভয় দেখিয়ে কোন কিছু শিখতে বাধ্য করা হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর শেখার স্বতঃস্ফূর্ততা ও উদ্যমশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে বিষয়বস্তু যত দুরূহই হোক না কেন শিক্ষার্থী সহজেই তা শিক্ষা করতে পারে—অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে যদি শিশুর মানসিক সামর্থ্যের সামঞ্জস্য থাকে। সুতরাং একদিকে যেমন

দ্বিতীয় অভিমতের সমালোচনা

একদল শিক্ষাবিদ্ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'কোমল শিক্ষাব্যবস্থা' নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক থেকেই শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুপযোগী, তেমনি যাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের বিশেষ ভূমিকার কথা স্বীকার করেন তাঁরা বলেন যে, শিক্ষার্থীর কাছে পঠনীয় বিষয়কে বিরক্তিকর ও ক্লান্তিজনক করে তোলাটাও মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক উভয় দিক থেকেই অযৌক্তিক। মনোবিজ্ঞানী হার্টম্যান (*Hartman*)-এর মতে আগ্রহের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ শিক্ষার্থীর আগ্রহই তার পাঠ্যবস্তু নির্বাচন করে এবং আগ্রহের দ্বারাই শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

পূর্বোক্ত দুটি অভিমতই চরমপন্থী এবং উভয় অভিমতেরই ভিত্তি একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় মতবাদই মনে করে যে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা পরস্পরবিরোধী। বস্তুতঃ, আগ্রহ পঠনীয় বিষয়ের কোন অন্তর্নিহিত গুণ নয়, আগ্রহ থাকে শিক্ষার্থীর মধ্যে। কাজেই শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা নয়, বরং পঠনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার কিভাবে করা যায় তাই হল প্রশ্ন। পঠনীয় বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্য তাকে সহজ ও সরল করা নয়, বরং শিশুর আগ্রহকে জাগরিত করা, উদ্দীপিত করা ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর মনোযোগকে আকৃষ্ট করা। আসলে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা, একটি অপরটির পরিপূরক। আগ্রহের কাজই হল শিক্ষার্থীর উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করা। চিত্তবিনোদন, আমোদ বা কৌতুক সৃষ্টি করা আগ্রহের লক্ষ্য নয়, আগ্রহের উদ্দেশ্য সক্রিয়তা, প্রচেষ্টা ও কর্মসম্পাদন। প্রচেষ্টাও আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। প্রচেষ্টা সহকারে কোন কাজ শুরু করলে, তা শেষ পর্যন্ত আগ্রহ সঞ্চার করেই। শিশুর প্রচেষ্টা যখন সফল হয়, তখন শিশুর মনে আনন্দ জাগে, তখন শিশু প্রেরণা লাভ করে নতুন উৎসাহে কাজ শুরু করে দেয়, ফলে শিশুর মধ্যে আগ্রহ জাগে। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, আগ্রহ ও প্রচেষ্টা উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই, বরং লক্ষ্য সিদ্ধ করার পক্ষে একটি অপরটিকে সহায়তা করে। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক: কোন শিশু বর্ণমালা শেখার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে এবং গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ শিক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করে ও শিক্ষকের প্রশংসা লাভ করে। ফলে,

উভয় মতের সমন্বয়

আগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারই আগ্রহভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য

আগ্রহ ও প্রচেষ্টা পরস্পরের পরিপূরক

কাজে তার আগ্রহ জাগে এবং এই আগ্রহই তাকে আরও শেখার জন্য পরিশ্রমী হতে ও প্রচেষ্টাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করার জন্য উদ্যোগী করে তোলে।

সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার যেমন মূল্য আছে আগ্রহেরও সমধিক মূল্য আছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে পুরস্কার, শাস্তি প্রশংসা, নিন্দা প্রভৃতি বাহ্য প্ররোচকের (incentive) সহায়তায় শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহের সঞ্চার করার চেষ্টা না করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ সেক্ষেত্রে আগ্রহ স্থায়ী হয় না, ক্ষণস্থায়ী হয়। যেমন—পুরস্কার পেয়ে যাবার পর অনেক শিক্ষার্থীকেই আর আগের মতন উদ্যমশীল হতে দেখা যায় না। সে কারণে শিক্ষণীয় বিষয়ে যাতে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহের সৃষ্টি হয় সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য প্রয়োজন শিশুর স্বাভাবিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর চাহিদা, প্রয়োজন, কামনা, বাসনা, মানসিক সামর্থ্য প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা যেমন একাধারে যুগোপযোগী, তেমনি অপর দিকে শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু সংগঠনের পরিপন্থী।

বাহ্য-প্ররোচকের সাহায্যে আগ্রহ সৃষ্টি করলে সে আগ্রহ স্থায়ী হয় না

১৮। পাঠ্যবিষয়ে শিশুর আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? (How to make a lesson interesting ?):

আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, ইতিপূর্বে আমরা তা দেখেছি। পাঠ্যবিষয়ের প্রতি শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে শিশুদের কাছে পাঠ্যবিষয়কে অবশ্যই আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, যাতে পাঠ্যবিষয়ে তাদের আগ্রহ জন্মায়। প্রশ্ন হল, পাঠ্যবিষয়ে শিশুর আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি করা যায়?

প্রথমতঃ, শিক্ষককে স্মরণ রাখতে হবে যে শিক্ষার কেন্দ্র হল শিশু, পাঠ্য-বিষয় নয়। কাজেই পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে শিশুর বা শিক্ষার্থীর বয়স, শিশুর মানসিক বিকাশ, শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ ও সামর্থ্যের যেন সামঞ্জস্য থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আগ্রহ পরিবর্তিত হতে থাকে। কাজেই শিক্ষককে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে—যতদিন পর্যন্ত না শিশু নিজে আগ্রহ অর্জন করে নেয়।

শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে পাঠ্য-বিষয়ের সামঞ্জস্য

পাঠ্যবিষয়ে শিশুর আগ্রহ স্থায়ী করার জন্য শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষণীয় বিষয় খুব সহজ বা খুব দুরূহ না হয়। শিক্ষার মান যেন শিশুর বোধশক্তির

সীমার মধ্যে থাকে। পাঠ্যবিষয় যদি খুব সহজ হয় তাহলে শিশু তা অপ্রয়োজনীয় মনে করে শেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে না। আর যদি খুব কঠিন হয় এবং তা যদি আয়ত্ত করা তার ক্ষমতার পরিসীমার বাইরে মনে করে, তাহলে শিশু তা শিক্ষা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে না। শৈশবে কিণ্ডারগার্টেন এবং মন্টেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে এবং তাতে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে। বয়স্ক শিশুদের কল্পনাশক্তি, স্মৃতি, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে উদ্দীপিত করে পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। কারণ শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনাশক্তি এবং স্মরণক্রিয়ার বিকাশ সাধিত হয় এবং আরও পরে তার চিন্তনশক্তি ও বিচারবুদ্ধি বাড়তে থাকে।

শিক্ষণীয় বিষয়—সহজ ও সরল হওয়া প্রয়োজন

পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য প্রেষণার ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা শিক্ষকের মনে রাখতে হবে। কোন শিক্ষার্থীই তার পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবে না যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে তার মধ্যে সচেতনতা না থাকে। সে কারণে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য শিক্ষার্থীর কাছে সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে হবে এবং তা লাভ করার জন্য উপযুক্ত প্রেষণার সৃষ্টি করতে হবে। সহজাত প্রবৃত্তি, কামনা ও অর্জিত প্রবণতার উপর ভিত্তি করে যে আগ্রহ জাগান হবে তাকে কেন্দ্র করেই পাঠ শুরু হওয়া উচিত। এই প্রাথমিক আগ্রহই তাদের আরও শিক্ষা করার প্রেষণা জোগাবে।

প্রেষণা

পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে ধরে রাখা সম্ভব হবে যদি নতুন বিষয় শেখবার সময় শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ রেখে তাকে নতুন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। যা শিখেছে এবং যা শিখতে চলেছে, উভয়ের মধ্যে যে সংযোগ সেটি যখন শিশু প্রত্যক্ষ করতে পারে, তখন সঠিকভাবে শেখার জন্য সে মনোযোগী হয়ে ওঠে।

নতুন বিষয়ের সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার সংযোগ রক্ষা করা

শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে না হয়। বিনা প্রয়োজনে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা শিক্ষকের উচিত হবে না। শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য পাঠ্যবিষয় যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বৈচিত্র্যহীন মনে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং পাঠ্যবিষয়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। বৈচিত্র্যহীনতা আগ্রহ ও শেখার উৎসাহ নষ্ট করে দেয়।

বৈচিত্র্যহীনতা দূরীকরণ

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিষয়বস্তুর আলোচনা করে, শিক্ষণীয় বিষয়কে নতুনভাবে সাজিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করে, চিত্তাকর্ষকভাবে বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা করে এবং শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করে শিক্ষক বৈচিত্র্যহীনতা দূর করতে পারেন।

শিশুর আগ্রহ সঞ্চার করার ব্যাপারে শিক্ষকের মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের ব্যক্তিগত আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাসি হাসি মুখ, মেজাজ ইত্যাদি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার ব্যাপারে খুবই উল্লেখযোগ্য। যে শিক্ষক উৎসাহ, আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা দেন তিনি ছাত্রদের অবশ্যই মনোযোগী করে তুলতে পারেন। শিক্ষকের কৌতুকবোধ, কাজের প্রতি অনুরাগ ও সক্রিয়তাও শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করে তোলে। বিষন্ন, বদমেজাজী, উৎকণ্ঠিতভাবাপন্ন, নিস্তেজ, অনুৎসাহী শিক্ষক কখনও পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে না। এই কারণে উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন যথার্থ শিক্ষাদানের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষকের মনোভাব

ছোট ছোট শিশুদের আগ্রহ হল সহজাত। তাদের মনোযোগ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘোরাফেরা করে। কাজেই ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় তাদের সহজাত আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কৌতূহল, সংগঠন বা আত্ম অধিকার প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্দীপিত করেই আগ্রহ সঞ্চার করতে হবে।

শিশুদের সহজাত আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন

পাঠ্যবিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষা দেবার সময় কার্যকরী বা ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষা দিতে হবে। বিজ্ঞানের পরীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যগুলি যদি পরীক্ষণাগারে গিয়ে ছাত্রদের দেখান না হয়, তাহলে ছাত্ররা বিজ্ঞান শিক্ষায় কখনও আগ্রহশীল হয়ে উঠবে না। এ ছাড়া দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিকে সহায়তা করে এমন সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার করলেও ছাত্রদের পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগ বাড়ে। চিত্র, চলচ্চিত্র, টেলিভিশান, ম্যাপ, মডেল প্রভৃতিও পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহ সঞ্চার করার ব্যাপারে খুবই উপযোগী। খুব ছোট শিশুকে যদি খেলনার মাধ্যমে কোন কিছু শেখান যায় তাহলে সে সহজে শেখে, কারণ খেলাধুলার মাধ্যমে শিখতে তার আগ্রহ জাগে।

পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ

সপ্তম অধ্যায়

কাজ ও অবসাদ

(Work and Fatigue)

১। মানসিক কাজ ও অবসাদ (Mental work and Fatigue) :

কাজ বলতে সাধারণতঃ আমরা দু ধরনের কাজ বুঝে থাকি। শারীরিক (Physical) ও মানসিক (Mental)। যে কাজে শারীরিক শ্রম ব্যয় হয় সেই কাজকে শারীরিক কাজ বলে ; যেমন, কোন ভারী বস্তু উত্তোলন করা। যে কাজে মানসিক শ্রম ব্যয় হয় তাকে মানসিক কাজ বলা হয়, যেমন, অঙ্ক কষা। মানসিক কাজ দু ধরনের হতে পারে—অনৈচ্ছিক এবং স্বেচ্ছাকৃত। যখন ইচ্ছা প্রয়োগ করে আমায় কোন বিষয় চিন্তা করতে হচ্ছে না, তখনও মনের কাজ চলছে, এলোমেলোভাবে মনে চিন্তা যাওয়া আসা করছে। তবে এ হল অনৈচ্ছিক মানসিক কাজের উদাহরণ। আর যখন ইচ্ছা প্রয়োগ করে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বিষয় আমরা চিন্তা করি তখন তাহল স্বেচ্ছাকৃত মানসিক কাজ। ঐচ্ছিক মনোযোগ (voluntary attention) ছাড়া স্বেচ্ছাকৃত মানসিক কাজে সফলতা আসে না। মনে মনে একটা হিসেব করছি। অমনোযোগী হলে হিসেব মিলবে না। এই ঐচ্ছিক মনোযোগ আবার কাজের প্রতি আগ্রহের উপর নির্ভর করে। স্বেচ্ছাকৃত মানসিক কাজ একটানা করে চললেই মানসিক অবসাদ দেখা দেয়। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার কাজই সাধারণভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে, আবার নিপুণতা বা দক্ষতার সঙ্গেও সম্পন্ন করা যেতে পারে। যথাযথ শিক্ষা, অভ্যাস, অনুশীলন ও সঠিক কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য যখন কোন কাজ স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে, স্বচ্ছন্দভাবে ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করা যায়, তখনই কাজে দক্ষতা প্রকাশ পায়। যে কোন কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হলে তা নিপুণভাবে শিক্ষা করারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করলেও সে কাজ সম্পাদন করার সময় দক্ষতার মান বরাবর বজায় রাখা সম্ভব হয় না। নিপুণভাবে কাজ শিক্ষা করলেই যে সব সময় বা বরাবর দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করা যাবে তা সম্ভব নয়, অন্যান্য কতকগুলি বিষয়ের প্রভাব কর্মীর উপর এমনভাবে পড়তে পারে যার জন্য কর্মীর দক্ষতা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে।

দক্ষতার মান বরাবর বজায় রাখা সম্ভব নয়

কাজের দক্ষতা কিভাবে বাড়ে বা কমে তার যদি একটা হিসেব নেওয়া যায় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, তার কয়েকটি স্তর আছে। কাজের শুরুতে ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়, তারপর একটা স্থিতিশীল অবস্থা আসে, তারপর কাজের নিম্নগতি দেখা দেয়। শুরুতে কর্মীর মনে থাকে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, কাজেই কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পেতে একটা সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌঁছয়। তারপর দক্ষতা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছয় যে, যখন ঊর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি আর কিছুই ঘটে না—অর্থাৎ দক্ষতা একটা স্থিতিশীল অবস্থায় এসে উপনীত হয়, একে বলা যেতে পারে কাজের উন্নতির পথে অধিত্যকা বা সাময়িক অচলাবস্থা। কাজের রেখাচিত্র অঙ্কন করলে এরূপ স্থানের রেখাচিত্র অনেকটা উপত্যকার মতো মনে হয়। এই অপরিবর্তিত অবস্থা বেশ কিছু সময় চলার পর কাজের নিম্নগতি লক্ষ্য করা যায়। কর্মীর দক্ষতা ধীরে ধীরে আরও কমতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে একটা ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী, তারপর আবার দক্ষতা হ্রাস পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কর্মীর কর্মদক্ষতায় বিরতি এসে যায়।

কাজের গতির কয়েকটি স্তর আছে

অধিত্যকাকাল

কাজের দক্ষতার এই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নানা কারণে। তার মধ্যে দুটি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। একটি প্রেষণা (Motivation) এবং অপরটি অবসাদ বা ক্লান্তি (Fatigue)। শক্তিশালী প্রেষণার অনুপস্থিতির জন্য কর্মীর দক্ষতার হ্রাস ঘটে। এই প্রেষণা ব্যক্তিভেদে এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। একটি শিশুর কাজের দক্ষতার মান অব্যাহত রাখতে হলে অবশ্যই খুব শক্তিশালী প্রেষণার প্রয়োজন। কিন্তু একজন বয়ঃপ্রাপ্তের ক্ষেত্রে হয়ত তার প্রয়োজন সব সময় নাও দেখা দিতে পারে। ক্লান্তি হল সর্বজনীন। কাজে ক্লান্তি বা অবসাদ সকলকেই কম-বেশী অনুভব করতে হয়। দৈহিক পরিশ্রমের একটা সীমা আছে, যদিও তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। সেই সীমা অতিক্রম করলে দৈহিক ক্লান্তি দেখা দেবেই। মানসিক অবসাদও তার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। মানসিক অবসাদ কারও ক্ষেত্রে সহজে আবার কারও ক্ষেত্রে বিলম্বে দেখা দেয়, তবু এ সর্বজনীন। অবসাদ বা ক্লান্তি কতকগুলি কারণে দেখা দেয় এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট সূত্রের দ্বারা অবসাদের কাল, পরিমাণ প্রভৃতি নির্ধারিত হয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলেও ক্লান্তি বা অবসাদের জন্যই কর্মীর দক্ষতার মান অপরিবর্তিত থাকে না। উপযুক্ত উপায় অবলম্বনের

কর্মদক্ষতার হ্রাসবৃদ্ধির দুটি প্রধান কারণ—প্রেষণা ও অবসাদ

দ্বারা এই ক্লান্তি দূরীভূত করে কর্মীকে তার পূর্ব দক্ষতার মান আবার ফিরিয়ে আনতে হয়।

২। অবসাদ বা ক্লান্তি (Fatigue) :

কার্যকর শিখন সম্পর্কে, ইতিপূর্বে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি যে ক্লান্তি বা অবসাদ কার্যকর শিখনের পথে এক বিরাট অন্তরায়স্বরূপ। ক্লান্তি বা অবসাদের জন্য শিখনের ক্ষেত্রে দক্ষতা হ্রাস পায়।

অবসাদ বা ক্লান্তির স্বরূপ

অবসাদ বা ক্লান্তির স্বরূপ কি? দৈহিক বা মানসিক, যে কোন কাজ অবিরতভাবে সম্পাদন করতে করতে যখন একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় তখন দেখা যায় কাজে দক্ষতা বা কুশলতা হ্রাস পাচ্ছে, কাজে আর আগ্রহ জাগছে না, শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে এবং কাজ করার ইচ্ছাও আর জাগছে না। একেই বলা হয় ক্লান্তি বা অবসাদ। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর পা আর চলতে চায় না। দীর্ঘ সময় ধরে কোন বই পড়তে থাকলে চোখ টনটন করে—এমন একটা অবস্থা আসে যখন আর পড়তে ইচ্ছা করে না। কোন হাতের কাজ একটানা কয়েক ঘণ্টা করার পর, কাজ আর এগোয় না, কাজে ভুল হয়। তখনই মনে করতে হবে কাজে ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দিয়েছে। স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*) অবসাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'কর্মে দক্ষতার হ্রাসই অবসাদ' (decreasing competency to do work)।

হার্ভে পিটারসন (*H. A. Peterson*)-এর মতে অসুস্থতার জন্য নয়, একটানা কাজ করার জন্য কর্মক্ষমতার হ্রাসই হল অবসাদ।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণের মতে কর্মক্ষমতার হ্রাসই অবসাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁদের মতে অবসাদ বিশেষ কোন লক্ষণ বা বিশেষ কোন গুণ নয়, কোন বস্তু বা অবস্থাও নয়। একটানা কাজ করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে যে দৈহিক, শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় তা' একত্রে বোঝাবার জন্য এ হল একটা সুবিধাজনক নাম।[1]

কার্যকরী শিক্ষণের জন্য প্রেষণা, মনোযোগ, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, দৈহিক সুস্থতা, মনোরম পরিবেশ প্রভৃতির প্রয়োজন। কিন্তু এই সবগুলির উপস্থিতি সত্ত্বেও কেবলমাত্র অবসাদ বা ক্লান্তির জন্য সার্থক শিক্ষণ ব্যাহত হয়। ক্লান্তি বা অবসাদ

1. **"Fatigue is not an entity, it is a convenient name to include different mental and physical phenomena associated with continuous work."—Moore.**

কাজে আগ্রহ ও মনোযোগ নষ্ট করে দেয়, দৈহিক সামর্থ্য নষ্ট করে এবং কাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।

৩। ক্লান্তি বা অবসাদের শ্রেণীবিভাগ :

ক্লান্তি বা অবসাদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (১) পেশী সংক্রান্ত (Muscular), (২) ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত (Sensory) এবং (৩) মানসিক (Mental)। পেশী সংক্রান্ত এবং ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত অবসাদকে একত্রে দৈহিক অবসাদ (Physiological Fatigue) নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং অবসাদের মোটামুটি দুটি শ্রেণী বিভাগ হল, দৈহিক (Physiological) এবং মানসিক (Mental)।

যান্ত্রিক ধরনের কাজ একটানা করতে থাকলে পেশীগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, পেশীগুলি অবসন্ন হয়ে পড়ে। তার ফলে দৈহিক ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। দীর্ঘ সময় ধরে লাফালাফি করা, দৌড়-ঝাঁপ দেওয়া, মাটি কোপান প্রভৃতি কাজের ফলে পেশীর অবসাদ দেখা দেয়, তার ফলে দৈহিক ক্লান্তি ও অবসাদ জাগে। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক পরিশ্রমের একটা সীমা আছে। এই পরিশ্রমের সীমা ছাড়িয়ে গেলে দৈহিক অবসাদ দেখা দেয়। আবার কোন মানসিক কাজ একটানা করতে থাকলে স্নায়ুকেন্দ্র অবসন্ন হয়ে পড়ে, তার ফলেও মানসিক অবসাদ দেখা দেয়। যেমন, একটানা কয়েক ঘণ্টা ধরে কোন বই পড়তে থাকলে, অঙ্ক কষতে থাকলে, কোন সূক্ষ্ম জটিল সমস্যা নিয়ে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করতে থাকলে দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে ক্লান্তি বা অবসাদ জাগছে, আর কাজ করা যাচ্ছে না বা চিন্তা করা যাচ্ছে না। চিন্তা জট পাকিয়ে যাচ্ছে, বা কাজে ভুল হচ্ছে ; জোর করে কাজ করার চেষ্টা করলেও লাভ হয় না, কেননা, কাজে গতি আসে না। কাজ করতে বিরক্তির সঞ্চার হয়, শেষ পর্যন্ত কাজে আর আগ্রহ জাগে না। এই হল মানসিক অবসাদ বা ক্লান্তির উদাহরণ।

পেশী অবসন্ন হলে দৈহিক ক্লান্তি ও স্নায়ুকেন্দ্র অবসন্ন হলে মানসিক ক্লান্তি দেখা দেয়

দৈহিক অবসাদ আর মানসিক অবসাদের মধ্যে কোন ধরাবাধা শ্রেণীবিভাগ করা চলে না। যেহেতু একটির সঙ্গে আর একটির নিবিড় সম্পর্ক। তাছাড়া, দৈহিক অবসাদ মানসিক অবসাদ সৃষ্টি করে। আবার মানসিক অবসাদ দৈহিক অবসাদ সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উভয় প্রকার অবসাদের একত্র সংমিশ্রণই লক্ষ্য করা যায়। একটানা কয়েক ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম করার পর যেমন দৈহিক অবসাদ দেখা দেয় তেমনি মানসিক অবসাদও দেখা দেয়। ঐ অবস্থায় কোন কঠিন সমস্যার

দৈহিক ও মানসিক অবসাদ একত্র মিশিয়ে থাকে

সমাধানে মনকে নিবিষ্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে, মানসিক অবসন্নতা চলাকালীন দৈহিক কাজে অনিচ্ছা জাগে। সাধারণতঃ দৈহিক অবসাদ পেশীর ক্লান্তির জন্য এবং মানসিক অবসাদ স্নায়ুর ক্লান্তির জন্য ঘটে থাকে—এরূপই ধারণা করা হয়। দেহতত্ত্বের দিক থেকে উভয় প্রকার ক্লান্তির উৎস এভাবে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে উভয় প্রকার অবসাদকে পৃথকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। দৈহিক অবসাদে মানসিক অবসাদ জাগে, আবার মানসিক অবসাদেও দৈহিক অবসাদ জাগে। তবে সাধারণতঃ দেখা যায়, দৈহিক অবসাদ যত তাড়াতাড়ি মানসিক অবসাদ সৃষ্টি করে, মানসিক অবসাদ তত দ্রুত দৈহিক অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে না।

ক্লান্তি বা অবসাদ সাধারণ (general) হতে পারে বা আংশিক (partial) হতে পারে। যখন সমগ্র দেহেই ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভূত হয় তখন এ হল সাধারণ অবসাদের উদাহরণ। কোন বিশেষ পেশী বা ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা হল আংশিক অবসাদ। একটানা লেখার জন্য যখন কেবলমাত্র ডান হাতেই অবসন্নতা দেখা দেয়, তখন তা হল আংশিক অবসাদের উদাহরণ।

অবসাদ সাধারণ বা আংশিক হতে পারে

৪। দৈহিক ও মানসিক অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্র ও উপায় (Different ways of the measurement of physical and mental fatigue) :

দৈহিক ও মানসিক অবসাদ নিরূপণ এবং পরিমাপ করার জন্য নানা ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নাড়ীর স্পন্দনের হার, দেহের উত্তাপের তারতম্য, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের পার্থক্য, অঙ্গ সঞ্চালনের সামর্থ্যের তারতম্য, পেশী সংক্রান্ত কর্মকুশলতার হ্রাসবৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে দৈহিক অবসাদ পরিমাপ করা হয়। অবিরতভাবে দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা বা কাজ করার ক্ষমতা, প্রশ্নোত্তরের দ্রুততা, লেখা বা বলার ভুলের হার, নির্ভুল গণনাশক্তি, মনোযোগ, আগ্রহের তীব্রতা, পাদপূরণ, স্মরণশক্তি, একটানা অনুশীলন, কোন বিষয়ে একটানা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ক্ষমতা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সহায়তায় মানসিক অবসাদ পরিমাপের চেষ্টা করা হয়। মানসিক অবসাদ সম্পর্কে পরিমাপ করার জন্য নানাবিধ পরীক্ষণকার্য চালান হয়েছে। তারই দু'-একটি নিচে আলোচিত হচ্ছে :

দৈহিক অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি

মানসিক অবসাদ পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি

পাদপূরণ করা সম্পর্কে যে পরীক্ষণকার্য (Completion test) চালান হয় তাতে পরীক্ষণ- পাত্রকে (Subject) একটি গল্প পড়তে দেওয়া হয়। এই গল্পটির কতকগুলি

অংশ অপূরণ রাখা হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে বলা হয় সেই অংশগুলি পূরণ করার জন্য। পরীক্ষণ-পাত্র পড়া শুরু করার কিছুক্ষণ পরে দেখা যায়, পড়ার গতি ও পাদপূরণের গতি হ্রাস পাচ্ছে ও ভুল হচ্ছে। ক্রমশঃ ভুলের সংখ্যা বাড়ছে বা যে পাদগুলি পূরণ করতে হবে সেগুলি নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। এর থেকেই মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যায়।

পাদপূরণের পরীক্ষা

মানসিক অবসাদ পরিমাপের আর একটি পদ্ধতি হল অক্ষর কেটে বা মুছে দেওয়ার পরীক্ষা (cancellation test or letter erasing test)। কোন একটি লেখার মধ্যে 'প' এই বিশেষ অক্ষরটি পরীক্ষার্থীকে কেটে দিতে বলা হল। এইরূপ একটানা কাজের জন্য পরীক্ষার্থীর মধ্যে ক্লান্তি দেখা দেয়। পরীক্ষার্থীর ভুলের পরিমাণ, কাজের গতি, নজর এড়িয়ে যাওয়া প্রভৃতি থেকে তার মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যায়।

অক্ষর কেটে দেওয়ার পরীক্ষা

মুখস্থ করার পরীক্ষণ কার্য চালিয়েও মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যায়। একটা পড়া মুখস্থ করতে কতবার পড়তে হচ্ছে তা থেকে মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যেতে পারে।

মুখস্থ করার পরীক্ষণ

গণনার সাহায্যে পরীক্ষণ কার্য চালিয়েও মানসিক অবসাদ পরিমাপ করা যেতে পারে। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে নানা ধরনের আঙ্কিক গণনা করতে দেওয়া হয়। গণনা করতে কত সময় লাগে, কি পরিমাণ ভুল হচ্ছে তার সাহায্যে মানসিক অবসাদ মাপা যায়।

গণনার সাহায্যে পরীক্ষণ কার্য

এইভাবে আঙ্কিক গণনার সাহায্যে মানসিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টিচার্স কলেজের' জাপানী ছাত্রী মিস্ আরাই (*Miss Arai*) নানা ধরনের পরীক্ষণ করেন। তিনি তাঁর পরীক্ষণ-কার্যে চারটি সংখ্যাকে চারটি সংখ্যা দিয়ে মনে মনে কয়েকদিন ধরে গুণ করতে লাগলেন। প্রথমতঃ, তিনি ৮,১৪৩ এবং ৫,৬২৯ এই সংখ্যা দুটি মুখস্থ করলেন। তারপর তাদের গুণফল নিরূপণ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি মনে মনে তাদের গুণফল নির্ণয় করলেন। প্রায় ১১ ঘণ্টা অনুশীলনের পর তিনি দেখলেন যে, সঠিক উত্তর পাবার জন্য তাঁকে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ সময় ব্যয় করতে হচ্ছে এবং ভুলের পরিমাণও কিছু বাড়ছে। এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন যে মানসিক অবসাদই এর কারণ। ১১ ঘণ্টার শেষে তাঁর যে কর্মদক্ষতা প্রকাশ পাচ্ছে, তা শুরুতে যে কর্মদক্ষতা ছিল তার শতকরা ৫০ ভাগ।

মিস আরাই এর পরীক্ষণ কার্য

দৈহিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন রকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে :

(১) **এস্‌থিসিওমিটার (Aesthesiometer) :** এ যন্ত্রের সাহায্যে ত্বকের স্পর্শানুভূতির পরিমাপ করা হয়। অবসাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি হ্রাস পেতে থাকে।
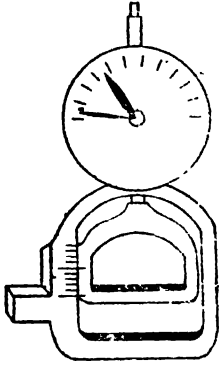
এস্‌থিসিওমিটার

(২) **ডাইনামোমিটার (Dynamometer) :** এ যন্ত্রটির সাহায্যে হাতের মুঠির শক্তি (strength of grip) নিরূপণ করা যায়। কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর ব্যক্তি কতটুকু অবসাদগ্রস্ত হল তাও এ যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়ে। অবসাদের ফলে হাতের মুঠির জোর কমে আসে।

ডায়নামোমিটার

(৩) **আরগোগ্রাফ (Ergograph) :** ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মসো (*Mosso*) এই যন্ত্রট আবিষ্কার করেন। এ যন্ত্রে পরীক্ষার্থীর হাতটি শক্ত করে একটি টেবিলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে মাঝের আঙ্গুল ছাড়া অন্য আঙ্গুল নাড়তে না পারে। ঐ মাঝের আঙ্গুলের সঙ্গে একটা শক্ত দড়ি দিয়ে একটা ওজন বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর পরীক্ষার্থীকে আঙ্গুলকে সঙ্কুচিত আর প্রসারিত করে ওজনটিকে ওঠাতে, নামাতে বলা হয়। ক্রমশঃ আঙ্গুলে অবসন্নতা দেখা দেয়, তখন আর দ্রুত তাকে ওঠান নামান সম্ভব হয় না। কিমোগ্রাফের ধোঁয়ান কাগজের সঙ্গে একটি লেখার স্টাইলাস সংযুক্ত থাকে যার দ্বারা পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টানের একটি চিত্ররূপ কিমোগ্রাফে আঁকা হয়ে যায়। এই চিত্রটিকে বলা হয় **আরগোগ্রাম (Ergogram)**।
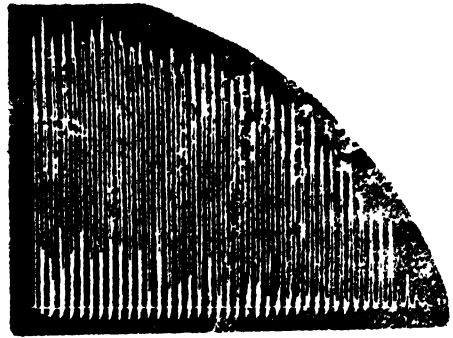
আরগোগ্রাফ

আরগোগ্রাম

উপরের রেখাচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা যায় পরীক্ষার্থীর প্রথম দিকের টানগুলি খুব দীর্ঘ ছিল কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যতই আঙ্গুল অবসন্ন হয়ে পড়ছে ততই

এই টানের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে আসছে এবং সর্বশেষে আঙ্গুল খুবই অবসন্ন হয়ে পড়ার টান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝামাঝি অবস্থায় এই দৈর্ঘ্য প্রায় একই আছে।

৫। বিদ্যালয়ে অবসাদ (Fatigue in School) :

বিদ্যালয়ের কাজে শিক্ষার্থীদের অবসন্নতা কতখানি দেখা দেয় এবং তার জন্য কাজের দক্ষতা কিভাবে ব্যাহত হয় সে সম্পর্কেও পরীক্ষণকার্য চালান হয়েছে। [1] *Winch, Gates Heck* প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, ক্লান্তি বা অবসাদ হেতু বিদ্যালয়ের শিশুদের কাজের দক্ষতার বিশেষ হেরফের ঘটে না। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রকৃত কোন মানসিক অবসাদ নেই। বিদ্যালয়ের কাজের বিভিন্ন সময়ে পড়া, অঙ্ককষা, অসম্পূর্ণ বাক্যের পাদপূরণ করা প্রভৃতি ব্যাপারে শিশুদের কর্মক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে কিনা, সে সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিদ্যালয়ের কাজের সারা দিন তাদের সামর্থ্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। সকাল আটটায় এবং দুপুর চারটায় মানসিক কাজ করার সামর্থ্য গড়ে সব শিশুরই প্রায় সমান। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মানসিক অবসাদের জন্য বিদ্যালয়ের কাজে দিনের কোন সময়েই মানসিক শক্তি ও কর্মক্ষমতার বিশেষ হানি ঘটে না।

ক্লান্তির জন্য বিদ্যালয়ের শিশুদের কাজের দক্ষতা হ্রাস পায় না

বিদ্যালয়ের কাজে কর্মক্ষমতার যে হ্রাস লক্ষ্য করা যায় তার কারণ মানসিক অবসাদ নয় ; বিরক্তি, চঞ্চলতা, কাজে আগ্রহের অভাব বা বন্ধ ঘরে আলো বাতাসের অভাব ইত্যাদি। উন্নত শিক্ষণ-প্রণালীর প্রয়োগে শিশুদের শেখার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। একথা সত্য যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষণকার্যে শিক্ষার্থীদের কোন মানসিক ক্লান্তি আসে না, তবু কেমন যেন একটা ক্লান্তির ভাব তাদের মধ্যে দেখা

বিরক্তি, চঞ্চলতা, আগ্রহের অভাব ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবার কারণ

1. মনোবিজ্ঞানী উইঞ্চ (*W. H. Winch*) পরীক্ষা করে দেখেছেন যে যারা দিনের বেলা কাজ করে, রাতে পড়াশোনা করে তাদের কর্মক্ষমতা রাতে পড়ার সময় ছ' ভাগের এক ভাগ হ্রাস পায়। অপর একজন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন অবসরের ঠিক পূর্বে শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষমতা সকালের চেয়ে কম থাকে। থর্ণডাইকও একই ধরনের পরীক্ষা করে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। হেক্ (*Heck*) মার্স (*Marsh*) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরাও একমত যে দিনের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক কাজ করার ক্ষমতার তারতম্য হয়।

দেয়। শিক্ষক বা স্কুল কর্তৃপক্ষের কঠোর শাসনব্যবস্থা; খেলাধুলা, বিশ্রাম ও আনন্দের অভাব, অমনোরম পরিবেশ, আলো-বাতাসহীন বদ্ধ শ্রেণীকক্ষ, বৈচিত্র্যহীন শিক্ষা-পদ্ধতি, পুষ্টিকর খাদ্যাভাবহেতু শিক্ষার্থীর দৈহিক দুর্বলতা, সফলতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও মানসিক দুশ্চিন্তা, ভাবদমন প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেমন একটা অবসাদের ভাব সৃষ্টি করতে পারে। শিক্ষার্থীর দৃঢ়সঙ্কল্প ও ইচ্ছা, শিক্ষক-শিক্ষিকার শিক্ষণ-কার্যে আন্তরিকতা, শিক্ষার্থীর শিক্ষণের আগ্রহ, সময়োচিত বিরাম ও বিশ্রাম, খেলাধুলার ব্যবস্থা, শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য, উন্নত শিক্ষণ প্রণালী ইত্যাদি এই ক্লান্তিভাব দূরীকরণে সমর্থ হয়। কাজেই বিদ্যালয়ের কাজে দক্ষতার মান যদি হ্রাস পায়, তা শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবার জন্য নয়; কাজে আগ্রহের অভাবহেতু এবং কেমন যেন একটা ক্লান্তি বা অবসাদের অনুভূতির জন্যই তা ঘটে থাকে।

বিদ্যালয়ের কাজের শুরুর সময় শিশুরা যে কর্মদক্ষতা দেখায়, বিদ্যালয়ের কাজের শেষভাগে তারা সেই একই কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। তবু বিদ্যালয়ের কাজের শেষভাগে শিশুরা চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পরে যেসব কাজ তারা করে থাকে, যেমন বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব, খেলাধুলা, বেড়ান—এ সবের একটা মানসিক প্রস্তুতি তাদের মধ্যে দেখা দেয়, ফলে পঠনীয় বিষয়ে আগ্রহের অভাব দেখা দেয়। বস্তুতঃ, শিক্ষকদের মধ্যেও এ সময় কাজে আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা যায়, শিশুদের তো দূরের কথা। শিশুদের মধ্যে এই সময় চঞ্চলতা ও মনোযোগের অভাব দেখা গেলেও, কোন পরীক্ষণকার্যে শিশুদের এ সময় নিযুক্ত রাখলে তাদের কর্মশক্তি, কাজে মনোযোগ ও আগ্রহ যে অন্য সময়ের অনুরূপ তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ কোন বিদ্যালয়ের পাঠদান-তালিকা পরীক্ষণ-কার্যের মতো অতটা কঠোর হয় না। সে কারণে দিনের শেষভাগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজের আগ্রহের অভাব দেখা যায়। এই কারণে পাঠদান তালিকাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সেই সময়েই বেশী উৎসাহভরে কাজ করতে পারে, যে সময়ে কাজে মনোযোগ নিবিষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিদ্যালয়ের কাজের শুরুতে যে কর্মদক্ষতা দেখা যায় তা বিদ্যালয়ের কাজের শেষ ভাগেও পরিদৃষ্ট হয়

সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, কোন কোন পঠনীয় বিষয় অন্য বিষয়ের তুলনায় সহজেই অবসাদ সৃষ্টি করে, কাজেই বিদ্যালয়ের কাজের প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি শিক্ষার্থীর শিক্ষা করা উচিত। ভাগনার (*Wagner*) এ সম্পর্কে একটি তালিকাও তৈরি করেছেন। পরপৃষ্ঠায় তালিকাটি লিপিবদ্ধ করা হল। এই তালিকায় ১০০-কে অবসাদের পূর্ণমান হিসেবে ধরা হয়েছে।

ভাগনারের তালিকা

বিষয়	অবসাদের মান
গণিত	১০০
ভাষা	৯১
ইতিহাস ও ভূগোল	৮৫
প্রকৃতি-বিজ্ঞান	৮০
অঙ্কন	৭৫
পরিশ্রমসাধ্য খেলাধূলা ও ব্যায়াম	৯০

এ সম্পর্কে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্ত করা গেছে যে, পূর্বোক্ত অভিমতের মূলে কোন সত্যতা নেই। গণিতের কাজে সহজেই অবসাদ বা ক্লান্তি আসে। সুতরাং বিদ্যালয়ের কাজের শেষ ঘণ্টায় তা করানো যেতে পারে না, এ সত্য নয়। ক্লান্তি উৎপাদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের তারতম্য চলে না। সুতরাং ভাগনারের উপরিউক্ত তালিকা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত নয়। গণিত, ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় দিনের যে কোন সময়েই সমান কুশলতার সঙ্গে শিক্ষা করা চলে। আসলে আগ্রহেব অভাব ও অতিবিক্ত দৈহিক পরিশ্রম কর্মকুশলতার হানি ঘটায়। পঠনীয় বিষয়ের দুরূহতা ও বৈচিত্র্যহীনতা, শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, বিরক্তিকর পরিবেশ, শিক্ষকের কঠোর মনোভাব শিক্ষণীয় বিষয়কে ক্লান্তিকর করে তোলে। মানসিক অবসাদ ও বিবক্তি সমার্থক নয়, তবু শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর বিতৃষ্ণা জাগলে শিক্ষাদান-কার্য ব্যাহত হয়। কাজের মধ্যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এনে শিক্ষার্থীর কর্মকুশলতার মান অব্যাহত রাখা সম্ভব। ক্লান্তির প্রশ্ন বড নয়, শিক্ষকের কাছে প্রধান সমস্যা হল বিদ্যালয়ের কাজের সমস্ত দিনটি ধরে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে কিভাবে জাগিয়ে রাখা যায়।

ক্লান্তি উৎপাদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়েব মধ্যে তারতম্য করা চলে না

৬। অবসাদের কারণসমূহ (Causes of Fatigue) :

অবসাদ বা ক্লান্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটি—শারীরিক (physical), মানসিক (mental) এবং পরিবেশগত (environmental)।

(ক) **শারীরিক কারণ** (Physical Cause): শরীরের অভ্যন্তরে শক্তি-উৎপাদক পদার্থগুলির ক্ষয়ের দরুন ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। পেশী বা স্নায়ুগুলি যদি একটানা কাজ করতে থাকে তাহলে যে তন্তুর দ্বারা পেশীগুলি গঠিত বা যে কোষের দ্বারা স্নায়ুগুলি গঠিত, সেগুলির শক্তি-উৎপাদক পদার্থের ক্ষয় সাধিত হয়, ফলে অবসাদ দেখা দেয়। আহার এবং বিশ্রামের দ্বারা শক্তি-উৎপাদক পদার্থ পুনরায় সঞ্চিত হলে পেশী ও স্নায়ুর অবসন্নতা দূর হয় এবং সেগুলি আবার কার্যক্ষম

হয়ে ওঠে। তবে পরীক্ষণের সাহায্যে জানা গেছে, পেশী যত দ্রুত অবসন্ন হয়ে পড়ে, স্নায়ু তত দ্রুত অবসন্ন হয় না।

পেশীগুলি ক্রিয়া করার জন্য দেহের অভ্যন্তরে অপচয়জনিত বিষাক্ত পদার্থ (toxic waste products) সঞ্চিত হতে থাকে।[1] দেহের অভ্যন্তরেই এমন ব্যবস্থা আছে যার

অপচয়জনিত বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয়

দ্বারা এই দূষিত বিষাক্ত পদার্থ শোধিত ও নিষ্কাশিত হয়। যদি এই শোধন ও নিষ্কাশন-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে দূষিত বিষ ক্রমশঃ সঞ্চিত হতে থাকে তখনই অবসাদ দেখা দেয়। প্রান্ত-সন্নিকর্ষ বা স্নায়ু সংযোগের (Synapse) উপরই এই দূষিত বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়া অধিক পরিমাণে ঘটে থাকে।

পরিমিত অম্লজানের (oxygen) অভাব ঘটলেও অবসাদ দেখা দেয়। রক্তের মধ্যে দু প্রকার কণিকা আছে, শ্বেত কণিকা ও লোহিত-কণিকা। এই লোহিত-কণিকাগুলি অম্লজান বহন করে। এই অম্লজানই শরীরের শক্তি উৎপাদনকারী

অম্লজানের অভাব

উপাদানগুলিকে বিশ্লেষিত হতে সহায়তা করে এবং তার দ্বারা দেহে শক্তি উৎপাদিত হয়। অম্লজানের অভাব ঘটলে শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয় না, ফলে দেহের ক্ষয় পূরণ ঘটে না। তাই শারীরিক অবসাদের সৃষ্টি হয়।

অত্যধিক কাজের জন্য দেহের লবণের (salt) পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলেও দেহের কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অবসাদের সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়াও দাঁত বা চোখের ত্রুটি, অনিদ্রা প্রভৃতিও ক্লান্তি বা অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে। কারও যদি দন্তশূল হয়, টনসিল ফোলে বা চোখের অত্যধিক পরিশ্রম ঘটে

দুর্বল ও অসুস্থ শরীরে ক্লান্তি সহজেই দেখা দেয়

বা দেহে পুষ্টি বা সজীবতার অভাব দেখা দেয় তাহলে, শিশু বা বয়ঃপ্রাপ্ত যেই হোক না কেন, অবসাদ অনুভব করবে এবং পাঠে মনঃসংযোগ করতে পারবে না। সোজা কথায় দুর্বল ও অসুস্থ শরীরে ক্লান্তি বা অবসাদ সহজেই দেখা দেয়, কিন্তু সুস্থ শরীরে অবসাদ অত সহজে দেখা দেয় না।

(খ) মানসিক কারণ (Mental Cause): অবসাদের যেমন কতকগুলি দৈহিক

মানসিক কারণ

কারণ আছে, তেমনি কতকগুলি মানসিক কারণও আছে। কাজে আগ্রহের অভাব ঘটলে তখন সহজেই ক্লান্তি বা অবসাদ আসে। আগ্রহের অভাব ঘটে তখন যখন উপযুক্ত প্রেষণার অভাব থাকে। কাজের

---

1. "Fatigue is an accumulation of the waste products of muscular activity." —Woodworth : Psychology, page 372.

পেছনে যদি প্রেষণা থাকে তাহলে সহজে ক্লান্তি আসে না। তবে দীর্ঘ একটানা কাজ চালানো হলে স্নায়ু ও পেশী অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন প্রেষণার উপস্থিতিতেও ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। উপযুক্ত প্রেষণা অযথা অবসাদকে (unnecessary fatigue) দূর করতে পারে। এছাড়া ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি (mental readiness) না থাকলেও অবসাদ দেখা দেয়। যে কাজের জন্য ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি থাকে সেই কাজে সে তার প্রচেষ্টাকে আন্তরিক ভাবে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু কাজের জন্য যদি মানসিক প্রস্তুতি না থাকে, বা অপরের দ্বারা কোন কাজ করার জন্য যদি সে বাধ্য হয়, কাজটি যদি ব্যক্তির নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধন না করে, তাহলে কাজে অবসাদ বা ক্লান্তি দেখা দেয়। একটানা কাজ করার অভ্যাস না থাকা ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাব ঘটলেও ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। মানসিক দৃঢ়তা থাকলে অনেক দুরূহ ও বিরক্তিজনক কাজও বেশ আনন্দের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে সম্পাদন করা যায়। কোন ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয় না।

আগ্রহের অভাব

কর্মীর মানসিক প্রস্তুতি

একটানা কাজ করার অভ্যাস দৃঢ় ইচ্ছা-শক্তির অভাব

(গ) **পরিবেশগত কারণ** (Environmental Cause): অবসাদ বা ক্লান্তি জাগাবার ব্যাপারে পরিবেশের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। যে পরিবেশ প্রীতিকর বা মনোরম তা একটানা কাজের পক্ষে উপযোগী, সহজে সে পরিবেশ অবসাদ সৃষ্টি করে না। যেমন, আলো-হাওয়াযুক্ত শ্রেণীকক্ষে শিশুরা কাজে বেশী মনোযোগী হতে পারে, অবসাদগ্রস্ত বোধ করে না। কিন্তু যে শ্রেণীকক্ষে আলো-হাওয়ার অভাব, যার চারপাশে হৈ-চৈ গোলমাল লেগেই রয়েছে, শ্রেণীকক্ষে বসার আসনগুলি ঠিকমত সাজান নেই, এই ধরনের পরিবেশে শিক্ষার্থীর মধ্যে অবসাদ জাগে।

মনোরম পরিবেশ একটানা কাজের পক্ষে উপযোগী

আবার খুব গরমে বা খুব জলো আবহাওয়াতে কাজে ক্লান্তি দেখা দেয়। পফেন বার্জার (*Poffen Berger*)-এর পরীক্ষণকার্যের দ্বারা জানা যায়, বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নেই এমন দুটি কারখানাতে শীতের তুলনায় খুব গরমের সময় উৎপাদন শতকরা ১১ এবং ১৮ ভাগ কম, অথচ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে এমন কারখানাতে শীতের তুলনায় গরমকালের উৎপাদন শতকরা মাত্র ৮ ভাগ কম। অবশ্য পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে গরম, বদ্ধ বাতাস, হৈ-চৈ ইত্যাদিতেও ক্লান্তি বা অবসাদ অনেক সময় দেখা দেয় না যদি কর্মীর মধ্যে উপযুক্ত প্রেরণা থাকে।

খুব গরমে বা জলো আবহাওয়াতে ক্লান্তি দেখা দেয়

৭। **অবসাদের কুফল (Bad effects of Fatigue) :**

কার্যকরী শিক্ষণ (effective learning) যেসব কারণে ব্যাহত হয়, তার মধ্যে অবসাদ অন্যতম। শিখনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর সুস্থ দেহ ও সতেজ মন। দেহ ও মন যদি সুস্থ থাকে তাহলে শিক্ষার্থী সহজে শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করতে পারে, শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করার সম্ভাবনা থাকে। ক্লান্ত দেহ ও অবসন্ন মন দিয়ে পাঠে মনঃসংযোগ করা সম্ভব নয় এবং এই অবস্থায় কাজ করলে কাজে ভুলভ্রান্তি দেখা দেয়। অবসন্ন অবস্থায় চিন্তন-শক্তির সক্রিয়তা দেখা যায় না, স্মরণ রাখার ক্ষমতা হ্রাস পায়। শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে পূর্বলব্ধ জ্ঞানের সংযোগ সাধন তেমন ভালভাবে সংগঠিত হতে পারে না। মনোযোগের অভাবহেতু চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হওয়ার জন্য পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এ তো গেল শিক্ষার্থীর অবসাদের কথা।

শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অবসাদের কুফল

শিক্ষকের অবসাদ বা ক্লান্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও ক্ষতিকর ও মারাত্মক। ক্লান্ত-অবসন্ন শিক্ষক যদি যান্ত্রিকভাবে কোনরকমে দায় সারা করে শিক্ষাদান কাজে লিপ্ত থাকেন, তাহলে ছাত্ররা সেই শিক্ষা থেকে কোন প্রেষণা বা উৎসাহ লাভ করতে পারে না, নতুন জ্ঞান অর্জনও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। শিক্ষকের মনোভাব সার্থক শিখনের অন্যতম শর্ত। সদাপ্রফুল্ল, সতেজ, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর এমন শিক্ষক যদি শিক্ষা দেন তাহলে ছাত্ররা শেখার প্রেরণা পাবে, শিক্ষণীয় বিষয় বৈচিত্রহীন মনে হবে না। কিন্তু ক্লান্ত মন দিয়ে শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষে যান, তাঁর নীরস বৈচিত্র্যহীন শিক্ষাপদ্ধতি পঠনীয় বিষয়কে বিরক্তিকর করে তুলবে ; পাঠে ছাত্রদের বিতৃষ্ণা জাগবে, ছাত্র-ছাত্রী লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক আদর্শস্বরূপ, ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত শিক্ষক নিজেই নিরুৎসাহী। শিক্ষার্থীর উৎসাহ জোগাবার সুযোগ তাঁর কোথায় ?

শিক্ষকের ক্ষেত্রে অবসাদের কুফল

শিক্ষার্থী ও শিক্ষক—শিক্ষার ক্ষেত্রে উভয়ের দিকে সমানভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর ক্লান্তি বা অবসাদ দূরীকরণের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের অবসাদ বা ক্লান্তি অপনোদন করার দিকেও সমান নজর দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের দারিদ্র্য মোচন করা, তাঁর নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করা, জীবনধারণের জন্যই তার সমস্ত শক্তি যাতে ব্যয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, কাজের মধ্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা করা, দৈনন্দিন কাজের পাঠদান-তালিকা যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক করে তোলা ইত্যাদি।

শিক্ষকের অবসাদ দূরীকরণের উপায়

৮। অবসাদ দূরীকরণের উপায় (Remedy for Fatigue) :

কাজ করার জন্য আমাদের দেহের শক্তির ক্ষয় সাধিত হয়। এই ক্ষয় পূরণ না হলে ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। প্রয়োজনমত বিশ্রাম দেহের এই ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে। **বিশ্রামে** দেহের শক্তি উৎপাদনকারী পদার্থগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে ; দেহে শক্তি ও উত্তাপের সঞ্চার হয়, ফলে ক্লান্তি দূরীভূত হয়।

পুষ্টিকর ও টাট্‌কা খাদ্য দেহের ক্ষয় পূরণ করে ক্লান্তি দূর করে। চা, কফি, কোকো প্রভৃতি পানীয়ও দেহের অবসাদ দূরীকরণের সহায়তা করে। কিন্তু দুধ, ফল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য শুধুমাত্র ক্লান্তি দূর করে না, নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। এই কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের টিফিনের সময় পুষ্টিকর খাদ্য দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

নিদ্রা ক্লান্তি অপনোদনে সহায়তা করে। নিদ্রার মাধ্যমে শরীর বিশ্রাম পায়, ফলে দেহের ক্ষয় পূরণ হয়, ক্লান্তি দূরীভূত হয়। শিক্ষার্থীর যাতে সুনিদ্রা হয়, তার প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখা উচিত। রাত্রে সুনিদ্রা না হওয়ার জন্য অনেক সময় শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অবসাদ অনুভব করে এবং পাঠে মনঃসংযোগ করতে অপারগ হয়।

শারীরিক সুস্থতা রক্ষিত হলে ক্লান্তি বা অবসাদ সহজে দেখা দিতে পারে না। কোন বিষয় শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীকে যে পরিমাণ দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হবে, শিক্ষার্থীর শরীর যেন তার উপযোগী হয়, নতুবা কাজে অবসাদ দেখা দেবে।

মানসিক অবসাদের প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর আগ্রহ। শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর যদি প্রবল আগ্রহ থাকে, তাহলে ক্লান্তি সহজে দেখা দিতে পারে না।

প্রেষণাই আগ্রহ সৃষ্টি করে, সুতরাং স্থায়ী প্রেষণার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে ধরে রাখতে পারলে সহজে ক্লান্তি দেখা দেবে না।

শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে একটানা কাজ করার অভ্যাস গঠিত হয়। ক্লান্তির আবির্ভাবকে ঠেকাতে হলে ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর পরিশ্রম করার অভ্যাস যাতে গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অবশ্য সুদৃঢ় ও স্থায়ী প্রেষণার মাধ্যমেই কেবলমাত্র এই অভ্যাস গঠন করা সম্ভব হবে। এই অভ্যাস গঠিত হলেই শিক্ষার্থী দুরূহ ও বিরক্তিকর কাজও দীর্ঘ সময় ধরে অবসন্ন না হয়ে প্রফুল্লমনে সম্পাদন করতে পারবে।

ধীর গতিতে কাজ করলে অনেক সময় কাজে অবসাদ জাগে। সে কারণে চটপট ও দ্রুত কাজ করার অভ্যাস আয়ত্ত করা ভাল।

শিক্ষণীয় বিষয় যদি চিত্তাকর্ষক না হয়ে একঘেয়েমি সৃষ্টি করে তাহলে সহজেই অবসাদের আবির্ভাব ঘটে। সে কারণে শিক্ষকের প্রয়োজন পঠনীয় বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা যাতে শিক্ষায় বৈচিত্র্যহীনতা দেখা না দেয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে না হয়।

পঠনীয় বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে তোলা

শিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশও ক্লান্তির আবির্ভাবকে বিলম্বিত করে। আলো-বাতাস ও সুসজ্জিত আসনযুক্ত ঘরে, নিরিবিলি শান্তিময় মনোরম পরিবেশে যদি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে পঠনীয় বিষয়ে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং সহজে ক্লান্তি দেখা যায় না।

উপযুক্ত পবিবেশ

শিক্ষণের যথাযথ প্রণালী অনুসরণ ও ক্লান্তি অপনোদন করার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যে বিষয়টি যে পদ্ধতিতে পড়ান উচিত, সে পদ্ধতিতে পড়ালে এবং শিক্ষাদানের সময় শিক্ষাসহায়ক উদ্দীপকের (Teaching Aids) সাহায্য নিলে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সঞ্চারিত হয়, শেখায় ক্লান্তি আসে না। ভূগোল পড়াবার সময় যদি মানচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়, বিজ্ঞান পড়াবার সময় যদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহায়তা নেওয়া হয় বা উদ্ভিদবিদ্যা পড়াবার সময় যদি গাছপালার সাহায্যে পড়ানো হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায় না এবং ক্লান্তিও চট করে দেখা দেয় না।

শিক্ষণের যথাবথ প্রণালী অনুসরণ

সফলতার আনন্দ কাজে সহজে অবসাদ আনতে দেয় না। সে কারণে শিখন-প্রক্রিয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার যাতে শিক্ষার্থী সাফল্যের আনন্দ লাভ করে। যদি এমন হয় যে সমগ্র শিখন-কার্যটি সমাপ্ত হবার পর শিক্ষার্থী সফলতার আনন্দ লাভ করবে তাহলে শিখন-কার্যটিকে কয়েকটিকে স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত করে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে সাফল্যের আনন্দ লাভের সুযোগ দিতে হবে। তাহলেই কাজে অবসাদ আসবে না বা যদি অবসাদ আসে তাহলে তা সাফল্যের আনন্দে দূরীভূত হবে।

সফলতার আনন্দ

৯। বিদ্যালয়ে অবসাদ দূর করার উপায় (Remedy for fatigue in School) ঃ

ছোট ছোট শিশুদের চট করে অবসাদ এসে যায়। কাজেই তাদের শিখনের সময় সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং তাদের বিশ্রামের প্রচুর অবসর দেওয়া প্রয়োজন। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠদান-তালিকায় কাজের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা বা বিশ্রামের

উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলিতে তিন বা চার পিরিয়ড (period) কাজের পরে বিশ্রাম দেবার রীতি প্রচলিত। তবে অনেকে মনে করেন যে একটানা তিন ঘণ্টা বা চার ঘণ্টা কাজ করার পরে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম দিলে যে ফল পাওয়া যায় প্রতি এক ঘণ্টা বা দু ঘণ্টা অন্তর দশ মিনিট বিশ্রাম দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়। একটানা চিন্তামূলক বা বৌদ্ধিক কাজে রত থাকলে শিক্ষার্থীর ক্লান্তি আসবে, সে কারণে চিন্তামূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ করার সুযোগ যদি পাঠদান-তালিকায় মাঝে মাঝে রাখা হয় তাহলে একঘেয়েমির ভাব দূর হয়ে যাবে, শিক্ষার্থীর কাজে ক্লান্তি দেখা দেবে না। যেমন—ভাষা, অঙ্ক প্রভৃতির পর অঙ্কন, কারুকলা, বাগান করা প্রভৃতি কাজের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

আগ্রহের সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। কোন বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির আগ্রহ থাকে তাহলে একটানা বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সে সেই কাজ করে যেতে পারে। কাজেই শিক্ষকের উচিত বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যাতে শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়। যখন শিক্ষক দেখবেন যে শ্রেণীর ছেলেদের মধ্যে অবসাদ দেখা যাচ্ছে, তখন তাঁর উচিত হবে সহজতর এবং আকর্ষণীয় কোন বিষয়ের আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত করা। আলোচ্য বিষয় আকর্ষণীয় হলে ছাত্ররা কোন রকম ক্লান্তি অনুভব না করেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যেতে পারে। যেসব বিষয়ের আলোচনা ছাত্রদের কাছে কঠিন মনে হয়, সেগুলিকে কোন বিশেষ সময়ে শিক্ষা দিলে, ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণ করা সহজতর হয়, সেদিকেও শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রেষণা এবং আগ্রহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি যথাযোগ্য প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারলে তাদের সহজে অবসাদ আসবে না।

আগ্রহ ও অবসাদ

যেসব বিষয় দুরূহ সেগুলি কাজ শুরুর প্রথম দিকে শেখাই ভাল। কারণ কাজের প্রথম দিকে শিশুদের মনে গ্রহণ-প্রবণতা থাকে এবং শেখবার প্রস্তুতিও অধিক থাকে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদানের সময় তালিকা (Time Table) রচনা করা প্রয়োজন। এ ছাড়া, শিক্ষণীয় বিষয় যেন কোন শিক্ষার্থীর শিখনের সীমার বাইরে চলে না যায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া, কাজের যোগ্যতার ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা যায়। শিখনের কার্যটি নিয়ন্ত্রণ করার সময় শিক্ষকের এ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের সহানুভূতি, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, উন্নত শিখনপদ্ধতি, কাজে আন্তরিকতা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের অবসাদ দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করে।

১০। অবসাদ ও বিরক্তি (Fatigue and Boredom) :

অবসাদের সঙ্গে বিরক্তির সাদৃশ্য থাকলেও দুটি কিন্তু সমার্থক শব্দ নয়। অবসাদ ও বিরক্তি উভয়ই কাজের অগ্রগতির পথে অন্তরায় স্বরূপ। অবসাদে কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা হ্রাস পায়; বিরক্তি কাজের প্রতি অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়ে তোলে। একটানা কাজ করার জন্য অবসাদ দেখা দেয়, বিরক্তি অল্প কিছুক্ষণ কাজ করার পরও দেখা দিতে পারে। কোন শিশুর মধ্যে একটানা পাঁচ ঘণ্টা অঙ্ক করার জন্য মানসিক অবসাদ দেখা দিল। কিন্তু এমন হতে পারে যে শিখন পদ্ধতির ত্রুটির জন্য শ্রেণীকক্ষে কাজ শুরু হবার কিছু পরেই তার মধ্যে বিরক্তি দেখা দিতে পারে। অধ্যাপকের নীরস বক্তৃতা ক্লান্তি জাগায় না, বিরক্তির সৃষ্টি করে। অনেক সময় শিক্ষার্থীর এই বিরক্তিকেই আমরা অবসাদ বলে ভুল করি। কিন্তু কাজে অবসাদ এত দ্রুত দেখা দেয় না। যদি শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি যথাযথ আগ্রহের সঞ্চার করা যায়, তাহলে বিরক্তির ভাব কেটে যায় এবং কার্যদক্ষতাও পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং বিরক্তি হল কৃত্রিম ক্লান্তির ভাব বা অবসাদ (false fatigue)। বিরক্তি অবসাদের বহু পূর্বেই দেখা দেয় এবং খুব শীঘ্র বেড়ে চলে। বিরক্তির প্রথম লক্ষণ হল মানসিক অস্থিরতা অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগের অভাব, তারপর শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করার তীব্র অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণা এবং সর্বশেষে আলস্য ও বোধহীনতা; কিন্তু অবসাদের শুরুতেই দেখা দেয় বোধহীনতা ও আলস্য। শিক্ষার্থী কোন বিষয় শিখতে গিয়ে যদি তাতে আনন্দ না পায় বা বিষয়বস্তু যদি একঘেয়ে হয়, তাহলেই তার বিরক্তি আসে। অবসাদ বা ক্লান্তির কারণ একাধিক—শারীরিক, মানসিক ও পরিবেশগত। শিশুরা কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র ভাবে প্রকাশ করতে চায়। এই প্রাণশক্তির প্রকাশের পথ রুদ্ধ হলেই কাজে একঘেয়েমি আসে এবং এর ফলে তাতে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। সে কারণে নীরস একঘেয়ে একটানা কাজে শিশুদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, ফলে কাজে বিরক্তি দেখা দেয়।

অবসাদে কর্মদক্ষতার হ্রাস ও বিরক্তিতে কাজে অনিচ্ছা জাগে

বিরক্তির কারণ

অষ্টম অধ্যায়

শিখন

(Learning)

১। ভূমিকা (Introduction) ঃ

পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে না পারলে কোন প্রাণীর পক্ষেই এ জগতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। প্রাণী কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী। এগুলি প্রকৃতির দান। এই সহজাত প্রবৃত্তির বশে প্রাণী যেসব সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেগুলি তাকে তার জীবনের কতকগুলি মৌলিক প্রয়োজন চরিতার্থ করতে সহায়তা করে। আবার কতকগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রাণী সম্পন্ন করে, সেগুলিকে শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয় না। এই সব প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষার সহায়ক। কিন্তু পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল এবং সেহেতু বিচিত্র পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি প্রাণীর উপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে, প্রাণীকে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় বরণ করে নিতে হয় ; এমন কি পৃথিবীর বুকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সে কারণেই প্রাণীকে তার পরিবেশের উপযোগী নিত্য নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। (নতুন নতুন আচরণ সম্পন্ন করা, অর্থাৎ কোন কিছু আয়ত্ত করাই হল শিক্ষার লক্ষ্য। প্রাণীর অতীত অভিজ্ঞতাই প্রাণীকে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার জন্য এবং নতুন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য সহায়তা করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন বিষয় আয়ত্ত করাই হল শিখন।) ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্তু অতীত অভিজ্ঞতার সহায়তায় নতুন পরিস্থিতিতে আচরণ সম্পন্ন করার জন্য নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে।

নতুন বিষয় আয়ত্ত করাই হল শিখন

মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো মানুষও প্রকৃতির দানের অধিকারী, মানুষও সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। মানুষের ক্ষেত্রেও প্রতিবর্ত ক্রিয়া তার আত্মরক্ষায় সহায়তা করে। কিন্তু এই জাতীয় আচরণ মানুষের জীবনধারণের জন্য এবং জীবনকে সহজ করে তোলার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। মানুষের এই শিখন-ক্রিয়া শুরু হয় শৈশব থেকে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মানুষের শিখনের কোন শেষ নেই।

কথায় বলে, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'। মানুষের সমস্ত জীবন ধরে এই শিখনের কাজ চলতে থাকে। শৈশবকাল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অনেক নতুন কিছু শিক্ষা করি। যেমন, নানা ধরনের খেলাধূলা, সাইকেল চালান, সাঁতার কাটা ইত্যাদি। তাছাড়াও পরিবেশ সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা গঠন করতে শিক্ষা করি। শিক্ষার সাহায্যে আমরা বাহ্যজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করে তুলি।

মানুষের ক্ষেত্রে এই শিখন-প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিখনের সাহায্যে যদি আমরা আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে ভরিয়ে না তুলি তাহলে আমাদের পক্ষে জীবন ধারণই অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষ ইতর প্রাণীর মত একমাত্র প্রকৃতি-নিভর জীব নয়। আমাদের দেহের ক্ষতিসাধন করে এমন খাদ্যবস্তু শৈশব অবস্থাতেই বর্জন করে শরীরের উপযোগী খাদ্যই কেবলমাত্র আমরা গ্রহণ করি। দৈনন্দিন জীবনে নানা বিপদ-আপদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আমাদের শিক্ষা লাভ করতে হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে শিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন বৃত্তি শিক্ষা করতে হয়, সমাজের রীতি নীতি, আচার-ব্যবহার, নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হয়। আবার, ছাত্র হিসেবে কিভাবে শিক্ষা করব তাও আমাদের শিক্ষা করতে হয়। নানারকম পদ্ধতি অনুসরণ করেই আমাদের এই সব শিক্ষা করতে হয়। সে কারণে মনোবিজ্ঞানীরা শিখন সম্পর্কীয় নানাবিধ সূত্রগুলি সন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিক শিখন সম্পর্কীয় বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা চালিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা সকলেই উপলব্ধি করেছেন যে, মনোবিজ্ঞানে এই বিষয়টির আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

○ ২। শিখনের স্বরূপ (Nature of Learning):

(অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করাই হল শিখন।)

শিখন হল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় ব্যক্তি নতুন পরিবেশে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জন করে। অবশ্য শিখন-প্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হতে পারে বা তার পূর্ব আচরণের উন্নত রূপও হতে পারে। শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন কোন একটি পরিস্থিতিতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার কৌশল আয়ত্ত করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনা

সুতরাং শিখনের লক্ষ্য হল ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনা এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে যেগুলি পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ প্রতিক্রিয়ার উপযোগী, সেগুলিকে স্থায়ী করা।

আমাদের বেশীর ভাগ শিখনই হল উদ্দেশ্যমূলক। শিখন মানুষের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে। শিখন দেহ ও মনে পরিণতি আনে, শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষ ও অন্তর্নিহিত গুণের বিকাশসাধন করে। শিখনের মাধ্যমে ব্যক্তি কোন নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করে। যখন আমরা বলি, শিখন আচরণের মধ্যে পরিবর্তন এনে তাকে স্থায়ী করে, তার অর্থ এই নয় যে, আর পরিবর্তন সম্ভব নয়। নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে এই আচরণ আরও পরিবর্তিত হতে পারে। শিখনের ফলে ব্যক্তির পুরাতন আচরণে উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাছাড়া, যা শিক্ষা করা হল তা স্মরণ রাখতে না পারলে ফলপ্রসূ হয় না। শিখনের ফলে ইন্দ্রিয় ও পেশীর মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং দৈহিক অঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষেত্রেও নতুন পরিবর্তন সাধিত হয়।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শিখনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

শিখনের বৈশিষ্ট্য

(১) শিখন হল কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য আচরণকে পরিবর্তিত করা এবং কোন বিশেষ পরিবেশে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার উপযোগী আচরণকে স্থায়ী করা। (২) শিখন হল উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ায় মধ্যে নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করা। (৩) শিখন হল অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া করে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা। (৪) শিখন হল আমাদের নানাবিধ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য নতুন কৌশল আয়ত্ত করা বা পুরাতন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা। (৫) শিখন হল দ্রুতগতিতে এবং উন্নত পদ্ধতির সহায়তায় আচরণের নতুন কৌশল আয়ত্ত করা।

শিখনের বিভিন্ন সংজ্ঞা

সুতরাং শিখন আমাদের সুবিধাজনকভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে সহায়তা করে। শিখনের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে আমরা শিখনের এইভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি : **"শিখন হল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় আমরা আচরণের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনতে পারি যা পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের উন্নতি সাধন করে।"** শিখনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী **উডওয়ার্থ** বলেছেন, "শিখন হল এমন একটি ক্রিয়া যা পরবর্তী ক্রিয়ার উপর অপেক্ষাকৃত একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায় অর্থাৎ যখনই কোন ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার ছাপ লক্ষ্য করা যায় তখনই সে ক্রিয়াকে শিখনের ফল মনে করা যেতে পারে।" **ম্যাকগিয়াক** (*McGeoch*) শিখনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "শিখন হল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন।" **বার্নার্ড** শিখনের স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, "শিখন হল আচরণের পরিবর্তন।"[1]

1. "...learning is the modification of behaviour through practice"—H. W. Bernard : Psychology of Learning and Teaching, Page 121.

শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আচরণবাদীদের বা চেষ্টিতবাদীদের (behaviourist) মতে শিখন-প্রক্রিয়া হল বিচার-বুদ্ধি বিবর্জিত যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক মনে করেন যে, শিখন-প্রক্রিয়া উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করা। ম্যাকডুগাল প্রমুখ উদ্দেশ্যসাধনবাদীদের (Purposieist) মতে উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী উপায় নির্বাচন করার ক্ষমতা অর্জন করাই হল শিখন। কোয়লার, কাফ্‌কা প্রমুখ গেস্টাল্টবাদীদের (Gestaltist) মতে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোন একটি পরিস্থিতিকে বিচ্ছিন্ন অংশে প্রত্যক্ষ না করে, সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া করাই হল শিখন।

শিখন প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মতে মতবিভেদ

৩। শিখন ও পরিণমন (Learning and Maturation) :

যে কোন ব্যক্তির ক্রমবিকাশের বা ক্রমোন্নতির মূলে শিখন ও পরিণমন উভয়েরই অবদান আছে ; উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক এতই নিকট যে একটিকে আর একটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তবু ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন ছাড়াও কোন ব্যক্তির যে স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি বা আচরণের পরিবর্তন ঘটে তাকেই আমরা পরিণমন বলতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে-কোন রকম বিশেষ প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন ব্যতিরেকেও একটা বিশেষ বয়সে সব শিশুই কথা বলতে, হাঁটা-চলা করতে বা অন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনা করতে শেখে। কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ (training) ছাড়াই এই ধরনের আচরণের পরিবর্তন হয়। পরিবেশগত পার্থক্য সত্ত্বেও শিশুদের এই ক্রমবৃদ্ধি প্রায় সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। শিখন (learning) কিন্তু ভিন্ন বিষয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আচরণে পরিবর্তন আনাই হল শিখন এবং আচরণে এই পরিবর্তন আনার জন্য পরিবেশ যেসব উদ্দীপক প্রয়োগ করে তার উপরে শিখন নির্ভর করে। শিশুর পরিণমন আসে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবেশের উপর তা নির্ভর করে না ; কিন্তু যে রকম পরিবেশে শিশুকে রাখা হয় এবং যে রকম অভিজ্ঞতা সে লাভ করে সে অনুযায়ী সে শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন ক্রিয়া করে।

দুটি যমজ শিশু নিয়ে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে ম্যাকগ্র (*Mcgraw*)[1] এবং অপর সকলে দেখতে পেলেন যে, শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি বা ক্রমোন্নতির জন্য যেসব

1. McGraw : Growth.

ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন সেগুলি বিশেষ ধরনের অনুশীলন ব্যতীত কার্যকরী হয় না ; যেমন—হাঁটাচলা, হামাগুড়ি দেওয়া, কোন কিছু জোর করে চেপে ধরা, শব্দোচ্চারণ করা ইত্যাদি। যেসব ক্রিয়াকলাপ শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নয় সেসব ক্ষেত্রেই বিশেষ ধরনের শিক্ষা এবং অনুশীলন কার্যকরী হয়। যেমন—সাঁতার দেওয়া, স্কেট পরে চলা, কোন কিছুর ওপর আরোহণ করা, লাফ দেওয়া ইত্যাদি। এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে ম্যাকগ্র আরও লক্ষ্য করলেন যে, বিশেষ ধরনের শিক্ষা হয় খুব অল্প বয়সে বা খুব বেশী বয়সে দিলেই ফল পাওয়া যায়। শিখন পরিণমনের উপর যে নির্ভর করে না তা নয়, তবে শিশুর আশানুরূপ ক্রমবৃদ্ধি বা ক্রমোন্নতি ঘটলেও পরিণমনের এক বিশেষ স্তরে এই শিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। শিশুর পরিণমন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে যদি সে উপযুক্ত অনুশীলন করে তবেই উপযুক্ত ফল লাভ ঘটে।

৪। শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব (Different theories of Learning.) ঃ

শিখন প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে সব মনোবিজ্ঞানী একমত নন। এ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন। শিখন-প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় তত্ত্বগুলির মধ্যে চারটি তত্ত্ব আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করব। (১) গেস্টাল্ট মতবাদ, (২) সংযোজনবাদ, (৩) সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াবাদ। (৪) ফিল্ড মতবাদ।

এই চারটি মতবাদের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে গেস্টাল্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়ক্ষেত্রেই গেস্টাল্টবাদের মৌলিক নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে চতুর্থ তত্ত্বটি একটি আধুনিক মতবাদ এবং প্রাচীন গেস্টাল্ট মতবাদেরই উন্নত রূপ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতবাদ সংযোগবাদের উপর ভিত্তি করে গঠিত।

(i) শিখনের গেস্টাল্ট মতবাদ ঃ (Gestalt Theory of Learning) : গেস্টাল্ট শব্দটি একটি জার্মান শব্দ। এই শব্দটির অর্থ হল 'আকার' বা রূপ (form), ছাঁদ (pattern) এবং সংগঠন বা সমগ্রতা (structure or configuration)-কোয়াহলার। (*Kohlcr*), কফকা (*Köffka*) এবং ভার্দাইমার (*Wertheimer*)-এই তিনজন এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক।

আচরণবাদ (Behaviourism), অনুষঙ্গবাদ (Associationism) এবং অন্তর্দর্শনবাদ এই তিন মতবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই মতবাদের উৎপত্তি। গেস্টাল্টবাদীদের মতে আমরা যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তখন বিষয়টিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ না করে তাকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন

বস্তু যদি পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, তাদের মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহলে সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ না করে একটি সমগ্র (Whole) বা একক (Unit) হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়—বিষয়টি খণ্ড খণ্ড ভাবে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় না। অনুষঙ্গবাদীদের মতে যখন আমরা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমন্বয়। কিন্তু

প্রত্যক্ষণের সময় কোন বিষয়কে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়

গেস্টাল্টবাদীরা এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন যে কি মানসিক প্রক্রিয়া, কি বাহ্যবস্তু, কোনটিই খণ্ড খণ্ড উপাদানের সমন্বয় নয়। যেহেতু সমগ্রতা বা সংগঠনই হল মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াকে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড উপাদানে বিশ্লেষণ করলে তার যথার্থ স্বরূপটিকে কখনও জানা যায় না।

অনুষঙ্গ বাদ ও গেস্টাল্টবাদ

গেস্টাল্টবাদীদের মতে আমাদের সব অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্রবস্তুর। এই সমগ্রতার কিছু অংশ মূর্তিরূপে এবং কিছু অংশ পটভূমিকারূপে ফুটে ওঠে। আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন কোন একটি বিশেষ পটভূমিতে একটি মূর্তি (A figure against a ground) হিসেবে তাকে প্রত্যক্ষ করি। বস্তুতঃ এই বিশেষ ক্ষেত্র বা পটভূমি এবং মূর্তিতত্ত্ব (Figure and ground) গেস্টাল্টবাদীদের প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যার একটি মৌলিক সূত্র।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু সকল সময়ই একটি অবিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তা, যাকে তার পৃথক পৃথক অংশে বিশ্লেষিত করলে সমগ্র সত্তাটিকে কখনও লাভ করা যাবে না। সমগ্র সত্তাটি পৃথক পৃথক অংশগুলির সমষ্টি মাত্র নয়, তার অতিরিক্ত কিছু এবং বিভিন্ন অংশগুলির সংগঠন থেকেই এই অতিরিক্ত কিছুটিকে আমরা পেয়ে থাকি। শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে গেস্টাল্টবাদীদের মতবাদ তাদের প্রত্যক্ষণ-সম্পর্কিত মতবাদের অনুরূপ।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিখন-প্রক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। তাঁরা বলেন থর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির সহায়তায় শিখন-প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। প্রাণী যখন কোন বিশেষ পারিস্থিতিতে কোন উদ্দীপকের উপর প্রতিক্রিয়া করে, তখন তার প্রতিক্রিয়াগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন অন্ধ প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়, প্রাণী সমস্ত পরিস্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবে অবধারণ করে প্রতিক্রিয়া করে। শিখন কোন পরিস্থিতির

শিখন প্রক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়

অংশ বিশেষের প্রতি প্রতিক্রিয়া নয়, সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া। গেস্টাল্ট-বাদীদের মতে শিখন-প্রক্রিয়া হল অন্তর্দৃষ্টির (Insight) সাহায্যে কোন বিশেষ সমস্যার পূর্ণ স্বরূপটি বুঝে নিয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সেটি জানা। অন্তর্দৃষ্টি হল কোন সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্ররূপে উপলব্ধি করা। এটি নিতান্ত আকস্মিক ভাবে আবির্ভূত হয়। বিদ্যুতের চমক যেমন হঠাৎ দেখা দেয় এবং মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু আলোকিত করে দেয়, অন্তদৃষ্টিও তেমনি প্রাণীর মধ্যে জাগরিত হয়ে সমগ্র বস্তুটির স্বরূপ নির্ণয়ে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সমস্যার সমাধানে প্রাণীর প্রত্যক্ষণে ও শিখনে সহায়তা করে।[1] এই অন্তর্দৃষ্টি কোন সহজাত ক্ষমতা নয়, এ হল অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষমতা। কাজেই শিখন প্রক্রিয়া কোন অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, এ হল সমগ্র পরিস্থিতি বা সমস্যা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি।

(ii) **গেস্টাল্ট শিখন নীতি** (Gestalt Principles of Learning): অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিখন তিনটি নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যথা—(i) অন্তর্দৃষ্টির নীতি, (The principle of insight), (ii) সমগ্রতার নীতি (The law of whole) এবং (iii) সমাধানের আকস্মিক আবির্ভাব নীতি (Sudden appearance of the solution)।

(iii) **শিখনবিষয়ে গবেষণা** (Experiment in learning): কোয়লার (*Köhler*) মুরগী, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতির শিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক পরীক্ষণ কার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শিখন-প্রক্রিয়া কোন অন্ধ-যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। এ সম্পর্কে ক্যানারি দ্বীপে অন্তরীণ থাকা কালে তিনি যে সব পরীক্ষণকার্য চালান তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণের বর্ণনা নীচে দেওয়া হচ্ছে:

কোয়লার-এর পরীক্ষণকার্য

সুলতান নামে একটি শিম্পাঞ্জীকে একটি বড় খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয় এবং খাঁচার মধ্যে দুটি বাঁশের টুকরাও রাখা হয়। খাঁচার বাইরে কিছু দূরে কয়েকটি কলা রাখা হয় এমন ভাবে, যাতে শিম্পাঞ্জীটি হাত বাড়িয়ে সেই কলার নাগাল না পায় বা যে কোন একটি বাঁশের টুকরার সাহায্যে সেই কলার নাগাল পেতে না পারে। শিম্পাঞ্জীটি প্রথমে হাত বাড়িয়ে কলার নাগাল পাবার জন্য খাঁচার মধ্যে খুব লাফালাফি করল কিন্তু সফল হতে পারল না। তখন তার চোখ পড়ল বাঁশের টুকরো দুটির উপর। সে একটি

1. 'The sudden grasping of the solution which results in a process that runs in course in accordance with the nature of the situation, so that the complete solution takes place with reference to the configuration of the field of perceprion.'
—K. Koffka—the growth of Mind Page—214.

টুকরো নিয়ে কলার নাগাল পাবার খুব চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই সফল হল না। হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর, হঠাৎ সে একটা বাঁশের টুকরোকে আর একটা বাঁশের টুকরোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা লম্বা বাঁশের লাঠি তৈরি করে নিল, তারপর সহজেই সেই লাঠির সাহায্যে কলাগুলিকে নিজের নাগালের মধ্যে টেনে নিল।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে উপরিউক্ত শিম্পাঞ্জীটির শিখন--প্রক্রিয়া নিছক 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে' (Trial and Error) শিখন নয়। এ হল অন্তর্দৃষ্টির (Learning by Insight) সাহায্যে শিখন। সমস্যা সমাধানের আকস্মিক উপলব্ধিই হল অন্তর্দৃষ্টি। সমস্যার সমাধানটি বিদ্যুৎচমকের মতো দেখা দিল। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্বন্ধ এবং তাদের যে পারস্পরিক তাৎপর্য, তার পূর্ণ দৃষ্টি যখন প্রাণীর মধ্যে জাগরিত হল তখনই অন্তর্দৃষ্টির সঞ্চার হল। আদি গেস্টাল্টবাদীরা কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে সমগ্র পরিস্থিতির সঙ্গে অংশের সম্পর্কের আকস্মিক প্রত্যক্ষণকে (sudden perception) অন্তর্দৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু আধুনিককালে 'হিলগাড (*Hillgard*) বার্নার্ড (*Bernard*) প্রভৃতির মতে অন্তর্দৃষ্টি কোন আকস্মিক প্রত্যক্ষণ নয়, একটা নিরবিচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি এবং বিকাশের পরিণতি (the result of a continuous growth and development)।

অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিখন

গেস্টাল্টবাদীদের মতে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণের জন্য পৃথকীকরণ (differentiation) এবং সামান্যীকরণ (generalisation), এই দুই মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া হল অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অপসারিত করে প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেওয়া এবং সামান্যীকরণের অর্থ হল এই পৃথক করে নেওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে একটি সার্বিক সূত্র রচনা করা। কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে যখন শিক্ষার্থী পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণের সাহায্যে সমস্যাটির অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্রগুলি উপলব্ধি করতে পারে, তখনই অন্তর্দৃষ্টি জাগে এবং শিখন সম্ভব হয়। বিশেষ একটি মুহূর্তে শিম্পাঞ্জীটির মধ্যে পরিস্থিতিটিকে সমগ্রভাবে অবলোকন করার এবং কিভাবে তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে হবে, সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হল। এই অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হওয়ায় প্রাণীটি আকস্মিকভাবে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পেল। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি লাঠি একটি লাঠিতে পরিণত হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সমগ্রতার সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু যখনই দুটি লাঠি মিলে একটি লাঠিতে পরিণত হল, তখনই একটি নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হল এবং ছেদ বা ফাঁক পূরণ হয়ে গেল। কোন একটা পরিস্থিতিকে অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া অবধারণ করা হয়

যখন তার বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়। কোন সমস্যার ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ তখনই হয় যখন যে অংশগুলি সুবিন্যস্ত নয়, তাদের মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতা প্রত্যক্ষ করা হয়। অবশ্য গেস্টাল্টবাদীরা শিখনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের বিষয়টিকে একেবারে অস্বীকার করেন না, তবে প্রকৃত শিখন-প্রচেষ্টা ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন হয় না। শিখন হল সমগ্র ও অংশের পারস্পরিক সংযোগ অবধারণ করা ও তা সম্ভব হয় যখন অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমস্যার সমাধানের সূত্রটি পাওয়া যায়। তখনই ভ্রান্ত প্রচেষ্টাগুলি পরিত্যক্ত হয়।

ছেদ পরিপূরণ

গেস্টাল্টবাদীদের মতে প্রত্যক্ষণের ধর্ম হল ভগ্নতা, ছেদ বা ফাঁক পূরণ করা। সে কারণে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নতুন সংগঠন। সমগ্র এবং অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষণ করার জন্য প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুটি নতুন ভাবে সংগঠিত হয়। শিখনের ক্ষেত্রেও রয়েছে এই ছেদ বা ফাঁক পূরণ (Closure) এবং প্রত্যক্ষণজনিত সংগঠন। শিখনের ক্ষেত্রে যখনই শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয় তখনই সে পরিস্থিতি (situation) এবং পরিস্থিতির উপযোগী প্রতিক্রিয়া—এই দুইয়ের মধ্যে যে ফাঁক বা ছেদ থাকে তাকে পূরণ করে এবং পরিস্থিতিটিকে সমগ্রভাবে অবধারণ করার জন্য সমগ্র পরিস্থিতি ও অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রটিকে নতুনভাবে সংগঠিত করে। [1]গ্যারেট (*Garrett*)-এর ভাষায়, "কোন সমস্যার সমাধান বা উদ্দেশ্য প্রাপ্তি ছেদ পূরণ করে এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটায়।" এই অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভবের ফলে প্রাণী সমস্যার সমাধানের জন্য যে যথাযথ প্রতিক্রিয়া অর্জন করে, ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলির সমাধানের জন্যও তাকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়।

(iv) শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের প্রয়োজনীয়তা (Importance of Gestalt theory in Education) : শিখনের গেস্টাল্ট মতবাদ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের শিখনের ক্ষেত্রে শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন কল্পে ও সংস্কার গঠনে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্লেষক বা অংশমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত।

---

[1] 'This the solution of a problem or the attainment of a goal brings closure and ends the active search of the learner."

—R E Garrett : Great Experiments in Psychology, Page 69

শিক্ষণীয় বিষয়টিকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করে সেগুলিকে পৃথক পৃথক ভাগে শিক্ষা দেওয়া হত। যার ফলে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ করতে পারত না। ফলে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া অন্ধ এবং যান্ত্রিক হত এবং শিখন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখন পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন সামগ্রিক বোধের সৃষ্টি হত না। বর্তমানে শিক্ষা-ব্যবস্থায় গেস্টাল্ট শিখন পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে ইতিহাস, গণিত, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বিষয়টির সমগ্র রূপটি তার সামনে তুলে ধরা হয় অর্থাৎ কিনা বিশ্লেষণ বা অংশমূলক পদ্ধতি থেকে সংশ্লেষণমূলক পদ্ধতির দিকে অগ্রসর না হয়ে তার বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। শিক্ষণীয় বিষয়টির সমগ্র রূপটি প্রথমে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে তারপর তাকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত শিখন-প্রক্রিয়া বিশেষ মূল্যবান ; কারণ এ জাতীয় শিখন-পদ্ধতি মুখস্থ করার পদ্ধতিকে বাতিল করার পক্ষপাতী। এ জাতীয় শিখন-প্রক্রিয়া স্বল্প সময়সাপেক্ষ। এই প্রক্রিয়ায় পাঠ্যবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি, সংগঠন ও সংহতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠ্যবিষয়টি এমনভাবে রচিত হবে যাতে সেটি একটি অর্থপূর্ণ (meaningful) সমগ্রতা নিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়। এই শিখন-প্রক্রিয়া কল্পনা-শক্তিকে, বিচার বুদ্ধিকে এবং চিন্তার সামর্থ্যকে উন্নত করে। এই শিখন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি (initial insight), যা সহজাত এবং স্বতঃস্ফূর্ত তাকেই এ শিখন-প্রক্রিয়া গুরুত্ব প্রদান করে। যে সমস্যাটি শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত হবে, সেই সমস্যাটি যেন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার আয়ত্তের বাইরে না হয়। তাহলে শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হবে না। তাই সমস্যা বা শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনে ও শিক্ষার্থীর কাছে তার উপস্থাপনে শিক্ষককে বিশেষ ভাবে সতর্ক হতে হবে। এই অন্তর্দৃষ্টিকে অনুকূল পরিবেশের সাহায্যে বা অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আরও গভীর করে তোলা যেতে পারে। আচরণকে সহায়তা করা, পরিচালিত করা ও উৎসাহিত করার প্রতিক্রিয়ার উপর এই শিখন-প্রক্রিয়া গুরুত্ব আরোপ করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের মূল্য

(৮) শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের অনুপযোগিতা (Disadvantage of Gestalt Theory in Education): শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাল্ট মতবাদের মূল্য স্বীকার করা হলেও এই মতবাদেরও নানারকম সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচকদের মতে 'অন্তর্দৃষ্টি' শব্দটি বর্ণনামূলক, প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি কিছুই ব্যাখ্যা

করে না। একটি শিশু একটি যান্ত্রিক খেলনা বেশ দ্রুত ও নিপুণতার সঙ্গে চালনা করতে পারে এবং তার কার্যকলাপ বুঝে নিতে পারে ; সেক্ষেত্রে আমরা বলি শিশুর অন্তর্দৃষ্টি আছে। কিন্তু যখন বলা হয় অন্তর্দৃষ্টি হল একটা নীতি বা সূত্র যার সাহায্যে প্রাণী যথাযথ প্রতিক্রিয়া করে, তখন তার অর্থ কি দাঁড়ায় ? গেস্টাল্টবাদীরা যখন অন্তর্দৃষ্টিকে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ এবং সাপেক্ষী প্রতিক্রিয়া মতবাদের মতো একটা ব্যাখ্যামূলক নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান তখনই সমালোচকরা আপত্তি করেন। তাছাড়া, শিক্ষার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হওয়ার পূর্বে কতবার তাকে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। বস্তুতঃ, শিখন-প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে 'এই প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' পদ্ধতিকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। ছোটখাট কাজে প্রায়ই দেখা যায়—কি মানুষ, কি প্রাণী উভয়কেই এই পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আকস্মিকভাবে কোন্ পদ্ধতিতে কাজটি সম্পন্ন হবে তা তার কাছে ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই অন্তর্দৃষ্টির উৎস যে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতি, তা স্বাভাবিক মনে হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, কোয়লার প্রাণীদের নিয়ে যেসব পরীক্ষণ করেছেন, সেসব পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের উপস্থিতির বিষয়টিও সমালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খুব নির্দোষ পরীক্ষকের কাছ থেকেও প্রাণীরা সহজে সংকেত বা ইঙ্গিত পেয়ে থাকে। তাছাড়া, গেস্টাল্টবাদীদের অনেক পরীক্ষণের ফলাফল পরিসংখ্যানের দিক থেকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

(vi) শিক্ষা দেবার সময় এই শিখন প্রক্রিয়াকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে ? (How to apply this Method of Learning in Teaching) : শিক্ষা দেবার সময় 'অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিখন-প্রক্রিয়াকে যদি কাজে লাগিয়ে ফল পেতে হয় তাহলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে :

(১) সমগ্র বিষয়টিকে উপস্থাপিত করতে হবে (Presentation of the whole problem) : ছাত্ররা কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতে গিয়েই অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেটির সন্ধান পায়। সেই কারণে শিক্ষককে প্রথম থেকেই সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত করতে হবে—খণ্ড খণ্ড ভাবে নয়, বা সমাধানের জন্য একটির পর একটি স্তর অতিক্রমণের প্রচেষ্টার মাধ্যমেও নয়। বীজগণিতের অঙ্ক শেখাতে গিয়ে তাকে শুধু গুণনীয়ক বা উৎপাদক না দিয়ে, এমন একটি সমস্যা দিতে হবে যাতে গুণনীয়ক বা উৎপাদক রয়েছে। অনুরূপভাবে পাটীগণিতের অঙ্ক শেখাতে গিয়ে শুধু ভগ্নাংশ না দিবে, এমন একটি সমস্যা দিতে হবে যাতে ভগ্নাংশ এসে

পড়ছে। শুধু গণিতের ক্ষেত্রে নয়, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেবার সময় পাঠ্যবস্তুটির একটি সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে এবং সেগুলিকে অংশে বিশ্লেষণ করে অংশগুলির ব্যাখ্যা করতে হবে।

(২) **পরিমাপ** (Pacing) : সমস্যার প্রাথমিক উপস্থাপন এবং শিখনের ক্রমোন্নতি—এই দুটির জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির দিকে। শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির সঙ্গে শিখন-প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য থাকবে। শিক্ষার পরিমাপ করতে গিয়ে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যাপারে বুদ্ধি সম্পকীয় এবং অনুভূতি সম্পকীয় প্রস্তুতির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। যে সমস্যাটি শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত হবে, সেই সমস্যাটি যেন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার আয়ত্তের বাইরে না হয়। তাহলে শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হবে না। তাই সমস্যা বা শিক্ষনীয় বিষয় নির্বাচনে ও শিক্ষার্থীর কাছে তার উপস্থাপনে শিক্ষককে বিশেষ ভাবে সতর্ক হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, পরিমাপ প্রক্রিয়া হল শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা, শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা নয়। যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে এই প্রস্তুতি না থাকে তাহলে শিক্ষক সমস্যাটিকে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত না করে, সমস্যাটিকে সহজতর অথচ সামগ্রিক ভাবে উপস্থাপিত করার জন্য সচেষ্ট হবেন, বা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনমত প্রস্তুতি যতদিন না আসছে ততদিনের জন্য সমস্যাটিকে তার কাছে উপস্থাপিত করা থেকে বিরত হবেন।

(৩) **বুদ্ধিগত এবং আবেগমূলক প্রস্তুতি** (Cognitive and Emotional Readiness) : বুদ্ধিগত প্রস্তুতি বলতে বোঝাচ্ছে কোন সমস্যার সমাধান করতে গেলে যে অতীত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন এবং বর্তমান সমস্যার ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা, তা যেন শিক্ষার্থীর থাকে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের সাদৃশ্য এবং সাধারণ ধারণা গঠন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাই হল সামান্যীকরণ (generalization)। বুদ্ধিগত প্রস্তুতি বলতে এই সামান্যীকরণের ক্ষমতা শিক্ষার্থীর কতটা আছে তাকেই বোঝাচ্ছে। আবেগমূলক প্রস্তুতি হল শিখনের পরিস্থিতি অনুধাবন করার মানসিক প্রস্তুতি। সমস্যাটি অনুধাবন করতে গিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন মানসিক প্রবণতা যেন শিক্ষার্থীর না থাকে। অর্থাৎ, পূর্ব বদ্ধমূল ধারণা, কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা যেন শিক্ষার্থীর সমস্যাটির যথাযথ অনুধাবন প্রচেষ্টার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কোন ছাত্রের বিদ্যালয়ে যাবার জন্য যদি আবেগমূলক প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে বিদ্যালয়ে তার উপস্থিতি শিখনের সহায়ক হতে পারে না। বস্তুতঃ, বিদ্যালয় তার কাছে একটা ভীতির বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

(৪) **শিক্ষকের সহায়তা** (Help of the Teacher) : অন্যান্য শিখন-পদ্ধতির মতো অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিখনের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে হলে শিক্ষকের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের সহায়তা বলতে বোঝাচ্ছে, শিক্ষার্থীকে সমস্যাটির সূত্র প্রদান করা নয়, যাতে শিক্ষার্থী সমস্যাটির সমাধানটি খুঁজে পায় তাতে সাহায্য করা এবং সমস্যাটির প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহকে জাগিয়ে রাখা। কোন সমস্যাকে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করার ক্ষমতা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিকশিত করার জন্য সেই সম্বন্ধ অনুসন্ধানের অভ্যাস শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষার্থী যাতে অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের জন্য অযথা উদ্যম ও সময় নষ্ট না করে সেদিকেও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে অন্তর্দৃষ্টি জাগে তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ নামে দুটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করা। এই দুটি প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থী সম্পাদন করে অর্থাৎ কিনা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বর্জন করে, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ভিত্তিতে একটি সামান্য বা সার্বিক সূত্র রচনা করতে পারে সেদিকে শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

টলম্যানের সাইন-গেস্টাল্ট মতবাদ (Tolman's Sign-Gestalt Theory) : টলম্যানের শিখন সম্পর্কীয় মতবাদ গেস্টাল্ট মতবাদের মূল নীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। লেউইনের মত টলম্যানও স্বীকার করেন যে মানুষের আচরণ সব সময়ই লক্ষ্যাভিমুখী। তবে শিখনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি ভিন্ন ভাবে তাকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে শিখন-প্রক্রিয়া হল লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপযোগী উদ্দীপককে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা, তিনি শিখনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন্ উদ্দীপক ব্যক্তিকে লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি সেই উদ্দীপককে প্রত্যক্ষ করে। কাজেই কোন সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে যে বিষয়গুলির উপর সেগুলি হল : (১) লক্ষ্যকে প্রত্যক্ষ করা। (২) যে উদ্দীপক লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে তাকে চিহ্নিত করা। (৩) বিশেষ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রত্যাশা। লক্ষ্যের উপযোগী উদ্দীপককে চিহ্নিত করা এবং লক্ষ্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিরূপণ করাই হল শিখন। ফলপ্রাপ্তি এই সম্পর্ক নিরূপণের ব্যাপারে সহায়ক। ফল লাভের প্রত্যাশাই লক্ষ্য। এই শিখন-প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি আচরণতত্ত্ব। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, সে নিতান্ত ভাবে পরিবেশের বা

উদ্দীপককে প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা

পরিস্থিতির দাসত্ব করে না। সে তার উদ্দীপকগুলিকে সংগঠিত করে তাদের অর্থবহ করে তোলে তারপর তাদের প্রতি প্রতিক্রিয়া শুরু করে। এটি নিছক একটি যান্ত্রিক ও অন্ধ প্রক্রিয়া নয়। এর মধ্যে রীতিমত বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপ বর্তমান।

(খ) থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Thorndike's Connectionism) :

থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই হল শিখন-প্রক্রিয়া। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যখন নির্ভুল যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই শিখন হয়। এই কারণে এই মতবাদকে সংযোজনবাদ বা যোগসূত্র স্থাপন মতবাদ (Theory of Connectionism or Bond Theory of Learning) বলা হয়। কোন ছাত্রকে একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হল। ছাত্রটি সমস্যা সমাধানের জন্য পর পর বিভিন্ন ফরমূলা বা সূত্রগুলি প্রয়োগ করতে লাগল। কিন্তু যখন নির্ভুল সূত্রটি প্রয়োগ করল তখনই সমস্যার সমাধানে সমর্থ হল। অর্থাৎ ছাত্রটি উদ্দীপক (গাণিতিক সমস্যা) এবং প্রতিক্রিয়ার (ফরমূলা বা সূত্রের প্রয়োগ) মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হল এবং সে শিখল। কাজেই শিখন হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

সংযোজনবাদের ব্যাখ্যা

থর্নডাইকের এই শিখন পদ্ধতি অনুষঙ্গবাদের (Associationism) উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুষঙ্গবাদের মূল নীতি হল আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াই প্রত্যক্ষণ, সংবেদন, প্রতিরূপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ অনুসারে শিখনও এই ধরনের মানসিক এককের সংযোগ থেকেই সৃষ্টি হয়।

থর্নডাইক তাঁর সংযোজনবাদের উপর ভিত্তি করেই শিখন পদ্ধতির নাম দিলেন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির সাহায্যে শিখন (Learning by Trial add Error Method)।

(i) **প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মাধ্যমে শিখন পদ্ধতির স্বরূপ** (Nature of learning by trial and error) **:** এই শিখন-প্রক্রিয়াকে 'সফল বিকল্প নির্বাচনের সহায়তায় শিখনও' (Learning by selection of the successful variant) বলা হয়ে থাকে। যখন আগে থেকে তৈরি এমন কোন সমাধান শিক্ষার্থীর জানা থাকে না, তখন শিক্ষার্থী শিক্ষা করার জন্য উপরিউক্ত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমে একটি সমাধান সে খুঁজে বার করে, তাকে প্রয়োগ করে, যদি তাতে কাজ না হয়, সে সেটিকে বর্জন করে এবং আর একটি সমাধান খুঁজে বার করে তাকে প্রয়োগ করে।

এভাবে একটির পর একটি প্রচেষ্টা সে চালিয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভুল পরিহার করতে এবং যেগুলি তার উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী নয় অপ্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া বর্জন করতে শেখে। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে সে শেষ অবধি যথার্থ বা নির্ভুল সমাধানটি আবিষ্কার করতে শিক্ষা করে। বার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই এই পদ্ধতির বিশেষত্ব। উপায় ও লক্ষ্যের (means and ends) মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তার চেতনা শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকেই না, যদিও থাকে তা নিতান্তই অস্পষ্ট। তবে যদিও শিক্ষার্থীকে বার বার প্রচেষ্টা করতে হয়, তার এই সব প্রচেষ্টা একেবারেই যে অর্থহীন তা নয়। এলোমেলো বা খুশীমত প্রচেষ্টা করার পদ্ধতি এ নয়; কেননা, শিক্ষার্থীর একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সে প্রচেষ্টা করে। তাই এই প্রচেষ্টা একেবারে লক্ষ্যহীন বা উদ্দেশ্যহীন নয়।

থর্নডাইক (*Thorndike*) এবং হল্ (*Hall*) এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ ও সম্বন্ধ স্থাপন করাই হল শিখন-প্রক্রিয়া। বার বার চেষ্টা ও ভুল-ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সংযোগ স্থাপিত হয়। শিখন-প্রক্রিয়া হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার অনুক্রম ও পারম্পর্য। আকস্মিকভাবে বিনা প্রচেষ্টায় কোন কিছু শেখা সম্ভব নয়।

উদ্দীপকের ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপন করাই হল শিখন।

(ii) **প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতিবিষয়ে গবেষণা** (Experimental studies in Trial and Error)**:** এই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানুষ ও নিম্নতর প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালানো হয়েছে। থর্নডাইক কুকুর, বিড়াল ও বানরের উপর একাধিক পরীক্ষণকার্য চালান। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের উপর তিনি যে পরীক্ষণটি করেন, এই পরীক্ষণটিকেই প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধনের মাধ্যমে শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হয়।

থর্নডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন এবং খাঁচার বাইরে এক টুকরো মাছ রাখলেন যাতে মাছের টুকরোটি বিড়ালটির চোখে পড়ে। বিড়ালটি খাঁচার দরজা খুলতে পারলেই, মাছের টুকরোটি তার আয়ত্তে আসবে। খাঁচার দরজাটি এমনভাবে ছিটকিনি দিয়ে আটকান, যাতে সামান্য চাপ লাগলেই ছিটকিনিটি খুলে যায়। বিড়ালটি প্রথমেই খাঁচার ভেতর থেকেই মাছটি পাবার চেষ্টা করল কিন্তু বিফল হয়ে সে খাঁচার ভিতর ছুটাছুটি করতে লাগল, খাঁচাটি আঁচড়াতে লাগল, কামড়াতে লাগল

একটি পরীক্ষণ কার্যের বিবরণ

এবং এই অবস্থায় হঠাৎ ছিটকিনির উপর চাপ পড়াতে ছিটকিনিটি খুলে গেল। তখন বিড়ালটি বেরিয়ে এসে মাছের টুকরোটি লাভ করল। দ্বিতীয় দিনে ঐ একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হল, দেখা গেল বিড়ালটি পূর্বদিনের তুলনায় কম প্রচেষ্টায় এবং অল্প সময়ে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে একই ভাবে খাঁচায় আটকান হল এবং দেখা গেল যে, তৃতীয় দিনে তার ব্যর্থ প্রচেষ্টার সংখ্যা আরও কমে গেছে এবং পূর্বদিনের তুলনায় সময় আরও কম লেগেছে। এইভাবে দেখা গেল তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বা ভুলের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। অবশেষে এমন একদিন এল যেদিন বিড়ালটি কোন ভুল বা ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে প্রথমবারেই অনায়াসে খাঁচার দরজাটি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। সেই দিনই বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের সহায়তায় উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ বা সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হল এবং তার শিখনও সমাপ্ত হল। বিড়ালের এই প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিখনের একটা রেখাচিত্র নিম্নে দেখান হল। খাঁচার দরজা খুলে খাদ্যে পৌঁছতে মোট ২৪টি ক্রমিক প্রচেষ্টার মধ্যে বিড়ালটির প্রথম প্রচেষ্টায় ১৬০ সেকেণ্ড সময় লাগলেও ক্রমশঃ সেটা কমে কমে ৭ সেকেণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে।
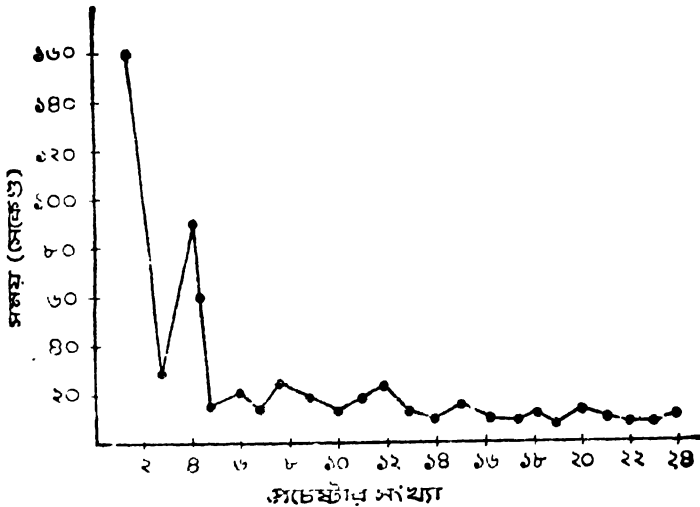
একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের শিখনের চিত্ররেখা

এরূপ রেখাচিত্র থেকে বোঝা যাবে যে প্রতিবারের প্রচেষ্টায় বিড়ালটির কতটা সময় লেগেছে।

থর্নডাইকের মতে শিখন-প্রক্রিয়া একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, এর মধ্যে বিচার বা মননশীলতার কোন স্থান নেই। শিখন-প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের

সঙ্গতিবিধান সম্পর্কে প্রাণীর মধ্যে কোন রকম পূর্ব সচেতনতা নেই ; অর্থাৎ সমস্যার সামগ্রিক রূপটিকে কল্পনায় মনের সামনে উপস্থিত করে কিভাবে সমস্যা ও সমাধানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যাবে তার কোন পূর্ব কল্পনা প্রাণীর মধ্যে নেই। অনুশীলনের সহায়তায় ভুল প্রক্রিয়াগুলিকে পরিহার করে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার সামর্থ্য অর্জন করাই হল শিখন। প্রাণীর শিখন-প্রক্রিয়া কতকগুলি দৈহিক প্রতিক্রিয়ার পারম্পর্য।

থর্নডাইকের মতে শিখন-প্রক্রিয়া যান্ত্রিক প্রক্রিয়া

থর্নডাইকের মতে কেবলমাত্র ইতর প্রাণীই এই পদ্ধতিতে শেখে না, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এই পদ্ধতিতে শেখে। ইতিপূর্বে সংযোজনবাদের ব্যাখ্যায় এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

(iii) **শিক্ষায় প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতির তাৎপর্য** (Significance of Trial and Error Method in Education) : যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলেও এই পদ্ধতির বিশেষ কোন উপযোগিতা আছে বলে অনেকে মনে করেন না। এই পদ্ধতিতে শিখতে গেলে অযথা অনেক সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে।[1]

তবু এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যেমন—অঙ্ক, নামতা, কবিতা মুখস্থ করা, ব্যাকরণের নিয়ম আয়ত্তকরা, এসব ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতিকে পরিহার করা সম্ভব হয় না। যুক্তিতর্কসংক্রান্ত বিষয়ের (reasoning subjects) ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সবচেয়ে বেশী সুবিধা রয়েছে।

যেসব শিক্ষক অঙ্ক, বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা (অর্থাৎ যেসব বিষয়ে যুক্তি ও আবিষ্কারের প্রয়োজন) শিক্ষা দেবেন তাঁরা এই পদ্ধতির সহায়তায় শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হবেন। তাঁরা ছাত্রদের কাছে এমন সমস্যা উপস্থাপিত করবেন যার সমাধানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সমাধানগুলি নিজে বার করে না দিয়ে, খুঁজে বার করার দায়িত্ব ছাত্রদের উপর অর্পণ করবেন। এর ফলে ছাত্ররা লক্ষ্যটিকে সুনির্দিষ্টভাবে জানবে, অথচ সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় তাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে থাকবে।

শিক্ষক নজর রাখবেন যাতে শিক্ষার্থী শুরুতে ঠিক পথ অনুসরণ করে। তার ফলে শুরুতেই ঠিকমত কর্ম সম্পাদনের আনন্দ-অনুভূতিতে তার মন পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাছাড়া, শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে এমন সমস্যা উপস্থাপিত করবেন, যাতে তাদের বার

1. "There is much wastage of time and energy in learning by this method."
—R. P Bhatnagar : A Study of Educational Psychology, Page 157

বার চেষ্টা করতে হয়, পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে প্রয়োগ করতে হয়, ফলাফল পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট মনোযোগী ও সতর্ক হতে হয়।

প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী লক্ষ্যহীন ভাবে প্রতিক্রিয়া করে, একথাও অনেকে স্বীকার করতে চান না। অনেক শিক্ষামনোবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই পদ্ধতিতে অনেক সময় সুনির্দিষ্ট এবং প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে যদিও সেই ক্রিয়াগুলি লক্ষ্যহীন মনে হয়, আসলে পরিস্থিতিই শিক্ষার্থীর কাছে ক্রিয়াগুলির ইঙ্গিত দেয় এবং শিক্ষার্থীও সেইভাবে অগ্রসর হয়।[1]

থর্নডাইকের শিখনের সূত্র (Thorndike's Laws of Learning) :

শিখনসম্পর্কীয় বিভিন্ন ফলাফলের উপর ভিত্তি করে থর্নডাইক কতকগুলি সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। এই সূত্রগুলি হল সংখ্যায় আটটি এবং এর মধ্যে তিনটি প্রধান সূত্র এবং পাঁচটি অপ্রধান সূত্র। তিনটি প্রধান সূত্র হল (১) **অনুশীলনের সূত্র** (Law of Exercise); (২) **ফললাভের সূত্র** (Law of Effect); (৩) **প্রস্তুতি সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Readiness)। অপ্রধান সূত্রগুলি হল (i) **একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Multiple Response to the same external stimulus; (ii) **মনোভাব, প্রস্তুতি** বা **প্রবণতার সূত্র** (Law of Attitude, Set or Disposition); (iii) **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Partial Activity); (iv) **উপমানের সূত্র** (Law of Assimilation or Analogy); এবং (v) **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র** (Law of Associative Shifting)। আমরা এখন প্রথমে প্রধান সূত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব :

শিখণের তিনটি সূত্র

(১) **অনুশীলনের সূত্র** (Law of Exercise) : কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যদি বার বার সংযোগ স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে তাহলে উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ়তর হয়; অপরপক্ষে, যদি কোন

1. "………in Trial and Error also, there are often systematic and relevant responses. Activities are not wholly random. All these activities though apparently random are suggested to him by the situation and the learner proceeds accordingly."

—R. P. Bhatnagar: A Study of Educational Psychology, page 157.

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল কোন সংযোগ স্থাপিত না হয় তাহলে সংযোগটি শিথিল হয়ে পড়ে। এই সূত্রটির মূল বক্তব্য হল অনুশীলন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগকে দৃঢ়তর করে। অনুশীলনের অভাব ঘটলে সেই সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে এই সূত্রটির বিশেষ প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। মোটর গাড়ী চালানো, টাইপকরতে শেখা, ভাষা শেখা, কবিতা মুখস্থ করা প্রভৃতি শিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলন কাজটিকে নিয়মিতভাবে ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

অনুশীলনের ফলে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ়তর হয়

এই সূত্রটির তিনটি উপসূত্র আছে ; যথা—(i) **তীব্রতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Vividness or Intensity) ; (ii) **সাম্প্রতিকতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Recency) ; (iii) **পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধীয় সূত্র** (Law of Frequency)। উদ্দীপকের তীব্রতা এবং শিখনের সাম্প্রতিকতা ও পৌনঃপুনিকতা শিখনের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে সহায়তা করে।

(২) **ফললাভের সূত্র** (Law of Effect) : একই অবস্থায় একটি কাজ বার বার করার ফলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগটি স্থাপিত হয়, সেই সংযোগটি যদি শিক্ষার্থীর পক্ষে সন্তোষজনক বা তৃপ্তিদায়ক হয় তাহলে সংযোগটি মনে রেখাপাত করে (stamped in), আর যদি সংযোগের ফল সন্তোষজনক না হয় তাহলে সংযোগটি শিথিল হয়ে ক্রমশঃ বিলুপ্ত (stamped out) হয়ে যায়। ইতর প্রাণীর পক্ষে যে প্রতিক্রিয়ার ফল তার জৈব প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সহায়ক, সেই প্রতিক্রিয়ার ফলই তৃপ্তিদায়ক, যেমন—থর্নডাইকের ক্ষুধার্ত বিড়ালকে নিয়ে যে পরীক্ষণকার্য চালাবার ঘটনাটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় ক্ষুধার্ত বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে খাঁচার দরজাটি খুলে খাদ্য লাভ করল। এক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যথাযথ সংযোগের ফল প্রাণীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক সেহেতু বিড়ালটি দরজা খোলার কৌশলটি শিখে রাখল। আর যেসব ভুল প্রতিক্রিয়ার জন্য সে খাদ্য লাভ করতে পারেনি সেগুলি বিস্মৃত হল।

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হলে সংযোগ দৃঢ়তর হয়

এই সূত্রকে পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কীয় নিয়ম (The Law of Reward and Punishment) বলা হয়। ক্ষুধার্ত বিড়ালটির যে প্রচেষ্টা তাকে খাদ্য লাভে সহায়তা করে সেগুলির ফলে যে পুরস্কৃত হয়। আবার যেগুলি সহায়তা করে না সেগুলির ফলে সে অসন্তুষ্ট হয় অর্থাৎ তার শাস্তি ভোগ হয়।

বস্তুতঃ, এই সূত্রটি অনুশীলনের সূত্রের পূর্বে আসে, যেহেতু এই সূত্রের সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে সফল প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থী নির্বাচন করে।

(৩) **প্রস্তুতির সূত্র** (Law of Readiness) : উদ্দীপক ও তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক অথবা স্নায়বিক (neurological) প্রস্তুতির ভাব থাকা প্রয়োজন। এই প্রস্তুতি থাকলে কাজটি করা শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক মনে হয়, আর এই প্রস্তুতি না থাকলে কাজটি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিজনক মনে হয়। ইহা ছাড়াও থর্নডাইক আরও তিনটি অপ্রধান সূত্রের উল্লেখ করেছেন :

শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি

(i) **একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Multiple Response to the same external stimulus) : অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির বিকাশের ফলে জীব একই উদ্দীপকের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যত বৈচিত্র্য দেখা দেয়, শিখনকার্য ততই সহজতর হয় এবং কোন বিশেষ পরিবেশে একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়াটি উদ্দীপকের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সবচেয়ে উপযোগী মনে হয়, শিক্ষার্থী সেটিই নির্বাচন করে নেয় এবং অনুশীলনের সহায়তায় সেই প্রতিক্রিয়াটিকেই স্থায়ী ও দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হয়। খাঁচায় বদ্ধ বিড়াল খাঁচার বাইরে খাদ্য দেখে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করে।

প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য শিখন-প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে

(ii) **মনোভাব, প্রস্তুতি ও মানসিক অবস্থার সূত্র** (Law of Attitude, Set or Disposition) : কোন অবস্থায় কোন উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার মনোভাব, দৈহিক ও মানসিক অবস্থা এবং প্রস্তুতির উপর। খাঁচার বিড়ালটি ক্ষুধার্ত ছিল বলেই বাইরে আসার চেষ্টা করেছিল।

প্রাণীর প্রতিক্রিয়া তার মনোভাব, দৈহিক এবং মানসিক অবস্থার ও প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে

(iii) **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র** (Law of Partial Activity) : সমগ্র অবস্থাটি উপস্থিত না থাকলেও, কোন অবস্থার অংশবিশেষ সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করতে পারে। যে বিড়াল আটক খাঁচা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে শিখেছে সে অনভিজ্ঞ বিড়ালের তুলনায় খাঁচার পাশে রাখা খাদ্যের প্রতি প্রথম থেকেই মনোযোগী হবে।

অবস্থার অংশবিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে

(iv) **সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র** (Law of Assimilation or Analogy) : এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা অনুরূপ অবস্থার দ্বারাও সৃষ্ট হতে পারে, যদিও পূর্বে সেই অবস্থা স্বভাবতঃ সেই প্রতিক্রিয়া ঘটাতো না ; যেমন, সম্পূর্ণ নতুন

একটি খাঁচাতে একটি বিড়ালকে আটকে রাখা হলে পুরনো খাঁচাতে থাকা অবস্থায় সে যেসব প্রতিক্রিয়া করেছিল, তার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া সে করবে।

(v) **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র** (Law of Associative Shifting) :

একই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্য অবস্থার দ্বারাও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে

একই অবস্থার দ্বারা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত অন্য অবস্থার দ্বারাও সেই প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্ট হতে পারে। যেমন, একটি নির্দিষ্ট পাত্রে কোন কুকুরকে যদি রোজ খাদ্য দেওয়া হয়, তাহলে পরে পাত্রটি দেখামাত্রই কুকুরটি প্রতিক্রিয়া করবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নডাইকের সূত্রগুলির গুরুত্ব (Importance of Thorndike's Laws in Education) :

যদিও থর্নডাইকের শিখন-তত্ত্ব এবং সেই সংক্রান্ত সূত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল নয় এবং সেগুলিকে সমালোচকদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে তবু শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা চলে না।

থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রটির শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আছে। অনুশীলনের উপর শিখন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অনুশীলন শিখনে পূর্ণতা নিয়ে আসে। অনুশীলনের সহায়তায় শিক্ষণীয় বিষয়টিকে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করা যায় এবং অনুশীলনের অভাব ঘটলে বিষয়টির ছাপ মনের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকে। থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রটির মূল্য শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত।

অনুশীলনের সূত্রটির মূল্য

তবে এ প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা দরকার যে অনুশীলন মানে না বুঝে কোন কিছু মুখস্থ করা নয়, প্রয়োগমূলক অনুশীলন, অর্থাৎ বাস্তবে কাজের মধ্য দিয়ে তাকে প্রয়োগ করে চর্চা করা। কাজেই এই ব্যাপারে শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব আছে। শিক্ষকের উচিত হবে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যাতে শিক্ষার্থী প্রয়োগমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়টির অনুশীলন করে।

থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটিরও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগিতা আছে। আনন্দ বা তৃপ্তি যতই অধিক হবে শিক্ষার্থীর শিখনের প্রেরণা ততই শক্তিশালী হবে, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। বিরক্তিকর শিখন স্থায়ী হয় না। কেননা তাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ লক্ষিত হয় না।

কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে শিখনকে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে লক্ষ্যকে তৃপ্তিদায়ক করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই সূত্রটির উপর ভিত্তি করেই

পুরস্কার, পদক প্রভৃতি প্রদান করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেবার রীতি বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়েছে। এই ব্যাপারেও শিক্ষকের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। শিখনকে যদি স্থায়ী করতে হয় তাহলে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্য-বিষয় এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে পাঠ্য-বিষয় এবং শিখনের ফল দুই-ই তার কাছে তৃপ্তিদায়ক হয়। শিক্ষার্থী তৃপ্তিলাভ করলেই সাফল্যলাভের জন্য উৎসাহী হবে এবং তখন শিখন যান্ত্রিক না হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত হবে। এই কারণে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পাঠ্য-বিষয় কঠিন বা দুর্বোধ্য না হয়ে সুখকর ও সহজসাধ্য হয়। পাঠ্য-বিষয় যেন শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে থাকে। পাঠ্য-বিষয় যেন সহজ থেকে জটিলতার ক্রমানুসারে সাজানো হয়। শিক্ষককে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দীর্ঘ পাঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে তার কাছে উপস্থাপিত হয়, শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যাতে বৈচিত্র্য থাকে এবং শিক্ষার্থী যাতে তার প্রচেষ্টার মধ্যে সাফল্যের সম্ভাবনার ইঙ্গিত পায়। শিক্ষক মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে প্রশংসা করে, উৎসাহ দিয়ে যেন তাকে বুঝতে দেন যে সে ঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছে এবং সাফল্য দূরাগত নয়। শিক্ষকের কর্তব্য ছাত্রকে কোনমতেই হতাশ না করা এবং তার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করে শিখনকে তার কাছে সুখকর করে তোলা।

ফললাভের সূত্রটির মূল্য

থর্নডাইকের 'প্রস্তুতির সূত্রটি'র মূল্যও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বীকৃত। শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি কোন প্রস্তুতি না থাকে অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক সবদিক থেকেই যদি শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থী উন্মুখ না হয় তাহলে শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষা প্রদান উভয়কার্য সম্পন্ন করা নিতান্তই কষ্টকর হয়ে পড়ে। যে শিখনের জন্য শিক্ষার্থী উন্মুখ নয়, সে শিখন কখনও সার্থক হতে পারে না। গণিতের জটিল অঙ্ক কষার আগে দেখতে হবে শিক্ষার্থী ঐ বিষয়ে যে সাধারণ সূত্রগুলি প্রচলিত, সেগুলি জানে কিনা। শিক্ষককে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন বিষয় শেখার আগে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি আছে কিনা, শিখনের পদ্ধতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতির ব্যাপারে শিক্ষার্থীর কোন প্রতিকূল মানসিকতা রয়েছে কিনা। যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে এই প্রস্তুতি না থাকে তাহলে সব সময় শিক্ষককে এই প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে নিজেকেই এই প্রস্তুতি, বিশেষ করে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে, কাজেই জ্ঞানমূলক এবং প্রক্ষোভমূলক উভয় প্রকার মানসিক প্রস্তুতি শিক্ষার্থীর আছে কিনা সেদিক লক্ষ্য রেখেই শিখনের কাজে শিক্ষককে অগ্রসর হতে হবে।

প্রস্তুতির সূত্রটির মূল্য

থর্নডাইকের 'উপমানের সূত্রটি'ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্যবান। অতীত ও পুরাতনের সাদৃশ্যের উপর এবং প্রতিদিনের শিখনকার্যে জানা থেকে অজানা বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করার উপর, এই সূত্রটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

উপমান সূত্রটির মূল্য

'একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়ার সূত্র'—শিক্ষার্থীকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জনের, নিজের অভিজ্ঞতা লাভ করার এবং নিজের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ প্রভৃতিব প্রয়োজন ও গুরুত্ব স্বীকার করে।

থর্নডাইকের 'অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের' সূত্রটিরও কার্যকারিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিশু যেসব অভ্যাস, প্রবণতা এবং আগ্রহ মনের মধ্যে গড়ে তোলে, সেগুলিই তার ভবিষ্যৎ জীবনে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক আচরণের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্রটির মূল্য

*** থর্নডাইকের শিখন তত্ত্বের সমালোচনা (Critical Evaluation of Thorndike's theory of learning):** বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং তাঁর শিখনের সূত্রগুলিকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের প্রধান অভিযোগ হল থর্নডাইক শিখনের সূত্রগুলিকে নিছক যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমতঃ, অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রটি পুরোপুরি সত্য নয়। তাঁদের মতে এই সূত্রটিতে প্রেষণা, আগ্রহ, বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। প্রেষণা, আগ্রহ এবং অর্থ বা তাৎপর্য উপলব্ধি ছাড়া কেবলমাত্র যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা কখনও শিক্ষার্থীকে কোন কিছু শিখতে সক্ষম করে না এবং এগুলি ছাড়া শিখন হয়ে পড়ে নিছক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি এবং পরিণামে ব্যর্থ।

বার বার পরীক্ষণকার্য চালিয়ে থর্নডাইক অনুশীলনের সূত্রটিকে সংশোধিত করেছেন। অনুশীলনের সূত্রটিকে বর্তমানে শিখনের নীতিরূপে স্বীকার না করে দক্ষতা বা নিপুণতা অর্জনের নীতিরূপে স্বীকার করা হয়। মনোবিজ্ঞানী গ্যারেট বলেন, "শিখনের কারণরূপে গণ্য না করে বরং কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় দক্ষতা কিভাবে অর্জন করা যায় তারই নীতিরূপে বর্তমানে অনুশীলনকে গণ্য করা হয়।"[1]

1. H. E. Gar ett: Great Experiments in Psychology, p. 57.

শিখনকার্য শিক্ষার্থীর নিছক পুনরাবৃত্তির উপরই নির্ভর করে না। শিক্ষণীয় বিষয়ের উপযোগিতা এবং মূল্যের উপরও নির্ভর করে।

দ্বিতীয়তঃ, থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটিরও বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ক্ষণিক সংযোজন ঘটলেই ফললাভ ঘটে। কাজেই ফললাভ সংযোজনের পূর্ববর্তী ঘটনা নয়; সংযোজনের পরিণাম, কাজেই সে ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন কিভাবে ফললাভের উপর নির্ভর হতে পারে? তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক কিছুই প্রয়োজনে শিখি যা আমাদের কাছে মোটেই তৃপ্তিদায়ক নয়। মনোবিজ্ঞানী টলম্যান (Tolman)-এর মতে পুরস্কার ছাড়াই শিখন সম্ভব, কাজেই ফললাভের সূত্রটি অপ্রয়োজনীয়। গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিখন এক সামগ্রিক প্রক্রিয়া তাকে শুধুমাত্র ফললাভের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

১৯৩২ সালে থর্নডাইক এই সূত্রটিকে সংশোধিত করেন। সূত্রটির সংশোধিত ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃপ্তি, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগকে দৃঢ় করে, কিন্তু বিরক্তি যে সেই সংযোগকে দুর্বল করে তা নয়। বিরক্তিও সময় সময় শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়। কেননা অনেক সময় বিরক্তি শিক্ষার্থীকে নতুন প্রচেষ্টার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। অনেক মনোবিজ্ঞানী এই সূত্রটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাঁরা বলেন যে, শেষ লক্ষ্য যে সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হবেই এমন কোন কথা নেই। আবার অনেক সময় সে লক্ষ্য শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হলেও সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ফলে সামাজিক আদর্শ ও শিক্ষার্থীর লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দেবে, অনেক বিষয়ে শেখার জন্য শিক্ষার্থীকে কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। লক্ষ্য তৃপ্তিদায়ক হওয়া ছাড়াও, দৃঢ় সংকল্প, অধ্যবসায়, ধৈর্য প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে বাঞ্ছিত ফললাভে সহায়তা করে, ওয়াটসন্ প্রমুখ আচরণবাদীরা এই সূত্রটির তীব্র বিরোধিতা করেছেন কারণ আচরণবাদীরা মনে করেন শিখন সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। তাঁরা শিখন প্রক্রিয়ায় প্যাভলভ (*Pavlov*) প্রদত্ত শারীরিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেন এবং ফললাভের সূত্রের সঙ্গে সুখদুঃখের সম্বন্ধ থাকায় সূত্রটিকে বর্জন করেছেন। সুখদুঃখের সঙ্গে মনের সম্পর্ক আচরণবাদীরা মনের পৃথক সত্তা স্বীকার করেন না।

এই সব সমালোচনার ফলে, শিখনের সূত্রগুলির অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে থর্নডাইক তাঁর তিনটি মুখ্য সূত্রের সঙ্গে আর একটি সূত্র যোগ করে দিয়েছিলেন যাকে তিনি 'অন্তর্ভুক্তির বা সংযুক্তির' সূত্র (Law of Belongingness) রূপে আখ্যাত করেছেন।

এই সূত্রটিকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হল যে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া এই দুটি ঘটনা যখন একটা বিশেষ সম্বন্ধের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তখনই শিখন সম্ভব হবে। একথা বলা প্রকারান্তরে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে গেস্টাল্টবাদকে স্বীকার করে নেওয়া।

থর্নডাইক সংযোজনবাদের স্বপক্ষে শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্নায়ুতন্তুর (nerves) মাধ্যমে সাধিত হয়। বার বার একই কাজের অনুশীলন করলে যে স্থায়ী স্নায়ু-মূলক সংযোজন স্থাপিত হয় তার দ্বারাই শিখন সংঘটিত হয়, কিন্তু ল্যাসলে (*Lashley*), ফ্রানজ (*Franz*) প্রমুখ শরীর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে স্নায়বিক সংযোজনের দ্বারা শিখন প্রক্রিয়াকে সুসংগত ব্যাখ্যা করা যায় না। মনোবিজ্ঞানী গেটস্ বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ শরীরবৃত্তীয় নয়, মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কীয়।

থর্নডাইকের শিখনের সূত্রগুলি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে শিখনের ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলির মূল্য যদিও অস্বীকার করা হয় না তবু শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ, প্রেষণা, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উপায় নির্বাচন, শিক্ষার্থীর মনোভাব প্রভৃতি বিষয়গুলিকে শিখন প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত না করে শিখন প্রক্রিয়াকে নিছক যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি।

(গ) সাপেক্ষীকরণের সাহায্যে শিখন (Learning by Conditioning) **:** এই প্রকার শিখনের মূল কথা হল উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ সাধন করা (linking of a response to a stimulus)। প্যাভলভ (*Pavlov*) এবং ওয়াটসন (*Watson*) প্রমুখ আচরণবাদীরা এই শিখন-পদ্ধতির সমর্থক। তাঁদের মতে শিখন হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। প্যাভলভের মতে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া বা সাপেক্ষীকরণের সাহায্যে সব প্রকারের শিখন পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করা চলে। তাঁর মতে জটিল শিখন-প্রক্রিয়া একাধিক সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল (a long chain of conditioned reflexes)। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণ-বাদীরাও শিখন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্যাভলভের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাঁদের মতেও শিখন হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার উপর এর ভিত্তি। আচরণবাদীরা সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে শিখন-প্রতিক্রিয়ার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন ; কেননা—ইচ্ছা, আশা, প্রত্যাশা, অন্তর্দৃষ্টি প্রভৃতি ধারণার সাহায্যে শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার

শিখন প্রক্রিয়া একাধিক সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল

তাঁরা মোটেই পক্ষপাতী নন। তাছাড়া, এজাতীয় ধারণাকে তাঁরা মনোবিজ্ঞান থেকে বর্জন করার পক্ষপাতী। এই শিখনের স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমেই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কাকে বলে তা বোঝা দরকার।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য বিশেষ উদ্দীপকের প্রয়োজন ; যেমন ক্ষুধার্ত প্রাণীর জিহ্বা খাদ্যের সংস্পর্শে এলে লালা ক্ষরণ হয় বা চোখে তীব্র আলোক পড়লে চোখ বুজে যায়। এ রকম উদ্দীপককে স্বাভাবিক উদ্দীপক বলে এবং এর প্রতিক্রিয়া হল প্রতিবর্তক্রিয়ার (Reflex action) উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে বাহ্য উদ্দীপক প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণীর দেহের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়া ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বা শিক্ষাপ্রসূতও নয়। ইহা স্বাভাবিক দেহজ বা শারীরিক ব্যাপার।

সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কাকে বলে ?

বিখ্যাত রুশ শারীরতত্ত্ববিদ প্যাভলভ তাঁর গবেষণার সাহায্যে দেখালেন যে, যদিও স্বাভাবিক উদ্দীপক (natural stimulus) বা নিরপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করার জন্য স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তবু সেই স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে যদি কোন একটি বিকল্প উদ্দীপক (substitute stimulus) বারে বারে উপস্থাপিত করা হয় তাহলে কালক্রমে কেবলমাত্র বিকল্প উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিকল্প উদ্দীপকের সাহায্যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করাকেই বলা হয় সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Reflex)। বিকল্প উদ্দীপক কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয়।

প্যাভলভ 'Conditioned Reflex' কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বর্তমানে 'Conditioned Reflex' কথাটি ব্যবহার না করে 'Conditioned Response' কথাটি ব্যবহার করা হয়। প্রতিবর্তক্রিয়া শিখননিরপেক্ষ কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া শিখনসাপেক্ষ। কৃত্রিম উদ্দীপকের দ্বারা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা হয় বলে তাকে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া বলে। শিখন এক অর্থে কৃত্রিম উদ্দীপকের নামান্তর।

প্যাভলভের পরীক্ষণ-পদ্ধতি (Pavlov's experimental Method) :

অত্যন্ত সুপরিচিত একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্যাভলভের গবেষণা শুরু হয়। প্যাভলভ লক্ষ্য করে দেখলেন যে, খাদ্য জিভের সংস্পর্শে এলে যেমন কুকুরের লালা ক্ষরণ হয়, খাদ্য জিভের সংস্পর্শে না এলেও খাদ্য দেখা মাত্র বা যে পাত্রে খাদ্য সরবরাহ করা হয় সেটি দেখা মাত্র, কিংবা যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে কুকুরটিকে খাদ্য দেয় তাকে দেখা মাত্রই কুকুরটির লালা ক্ষরণ হয়। নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক

উদ্দীপক অর্থাৎ খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য যেসব অনুষঙ্গবদ্ধ উদ্দীপক কুকুরটির লালা ক্ষরণ ঘটায় তিনি তার নাম দিলেন সাপেক্ষ উদ্দীপক বা বিকল্প উদ্দীপক (Conditioned Stimulus) এবং এই সাপেক্ষ বা বিকল্প উদ্দীপক-প্রয়োগে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার নাম দিলেন সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Reflex)। এর পরে প্যাভলভ দেখলেন যে, অন্য কোন একটি কৃত্রিম উদ্দীপককে (অর্থাৎ যা স্বাভাবিকভাবে নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত নয়) যদি স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে বার বার উপস্থাপিত করা হয় তাহলে স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে কৃত্রিম উদ্দীপকটি সেই একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, তিনি কুকুরটিকে খাবার দেবার পূর্বে প্রতিদিনই একটি ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। পরে দেখা গেল ঘণ্টা শোনা মাত্রই কুকুরটি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তার লালা ক্ষরণ হয়। এক্ষেত্রে ঘণ্টার শব্দ হল সাপেক্ষ উদ্দীপক (Conditioned Stimulus) এবং ঘণ্টার শব্দ শুনে কুকুরের লালা ক্ষরণকে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response) বলা হয়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিভাবে সংযোগ স্থাপিত হয় তা নীচের চিত্রটি অনুধাবন করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে :

উদ্দীপক₁ (খাদ্য) ... ... প্রতিক্রিয়া₁ (লালা ক্ষরণ)
(স্বাভাবিক উদ্দীপক) (স্বাভাবিক প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া)

উদ্দীপক₂ (ঘণ্টার শব্দ) ... ... প্রতিক্রিয়া₂ (ঘণ্টার শব্দ শোনা একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া)

উদ্দীপক₁ + উদ্দীপক₂
(খাদ্য ও ঘণ্টার শব্দ উপস্থিত একসঙ্গে) ... ... প্রতিক্রিয়া₁ (লালাক্ষরণ)

কয়েকবার ঘটনাটি পুনরাবৃত্তির পর

উদ্দীপক₂ ... ... প্রতিক্রিয়া₁ (লালাক্ষরণ)

প্যাভলভের পরীক্ষণ-পদ্ধতির বিবরণ : সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Reflex) সম্পর্কে গবেষণা করার সময় প্যাভলভ বিশেষ করে কুকুরের উপর এই পরীক্ষণকার্য চালান। কুকুরের লালা ক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়াটিকে কেন্দ্র করে গবেষণা করার কারণ, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিয়ার ফলে কতখানি লালা নিঃসৃত হল তা যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। নিঃসৃত লালাকে সংগ্রহ করার জন্য প্যাভলভ যে পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তা অপেক্ষাকৃত সহজ। তিনি কুকুরটির গণ্ডদেশে একটি ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে একটি সরু কাচের বা রবারের নল ঢুকিয়ে দিতেন এবং সেই নলের একটি প্রান্ত লালা নিঃসারী গ্রন্থির (Parotid

অথবা Submaxilary) সঙ্গে এবং নলের অপর প্রান্তটি একটি দাগকাটা কাচের পাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতেন, যাতে কুকুরের জিভের নিঃসৃত লালা রবারের নল বেয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে গড়িয়ে পড়ে। এই লালা নিঃসরণের ব্যাপারটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপার এবং যাতে এই কাজে কোন রকম বাধা দেখা না দেয় তার জন্য প্যাভলভ বিশেষভাবে নির্মিত বায়ু-প্রতিরোধক কক্ষে (এ জাতীয় আটটি কক্ষ তাঁর ছিল) পরীক্ষণকার্য চালাতেন। খাদ্য এবং বিকল্প উদ্দীপক উপস্থাপনের ব্যাপারেও যান্ত্রিক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হত। যাতে পরীক্ষককে দেখলে কুকুরটির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, সে কারণে পরীক্ষক অন্য একটি কক্ষ থেকে দেয়ালের মধ্য দিয়ে পেরিসকোপের (Periscope) সাহায্যে কুকুরটিকে লক্ষ্য
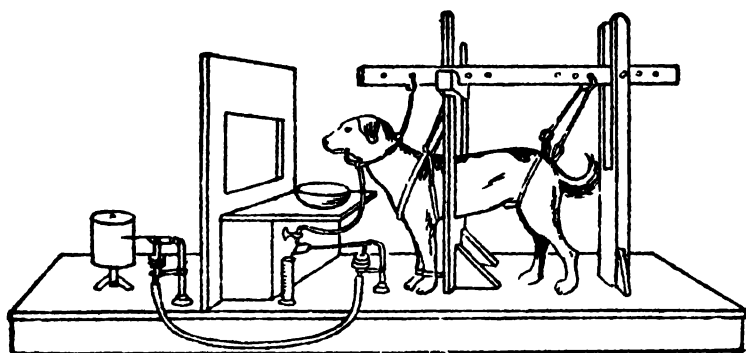
সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধীয় পরীক্ষণ

করতেন। পরীক্ষককে খুব সতর্ক থাকতে হত যাতে তিনি স্বয়ং বিকল্প উদ্দীপকরূপে গণ্য না হন। যখন লালা গড়িয়ে পাত্রটির উপর পড়ত তখন পাত্রটির সঙ্গে সংলগ্ন স্টাইল্যাসটি কাইমোগ্রাফের ধোঁয়ানো কাগজের[1] উপর দাগ কেটে যেত। এই কাগজের উপর যে রেখা অঙ্কিত হয় তার সাহায্যেই জানা যায় কত ফোঁটা লালা নিঃসৃত হয়েছে এবং এই ক্ষরণ কতখানি নিয়মিতভাবে ঘটেছে। কুকুরটি গবেষণাগারে একটি ছোট কাঠের টেবিলের উপর দাঁড় করান হয় এবং একটি কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে তাকে এমনভাবে বেঁধে রাখা হয় যাতে কুকুরটি খুব নড়াচড়া না করে সহজভাবে দাঁড়াতে পারে। প্রত্যেকটি কুকুরকেই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা দি গবেষণাগার, চারপাশের পরিবেশ, গবেষণাগারের কর্মী এবং যন্ত্রপাতির সা

1. কাইমোগ্রাফ (Kymograph)—একটি বিদ্যুৎ চালিত ঘূর্ণায়মান ড্রাম যার উপর একটি ধোঁয়ানো (smokked) কাগজ থাকে।

পরিচিত করানো হয়। দেখা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষা পাবার পর কুকুরগুলি পরীক্ষণকার্যের পক্ষে বেশ উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় (How Conditioned Response is established) : সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করার সহজতম উপায় হল নিরপেক্ষ উদ্দীপক বা স্বাভাবিক উদ্দীপক (Original Stimulus) এবং বিকল্প উদ্দীপক বা সাপেক্ষ উদ্দীপক (Substitute or Conditioned Stimulus) একই সঙ্গে উপস্থাপিত করা। বার বার প্যাভলভ তাঁর পরীক্ষণকার্যে খাদ্যকে সকল সময়ই স্বাভাবিক বা নিরপেক্ষ উদ্দীপকরূপে ব্যবহার করতেন এবং দর্শন-সম্পর্কীয়, শ্রবণসম্পর্কীয়, ঘ্রাণজ এবং স্পর্শণ-সম্পর্কীয় উদ্দীপককে সাপেক্ষ উদ্দপীকরূপে ব্যবহার করতেন।

নিরপেক্ষ উদ্দীপক ও সাপেক্ষ উদ্দীপক পুনঃ পুনঃ উপস্থাপন

কখনও 'ঘণ্টার শব্দ'—এই বিকল্প উদ্দীপক প্রয়োগ করেই লালা নিঃসরণ-রূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটান হত, কখনও বা কর্পূরের গন্ধ, কখনও বা আলোক, আবার কখনও বা কুকুরটির গাত্রচর্ম ঘর্ষণ করে এই প্রতিক্রিয়া ঘটান হত। এই সব পরীক্ষণের দ্বারা বোঝা যেত কুকুরটি বিকল্প উদ্দীপক (যেমন—কর্পূরের গন্ধ, আলো ইত্যাদি) এবং প্রতিক্রিয়া (লালা নিঃসরণ) এ দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে অনুষঙ্গবদ্ধ করে নিয়েছে।

ঘটনার শব্দ, কর্পূরের গন্ধ, আলোক প্রভৃতি বিকল্প উদ্দীপকরূপে ব্যবহৃত হত

সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার অবলুপ্তি (Extinction of a Conditioned Response) : একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কখনও একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। প্রয়োজন হলে এই শিক্ষা আবার প্রাণীর মন থেকে মুছে দেওয়া যেতে পারে। যদি সাপেক্ষ উদ্দীপক (ঘণ্টা বাজান) বার বার উপস্থাপিত করার পর নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক (খাদ্য) উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াটি আর ঘটে না, অর্থাৎ সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার অবলুপ্তি ঘটে (Extinction of Conditioned Response)। প্যাভলভের একটি পরীক্ষণের ক্ষেত্রে খাদ্যের সঙ্গে মেট্রোনোম (Metronome) বাজিয়ে শব্দ করে একটি কুকুরের লালা নিঃসরণ করা হত। তারপর একদিন শুধু মেট্রোনোম ৩০ সেকেণ্ড ধরে বাজান হল, কিন্তু কোন খাদ্য দেওয়া হল না, কিন্তু সেদিনও দেখা গেল কুকুরটির লালা ক্ষরণ হচ্ছে। এর পরের দিন ঐ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিতে লালা ক্ষরণের পরিমাণ কমে গেল। এইভাবে পরিমাণ কমে আসতে আসতে দেখা গেল

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অবলুপ্তি

যে মেট্রোনোমের শব্দ শুনে কুকুরটির আর লালা ক্ষরণ হচ্ছে না অর্থাৎ যে সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়াটি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটির অবলুপ্তি ঘটেছে।

সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতির উপর নির্ভরশীল। এ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ নিম্নোক্ত নীতিগুলির উপরে নির্ভর করে। যথা—

(১) **সময়ের নীতি** (Time Principle) : কৃত্রিম উদ্দীপক ও স্বাভাবিক উদ্দীপক —এই দুটির উপস্থাপনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যেন খুব দীর্ঘ না হয়।

(২) **তীব্রতার নীতি** (Principle of Intensity) : স্বাভাবিক উদ্দীপকটির তীব্রতা খুব বেশী হওয়া প্রয়োজন, নতুবা জীবদেহে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না।

(৩) **সামঞ্জস্যপূর্ণতার নীতি** (Principle of Consistency) : কোন রকম পরিবর্তন না করে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) **পরিস্থিতিসম্পর্কীয় নীতি** (The Situational Principle) : যে পরিস্থিতিতে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি অনুসৃত হবে, তাতে এমন কিছু থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না যাতে চিত্তবিক্ষেপ ঘটতে পারে বা মনোযোগ বিষয়ান্তরে ধাবিত হতে পারে।

(৫) **পুনরাবৃত্তির নীতি** (Principle of Repetition) : সাপেক্ষীকরণকে সুদৃঢ় করার জন্য পুনরাবৃত্তির একান্ত প্রয়োজন।

থর্নডাইকের সঙ্গে প্যাভলভের পার্থক্য : প্রথমত:, থর্নডাইক প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন ; কিন্তু প্যাভলভ এই পদ্ধতির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। দ্বিতীয়ত:, থর্নডাইকের মতে প্রাণিবিশেষ দৈহিক ভঙ্গিমার পারম্পর্য কতখানি শিখেছে, তাই হল গুরুত্বপূর্ণ। আর প্যাভলভের কাছে স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে কৃত্রিম বা বিকল্প উদ্দীপকের উপর প্রাণী প্রতিক্রিয়া করছে কি না তাই হল লক্ষ্য করার বিষয়। একটি বিশেষ অবস্থায় প্রাণী বার বার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের দ্বারা উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারছে কি না, থর্নডাইক তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ; কিন্তু প্যাভলভ প্রাণীর সহজাত বৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্য কোন স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত কৃত্রিম উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রাণী কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে তারই উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

থর্নডাইকের সঙ্গে প্যাভলভের পার্থক্য

মানুষের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response in **human beings) :** প্রশ্ন হল, মনুষ্যেতর জীবের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কীয় পরীক্ষণের সহায়তায় প্যাভলভ যেসব ফলাফল লক্ষ্য করেছেন, মানুষের ক্ষেত্রে সে জাতীয় ফলাফল লক্ষ্য করা যেতে পারে কি ?

রুশদেশীয় মনোবিজ্ঞানী ভ্লাডিমির বেক্‌টেরেভ (*Vladimir Bechterrev*) মানুষের উপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ লক্ষ্য করেন। মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসনও (*Watson*) পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব প্রমাণ করেন। সাধারণতঃ বৈদ্যুতিক শক্ লাগামাত্রই আমরা হাত-পা সরিয়ে নিই, এটি একটি প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার উদাহরণ। ওয়াটসন পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখালেন যে, শক্ দেবার পূর্বে যদি একটি বাতি জ্বালান হয়, তারপর 'শক' বা বৈদ্যুতিক ধাক্কা দেওয়া হয় এবং বেশ কয়েকবার এই অবস্থার যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপকটির প্রয়োগের ফলে অর্থাৎ বাতি জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি তার হাত-পা গুটিয়ে নিচ্ছে।

বেক্‌টেরেভ এবং ওয়াটসন মানুষের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতি-ক্রিয়ার গুরুত্ব স্বীকার করেন

দমকা বাতাস চোখের উপর এসে পড়লেই আমাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়—এটি একটি প্রতিবর্তক্রিয়া। কিন্তু দমকা বাতাস চোখের উপর লাগার পূর্বে যদি একটা ক্ষীণ আলোক ঠিক বাতাস লাগার আগে চোখের উপর ফেলা হয় এবং এটি বেশ কয়েকবার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে বাতাস চোখে লাগার আগেই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে আলো বাতাস লাগার $\frac{1}{2}$ সেকেণ্ড আগে ফেলতে হয়।

পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া

শিশুদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়ার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষিধে পাওয়ার জন্য শিশু যখন কাঁদতে থাকে তখন যে লোকটি রোজ দুধের বোতল দেয়, তার হাতে দুধের বোতল দেখেই তার কান্না থেমে যায়। দুধের বোতলটি দেবার ঠিক কিছু আগে যদি বাজনা বাজিয়ে গুনগুন শব্দ করা হয় এবং কয়েকদিন ধরে এই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে দেখা যাবে কেবলমাত্র বাজনার গুনগুন শব্দ শুনেই শিশুটির লালা ক্ষরণ হচ্ছে।

শিশুর ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া

বিভিন্ন সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করে যেমন কুকুরের লালা ক্ষরণ হয়, প্যাভলভের জনৈক ছাত্র ক্রাস্‌নোগোরস্কি (*Krasnogorski*) বিভিন্ন সাপেক্ষ উদ্দীপক—যেমন, খাদ্য, ঘণ্টা বাজান, বাঁশীর শব্দ, গায়ে হাত বুলান প্রভৃতি প্রয়োগ করে সাপেক্ষ-প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার ফলে শিশুদের লালা ক্ষরণ হয়েছে। আমেরিকার মাটিয়ের (*Mateer*), মারকুইস (*Marquis*), রাজরন (*Razron*) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানী ক্রাস্‌নো-গোরস্কির ফলাফলকেই তাঁদের পরীক্ষণের মাধ্যমে সমর্থন করেছেন। মাটিয়ের বারমাস বয়স থেকে সাত বছরের পঞ্চাশটি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন

ক্রাস্‌নোগোরস্কির পরীক্ষণকার্য এবং মাটিয়ের, মারকুইস ও রাজরন-এর পরীক্ষণকার্য

শিশুর এবং দুটি দুর্বলমনা শিশুর উপর পরীক্ষণ চালিয়ে দেখান যে, দুর্বলমনা শিশুদের তুলনায় স্বাভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রেই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং দ্রুত অবলুপ্ত করে দেওয়া যায়।

প্রক্ষোভের জটিলতা ও বিস্তৃতির মূলে সাপেক্ষীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ওয়াটসন প্রক্ষোভ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা থেকে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে দুটি উদ্দীপক নবজাতকের মনে ভয় জাগাতে পারে—উচ্চশব্দ ও আকস্মিক পতন, কিন্তু শিশু যখন বড় হয় তখন দেখা যায় যে তার ভয় কেবলমাত্র ঐ দুটি উদ্দীপকেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্যান্য উদ্দীপকও ভয় জাগাতে পারে। সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রক্ষোভ বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়। প্রক্ষোভের জটিলতা ও বিস্তৃতি সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার জন্যই যে অনেক শিশুর মধ্যে নানা ধরনের ভয় দেখা দেয়, ওয়াটসন একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তা দেখান। এলবার্ট নামে নয় মাসের একটি শিশুর উপর এই পরীক্ষণকার্য চালান হয়। ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি দেখে এলবার্ট ভয় পেত না, কিন্তু অন্যান্য ছোট শিশুর মতো সে জোরালো শব্দ শুনলে ভয় পেত। এলবার্টের কাছে একটা ইঁদুরকে আনা হয় এবং যখনই সে ইঁদুরকে স্পর্শ করতে যাবে তখনই তার পেছনে বেশ জোরে একটি শব্দ করা হত। শব্দ শোনামাত্রই এলবার্ট ভয় পেয়ে যেত এবং কেঁপে উঠত। এই রকম বার বার করার পর দেখা গেল, কেবল মাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপক অর্থাৎ ইঁদুরটিকে দেখেই সে ভয় পাচ্ছে।

সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মনে ভয়ের উদ্রেক

ওয়াটসন পরীক্ষার মাধ্যমে আরও দেখালেন যে, সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে কি ভাবে কোন ভয়কে মন থেকে দূর করা যেতে পারে। যে উদ্দীপকটি ভয় জাগায়, সেই উদ্দীপকটিকে যদি একটি আনন্দজনক উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে ক্রমশঃ ভয়ের ভাব মন থেকে দূর হয়ে যায়। কোন একটি শিশু একটি নিরীহ বেড়াল দেখলে ভয় পেত। শিশুটির কোন আনন্দজনক অবস্থায়, অর্থাৎ যখন শিশুটি তার মায়ের সঙ্গে খেলা করছে বা খাবার খাচ্ছে, তখন বেড়ালটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হতে লাগল। এইভাবে কয়েকদিন বেড়ালটিকে তার কাছে আনার পর, শিশুর ঐরূপ আনন্দজনক অবস্থায় বেড়ালটিকে আরও কাছে আনা হতে লাগল। অবশ্য শিশুর আনন্দজনক অবস্থায় যাতে কোনরূপ বাধা দেখা না দেয় তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। দেখা গেল, ক্রমশঃ শিশুটি আর বেড়াল দেখে ভয় পাচ্ছে না।

সাপেক্ষ প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার সাহায্যে কিভাবে ভয় দূর করা যেতে পারে

ব্যবহারিক জীবনে ওয়াটসনের এই জাতীয় পরীক্ষণের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কেননা, শিশুদের মনে নানা বিষয়ে ভয় জাগ্রত হয়। ওয়াটসনের পদ্ধতি অনুসরণ করে এভাবে সেই সব ভয় মন থেকে দূর করা চলে। শুধু অকারণ ভয় নয় অনেক সময় অনেক মন্দ অভ্যাস কেবলমাত্র সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেই দূর করা যেতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির অনুপযোগিতা (Disadvantages of Conditioning Method in Education): প্যাভলভ এবং ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা শিখন-প্রক্রিয়ার যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। শিখন-প্রক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা—ইচ্ছা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিখন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে মানসিকতা বর্তমান, তাকে বর্জন করে শিখন-প্রক্রিয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। জটিল শিখন-প্রক্রিয়াকেও একাধিক সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। শিখন সরল বা জটিল যাই হোক না কেন, নিছক দৈহিক প্রতিক্রিয়া নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিখনের উদ্দেশ্য কোন লক্ষ্যসাধন করা এবং এই লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে শিখন-প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বোয়াজ (*Boaz*) বলেন, "সরল বা এমন কি জটিল অঙ্গসঞ্চালনমূলক ক্রিয়া ও নৈপুণ্য শিক্ষা করার জন্য এই ব্যাখ্যা কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু আমাদের সব রকম ভাবমূলক শিক্ষা; যেমন, পদার্থবিদ্যার আপেক্ষিকতাবাদকেও সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলে, এই পদ্ধতিকে এর সীমার বাইরে প্রয়োগ করা হবে।[1]

শিখন ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়ার প্রয়োগের দোষ-ত্রুটি

সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে শিখনের ঝুঁকিও আছে অনেক। কয়েকটি কারণ নীচে ব্যক্ত করা হচ্ছে:

(১) শিশুকে জন্মের পর থেকে ইচ্ছানুসারেই হোক বা অনিচ্ছাসত্ত্বেই হোক এই পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করতে হয়। শিশু চায় খাদ্য, ভালবাসা, আরাম।

1, "………Of course in the case of learning simple or even complex motor activities and skills this explanation may work very well. But it will be stretching the point beyond its limit, if an attempt is made to explain all our ideational learning, such as learning the theory of relativity in physics, as a process of conditioning."

—G. D. Boaz: Educational Psychology. Page 163.

কিন্তু তার অভিভাবক বা তার চারপাশের পরিচিত ব্যক্তিরা এই সব স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে বিকল্প উদ্দীপকের ব্যবস্থা করে শিশুকে সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে শিখনে বাধ্য করেন। ফলে, যদি এই সব অভিভাবক বা পরিচিত ব্যক্তিরা অবিবেকী হন তাহলে শিশুর ক্রমোন্নতি বা ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের পথে নানারূপ বাধার সঞ্চার হয়। এই পদ্ধতিই অনেক শিশুকে ভীরু, আক্রমণশীল, অপরিচ্ছন্ন স্বভাবসম্পন্ন বা বিদ্রোহী করে তোলে।

(২) অনেক সময় শিখনের উদ্দেশ্য ছাড়াও যদি শিশুকে পরস্পর সংযুক্ত অভিজ্ঞতার অংশীদার করা হয় তাহলে এই সাপেক্ষীকরণের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ চমকালেই যদি মাকে উত্তেজিত হতে শিশু দেখে, তাহলে সারা জীবন ধরেই বিদ্যুৎ চমকানোতে শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হতে পারে।

(৩) কথাবার্তা এবং দেহগত পরিবর্তন অনেক সময় এমনভাবে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে পড়ে যে একটির উপস্থিতি অপরটির উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। ক্রুদ্ধ পিতা যদি প্রতিবারই সন্তানকে শাস্তি দেবার আগে তাকে মূর্খ বলে গালিগালাজ করেন তাহলে এমন হতে পারে যে, ভবিষ্যতে এরূপ গালিগালাজকে শিশু দৈহিক শাস্তির প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে পারে। কাজেই শাস্তি দেবার ফলে শিশুর মনে যে ভাব বা অনুভূতি জাগে, সেগুলি এই গালিগালাজের দ্বারাই তার মনে জাগতে পারে, পরবর্তী জীবনে যখন শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন কেউ গালিগালাজ করলে অনুরূপ অনুভূতি তার মনে সঞ্চারিত হতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে শিখনের উপকারিতা (Usefulness of Learning by Conditioning) :

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির কোন উপযোগিতা নেই, তা বলা চলে না। সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি সফল হলে, বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা যায়। এর ফলে আচরণে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে এবং আমরা বুঝতে পারি যে শিক্ষার্থী একটা বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমেই শিশুরা বিভিন্ন বস্তুর নামকরণ শেখে, শিশু যখন দেখে যে কোন একটি বস্তুর নাম কেউ বার বার উচ্চারণ করলে একটি বিশেষ বস্তু এনে উপস্থিত করা হয় তখন ঐ নামের সঙ্গে ঐ বস্তুটির সাপেক্ষীকরণ হয়ে থাকে। শিশু তখন বুঝতে শেখে যে ঐ বস্তুটির ঐ নাম। এই প্রক্রিয়ার

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার উপযোগিতা

সাহায্যে স্কুলের অনেক পাঠ্যবিষয়; যেমন-পড়া, লেখা, বানান অভ্যাস প্রভৃতি বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করা যায়। এই সকল বিষয় শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষকেরা দেখতে পাবেন সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি কতখানি মূল্যবান। সহজ কথায়, কতকগুলি এমন বিষয় আছে যাতে দক্ষতা অর্জন করতে গেলে স্বতঃস্ফূর্ততার প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন-ধারাপাতের নামতা মুখস্থ করা, বীজগণিতের বা পাটীগণিতের এমন অনেক বিষয় যেগুলি শিখনের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

অনেক বিষয় সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভালভাবে আয়ত্ত করা যায় এবং সে কারণেই কোন একটি ভাষা শিখতে গেলে যে সমাজে সেই ভাষা ব্যবহার করা হয়, সে সমাজে থেকেই এই ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করা যায়। সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা করা সহজতর হয়। সৎ মনোভাব, ভাল অভ্যাস, সহযোগিতার মনোভাব, দলের প্রতি আনুগত্য, বন্ধুপ্রীতি, সৎগুণ এবং আদর্শ যেগুলি নিয়মানুবর্তিতার উপাদান সেগুলি এই সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সহায়তায় বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করা যায়।[1]

শিশুমনের অনেক ভীতি বা আতঙ্কের মূলে রয়েছে কোন-না-কোন ধরনের সাপেক্ষীকরণ। কোন শিশুর গণিত সম্পর্কে খুবই ভীতি। আসলে কিন্তু এই ভীতি সাপেক্ষীকরণের ফল। শিশু যখন প্রথম গণিত শিখতে সুরু করে তখন তার গণিতের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। কিন্তু কোন কারণে গণিতের শিখনের প্রতি তার বীতরাগ জন্মাল। সাপেক্ষীকরণের ফলে ঐ বীতরাগ গণিতের প্রতিও দেখা দিল। সাপেক্ষীকরণের বিলুপ্তির সাহায্যে মন থেকে এই সব ভীতি বা আতঙ্ককে অপসারিত করা সম্ভব। শিশুর অনেক অসঙ্গতিমূলক প্রতিক্রিয়ার মূলেও এই সাপেক্ষীকরণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সাপেক্ষীকরণ শৈশবেই ঘটে থাকে, যদিও এর যথার্থ কারণ অজ্ঞাত থাকে, তবু এর প্রভাব উত্তরজীবনে চলতে থাকে। এই সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে এই সব আচরণের কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে এবং তার প্রতিবিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। কাজেই এই ব্যাপারে শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষককে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিখন পদ্ধতির ত্রুটি বা শিক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রতি নির্মম ব্যবহার বা বিদ্যালয়ের অমনোরম পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনে প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি

1. "Discipline may be caused through conditioning. Good sentiments, good habits, virtues and ideals etc., which are component of discipline are effectively learnt through the process of conditioning,"

—R. P. Bhatnagar : A Study of Educational Psychology, page 160.

করে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি না করে। এই সাপেক্ষী-করণের জন্য বিদ্যালয়ের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সকল শিক্ষকের প্রতিই শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ মনোভাগ জাগিয়ে তুলতে পারে।

অনেক কু-অভ্যাসও সাপেক্ষীকরণ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে, অমনোযোগ, বানান ভুল, অসতর্কতা প্রভৃতির মূলেও অনেক সময় সাপেক্ষীকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক যদি একটু সতর্ক হন তাহলে সাপেক্ষীকরণের অবলুপ্তির দ্বারা অনেক কু-অভ্যাসই শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে দূর করা যেতে পারে।

সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সমালোচনা (Criticism of the Conditioning Theory) : অনেক মনোবিজ্ঞানী এই সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে নিছক যান্ত্রিকভাবে শেখা বা আয়ত্ত করা হয়েছে এমন কিছু কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা হয়ত সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে করা যেতে পারে কিন্তু মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা এই মতবাদের সাহায্যে সম্ভব নয়। আমাদের ঐচ্ছিক ক্রিয়া, উন্নততর চিন্তন ও যুক্তি-পদ্ধতির কোন ব্যাখ্যা এই পদ্ধতি দিতে পারে না।

অবশ্য এই সমালোচনার উত্তরে একথা বলা যেতে পারে যে, উন্নততর শিক্ষার স্তরগুলি কিভাবে ব্যাখ্যাত হল শিক্ষকের কাছে তার গুরুত্ব সমধিক নয়। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী হবেন সারগ্রাহী মনোভাবাপন্ন। তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণেও প্রয়োজন আছে।

এই পদ্ধতির সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলেন যে দৈনন্দিন জীবনে পুনরাবৃত্তি ছাড়াও অনেক বিষয়ে শুধু মাত্র একবারের প্রচেষ্টাতেই শিখতে পারা যায়। অনেক অভিজ্ঞতা বিনা অনুশীলন ছাড়াই স্মরণ করা যায়। দীর্ঘকাল পরে কার্যক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ করে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়। কাজেই শুধুমাত্র অনুশীলন বা পুনরাবৃত্তি মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। লেখা, কথা বলা, কোন সহজ যন্ত্র পরিচালনা করা প্রভৃতি কতকগুলি যান্ত্রিক শিখনের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ ফলপ্রসূ হলেও, মানুষের শিখনের যে বৃহত্তর ক্ষেত্র তার ব্যাখ্যা সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায় না। সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প প্রভৃতির সাহায্যেই তার ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। গ্যারেট যথার্থই বলেছেন যে 'প্যাভলভ মনে করেন শিখন সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার নিছক দীর্ঘ শৃঙ্খল মাত্র নয়; বরং এটি একটি সহযোগিতামূলক এবং সংগঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা যে ক্ষেত্রে ব্যক্তির সমস্ত দেহ-মন সংগঠনই অংশ গ্রহণ করে।'

গেস্টাল্ট বা সমগ্রতাবাদীরাও এই পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে শিখন হল কোন বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ক্রিয়াকে পরিচালিত করা। উপায় ও লক্ষ্যের সংযুক্তিকরণ গেস্টাল্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। কিভাবে একটি পরিস্থিতির একটি উপাদানকে অপর পরিস্থিতির অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়, উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া-পদ্ধতি তার কোন উল্লেখ করে না এবং এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যদি উপস্থিত না থাকে তাহলে সাপেক্ষীকরণ কিভাবে সম্ভব? শিশুদের মনে ভীতি সঞ্চার করার উপায় হল তাদের মাতাপিতার আবেগমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি তাদের পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ দেওয়া। আবেগের যান্ত্রিক সাপেক্ষীকরণ সম্ভব নয়। শিশু কখনও কখনও কোন প্রাণী দেখে ভয় পায়। এর কারণ প্রাণীর আবির্ভাবেই বিকট চীৎকার শুরু হয়ে যায় বা অন্য কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং শিশু মনে করে প্রাণীটিই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণস্বরূপ। সুতরাং গেস্টাল্টবাদীর মতে শিক্ষার সাপেক্ষীকরণের জন্য বিভিন্ন উপাদানকে একটি সমগ্রতার মধ্যে সংযুক্তিকরণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গেস্টাল্টবাদীদের সমালোচনা

শিখনের ফিল্ড মতবাদ (Field Theory of Learning) : গেস্টাল্ট মতবাদের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে যে সব মতবাদের উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে জার্মান মনোবিজ্ঞানী কার্ট লেউইন (*Kart Lewin*)-এর ফিল্ড মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ফিল্ড সাইকোলোজি' নামে মনোবিজ্ঞানের যে নূতন শাখাটির উদ্ভাবন তিনি করেছেন সেটি সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এই মতবাদটি গেস্টাল্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্পূর্ণ আধুনিক মতবাদ এবং প্রাচীন গেস্টাল্ট মতবাদের উন্নতরূপ।

কার্ট লেউইন ফিল্ড মতবাদের প্রবর্তক

শিখনের ফিল্ড মতবাদকে বুঝে নিতে হলে 'মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড' (psychological field) বলতে কার্ট লেউন কি বুঝেছেন তা আগে জানা দরকার। লেউনের মতে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তির আচরণ মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটি রচিত হয় কোন বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তির উপর তার পরিবেশের যে শক্তিগুলি ক্রিয়া করে তার সমষ্টির দ্বারা, একটি ব্যক্তির পরিবেশে অসংখ্য বস্তু ও শক্তির উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু সব বস্তু বা শক্তিগুলিই একটি বিশেষ মুহূর্তে তার উপর ক্রিয়া করে না, যে সব শক্তিগুলি

মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের স্বরূপ

ব্যক্তির সেই সময়কার চাহিদা, আগ্রহ ও লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলিই তার উপর ক্রিয়া করে। ব্যক্তি এই সব শক্তির সমষ্টির প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। কাজেই ব্যক্তির মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড হল একটা সীমিত মনোবিজ্ঞানমূলক ক্ষেত্র, ব্যক্তির চাহিদা, লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শক্তি সমষ্টির দ্বারা সেটি গঠিত। এই ফিল্ডই বিশেষ এক মুহূর্তে ব্যক্তির আচরণের নিয়ামক।

শক্তি দু প্রকার সদর্থক ও নঞর্থক

ব্যক্তির উপর যে শক্তিগুলি ক্রিয়া করে সেগুলি দু ধরনের, যথা—সদর্থক ও নঞর্থক। যে শক্তিগুলি ব্যক্তির লক্ষ্য পূরণে সমর্থ সেগুলি সদর্থক এবং যেগুলি বাধার সঞ্চার করে সেগুলি নঞর্থক। সদর্থক শক্তি ব্যক্তিকে তার দিকে আকর্ষণ করে। ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে যায়, আর নঞর্থক শক্তি বিকর্ষণ সৃষ্টি করে যার জন্য ব্যক্তি তার থেকে পিছিয়ে যায়। লক্ষ্যের ধনাত্মক যোজ্যতা (positive valence) আছে বা আকর্ষণ শক্তি আছে। যে সব উদ্দীপক থেকে ব্যক্তি দূরে সরে যেতে চায় সেগুলি ঋনাত্মক যোজ্যতা সম্পন্ন (Negative valence) বা তাদের বিকর্ষণ শক্তি আছে। ব্যক্তির লক্ষ্য পৌছিবার পথে যে কোন বাধাই নঞর্থক শক্তিসম্পন্ন বস্তু। তবে ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত বাধার সম্মুখীন না হচ্ছে ততক্ষণ সেটির মধ্যে কোন নঞর্থক শক্তির সৃষ্টি হয় না। যখনই ব্যক্তি তার লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য বাধাটি দূর করতে সচেষ্ট তখনই সেটি তার কাছে নঞর্থক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে।

শিখনের পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড

শিখনের পরিস্থিতি এই ধরনের একটা বিশেষ মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের সৃষ্টি করে। কোন ব্যক্তি এই পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করবে তা নির্ভর করছে মনোবিজ্ঞান ফিল্ডের মধ্যে লক্ষ্য এবং বাধার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের অবস্থান নির্বাচন করার ক্ষমতার উপর। এই ফিল্ডে ব্যক্তি একটা লক্ষ্যে পৌছতে চায় কিন্তু নানাধরনের বাধা তার এই পথে প্রতিরোধের সৃষ্টি করছে। কতকগুলি শক্তি তাকে লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা করছে। এগুলিই সদর্থক শক্তি। যেগুলি ব্যক্তির মধ্যে আকর্ষণমূলক আচরণ সৃষ্টি করে, আর যে শক্তিগুলি তার লক্ষ্যে পৌছিবার পথে অন্তরায় সেগুলি নঞর্থক শক্তি। এগুলি ব্যক্তির মধ্যে বিকর্ষণমূলক আচরণের সৃষ্টি করছে। ব্যক্তি এগুলিকে দূর করতে চায়। এই উভয় প্রকার শক্তির সমন্বয়ে যে মনো-

ফিল্ডের পুনর্গঠন

বিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটি তৈরী হয় সেটিই ব্যক্তির মধ্যে শিখনমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। লেউইন বলেন, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি তার এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডকে নতুন ভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ করতে পারে

তাই হল শিখন। অনেক সময় ব্যক্তিকে এই ফিল্ডকে পুনর্গঠিত করতে হয়। বর্তমানের ফিল্ডটি যখন ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করতে পারছে না তখন সেই এই ফিল্ডটিকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়। ব্যক্তিকে তার ফিল্ডে কিছু পরিবর্তন করতে হয়। এই পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস থেকেই তার শিখন সম্ভব হয়, সমস্যার সমাধান মেলে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা বাগানের গাছে ফল ঝুলতে দেখে একটি বালক সেটিকে পেতে চায়, যেহেতু ফলটি বালকটির চাহিদা মেটাতে সমর্থ সেহেতু এটি সদর্থক শক্তিসম্পন্ন। বালকটি তার দিকে আকর্ষণ বোধ করে, কিন্তু পাঁচিলের উচ্চতা হল বাধা যার জন্য সেটি তার কাছে নঞর্থক শক্তিসম্পন্ন। বালকটি কয়েকবার পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বর্তমানে শিশুর যে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড সেটি বালককে লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করছে না। তার শিখন সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ বালকটি আবিষ্কার করে যে বাগানের পিছন দিকে যে পাঁচিল রয়েছে সেখানে একটি সংকীর্ণ পথ আছে। সেই পথে সে তার লক্ষ্যে উপনীত হয়। এখানে বালকটি তার পূর্ববর্তী ফিল্ডটির পুনর্বিন্যাস করে একটি নতুন মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের সৃষ্টি করে। যার ফলে বালকটির মধ্যে সমস্যা সমাধানের অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয়। বালকটি শেখে, কাজেই যে প্রক্রিয়ার দ্বারা এই ফিল্ডের পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস করা হয় তাই হল শিখন।

শিখনের ক্ষেত্রে ফিল্ড মতবাদের তাৎপর্য: প্রথমতঃ, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রেষণাই সব বাধাকে দূর করে দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ব্যক্তিকে নূতন আচরণে প্রবৃত্ত করে। শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে প্রেষিত করে তাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করা। দ্বিতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্বিন্যাসের জন্য অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আছে, এই অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ব্যক্তিকে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। যে প্রক্রিয়াটিকে প্রাচীন গেস্টাল্টবাদীরা একেবারে বাতিল করে দেবার পক্ষপাতি। তবে ব্যক্তির মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠনের ফলে সমস্যার সমাধান তখনই দেখা দেয় যখন ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয়। গেস্টাল্টবাদীরা শিখনের মূলে অন্তর্দৃষ্টিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কাজেই গেস্টাল্টতত্ত্বের সঙ্গে ফিল্ডতত্ত্বের পার্থক্য থাকলেও, মিল আছে।

শিখনের বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়সাধন: শিখন সম্পর্কীয় প্রধান প্রধান মতবাদগুলি আমরা আলোচনা করেছি। এখনএকটি প্রশ্ন করা যেতে পারে, এই

মতবাদগুলির মধ্যে কোন্‌টি সঠিক? গেস্টাল্ট পদ্ধতি, প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতি এবং সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি—এই মতবাদগুলির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য, এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতিতেই শিখন হয়ে থাকে। আমরা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখি, আবার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের এবং সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমেও শিখি। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন অবস্থায় কোন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হবে সেটি নির্ভর করে শিখনের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর, শিখন পরিস্থিতির প্রকৃতির উপর এবং শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা ও ক্ষমতার উপর। যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বিষয়টি খুব সহজ, সরল প্রকৃতির, মোটেও জটিল নয়, সেখানে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতিতেই শেখা হয়ে থাকে। যেসব বিষয় শিখতে গেলে স্বতঃস্ফূর্ততার প্রয়োজন, সেখানে এই পদ্ধতিই কার্যকর। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্কুলের অনেক পাঠ্যবিষয় যেমন পড়া, লেখা, বানান অভ্যাস করা সহজে আয়ত্ত করা যায়। বস্তুতঃ, অনেক অভ্যাসমূলক কাজে শিখন এবং প্রাথমিক শিখনের কাজ এই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। যে সব ক্ষেত্রে শিখন পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর কাছে সুনির্দিষ্ট ও সুসম্পর্করূপে প্রতিভাত নয়, যে সব ক্ষেত্রে লক্ষ্য শিক্ষার্থীর কাছে সুসম্পর্করূপে পরিস্ফুট নয়, বা যেখানে শিখন পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অংশ তার প্রত্যক্ষণে ধরা পড়ছে না। যেসব ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী শেখে। কৌশলে শিক্ষা করার ব্যাপারে, যেমন—টাইপ করা, গাড়ী চালান, যন্ত্রপাতি পরিচালন করা, সাঁতার শেখা প্রভৃতি ব্যাপারে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যম শেখে। আর যখন শিখন পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত, এবং লক্ষ্য সম্পর্কেও সে বেশ ভাল ভাবেই জ্ঞাত তখন শিক্ষার্থী অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শেখে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতি ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নাই। প্রথম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের বিষয়টি বাস্তবে ঘটতে দেখা যায় যেহেতু সেটি শিক্ষার্থীর বাহ্য আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেটি বাস্তবে অপ্রকাশিত থেকে শিক্ষার্থীর মানস-স্তরেই শুধু প্রকাশিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে ফিল্ড মতবাদে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা—এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটেছে। যখন শিক্ষার্থীর তার মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুণর্বিন্যাস করে তখন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন প্রক্রিয়ার আশ্রয় তাকে নিতে হয়। কিন্তু ফিল্ডের পুনর্গঠন সমাপ্ত হলেই অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয়।

শিখন পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা ও ক্ষমতার উপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল। কোন শিশু যখন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কোন কিছু শেখে, তখন সেই একই ক্ষমতা অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন কোন বালক তার অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সহজেই সমাধান করতে পারে। আবার সমবুদ্ধিসম্পন্ন দুটি বালকের মধ্যে একটি মানসিক অবস্থা চঞ্চল হওয়ার জন্য বার বার ভুল করতে করতে কোন বিষয় শেখে, কিন্তু অন্য জন মানসিক অবস্থা ধীর স্থির হওয়াতে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সমস্যার অতি সহজেই সমাধান করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন হল শিখনের এই মতবাদগুলির কোন সমন্বয় করা সম্ভব কী? ওয়াসবার্ণ ও মেগ্রোথ (*Washburn and Megroth*) শিখনের তিনটি মতবাদের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁরা শিখন প্রক্রিয়াটিকে উৎপত্তির দিক থেকে বিচার করে কতকগুলি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ, এটিকে শিখনের মতবাদ না বলে শিখনের উৎপত্তিমূলক বর্ণনা (Gene tic Description of Learning) বলা যেতে পারে। তাঁদের মতে শিখন প্রক্রিয়া যে পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে সেগুলি হল (১) সম্পর্ক নিরূপন (Orientation); (২) পরীক্ষণ (Exploration), (৩) সম্প্রসারণ (Elaboration); (৪) পরিস্ফুটন (Articulation), (৫) সরলীকরণ, (Simplification) (৬) যান্ত্রিকীকরণ (Automatisation) এবং পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন (Reorientation); কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে শিক্ষার্থী এই সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করে থাকে।

প্রথম ধাপে শিক্ষার্থী সমস্যাটির স্বরূপটিকে জানতে চায়। দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষার্থী তার অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যাটির সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপায় পরীক্ষা করে দেখে, তৃতীয় ধাপে, সমস্যা সমাধানের জন্য অতীত অভিজ্ঞতা ঠিক কার্যকর হবে না মনে করে তার জ্ঞানকে আরও সম্প্রসারিত করে। এবং চতুর্থ স্তরে সে লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়গুলিকে আরও সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত করতে সচেষ্ট হয়। পরের ধাপে অপ্রয়োজনীয় উপায়গুলি বর্জন করে প্রয়োজনীয় উপায়গুলির উপর মনঃসংযোগ করে, তার পরের ধাপে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াটি বার বার সম্পাদন করে যাতে প্রতিক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়তা অর্জন করে এবং যান্ত্রিক হয়ে পড়ে এবং সর্বশেষ ধাপে নতুন আচরণ ও অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ (generelisation) করে যাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে তাকে আবার প্রয়োগ করা যায়।

ওয়েসবার্ণ এবং মেগ্রোথ-এর মতে শিখনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বিরোধ এসেছে মনোবিজ্ঞানীদের আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, যে সব মনোবিজ্ঞানী উপরে

বর্ণিত সাতটি পর্যায়ের মধ্যে শুধু মাত্র সরলীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়করণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁরা শিখন প্রক্রিয়াকে সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়া রূপে বর্ণনা করতে চান। আবার যে সব মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষণ, সম্প্রসারণ ও পরিস্ফুটনের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে চান তাঁরা শিখন পদ্ধতিকে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতি বলে গণ্য করেন, আর যে সব মনোবিজ্ঞানী সম্পর্ক প্রত্যক্ষণ, ও পূর্ণ সম্পর্ক সন্ধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তাঁরা মনে করেন শিখন অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই হয়।

কাজেই সিদ্ধান্তে একথা বলা যেতে পারে যে কোন মতবাদই শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে শেষ কথা নয়, অর্থাৎ কোন মতবাদই শিখনকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। প্রতিটি মতবাদই শিখন প্রক্রিয়ার কোন বিশেষ দিককে পরিস্ফুট করার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। বস্তুতঃ, কেউ কেউ মনে করেন মনোবিদ্যা এখনও পর্যন্ত শিখনের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ, সুসংগঠিত, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সর্বজন স্বীকৃত বর্ণনা উপস্থাপিত করতে পারেনি।

মাওরারের শিখনের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Mowrer's two factor theory) মাওরার সবরকম শিখনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—সাপেক্ষীকরণ (conditioning) বা উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন (stimulus substitution) এবং (২) সমস্যাসমাধান (Problem solving) বা প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপনে (Response substitution)। সাপেক্ষীকরণের ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন, উদ্দীপক 'খাদ্য' কুকুরের মধ্যে লালাক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে সাপেক্ষীকরণের ফলে উদ্দীপক হল ঘণ্টাধ্বনি। সে কারণে সাপেক্ষীকরণকে উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন বলা হয়।

'সমস্যা সমাধান' নামক শিখনে মাওরার প্রচেষ্টা ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে শিখন এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই দু প্রকার শিখনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক অপরিবর্তিত থাকে। প্রতিক্রিয়াই পরিবর্তিত হয় যেমন, বিড়াল বা শিম্পাঞ্জী উভয়ের ক্ষেত্রে উদ্দীপক ছিল একই অর্থাৎ খাদ্য। কি শিখনের ফলে উভয় ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন গঠিত হয়। সেকারণে এই ধরনে শিখনকে প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাওরারের মতে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতিতে শিখনের জন্য প্রয়োজন হয় সান্নিধ্যে সূত্রটির (Law of contiguity)। পছন্দ, অপছন্দ, অনুরাগ, ক্রোধ, ভয় প্রভৃ প্রক্ষোভসম্পর্কীয় শিখন সাপেক্ষীকরণমূলক শিখনের অন্তর্ভুক্ত। সমস্যা সমাধানের শিখনের জন্য প্রয়োজন হয় ফল লাভের সূত্রটির। অভ্যাস অর্জন, ভাষা শিখ

দেহগত কৌশলে শিখন প্রভৃতি ঐচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সমস্যা সমাধানরূপ শিখনের পর্যায়ভুক্ত। এই কাজগুলি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সংযোগে সম্পন্ন হয়।

মাওরারের তত্ত্বের সাহায্যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে যেসব জিনিষ আমরা শিক্ষা করি তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়।

৫। অনুকরণের সাহায্যে শিখন (Learning by Imitation):

(i) অনুকরণের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of Imitation): কি মানুষ, কি নিম্নতর প্রাণী সকলেই অপরের আচরণ অনুকরণ করে। মানব শিশুর শৈশবের অনেকখানিই সময় কেটে যায় অপরকে অনুকরণ করার ইচ্ছাতে। শিশুর কথা বলা, হাঁটা, খেলাধূলা, পড়া, লেখা প্রায় সব কিছুতেই বয়স্কদের ক্রিয়ার অনুকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

অনুকরণের স্বরূপ ও সংজ্ঞা

অনুকরণ কাকে বলে? অপর ব্যক্তি বা প্রাণীর আচরণের দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে যখন কোন ব্যক্তি বা প্রাণী সেই একই জাতীয় আচরণ করে তখন তার আচরণকে আমরা অনুকরণ বলে থাকি। অধ্যাপক ভ্যালেন-টাইন (*Valentine*) বলেন, 'অনুভাবন প্রক্রিয়া যখন ভাবের সাহায্যে সাধিত না হয়ে ক্রিয়ার সাহায্যে সাধিত হয় তখনই তাকে অনুকরণ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী রস (*Ross*)[1]-এর মতে অনুকরণ হল 'যূথ-প্রবৃত্তির ক্রিয়ামূলক দিক।' অনুকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এ হল যূথচারী প্রাণীদের এক সহজাত প্রবৃত্তি, যার জন্য ব্যক্তিবিশেষ অপরের ক্রিয়াকলাপ নিজের মধ্যে নকল করার চেষ্টা করে।' যথাযথ অনুকরণকে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে; যথা—(১) যে ক্রিয়াকে অনুকরণ করা হচ্ছে, তা অনুকরণকারীর কাছে অপরিচিত হবে। (২) পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই অনুকরণজাত আচরণের প্রকাশ ঘটবে, প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে যেন আচরণ করা না হয়। (৩) যে আচরণ পর্যবেক্ষণ করে অনুকরণ করা হচ্ছে, অনুকরণজাত আচরণ যেন তার একটা পরিচিত অনুলিপি হয়। এই সব শর্তাধীনে যখন শিখন ঘটে তখন তাকে অনুকরণমূলক শিখন বলা চলে।

যথাযথ অনুকরণের শর্ত

---

1. "Imitation proper, the 'doing aspect of gregariousness is the process in virtue of which all the members of a group act together."
—J. S. Ross Groundwork of Educational Psychology, p. 254.

মনোবিজ্ঞানী ড্রেভার (*Drever*) এবং ম্যাকডুগাল (*McDougall*)-এর মতে অনুকরণ হল সহজাত প্রবণতা (innate tendency)। বিশেষ বস্তু বা অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত না হয়ে যে প্রবণতা নিজেকে প্রকাশ করে তাকেই সহজাত প্রবণতা বলে। ছোট ছোট শিশুদের অনুকরণ-প্রবণতা লক্ষ্য করেই তাঁরা এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক (*Thorndike*) অনুকরণকে সহজাত প্রবণতা বলে গণ্য করতে নারাজ। তাঁর মতে অনুকরণমূলক ক্রিয়ার ভিত্তি কোন সহজাত প্রবণতা নয়। অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিখনের উপরই এর ভিত্তি। কিন্তু ম্যাকডুগাল ও ড্রেভার থর্নডাইকের এই অভিমত স্বীকার করতে চান না। ছোট ছেলে যখন অপর ছেলেকে জিভ্ বার করতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে জিভ বার করে করে তখন সে অনুকরণ করেই এ কাজ করে থাকে, কোন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে এই বিষয়টি সে শিক্ষা করেছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু ম্যাকডুগাল ও ড্রেভারের অভিমত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। অনুকরণ কোন সহজাত প্রবৃত্তি বা সহজাত প্রবণতা—এই মতবাদ এখন ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী বোরিং (*Boring*)[1] বলেন, "যখনই সুযোগ আসে তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুকরণ দেখা দেয় না, অনুকরণ বিশেষ অবস্থাতে ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে তার দাদার বল খেলাকেই অনুকরণ করে, কোনমতেই তার ছোট বোনের পুতুল খেলাকে অনুকরণ করে না।"

মনোবিজ্ঞানী বোরিং-এর অভিমতানুযায়ী অনুকরণ হল এমন এক স্পৃহা বা প্রবণতা যা অর্জন করা হয় এবং যা আমাদের কোন উদ্দেশ্য, চাহিদা বা প্রয়োজন মেটায়।

মানুষ শেখে, কখন অনুকরণ করবে আর কখন অনুকরণ করবে না। মানুষ তখনই অনুকরণ করতে শেখে যখন সে বোঝে এ অনুকরণের ফলে সে তৃপ্তি লাভ করবে। কিন্তু যেখানে অনুকরণ করে কোন তৃপ্তি লাভ করা যায় না বা যেখানে অনুকরণ কোন অপ্রীতিকর ফল নিয়ে আসে, সেখানে মানুষ অনুকরণ করার প্রবণতা দেখায় না।

(ii) মানবজীবনে অনুকরণের গুরুত্ব (Importance of imitation in human life) : মানব জীবনে অনুকরণের মূল্য কতখানি বিচার করে দেখা যাক। সাধারণতঃ অনুকরণ-প্রবণতাকে আমরা খুব ভাল চোখে দেখি না। আমরা এর নি

1. C. F. Boring and others, Foundations of Psychology.

করে থাকি। নিছক অনুকরণ বলে জানতে পারলে আমরা তার বিশেষ কোন মূল্য দিই না। কিন্তু তা বলে অনুকরণমাত্রই হেয় একথা বলা যেতে পারে না। অনুকরণ ছাড়া জীবদেহের ক্রমবৃদ্ধি সম্ভব হত না বা জীবদেহ প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারত না। সৎ-অভ্যাস, সমাজ-অনুমোদিত আচরণ, মহৎ আদর্শ এবং উচ্চমানের জীবন-যাত্রা অনুকরণের মাধ্যমেই শিক্ষা করা যেতে পারে। কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক —উভয় প্রকার উন্নতির ক্ষেত্রেই অনুকরণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। উইলিয়াম জেম্‌স (*William James*)-এর কথা উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে যে, "অনুকরণ এবং আবিষ্কার হল দুটি পা, যার সাহায্যে মানুষ হেঁটে বেড়িয়েছে।"[1] আমরা অপরের অভিজ্ঞতার অনুকরণ করে উপকৃত হই। পুরাতন সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং নতুন ধারার বিস্তার, অনুকরণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। যাঁরা আমাদের থেকে উন্নত তাঁদের অনুকরণ করেই আমরা জীবনে উন্নতি লাভ করি। অনেকে মনে করে, অনুকরণ প্রবণতা মৌলিকতা শক্তি বিনষ্ট করে। মৌলিকতা এবং অনুকরণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিকূলতা নেই। নান্ (*Nunn*) বলেন, "অনুকরণ প্রথম অবস্থায় জৈবিক এবং পরে চিন্তামূলক হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রথম স্তর রচনা করে।' অনুকরণের পরিধিকে বাড়িয়ে ব্যক্তিত্ববোধকে উন্নত করা যেতে পারে। যে শ্রেণী বা জাতি শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে খুবই অনগ্রসর তারা উন্নততর শ্রেণী বা জাতিকে অনুকরণ করে নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধন করতে পারে। নেপোলিয়ান তাঁর সেনাপতিদের বলতেন, 'দীর্ঘদিন ধরে একই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করো না। তাহলে দেখবে তুমি তাদের সব যুদ্ধ-কৌশল শিখিয়ে দিয়ে বসে আছ।"

জীবনে অনুকরণের মূল্য

শিশুর অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশ ও বুদ্ধির ক্রমোন্নতি অনুকরণ করার উপর নির্ভর করে। এই কারণেই, বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের মধ্যে অনুকরণ প্রবণতা বেশী। শিশুদের মধ্যে এই অনুকরণ স্পৃহা যদি খুব প্রবল না হত, তাহলে মা, বা অন্যান্য পরিজন শিশুকে এত সহজে কথা বলা, হাঁটা, পড়া প্রভৃতি শেখাতে পারত না। যখন শিশুর দুই কি তিন বছর বয়স, তখন তার মধ্যে এই অনুকরণ প্রবণতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয়। অনুকরণ করাই তখন তার কাছে খেলা হয়ে দাঁড়ায়। রাস্তার এক দল সৈনিককে কুচকাওয়াজ করে যেতে দেখলে

শিশুর জীবনে অনুকরণের স্থান

1. "Imitation and invention are the two legs on which human being has proverbially walked"—William James.

শিশুর দল তার অনুকরণ করে। আবার কোন শিশু রাস্তায় কোন ব্যক্তিকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখে, নিজের লাঠিটাকে ঘোড়া মনে করে অশ্বারোহীর আচরণ অনুকরণ করে। অপরের অনুকরণে শিশু অভিনয় করে, মোটর চালায়, নৌকা চালায়, পুলিসের ভঙ্গীতে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামায়। এই সব ক্রিয়া শিশুকে ভবিষ্যতে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। বস্তুতঃ, সামাজিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে (Social heredity) শিশুর পরিচয় অনুকরণের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। সমাজের সঞ্চিত অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনুকরণের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে শিশু তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়।

সমাজ-জীবনে অনুকরণের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সভ্য সমাজে এই অনুকরণস্পৃহা কি ভাবে বিস্তার লাভ করছে তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। পোশাক পরিচ্ছদ, চলন-বলন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই অনুকরণস্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। আবার সভ্য জাতির উন্নততর জীবনযাত্রা ও সমাজ-ব্যবস্থার অনুকরণে অনগ্রসর দেশগুলি কিভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে বর্তমান যুগের বিভিন্ন জাতিগুলির দিকে তাকালেই তা টের পাওয়া যায়। শিশু কি কি অনুকরণ করছে, তা আমাদের জানা থাকলে কোন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে গড়ে উঠবে তার কিছুটা ধারণা করা যায়।

সমাজ-জীবনে অনুকরণের স্থান

(iii) **অনুকরণের প্রকারভেদ (Types of Imitation):** বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী অনুকরণকে নানাভাবে শ্রেণীবিভক্ত করেছেন। আমরা এইবার এই শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে একে একে আলোচনা করব:

(A) মনোবিজ্ঞানী ড্রেভার অনুকরণ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যথা—

(ক) **প্রাথমিক বা অচেতন এবং অনৈচ্ছিক অনুকরণ:** (Primary or Unconscious and Involuntary Imitation): যখন কোন ব্যক্তি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত না হয়ে অচেতনভাবে অপরের আচরণ অনুকরণ করে তখন তাকে অনৈচ্ছিক বা প্রাথমিক অনুকরণ বলা হয়। এই প্রকার অনুকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার পরিবেশ থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা করে। শিশুর জীবনে এই ধরনের অনুকরণ অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। শিশু অপরকে কাঁদতে দেখে কাঁদে, অপরকে হাসতে দেখে হাসে। শিশুর এই জাতীয় অনুকরণ প্রবণতার সদ্ব্যবহার করতে পারলে শিক্ষক তাকে অনেক কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন।

অচেতন ও সচেতন অনুকরণ

(খ) **সচেতন অনুকরণ** (Deliberate Imitation): এই ধরনের অনুকরণের বেলায় ব্যক্তি তার আদর্শস্থানীয় ব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করে। এই প্রকার অনুকরণ ঐচ্ছিক এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। শৈশবে যেমন প্রাথমিক অনুকরণ বেশীমাত্রায় দেখা যায়, পরিণত জীবনে সচেতন অনুকরণেরই স্থান বেশী। শিশুর ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অচেতন অনুকরণ সচেতন অনুকরণে রূপান্তরিত হয়। শিশু যতই বড় হতে থাকে, ততই অপরকে অনুকরণ করার ভালমন্দ দিকটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার ফলে সে বিচার করে—অপরের কোন আচরণ বা ক্রিয়াকলাপ সে অনুকরণ করবে, কি করবে না।

(B) মনোবিজ্ঞানী ম্যাকড়ুগাল অনুকরণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা—

(ক) **সহানুভূতিমূলক অনুকরণ** (Sympathetic Imitation): কোন মানুষ যখন অপরের অনুভূতিকে অনুকরণ করে কোন ক্রিয়া করে তখন তাকে বলা হয় সহানুভূতিমূলক অনুকরণ। কোন ব্যক্তিকে দুঃখে কাঁদতে দেখে অনেক সময় অপর ব্যক্তিও তার অনুকরণে কাঁদতে শুরু করে বা সুখে হাসতে দেখে তার অনুকরণে হাসতে শুরু করে দেয়। এই ধরনের অনুকরণ হল অচেতন অনুকরণ। ড্রেভারের শ্রেণীবিভাগের প্রথম ধরনের অনুকরণের সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করা যায়।

(খ) **ভাবজ অনুকরণ** (Ideo-motor Imitation): যখন কোন ভাব কোন ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেই অনুকরণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মে পরিণত হয় তখন তাকে বলা হয় ভাবজ অনুকরণ। ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে কোন দর্শক গোলের মুখে বল দেখে নিজের অজ্ঞাতসারেই পা ছোঁড়ে বা সার্কাস খেলোয়াড় যখন দড়ির উপরে নাচতে থাকে তখন সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তারই অনুকরণে কোন কোন দর্শকও দেহকে সঞ্চালিত করতে থাকে।

ম্যাকড়ুগালের শ্রেণীবিভাগ—সহানুভূতিমূলক, ভাবজ ও সচেতন

শিশুদের মধ্যে এ ধরনের অনুকরণ অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। যখন কোন শিশু অপরকে মাথা নাড়তে বা হাততালি দিতে দেখে তখন নিজের অজ্ঞাতসারেই তার অনুকরণ করে সেও মাথা নাড়তে বা হাততালি দিতে থাকে। অনেক সময় শিশু শিক্ষকদের মুখভঙ্গী দেখে তার অনুকরণে মুখভঙ্গী করে। শিশুর শৈশবে যে সকল আচরণ নিত্য নতুন করে থাকে তার বেশীর ভাগই ভাবজ অনুকরণ।

(গ) **সচেতন অনুকরণ** (Deliberate Imitation): এ হল সেই ধরনের অনুকরণ যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আদর্শস্থানীয় মনে করে তাঁর আচরণ

অনুকরণ করে। কোন কোন যুবকের মধ্যে তাদের প্রিয় নায়কদের ভাবভঙ্গী, কথা-বার্তা বা অন্যান্য আচরণ অনুকরণ করার স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল।

ম্যাকডুগাল পূর্বোক্ত তিন প্রকার অনুকরণ ছাড়াও আরও দু প্রকার অনুকরণের কথা উল্লেখ করেছেন—এর মধ্যে প্রথমটি হল এমন এক ধরনের অনুকরণ যা ভাবজ অনুকরণ এবং সচেতন অনুকরণের মধ্যবর্তী। কেউ কেউ একে বলেছেন '*Image Imitation*' এবং আর এক ধরনের অনুকরণ আছে যাকে অর্থহীন অনুকরণ বা '*Meaningless Imitation*' বলা হয়।

এই দুই ধরনের অনুকরণের মধ্যে প্রথমটি দেখা যায় যখন শিশুরা যে আদর্শকে অনুকরণ করেছে সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে অনুকরণ করে যায়। তখন এই অনুকরণ সচেতন অনুকরণ ও ভাবজ অনুকরণের মধ্যবর্তী। অনেক সময় কোন শিশু কোন শিক্ষকের মুখের ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করে। কিন্তু সেই শিক্ষককে আদর্শ মনে করার জন্যই যে সে অজ্ঞাতসারে তাঁকে অনুকরণ করে চলেছে, এ সম্পর্কে সে স্পষ্টভাবে সচেতন থাকে না।

সচেতন ও ভাবজ অনুকরণের মধ্যবর্তী অনুকরণ

অর্থহীন অনুকরণ খুব ছোট ছোট শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই ধরনের অনুকরণ সচেতন নয়, যেহেতু কোন আদর্শকে নকল করার তাৎপর্য সম্পর্কে এ বয়সে সে কিছুতেই অবহিত থাকতে পারে না বা একে ভাবজও বলা যায় না। কারণ কোন ভাবকে সচেতনভাবে কর্মে পরিণত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অর্থহীন অনুকরণ

(C) মনোবিজ্ঞানী কার্কপ্যাট্রিক (*Kirkpatrick*) তাঁর 'Fundamentals of the Child Psychology' গ্রন্থে ক্রমবিকাশের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অনুকরণকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন:

কার্কপ্যাট্রিকের শ্রেণীবিভাগ

(ক) **যান্ত্রিক অনুকরণ** (Reflex Imitation): এই ধরনের অনুকরণ হল বিশেষভাবে সংবেদী এবং এই ধরনের অনুকরণপ্রবণতা শিশুর জন্মাবার এক বছর পর্যন্ত তার মধ্যে বর্তমান থাকে। শিশু অপরের হাসি-কান্না অনুকরণ করে, অপরকে হাই তুলতে দেখলে হাই তোলে। এক বছর পরে এই ধরনের অনুকরণ অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। এই কারণেই অপরকে ভাল বা খারাপ মেজাজে থাকতে দেখলে আমাদের মেজাজও সেরকম হয়ে যায়। অপরকে ভদ্র বা নম্র ব্যবহার করতে দেখলে আমরাও অনুরূপ ব্যবহার করি।

(খ) **স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণ** (Spontaneous Imitation): যখন শিশু বিনা উদ্দেশ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার পরিবেশের সব কিছুকেই অনুকরণ করে চলে তখন

এই ধরনের অনুকরণ দেখা দেয়। রেলের ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ শুনে তার অনুকরণে মুখে ঐরূপ শব্দ করা, বা জাহাজের ভোঁ শব্দ শুনে তার অনুকরণ করা, বা পাখীর ডাক শুনে তার অনুকরণ করা, সবই এই জাতীয় অনুকরণের অন্তর্ভুক্ত। শিশুর মধ্যে তিন থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত এই ধরনের অনুকরণস্পৃহা বর্তমান থাকে।

প্রথম বছরের শেষাংশ থেকেই এই ধরনের অনুকরণ খুব উল্লেখযোগ্যভাবে শিশুর মধ্যে প্রকাশিত হয়। অনেক সময় যান্ত্রিক অনুকরণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এই ধরনের অনুকরণ বিশ্লেষাত্মক বা সংশ্লেষাত্মক নয়। এ হল সব সময় সামগ্রিকভাবে কোন কিছু অনুকরণ করা। এই ধরনের অনুকরণের মাধ্যমে শিশু তার চারপাশের পরিবেশকে নিজের করে নেয়। যা শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে না, তাকে সে অনুকরণও করে না।

(গ) **নাটকীয় অনুকরণ** (Dramatic Imitation): অনুকরণের এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়, শিশু যা কিছু দেখে, শোনে, সবই সে অনুকরণ করে, তবে যেমনটি দেখে শোনে ঠিক তেমনটি নয়, কল্পনায় তাকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়। অনুকরণ করার সময় শিশু নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে। সে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে তার কাল্পনিক অনুকরণের উপাদান সংগ্রহ করে। ছোট মেয়েরা অপরের সংসার করা দেখে নিজের পুতুলদের নিয়ে নতুন ঘর সংসার সাজায়, পুতুলের বিয়ে দেয়। আবার ছেলেরা যুদ্ধের গল্প শুনে নকল যুদ্ধের অভিনয় করে। প্রায় তিন বছর বয়স থেকেই এই ধরনের অনুকরণ শিশুর মধ্যে দেখা দেয় এবং প্রায় সারা জীবন ধরেই চলতে থাকে। তবে চার থেকে সাত বছর বয়সে এই ধরনের অনুকরণ তার পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশ করে।

(ঘ) **ঐচ্ছিক অনুকরণ** (Voluntary Imitation): সচেতন অনুকরণ আর ঐচ্ছিক অনুকরণ, একই প্রকার অনুকরণ প্রক্রিয়া। এই ধরনের অনুকরণের মূলে থাকে শিশুর কোন উদ্দেশ্যসাধনের ইচ্ছা।

এই ধরনের অনুকরণ কম-বেশী বিশ্লেষাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক। লেখা, বাক্য-রচনা করা, শব্দ উচ্চারণ করা, ছবি আঁকা প্রভৃতি ঐচ্ছিক অনুকরণের দৃষ্টান্ত। স্মৃতি প্রতিরূপও (memory image) এই ধরনের অনুকরণ প্রক্রিয়াকে চালিত করে। শিশুর দুই কি তিন বছর বয়স থেকে এই ধরনের অনুকরণ শুরু হলেও এর পরিণত রূপ দেখা দেয় আরও বেশ কয়েক বছর পরে। কিভাবে অনুকরণ করা হচ্ছে, অর্থাৎ অনুকরণ পদ্ধতির উপরই এই ধরনের অনুকরণের সফলতা নির্ভর করে।

(ঙ) **আদর্শের অনুকরণ** (Idealistic Imitation): শিশুর অনুকরণ প্রবণতার ক্রমবিকাশের সর্বশেষ স্তর হল এটি। এই স্তরে শিশু সেই রকম কোন আদর্শকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে, যে আদর্শকে শিশু যুক্তিযুক্ত বা অনুকরণের যোগ্য মনে করে। যে কোন ধারণাই (concept) আদর্শের কাজ করতে পারে। ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও সৌন্দর্য সম্পর্কীয় আদর্শের যে প্রকাশ বাস্তবে ঘটে, তার থেকেই শিশু তার আদর্শের ধারণা গঠন করে এবং তাকে অনুকরণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। যেমন, কোন শিশু কোন ব্যক্তির জীবনকে আদর্শস্থানীয় মনে করে তার অনুকরণ করার চেষ্টা করতে পারে, কোন ছাত্রের শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে আদর্শ-স্থানীয় মনে করে তার অনুকরণে সচেষ্ট হতে পারে। শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা তার মধ্যে আসে, তখনই এই ধরনের অনুকরণের নানাবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

খুব ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত। একটু বয়স্ক শিশুদের অনুকরণ হওয়া উচিত ঐচ্ছিক বা সচেতন, এবং বয়স বৃদ্ধি পেলে শিশুদের ক্ষেত্রে অনুকরণ হবে বিশ্লেষাত্মক বা নির্দিষ্ট পথে নিয়মানুযায়ী সচেতনধর্মী।

মনোবিজ্ঞানী স্টাউট (*Stout*) দুই ধরনের অনুকরণের কথা বলেছেন—(ক) **প্রক্ষেপক অনুকরণ** (Projective Imitation) এবং (খ) **নিক্ষেপক অনুকরণ** (Ejective Imitation)।

প্রক্ষেপক ও নিক্ষেপক অনুকরণ

প্রথম ধরনের অনুকরণের ক্ষেত্রে অনুকরণকারী তার আদর্শের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় ধরনের অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারীর মনে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগে। প্রথম ধরনের অনুকরণের বেলায় অনুকরণ ততখানি সঠিক হয় না। অনুকরণকারী উপলব্ধি করে যে, সঠিক অনুকরণ করার ক্ষমতা তার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারী যাকে অনুকরণ করতে চায় তাকে সফলভাবে অনুকরণ করতে পারে। এই অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারী অপরের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতাগুলিকে আরোপ করে; তাকে অনুকরণ করার ক্ষমতা অনুকরণকারীর নেই, একথা সে কখনও ভাবে না। প্রক্ষেপক অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারী গ্রহণক্ষম, অনুগত এবং বিনীত; কিন্তু নিক্ষেপক অনুকরণের বেলায় অনুকরণকারীর মধ্যে আক্রমণাত্মক, দাম্ভিক এবং আত্মপরিতুষ্টির ভাব বর্তমান থাকে। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই দ্বিতীয় ধরনের অনুকরণ-স্পৃহা তার মধ্যে বাড়তে থাকে। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভীতি ভাব থেকে নিজেদের তাদের সমতুল

মনে করার ইচ্ছা জাগে। অবশ্য বয়স্ক শিশুদের বেলায় এই অনুকরণ-প্রবণতা দেখা দেয়, খুব ছোট ছোট শিশুদের বেলায় এরকম পরিলক্ষিত হয় না।

মনোবিজ্ঞানী বোরিং শিখনের দিক থেকে তিন ধরনের অনুকরণের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) **সরল অনুকরণ** (Simple Imitation), (২) **পরস্পর নির্ভরশীল আচরণ** বা **অনুকরণ** (Matched dependent Behaviour) এবং (৩) **নকল অনুকরণ** (Copying Imitation)।

সরল অনুকরণ, পরস্পর নির্ভরশীল অনুকরণ ও নকল অনুকরণ

শিশু ভাষা আয়ত্ত করতে গিয়ে যে অনুকরণের আশ্রয় গ্রহণ করে তা হল সরল অনুকরণ। পরস্পর নির্ভরশীল অনুকরণের উদ্ভব ঘটে থাকে আকস্মিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে। সিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ শুনেই তারক দৌড়তে শুরু করে, কারণ, সে জানে বাবা টফি নিয়ে এসেছেন। তারককে দৌড়তে দেখে তিতুও তার অনুকরণ করে, ফলে তার ভাগ্যেও টফি জোটে। পরবর্তীকালে যখনই তারককে দৌড়তে দেখে, তিতু তার অনুকরণ করে, যদিও কেন দৌড়োচ্ছে তার সঠিক উদ্দেশ্য তার জানা নেই।

নকলের বেলায় কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার পর তার মাধ্যমে কোন কিছু অনুকরণ করে, কিন্তু কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তার অনুকরণ সঠিক হচ্ছে বা হচ্ছে না তা সে জানে না। তাই এই ধরনের অনুকরণের ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থেকে তার অনুকরণের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে পারেন এবং ভবিষ্যতে অন্য ব্যক্তির মধ্যস্থতা ছাড়াও যাতে সে অনুকরণ করতে পারে তার জন্য তাকে সহায়তা করা প্রয়োজন। যেমন, কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার পর, কখন অনুষ্ঠানে দাঁড়াতে হবে, বা বসতে হবে কোন ব্যক্তির জানা না থাকলে সে অপর ব্যক্তিদের আচরণ নকল করে, তাদের দেখাদেখি দাড়ায় বা বসে। বিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে অবশ্য পরে অনুকরণকারী যথাযথ প্রতিক্রিয়া করতে শিক্ষা করে।

(iv) শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের গুরুত্ব (Importance of Imitation in Education) : শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না। যুবক, বৃদ্ধ মাত্রই অনুকরণের মাধ্যমে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করে। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মনের ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে শিশু অনুকরণের মাধ্যমে সব কিছুই শেখে। সচেতন বা অনৈচ্ছিক অনুকরণের (spontaneous or unconscious imitation) সহায়তায়

শিক্ষার ক্ষেত্রে অচেতন অনুকরণের গুরুত্ব

শিশু অনেক বিষয় শিক্ষা করে। শিশুর জীবনে অচেতন বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুকরণের গুরুত্ব সচেতন অনুকরণের তুলনায় অনেক বেশী, কেননা, সচেতন অনুকরণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং এই অনুকরণ করে একটু বেশি বয়সে। তাই শিক্ষকের উচিত হবে খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া। মাদাম মন্টেসরী (*Madam Montessori*) তাঁর শিক্ষা-সম্পর্কীয় পরিকল্পনায় এই ধরনের অনুকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিশুর উপর সুন্দর পরিবেশের প্রভাব

শিশুকে যদি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে রাখা হয় তাহলে শিশু তার পরিবেশের ভাল জিনিসগুলি অনুকরণ করবে এবং তার চরিত্রও সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে; কিন্তু যদি শিশুকে নোংরা, কদর্য পরিবেশে রাখা হয় তাহলে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সে অসামাজিক আচার আচরণ অনুকরণ করে নিজের চরিত্রকে কলুষিত করবে। বেশ সুন্দর ভদ্র পরিবারের শিশুরা আচার-ব্যবহারে ভদ্র, শিষ্ট ও নম্র হয়। তার কারণ পারিবারিক পরিবেশ তাদের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শিশু পারিবারিক পরিবেশ থেকে যা কিছু ভাল ও সুন্দর তার অনুকরণ করে ভদ্র, শিষ্ট, নম্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বভাব-বিশিষ্ট ও অনুগত হয়। এই কারণেই পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ খুব সুন্দর হওয়া দরকার যাতে শিশু সচেতন ভাবে সৎ জিনিসগুলি অনুকরণ করে নিজের জীবনকে সৎ পথে চালিত করতে পারে। শিশুর অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও কর্তব্য শিশুর সামনে সৎ আদর্শ, সৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা ও যথাযথ আচরণ করা যেগুলিকে শিশু সহজেই অনুকরণ করে নিজের চরিত্র গঠনে প্রয়াসী হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক বা সচেতন অনুকরণের (deliberate imitation) **গুরুত্বও** কম নয়। শিশু শিক্ষককে অনুকরণ করে শব্দের নির্ভুল উচ্চারণ করতে শেখে, হাতের লেখা সুন্দর করতে শেখে, সুন্দর করে আঁকতে শেখে, গানবাজনা, খেলাধূলার দক্ষতা অর্জন করতে শেখে বা অন্যান্য কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে। ঐচ্ছিক বা সচেতন অনুকরণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তার অপেক্ষা উন্নততর কোন ব্যক্তিকে অনুকরণ করে। কাজেই শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর সামনে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং অনুকরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করতে পারেন তাহলে ছাত্ররা তাঁর সৎ গুণ ও আচার ব্যবহার অনুকরণে প্রয়াসী হবে।

অনুকরণ-স্পৃহা আবিষ্কারের স্পৃহা জাগ্রত করে। অনুকরণের পথ ধরে অগ্রসর হতে হতেই শিক্ষার্থীর মনে জাগবে নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। এ ছাড়া অনুকরণ-প্রবণতা শিশুর মনে সমাজ-চেতনার সঞ্চার করে।

সমাজের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি, সৎ আদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদি অনুকরণের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়।

অতীতে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর অনুকরণ-প্রবণতার উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হত। কিন্তু শিক্ষা বলতে যদি অপরের নিছক অনুকরণ বোঝায় তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন গবেষণা ও সৃজনশীলতার পথ রুদ্ধ হবে। এ মত মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ্ অনুকরণ প্রবণতাকে হেয় চক্ষে দেখে থাকেন, যেহেতু এই প্রবণতা মৌলিকতা নষ্ট করে দেয়। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। সামাজিক প্রগতি একদিনে সম্ভব হয় নি। মানুষ প্রথমে অতীতকে অনুকরণ করেছে, তারপর নতুনকে আবিষ্কার করেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে এই সত্য সহজেই প্রমাণিত হয়। কোন বৈজ্ঞানিক অতীতের সূত্র ধরে প্রথমে অগ্রসর হয়েছেন, তাদের ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন এবং তারপর নিজের পদ্ধতি অনুকরণ করে নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের উপাদান বাড়িয়ে গেছেন।

অনুকরণ মৌলিকতা নষ্ট করে না

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী রস্[1] (*Ross*)-এর ভাষায়, "কোন আইনস্টাইনকে যদি নিউটনের চিন্তার অগ্রগতিসাধন করতে হয় তাহলে প্রথমে তাঁকে তাঁর অনুকরণ করতে হবে"। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী রসের মতে ছাত্রদের ভাল জিনিস অনুকরণ করতে দেখার সময় আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু ছাত্ররা যাতে অনুকরণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে ধারণা না করে তার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তাঁর ভাষায়, 'Imitation is only the process to original self-expression অর্থাৎ, "অনুকরণ মৌলিক আত্মপ্রকাশের উপায় মাত্র"[2]। সৃষ্টিমূলক আত্মবিকাশের উপায়রূপেই অনুকরণকে গণ্য করতে হবে। অনেক মৌলিক চিন্তাবিদ ও প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁদের পূর্বসূরীদের অনুকরণ করে যে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছেন, শিক্ষাবিদ নান্ও[3] (*Nunn*) তা স্বীকার করেছেন।

৬। শিখন ও প্রেষণা (Learning and Motivation) :

প্রেষণা কাকে বলে? উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হলে যে সক্রিয় বা গতিশীল অবস্থার (dynamic state) সৃষ্টি হয় তাকে প্রেষণা (Motivation) বলে। এই

1. "An Einstin must first imitate the thought of a Newton before he can advance upon it,"—J. S. Ross : Groundwork of Educational Psychology, Page 253.

2. Ibid, Page 255.

3. "The most original minds find themselves only in playing the sedulous ape to others who have gone before them along the same path of the self-assertion." —Nunn, Education : Its Data and First Principles, Page 157.

অবস্থায় উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য মনে তীব্র অনুরাগ, আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছার উদয় হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই জাতীয় অবস্থা চলতে থাকে। ম্যাকগিয়ক (*McGeoch*) প্রেষণার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "প্রেষণা হল ব্যক্তির যে কোন অবস্থা যা তাকে একটি প্রদত্ত কাজের অনুশীলনের জন্য নির্দেশ দেয় এবং যা তার কর্মতৎপরতার প্রাচুর্য ও পরিসমাপ্তি নিরূপণ করে।"[1]

প্রেষণার স্বরূপ

প্রেষণা শিক্ষার এক অতি আবশ্যকীয় শর্ত। শিখনকে বর্তমানে সক্রিয় প্রক্রিয়ারূপেই গণ্য করা হয়। শিখন নিষ্ক্রিয় জ্ঞান সঞ্চয়ন নয় বা বিষয়ের যথাযথ পুনরুল্লেখের জন্য কোন বই পড়া বা বক্তৃতা শোনা নয়। যথার্থ শিখন হল অভিজ্ঞতার পরিপুষ্টিসাধন। শিখন হল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবের আচরণে পরিবর্তন আনা। শিখনের ক্ষেত্রে জীবদেহের সঙ্গে বাহ্য-পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জীবদেহ বাহ্য-পরিবেশের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। এবং বাহ্য-পরিবেশের উদ্দেশ্যে জীবদেহই প্রতিক্রিয়া করে। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে যখন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রূপান্তর ঘটে তখনই শিখন ঘটে। শিখনপ্রক্রিয়ার তিনটি শর্ত বা উপাদান আছে; (১) মনস্তাত্ত্বিক উপাদান (Psychological factor), (২) দৈহিক উপাদান (Physiological factor) এবং (৩) পরিবেশগত উপাদান (Environmental factor)। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানই হল প্রেষণা। প্রেষণা হল শিখন-প্রক্রিয়ার কেন্দ্র-স্বরূপ (Motivation is the very heart of the learning process)। শিখনের জন্য যে সক্রিয়তার প্রয়োজন প্রেষণা তাকে জাগরিত করে, এই সক্রিয়তাকে শিখন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত করে এবং তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করে। উপযুক্ত প্রেষণা শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে, তার মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং পরিশ্রম করার জন্য তাকে উৎসাহিত করে।

শিখন-প্রক্রিয়ার তিনটি শর্ত—(১) মনস্তাত্ত্বিক (২) দৈহিক এবং (৩) পরিবেশগত

মানুষের শিখন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি প্রেষণার উপর বিশেষ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

(i) **আকাঙ্ক্ষার স্তর (Level of Aspiration):** অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে শিখনের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে ব্যক্তির

1. "Any condition of individual which points or orients him towards the practice of a given task and which defines the adequacy of the activities and the completion of the task."
—J. A. McGeoch : The Psychology of Human Learning, Page 27.

আকাঙ্ক্ষার উপর। এই আকাঙ্ক্ষা যতই উচ্চ হয়, প্রেষণাও ততই বলবতী হয়। আবার অতীত সফলতার অভিজ্ঞতাও মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির নিজের সামর্থ সম্পর্কে সচেতনতা, অতীতের সাফল্য ও বিফলতা সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শিক অবস্থা এই আকাঙ্ক্ষার স্তর নির্ধারণ করে।

(ii) **শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ** (The Intention to learning): প্রেষণার শক্তি তীব্র হলেই চলবে না, শিখনের আগ্রহ মানুষের শিখন-প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং আগ্রহ না থাকলে শিখন সম্ভব নয়।

(iii) **প্রয়োগ-দৃষ্টিভঙ্গী** (Pragmatic outlook): শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিষয়টিও প্রেষণার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যবহারিক চাহিদা ও সমাধান করার প্রয়োগমূলক দিক শিখনের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে।

প্রেষণা শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করে

যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ নেই তার মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা, বা আগ্রহ থাকলেও যেখানে অনুভূতি অত্যন্ত ক্ষীণ, সেক্ষেত্রে তাকে তীব্র করে তোলা বা যেখানে আগ্রহ রয়েছে, তার যথাযথ অনুশীলনে সহায়তা করাই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা। মানুষের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হল কোন লক্ষ্যসাধন করা। মানুষের প্রতি কাজেই প্রেষণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সব শিক্ষারই উদ্দেশ্য কোন লক্ষ্য সাধন করা, সেহেতু সব শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রেষণার আবশ্যকতা রয়েছে। কাজেই যে কোন শিখনের ক্ষেত্রে যাতে যথোপযুক্ত প্রেষণা উপস্থিত থাকে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। কারণ, প্রেষণার তীব্রতা, লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টতা প্রভৃতির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি শিখন-প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ আনয়ন করে। শিক্ষকের কাজই হল কার্যকর বা সার্থক শিখনের শর্তগুলির উন্নয়ন সাধন করা। প্রেষণার সাহায্যেই সে কাজ সাধিত হতে পারে।

প্রেষণা ও প্রবোচকদের মধ্যে প্রভেদ

শিখনের জন্য প্রেষণা ছাড়াও আরও একটি বিষয়ের প্রয়োজন, সেটি হল প্রবোচক (incentive)। প্রেষণা ও প্রবোচক সমার্থক শব্দ নয়। প্রবোচক হল বস্তু বা অবস্থা যার সংস্পর্শে প্রেষণা কার্যকর হয়। উডওয়ার্থের মতে উদ্দেশ্য থাকে ব্যক্তির মধ্যে আর প্রবোচক থাকে বাইরে। প্রবোচক হল লক্ষ্যবস্তু (goal-object), যেটি উদ্দেশ্যের উপরে প্রভাব বিস্তার করে উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত করে। প্রবোচক লক্ষ্য নয়। তবে প্রবোচক লক্ষ্যে উপনীত হবার আগ্রহ বৃদ্ধি করে। যেমন—কোন

খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হল প্রবোচক। কিন্তু উদ্দেশ্য হতে পারে শুধু মাত্র জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা। যথাযথ শিখনের জন্য প্রেষণা ও প্রবোচক উভয়েরই প্রয়োজন।

প্রেষণা দুপ্রকারের হতে পারে—(১) অভ্যন্তরীণ (intrinsic) এবং (২) বাহ্যিক (extrinsic)। শিখনের বিষয় যখন শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সেটি শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থী যে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ অনুভব করে তাকেই বলা হয় আভ্যন্তরীণ প্রেষণা। শিখনই শিখনের একমাত্র পুরস্কার—এই বোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগে। শিখন-প্রক্রিয়ার মধ্যেই আগ্রহ নিহিত থাকে যা শিক্ষার্থীকে তার কাজের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। প্রেষণার এই দিকটি জাগিয়ে তোলার জন্য শিক্ষকের উচিত বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা পাঠ্যবিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং লক্ষ্য রাখা যাতে শিখনের বিষয়টি শিক্ষার্থীর সামর্থ ও ক্ষমতার বাইরে চলে না যায়। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ প্রেষণা সৃষ্টি করাই শিক্ষকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই অভ্যন্তরীণ প্রেষণা জাগ্রত হলে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখনের পথে অগ্রসর হতে থাকবে, স্বয়ং-শিখনের (self-learning) দিকে শিক্ষার্থীর প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষার্থী শিক্ষায় মনোনিবেশ করবে।

প্রেষণা দু প্রকার—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

যখন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের জন্য এই স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ এবং আনন্দ বর্তমান থাকবে না, তখন বাহ্য-প্রেষণার (external motivation) সহায়তায় শিক্ষণকার্যকে চালিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি বুদ্ধিগত অপরিপক্কতা এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে চেতনার অভাব দেখা হয় তাহলে অভ্যন্তরীণ প্রেষণা কার্যকর হবে না। তখনই প্রয়োজন বাহ্যিক প্রেষণার। এটাকে বাহ্যিক বলার কারণ, এটি শিখন-প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে না। বাহ্য-প্রবোচকের সহায়তায় তার মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করতে হয় যাতে শিক্ষণীয় বিষয়টির প্রতি তার আগ্রহ জাগে। বাহ্যিক প্রেষণা কৃত্রিম, এরূপ ধারণা করলে ভুল করা হবে। শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা বা প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই একে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্যে একে প্রবিষ্ট করিয়েই একে কার্যকর করে তোলা যেতে পারে। যেসব বাহ্য-প্রবোচকের সহায়তায় শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করা হয় তার মধ্যে যেগুলি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ তার উল্লেখ করা হচ্ছে :

বাহ্য-প্রেষণা

(ক) প্রশংসা (Praise) : জীবনের সর্বস্তরে প্রশংসা বেশ ভালরকম প্রবোচকের কাজ করে। তবে প্রশংসা যখন শিক্ষার্থীর যথার্থ প্রাপ্য, তখন তাকে প্রশংসা করতে

হবে। যাঁরা প্রশংসা করছেন তাঁদের উপরেই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। শিক্ষার্থীরা যাঁদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, প্রশংসা যদি তাঁদের কাছ থেকেই আসে তাহলে তা প্ররোচক হিসেবে ফলপ্রসূ হয়। এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, সাধারণ মানের বা নিম্নমানের শিশুদের ক্ষেত্রেই এটি কার্যকর হয়, কিন্তু উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের বেলায় এটি খুব ফলপ্রদ হয় না। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের উপরে প্রশংসা বা ভর্ৎসনা কিভাবে কাজ করে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই একে প্ররোচক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। যাদের শক্তি বা সামর্থ কম তাদের সামান্য-তম কৃতিত্বের জন্যও প্রশংসা করতে হবে। কিন্তু যাদের সামর্থ ও শক্তি বেশি তাদের দুরূহ কষ্ট সম্পাদনের জন্যই প্রশংসা করতে হবে।

(খ) নিন্দা (Blame): অনেক ক্ষেত্রে নিন্দা বেশ কার্যকর প্ররোচক। অবশ্য প্রশংসার মতো নিন্দাও তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তা শিক্ষার যথার্থ প্রাপ্য। চটপট যারা শিখতে পারে না বা যাদের মেধা খুব তীক্ষ্ণ নয়, তাদের ক্ষেত্রে নিন্দা ততখানি কার্যকর হয় না; হয়ত এই কারণেই যে প্রায় সব সময়ই তারা তাদের হতাশজনক কার্যের জন্য নিন্দিত হচ্ছে। কিন্তু মেধাবী ছাত্রদের ক্ষেত্রে নিন্দা বেশ কার্যকর প্ররোচক। আবার নিন্দার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। যারা অন্তর্মুখী (introvert) তাদের ক্ষেত্রে প্রশংসা বেশী কার্যকর হয়, আর যারা বহির্মুখী (extro-vert) তাদের ক্ষেত্রে নিন্দা বেশী কার্যকর হয়। কাজেই নিন্দা করার পূর্বে শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি কিরূপ তা নিরূপণ করা।

(গ) পুরস্কার (Reward): পুরস্কার এবং শাস্তি, প্রশংসা ও নিন্দারই মূর্ত রূপ এবং প্রেষণা সৃষ্টি করার জন্য প্ররোচক হিসেবে এগুলি খুব বাঞ্ছিত নয়।

পুরস্কার দুরকমের হতে পারে। কোন প্রতীক বা চিহ্ন। যেমন—মেডেল, কাপ, ব্যাজ প্রভৃতি। এগুলি কৃতিত্ব ও সম্মানলাভের পরিচায়ক। পুরস্কার নিছক জড় বস্তুও হতে পারে—যেমন অর্থ। যদিও পুরস্কার অনেক ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্ররোচকের কাজ করে তবু শিক্ষাবিদ্‌রা পুরস্কারের সহায়তায় প্রেষণা সৃষ্টি করার পক্ষপাতী নন। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পুরস্কার পাবার পর পূর্বের কর্ম প্রেরণা আর শিক্ষার্থীর মধ্যে তেমন দেখা যায় না। সে কারণে পুরস্কার দেওয়া হলেও শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীকে তার অধিকতর উপযুক্ততা ও জ্ঞানের কথা এবং তার বর্ধিত সামাজিক মর্যাদার কথা মনে করিয়ে দেওয়া, যার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কারের সাহায্যে প্রেষণা সৃষ্টি করার মধ্যে বিপদও আছে। *Hart-shorne* এবং *May* বিদ্যালয়ের শিশুদের সাধুতা সম্পর্কে একটি পরীক্ষণ কার্য চালিয়ে দেখলেন যে,

একদল শিশু যাদের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সাধু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করা হয়েছিল তারা সাধারণ শিশুদের তুলনায় অনেক বেশী অসাধু। পুরস্কারের প্রেষণা তাদের মধ্যে এত প্রবল হয়েছিল যে সাধুতার পুরস্কার লাভ করার জন্য তারা অসাধু উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করে নি।

(ঘ) শাস্তি (Punishment) : কোন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আচরণে পরিবর্তন আনার জন্য তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়াই হল শাস্তি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগ করার প্রথা খুবই প্রাচীন। শারীরিক কষ্টের ও মর্যাদাহানির ভীতির উপরেই এর ভিত্তি। ভীতি হল খুব শক্তিশালী প্রেষণা সে কারণে শাস্তি-প্রয়োগে অনেক সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কঠোর শাস্তি বা সামান্য কারণে শাস্তি-প্রদান অনেক সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিহিংসা, ক্রোধ ও শত্রুতার ভাব সঞ্চার করে এবং শিক্ষণীয় বিষয়কে এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া, ভীতির ভাব কেটে গেলে শাস্তি তার বাঞ্ছিত ফলদানে ব্যর্থ হয়।

(ঙ) যোগ্যতা অনুসারে বিন্যাসকরণ ও নম্বর-প্রদান (Grade and Mark) : অনেক শিক্ষাবিদ যোগ্যতার ক্রমানুসারে শিক্ষার্থীর নাম সাজাবার ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন না, যেহেতু এ ব্যবস্থা পুরস্কার দেওয়া ব্যবস্থারই অনুরূপ। কিন্তু বিচক্ষণতার সঙ্গে যদি এই কার্য সমাধা করা হয় তাহলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণার সঞ্চার করা যেতে পারে। একই নীতির ভিত্তিতে যদি শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ক্রমানুসারে সাজান হয় তাহলে কয়েকজন শিক্ষার্থী অতি সহজেই অপর শিক্ষার্থীর তুলনায় নিজেদের যোগ্যতর প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে, ফলে তাদের অভ্যাস ও আচরণের মধ্যে কৃত্রিমতার আবির্ভাব ঘটতে পারে। অপরদিকে কোন কোন শিক্ষার্থী নিজেদের সাফল্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে এতই হতাশ হয়ে পড়বে যে তাদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ দেখা দেবে এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতিও জাগবে তাদের দুর্বার বিতৃষ্ণা। কিন্তু শিক্ষার্থীর সামর্থ, তার শারীরিক ও মানসিক অন্যান্য অবস্থার বিবেচনার ভিত্তিতে যদি এই ক্রমবিন্যাসকরণের ব্যবস্থাকে কার্যকর রূপ দেওয়া হয়, তাহলে তা ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঞ্চার করতে পারে।

যোগ্যতার ক্রমানুসারে সাজান এবং নম্বর দেওয়া

(চ) ক্রমোন্নতি সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge of Progress) : কতটুকু উন্নতি হল এ সম্পর্কে যদি শিক্ষার্থী অবহিত হয়, তাহলে তার সেই জ্ঞান প্রেষণা সঞ্চার করার ব্যাপারে শক্তিশালী প্ররোচকের কাজ করতে পারে। যে ছাত্রকে

শিক্ষক তার উন্নতি সম্পর্কে অবহিত রাখেন, আরও পরিশ্রম ও উন্নতি করার জন্য তার মধ্যে আগ্রহ জাগে। এই সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে যে ফল পাওয়া গেছে তা পূর্ব অভিমতই সমর্থন করে। এই কারণেই প্রতিটি ছাত্রের, কার কতটুকু উন্নতি হচ্ছে, তা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থার অপরিসীম মূল্য আছে। নানাভাবে শিক্ষক ছাত্রকে তার সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। ইতিপূর্বে যোগ্যতার ক্রমানুসারে নাম সাজাবার যে ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারাও এই কার্য সাধিত হতে পারে। ছাত্রের উন্নতি সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করার ব্যবস্থা, প্রশংসা, ছাত্র-শিক্ষক আলোচনার ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির তালিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণার সঞ্চার করা যায়।

(ছ) **সাফল্য** (Success)ঃ সফলতা, নৈপুণ্য বা দক্ষতা প্রভৃতিও কাজের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহের সঞ্চার করে। প্রতি ছাত্র তার নিজ নিজ স্তরে যাতে সফলতা অর্জন করতে পারে, শিক্ষণীয় বিষয়কে সে ভাবেই শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থিত করা দরকার। সফলতাই ছাত্রের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। এই আত্মবিশ্বাসই ছাত্রকে নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করে।

(জ) **প্রতিযোগিতা** (Competition)ঃ কোন কোন অবস্থায় প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রেষণা সঞ্চারের ব্যাপারে বেশ কার্যকর প্ররোচক। যে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শত্রুতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা জাগিয়ে তোলে সে রকম প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত না করে, সুস্থ ও বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দানই শিক্ষকের কর্তব্য। তাছাড়া, প্রতিযোগীদের মধ্যে কিছুটা সততা না থাকলে, প্রতিযোগিতা ফলপ্রসূ হয় না। একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত। প্রত্যেক প্রতিযোগীরই যেন জয়লাভের সম্ভাবনা থাকে। প্রতিযোগিতা তিন প্রকারের হতে পারে—ব্যক্তিগত, দলগত এবং আত্মপ্রতিযোগিতা। আত্মপ্রতিযোগিতা বা নিজের কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও বাঞ্ছিত প্রচেষ্টা। এই প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থী নিজের পূর্বেকার যোগ্যতাকে অতিক্রম করে অধিকতর যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য সচেষ্ট হয়।

এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতার ভাব শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চার করাই হবে শিক্ষকেব একমাত্র কর্তব্য। প্রতিযোগিতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলে শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য বিফল হবে। যদিও একাধিক গবেষণামূলক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, প্রতিযোগিতা প্রেষণা সৃষ্টি করার ব্যাপারে বেশ কার্যকর প্ররোচক, তবুও শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এটিকে প্রয়োগ করার সময় এই

পদ্ধতির অনুভূতিমূলক এবং সামাজিক ফলাফলগুলি শিক্ষকের ভাল করে বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য।

(ঝ) নতুনত্ব (Novelty)ঃ পরিচিতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে নতুনত্ব বা অভিনবত্ব সৃষ্টিতেও উপযুক্ত প্রেষণার সঞ্চার ঘটে। বৈচিত্র্যই জীবনের ধর্ম—শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উক্তির যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য কম নয়। শিক্ষণীয় বিষয়কে যদি শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীর করে তুলতে হয়, তাহলে শিখনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

(ঞ) শ্রবণ ও দৃষ্টি গ্রাহ্য সহায়ক উপকরণ (Audio-visual aids)ঃ শিখনকার্যে প্রেষণা সঞ্চার করাব জন্য বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে সহায়তা করে এরূপ উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যা করা হচ্ছে তা যদি চোখে দেখা যায় তাহলে সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে না এবং করণীয় কার্যকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে। এগুলি প্রেষণাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলে। শিক্ষাগ্রহণ কালে সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, পরীক্ষণাগার, কারখানা প্রভৃতির ব্যবহার প্রেষণা সঞ্চারে যথেষ্ট সহায়তা করে।

(ট) আকাঙ্ক্ষার স্তর (Level of Aspiration)ঃ যদিও প্রেষণা সঞ্চার করার ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষার স্তরের কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই, তবু এর সঙ্গে প্রেষণার নিগূঢ় সম্পর্ক আছে বলে, এর আলোচনার প্রয়োজন আছে। অনেক ছাত্র রয়েছে যারা অঙ্ক, ইংরেজী ভাল বোঝে না। কেন তারা বোঝার চেষ্টা করে না, তা জানতে হলে শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষার স্তর সম্পর্কে শিক্ষকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আকাঙ্ক্ষার স্তর বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর লক্ষ্য বা কার্যের গুরুত্বতা। এটি একই সঙ্গে প্রেষণার উপাদান এবং অন্য একটি প্রেষণার ফলশ্রুতি। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষার্থীর লক্ষ্য যেন এমন না হয়, যা তার আয়ত্তের বাইরে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ছাত্রদের কাছে এমনভাবে উপস্থিত করতে হবে, য শিক্ষার্থীর সামর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোন শিক্ষার্থী অধিকতর সামর্থের পরিচয় দেওয়া মাত্রই তাকে অঙ্ক, ভাষা বা অন্যান্য কোন বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার জন্য শিক্ষকের ব্যস্ত হওয়া সমীচীন হবে না। শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষার স্তর যথাযোগ্যভাবে নিরূপিত হলেই প্রেষণা কার্যকর হয়।

৮। শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার কার্য (Functions of Motives in the Learning Process)ঃ

মনোবিজ্ঞানী গেট্স (*Gates*)-এর অভিমতানুসারে শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার কার্য হল তিনটি। যথা—

(ক) **প্রেষণা কার্যে শক্তি সঞ্চার করে :** শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার হলে তার মধ্যে অধিকতর শক্তি সঞ্চারিত হয়, শিক্ষার্থীর উদ্যম বাড়ে, তার মধ্যে কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ক্ষুধা বা তৃষ্ণার সময় পেশী ও গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। প্রশংসা, নিন্দা, পুরস্কার, শাস্তি, অর্থ প্রভৃতি শক্তিশালী প্রেষণা সৃষ্টিকারী প্ররোচক। এই সব প্ররোচকের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থী বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া করে এবং এই সব প্ররোচক শিখনকার্যে সহায়তা করে। কোন কোন সময় বাহ্য-প্ররোচকের সহায়তায় শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা হলেও শিক্ষার্থীর বাহ্য-প্রেষণা অভ্যন্তরীণ প্রেষণায় রূপান্তরিত হয়। কোন পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে কোন শিক্ষার্থীকে একটি পুস্তক পড়ার জন্য উৎসাহিত করা হল, কিন্তু শিক্ষার্থী সেই বই পড়ে যদি আনন্দ পায় বা অন্য কোন কার্য সমাধানের জন্য সেই পুস্তকের জ্ঞান প্রয়োজনীয় মনে করে স্বাভাবিকভাবেই বইটি পড়ার জন্য সে আগ্রহশীল হয়ে উঠে, সেক্ষেত্রে বাহ্যপ্ররোচকের আর কোন কার্যকারিতা থাকে না।

(খ) **প্রেষণা নির্বাচনধর্মী :** শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সঞ্চারিত হলে শিক্ষার্থী বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় প্রতিক্রিয়া করে এবং অন্যান্য অবস্থাকে উপেক্ষা করে। কিভাবে শিক্ষার্থী একটি বিশেষ অবস্থায় প্রতিক্রিয়া করছে প্রেষণা তাও নির্ধারণ করে। যেমন, একটি খবরের কাগজ দেওয়া হলে, কেউ বা খেলাধুলার পৃষ্ঠাটি পড়ার আগ্রহ দেখায়, কেউ বা চাকরিখালির, আবার কেউ বা জমিজমা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। কোন একটি বক্তৃতার বিবরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় বিভিন্ন ব্যক্তি তার বিভিন্ন বিবরণ দিচ্ছে। কারণ, বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে হয়ত তারা সেই বক্তৃতা শুনেছে, হয়ত বিষয়টির প্রতি আগ্রহ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন বা হয়ত নিজ নিজ অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই বক্তৃতার তাৎপর্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

(গ) **প্রেষণা আচরণকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে :** প্রেষণা কেবলমাত্র নির্বাচনধর্মী নয়, প্রেষণা আচরণকে একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত ক'রে শিক্ষার্থীর মানসিক তৃপ্তি সাধন করে। শিক্ষার্থীর উন্নতি তখনই ঘটে, যখন শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে চালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিখনে আগ্রহ প্রকাশ করে না, যেহেতু শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে না যে তার বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তার আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সম্পর্ক কি? উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানের জন্য প্রাথমিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের কি প্রয়োজন, অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার সময় তা বুঝে উঠতে

পারে না। সে কারণে শিক্ষকের সকল সময়ই কর্তব্য হবে ছাত্রকে বুঝিয়ে বলা যে, তার বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের কি সম্পর্ক; তাহলেই বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ে ছাত্রের আগ্রহের সঞ্চার হবে এবং ছাত্র সেই বিষয় অধ্যয়নে আগ্রহশীল হবে।

শিখন কখনই কার্যকর হতে পারে না যদি না তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়। যে অবস্থা শিক্ষার্থীর প্রতিটি অভিজ্ঞতাকেই অর্থপূর্ণ করে তোলে সেই অবস্থা যাতে যথাযথভাবে সৃষ্ট হয় সেদিকে শিক্ষকের অবশ্যই মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য। শিক্ষার্থীর শিখন তখনই অর্থপূর্ণ হবে যদি তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহের সংযোগ থাকে। তাছাড়া, সেগুলি কেবলমাত্র তার বর্তমান প্রয়োজন না মিটিয়ে ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যসাধনের উপায় স্বরূপ হবে। তখন সেগুলি শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে নতুন কোন সমস্যা সমাধানে ও নতুন বিষয়বস্তু আবিষ্কারের জন্য প্রেরণা দেবে এবং তার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর যুগ্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা, যা এরূপ শিক্ষাকে সম্ভব করে তুলবে এবং তার উপায় নির্ধারণ করা, যা লক্ষ্য সাধনের উপযোগী হবে। এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাহলেও শিখনের প্রারম্ভিক স্তরগুলিকে অবহেলা করলে সমস্ত শিখন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

৯। কার্যকর শিখনের শর্তাবলী (Conditions of Effective Learning) :

শিখনের যে কোন প্রচেষ্টাই যে সব সময় কার্যকর হয়, তা নয়। শিখনকে কার্যকর করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করা প্রয়োজন :

(১) **আগ্রহ** বা **প্রেষণা :** এটি কার্যকর শিখনের একটি অতি আবশ্যকীয় শর্ত। শিক্ষার্থীর অনুরাগ এবং প্রচেষ্টা প্রেষণার উপর নির্ভরশীল। প্রেষণাই শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্মতৎপরতা বা কর্মশক্তির সঞ্চার করে, শিক্ষার্থীর আচরণকে নির্বাচনধর্মী করে তোলে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে তাকে চালিত করে। শিক্ষার্থীর মধ্যে শুধু শিখনের আগ্রহ থাকলেই চলবে না, নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শ থাকা প্রয়োজন। শুধু শিক্ষার্থীর বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ করাই শিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য নয়। বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ করেও, যদি ভবিষ্যতের কোন লক্ষ্যসাধনে শিখন উপযোগী না হয়, তাহলে সেই শিখন কখনও কার্যকর হতে পারে না।

(২) **কার্যের মাধ্যমে শিখন :** কোন কিছু করা মানেই হল তা শেখা। যদি কোন শিশু নিজে কোন কাজ করে তাহলে সে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করে তা তার শিখনের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়। সে কারণে শিখনকে কার্যকর করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীকে নিজের হাতে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

(৩) **উপযুক্ত পরিবেশ :** মনোরম পরিবেশ, উপযুক্ত আলো, বাতাসের ব্যবস্থা এবং অবসাদ-সৃষ্টিকারী বিষয়ের অনুপস্থিতি কার্যকর শিখনের প্রয়োজনীয় শর্ত। সুন্দর সহজ পরিবেশ শিখনকে কার্যকর করে তোলে।

(৪) **শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা :** শিক্ষার উপযোগী মানসিক অবস্থা যদি শিক্ষার্থীর না থাকে, তা হলে শিখন কখনও কার্যকর হতে পারে না। শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব তার কর্মতৎপরতা বিনষ্ট করে। তাছাড়া, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভ্রান্ত ধারণা, মানসিক অস্থিরতা, কুসংস্কার, মানসিক ব্যাধি প্রভৃতিও কার্যকর শিখনের প্রতিবন্ধক।

(৫) **পরিণমন :** কার্যকর শিখনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর পরিণমন। শিক্ষার্থী যা শিক্ষা করতে চায় তা শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক পরিণমন অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করার জন্য যদি শিক্ষার্থীর ক্ষমতা বা সামর্থ না থাকে, বা তা যদি শিক্ষার্থীর ক্ষমতার নাগালের বাইরে হয় তাহালে কার্যকর শিখন সম্ভব হতে পারে না।

(৬) **শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা :** শিক্ষণীয় বিষয়ের তাৎপর্য ও অর্থ যদি শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা না হয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে পথ বিশেষভাবে উপযোগী তা যদি শিক্ষার্থীকে না বলে দেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর শিখন কখনও সার্থক হতে পারে না। শিখনের ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য অনেক শিক্ষার্থীই শিখনকে কার্যকর করে তুলতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক কর্তৃক সার্থক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

(৭) **শিখনের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান :** শিক্ষার্থী যদি নিজ প্রচেষ্টার ফলাফল সতর্কভাবে প্রত্যক্ষণ করে তাহলে প্রচেষ্টার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সজাগ হতে পারে এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে আরও সতর্ক হয়ে দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে শিখনকে সার্থক করে তুলতে পারে।

(৮) **অনুশীলন :** কার্যকর শিখনের জন্য প্রয়োজন আন্তরিকভাবে বার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাকে আয়ত্ত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। একবার-দুবার চেষ্টা করার পর যদি শিক্ষার্থী সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে তাহলে শিখন কোনমতেই কার্যকর হতে পারে না অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন উন্নত ও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে।

(৯) **কার্যকালের পরিসর :** শিক্ষার্থীর কার্যকালের পরিসর খুব দীর্ঘ বা খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নয়। সামর্থ, বয়স, কাজের প্রকৃতি অনুসারে কোন কাজ আয়ত্ত করতে কিছু সময় লাগে। একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পরও যদি একটা কাজে বিরতি না দেওয়া হয় তাহলে মনোযোগ বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। ফলে, সার্থক শিখন ব্যাহত হয়।

(১০) **মনোযোগ :** কার্যকর শিখনের অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত হল শিক্ষণীয় বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করা। শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বাহ্য পরিবেশগত অবস্থা—যেগুলি মনোযোগ নির্ধারণে সহায়ক, সবগুলিই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

শিখনকে কার্যকর করে তুলতে হলে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (individual difference) কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক প্রস্তুতি, পরিণমন এবং দৈহিক ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষার্থীর পাঠক্রম নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। তাছাড়া, শিখনের ক্ষেত্রে উন্নতি কি কারণে ব্যাহত হচ্ছে বা কিছু উন্নতি হবার পর কেন সাময়িক অচলাবস্থার (Plateau) সৃষ্টি হচ্ছে, তার কারণগুলি নির্ণয় করে এর উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও সার্থক শিখনের পক্ষে অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

১০। শিখনে উন্নতি (Improvement in Learning) :

শিখনের উন্নতি কতকগুলি শর্তের উপরে নির্ভরশীল। এগুলি হল অনুশীলনের মাত্রা, আগ্রহ, মনোযোগ, শিখন-পদ্ধতির উপযোগিতা, পূর্বজ্ঞান, সবিরতি শিখন-প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীর বয়স, তার বংশধারার গুণাগুণ, অবসাদ, দৈহিক অবস্থা, সফলতা ও বিফলতা সম্পর্কে জ্ঞান, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতির অনুপস্থিতি ইত্যাদি। শিখনের উন্নতির ক্ষেত্রে আবার ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা দেয়, এর কারণ সব ব্যক্তির শিখনের ক্ষমতা এক নয়।

শিখনের উন্নতি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল

শিখনের উন্নতি সম্পর্কে আমাদের যে সাধারণ অভিজ্ঞতা হয়, তাহল এই যে, শিক্ষার্থীর উন্নতি সমান গতিতে চলে না, সময় সময় দেখা যায় বেশ দ্রুত উন্নতির পর আর মোটেই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না—একটা বিশেষ স্তরে এসে উন্নতি থেমে যায়। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভাণ্ডারে আর নতুন সঞ্চয়ন হয় না। উন্নতির ক্ষেত্রে একটা অচল অবস্থা বা স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা এই অচল অবস্থাকেই শিক্ষার উন্নতি-রেখার অধিত্যকা (Plateau of learning) বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এই অচল অবস্থার যে কোন পরিবর্তন ঘটে না,' তা নয়।

অধিকতর কার্যকর প্রতিক্রিয়া উদ্ভাবনের ফলে বা শিক্ষার্থীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বর্ধিত অনুরাগের ফলে হয়ত এই অচলাবস্থার অবসান ঘটে, আবার কিছু উন্নতি দেখা দিতে পারে। এর পরে আসে আগের মতো সচলাবস্থা, আবার কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়। অচলাবস্থার পর যে উন্নতি দেখা দেয় তাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন উৎক্ষেপ (spurt). এইভাবে চলতে চলতে শিখনের উন্নতি এমন একটি অবস্থায় এসে থেমে যায় যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে আর কোন উন্নতি করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীর উন্নতির পথে বার বার যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই শিক্ষার উন্নতি রেখার অধিত্যকা (Plateau of learning) বলা হয়।

শিক্ষার উন্নতি-রেখার অধিত্যকা

টাইপকরা ও টেলিগ্রাফি শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে এই অচলাবস্থার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

ব্রায়ান ও হার্টার (*Bryan and Hartar*) টেলিগ্রাফি শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষণকার্য চালাতে গিয়ে শিক্ষার উন্নতির এই অচল অবস্থার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, শিক্ষার ফলে বেশ কিছুদিন উন্নতির পর একটা অচল অবস্থা
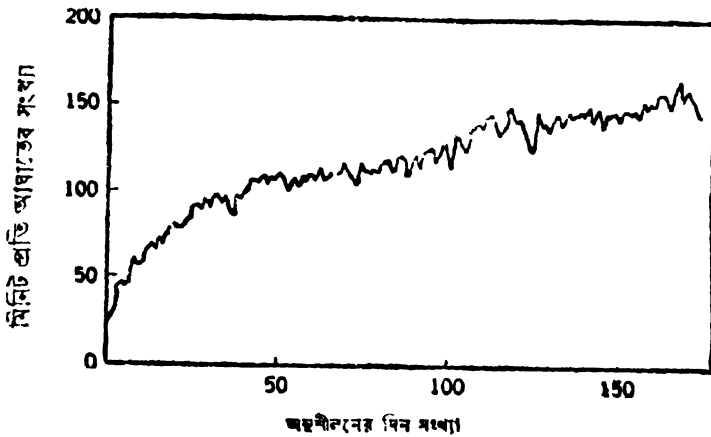
ব্রায়ান ও হার্টার-এর পরীক্ষণকার্য
প্রতিটি যুবকের টাইপরাইটিং শিখনের বক্ররেখা (Learning Curve)। বক্ররেখায় প্রতিটি ধাপ, মিনিট প্রতি আঘাতের সংখ্যায় এক দিনের হিসাব। ৬০ থেকে ৯০ প্রচেষ্টা পর্যন্ত শিখনের পথে অধিত্যকা (Plateau) দেখা যাচ্ছে, যার পরে কিছুদিন ধরে দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

দেখা দেয়। তবে এ অবস্থা সাময়িক, কেননা, উন্নত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। আবার কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়, আবার আসে অচল

অবস্থা। এইভাবে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা আসে যখন আর কোন উন্নতি হয় না। টাইপরাইটিং সম্বন্ধে পরীক্ষণকার্য চালিয়েও অনুরূপ ফল লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বপৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*) টয়নেটার হাই স্কুল অব কমার্স এর টাইপরাইটিং-এর ছাত্রের উপরে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে যে ফলাফল পেলেন তা তিনি তাঁর *Educational Psychology*[1] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষার উন্নতির পথে এই স্থিতিশীল অবস্থার আবির্ভাব ঘটে। অনেক সময় শিক্ষার্থী প্রথম অচলাবস্থা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে শিখনের শেষ সীমা মনে করে শিক্ষণকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করে। তারা ধারণা করে শিক্ষায় আর উন্নতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে কারণে হতাশ হয়ে তারা শিখন থেকে বিরত হয়। এই কারণে শিক্ষার উন্নতিপথে এই অচলাবস্থার আবির্ভাবের কারণগুলি কি এবং সেগুলিকে কি ভাবে দূর করা যেতে পারে তা জানা প্রয়োজন।

উন্নতির পথে অচলাবস্থা শিক্ষার্থীর মনে হতাশা সৃষ্টি করে

১১। শিক্ষার উন্নতিপথে অধিত্যকার অর্থাৎ অচলাবস্থার আবির্ভাবের কারণ (Causes for the Formation of the Plateau) ঃ

নিম্নলিখিত কারণে শিক্ষার উন্নতিপথে অচল বা স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয় ঃ

(১) **আগ্রহের অভাব ঃ** শিক্ষার্থীর আগ্রহের অভাবের জন্য যদি অচলাবস্থার আবির্ভাব ঘটে তাহলে উপযুক্ত প্ররোচকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটান যেতে পারে। অবশ্য অনেক সময় অন্যান্য কারণে এই আগ্রহের অভাব দেখা যায়। যেমন, শিক্ষার্থী যদি অসুস্থ হয় বা শিক্ষণীয় বিষয় যদি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের অভাব দেখা যায়।

(২) **শিক্ষণীয় বিষয়ের দুরূহতা ঃ** শিক্ষণীয় বিষয় যদি শিক্ষার্থীর কাছে খুব দুরূহ মনে হয়, তাহলেও শিক্ষার উন্নতিপথে এই অধিত্যকা দেখা দেয়। দুরূহ বিষয় এড়িয়ে শিক্ষণীয় বিষয়কে যথাযথ ভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থিত করে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটান যেতে পারে।

(৩) **মন্দ অভ্যাস ঃ** মন্দ অভ্যাসও শিক্ষার উন্নতিপথে এই স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ঠিকমত কলম ধরতে না শেখা, অনেক সময় লেখার

1. Sandiford...Educational Psychology. Pages 209-10

উন্নতিপথে স্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, সেক্ষেত্রে কলম ধরার যথার্থ পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে দেখিয়ে দিলে এই স্থিতিশীল অবস্থার বিলোপ ঘটে।

(৪) **শিক্ষণীয় বিষয়ের অংশবিশেষের দিকে মনোযোগ :** শিক্ষণীয় বিষয়ের বিভিন্ন অংশের দিকে সমানভাবে নজর না দিয়ে যদি অংশ বিশেষের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় তাহলে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় না, ফলে উন্নতির পথে স্থিতাবস্থা দেখা দেয়। শিক্ষণীয় বিষয়েব সব অংশেব প্রতি সমান মনোযোগ নিবদ্ধ করে এই স্থিতাবস্থাকে দূর করা যেতে পারে।

(৫) **কার্যের একটি দিক থেকে অপর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধকরণ :** কার্যের একটি দিক থেকে যদি আর এক দিকে মনোযোগ ধাবিত হয়, অর্থাৎ কাজের গতি থেকে যদি কাজকে কিভাবে নিখুঁত করা যায়, সেদিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় তাহলেও এই স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয়। উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করে এইরকম স্থাণু অবস্থার অবসান ঘটান যেতে পারে।

(৬) **কাজের এক অংশের ভুল অন্য অংশে স্থানান্তরিত করা :** কোন ছাত্র পরিসংখ্যান শিক্ষা করতে গিয়ে শুরুতে বেশ উন্নতি দেখাল, কিন্তু কিছু পরে যেই জটিল সমস্যার আলোচনাতে উপনীত হল, তার উন্নতি থেমে গেল। কারণ গণনার ভুল, যোগ-বিয়োগের ভুল এবার আসল কাজের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হল।

(৭) **কোন জটিল বিষয় আয়ত্ত করার সময় তার বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব :** কোন একটি জটিল বিষয় শিক্ষা করার সময় তার বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে শিক্ষার উন্নতিতে স্থিতাবস্থা দেখা দিতে পারে।

(৮) **শিখনের ক্ষেত্রে অফলপ্রদ পদ্ধতির অনুসরণ :** শিক্ষাদান পদ্ধতি যদি যথার্থ না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর উন্নতি ব্যাহত হতে পারে। সঠিক পদ্ধতি অনুসারে শিখনই শিক্ষার উন্নতিতে সহায়তা করে।

(৯) **সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতির অনুসারে অনুশীলনের অভাব :** যদি এক সময় এক পদ্ধতি অনুসারে, অপর সময় অন্য পদ্ধতি অনুসারে কোন বিষয় শিক্ষা করা হয়, অর্থাৎ কোন বিষয়ে শিখনের জন্য যদি স্থিরভাবে একটি যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা না হয়, তাহলে শিক্ষার উন্নতি স্থলে স্থিতাবস্থা দেখা দেয়।

(১০) **দৈহিক অবস্থা :** দৈহিক অবস্থা, যেমন ক্লান্তি বা অবসাদ, বা দর্শনেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি হেতুও শিক্ষার উন্নতি পথে স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দিতে পারে।

(১১) **নতুন পদ্ধতি বা প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব :** কোন নতুন পদ্ধতি বা প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব হেতুও কোন শিক্ষার্থীর উন্নতির পথে অচলাবস্থার আবির্ভাব ঘটতে পারে।

(১২) **বিচ্ছিন্ন এককের পরিবর্তে সমগ্রের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করতে না শেখা :** যে লোক টাইপ করতে শিখছে সে গোটা শব্দ টাইপ করতে না শেখার জন্য, প্রথম কিছুদিন পরেই তার উন্নতির পথে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। যখন একটা অক্ষর আলাদা-আলাদা ভাবে টাইপ না করে, গোটা অক্ষর টাইপ করতে শেখে তখনই অচলাবস্থা কেটে যায় এবং শিক্ষার্থীর আবার উন্নতি দেখা দেয়।

১২। নৈপুণ্য এবং জ্ঞান (Skill and Knowledge) :

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে। শিক্ষার লক্ষ্য হল : (১) জ্ঞান-অর্জন (Acquisition of knowledge) এবং (২) নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জন (Acquisition of skill)। প্রত্যক্ষণ (Perception), প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার মাধ্যমে চিন্তন (Conception), সামান্যীকরণ (Generalisation), অনুষঙ্গমূলক শিখন (Associative learning) এবং মূল্যনিরূপণ (Evaluation)—এই সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়। কোন বিশেষ মুহূর্তে বা অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে উত্তেজিত হলে আমাদের কোন বিষয় বা ঘটনার প্রত্যক্ষণ হয় এবং সেই বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন করি। প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার (Concepts or General ideas) মাধ্যমেও আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত জ্ঞান অর্জন করি। রাম, শ্যাম, যদু, মধু, হল ব্যক্তিবিশেষ, কিন্তু 'মানুষ' হল একটি প্রত্যয়। প্রত্যয় সংবেদনের বিষয়বস্তু নয়, প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমরা ব্যক্তিবিশেষকেই ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু 'মানুষ' এই প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগ সংগঠিত হতে পারে না। প্রত্যয় বলতে আমরা একটা জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝি বা তাদের যে সাধারণ গুণাবলী আছে তাদের বুঝি। প্রত্যক্ষরূপ (Percept) এবং প্রত্যয়ের (Concept) মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতি এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলিকে নিয়ে প্রত্যয়ের সম্পর্ক। প্রত্যক্ষরূপের সম্পর্ক হল ব্যক্তি-বিশেষকে নিয়ে। প্রত্যয় হল সার্বিক এবং অমূর্ত। প্রত্যক্ষরূপ হল বিশেষ এবং মূর্ত। অনুষঙ্গমূলক শিখনের সম্পর্ক স্মৃতির সঙ্গে। স্মৃতি বলতে এখানে স্বেচ্ছায়

প্রত্যক্ষণ, চিন্তন, সামান্যীকরণ, অনুষঙ্গ-মূলক শিক্ষণ ও মূল্য নিরূপণ—এই সকল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়

কোন বিষয়কে মনে জাগিয়ে তুলে তাকে পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে চিনতে পারা ও অনুষঙ্গের নিয়মানুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন বিষয়ের মনে উদ্রেক— উভয় প্রক্রিয়াকেই বোঝাচ্ছে। মূল্যনিরূপণ হল জ্ঞানের অনুভূতির দিক। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা আদর্শের জ্ঞান অর্জন করি।

নৈপুণ্য অর্জন (Acquisition of Skill)ঃ কর্মনৈপুণ্য বা কর্মদক্ষতা বলতে কি বোঝায়? যে কোন কাজ করতে গিয়ে আমাদের আনুক্রমিকভাবে কতকগুলি আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করতে হয়। যখন সুসংবদ্ধ কতকগুলি আনুক্রমিক প্রতিক্রিয়া বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পন্ন করার পারদর্শিতা শিক্ষার মাধ্যমে আমরা অর্জন করি, তখনই আমাদের কর্মদক্ষতা প্রকাশ পায়।[1] যেমন —নিপুণতার বা দক্ষতার সঙ্গে পিয়ানো বাজানো, উড়োজাহাজ চালান বা কবিতা আবৃত্তি করা। কোন কাজে নিপুণতা বা দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য হল, সেই কাজটি নির্ভুলভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পাদন করা। মোটর গাড়ি চালনা করতে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তির পদে পদে ভুল হয় তাহলে সেই ব্যক্তি গাড়ি চালনায় দক্ষতা অর্জন করছে এ কথা আমরা বলব না। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের প্রশ্ন আসে। অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের কথা আমরা বলি না। যে ব্যক্তি নিখুঁত ভাবে কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারে, গাড়ি চালনা করতে পারে, কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, টাইপ করতে পারে, সে সেই কাজে নৈপুণ্য অর্জন করেছে এ কথা আমরা বলব। কিন্তু বিদ্যুতের স্পর্শে দ্রুত পা সরিয়ে নেওয়া বা ঝলসানো আলো চোখে এসে পড়াতে চোখবোজা—এগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action)। এগুলিতে ব্যক্তিবিশেষের দক্ষতা বা নৈপুণ্য প্রকাশ পায় না। পড়া, লেখা, গানবাজনা, ভাষা আয়ত্তীকরণ (বাচনিক), অঙ্কন এবং সাধারণ শিল্পকলা (arts in general) প্রভৃতি সংবেদন-ক্রিয়াজনিত প্রক্রিয়াগুলির (sensori-motor process) পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-বিশেষের দক্ষতা বা নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়। সাধন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই কোন বিশেষ দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জিত হয়। অর্জিত বিষয়েই নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের কথাই বলা হয়ে থাকে, সহজাত প্রবণতার ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের প্রশ্ন আসে না। নিপুণ হাঁটিয়ে একথা আমরা বলি না, কিন্তু দড়ির উপর দিয়ে নিপুণভাবে হাঁটতে পারে একথা আমরা বলি।

নৈপুণ্যের স্বরূপ

1. "When we acquire through learning a co-ordinated series of responses which are performed with proficiency, we speak of the accomplishment of skill." —Boring & others. Foundations of Psychology.

নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার আনুক্রমিক সংগঠন (serial organisation)। অর্থাৎ কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে আনুক্রমিক শিখনের (serial learning) প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে আনুক্রমিকভাবে বা ধারাবাহিকভাবে আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করা হয়, সে ক্ষেত্রেই আনুক্রমিক শিখন নামটি প্রয়োগ করা হয়।[1] এই আনুক্রমিক শিখনের একটা সাধারণ উদাহরণ হল কবিতা আবৃত্তি করা। যেসব ক্ষেত্রে পেশীচালনার দক্ষতা (motor skill) প্রকাশ পায়, সে-সব ক্ষেত্রেও আনুক্রমিক শিখনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ গোলকধাঁধার (maze) উল্লেখ করা যেতে পারে। নিম্নতর প্রাণী এবং মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই গোলকধাঁধার সহায়তায় আনুক্রমিক শিখনের বিষয়টি লক্ষ্য করা হয়। গোলকধাঁধার এক প্রান্তে খাদ্য রক্ষিত হয় এবং আর এক প্রান্তে থাকে একটি ক্ষুধার্ত প্রাণী, ধরা যাক কোন ক্ষুধার্ত বিড়াল। ক্ষুধার্ত বিড়ালটিকে গোলকধাঁধার নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার পথটি খুঁজে বার করে, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করতে হয়। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে কিভাবে নিম্নতর প্রাণী শিক্ষা করে, সে সম্পর্কে থর্নডাইক ক্ষুধার্ত বিড়াল নিয়ে যে পরীক্ষণ কার্য চালান, এ পরীক্ষণও তারই অনুরূপ; তবে পার্থক্য এই যে, থর্নডাইকের শিখন-পরীক্ষণের মূল কথা একটি মাত্র আচরণ—সমস্যার সামগ্রিক রূপটিকে কল্পনায় মনের সামনে উপস্থিত করে সমস্যা ও সমাধানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, আর পূর্বোক্ত গোলধাঁধার ক্ষেত্রে একটিমাত্র আচরণ নয়, আচরণের পারম্পর্য বা ধারাবাহিকতা বা আচরণের ক্রম লক্ষ্য করতে হয়।

দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রতিক্রিয়ার আনুক্রমিক সংগঠন

অনেক সময় কাজে নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, উত্তরোত্তর দক্ষতা বা নৈপুণ্যের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, কাজটিও পরিবর্তিত হতে থাকে। টাইপরাইটিং ও টেলিগ্রাফ, এই দুই শিখনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। টাইপরাইটিং শেখা যখন ধীরগতিতে অগ্রসর হয় তখন শিক্ষার্থীকে প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া করতে হবে, যেমন, 'Bat' শব্দটি টাইপ করতে গিয়ে প্রথমে 'B' তারপরে 'a', তারপরে 't'। কিন্তু যতই শিক্ষার্থীর নৈপুণ্য বা দক্ষতা বাড়তে থাকবে, তখন শিক্ষার্থী একসঙ্গে সম্পূর্ণ কথাটি টাইপ করার জন্য প্রতিক্রিয়া করতে

নৈপুণ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিবর্তন

1. "The name serial learning as applied to the process of learning means a sequence of responses."—Boring : Foundation of Psychology.

সমর্থ হবে এবং অধিকতর অনুশীলনের ফলে যখন আরও দক্ষতা জন্মাবে তখন সম্পূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশ একক হিসেবে টাইপ করতে সমর্থ হবে।

আনুক্রমিক শিখনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষার ক্রমের সব অংশগুলি আয়ত্ত করার পক্ষে সমান কঠিন নয়। প্রথম দিকের এবং শেষের দিকের প্রতিক্রিয়াগুলি সবচেয়ে সহজ এবং মাঝেরগুলি সবচেয়ে কঠিন। এই ফলাফল-গুলিকে দুটি নীতির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। একটি হল প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সূত্র (the principle of primacy) এবং দ্বিতীয়টি হল সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার সূত্র (the principle of recency)। প্রথম সূত্রানুসারে অন্যান্য বিষয় যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে শিখনের ক্ষেত্রে প্রথম অভিজ্ঞতা অতি দ্রুত আয়ত্ত করা যায়। দ্বিতীয় সূত্রানুসারে প্রথম অভিজ্ঞতার তুলনায় সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা অতি সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করা যায়। যেহেতু প্রথম ও সব শেষের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের মাত্রা খুবই কম, সেহেতু এই প্রতিক্রিয়া খুব সহজে করা যায়। শিক্ষার ক্রমের মধ্যবর্তী অংশটুকুতেই প্রতিবন্ধকতার মাত্রা সবচেয়ে বেশী।

আনুক্রমিক শিক্ষণের স্বরূপ

আনুক্রমিক শিখনের স্তরগুলি সর্বক্ষেত্রে একপ্রকার নয়। কোন মানুষ যখন কবিতা শেখে তখন তাকে আনুক্রমিক শিখনের স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয়। যখন কোন ইঁদুর ধাঁধার নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থলে পৌঁছবার পথ খুঁজে বার করতে চায়, তখন তার ক্ষেত্রে শিখনের স্তরগুলি ভিন্ন। মানুষ যখন কোন কবিতা শেখে তখন কবিতাটির প্রথম পংক্তির সহায়তায় কবিতাটিকে স্মরণ রাখে। ইঁদুর যখন ধাঁধার পথটির কথা স্মরণ রাখে তখন আনুক্রমিক শিখনের শেষ স্তরটির কথাই সে স্মরণ রাখে। কারণ এই পথ অতিক্রম করেই সে খাদ্য লাভ করেছিল। কাজেই আনুক্রমিক শিখনের সব স্তর সবার কাছে সমান মূল্যবান নয়।

দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে অনুকরণের গুরুত্ব খুব বেশি। কোন ব্যক্তি অপরকে একটি কাজ করতে দেখে, সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা করে এবং কাজটি সম্পন্ন করার জন্য উপায়ও নির্ধারণ করে, যদিও উপায় সম্পর্কে তার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তারপর প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে কাজটির অনুকরণ করা হয়। প্রথম প্রথম চেষ্টা করতে গিয়ে চেষ্টা খুব এলোমেলো হয়, অনেক অনাবশ্যক ক্রিয়াও দেখা দেয়, তারপর দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো প্রচেষ্টা সুসংহত হয় এবং সকল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়।

নৈপুণ্য অর্জনের মৌলিক নীতি (Basic principles in the acquisition of skills) **:** শিখনের সব নীতিগুলিই নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ।

কিন্তু এই সব নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে, কতকগুলি কার্যকর নীতি গঠন করা হয়েছে—যেগুলি নৈপুণ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এই নীতিগুলি নীচে পর পর আলোচনা করা হচ্ছে :

(১) **নির্ভুলভাবে কর্মসম্পাদনের উপর প্রথম থেকেই জোর দিতে হবে** (Stress the correct performance from the start) : অনেক সময় ইচ্ছা করেই শুরুতে আমরা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করি না। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক আবিষ্কার করে নেব. এই আমাদের ইচ্ছা। এর ফলে অনুশীলন সত্ত্বেও কাজ নিখুঁত হয় না, এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ অনুশীলনের ফলে তখনই কাজ নিখুঁত হয় যদি সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুশীলন করা যায়। যেখানে সঠিক পদ্ধতি জানা নেই, সেক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতিরই মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু যেখানে ভুল না করেও শেখার মতো প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মজুত রয়েছে, সেখানে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। সঠিক পদ্ধতি জানা সত্ত্বেও যদি ভুল পদ্ধতি ধরে কোন কিছু অনুশীলন করা যায় তাহলে ভুল অভ্যাস সঠিক হয়ে যাবে, সেগুলিকে আর সহজে বর্জন করা যাবে না।

এছাড়া, অনেক সময় দেখা যায় অনুশীলন সত্ত্বেও কাজে উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। সেই সব ক্ষেত্রে যারা দক্ষ (expert) তাদের উপদেশ এবং নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে হবে। যে শিক্ষার্থী টাইপ শিখছে কিন্তু শেখাতে তেমন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না, দক্ষ শিক্ষক তাকে প্রতিক্রিয়ার নির্ভুল পদ্ধতিটি শিখিয়ে দেবেন, তাহলেই সে সঠিক পদ্ধতি এবং ত্রুটিযুক্ত পদ্ধতির পার্থক্যটুকু বুঝে নিতে পারবে।

(২) **শিক্ষণীয় বিষয়টির উপর মনঃসংযোগ করতে হবে** (concentrate on the actual task to be learned) : এই নীতিটি প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত। শিখনকে যদি ফলপ্রসূ হতে হয় তাহলে করণীয় বিষয়টির উপর মনকে নিবদ্ধ রাখতে হবে। টাইপ শিখতে হলে সাধারণতঃ যে টাইপ মেসিন ব্যবহার করা হয় তাতে শেখাই যুক্তিযুক্ত। ভাল ফুটবল খেলা শিখতে হলে কোন ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শেখার অভ্যাস করাই উচিত। শুধু টাইপযন্ত্রটি একটু-আধটু ব্যবহার করতে শিখলেই চলবে না, দক্ষতা অর্জন করতে হলে নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া করার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, তা না হলে ভবিষ্যতে পুরনো অভ্যাস কর্মদক্ষতার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

(৩) **স্বাভাবিক অংশে ভাগ করে নিয়ে শিখতে হবে, খণ্ড খণ্ড অংশে নয়** (**Learn in natural units, not in piece-meal**) : খণ্ড খণ্ড অংশে ভাগ করে

শিক্ষা না করে। সম্পূর্ণভাবে কোন বিষয় শিক্ষা করার চেষ্টাই অধিকতর ফল প্রদান করে। অনেক সময় খুঁটিনাটি বিষয়ের অনুশীলনের দিকেই অধিকতর মনঃসংযোগ করা হয়। সামগ্রিকভাবে কর্মসম্পাদনের দিকে নজর থাকে না। এর ফলে শিক্ষার্থী খুঁটিনাটি বিষয়ে নিজের দক্ষতা প্রকাশ করতে পারলেও, বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্রে সমন্বিত করে সম্পূর্ণ কাজটি সমাধা করতে পারে না।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজন হলে শিক্ষণীয় বিষয়টি সুবিধাজনক অংশে বিভক্ত করে নেওয়া হবে না। আসল কথা হল, অংশগুলি যেন কৃত্রিম না হয়ে স্বাভাবিক হয় এবং অংশগুলির মধ্যে যেন একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে। টাইপ শিক্ষা করতে গিয়ে সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা এক একটি শব্দকে 'একক' হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষা করতে থাকে। কিন্তু যদি টাইপ যন্ত্রের 'Key board' সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করে প্রথম থেকেই এক একটি অক্ষর টাইপ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে প্রচেষ্টার সংখ্যা প্রায় অর্ধেক নেমে আসে। অনুরূপভাবে, মোটর গাড়ি চালাবার সময় যদি তার খুঁটিনাটি অংশগুলি বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা করার চেষ্টা না করে, অংশগুলির একত্র পরিচালনা শিক্ষা করার উপর জোর দেওয়া হয় তাহলে অধিকতর ফল পাওয়া যায়। কেননা, গাড়ি চালনা করার সময় একই সময়ে বিভিন্ন অংশগুলি চালনা করে তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হয়।

(৪) **সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি** (Space learning trials): কোন বিষয়ের দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে, এক নাগাড়ে একটি বিষয় শিক্ষা করার চেয়ে কিছু সময়ের ব্যবধানে সেটি পুনরাবৃত্তি করলে প্রচেষ্টা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। যেমন, একটি কবিতা একবারে মুখস্থ করার চেষ্টা না করে যদি কয়দিন ধরে দিনে দু' তিনবার করে পড়া যায় তাহলে সেটি সহজেই মুখস্থ হয়। এর কারণ, একটানা পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অবসাদ জাগে, শিক্ষণীয় বিষয়টি একঘেয়ে মনে হয়। ফলে, শিখনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। সময়ের ব্যবধানে শিক্ষা করলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াশক্তি বর্ধিত হয়, অবসাদ আসে না, একঘেয়েমির ভাবটা কেটে যায়।

(৫) **শিক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাছাড়াও অধিশিক্ষণের দরকার** (Over-learn, do not count on barely learning the task): কাজে নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জনের অর্থ হল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যজনক ও ত্রুটিহীন সমন্বয়সাধন।

অধিশিখন

এর জন্য শুধু সঠিকভাবে কর্ম-সম্পাদন করতে হলে যতটুকু শিখতে হয়, ততটুকু শিখলেই চলবে না, আরও কয়েকবার বেশি অনুশীলন করে, বিষয়টিকে ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে। একেবারে

যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষা করলে আয়ত্ত বিষয়টি ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকবে এবং অল্পের জন্যও যদি মন বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ হয় তাহলে কর্মে প্রতিবন্ধকের সঞ্চার হবে। কুচকাওয়াজে যতই পারদর্শিতা আসুক না কেন, তবু সৈন্যদের নিয়মিত কুচকাওয়াজ করে যেতে হয় যাতে ঐ ব্যাপারে দক্ষতা হ্রাস না পায়। দশজনের সামনে কোন বিষয়ে নিজের দক্ষতা দেখাতে হলে দক্ষ ব্যক্তিকেও নিয়মিত অনুশীলন করে যেতে হয় যাতে দশের সামনে দাঁড়াতে গিয়ে কোন স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা না দেয়। বাস্তব জীবনে এই অবিশিখনের মূল্য আমরা সকল সময়ই উপলব্ধি করি।

(৬) **দক্ষতা অর্জনে কর্মের গতি বা নিপুণতা কোন্‌টি প্রয়োজন?** **(Speed or Accuracy ?)** : কর্মে গতি বা নির্ভুলতা, কোন্‌টির উপর প্রথম জোর দেওয়া হবে তা নির্ভর করে যে পরিবেশে কাজটি করা হয় তার উপর। তবু সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, কর্মের গতির তুলনায় নির্ভুল কর্ম-সম্পাদনের উপরই জোর দেওয়া উচিত। যেমন, টাইপ শেখার সময় প্রথম নির্ভুলভাবে শেখার উপর জোর দিতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে গতি বাড়াতে হবে, তাহলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, গতির দিকে নজর দিলেই ভাল হয়। যেমন—ইট তৈরি।

গতির তুলনায় নির্ভুলতাই বেশী প্রয়োজনীয়

(৭) **দক্ষতা অর্জনে উপদেশ বা তত্ত্বাবধানের কতটুকু প্রয়োজন?** **(How much guidance ?)** : এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন, তবে কাজের শুরুতে ভুলভ্রান্তি পরিহার করে সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য যে বিচক্ষণ ব্যক্তির উপদেশ বা তত্ত্বাবধানের প্রযোজন আছে তা স্বীকার করতেই হবে। তবে শিক্ষার্থী পরে যেভাবে কাজটি সম্পাদন করবে সেভাবে শিক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ পরবর্তী সময় অপরের উপর নির্ভর না করে নিজেকেই কাজ করতে হবে। পরনির্ভরতা উত্তরকালে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসের প্রতিবন্ধক হতে পারে। সবচেয়ে ভাল নীতি হল, শিক্ষার্থী শিখনের সময় আত্মনির্ভরতা অনুশীলন করবে, শুধু বিশেষ প্রয়োজনে অপরের উপদেশ বা নির্দেশ গ্রহণ করবে।

নির্দেশ ও আত্ম-নির্ভরতা উভয়ই প্রয়োজন

(৮) **কর্মদক্ষতার জন্য প্রেষণা থাকা দরকার** (Motivation) : উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হলে যে সক্রিয় বা গতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় প্রেষণা। এই অবস্থায় উদ্দেশ্যকে লাভ করার জন্য মনে তীব্র অনুরাগ বা আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। নৈপুণ্য অর্জনের জন্য এই

প্রেষণা

প্রেষণার সমধিক প্রয়োজন। দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর দৃঢ়সংকল্প ও উৎসাহ থাকা দরকার। অবশ্য উৎসাহ, বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। অতি উৎসাহের ফলে ভুলগুলিও শেখা হয়ে যেতে পারে। কাজের ফলাফল, নিজের সঙ্গে ও অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রেষণার কাজ করতে পারে।

১৩। অভ্যাস (Habit):

ঐচ্ছিক ক্রিয়া থেকেই অভ্যাস উদ্ভূত। ঐচ্ছিক ক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হলে, সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কোন একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া বার বার করাতে কাজটি সহজে সম্পন্ন করার একটা প্রবণতা অর্জিত হয়, যার ফলে ভবিষ্যতে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই কাজটি সম্পন্ন হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে চিন্তা এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বার বার করার জন্য পরে কাজটি এতই সহজ হয়ে পড়ে যে আগের মতন মনোযোগ এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না: পরবর্তীকালের যান্ত্রিকভাবেই সেটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়! এইভাবে একটি ঐচ্ছিক ক্রিয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। লেখা, গান করা, নাচা, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা এগুলি অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়ার (Habitual action) উদাহরণ। অভ্যাস হল অর্জিত ক্রিয়া, সহজাত (Innate) নয়। অভ্যাস হল স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া, কারণ অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে একই ধারায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয় বলে এ একরূপ স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া। বস্তুতঃ অভ্যাস হল মাধ্যমিক স্বতঃসঞ্জাত ক্রিয়া। সেজন্য অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল যান্ত্রিক, স্বতঃসঞ্জাত বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। অভ্যাস হল শিক্ষানির্ভর, শিক্ষানিরপেক্ষ নয়।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হলে অভ্যাসে পরিণত হয়

অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য (The Characteristics of Habit): (ক) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল একই প্রকৃতিবিশিষ্ট (uniform)। ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া একই ভাবে সম্পন্ন হয়। একজন লোক একই ভাবে কথা বলে, একই ভাবে লেখে।

(খ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া খুব দ্রুত সম্পন্ন হয়। অভ্যাস যত ভালভাবে গঠিত হয়, তা তত দ্রুত সম্পন্ন হয়।

(গ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া কেবল যে দ্রুত সম্পন্ন হয় তা নয়, যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয়। যত ভালভাবে অভ্যাস গঠিত হয় অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়াও তত সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

(ঘ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন হয় যদিও অভ্যাস গঠনের জন্য মনোযোগের দরকার। অভ্যাস একবার গঠিত হলে বিশেষ বা আদৌ কোন মনোযোগের আর প্রয়োজন হয় না।

(ঙ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া বেশ সহজভাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়। অভ্যাস সুগঠিত হলে কাজে ক্লান্তির ভাব আর থাকে না বা কম থাকে।

(চ) অভ্যাস যতই ভালভাবে গঠিত হয়, ততই সেই অভ্যাস পরিহার করা কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে যে ব্যক্তি বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তার পক্ষে সহজে সে অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Habit and Reflex Action) : অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। অভ্যাস যদিও ঐচ্ছিক ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত তবুও অভ্যাসটি গঠিত হবার পর সেটি অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার রূপ লাভ করে। প্রতিবর্ত ক্রিয়াও অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া, উভয়ই দ্রুত সম্পন্ন হয়। উভয় ক্রিয়াই একটি বিশেষ ধারায় সম্পন্ন হয়। উভয় ক্রিয়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। উভয় ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই চেতনা, মনোযোগ এবং ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না।

অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মধ্যে সাদৃশ্য

তবে অভ্যাসের সঙ্গে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় :

(ক) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল জটিল, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া হল সরল। সাঁতার দেওয়া হল অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া। এটি একটি জটিল ক্রিয়া, কিন্তু হাঁচা হল একটি সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া।

অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য

(খ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল অর্জিত ক্রিয়া (Acquired action)। সক্রিয় প্রচেষ্টার সাহায্যেই অভ্যাস গঠিত হয়, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া হল সহজাত।

(গ) কোন অভ্যাস গঠিত হবার পর ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নিজের চেষ্টায় সেই অভ্যাস বর্জন করতে পারে, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া বর্জনের কোন প্রশ্ন ওঠে না, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে এর প্রকাশ রোধ করা যায়।

(ঘ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া গঠিত হবার প্রথম স্তরে ঐচ্ছিক, পরবর্তী পর্যায়ে তা অনৈচ্ছিক কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া সর্বস্তরেই অনৈচ্ছিক।

অভ্যাস ও সাহজিক ক্রিয়া (Habit and Instinctive Action) : অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া এবং সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে দু'এক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয় ক্রিয়াই জটিল এবং উভয় ক্রিয়াই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য সাধন করে।

কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় :

(ক) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া হল অর্জিত বা শিক্ষালব্ধ (acquired)। চেষ্টার দ্বারা অভ্যাস গঠন করতে হয়, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া সহজাত বৃত্তির জন্যই ঘটে। সহজাত প্রবৃত্তি হল জন্মগত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, অর্জিত নয়।

(খ) ঐচ্ছিক ক্রিয়া থেকেই অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়ার উদ্ভব, কিন্তু জৈব অভাব এবং প্রযোজন থেকে উদ্ভূত এক প্রকার অস্বস্তিবোধ বা চেতনা সাহজিক ক্রিয়ার উৎস।

(গ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিযা ব্যক্তিগত (individual) ; বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনেব অভ্যাস দেখা যায়, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া হল জাতিগত (racial)। সহজাত প্রবৃত্তি হল জাতিগত বৈশিষ্টা ; খাদ্য অন্বেষণ, বাসস্থান নির্মাণ, শাবক প্রতিপালন, এসব ক্রিয়া কোন এক শ্রেণীব সকল জীবের মধ্যেই দেখা যায়।

(ঘ) অভ্যাস গঠিত হলে তাকে প্রযোজনবোধে বর্জন কবা চলে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিকে একেবারে বর্জন কবা সম্ভব নয, তবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সাহজিক ক্রিযাকে অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত করা যায়।

(ঙ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া অনৈচ্ছিক হলেও গঠনের প্রথম স্তরে ঐচ্ছিক ; কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া সর্ব অবস্থাতেই অনৈচ্ছিক, কোন পূর্বকল্পিত উদ্দেশ্য দ্বারা সাহজিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত নয়। বার বার চেষ্টা করে অভ্যাস গঠন করতে হয়, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি হল জন্মগত বিষয় এবং সহজাত প্রবৃত্তিই সাহজিক ক্রিয়ার মূলে বর্তমান।

সহজাত প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব (Influence of Habit on Instinct): সহজাত প্রবৃত্তি কি অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে জেম্‌স এবং ম্যাকডুগাল দুটি ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন :

জেম্‌সের অভিমত (Jame's View): জেম্‌সের মতে সহজাত প্রবৃত্তি অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। প্রথমতঃ, জেম্‌স মনে করেন অভ্যাস কোন

সহজাত প্রবৃত্তি অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে

একটি সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে একটি নির্দিষ্ট পথে চালিত করে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, বা কোন সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশের পথে বাধার সঞ্চার করতে পারে। বছরের পর বছর পাখি একই গাছের শাখায় বাসা বাঁধে। অভ্যাসের জন্যই সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ একটি নির্দিষ্ট সীমিত পথে চালিত হয়। আবার অভ্যাসের জন্য সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। সদ্যোজাত মুরগী-শাবককে প্রথম থেকেই যদি মানুষের পিছু পিছু চলতে অভ্যস্ত করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে তার ভয় প্রবৃত্তিটি দূর হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে 'ভয়' এই সহজাত প্রবৃত্তিটির প্রকাশ অভ্যাসের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হল। অনেক সময় কুকুর, বিড়াল, মুরগী প্রভৃতি প্রাণীগুলিকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তারা সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে—এর মূলেও অভ্যাসের প্রভাব।

দ্বিতীয়তঃ, জেম্‌সের মতে আমাদের অনেক সহজাত প্রবৃত্তি আছে যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী নয়। তিনি বলেন যে, অভ্যাসের দ্বারা এই সব প্রবৃত্তির প্রকাশকে আরও দৃঢ় করা যায়, তাহলে সহজাত প্রবৃত্তিটির যখন আর কোন প্রয়োজন নেই তখনও সেটি চলতে থাকবে। আর যদি অভ্যাসের দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বন্ধ করা যায় তাহলে সেটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ শিশুদের স্তন্যপানের বিষয়টিকে গ্রহণ করা যাক : শৈশব থেকেই যদি এই সহজাত প্রবৃত্তিটিকে অভ্যাসের দ্বারা দৃঢ় করা যায় তাহলে যখন এর আর কোন প্রয়োজন নেই বা স্বাভাবিকভাবে এই প্রকাশ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত, তখনও এটি সমানভাবে কার্যকর হয় ; আবার ছোট থেকেই কোন শিশুকে যদি মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত করে, চামচ দিয়ে দুধ খাওয়ান অভ্যাস করা হয় তাহলে অতি শৈশব থেকেই এ প্রবৃত্তির প্রকাশ বিলুপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কারও দিনে পাঁচবার খিধে লাগে, কারও বা একবার খিধে লাগে। সহজাত প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব কতখানি তা উদাহরণের সাহায্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অভ্যাসের দ্বারা সাহজিক ক্রিয়ার নিরোধ ঘটতে পারে বা তা পরিবর্তিত হতে পারে বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষণস্থায়িত্ব

ম্যাকডুগালের অভিমত (McDougall's View) : ম্যাকডুগালের মতে জেম্‌স ব্যবহারিক জীবনে অভ্যাসের প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার উপরে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি স্বীকার করেন যে, অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে কিছু পরিমাণে দৃঢ়তর করে তুলতে পারে এবং কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু প্রধান প্রধান সহজাত প্রবৃত্তিগুলি ক্ষণস্থায়ী নয়; সেগুলি আজীবন স্থায়ী হয়। বিপরীত অভ্যাসের দ্বারা সেগুলিকে লুপ্ত করে দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও তাদের প্রকাশকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করা যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে জীবের মৃত্যুও ঘটতে পারে। যেমন, পশুপক্ষীর স্বাভাবিক সঙ্গমেচ্ছাকে যদি রোধ করা হয় তাহলে তাদের মৃত্যু ঘটা সম্ভব। যদি সাময়িকভাবে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে রুদ্ধ করাও হয়, তাহলে সুযোগ পাওয়া মাত্রই সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। ম্যাকডুগাল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন যে, বন্য হাঁসের জন্মাবার পরেই যদি ডানা কেটে দেওয়া হয় এবং সাময়িকভাবে তাদের উড়ে বেড়াবার সহজ প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে ডানা গজান মাত্রই তারা উড়তে

প্রধান প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী নয়

শুরু করছে। সুতরাং ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির কাছে অভ্যাস একান্তই শক্তিহীন। বস্তুতঃ, অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তির অধীন।

অভ্যাস গঠনের নিয়ম (Formation of the Laws of Habit) : উইলিয়াম জেম্‌স অভ্যাস গঠনের জন্য কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন। এই নিয়মগুলি নীচে আলোচনা করা হচ্ছে :

(ক) নতুন অভ্যাস গঠনের জন্য প্রয়োজন **দৃঢ়সঙ্কল্প**। দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে যদি কাজ শুরু করা যায় তাহলে সহজেই অভ্যাসটি গঠিত হয়। যদি কোন ছাত্র খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবার অভ্যাস আয়ত্ত করতে চায় তাহলে সর্বপ্রথমে সেটি করার জন্য মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করতে হবে।

(খ) মনের সঙ্কল্পকে কার্যে পরিণত করার জন্য **প্রথম সুযোগটিরই সদ্ব্যবহার** করতে হবে। ছাত্রটির ভোরে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করার জন্য পরের দিন থেকেই তাকে কাজ শুরু করতে হবে। নইলে অনাবশ্যক বিলম্ব করলে সঙ্কল্প দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব দেখা দিতে পারে।

(গ) **অভ্যাসটি আয়ত্ত করার সময় কোন ব্যতিক্রম যাতে না ঘটে** সেদিকে নজর রাখতে হবে। ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আয়ত্ত করতে হলে দিনের পর দিন সেটি করে যেতে হবে। কোন ওজর দেখিয়ে যদি ব্যতিক্রম ঘটান হয় তাহলে অভ্যাস গঠনের পথে বাধা দেখা দেবে।

(ঘ) যে অভ্যাসের প্রত্যহ **অনুশীলন** সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে সুযোগমত কাজটির অনুশীলন করা উচিত। যেমন, বন্দুক দ্বারা লক্ষ্যভেদ।

(ঙ) অপর ব্যক্তিকে নিয়ে যদি কোন অভ্যাস গঠন করতে হয় তাহলে **সেই ব্যক্তির সামনে নিজের অভ্যাসটির অনুশীলন** করা উচিত। মাতাপিতা যদি চান যে তাঁদের সন্তান সত্য কথা বলা অভ্যাস করুক, তাহলে মাতাপিতার উচিত হবে কখনও সন্তানের সামনে মিথ্যা কথা না বলা।

কু-অভ্যাস বর্জনের নিয়ম (Rules of breaking bad habits) : উইলিয়াম জেম্‌স (*W. James*), কু-অভ্যাস বর্জন করার জন্য কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন :

(ক) কোন কু-অভ্যাস যদি বর্জন করতে হয় তাহলে **অবিলম্বে তা করার জন্য দৃঢ়সংকল্প গঠন** করতে হবে। ভবিষ্যতে সুযোগমত কু-অভ্যাসটি বর্জন করব, বা সেটিকে ধীরে ধীরে বর্জন করব, এ জাতীয় ওজর করলে সেটিকে আর দূর করা যাবে না। ধূমপানের অভ্যাস যে বর্জন করতে চায়, কোন অজুহাতে যদি তা করতে বিলম্ব হয় তাহলে সেই অভ্যাস আর বর্জন করা সম্ভব হয় না।

(খ) কু-অভ্যাসটি বর্জন করার জন্য কেবলমাত্র সেটিকে দূর করার চেষ্টা না করে অপর একটি **সুঅভ্যাস গঠন** করতে হবে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সিনেমা দেখায় অভ্যস্ত, সে ব্যক্তি যদি অভ্যাসটি দূর করতে চায় তাহলে যে সময় সে সিনেমায় যায় সে সময় তার সাহিত্যপাঠ বা সঙ্গীত চর্চা প্রভৃতির অভ্যাস করা ভাল।

(গ) কু-অভ্যাস বর্জন করার জন্য এমন একটি **উপযোগী পরিবেশে** নিজেকে রাখার চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রলোভনের দ্রব্য চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে না পারে। যে ব্যক্তি মদ্যপানের কু-অভ্যাস বর্জন করতে চায়, মদ্যপায়ীদের সঙ্গ বর্জন করে তার পক্ষে উচিত সৎব্যক্তির সঙ্গলাভ করা।

(ঘ) কু-অভ্যাস বর্জনের জন্য যেমন মনের দিক থেকে প্রস্তুতির প্রয়োজন তেমনি **দেহের দিক থেকেও প্রস্তুতির** প্রয়োজন। কু-অভ্যাস বর্জনের জন্য দেহকেও মনের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী করে নিতে হবে। কারও কারও মতে অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করার ফলে মস্তিষ্কে স্নায়ুপথ (nervous pathways) রচিত হয়। বিপরীত অভ্যাস গঠন করে সেই স্নায়ুপথগুলিকে পরিবর্তিত করে দিতে পারলে অভ্যাসটিকে বর্জন করা সহজ হয়।

অভ্যাসের সুফল ও কুফল (Uses and Abuses of Habit) : **সুফল :** (১) যে-সব কাজ পরিশ্রমসাপেক্ষ, অভ্যাস গঠিত হলে সেসব কাজ সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে সম্পন্ন করা যায়। (২) অভ্যাস দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপচয় নিবারণ করে এবং সেই শক্তিকে প্রয়োজন বোধে অন্যত্র নিয়োগ করে আমরা কোন জটিল কার্য সম্পন্ন করতে পারি। (৩) অভ্যাস গঠনের ফলে বিনা মনোযোগেই কাজ করা যায়। (৪) কোন অভ্যাস ভালভাবে গঠিত হলে, আমরা কাজটি সুষ্ঠুভাবে অল্প আয়াসে সম্পন্ন করতে পারি, তার ফলে কাজ করার জন্য কোন ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করি না বা কম অনুভব করি। (৫) অভ্যাসের ফলে কাজ বেশ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা যায়, তার ফলে মূল্যবান সময়ের অযথা অপচয় বন্ধ হয়। (৬) অভ্যাসের জন্য কাজে যোগ্যতা এবং দক্ষতা জন্মে। (৭) আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্পর্কীয় কতকগুলি সুঅভ্যাস যদি শৈশবেই আয়ত্ত করা যায় তাহলে আমাদের সামাজিক জীবন সুন্দর ও প্রীতিকর হয়। (৮) অভ্যাস আমাদের মানসিক উন্নতিবিধানেও সহায়তা করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সুঅভ্যাস গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। যে ছাত্র সৎ আচরণে অভ্যস্ত, নিয়মিতভাবে পাঠ প্রস্তুত করে ও দৈনন্দিন জীবনের করণীয় কাজগুলি

দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাসের সুফল

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের সুফল

সময়মত করে, তার ভবিষ্যৎ জীবন যে খুব উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শৈশবের অভ্যাসই ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। (৯) অভ্যাস গঠনের ফলে সাধারণ কাজগুলি করার জন্য বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন হয় না, ফলে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নীতি প্রভৃতি উচ্চতর বিষয়গুলির চর্চায় মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়।

কুফল ঃ (১) অভ্যাস একবার গঠিত হলে তাকে বর্জন করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। এই কারণে শৈশব থেকেই যারা কু অভ্যাসের দাস, আত্মসংযম ও কঠিন মনোবলের সহায়তায় সেই সব কু-অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে প্রায় সম্ভব হয় না।

কু-অভ্যাস সহজে বর্জন করা যায় না

(২) কু-অভ্যাস অনেক ক্ষেত্রে মানসিক উন্নতির অন্তরায় হয়ে পড়ে। অভ্যাস মানুষের মনকে চিন্তা ও ক্রিয়ার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমিত করে রাখে। এতে মানুষের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবের সৃষ্টি হয়, যার জন্য মানুষ নতুনকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না। অভ্যাসের ধর্ম হল গতানুগতিকতা, সংরক্ষণশীলতা, কিন্তু জীবনে যদি অভিনবত্ব না থাকে, নতুন পরিবেশ, নতুন অবস্থায় যদি মন প্রতিক্রিয়া করতে না পারে, তবে তাতে জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

কু-অভ্যাস মানসিক উন্নতির অন্তরায়

অভ্যাস অভিনবত্বের অন্তরায়

১৪। শিক্ষার্থীর মধ্যে পঠনের অভ্যাস কিভাবে গড়ে তোলা যায়? (How to develop reading habit in pupils) :

প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী যাতে পাঠ্যবিষয়টি অনুশীলন করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্য বিষয়টির প্রতি শিশুর আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। পাঠ্যবিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। সেকারণে প্রয়োজন শিশুর উপযোগী পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা করা। পাঠ্যবিষয় যদি দুর্বোধ্য, নীরস, অতৃপ্তিকর এবং বিরক্তিজনক হয় তাহলে শিশু তার প্রতি মনোযোগী হতে পারে না, এবং সেই পাঠ্যবিষয়কে শিশু এড়িয়ে চলতে চায়, ফলে পঠনের অভ্যাস গড়ে ওঠে না। তৃতীয়তঃ, পাঠ্যবিষয়টি যাতে শিশুর কৌতুহল উদ্রেক করে তার জন্য শিক্ষককে যত্নবান হতে হবে। কৌতুহলই শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পঠনের অভ্যাস গড়ে তুলবে। চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থী যাতে সুন্দর ভাবে উচ্চারণ করে, ধীরে ধীরে পাঠ্যবিষয়টি আয়ত্ত করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে পাঠ্যবিষয়ের তাৎপর্য শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রয়োজনে শিশুকে সরবে বা নীরবে

নিয়মিত অনুশীলন ও পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ

পাঠ আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষা দিতে হবে। পঞ্চমতঃ, পঠনের উপযোগী পরিবেশ, শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি ও পঠনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য খুবই প্রয়োজন। বিরক্তিকর ও অমনোরম পরিবেশে শিশু কখনও পাঠ্যবিষয় অনুশীলনে সমর্থ হয় না। পঠনের সার্থকতা সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তুলতে হবে। ষষ্ঠতঃ, পঠনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে হবে। অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি কিছুটা শিথিলতা প্রথম স্তরে লক্ষ্য করা যায় তাহলে অযথা তিরস্কার, শাস্তি, নিন্দা উপাখ্যানের দ্বারা তাকে নিরুৎসাহ করলে চলবে না। অভ্যাস গঠনের জন্য তার মনে দৃঢ়সঙ্কল্প জাগিয়ে তুলতে হবে। সপ্তমতঃ, শিক্ষক যদি পাঠ্যবিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহলেও শিশুর পঠনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে যদি অপর কোন ব্যক্তিও নিয়মিতভাবে পঠনের অভ্যাস করেন তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজেই পঠনের অভ্যাস গড়ে ওঠে। পঠনের অভ্যাসের কার্যকারিতা শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাখ্যা করা হলে শিক্ষার্থী অভ্যাস অর্জন করার সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

১৫। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস গঠন (Formation of useful habits in school children) :

ছাত্রজীবনে ছাত্ররা যাতে নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতে পারে সেজন্য পাঠ্যজীবনে ছাত্রদের মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় অভ্যাসগঠনের প্রয়োজন। এই সব অভ্যাসের মধ্যে প্রথমেই নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার আদেশ যাতে ছাত্ররা শৃঙ্খলার সঙ্গে মেনে চলে তার অভ্যাস ছাত্রদের অর্জন করা দরকার। নতুবা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে পাঠ শিক্ষা করা ছাত্র-ছাত্রীর প্রধান কর্তব্য, সে কারণে নিয়মিত শিখনের অভ্যাস প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে গড়ে তোলা দরকার। শ্রমশীলতার ও সহনশীলতার অভ্যাস যে কোন ছাত্রের মধ্যেই থাকা প্রয়োজন। ছাত্রজীবনে নানারকম বাধা-বিপত্তি বিদ্যা অর্জনে বাধার সঞ্চার করতে পারে। শ্রমশীল ও সহনশীল ছাত্র নির্ভয়ে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে বিদ্যার্জনের দুরূহ পথে অগ্রসর হতে পারে। সময়নিষ্ঠার অভ্যাসও ছাত্রজীবনে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়মত পাঠ অভ্যাস করা, সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজে অংশ গ্রহণ করার অভ্যাস ছাড়া ছাত্রজীবনের লক্ষ্য কখনও সিদ্ধ হতে পারে না। প্রতিটি ছাত্রের প্রয়োজন সহযোগিতার অভ্যাস অর্জন করা। বিদ্যালয়ের যাবতীয়

কাজে, খেলাধুলায় ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকা প্রয়োজন। একক প্রচেষ্টায় সকল সময় বাঞ্ছিত ফললাভ ঘটে না, দলগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই সম্পন্ন হয় না।

ছাত্রদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও স্বাস্থ্য চর্চার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। এ ছাড়াও যাবতীয় সদভ্যাসও ছাত্রদের অর্জন করা দরকার যাতে তাদের ছাত্রজীবন সুন্দর ও সার্থক হয়।

১৩। শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের মূল্য (Importance of habit formation in Education) :

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, অভ্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই তা উপলব্ধি করা যাবে। অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া দ্রুত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। অভ্যাসের জন্য কাজে স্বতঃস্ফূর্ততা আসে এবং অভ্যাসসিদ্ধ কাজ সহজভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোন বিষয় চিন্তা করতে আরম্ভ করা মাত্রই শিশু তা সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করতে পারে না, একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই বিষয়টিকে ক্রমশঃ আয়ত্ত করতে থাকে।

অভ্যাসের দ্বারাই শিক্ষণীয় বিষয়কে আয়ত্ত করা যায়

যেমন, কোন শিশু যখন লিখতে শেখে তখন প্রথম প্রথম কাজটি তার কাছে দুরূহ মনে হয় কিন্তু নিয়মিত লেখা অভ্যাস করতে করতে সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে লিখতে পারে। কোন বিষয় দুরূহ মনে হলে শিক্ষার্থীর তা শিক্ষা করতে প্রথমে মানসিক অবসাদ জাগে এবং শেষ পর্যন্ত যে দুরূহ বিষয়টি তার আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়, কারণ হল অভ্যাস। সঙ্গীত বা অন্যান্য ললিতকলায় যাঁরা পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, তাঁরা জানেন যে তাঁদের এই পারদর্শিতার মূলে রয়েছে শুধুমাত্র আগ্রহ নয়, নিয়মিত শিখনের অভ্যাস। সে কারণে শিখনের অন্যতম কর্তব্য হল শিশুর মধ্যে শিখবার অভ্যাসটি গড়ে তোলা। মনোবিজ্ঞানী জেম্‌স এর মতে যথোচিত অভ্যাস গঠন করাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন যার দ্বারা শিক্ষার্থী তার আচরণে পরিবর্তন এনে কোন অবস্থায় যথোচিত প্রতিক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু শেখা আচরণগুলি যদি অভ্যাসের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা না হয়, তাহলে অবস্থানুসারে প্রতিক্রিয়া করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না। একমাত্র অভ্যাসের অভাবের জন্যই অনেক বিষয় শেখা সত্ত্বেও আমরা প্রয়োজনমত তার সদ্ব্যবহার করতে পারি না।

অভ্যাসের জন্যই শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়, যে বিষয়টি শেখা হল, তাকে যদি অভ্যাসের দ্বারা বিশেষভাবে আয়ত্ত করে নেওয়া না হয়, তাহলে নতুন বিষয় শিক্ষা করা সম্ভব হবে কি ভাবে? সমস্ত জীবন ধরে যে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে, তাকে যদি বিশেষ কয়েকটি প্রতিক্রিয়া করার কৌশল আয়ত্ত করার দিকেই নজর রাখতে হয় তাহলে নতুন নতুন প্রতিক্রিয়া করার কৌশল সে আয়ত্ত করবে কি ভাবে? কাজেই অভ্যাস শিক্ষার্থীর সময়ের ও শক্তির অপচয় রোধ করে, তাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করে। কেবল নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা নয় দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জন করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের নিয়মিত অনুশীলনের অভ্যাস যদি কোন শিক্ষার্থীর না থাকে, তাহলে সে বিষয়ে তার পক্ষে দক্ষতা অর্জন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। যে শিক্ষার্থী টাইপরাইটিং-এ দক্ষতা অর্জন করতে চায় তাকে নিয়মিতভাবে তা অভ্যাস করতে হবে, তবেই তার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

অভ্যাসের দ্বারাই নৈপুণ্য অর্জিত হয়

শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস ক্রমবিকাশ। শিশুর মধ্যে সৎ অভ্যাস গঠিত হলেই শিক্ষায় এই লক্ষ্য সিদ্ধ হয়। নিয়মানুবর্তিতা, শ্রমশীলতা, ন্যায়-পরায়ণতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি অভ্যাসগুলি যদি শিশুর মধ্যে শৈশবেই গঠিত না হয়, তাহলে উত্তরকালে যথোচিত অভ্যাস গঠন শিশুর ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং মন্দ অভ্যাসের দূরীকরণও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। মাতাপিতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের অবহেলার জন্য শিশু শৈশবে এমন কতকগুলি মন্দ অভ্যাস গঠন করে যেগুলি তার ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস গঠনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ কোন্ অভ্যাস বর্জনীয় এবং কোন্ অভ্যাস অবাঞ্ছনীয় শিশুর পক্ষে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। যাঁরা শিশুর অভিভাবকস্থানীয় তাঁদের উচিত শিশুকে যথোচিত আচরণটি অনুকরণ করতে এবং অভ্যাস করতে সহায়তা করা। সুতরাং শিক্ষকের কাছে এই বিষয়টির শিক্ষাগত তাৎপর্য সমধিক। যে শিশুর মধ্যে সৎ অভ্যাস গঠিত হয়, সে শিশু অসীম শক্তির আধার এবং এই শক্তির সদ্ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষক তার ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠুভাবে গঠন প্রয়াসী হতে পারেন।

সৎ অভ্যাস ব্যক্তি-সত্তার সুষ্ঠু সংগঠনে সহায়তা করে

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। শিক্ষার্থীর শিখনকার্য সেই লক্ষ্যাভিমুখেই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ শিখনকার্য কখনও উদ্দেশ্যহীন হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার্থীর অভ্যাসের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যের যাতে নিগূঢ় সম্পর্ক

থাকে শিক্ষকের উচিত হবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। কোন শিক্ষার্থী যদি উদ্দেশ্যহীন ভাবে কতকগুলি অভ্যাস অর্জন করে, তাহলে সে অভ্যাস গঠন কখনও ফলপ্রসূ হয় না। সে কারণে প্রয়োজন শিক্ষকের পক্ষে প্রতিটি অভ্যাসের কার্যকারিতা শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাখ্যা করা, যাতে শিক্ষার্থী অভ্যাস অর্জন করার সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। উদ্দেশ্যহীনভাবে অভ্যাস গঠনের কোন সার্থকতা নেই—তাতে শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময়ের ও মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে অভ্যাস গঠন যুক্তিযুক্ত নয়

কি কারণে শিশু অবাঞ্ছনীয় অভ্যাস অর্জন করেছে, তা জেনে, সেগুলি দূর করার জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। নচেৎ শিশুর শিক্ষার ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষককে অত্যন্ত সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে, কারণ নিন্দা, শাস্তি, ভীতি প্রদর্শন, ভর্ৎসনা অনেক সময় শিশুর মন্দ অভ্যাস বর্জনে সহায়ক না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ শিশুর মধ্যে এমন এক হীনমন্যতা বোধ দেখা দেয় যা শিশুর সুস্থ ব্যক্তিসত্তা গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শিশুর অবাঞ্ছনীয় অভ্যাস দূরীকরণের জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে

শুধুমাত্র আচরণ নয়, শিক্ষার্থী যাতে কোন বিষয় সুসঙ্গত ভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে পারে তার অভ্যাসও শিক্ষার্থীর অর্জন করা প্রয়োজন। তার ফলে শিক্ষার্থী অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজন হলেই বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে, এবং সহজেই কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

আবার এমনও দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও সামর্থ থাকলেও তার মধ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকে না; বা ইচ্ছাকে কর্মে প্রয়োগ করার অভ্যাস গঠিত হয়নি। শিক্ষার্থীর পক্ষে তাই অভ্যাস গঠনেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে, যার ফলে নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুকরণ করে নিজ লক্ষ্যের অভিমুখে নিজেকে পরিচালিত করা তার পক্ষে সম্ভব হবে।

১৭। স্বয়ং শিখন ও দলগত শিখন (Self-Learning and Learning in a Group):

শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনাকে অর্থাৎ তার শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তিকে বিকশিত করা যাতে তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন হয়। শিক্ষাই শিশুর মধ্যে সামাজিক গুণের সৃষ্টি করে তাকে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে শেখায় অর্থাৎ তাকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। শিক্ষার এই লক্ষ্য

শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন

তখনই ব্যাহত হবে যদি কতকগুলি তথ্য দিয়ে শিশুর মন ভরিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। শিশুকে আত্ম-সক্রিয় হয়ে পর্যবেক্ষণ করতে, চিন্তা করতে, সমস্যার সমাধান করতে এবং সিদ্ধান্ত গঠন করতে সুযোগ দেওয়া উচিত।

যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, তবুও শিক্ষা বিশেষ করে স্ব-নির্ভর। শিক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও সক্রিয়তা ছাড়া কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোযোগ যদি না থাকে, শিক্ষা গ্রহণে যদি শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও ইচ্ছা না থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন কিছুই শেখা সম্ভব হয় না। সুতরাং স্বয়ংশিখনই শিক্ষার মূলকথা। অন্যের যত সহযোগিতা শিশু লাভ করুক না কেন, শিক্ষার্থীকে নিজের চেষ্টায় শিখন সম্পূর্ণ করতে হবে। একথা শিক্ষার্থীকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, নব্য শিক্ষা-পদ্ধতি, মন্টেসরী, কিণ্ডারগার্টেন, ডাল্টন পরিকল্পনা, ডিউই-র প্রকল্প পদ্ধতি প্রভৃতি পরিকল্পনাকে স্বয়ংশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মন্টেসরী পদ্ধতি হল খেলাধুলার মাধ্যমে শিখন, এখানেও স্বয়ংশিখনের (auto-education) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাবিদ নান্ (*Nunn*) বলেন যে "ম্যাডাম মন্টেসরী শিশুর শিক্ষার দায়িত্বভার সাহসের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে শিশুর উপরই অর্পণ করেছেন।" এই শিক্ষা পরিকল্পনার প্রতি শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় হতে হয় এবং শিক্ষক ও সহপাঠীদের উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করে যেতে হয়। এই পদ্ধতিতে শিশু নিজের চেষ্টাতেই পড়তে, লিখতে, সংখ্যা গণনা করতে শেখে, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ গতি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সে নিজেই ভুল নিজের সংশোধন করতে পারে। মিস্ হেলেন পার্কহার্স্ট (*Miss Helen Parkhurst*) ডাল্টন পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এই শিক্ষাব্যবস্থাতেও শিশুর স্বয়ংশিখন এবং ব্যক্তিগত ও সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুকে উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া যে হয় না তা নয়, কিন্তু শিশুকে নিজের প্রচেষ্টাতেই শিখতে হয়। প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ হয়ে ওঠে যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত এক-একটি গবেষণাগার। শিক্ষক শ্রেণীতে যান না। তাঁর কাজ শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা করা নয়, প্রয়োজনমত তত্ত্বাবধান করা, উপদেশ দেওয়া ও নির্দেশ দেওয়া। আর একটি পদ্ধতি আছে যাকে হিউরিষ্টিক পদ্ধতি (Heuristic method) নামে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতিও শিশুর স্বয়ংশিখনের উপর জোর দেয়। এই

শিক্ষা বিশেষ করে স্ব-নির্ভর

বিভিন্ন প্রগতিশীল শিক্ষা পদ্ধতি

ডাল্টন পরিকল্পনা

পরিকল্পনায় শিশুর ভূমিকা হল আবিষ্কারকের ভূমিকা। শিশু নিজেই অনুসন্ধান করে বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে সাধারণ এবং বিমূর্ত জ্ঞান অর্জন করে। শিক্ষকের কাজ হল শিশুকে প্রয়োজনমত নির্দেশ দেওয়া, বক্তৃতা দেওয়া নয় বা করণীয় কার্য করার জন্য শিশুকে বাধ্য করা নয়।

হিউরিস্টিক পদ্ধতি

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সব শিক্ষা-পরিকল্পনাতেই শিশুর স্বয়ংশিখনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বচেষ্টায় যদি শিশু শিক্ষা করে তাহলে তার মধ্যে মৌলিক চিন্তন ও কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়। কোন সমস্যা সমাধান করার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা জাগে, নিজের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হয়। স্বাধীনভাবে কোন কিছু শিক্ষা করার সুযোগ লাভ করাতে শিক্ষণীয় বিষয় তার কাছে বিরক্তিকর বা আকর্ষণহীন হয়ে ওঠে না। এর ফলে উত্তর জীবনে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে চলতে শেখে এবং বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য সুসঙ্গত ভাবে সম্পন্ন করতে পারে। নিজ নিজ রুচি, প্রবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী শিক্ষা করার সুযোগ লাভ করাতে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। বস্তুতঃ, শিক্ষার্থীর সমস্ত জীবন ধরেই স্বয়ংশিখন চলতে থাকে, জন্মের সময় থেকেই শিশুর এই শিখন শুরু হয় এবং জীবনের পরিসমাপ্তিতেই এই স্বয়ংশিখনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্বয়ংশিখনের সুফল

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বয়ংশিখনের যেমন মূল্য আছে তেমনই দলগত শিক্ষারও মূল্য আছে। শিশু যেমন নিজেই শেখে তেমনি দলের মধ্যে থেকেও শিক্ষা লাভ করে। দলের মধ্যে থাকলে শিশু অন্যান্য শিশুদের অনুকরণ ক'রে শিক্ষণীয় বিষয় সহজে আয়ত্ত করতে পারে, সৎ অভ্যাস অর্জন করতে পারে। অবশ্য শিখনের লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে শিশু মন্দ কোন কিছু অনুকরণ না করে। দলগত শিক্ষায় প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা করার এবং সমকক্ষতা লাভের প্রবণতা শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। সুস্থ প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব শিশুর সুস্থ সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। প্রতিযোগিতা যদি সমকক্ষদের মধ্যে হয় তাহলে দলের মধ্যে নিজের অবস্থা বুঝে নেবার অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত হয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী শিক্ষার উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হয়। দলগত শিক্ষা শিশুর মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে শিশু মিলেমিশে কাজ করতে শেখে, শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয়। দলগত শিক্ষা শিশুর মধ্যে অপরের সমকক্ষ হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করে। সে সব

দলগত শিখনের মূল্য

সময় অপর শিশুদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে এবং তাদের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। দলগত শিক্ষায় শিক্ষার্থী নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেগুলি সংশোধনের জন্য যত্নবান হয়।

এই দলগত শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। (১) দলের মধ্যে থেকেও শিক্ষার্থী স্বয়ংশিক্ষা লাভ করতে পারে। দলের মধ্য থেকে শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার্থীর শিক্ষার যে উন্নতি হয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু যদি একই ছাত্রকে দলের মধ্যে রেখে এবং দলের বাইরে রেখে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য বলা হয় তাহলে দলগত শিক্ষার উৎকর্ষের তুলনায় ব্যক্তিগত শিক্ষার উৎকর্ষ অধিকতরভাবে পরিলক্ষিত হয়।

দলগত শিক্ষার প্রকারভেদ

(২) দলগত শিক্ষার আর একটি রূপ হল, একটি বা দুটি ছেলে বোর্ডে লেখে, অন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের ডেস্কে বসে কাজ করে। এতে শিক্ষার্থীর কাজের গতি বাড়ে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ বড় একটা দেখা যায় না। (৩) দলগত শিক্ষার আর একটি রূপ হল, একটি ছাত্র বোর্ডে কাজ করছে, আর ক্লাসের সব ছাত্র তার কাজ লক্ষ্য করছে। প্রশ্ন হল, ছাত্রটি নিজে ডেস্কে কাজ করার সময় যে কাজ করত, তার তুলনায় তার কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে কী? দেখা গেছে, এতে শিক্ষার্থীর কাজের পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ হ্রাস পায়।

ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা (individual competition) দলগত প্রতিযোগিতার (group competition) তুলনায় বেশী কার্যকর। যদি প্রতিটি শিশু অপর শিশুর দক্ষতাকে অতিক্রম করার ইচ্ছা নিয়ে প্রতিযোগিতা করে তখন ভাল ফল পাওয়া যায়। আবার যখন একটি শ্রেণী অপর শ্রেণীর দক্ষতাকে অতিক্রম করতে চায়, তখন প্রতিযোগিতার প্রভাব তেমনভাবে পরিদৃষ্ট হয় না। যখন একদল ছেলে এবং একদল মেয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় তখন প্রতিযোগিতা খুবই ফলপ্রসূ হয়।

ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতা

সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে ব্যক্তি, না দল, কার বেশি কৃতিত্ব তা নিরূপণ করার জন্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটসন (*Watson*) একটি পরীক্ষণকার্য চালান। তিনি একটি বড় শব্দ (যেমন—regeneration) যতগুলি অক্ষরের দ্বারা গঠিত (r, e, g, ইত্যাদি), সেই অক্ষরগুলি দিয়ে কতকগুলি নতুন শব্দ গঠন করা যায় (যেমন—nation, ration ইত্যাদি) তা পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে তা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি তাদের ২০ জন করে এক একটি

সমস্যার সমাধানে ব্যক্তি না দল, কার কৃতিত্ব অধিক

দলে বিভক্ত করে, একটি নতুন শব্দ নিয়ে সেই কাজটি করতে বললেন। ঐ একই বিষয়টি আবার ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল। তিনি দেখলেন, এক একটি দল যে পরিমাণ শব্দ গঠন করেছে তা ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার তুলনায় অনেক বেশি। এই বিষয়টি থেকে অনেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার তুলনায় দলগত প্রচেষ্টার উৎকর্ষ অধিক। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, ওয়াটসন আরও একটি বিষয় আবিষ্কার করেছিলেন। সব ব্যক্তিদের পৃথক পৃথক ভাবে করা সমাধানগুলি গণনা করে দেখা গেল যে, দলের তুলনায় একা কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের তুলনায় দলের কৃতিত্ব এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। বরং দলের মধ্যে থাকলে ব্যক্তির মৌলিক রচনাশক্তির প্রকাশ তেমনি পরিদৃষ্ট হয় না। পরে এ সম্পর্কে (১৯৩২ এবং ১৯৩৩ খ্রীঃ) পরীক্ষণকার্য চালিয়ে অনুরূপ ফলাফলই লক্ষ্য করা গেছে।

কোন সমস্যার সমাধান হোক বা কোন রুটিন বাঁধা কাজ হোক, দলের কাজের পরিমাণ কোন দল-বহির্ভূত বিশেষ ব্যক্তির কাজের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যেসব ব্যক্তি একা একা কাজ করছে, তাদের কাজের পরিমাণের সমষ্টি ও গুণগত উৎকর্ষ, সেই সব ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত দলের কাজের তুলনায় অনেক বেশি।

যেসব শিক্ষার্থী জড় বা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন (idiot) অর্থাৎ বুদ্ধির সোপানে যারা সর্ব-নিম্নে, তারা দলগত শিক্ষায় বিশেষ লাভবান হয় বলে মনোবিজ্ঞানী সেগুঁই (*Seguin*) উল্লেখ করেছেন। দলগত শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন —উইনেট্কা পদ্ধতি (Winnetka method), সহযোগিতা মূলক যৌথ-পদ্ধতি (Co-operative method), আলোচনা মূলক পদ্ধতি (Discussion method) ইত্যাদি। উইনেট্কা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর স্বয়ং-শিখন ও দলগত শিখন উভয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। শিক্ষার্থী একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিজেই শিখে নেয় তেমনি দলগত কাজের ভিত্তিতেও অনেক বিষয় শেখে। সঙ্গীত, সাহিত্য, অভিনয়, খেলাধুলা প্রভৃতির মাধ্যমে এই দলগত কাজগুলি সম্পন্ন হয়। এই প্রকার দলগত কাজের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনা, সহযোগিতার ভাব ও সৃজনমূলক বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। 'যৌথ-পদ্ধতি'ও পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে শিক্ষা গ্রহণ করার পদ্ধতি। আলোচনা-

দলগত শিক্ষায় লাভ

উইনেট্কা পদ্ধতি

যৌথ-পদ্ধতি

মূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কোন একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে ও পারস্পরিক সাহযোগিতার মাধ্যমে তার সমাধানের সূত্রটি নিরূপণে সচেষ্ট হয়।

আলোচনামূলক পদ্ধতি

১৮। প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা (Competition and co-operation) :

প্রতিটি ব্যক্তির জীবনেই এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন তাকে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়, আবার অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়। অতি শৈশব থেকেই শিশুর জীবনে এই প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। শৈশবে শিশুকে পরিবারের অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে প্রতিযোগতায় অবতীর্ণ হতে হয়। যখন শিশু দেখতে পায় পরিবারের মধ্যে আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী শিশু রয়েছে যে মাতাপিতার স্নেহ ভালবাসা ও মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করছে, অথচ যা পুরোপুরি সে নিজেই পাবার বাসনা করে, তখনই তার মনে ঈর্ষার ভাব জাগে। এই ঈর্ষার সঙ্গে জড়িত থাকে ক্রোধ, ভয় এবং দুঃখের অনুভূতি। সব শিশুরই মনে কম বেশি ঈর্ষার ভাব জাগে। নানাবিধ অবস্থা এই মনোভাবকে আরও তীব্র করে তোলে। যখন শিশু দেখে মাতাপিতা অন্য শিশুর প্রতি খুব বেশি মাত্রায় পক্ষপাত দেখাচ্ছে, বা, যেখানে নতুন শিশুর আবির্ভাবে তাকে মাতাপিতা অবহেলা করছে বা তার থেকে ছোট অথচ বেশি বুদ্ধিমান কোন শিশুর সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারছে না, তখন বা অন্যান্য কোন কারণে শিশু নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে ভীত হয়ে ওঠে।

অতি শৈশব থেকেই শিশুকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়

শিশু যখন বড় হয় এবং অপরের সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে পরিবার-বহির্ভূত অন্যান্য শিশুদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে, বিশেষ ভাবে যারা তার থেকে দৈর্ঘ্যে, শারীরিক শক্তিতে, মর্যাদায় এবং প্রতিপত্তিতে অনেক বড়। তখনই তার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব জাগে, সে অপরের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে চায়। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বেই তার দেখা দেয় এবং সারা জীবন ধরেই চলতে থাকে।

প্রতিযোগিতার মনোভাব সারা জীবন ধরে চলে

অনেক সময় মাতাপিতা নিজেদের আকাঙ্ক্ষা সন্তানদের মধ্য দিয়ে পূরণ করতে চান। সে কারণে শিশু যদি প্রতিযোগিতায় হেরে যায়, জয়লাভে বঞ্চিত হয় তাহলে সেই ব্যর্থতার জন্য শিশুমনে যে দুঃখবোধের সঞ্চার হয়, [illegible] মাতাপিতা যেন

আর না বাড়িয়ে দেন। পুরস্কার, পরীক্ষার নম্বর দেওয়া, ক্রমোন্নতি অনুসারে নাম সাজাবার ব্যবস্থা প্রভৃতি সব সময়ই শিশুকে তার প্রতিযোগিতা-মূলক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যান্য প্রভাবের তুলনায় প্রতিযোগিতার ভাব সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও, কম নয়। বিদ্যালয়-জীবনে খেলাধুলার মাধ্যমে, বা অন্যান্য কাজের মাধ্যমে শিশুরা অপরের সঙ্গে নিজেদের দক্ষতা ও শক্তির প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হয়, মর্যাদা ও জনপ্রিয়তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং অপরের সমকক্ষ হবার বাসনা করে। এমন কি যেসব বিদ্যালয়ে সম্মান-তালিকায় নাম বসাবার ব্যবস্থা, স্কুলের কাজে নম্বর দেবার রীতি বা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা রহিত করা হয়েছে সেখানেও ছাত্ররা অন্য প্রকারের স্বীকৃতির জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা

তারপর বিদ্যালয় বা কলেজ জীবন শেষ করে শিশু যখন বৃহত্তর সমাজ জীবনে প্রবেশ করে তখনও তার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, সম্মানের জন্য, মর্যাদার জন্য, জনপ্রিয়তার জন্য, খ্যাতির জন্য, তাকে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোন-না-কোন ভাবে তাকে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে যেতে হয়।

বৃহত্তর সমাজ-জীবনে প্রতিযোগিতা

ব্যক্তির জীবনে প্রতিযোগিতার যেমন স্থান রয়েছে তেমনি রয়েছে সহযোগিতার স্থান। পরিবারে শিশু যেমন অন্য শিশুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, তেমনি প্রয়োজনে সহযোগিতাও করে। একই পরিবারে শিশুদের অনেক সময়েই মাতাপিতার নির্দেশে মিলেমিশে কাজ করতে হয়।

পরিবারের বাইরেও শিশুরা যখন অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধুলা করে তখন প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার ভাবও দেখা দেয়। দলগত খেলাধুলা সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়েও যেমন প্রতিযোগিতার স্থান আছে, তেমনি সহযোগিতার স্থান রয়েছে। শিক্ষকের নির্দেশে অনেক সময় বিভিন্ন কাজ শিশুদের একত্র মিলেমিশে করতে হয়। বয় স্কাউট (Boy's Scout), এন. সি. সি. প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা বিদ্যালয় ও কলেজ-জীবনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করে। বৃহত্তর সমাজ-জীবনে এই সহযোগিতার প্রশ্ন আরও তীব্র ভাবে দেখা দেয়। জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য, জনকল্যাণমূলক

পরিবারে ও পরিবারের বাইরে সহযোগিতার স্থান

কাজ সম্পাদন করার জন্য, সমাজ-জীবনের সংরক্ষণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রেষণা সঞ্চার করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য প্ররোচক হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে শিক্ষকদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং বিদ্বেষমূলক বা শত্রুতামূলক প্রতিযোগিতার ভাব যেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে না জাগে। প্রতিযোগিতার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রতিযোগিতা সমানে সমানে হয়। প্রতিযোগিতা যদি একই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে হয় তবেই ভাল হয় এবং প্রতিযোগিতায় যেন প্রতি ছাত্রেরই জয়ের সম্ভাবনা থাকে। প্রতিযোগিতা তিন প্রকারের হতে পারে। যথা—

প্ররোচক হিসেবে প্রতিযোগিতা

(১) **ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা** (Personal Competition): এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীর মধ্যে তীব্র সক্রিয়তা সৃষ্টি করে; কিন্তু মনোবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ্‌রা এই ধরনের প্রতিযোগিতা সমর্থন করেন না।

(২) **দলগত প্রতিযোগিতা** (Group Competition): এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীর মধ্যে সক্রিয়তা সৃষ্টি করে এবং এ ধরনের প্রতিযোগিতা শিক্ষাবিদ্‌রা সমর্থন করলেও করতে পারেন।

(৩) **আত্মপ্রতিযোগিতা** (Competition with self): অনেক সময় শিক্ষার্থী নিজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। সে তার পূর্ববর্তী যোগ্যতা বা কৃতিত্বকে অতিক্রম করে নতুন কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই প্রকার প্রতিযোগিতা সুস্থ এবং বিশেষভাবে সমর্থনযোগ্য।

সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার কামনা, অপরের সমর্থন লাভের বাসনা, ভালবাসা দেবার ও পাবার আকাঙ্ক্ষার জন্য সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার মতনই, এক স্বাভাবিক প্ররোচক। অনেকে মনে করেন সমাজে শুধু তীব্র প্রতিযোগিতারই স্থান রয়েছে এবং শিশুদের কিভাবে প্রতিযোগিতা করতে হয় কেবল তাই শেখানো উচিত। কিন্তু অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন করেন না। তাঁরা বলেন, সমাজের পক্ষে নির্বিচারে প্রতিযোগিতাকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। কেননা, সমাজের প্রধান কাজই হল সহযোগিতা। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মূল্য থাকলেও সহযোগিতামূলক আচরণের মূল্যই এখানে বেশি। মনোবিজ্ঞানীরাও একে সমর্থন করেন এই কারণে যে, সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির পূরণ ঘটে।

সহযোগিতা ও স্বাভাবিক প্ররোচক

প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতার মূল্য (Value of Competition and Co-operation) : কোন কোন সময় প্রতিযোগিতা বাঞ্ছনীয়। যখন কোন শিশুর মধ্যে প্রতিযোগিতায় জয়লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়, অথচ সে ব্যর্থ হয় এবং এই ব্যর্থতা তার মনে ভীষণভাবে রেখাপাত করে, তখন প্রতিযোগিতা তার মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সাধারণতঃ খুবই ক্ষতিকর। কিন্তু প্রতিযোগিতার মূল্যও রয়েছে। যেসব কাজ অনেক সময় বিরক্তিকর, প্রতিযোগিতাই সেসব করার জন্য শিক্ষার্থীর মনে উৎসাহের সঞ্চার করে।

অনেক সময় কোন শিশু প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে পুরস্কার লাভের আশায় কোন কাজ শিক্ষা করে যাতে তার বিশেষ কোন অনুরাগ বা আগ্রহ নেই। অনেক সময় শিশু নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করে। অনেক সময় প্রতিযোগিতা ব্যক্তিকে পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি যোগ্যতা এবং ক্ষমতা প্রদর্শন করার জন্য উৎসাহিত করে। আবার অনেক সময় ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট মানকে নিজের সামনে রেখে তার সমকক্ষ হতে সচেষ্ট হয়।

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতা

কোন কোন অবস্থায় ব্যক্তি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতা করে। দলগত খেলাধুলায় এটি লক্ষ্য করা যায়। যদি কোন ফুটবল দল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে চায়, তাহলে তার সভ্যদের সহযোগিতার অবশ্যই প্রয়োজন এবং এ জাতীয় খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করে শিশু সহযোগিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আবার অনেক সময় ব্যক্তি সহযোগিতামূলক কাজে প্রতিযোগিতা করে। যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সভ্যরা প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বাড়াবার উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠতালাভের জন্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তখন এই মনোভাব পরিদৃষ্ট হয়। উদ্যমশীল ব্যক্তি প্রতিযোগিতাও করতে পারে, সহযোগিতাও করতে পারে, প্রয়োজন হলে একই সময়ে উভয়ই করতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কিভাবে অপরকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ করব, এ ধারণা সব সময়েই যদি কোন ব্যক্তির মন অধিকার করে থাকে তাহলে জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায় এবং পরিমাণে অনেক দুঃখভোগ করতে হয়।

সহযোগিতামূলক কাজে প্রতিযোগিতা

প্রশ্ন হল, শিক্ষার দিক থেকে প্রতিযোগিতার প্রতি আমাদের মনোভাব কি হবে? শিক্ষার দিক থেকে যথার্থ মনোভাব হবে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে সংগঠনমূলক পথে চালিত করা এবং যাতে অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা না দেয় তার

দিকে লক্ষ্য রাখা। প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সামর্থ অনুযায়ী কাজ দিতে হবে যাতে তার মধ্যে কোন ভুল প্রবণতার সৃষ্টি না হয়। শিশুদের মধ্যে সামর্থের নানা পার্থক্য থাকে, সেই পার্থক্যের কথা বিচার করে তাদের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষকদের কখনই উচিত হবে না শিশুদের এমন প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে বলা, যাতে তারা কখনই জয়লাভ করতে পারবে না। কৃত্রিম পুরস্কার থেকে যথার্থ পুরস্কারের মূল্য যাতে শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে তার জন্যই শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। যখনই প্রতিযোগিতা হবে তখন যেন সমানে সমানে প্রতিযোগিতা হয় তার দিকেও শিক্ষকের বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মপ্রতিযোগিতার ভাব জাগিয়ে তোলাই সবচেয়ে শ্রেয়। তবে প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনে ও শিক্ষা-জীবনে সহযোগিতার মূল্য সম্পর্কে যাতে শিক্ষার্থী সচেতন হয়, তার দিকেও শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

প্রতিযোগিতার প্রতি মনোভাব

প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে সংগঠনমূলক পথে চালিত করা উচিত

১৯। শিখনের সঞ্চালন (Transfer of Training) :

(ক) শিখনের সঞ্চালন কাকে বলে? (What is Transfer of training ?) : কোন একটি বিষয় শিখনের পর পরবর্তী একটি বিষয়ে শিখনের বা সম্পাদনের উপর প্রথম শিখনের ফলাফল বা প্রভাবকেই শিখনের সঞ্চালন বলা হয়।[1] শিখনের সঞ্চালন মতবাদ অনুসারে একটি বিষয়ের শিখনের ফলাফল পরবর্তী অপর একটি বিষয়ের শিখন বা সম্পাদনে সঞ্চালিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষার মাধ্যমে কোন বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান বা পারদর্শিতা অন্য বিষয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হতে পারে। এক পরিস্থিতিতে যা শেখা যায় পরবর্তী কোন পরিস্থিতিতে তাকে প্রয়োগ করা যায় বা কাজে লাগানো যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি প্রথমে ল্যাটিন ভাষা শিখল। তারপর ইংরেজী ভাষা শিখল। শিখনের সঞ্চালন মতবাদ অনুসারে ল্যাটিন ভাষার শিখন ইংরেজী ভাষার শিখনকে কিছুটা প্রভাবিত করবে।

কোন বিষয় শিখনের ফলাফল পরবর্তী অপর একটি বিষয়ের শিখনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে

1. "When we speak of transfer of training we mean the effect which some particular course of training has on learning or execution of a second performance".

—K. Lovell : Educational Psychology and Children. Page 149.

এই সঞ্চালন বা প্রভাব দু প্রকারের হতে পারে, সদর্থক বা নঙর্থক। যদি প্রথম বিষয়ের শিখন দ্বিতীয় বিষয়ের শিখনকে সহায়তা করে তাহলে সেই প্রভাবকে সদর্থক সঞ্চালন (Positive Transfer) বলা হবে। ল্যাটিন ভাষার শিখন যদি ইংরেজী ভাষার শিখনের সহায়তা করে বা সহজ করে তোলে তাহলে সেই প্রভাবকে সদর্থক সঞ্চালন বলা হবে। আর যদি ল্যাটিন ভাষায় শিখন ইংরেজী ভাষার শিখনে বাধা সঞ্চার করে তাহলে সেই প্রভাবকে নঙর্থক সঞ্চালন (Negative Transfer) বলা হবে। আর যদি ল্যাটিন ভাষার শিখন ইংরেজী ভাষার শিখনে সহায়তা না করে বা বাধারও সঞ্চার না করে তাহলে তাকে শূন্য বা অনিৰ্দিষ্ট সঞ্চালন (Nil or Indefinite Transfer) বলা হয়।

সঞ্চালন দু প্রকার—সদর্থক ও নঙর্থক

শিখনের সঞ্চালন সম্ভব, কি অসম্ভব, এই প্রশ্নটি শিখনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কমূলক প্রশ্ন। দৈনন্দিন জীবনে বা বাস্তব অভিজ্ঞতায় শিখনের সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা এবং অসম্ভাব্যতা, উভয়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন কোন পরিস্থিতিতে শিখনের সঞ্চালন সম্ভব আবার কোন কোন পরিস্থিতিতে শিখনের সঞ্চালন অসম্ভব মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তির বিশেষ এক ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান বা পারদর্শিতা অন্য এক ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োগ কৌশল শিখনকে সহজতর করে তোলে। আবার দেখা যায় যে ব্যক্তি বাংলা কবিতা মুখস্থ করার ব্যাপারে খুবই দক্ষ তিনি ইংরেজী কবিতা শিখনের ব্যাপারে তেমন দক্ষ নন। অর্থাৎ কিনা, একটা বাংলা কবিতা মুখস্থ করার পরে একটি ইংরেজী কবিতা মুখস্থ করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে, তাঁর প্রথম শিখন দ্বিতীয় শিখনকে মোটেই সহজতর করে তোলেনি, বা দ্বিতীয় শিখনের উপর প্রথম শিখনের কোন প্রভাব নেই।

(খ) শিখন সঞ্চালনের পরিমাপ পদ্ধতি (Measurement of Transfer of Training) : শিখন সঞ্চালন মতবাদের যথার্থতা পরীক্ষা করার জন্য এই শতাব্দীর প্রথম দিকে অনেক পরীক্ষণকার্য চালান হয়। পরীক্ষণকার্যে সাধারণতঃ কতকগুলি পদ্ধতি অনুসরণ করা হত।

পরীক্ষার্থীরা কোন্ বিষয়বস্তু কতখানি স্মরণ রাখতে পারে, সে সম্পর্কে একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে তাদের সাফল্যাঙ্ক (scores) নির্ধারণ করা হত, এবং ঐ সাফল্যাঙ্কের ভিত্তিতে দুটি দল 'ক' এবং 'খ' নির্বাচন করা হত যারা স্মরণশক্তির ব্যাপারে সমতুল্য। 'ক' দলকে বলা হত পরীক্ষণ দল (Experimental Group)

বা সঞ্চালন পরীক্ষণ দল (Transfer Group)। এবং 'খ' দলকে বলা হত নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group)। প্রথম দলের স্মরণ রাখার দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়েছে। এরপর তাদের অন্য কোন বিষয় যেমন, কোন কবিতা, গদ্যাংশ, ওজন বা মাপের তালিকা মুখস্থ করতে বলা হয়। দ্বিতীয় দলকে তা করার সুযোগ দেওয়া হয় না বা এমন কোন কাজে নিযুক্ত করা হয়, যাতে স্মরণশক্তির অনুশীলনের কোন ব্যাপার নেই। কিছু সময় পরে উভয় দলকেই প্রথমে যে বিষয় সম্পর্কে তাদের স্মরণশক্তির দক্ষতা পরীক্ষণ করা হয়েছিল, তার পুনঃ পরীক্ষা করা হয়। শিখনের সঞ্চালন যদি হয়ে থাকে তাহলে আশা করা যায়, দ্বিতীয় পরীক্ষণের ফলাফলে 'খ' দলের সাফল্যাঙ্কের তুলনায় 'ক' দলের সাফল্যাঙ্ক বেশী হবে।

পরীক্ষণ দল ও নিয়ন্ত্রিত দল

পরীক্ষণের বিভিন্ন স্তর

দলের নাম	প্রথম স্তর	দ্বিতীয় স্তর	তৃতীয় স্তর
'ক'-পরীক্ষণ দল (Experimental Group)	'গ' বিষয় সম্পর্কে স্মরণশক্তির দক্ষতা পরীক্ষা	'গ' ছাড়া অন্য বিষয় সম্পর্কে স্মরণশক্তির অনুশীলনে নিযুক্ত করা	'গ' বিষয় সম্পর্কে স্মরণশক্তির দক্ষতা পুনঃ পরীক্ষা (অর্থাৎ 'গ' বিষয় স্মরণ রাখার ব্যাপারে দক্ষতা বাড়ল, কি কমলো পরীক্ষা করা।)
'খ'—নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group)	ঐ	—	ঐ

(গ) **শিখনের সঞ্চালনসম্পর্কে দুটি প্রাচীন মতবাদ ঃ** মানসিক শক্তিবাদ এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Theory of Mental Faculties and Theory of Formal or Mental Discipline) : (i) **মানসিক শক্তিবাদ** (Theory of Mental Faculties) : গত শতাব্দীর শেষভাগে মানসিক শক্তিবাদ প্রচার লাভ করে। এই মতবাদ অনুসারে আমাদের মন কতকগুলি শক্তির সমষ্টি। এই শক্তিগুলি হল চিন্তন, স্মৃতি, বিচার, যুক্তি, বিশ্লেষণ, অবধারণ, ইচ্ছা, কল্পনা ইত্যাদি। এই মতবাদ অনুসারে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে যেমন উপযুক্ত ব্যায়ামের সাহায্যে শক্তিশালী করা যায়, তেমনি উপযুক্ত অনুশীলনের সাহায্যে মনের শক্তিগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করা যায়। যেমন, মন যদি চিন্তনশক্তির উন্নতি করতে চায় তাহলে চিন্তনের চর্চা হয় এরূপ বিষয় পাঠের প্রয়োজন, স্মরণশক্তির উন্নতির জন্য স্মরণশক্তিকে উন্নত করে এমন বিষয় অর্থাৎ কিনা কবিতা পাঠের প্রয়োজন।

বিশেষ বিশেষ বিষয় চর্চা করিলে মনের শক্তির উন্নতি ঘটে

বর্তমানে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রথমতঃ, মন বিচ্ছিন্ন শক্তির সমষ্টি নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদে যাদের শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের অনেক-গুলিই মানসিক প্রক্রিয়ামাত্র।

(ii) **মানসিক শৃঙ্খলাবাদ** (**Theory of Formal or Mental Discipline**) **:** প্রাচীনকালে 'মানসিক শক্তিবাদের' প্রভাবে অপর একটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, যেটি শিখনের সঞ্চালন মতবাদের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই মতবাদ অনুসারে স্মৃতি, বিচারকরণ, মনোযোগ, অবধারণ, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি মানসিক শক্তিগুলিকে অনুশীলনের সাহায্যে উন্নত বা শক্তিশালী করে তোলা যায়, যার ফলে বিশেষ কোন পেশার জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হয় না। কারণ অনুশীলনের ফলাফল এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া থেকে ঠিক অনুরূপ অপর এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়াতে সঞ্চালিত হয়, অবশ্য ভিন্ন এক ক্ষেত্রে। এই মতবাদ অনুসারে স্মৃতি, মনোযোগ, প্রত্যক্ষণ, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক শক্তিগুলিকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অনুশীলনের দ্বারা শক্তিশালী করে তোলা যেতে পারে। এই মতবাদ অনুসারে শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি মূল শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যেগুলির অনুশীলনে বোধশক্তি উন্নততর হয়, বুদ্ধি শাণিত হয় এবং স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। অর্থাৎ কিনা বিশেষ বিষয়ের চর্চায় বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির বিকাশ ও উন্নতি সাধিত হয়। যেমন, প্রাচীনকালে ধারণা করা হত ল্যাটিন ও গ্রীক চর্চায় স্মৃতিশক্তির উন্নতি এবং সামগ্রিকভাবে মনের উন্নতি সাধিত হয়। গণিতের চর্চা বিচারশক্তিকে উন্নত করে, বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণের শক্তিকে উন্নত করে, ন্যায়শাস্ত্র বিচারশক্তিকে উন্নত করে, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির চর্চায় কল্পনার উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্লেটোর যুগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের অনেক শিক্ষাবিদ্‌ই ছিলেন এই মতবাদে বিশ্বাসী। প্লেটো তাঁর **'Republic'** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন একজন ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে যদি জ্যামিতি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে তার বুদ্ধি শাণিত হবে। দার্শনিক লক (*Locke*) যদিও মানসিক শক্তিবাদের একজন সমালোচক ছিলেন তবু তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে 'মানসিক শৃঙ্খলাবাদের' অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, গণিতের শিক্ষা শিক্ষার্থীকে জ্ঞানী এবং বিচারকরণে দক্ষ করে তোলে, যাতে শিক্ষার্থী অন্য বিষয় শিক্ষা করার সময় তার বিচারকরণের শক্তিকে সঞ্চালিত করতে পারে। এই মতবাদ প্রসারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে উপযোগিতা নীতির ভিত্তিতে

বিশেষ বিষয়ের চর্চায় বিশেষ মানসিক শক্তির বিকাশ

প্লেটো, লক, প্রভৃতির অভিমত

(on the principle of utility) পাঠক্রমে নানাধরনের শিক্ষণীয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হতে লাগল। বিচারশক্তিকে উন্নত করার জন্য গণিতের, কল্পনাশক্তিকে উন্নত করার জন্য সাহিত্যের, স্মৃতিকে উন্নত করার জন্য ভাষার অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হল।

মানসিক শক্তিবাদের অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হওয়াতে 'মানসিক শৃঙ্খলাবাদ'ও বর্তমানে পরিত্যক্ত হয়েছে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন বিশেষ শাস্ত্র পাঠ করে কোন মানসিক শক্তির উন্নতি সাধিত হলেও, ভিন্ন ক্ষেত্রে ঐ শক্তি যে উৎকর্ষের পরিচয় দেবেই এমন কোন কথা নেই। ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করে যিনি যুক্তিতর্কে পারদর্শী হয়েছেন, দৈনন্দিন জীবনে যুক্তিতর্ক করার সময় তিনি যে সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সে যা হোক, বিশেষ পাঠ্যবিষয়ের দ্বারা যে মনের বিশেষ শক্তিকে উন্নত করা যায় এবং এই উৎকর্ষ অন্য বিষয় পাঠ করার সময় বা নতুন কোন পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হয়, এই নীতির ভিত্তিতে এক সময় বিভিন্ন দেশের শিক্ষার পাঠক্রমে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় পাঠ্য-বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

(ঘ) শিখন সঞ্চালনের উপর কয়েকটি পরীক্ষা (Some Experiments on Transfer of Training) : (i) **জেমস[1] পরিচালিত পরীক্ষা** : শিখন সঞ্চালনসম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেন মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক উইলিয়ম জেম্‌স (*William James*)। তিনি নিজেই পরীক্ষণ-পাত্রের ভূমিকা অবলম্বন করে নিজের উপর পরীক্ষা পরিচালনা করেন। তিনি প্রথমে ভিক্টর হুগোর লেখা 'স্যাটির' (*Satyr*) কবিতা থেকে ১৫৮ লাইন মুখস্থ করলেন, যাতে তাঁর সময় লাগল ১৩১⅚ মিনিট। তারপর তাঁর মুখস্থ শক্তির উন্নতিসাধনের জন্য তিনি দৈনিক কুড়ি মিনিট করে আবৃত্তি করে ৩৮ দিনে মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট (Paradise Lost)-এর অনেকটা অংশ আয়ত্ত করলেন। তারপর তিনি হুগোর স্যাটির কবিতার আগের মুখস্থ করা অংশের পরবর্তী ১৫৮ লাইন মুখস্থ করতে গিয়ে দেখলেন যে, তাঁর মোট সময় লাগল ১৫১½ মিনিট, অর্থাৎ প্রথম বারের থেকে ২০ মিনিট বেশী সময় লেগেছে। প্যারাডাইস লস্টের অংশবিশেষ মুখস্থ করার পর হুগোর কবিতার অংশবিশেষ মুখস্থ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে, তাঁর মুখস্থ শক্তির কোন উন্নতি হয় নি। অন্যান্য ব্যক্তিদের দিয়ে তিনি স্বতন্ত্রভাবে ঐ পরীক্ষণটি করালেন এবং তাঁদের ক্ষেত্রে ঐ একই ফল লক্ষ্য করে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, শিখনের কোন

1. William James : Principles of Psychology, Vl. 1. P. 666–668.

সঞ্চালন হয় না এবং মুখস্থ শক্তির চর্চা করলেই তা বাড়ে না। এইভাবে মানসিক শৃঙ্খলা মতবাদটির অসারতাও প্রমাণিত হল। জেম্‌স পরিচালিত পরীক্ষা শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটিও বিরোধিতা করে। তাঁর পরীক্ষণ থেকে এই বিষয় প্রমাণিত হয় যে এক শিখন পরিস্থিতি থেকে এক শিখন পরিস্থিতিতে কোনও সঞ্চালন হয় না। কিন্তু জেম্‌সের পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি একেবারে মিথ্যা বলে বাতিল করে দেন নি।

(ii) **স্লেট পারচালিত পরীক্ষা :** স্লেট (*Sleight*) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী স্মৃতির উপরে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়েছিলেন। তিনি কয়েকজন ব্যক্তিকে পদ্য এবং গদ্য থেকে কয়েক পংক্তি মুখস্থ করতে দিলেন। তারপর তিনি সেই একই ব্যক্তিকে কতকগুলি তারিখ এবং অর্থহীন শব্দ (non-sense syllable) মুখস্থ করতে দিলেন। এই পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে চর্চা করলেই মুখস্থশক্তির উন্নতি হয় না এবং কোন একটি বিষয় মুখস্থ করলে অন্য বিষয় মুখস্থ করার ব্যাপারে যে তা সহায়ক হবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হয় না অর্থাৎ কিনা বিভিন্ন বিষয় মুখস্থ করার প্রক্রিয়াগুলি পরস্পরনির্ভর নয়।

(iii) **ওয়েব-পরিচালিত পরীক্ষা :** ওয়েব (*Webb*) একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দুটি দলে ভাগ করলেন এবং একটি দলকে পাটিগণিতের প্রশ্নের ভিত্তিতে দশ সপ্তাহ ধরে বিচারকরণ শিক্ষা দিলেন। অপর দলটি অন্যান্য সাধারণ বিষয় পাঠ করতে লাগল। পরে উভয় দলকে একই ধরনের প্রশ্ন করে তাদের বিচারকরণ-শক্তির পরীক্ষা নেওয়া হল। পরীক্ষণ থেকে দেখা গেল যে, পাটিগণিতের প্রশ্নের ভিত্তিতে যে ছাত্রদল বিচারকরণের চর্চা করেছিল তারা অন্যদলের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ অধিকতর উৎকর্ষ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এ থেকে ওয়েব সিদ্ধান্ত করলেন যে, বিচারকরণের ক্ষেত্রে শিখন-সঞ্চালন সম্ভব। ওয়েব আরও লক্ষ্য করলেন যে, কোন বিশেষ বিষয় অনুশীলনে যে ছাত্র যত্ন নেয়, সে অন্যান্য বিষয় অনুশীলনেও যত্ন নেয়। এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি কয়েকটি পরীক্ষণ পরিচালনা করেন এবং সিদ্ধান্ত করলেন যে আদর্শ ও নীতির (ideas and principles) ক্ষেত্রেও শিখনের সঞ্চালন ঘটে থাকে।

(iv) **জাড পরিচালিত পরীক্ষা :** জাড (*Judd*) পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর দু দল ছেলেকে নিয়ে একটি পরীক্ষা পরিচালিত করেন। দু দলের মধ্যে একটি হল পরীক্ষণ-দল এবং আর একটি হল নিয়ন্ত্রিত দল। তিনি উভয় দলকেই জলের নিম্নে অবস্থিত একটি লক্ষ্যের প্রতি তীর ছুঁড়তে বললেন। আলোর প্রতিসরণের (refraction

of light) জন্য জলের নীচে অবস্থিত খণ্ডটিকে ঠিক যে জায়গায় অবস্থিত সেই জায়গায় দেখা যায় না, তা একটু ওপরে অবস্থিত মনে হয়। আলোর প্রতিসরণের এই নিয়মটি জানা না থাকার জন্য উভয় দলেরই লক্ষ্যচ্যুতি ঘটল। এর পরে পরীক্ষণ দলকে অপর দলটি থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, আলোর প্রতিসরণের মূল নীতিটি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দলের কাছে সেটি ব্যাখ্যা করা হল না। এরপর উভয় দলকে লক্ষ্যভেদ করতে বলা হলে, পরীক্ষণ দলটি নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় অনেক কম ভুল করল। এর থেকে জাড সিদ্ধান্ত করলেন যে, ব্যক্তি যদি অভিজ্ঞতা সামান্যীকরণের নীতিকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তি যদি সামান্য সূত্র গঠন করতে পারে তাহলে শিখনের সঞ্চালন হয়।

(v) **থর্নডাইক পরিচালিত পরীক্ষা:** ল্যাটিন শিখনের সঞ্চালন মূল্য নির্ণয় করার জন্য থর্নডাইক একটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করেন। তিনি অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন যে, যেসব ছাত্র-ছাত্রী ল্যাটিন শিক্ষা করে বুদ্ধি পরীক্ষায় তাদের সাফল্যাঙ্ক বেশি হয় কিনা। পরীক্ষণের ফলাফল থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, যে সব ছাত্র ল্যাটিন শিক্ষা করেছে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক, যেসব ছাত্র ল্যাটিন শিক্ষা করে নি তাদের বুদ্ধ্যঙ্কের তুলনায় অধিক। অবশ্য এর কারণ ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির উৎকর্ষ, না তাদের ল্যাটিন শিক্ষার পারদর্শিতা, বিচার করা মুস্কিল। যেসব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শিক্ষা করেছে, তারা ল্যাটিন না-জানা ছাত্রদের তুলনায় উন্নত হলেও, এই সঞ্চালন বেশি দিন স্থায়ী হয় না, কারণ অল্পকাল পরে দেখা যায়, ল্যাটিন-জানা এবং ল্যাটিন না-জানা শিক্ষার্থী সব বিষয়েই সমান দক্ষতা প্রকাশ করে।

(vi) **উড্রো হারবার্ট পরিচালিত পরীক্ষা:** উড্রো হারবার্ট মুখস্থ করা সম্পর্কে কতকগুলি পরীক্ষা পরিচালনা করেন। তিনি একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তিনটি দলে ভাগ করেন। প্রথম দলটিকে তিনি মুখস্থ করা সম্পর্কে কোন নির্দেশ বা শিক্ষা দিলেন না। দ্বিতীয় দলটিকে তিনি কবিতা এবং অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করতে বললেন। কি ভাবে মুখস্থ করতে হবে সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিলেন না। দ্বিতীয় দলটি, তিন ঘণ্টা ধরে প্রায় চার সপ্তাহ, কোন নির্দেশ ছাড়াই মুখস্থ করার কাজে নিজেদের নিযুক্ত রাখল। তৃতীয় দলটিকে উপরিউক্ত সময়ের শতকরা ৪৮ ভাগ সময় তিনি মুখস্থ করার যথাযথ পদ্ধতি শিক্ষাদান করলেন এবং অবশিষ্ট সময় কতকগুলি কবিতা এবং অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করতে দিলেন। এর পর তিনটি দলেরই স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করা হল। প্রথম দুটি দলের সাফল্যাঙ্ক প্রায় সমান সমান হল, কিন্তু তৃতীয়

দলটির সাফল্যাঙ্ক প্রথম এবং দ্বিতীয় দলের প্রত্যেকের থেকে বেশি হল। উড্রো সিদ্ধান্ত করলেন যে, তৃতীয় দলটিকে মুখস্থ করা সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা বা নির্দেশ দানের জন্যই তাদের ফলাফল অপরের থেকে ভাল হয়েছে। তাঁর এই বিশেষ শিক্ষাদানের অন্তর্ভুক্ত ছিল কয়েকটি বিষয়; যেমন, অংশ হিসেবে মুখস্থ না করে সমগ্র হিসেবে মুখস্থ করা, ছন্দযুক্ত করে এবং দলবদ্ধ করে শিক্ষা করা, নিজে নিজে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয়তা অবলম্বন করা, শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থের প্রতি মনোযোগী হওয়া (এই প্রসঙ্গে অর্থ বোঝাতে সহায়তা করে এরূপ প্রতিরূপ বা সঙ্কেত চিহ্নের ব্যবহার করা), মুখস্থ করার দক্ষতার বিকাশসাধন এবং ঐ দক্ষতাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই পরীক্ষণ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, একই ধরনের বিষয়ে শিখন সঞ্চালিত হয় যদি সেই বিষয় পাঠ করা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে যথাযথ পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

(vii) ব্রুস্‌-পরিচালিত পরীক্ষা: কোন একটি শব্দ মুখস্থ করলে ঐ জাতীয় শব্দ বা অন্যান্য শব্দ মুখস্থ করার পক্ষে পূর্বোক্ত শিক্ষা কতখানি সহায়ক হয় অর্থাৎ কিনা শিখনের সঞ্চালন কতখানি সম্ভব হয় ব্রুস্‌ (*Bruce*) সে সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য পরিচালনা করেন। মুখস্থ করা শব্দটিকে দুবার উচ্চারণ কবার পরে নতুন শব্দ মুখস্থ করার চেষ্টা করা হল, কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করা গেল না। আবার মুখস্থ করা শব্দটি ছয়বার উচ্চারণ করার পরে নতুন শব্দ মুখস্থ করা হল। এইবার অধিকতর ফললাভ ঘটল। মুখস্থ করা শব্দটি ১২ বার উচ্চারণ করার পরে, যখন নতুন শব্দ মুখস্থ করার চেষ্টা কর! হল তখন দেখা গেল যে, মুখস্থ করা কোন শব্দ যদি সম্পূর্ণ স্মরণ করা যায়, তাহলে ঐ একই ধরনের শব্দ সহজে মুখস্থ করা যায়।

(viii) মুর পরিচালিত পরীক্ষা: অর্জিত জ্ঞান এবং জীবনে তার সদ্ব্যবহারের ক্ষমতা, এদুটি কতখানি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, এই বিষয়টি লক্ষ্য করার জন্য মুর (*Moore*) একটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপরে একটি পরীক্ষণ পরিচালনা করলেন। প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা লাভ করেছে। মুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, যে জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই এবং অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাবার দক্ষতা, আগ্রহ, বিশ্বাস ও চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বাড়ে বা কমে। মুর-এর পরীক্ষণ থেকে প্রকাশ পেল যে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদান করাই যথেষ্ট নয়, দৈনন্দিন জীবনে তাকে কিভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে বিষয়ও তাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(xi) **কক্স পরিচালিত পরীক্ষা:** শিল্পের ক্ষেত্রেও শিখনের সঞ্চালনকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা যেতে পারে। একজন শিক্ষানবীশকে সাধারণ ধরনের শিক্ষা দিলেই কি যথেষ্ট হয় বা তাকে খুঁটিনাটি প্রতিটি কার্যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য কক্স (*Cox*) তিনটি দলকে নির্বাচন করলেন। এই তিনটি দলই প্রদীপের অংশ জোড়া লাগানো এবং পৃথক করার কাজে অনুশীলনে রত। প্রথম পরীক্ষায় দেখা গেল সব কয়টি দলই সমান দক্ষ। প্রথম দলকে সাধারণ ধরনের কাজ করতে দেওয়া হল, দ্বিতীয় দলকে কাজ করতে দেওয়া হল কিন্তু কোন নির্দেশ দেওয়া হল না। প্রায় ১১ দিন ধরে তাদের কতকগুলি অংশ জোড়া লাগাতে এবং পৃথক করতে বলা হল। তৃতীয় দলটিকে এই ১১ দিন ধরে প্রত্যেক দিনটিতে বিশেষ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হল। যেমন, কিভাবে জিনিসটাকে সাজাতে হবে, কোন্ কাজ করার সময় কোন্ দিকে নজর দিতে হবে, বিভিন্ন অংশের আকারের দিকে এবং তাদের স্থানগত সম্পর্কের প্রতি কতখানি মনোযোগী হতে হবে, কাজের সময় মনোযোগ ও প্রচেষ্টার ব্যাপারে কতখানি মিতব্যয়ী হওয়া যায় ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে যখন তিনটি দলেরই পরীক্ষা নেওয়া হল তখন দেখা গেল প্রথম দুটি দলের তুলনায় তৃতীয় দলের কাজের উৎকর্ষ অধিক। দ্বিতীয় দল প্রথম দলের তুলনায় কোন উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারে নি। কক্স সিদ্ধান্ত করলেন যে, কোন বিষয়ের শিখনে সেই বিষয় সম্পর্কিত সাধারণ সূত্র বা নিয়মগুলি যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে শিখনের সদর্থক সঞ্চালন (positive transfer) ঘটে। যাঁরা হস্তশিল্পে বা খেলাধুলার শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত তাঁদের পক্ষে এই পরীক্ষণের ফলাফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিছক অনুশীলনের তুলনায় সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান অনেক বেশি মূল্যবান।

অন্যান্য পরীক্ষণের ফলাফল: সমস্যা-সমাধান শিক্ষাসম্পর্কে শিক্ষাবিদ জে. ডি. উইলিয়মস বলেন সাধারণতঃ শিক্ষকেরা ধারণা করেন যে, শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় নীতিগুলি জানতে পারে এবং অন্য সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সেই শিক্ষাকে সঞ্চালিত করতে পারে। কিন্তু এ সম্পর্কে নানা গবেষণা চালিয়ে দেখা যায় যে কোন একটি মাত্র সমস্যা সম্পর্কে অল্প শিক্ষা দেওয়া হলে শিখনের সঞ্চালন ভাল হয়। আবার একাধিক সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হলে শিখনের সঞ্চালন ভাল হয়। কাজেই, যখন সময় সংক্ষিপ্ত, শিক্ষার্থীর স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন বা কাজের কলাকৌশল কঠিন, তখন অল্প সমস্যাসম্পর্কে অধিকতর শিক্ষা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

যখন শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বা পারদর্শিতা বেশি তখন সমস্যার বৈচিত্র্য যত অধিক হয় তত ভাল। উইলিয়ম-এর মতে বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যখন শিশু কোন একটি সমস্যার সমাধান নিজেই আবিষ্কার করতে পারে তখন অন্যান্য সমাধানের ক্ষেত্রে সেই কলাকৌশল প্রয়োগের ব্যাপারে শিখনের সঞ্চালন তার পক্ষে অনেক বেশি সম্ভব হয়।

কোন কোন লেখক শিখন সঞ্চালনের ব্যাপারে আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ: কোন একটি বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাকে আদর্শ বা লক্ষ্যরূপে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করতে পারলে, সেই শিখন অন্য বিষয়েও সঞ্চালিত হতে পারে। কিন্তু আদর্শরূপে উপস্থাপিত না করলে, শিক্ষার্থী হয়ত পাটিগণিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য নম্বর পেতে পারে, কিন্তু ভূগোলে নাও পেতে পারে। আসলে শিখন সঞ্চালনের ক্ষেত্রে সচেতন সামান্যী-করণের (cautious generalisation) যথেষ্ট মূল্য আছে' পদ্ধতি নীতি এবং আদর্শের সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা বেশি যখন শিক্ষার্থী তাদের প্রকৃতি এবং সাধারণ প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সচেতন থাকে।

জেমসের শিখন সঞ্চালন সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণার পর শিখন সঞ্চালন সম্পর্কে অনেক পরীক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে। এই সকল পরীক্ষণের ফলাফল প্রকৃতি এবং পরিমাণের দিক থেকে ভিন্ন ধরনের হয়েছে। প্রকৃতির দিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে সঞ্চালন হয়েছে সদর্থক (positive), কোন কোন ক্ষেত্রে নঙর্থক (negative) এবং কখনও হয়েছে শূন্য বা অনির্দিষ্ট (nil or indefinite)। পরিমাণের দিক থেকে এই সঞ্চালন কখনও খুব বেশি, কখনও কম আবার কখনও মাঝামাঝি। ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত শিখন সঞ্চালনের উপর বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা যে সব পরীক্ষণ পরিচালনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ওরাটা (*R. T. Orata)* সিদ্ধান্ত করেন যে, শতকরা ২৮টি ক্ষেত্রে খুব বেশী পরিমাণে শিখন সঞ্চালন হয়েছে। শতকরা ৪৮টি ক্ষেত্রে মাঝামাঝি সঞ্চালন হয়েছে, শতকরা ৯টির ক্ষেত্রে সঞ্চালন হয়েছে অল্প, শতকরা ৩'৬ ক্ষেত্রে কোন সঞ্চালন হয়নি এবং অবশিষ্ট শতকরা ১১'৪ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। ওরাটা ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ২১১টি সঞ্চালন পরীক্ষার বিশ্লেষণ করেন এবং তার থেকেও সিদ্ধান্ত করেন যে, শতকরা ৮০টির বেলায় সঞ্চালন হয়েছে।

স্কুল পাঠ্য বিষয়ে শিখনের সঞ্চালন (Transfer in School Subjects): স্কুল পাঠ্যবিষয়ে শিখনের সঞ্চালন সম্পর্কে নানাধরনের পরীক্ষা পরিচালনা করা

হয়েছে। এই সব পরীক্ষার ফলাফলগুলিকে বিশ্লেষণ করলে স্কুল পাঠ্যবিষয়গুলিতে কি ধরনের সঞ্চালন হয়, তা জানা যায়। নীচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

বিগ্রস এর পরীক্ষা

ব্যাকরণ পাঠের সঞ্চালন ক্ষমতা কতটুকু এ-সম্পর্কে বিগ্রস (*Briggs*) যে পরীক্ষা চালান তা থেকে জানা যায় যে ব্যাকরণ শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। একমাত্র মিল ও অমিল খুঁজে বার করার ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন গুণ ব্যাকরণ শেখা থেকে সঞ্চালিত হয় না।

উইঞ্চ-এর পরীক্ষা

গণিত শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে উইঞ্চ (*Winch*) যে পরীক্ষণ পরিচালনা করেন তা থেকে জানা যায় যে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা কেবল গণিত শেখার উপর নির্ভরশীল নয়, অন্যান্য বিষয়ের শেখার উপরও নির্ভর করে। তিনি একদল ছাত্রকে কিছুদিন ধরে গণিত শিক্ষা দেবার পর দেখেন যে তাদের গাণিতিক বিচারকরণের সঞ্চালনের শতকরা তিরিশ ভাগ অন্য পরিস্থিতিতে হয়েছে।

রাগ-এর পরীক্ষা

জ্যামিতি শিক্ষার সঞ্চালন অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ে কতটুকু হয়, সে সম্পর্কে রাগ (*H. O. Rugg*) নামে জনৈক মনোবিজ্ঞানী এক পরীক্ষা চালান। ঐ পরীক্ষণের ফলের ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে জ্যামিতিতে বিশেষ শিক্ষাদান অন্যান্য জ্যামিতিক সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে শতকরা ৩২ ভাগ সঞ্চালিত হয় এবং জ্যামিতি ভিন্ন অন্য বিষয়ে সঞ্চালিত হয় মাত্র শতকরা ৭ ভাগ। স্কুলে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য নিরূপনের জন্য অল্প পরীক্ষা চালান হয়েছে, এই পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে ল্যাটিন ভাষার সঞ্চালন মূল্য সমধিক। যে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেছে, যারা ল্যাটিন শিক্ষা করেনি এমন ছাত্রদের থেকে অল্প উন্নত হয়। ইংরেজী ভাষা শিখনের উপর

কক্স-এর পরীক্ষা

ল্যাটিন শিখার প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা পরিচালনা করতে গিয়ে কক্স (*Coxe*) দেখেন যে ল্যাটিন ভাষা শেখা ইংরাজী শেখার ক্ষেত্রে নানা ব্যাপারে সহায়ক হয়। এই সব ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা ল্যাটিন ভাষা প্রসূত ইংরেজী শব্দগুলি তাড়াতাড়ি শেখে, ইংরেজী বানানও ভাল পারে। তবে এই সঞ্চালন অধিককাল স্থায়ী হয় না। কেননা পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে ল্যাটিন ভাষা জানা ও না-জানা উভয়ই প্রায় সব বিষয়ে সমান পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হচ্ছে।

উদ্ভিদ-বিদ্যা শেখার সঞ্চালন মূল্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে হিউইন্স (*Hewins*) যে, পরীক্ষন চালান, তার উদ্দেশ্য হল উদ্ভিদ বিদ্যার-শিক্ষা সাধারণ-ভাবে পর্যবেক্ষন

ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে কিনা। তিনি পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে শিক্ষার্থীরা উদ্ভিদ বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষাকে শতকরা ৩৩ ভাগ সঞ্চালিত করতে পারে, কিন্তু সাধারণ কোন বিষয়ে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে শতকরা ৪.৫% ভাগ সঞ্চালিত করতে পারে।

হিলল-এর পরীক্ষা

বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের আবষিক সঞ্চালন মূল্য, এবং এক বছরে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের শিখন কিভাবে সাধারণ পুস্তকে প্রভাবিত করে নিরূপনের জন্য থর্নডাইক (*Thorndike*) পরীক্ষণ চালান। এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে এক বছরে বিভিন্ন বিষয়ের শিখন সাধারণ পরিস্থিতিতে তেইশ ভাগ সঞ্চালিত হয়। থর্নডাইক আরও সিদ্ধান্ত করলেন যে সঞ্চালনের পরিমাণ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধ্যাঙ্কের (I. Q.) উপর নির্ভর। বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের আপেক্ষিক সঞ্চালন মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে সেটি বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিমাণ হয়ে থাকে। যেমন—জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে −০.২, ব্যায়াম খেলাধূলার ক্ষেত্রে +০.৮, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে +২.৭।

থর্নডাইক-এর পরীক্ষা

উপরিউক্ত গবেষণার ভিত্তিতে শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত *: শিখন সঞ্চালন তত্ত্বটির উপর সম্পাদিত বিভিন্ন পরীক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে শিখন লঞ্চালিত হয়। তবে এটি একটি সার্বিক ঘটনা নয়। কোন বিষয় শিক্ষা করার পর পরবর্তী বিষয় শিখনের সময় পূর্ববর্তী শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যাবেই, এমন কোন কথা নেই। কোন বিষয় শিখনের পর, পরবর্তী কোন বিষয় শিখনের উপর বা পরবর্তী কোন কার্য সম্পাদনের উপর সেই শিখন সঞ্চালিত হবে কিনা, সে সম্পর্কে পূর্ব থেকে কোন ভবিষ্যৎ বাণী করা সম্ভব নয়। শিখনের সঞ্চালন সীমিতভাবে ঘটে এবং বিশেষ বিষয়, ব্যাপক নীতি পদ্ধতি, আদর্শ, মনোভাব এগুলিই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু যদি এই সব বিষয়গুলির দিকে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা না হয় এবং তাদের মূল্য ও প্রয়োগসম্পর্কে তাদের অবহিত করান না হয় এগুলিরও তবে সঞ্চালন ঘটে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সদর্থক সঞ্চালন (positive transfer) ঘটে কিনা, অর্থাৎ কিনা এক পরিস্থিতিতে যে দক্ষতা অর্জন করা হয় তা অন্য পরিস্থিতিতে কোন বিষয়ের শিখনে বা সম্পাদনে সহায়ক হয় কিনা, এই প্রশ্নই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

* **K. Lovell: Educational Psychology and Children. Page 195.**

শিখনের সদর্থক সঞ্চালন কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, অধীত বিষয় এবং অধীতব্য বিষয়, এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলে সদর্থক সঞ্চালন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। থর্নডাইক (*Thorndike*)-এর মতে, যোগে দক্ষতা, গুণনে দক্ষতা-লাভে সহায়তা করে। পুরাতন পরিস্থিতির ও নতুন পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য সদর্থক সঞ্চালনে সহায়তা করে উদ্দীপক সামান্যীকরণের (**Stimulus generalisation**) জন্য। নতুন পরিস্থিতি বা উদ্দীপক এবং পুরাতন পরিস্থিতি বা উদ্দীপক, উভয়ের সাদৃশ্যই ব্যক্তির কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, উভয়ের পার্থক্যের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। নতুন পরিস্থিতিকে ব্যক্তি পুরাতন পরিস্থিতির সঙ্গে এক করে দেখে। কাজেই ব্যক্তি পুরাতন পরিস্থিতিতে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করেছে নতুন পরিস্থিতিতে সেভাবে প্রতিক্রিয়া করে বলেই সদর্থক সঞ্চালন ঘটে থাকে। অবশ্য সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া না করে, উভয় উদ্দীপকের পশ্চাতে যে মূল নীতি বর্তমান তার জ্ঞানই সদর্থক সঞ্চালনকে সম্ভব করে তোলে। দ্বিতীয়তঃ, শিখনের সদর্থক সঞ্চালনের ব্যাপারে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে শিশু যত বুদ্ধিমান হয়, সে শিশু তত শিখনকে সঞ্চালিত করতে পারে। তৃতীয়তঃ, শিখন-সঞ্চালনের ব্যাপকতা নির্ভর করে মূল শিখনের ব্যাপকতা, গভীরতা এবং সম্পূর্ণতার উপর। যদি মূল শিখনের পরিমাণ খুব কম হয় তাহলে খুব স্বল্প পরিমাণে সঞ্চালন ঘটতে পারে। চতুর্থতঃ, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহের দিকে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হলে, শিখন-সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা বেশি থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, ভূগোল পাঠ করার পর শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেন দৈনন্দিন জীবনে ভূগোলের জ্ঞানকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে শিখন-সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা অনেক বেশি থাকে। পঞ্চমতঃ, শিক্ষাদানের সময় যদি যন্ত্রপাতি এবং নানারকম উপাদানের ব্যবহার করা হয়, তাহলে এগুলির প্রয়োগবিধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া শিখন-সঞ্চালনের পক্ষে সহায়ক হয়। নীতিগুলির প্রয়োগের ব্যাপারেও শিক্ষার্থীর কিছুটা অনুশীলনের প্রয়োজন যার ফলে শিক্ষার্থী এমন একটি কৌশল আয়ত্ত করতে পারে, যা ঐ ধরনের অন্য কাজে সদর্থক সঞ্চালনকে সম্ভব করে তোলে। ষষ্ঠতঃ, শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব প্রভৃতিও শিখন-সঞ্চালনে সহায়তা করে। সর্বশেষে, বলা যেতে পারে যে, কোন বিষয় বা কলাকৌশল সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান পারদর্শিতা ব্যক্তির মনোবল এমনভাবে গঠিত করে যে অন্য শিখনে বা অন্য কোন কার্য-সম্পাদনে শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে। আরও দেখা গেছে যে, শিখন পরিস্থিতিতে নির্ভুল সমাধানের ইঙ্গিতটা খুঁজে বার করার কৌশল কিভাবে

আয়ত্ত করা যায় তা যদি শিক্ষা করা যায় তাহলে সেই শিখন অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হতে পারে।

(ঙ) **শিখন-সঞ্চালন কিভাবে ঘটে ? (How is Training Transferred ?) :** শিখন-সঞ্চালন কিভাবে ঘটে, তার ব্যাখ্যারূপে আমরা কয়েকটি মতবাদের সন্ধান পাই। নীচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ আলোচনা করা হচ্ছে :

(i) **অভিন্ন উপাদান মতবাদ (Theory of Identical Elements) :** থর্নডাইক এই মতবাদের প্রবর্তক। একটি শিখন পরিস্থিতি আর একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে ততটুকুই প্রভাবিত করতে পারে, যতটুকু অভিন্ন উপাদান এ দুটি পরিস্থিতির মধ্যে বর্তমান থাকে। অর্থাৎ, পুরাতন পরিস্থিতি ও নতুন পরিস্থিতির মধ্যে যে উপাদানটুকু অভিন্ন, পূর্বপরিস্থিতি থেকে নতুন পরিস্থিতিতে সেই উপাদান-টুকুরই সঞ্চালন ঘটবে। এই মতবাদ অনুসারে শিখনের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, উদ্দেশ্যের অভিন্নতাও এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, কোন ছাত্রের যোগ অঙ্কে ব্যুৎপত্তি তাকে গুণ অঙ্কে পারদর্শী করে তুলবে। গুণ অঙ্কের একটা অংশের সঙ্গে যোগ অঙ্কের পুরোপুরি অভিন্নতা রয়েছে। থর্নডাইকের মতে এই অভিন্ন অংশটির ক্ষেত্রেই শিখনের সঞ্চালন ঘটবে। একটি ছাত্র দুটি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেল। থর্নডাইকের মতে উক্ত দুটি বিষয়ের একটি আর একটিতে সহায়তা করতে পারে যদি দুটির মধ্যে কিছু অংশ অভিন্ন থাকে, তা না হলে নয়। একটি ছাত্র ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করতে পারলেই যে ইতিহাসের সন তারিখ সহজে মুখস্থ করতে পারে এমন কোন কথা নেই ; কেননা, দুটি বিষয়ের পাঠে অভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার অভাব। যদি কোন ছাত্র ব্যবসায়ী হতে চায় তাহলে অর্থনীতি তাকে যতখানি সাহায্য করতে পারবে, ইতিহাস ততখানি পারবে না। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নশাস্ত্র পাঠ না করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠেই একজন রাজনীতিবিদ্ বেশি উপকৃত হবেন।

(ii) **সামান্যীকরণ মতবাদ (Theory of Generalisation) :** সামান্যীকরণ মতবাদের ভিত্তিতে জাড (*Judd*) শিখন-সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জাড-এর মতে উপাদানের অভিন্নতার জন্য শিখন-সঞ্চালন ঘটে না। ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার কতটা সামান্যীকরণ করতে পারল তারই উপর শিখন-সঞ্চালন নির্ভর করে। কোন শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্যকে বুঝে নেবার প্রক্রিয়াই হল সামান্যীকরণ। বানার্ড বলেন, "সামান্যীকরণ হল এক ধরনের উপলব্ধি যা নতুন শিখন পরিস্থিতিতে প্রয়োগের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে।" অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের অর্থ হল বিভিন্ন অভিজ্ঞতার অবান্তর লক্ষণগুলি বর্জন করে,

সেগুলির সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলিকে পৃথক করে নিয়ে ঐগুলি সম্পর্কে সামান্য সূত্র (general principles) গঠন করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছাত্র রসায়ণাগারে একটি পরীক্ষণকার্যে সফলতা লাভ করল। যদি ছাত্রটি ঐ পরীক্ষণকার্যে যে সূত্রগুলি কার্যকর হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত না হয়, তাহলে তার শিখনকে নতুন পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করতে পারবে না।

এই মতবাদের সমর্থনে জাড যে পরীক্ষণকার্যটি সম্পাদনা করেছিলেন, সেটি ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আলোর প্রতিসরণের নীতিটি পরীক্ষণ দলকে বুঝিয়ে বলার জন্যই, তাদের ভুলত্রুটি নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় অনেক কম হয়েছিল। জাডের উক্ত পরীক্ষণ থর্নডাইকের উপাদানের অভিন্নতা মতবাদের অযথার্থতা নির্দেশ করে। উপাদানের অভিন্নতার উপর যদি শিখন-সঞ্চালন নির্ভর করে তাহলে নিয়ন্ত্রিত দলকে যখন দ্বিতীয়বার লক্ষ্য ভেদ করতে দেওয়া হল তখন প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পরিস্থিতিতে উপাদানের অভিন্নতার জন্য নিয়ন্ত্রিত দলের শিখনের সঞ্চালন ঘটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আসলে তা ঘটে নি। পরীক্ষণ দলের সাফল্যের মূলে ছিল আলোর প্রতিসরণ সূত্রটি সম্বন্ধে যে শিখন হয়েছিল সেটিকে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করা। উপাদানের অভিন্নতাই যদি কারণ হত তাহলে নিয়ন্ত্রিত দলও লক্ষ্যভেদে সফলতা লাভ করত।

(iii) **অভিস্থাপন মতবাদ** বা **গেস্টাল্ট মতবাদ** (Transposition Theory or Gestalt Theory): গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিখন হল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কোন বিশেষ সমস্যার সমগ্র রূপটি বুঝে নিয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সেটি জানা। অন্তর্দৃষ্টি হল কোন সমস্যার বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে পূর্ণ সমস্যাটির সম্বন্ধ সমগ্ররূপে উপলব্ধি করা। এইভাবে যে শিখন ঘটে সেই শিখনই সঞ্চালিত হয়। প্রথম শিখন-পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং তাদের মধ্যে যে অখণ্ড সমগ্রতার প্রত্যক্ষণ ঘটে, পরবর্তী পরিস্থিতিতে তার অভিস্থাপন (Transposition) হল সঞ্চালন। প্রথম পরিস্থিতিতে সমগ্র এবং অংশের পারস্পরিক সংযোগ অবধারণকে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করতে পারাই শিখনের সঞ্চালন।

কোয়লার (*Kohler*)-এর পরীক্ষণে দেখা গিয়েছিল, শিম্পাঞ্জীটি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যে সম্বন্ধ এবং তাদের পারস্পরিক তাৎপর্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেছিল। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিখন আয়ত্ত করার জন্য শিম্পাঞ্জীটি ভবিষ্যতে নতুন পরিস্থিতিতে তার শিখনকে সহজেই সঞ্চালিত করতে সমর্থ হত। শিম্পাঞ্জীটি যখন তার প্রথম দিনের শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের, যেমন—দুটি

বাঁশের টুকরা, খাঁচা, কলা প্রভৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করেছিল এবং বিভিন্ন উপাদানগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশরূপে প্রত্যক্ষ না করে তাদের মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল তখন সেই প্রত্যক্ষণকেই দ্বিতীয় দিনের পরিস্থিতিতে অভিস্থাপনে সমর্থ হল এবং তার ফলে সহজেই সমস্যার সমাধানে সমর্থ হল।

গেস্টাল্টবাদীদের অভিস্থাপন মতবাদ থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদান মতবাদের বিরোধী মতবাদ। থর্নডাইকের মতবাদ অনুসারে শিখন-সঞ্চালনের জন্য প্রথম শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের অভিন্নতা নির্ধারণ করতে হবে।

আর গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিখনের সঞ্চালন ঘটাতে গেলে দরকার শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, তার সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। জাডের সামান্যী-করণ মতবাদের সঙ্গে মূল বিষয়ের দিক থেকে এই মতবাদের মিল লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন মতবাদের সমালোচনা ঃ থর্নডাইকের 'অভিন্ন উপাদানের মতবাদ' শিখন-সঞ্চালনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয় না, কেননা অনেক সময় দুটি শিখন-পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের অভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও, শিখন সঞ্চালিত হয় না। জাডের পরীক্ষণকার্য থর্নডাইকের 'অভিন্ন উপাদান মতবাদের' অসারতাই প্রমাণ করে। অনেক পরীক্ষণে দেখা গেছে, উপাদানের অভিন্নতা শিখন-সঞ্চালনকে ব্যাহত করে। অনেকে মনে করেন যে থর্নডাইক শিখন-সঞ্চালনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন কেননা সঞ্চালনের জন্য যে শিক্ষার্থীর অনুরাগ, আগ্রহ, তাড়না প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, তার উল্লেখ থর্নডাইক করেন নি। তিনি যে বলেছেন শিখন-সঞ্চালনের পরিমাণ অভিন্ন উপাদানের পরিমাণের সমানুপাতী, তাও যথার্থ নয়। থর্নডাইকের মৌলিক উপাদান কতখানি মৌলিক, সে সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। যোগ, গুণ ইত্যাদির নামতাকে অনেকে মৌলিক অভিজ্ঞতা মনে করেন না। ওরাটা (*P. T. Orata*) মনে করেন যে, যেহেতু এক্ষেত্রে উপাদানের পুনরাবৃত্তির দ্বারাই সঞ্চালন হয়। মাধ্যমের (Vehicle) পরিবর্তন হয় না, তাই এই পরিবর্তনকে সঞ্চালন বলা চলে না।

জাডের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ মতবাদ শিখনের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর কোন মূল্য আরোপ না করে শিখনের পদ্ধতির উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিখন-সঞ্চালনের জন্য যথাযথ শিখন-পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতির জ্ঞানও উপেক্ষার বিষয় নয়।

'অভিন্ন উপাদান মতবাদ' এবং 'সামান্যীকরণ মতবাদকে' আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের বিরুদ্ধতত্ত্ব মনে হবে। প্রথমটিতে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার উপর এবং দ্বিতীয়টিতে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী কোলেসনিক (*Kolesnik*) মনে করেন যে "এই দুই মতবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ নয় বরং পরস্পরের পরিপূরক; এক সঙ্গে বিচার করলে তারা নির্দেশ করবে সঞ্চালন কিভাবে ঘটে এবং কিভাবে সঞ্চালনকে সহজ করে তোলা যেতে পারে।"[1] সামান্যীকরণের ও তার সঞ্চালনের জন্যও অভিন্ন বা সাধারণ উপাদান অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

গেস্টাল্টবাদে বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি উভয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সংযোগের উপলব্ধি এবং সমগ্র শিখন-পরিস্থিতির অখণ্ড সামগ্রিক রূপটির জ্ঞানই হল যথার্থ শিখন যা সঞ্চালনকে সম্ভব করে তোলে। গেস্টাল্টবাদীদের মতে শিখন-প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টি, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিকে একটা নীতি বা সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়া কবার কথা বলা হলে প্রকৃতপক্ষে 'অন্তর্দৃষ্টি' শব্দটিব যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। অন্তর্দৃষ্টির উৎস যে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন-পদ্ধতি' তা কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না।

(চ) শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষকের কর্তব্য: যেহেতু শিখন-সঞ্চালন মতবাদ অসার মতবাদ নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে শিখন-সঞ্চালিত হয়, সেহেতু শিখন-সঞ্চালনের ব্যাপারে শিক্ষকেব কর্তব্য কতটুকু তা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে এমন কোন মতবাদ আবিষ্কৃত হয় নি, যার সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিখন-সঞ্চালনের নির্ভুল সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে, সেহেতু শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে এযাবৎ যে সমস্ত পরীক্ষণকার্য পরিচালিত হয়েছে তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই শিখন-সঞ্চালনের ব্যাপারে শিক্ষককে অগ্রসর হতে হবে।

আমাদের মনের মধ্যে পৃথক পৃথক শক্তি আছে, কতকগুলি মূল শাস্ত্র অধ্যয়নে মনের স্থায়ী উৎকর্ষ সাধিত হয়—এই মতবাদ অসার মতবাদ, কাজেই এই লক্ষ্য নিয়ে

1. These two theories may be regarded as supplementary rather than mutually opposed, considered together, they indicate how transfer takes place and how it can be facilitated." —W. B. Kolesnik: Educational Psychology

শিক্ষকের শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় শিক্ষাদান করা উচিত হবে না। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, যে কোন বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যমেই মানসিক উন্নতি সম্ভব। যথাযথভাবে শিক্ষা দিলে কোন পাঠ্যবিষয়ই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যে কোন বিষয় যথাযথ শিক্ষাদানে মানসিক উন্নতি সম্ভব

শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে শিক্ষকের করণীয় হল; প্রথমতঃ, শিখন-সঞ্চালনের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করা। অর্থাৎ কিনা, কোন্ পরিস্থিতিতে কি শিক্ষা করলে সেটি অন্য পরিস্থিতিতে কোন বিষয় শিখনে সহায়ক হয় এবং শিখন-সঞ্চালন মোটামুটি কি কি শর্তের উপরে নির্ভরশীল, সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা দরকার। শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক গবেষণার ফলাফলগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের অবহিত হওয়া দরকার। তা ছাড়া কি শিখছে, কেন শিখছে শিক্ষার্থীকে সে সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কাজেই শিক্ষককে শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, সব মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিখন-সঞ্চালনের সাফল্য নির্ভর করে শিখনের গভীরতা ও সম্পূর্ণতার উপরে, কাজেই এই ব্যাপারে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত হতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয় বোধগম্য হলেই তার সঞ্চালন সহজতর হবে। শিক্ষককে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যাতে পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীর বোধগম্য হয়। এইজন্য প্রয়োজন হলে তাঁকে শিখন সহায়ক কৌশলের (Teaching aids) সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়ের অনুশীলন পাঠ্যবস্তুর উপলব্ধিকে সহজতর করে তোলে। এ সম্পর্কে শিক্ষককে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ, যে পরিস্থিতি থেকে শিখন অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে, সেই দুটি পরিস্থিতির পশ্চাতে যে মূল সূত্র ক্রিয়া করছে সেটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করাতে হবে। ক্রোন্‌বাক (*Cronback*)-এর মতে শিক্ষার্থীকে সেই সূত্রটি নির্ভুল ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে যে ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রয়োগ করা যায় সেসব দিকে তাকে মনোযোগ দিতে হবে। বিচিত্র এবং জটিল পরিস্থিতিতে সেই সূত্রটির প্রয়োগ শিক্ষার্থীকে চিনে নিতে হবে। চতুর্থতঃ, পাঠ্যবিষয়ের অর্থ অবধারণ। বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বোধ, দুটি পরিস্থিতির অভিন্ন উপাদানগুলি অনুধাবন করার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রী যাতে সমর্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষকের কর্তব্য। সঞ্চালনের জন্য বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর মধ্যে যে মিল, তার দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সমস্যাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির-পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা। পঞ্চমতঃ,

শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে পাঠ্যবিষয়ের সংগঠন সুসঙ্গতিপূর্ণ ও সুপরিকল্পিত হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে মূলগত ধারণা এবং মতবাদগুলি সহজে অনুধাবন করতে পারবে। ষষ্ঠতঃ, অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণ শিখন-সঞ্চালনের সহায়ক প্রক্রিয়া। সে কারণে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে হবে যাতে পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সামান্য সূত্র গঠন করার ক্ষমতা শিক্ষার্থী লাভ করে। সমগ্রতঃ, পদ্ধতি, নীতি, আদর্শ প্রভৃতিই এক পরিস্থিতি থেকে অন্য পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়, কাজেই এগুলির প্রয়োগের উপর শিক্ষকের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবনের মূল আদর্শের সঙ্গে শিখনকে সংযুক্ত করতে পারলে সঞ্চালন সহজতর হয়। সর্বশেষে, মনোযোগী হওয়ার অভ্যাস, পর্যবেক্ষণ করা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করার ক্ষমতা, বিচারকরণের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি যাতে শিক্ষার্থী ঠিকমত সম্পাদন করতে পারে সে সম্পর্কে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনমত সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতে হবে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে সঞ্চালনের জন্য তিন ধরনের বিশেষ কার্যের প্রয়োজন। সেগুলি হল: সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা (Planning for transfer), সঞ্চালনের জন্য পাঠদান (teaching for transfer) এবং সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা (education for transfer)। এগুলির গুরুত্বের কথা শিক্ষক অবশ্যই ভেবে দেখবেন।

নবম অধ্যায়

ব্যক্তিত্ব

(Personality)

১। ব্যক্তিত্ব বলতে কি বোঝায় ? (What is Personality ?) :

ব্যক্তিত্বের লৌকিক ব্যাখ্যা

'ব্যক্তিত্ব' শব্দটির লৌকিক ব্যাখ্যা তার মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থেকে পৃথক। সাধারণতঃ স্বাতন্ত্র্য (Individuality) এবং অনন্যতা (uniqueness) ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ব্যক্তির সেই বৈশিষ্ট্য যার জন্য সে অন্য ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র। এ কারণে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ব্যক্তিত্ব হল সেই বৈশিষ্ট্য যা একই ধরনের বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে একই অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া করায়।

ব্যক্তিত্ব শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

দৈনন্দিন জীবনে 'ব্যক্তিত্ব' শব্দটিকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। যে ব্যক্তি তার কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, চালচলনে অপরের মনের উপর একটা ছাপ রেখে যায়, সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। ইংরেজী 'Personality' শব্দটির আদি অর্থের সঙ্গে এই জাতীয় লৌকিক ব্যাখ্যার একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজী পার্সোনালিটি শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ পার্সোনা (*Parsona*) থেকে। পার্সোনা শব্দটির অর্থ হল 'মুখোশ'। প্রাচীনকালে রোমে অভিনেতারা মুখোশ পরে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য অবতীর্ণ হতেন। সুতরাং পার্সোনালিটি শব্দটির উৎপত্তি যে শব্দটি থেকে সেটি আদিতে একটা ছদ্ম, মিথ্যা বা বিকৃত রূপ বা ব্যক্তি যেভাবে অপরের কাছে প্রকাশিত হয়, তাকেই বোঝাত। পরবর্তীকালে পার্সোনা শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। শব্দটির অর্থ হয়ে দাঁড়ায় নাটকের অভিনেতা। এই অর্থেও ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আসল স্বরূপকে না বুঝিয়ে নাটকে অভিনীত রূপকে বোঝাত।

আবার ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা মনে করি ব্যক্তির কতকগুলি অসাধারণ গুণ যা ব্যক্তিকে অপরের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। আবার কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে, ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির সেই অন্তর্নিহিত সারবত্তা (inner essence) বা

আসল সত্তা যা ব্যক্তির পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই অর্থ অনুসারে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ এবং ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না, সকল প্রকাশের অন্তরালে অজ্ঞাত থেকে যায়।

ব্যক্তিত্বের লৌকিক বা দার্শনিক ব্যাখ্যা মনোবিদ্যায় গ্রহণ করা হয় না

মনোবিদ্যার দিক থেকে ব্যক্তিত্বের পূর্বোক্ত লৌকিক ব্যাখ্যা এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাতন্ত্র্য ও অসাধারণত্ব ছাড়াও ব্যক্তি তার চিন্তা, প্রবণতা, গুণ, আগ্রহ এবং জীবনাদর্শ নিয়ে এক বিস্ময়কর জটিল সংগঠন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূলে আছে ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং জাগতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির অভিযোজন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায় এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা কোনমতেই যুক্তিসংগত নয়। কাজেই অপরের মনের উপর রেখাপাত করা বা অপরের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলাকেই ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বলা চলে না।[1]

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সমার্থক শব্দ নয়

অনেক সময় ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারাকে বোঝান হয়। আবার সময় সময় ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র এ দুটিকে সমার্থক শব্দ মনে করা হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের এ জাতীয় ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তিত্ব বলতে যদি বুঝি ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারা, তাহলে ব্যক্তিত্বের মানসিক দিকটিরই উল্লেখ করা হবে, যে আচরণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তার কোন উল্লেখ করা হবে না। ব্যক্তিত্বকে 'চরিত্রের' সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাও যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব চরিত্র থেকে ব্যাপকতর এবং চরিত্রকে ব্যক্তিত্বের একাধিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান মনে করা যেতে পারে।[2] ব্যক্তিত্বের সব উপাদানের নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। অলপোর্টের (*Allport*) মতে, 'ব্যক্তিত্বের যখন নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তখন তা হয় চরিত্র, আর চরিত্র থেকে নৈতিক মূল্যায়নের বিষয়টুকু যখন বাদ দেওয়া হয় তখন আমরা পাই

---

1. "Colloquial speech influenced by the idols of the theatre and the market place, equate personality with charm, with 'It', with superfical attractiveness."
—G. Allport: Personality—Page 40.

"......Personality is conceived by most people as an intengible quality that makes an individual attractive or unattractive to his fellows. Psychology uses the word personality in a much broader meaning".
—Boring and others: Foundations of Psychology, page 487.

2. "......Personality is the broader term including character as one of its aspects". —Thorpe: Psychological Foundation of Personality.

ব্যক্তিত্ব।[1] যদি বলা হয়, বাহ্যিক কার্যাবলী যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে, তার সমন্বয়ই ব্যক্তিত্ব, তাহলে ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হল না। 'অপরিবর্তনশীল আত্মাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব'—ব্যক্তিত্বের এ জাতীয় ব্যাখ্যা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়; এরকম দার্শনিক আলোচনা মনোবিদ্যার মধ্যে টেনে না আনাই যুক্তিযুক্ত।

কেউ কেউ আবার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিকে অভিন্ন মনে করেন। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক আছে। কিন্তু সে কারণে তাদের অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়।

২। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা (Definition of Personality):

ব্যক্তিত্ব জটিল বিষয় এবং ব্যক্তিত্বের নিখুঁত সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন।[2]

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন মনোবিদ্ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। অলপোর্ট তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর লেখা গ্রন্থে প্রায় পঞ্চাশটি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সংজ্ঞাগুলি দেওয়া হয়েছে বলে কোন সংজ্ঞাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্বরূপটিকে প্রকাশ করতে পারেনি।

মনোবিদ্ **উডওয়ার্থ** (*Woodworth*) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, ব্যক্তিত্ব হল 'ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক প্রকৃতি।'[3] কিন্তু সামগ্রিক প্রকৃতিটি বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের এই ঐক্যসূত্রটি কি, তা উডওয়ার্থ ব্যাখ্যা করেন নি। কোন

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা

কোন মনোবিদ্ তাঁদের সংজ্ঞাতে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্যসাধন বা অভিযোজনের শক্তিকেই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন। মনোবিদ্ **ওয়াটসন্** (*Watson*)-এর মতে উদ্দীপক জীবদেহের উপর ক্রিয়া করার জন্য যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেই প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিই হল ব্যক্তিত্ব; কিন্তু ওয়াটসনের সংজ্ঞাতে ব্যক্তিত্বের মানসিক এবং উদ্দেশ্যমূলক দিককে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। মনোবিদ্ **বোরিং** (*Boring*) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—ব্যক্তিত্ব হল, 'ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে এক বিশেষ ধরনের সঙ্গতিপূর্ণ অভিযোজন।'[4]

1. "Character is personality evaluated and personality is character devaluated." —Allport : Personality ; Page 52.

2. "Personality is intrinsically complex : we can offer no simple formula for reducing its rich variety to a dry definition." —Stagner : Psychology of Personality.

3. "Personality can be broadly defined as the total quality of an individual's behaviour." —Woodworth : Psychology : Page 139.

4. "It is defined as an individual's typical or consistent adjustment to his environment." —Boring : Foundations of Psychology : Page. 488.

গ্যারেট (*H. E. Garrett*)-এর মতে 'ব্যক্তিত্ব হল আচরণের বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি। তাঁর মতে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যে বিশেষ ধরনের বা রীতিতে প্রক্রিয়া করে তার মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। মনোবিদ্ **ম্যাকডুগাল**-এর মতে ব্যক্তিত্ব কতকগুলি সহজাত বৃত্তির ক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। কেউবা ব্যক্তিবিশেষের অর্জিত প্রবণতা ও বৃত্তিকে, কেউবা ব্যক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণের সমষ্টিকে (sum total of different traits) ব্যক্তিত্ব মনে করেছেন ; আবার কোন কোন মনোবিদ্ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সংহতি বা ঐক্য আছে তাকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব রূপে নির্দেশ করেছেন। পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি অসম্পূর্ণ, কারণ এগুলিতে ব্যক্তিত্বের কোন একটি বিশেষ দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অলপোর্ট বলেন "ব্যক্তিত্ব মানুষের অন্তঃস্থিত দৈহিক-মানসিক তন্ত্রের সেই গতিশীল সংগঠন যা পরিবেশের সঙ্গে তার অভিনব অভিযোজন নির্ধারণ করে।[1] অন্যান্য সংজ্ঞার তুলনায় অলপোর্টের সংজ্ঞাটি অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। কারণ, তিনি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীল রূপকে স্বীকার করেছেন। তিনি বাহ্য-প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে অভ্যন্তরীণ দিক এবং ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকের উপর গুরুত্ব প্রদান করতে চেয়েছেন।

মনোবিদ্ **মান্** (*Munn*)-ও তাঁর সংজ্ঞার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে ঐক্য বা সংহতি আছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞায় বলেছেন—"বিশেষ করে সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, ক্ষমতা, সামর্থ এবং প্রবণতার বিশেষ সংহতি বা ঐক্য হল ব্যক্তিত্ব।"[2]

ব্যক্তিত্বের কোন সংজ্ঞাই ত্রুটিমুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব এক জটিল বিষয়। আসলে ব্যক্তিত্ব দেহমনের এক জীবন্ত ঐক্য। ব্যক্তির দৈহিক বৈশিষ্ট্য, সহজাত প্রবৃত্তি, মানসিক প্রবণতা ও ব্যক্তির আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, আগ্রহ, জীবনাদর্শ, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোষ-গুণ প্রভৃতি, প্রাকৃতিক

---

1. "Personality is the dynamic organisation within the individual of those Psycho-physical systems that determine his unique adjustment to his environment". —Allport : Personality ; Page 48.

2. "Personality may be defined as the most characteristic integration of an individual's structure, modes of behaviour, interests, attitudes, abilities and aptitudes, especially from the standpoint of adjustment in social situations.—Munn.

পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা এবং বাহ্য-প্রতিক্রিয়া—এই সব কিছুর সংমিশ্রণেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি নয়, বা শুধুমাত্র সংহতি বা ঐক্য নয, ব্যক্তিত্ব হল সেই সত্তা যা গুণ ও ক্রিযার মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের সংহত বা ঐক্যবদ্ধ করে।

৩। ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Personality) :

এখন সংক্ষেপে ব্যক্তিত্বেব প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে আমরা ব্যক্তিত্বের স্বরূপটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব।

ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) ব্যক্তি যখন জন্মগ্রহণ কবে তখন তার মধ্যে সুপ্ত থাকে অনন্ত সম্ভাবনা ও বিচিত্র শক্তি এবং সেই সম্ভাবনা ও শক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ব্যক্তির এক দৈহিক-মানসিক সংগঠন আছে। জন্মের পর থেকেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি ব্যক্তিব উপর ক্রিয়া করে। এর ফলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি, ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা এবং পরিবেশের শক্তির মধ্যে যে পারস্পরিক প্রতিক্রিযা শুরু হয তার থেকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে। কাজেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অভিযোজনের (adaptation) জন্য ব্যক্তির কার্যাবলী তার ব্যক্তিত্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ।

(২) ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের এই অভিযোজনের পেছনে আছে তাব চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ভাবধারা, কামনা-বাসনা, জীবনাদর্শ, এবং সহজাত প্রবণতা ও বৃত্তি।

(৩) আবার মানসিক বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দৈহিক বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিত্ব দেহমনের এক জীবন্ত ঐক্য।

(৪) মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা সুসমঞ্জস রূপ লাভ করে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে একটা সমগ্রতা, একটা সংহতি, একটা সুসমঞ্জস সংগঠন।

(৫) যে আত্মসচেতন জীব নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ, তিনিই ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সুতরাং আত্মচেতনা (self-consciousness) এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determination) ক্ষমতাই ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি।

(৬) ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয়, ব্যক্তিত্বের গঠন ক্রমবর্ধমান ও গতিধর্মী (dynamic)। পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এবং এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের

সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয় ; এ চির-পরিবর্তনশীল, সদা-বিকাশমান ও গতিধর্মী।

(৭) ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান হলেও এর মধ্যে একটা স্থায়িত্ব আছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বুঝে নেওয়া যায়। প্রতিটি ব্যক্তি এক বিশেষ ব্যক্তি এবং এই হিসেবে সে অদ্বিতীয়, অন্য কারও সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

(৮) সর্বশেষে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, কৃষ্টি ও ভাবধারা প্রভৃতি সামাজিক উপাদান ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে, সে কারণে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর নির্ভরশীল।

৪। ব্যক্তিত্বের উপাদান (Factors of Personality) :

ব্যক্তিত্ব হল একটা সুসংহত সামগ্রিক সত্তা, বহু উপাদানে গড়া কমবেশী সামঞ্জস্য-পূর্ণ একটি ঐক্যবদ্ধ জটিল সংগঠন। প্রশ্ন হল, যে বহুবিধ উপাদানে এই ব্যক্তিত্ব গঠিত, সেই উপাদানগুলি কী ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ঠিক কোন্ কোন্ উপাদানের দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রাণহীন ও অচেতন জড়বস্তুর উপাদানগুলিকে সহজে জানা যায় এবং জড় পদার্থের বিভিন্ন উপাদানগুলির বর্ণনার মাধ্যমেই জড় পদার্থের স্বরূপটিকে মোটামুটি বুঝে নেওয়া যায়। তাছাড়া জড় পদার্থের উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে পাওয়া সম্ভব হয়। ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলিকে ঠিক সেভাবে পাওয়া সম্ভব নয় , কেননা, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে কার্য করে। জড় পদার্থ তার উপাদানগুলির সমষ্টিমাত্র, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমষ্টি-মাত্র নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এক চলমান জীবন্ত ঐক্য। বহুবিধ বিচিত্র উপাদানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠিত। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে এবং অজ্ঞাতসারে বহুবিধ ঘটনা ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ব্যক্তিত্ব দৈহিক ও মানসিক সমস্ত রকম শক্তি ও সম্ভাবনার এক সুসম সমন্বয়।

ব্যক্তিত্বের উপাদানের সঠিক বর্ণনা সম্ভব নয়

ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা চলে—(ক) **প্রাকৃতিক উপাদান**, এবং (খ) **পরিবেশগত উপাদান**।

(ক) প্রাকৃতিক উপাদান : এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম হল বংশধারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (Hereditary factors) ; দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক গঠন (Physique) ; তৃতীয়তঃ, অনালী বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয় (Function of ductless glands)।

(i) **বংশধারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্য ঃ** আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর বংশপ্রভাব কিভাবে ক্রিয়া করে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশধারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা কি কি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হই, তা জানতে হলে খুব সংক্ষেপে প্রাণীর জন্মরহস্য সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

পিতৃকোষ ও মাতৃকোষ

মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষে জীবনের সর্বপ্রথম আবির্ভাব ঘটে, সেই ডিম্বকোষটি হল দুটি জননকোষের (germ-cell) মিলনের ফল। এই দুটি জনন-কোষের মধ্যে একটি হল পিতৃকোষ এবং আর একটি হল মাতৃকোষ। প্রথমটি আসে পিতার কাছ থেকে, দ্বিতীয়টি আসে মায়ের কাছ থেকে। পিতার কাছ থেকে পাওয়া জননকোষটির নাম শুক্রকীট (Spermatozoon) এবং মাতার কাছ থেকে পাওয়া জননকোষের নাম ডিম্বাণু (ovum)। প্রতি জননকোষে তেইশটি করে ক্রোমোসোম (Chromosome) বা বঙ্গনিক থাকে এবং শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষের বা যাইগট (Zygote)-এর সৃষ্টি হয় তার মধ্যে মোট ২৩+২৩=৪৬টি ক্রোমোসোম থাকে।
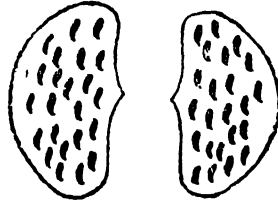
দুটি অর্ধকোষ, যার প্রত্যেকটিতে তেইশটি করে ক্রোমোসোম আছে

এদের মধ্যে শেষের জোড়াটিই যৌন নির্ধারক ক্রোমোসোম। পুরুষের ক্ষেত্রে এই যৌন নির্ধারক ক্রোমোসোম দুটির একটি X ও অপরটি Y, স্ত্রীদেহের দুটি ক্রোমোসোমই X। এই ক্রোমোসোম হল সূক্ষ্ম সূতার মতো পদার্থ। পূর্বে এই ক্রোমোসোমকেই বংশগত

জিনই বংশগত প্রলক্ষণের প্রধান বাহক

প্রলক্ষণের (hereditary traits) বাহক বলে ধারণা করা হত। কিন্তু গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মতো রাসায়নিক পদার্থ থাকে যাকে বলা হয় 'জিন' (gene)। এই জিনই হল বংশগত প্রলক্ষণের যথার্থ বাহক।[1]

---

1. "Since, however, each chromosome 'thread' is composed of numerous infinitesimal units called genes, it is more proper as Gilliland suggests to regard the latter as the real basis of inheritance".

—Thorpe : Psychological Foundations of Personality ; Page 46.

পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জিনগুলির পারস্পরিক মিলনের উপরই শিশুর বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে। এই জিনগুলিই শিশুর দৈহিক এবং মানসিক প্রকৃতি নির্ধারণ করে। মাতাপিতার বৈশিষ্ট্য এবং গুণরাজি এই জিনগুলির মাধ্যমেই শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হয়।

ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, স্বভাবগত—সব রকম সহজাত বৈশিষ্ট্যই এই জিনগুলির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, সেহেতু বংশগতির ক্ষেত্রে এই জিনগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জিনগুলি সব সময় জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে ; একটি জিন পিতৃকোষের, অপরটি মাতৃকোষের। যেহেতু এক জোড়ার জিন একই ধরনের কাজ করে এবং যেহেতু প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম, সেজন্য কোন একটি জিন ত্রুটিপূর্ণ হলেও, অন্যটি সমস্ত কাজ একাই করতে পারে।[1] জিনগুলি কিভাবে জোড় বাঁধবে, সেই জোড় বাঁধার উপরই নির্ভর করে বংশগতি। প্রত্যেক মাতাপিতার জিনের মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। সে কারণে একই মাতাপিতার সন্তানদের মধ্যে দৈহিক, মানসিক ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের নানা প্রকার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ প্রত্যেক সন্তানের মধ্যে জিনের ভিন্ন ভিন্ন সম্মেলন ঘটে। প্রত্যেক সন্তানের মধ্যে জিনের বিশেষ সম্মেলনের জন্য তার বংশগতিও এক বিশেষ ধরনের হয়ে থাকে। এই কারণে জেনিংস (*Jennings*) বলেন, "যে ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশ ঘটে, যে বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের মধ্যে দেখা যায়, তথাকথিত বংশগতির নিয়মগুলি, মাতাপিতা ও সন্তানের মধ্যে অসাধারণ রকমের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য—এই সব কিছুই জিনের বিন্যাস এবং ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।"[2] সুতরাং জিনের যে সংগঠন নিয়ে মানবশিশু জন্মেছে, তার উপরই নির্ভর করছে পরিণত জীবনে সে কি হবে। "একটি রাসায়নিক মিশ্রণের প্রকৃতি যেমন যে যে উপাদানে মিশ্রণটি গঠিত

ব্যক্তির সব বৈশিষ্ট্য জিনের উপর নির্ভর করে

1 "Since each pair of genes is concerned with same function and since either is capable of performing the function in question independently, it follows that if one gene is defective or otherwise inadequate in its work, its mate can perform the entire function......"

—Thorpe : Psychological Foundations of Personality,

2. "The way diverse individuals develop the peculiarities that they show, the so-called laws of heredity, the extra-ordinary resemblances and differences between parents and offsprings—all these things depend largely in the arrangement and behaviour of the genes."

—H. S. Jennings : The Biological Basis of Human Nature—Page 8,

তার উপরে নির্ভর করে, তেমনি ব্যক্তির প্রকৃতি গঠনে যে যে জিনের সমাবেশ হয়েছে সেগুলির উপরই ব্যক্তির প্রকৃতি নির্ভর করে।"[1]

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে —শারীরিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক বৈশিষ্ট্য এবং মানস-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলির অন্তর্গত হল দৈহিক গঠন, উচ্চতা, মুখ-চোখের গড়ন, দেহের রঙ ইত্যাদি। অনালী গ্রন্থিগুলির ক্ষরণের ফলে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় সেগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত। মানসিক বৈশিষ্ট্য হল চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছা, কল্পনা ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি। মানস-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল শিশুর মেজাজ বা মুড (Mood)।

(ii) **দৈহিক গঠন :** দৈহিক গঠনের উপর ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে। ব্যক্তির নিজস্ব ব্যবহার এবং অপরের সঙ্গে তার আচরণ দৈহিক গঠনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ক্রেৎস্মার (*Kretschmer*) এবং সেল্‌ডন (*Sheldon*) দেহের গঠনের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গভীর সম্বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মনোবিদ্ অ্যাডলার (*Adler*)-এর মতে শারীরিক ত্রুটিযুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ দেখা যায়।

(iii) **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি :** আমাদের দেহের মধ্যে কতকগুলি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (duct gland) আছে, যেমন লালাগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি, অশ্রুগ্রন্থি, মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি। যদিও এগুলি ব্যক্তির আচরণের উপর ক্রিয়া করে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তবুও আমাদের দেহের মধ্যে যেসব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (ductless glands) আছে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সেগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই অনালী গ্রন্থিগুলি রক্তের মধ্যে যে রস ক্ষরণ করে, সেই রস সমস্ত দেহের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। দেহের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সমন্বয়-সাধন করা ছাড়াও, দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই গ্রন্থিগুলির উপযুক্ত ক্ষরণ একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যক্তির মানসিক জীবনে এই গ্রন্থিগুলি অসীম প্রভাব বিস্তার করে। থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ব্যাহত হলে শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়, ব্যক্তির মধ্যে উৎসাহের অভাব, বিষণ্ণতা ও অবসন্নতা দেখা দেয়। থাইরয়েড পিটুইটারি এবং যৌনগ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়া বাধা-

1. **"Just as the character of a chemical solution depends upon the substance of which it is composed, so human characteristics depend upon the genes that co-operated in their formation."**

—W. Rand, M. E. Sweeny and E. L. Vincent : Growth and Development of the young child.

প্রাপ্ত হলে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা কমে যায়। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে চপলতা, উত্তেজনা ও মানসিক উদ্বেগ অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই সব অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থির সংযোগ বাইরে থেকে সহজে পরিমাপ করা যায় না, কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন এই সব গ্রন্থির বিকাশ হয়, খুব কম বা অধিক মাত্রায় ঘটে থাকে তখনই ব্যক্তিত্বের উপর তাদের প্রভাব আমরা উপলব্ধি করতে পারি।[1]

(খ) **পরিবেশগত উপাদান:** ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে মাতাপিতা এবং পূর্বপুরুষদের অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত থাকে বিচিত্র সম্ভাবনা, অনন্ত শক্তি, তবে' অনুকূল পরিবেশেই ব্যক্তির এই সম্ভাবনা ও শক্তি বাস্তবে রূপায়িত হয়। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগতি বিধান এবং সেই সঙ্গে নিজের শক্তি ও সম্ভাবনার সুষম সমন্বয়ের ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। **এই পরিবেশ দু ধরনের—প্রাকৃতিক এবং সামাজিক।** প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যক্তির মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। জলবায়ু, মৃত্তিকা, গাছপালা, জীবজন্তু, খাদ্য—এ সব কিছুর প্রভাব ব্যক্তির উপর আছে। এগুলির প্রভাবে ব্যক্তি হয় কর্মঠ বা আয়েসী, শক্তিমান বা দুর্বল, পরিশ্রমী বা অলস।

সামাজিক পরিবেশ

সামাজিক পরিবেশের (Social environment) মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হল **গৃহের** বা **পরিবারের পরিবেশ**। পরিবারের সুস্থ ও মনোরম পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে বিশেষভাবে উপযোগী। পরিবারের মাতাপিতা, ভ্রাতাভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের কার্যকলাপ চিন্তাধারা, আদর্শ, শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।[2] মাতাপিতা যদি শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেন, তাহলে শিশুর মধ্যে আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস, স্বাধীনভাবে কাজ ও চিন্তা করার ক্ষমতা দেখা দেয়; তার ফলে শিশু স্থির ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। আবার অপরপক্ষে মাতাপিতা যদি শিশুকে কেবল চোখে চোখে রাখতে চান, তাকে স্বাধীনভাবে কাজ করা ও চিন্তা করার

1. "Only in dramatic cases, when these glands are grossly under developed or over developed can we see their effects on personality.

—C. T. Morgan : Introduction of Psychology, Page 232.

2. "Parents, finally, influence personality development by being models. Much of a child's learning is by imitation. By watching his father, a son learns how to act like a man, and the daughter learns how to assume the role of wife and mother by watching her mother."

—C. T. Morgan : An Introduction to Psychology; Page 239.

সুযোগ না দেন, তাহলে শিশুর মধ্যে এক দুর্বল ও ভীরু ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। আবার মাতাপিতা যদি শিশুর প্রতি নির্মম ব্যবহার করেন, বা তাঁরা যদি খেয়ালী. উৎপীড়ক বা অত্যাচারী হন, তাহলেও শিশু বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন, অসংযত, ভীরু, অসামাজিক ও রুক্ষ মেজাজের হয়ে থাকে। কাজেই গৃহের পরিবেশ যেমন মনোরম, স্বাস্থ্যকর, ও স্নেহপূর্ণ হবে, পরিবারের ছেলেমেয়েরা সেভাবেই ব্যক্তিত্ব অর্জন করবে।

এর পরে উল্লেখ করা যেতে পারে **বিদ্যালয়ের পরিবেশ** অর্থাৎ শিশুমনের উপর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং শিশুর সহপাঠীদের প্রভাব। শিক্ষকদের সদয় ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা দেবার আগ্রহ, তাঁদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, চালচলন শিশুর জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অপরপক্ষে, শিক্ষকের কঠোর ব্যবহার, নির্মমতা শিশুমনকে বিদ্রোহী করে তোলে, তার মধ্যে উদাসীন ভাব সৃষ্টি করে।[1] সহপাঠীদের সাহচর্যে শিশু তার সুপ্ত ক্ষমতা ও শক্তির স্বাধীন বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হয়। কোন কোন শিশুর মধ্যে নেতৃত্ব করার প্রবণতা জাগে। দলের অপর ছেলেদের সে নেতা সাজে। বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন সহজাত ক্ষমতা 'দলের' প্রভাবে বিশেষভাবে ক্রিয়া করার সুযোগ পায়। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশের মূলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশের মূলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

তারপর শিশু যখন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয় তখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, সমাজের আচার, রীতি-নীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, এবং অফিস প্রভৃতি সংগঠনগুলি ব্যক্তির চিন্তাধারা ও আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবের তারতম্য অনুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

বংশগতি বা পরিবেশ, কোন্‌টি ব্যক্তিত্বের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার করে?—এর উত্তরে কোন কোন মনোবিদ্‌ বংশগতির উপর, আবার কোন কোন মনোবিদ্‌ পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বস্তুতঃ, কোন চরম মতবাদের প্রতি সমর্থন না জানিয়ে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিত্বের উপর, উভয়ের প্রভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি, প্রবণতা ও

বংশগতি বা পরিবেশ —কোন্‌টির প্রভাব অধিকতর?

1. "The effect of an autocratic school system, like the authoritarian family structure, is generally harmful to the children. It tends to create unnecessary aggressiveness and to prevent the development of independent habits of thinking."
—Stagner: Psychology of Personality; Page 389.

ক্ষমতার অধিকারী হয় সত্য, কিন্তু প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ গুণগুলি বিকাশলাভ করে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উপাদানগুলি পরিবেশের মাধ্যমেই নিজেকে বিকশিত করে। সহজ কথায়, ব্যক্তির মধ্যে যে শক্তি ও সম্ভাবনা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, উপযুক্ত পরিবেশে তা' সম্যকভাবে সুপরিস্ফুট হয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে একটি দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করে।

৫। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (Traits of Personality):

ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ বলতে বোঝায় ব্যক্তির এমন কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যার সাহায্যে আমরা একটি ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক করি। যেমন—'সদাশয়তা', 'পরিশ্রমশীলতা', 'সামাজিকতা', 'বিষণ্ণতা,' 'প্রফুল্লতা', উদারতা ইত্যাদি।

প্রলক্ষণের পরিচয়

ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের ধারণা আমরা কিভাবে করি এবং কিভাবে তার নামকরণ করি, কোন কোন মনোবিদ্ তার একটা যুক্তিশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তরে ব্যক্তির আচরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা কোন একটি **ক্রিয়া-বিশেষণের (adverb)** ব্যবহার করি। যেমন, অমুক লোক বেশ সতর্কতার সঙ্গে বা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করেছে। দ্বিতীয় স্তরে, এই গুণটিকে ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ না করে, ব্যক্তির বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তখন এটি ক্রিয়াবিশেষণ না হয়ে হয় **বিশেষণ (adjective)**। যেমন, লোকটি সাবধানী বা আত্মবিশ্বাসী। তৃতীয় স্তরে, আমরা এই বিশেষণটিকে **বিশেষ্যরূপে** ব্যবহার করি এবং মনে করি ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ গুণটির অস্তিত্ব আছে। তখন বলি এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে 'সাবধানতা' এবং 'আত্মবিশ্বাস' এই দুই প্রলক্ষণের অস্তিত্ব রয়েছে। কোন কোন মনোবিদ্ এইভাবে অমূর্ত বিষয়কে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু এই বিষয়টির উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন নয়। প্রলক্ষণ হল ব্যক্তির মধ্যে একটা কমবেশী স্থায়ী গুণ যার জন্য কোন ব্যক্তির কাছে আমরা বিশেষ এক ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করি, অন্যরূপ প্রত্যাশা করি না।

কিন্তু ব্যক্তির আচরণ-নির্দেশক যে কোন গুণবাচক শব্দকেই ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ-রূপে গণ্য করা যেতে পারে না। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণরূপে গণ্য হবার জন্য যে কোন গুণবাচক শব্দের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

---

1. "Although a trait is a description of human behaviour, not every word that describes behaviour defines a trait."
—Boring : Foundations of Psychology : Page 490.

প্রথমতঃ, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের দুটি দিক আছে—একটি মানসিক ও অপরটি আচরণমূলক, যেমন—ভদ্রতা, মনের দিক থেকে ভদ্রতা মার্জিত রুচিসম্পন্ন মনোভাবকে বোঝায় এবং আচরণের দিক থেকে শিষ্ট-সভ্য আচরণকে বোঝায়।

ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের দুটি দিক—মানসিক ও আচরণমূলক

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই প্রলক্ষণগুলি কমবেশী পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন গুণই চরম মাত্রায় বিদ্যমান থাকে না, যেমন, সামাজিকতা। কোন ব্যক্তি কম সামাজিক, কোন ব্যক্তি বেশী সামাজিক।

প্রলক্ষণগুলি কম বেশী পরিমাণে বিদ্যমান

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির জন্মগত প্রবণতা ও পরিবেশ—এই উভয়ের প্রতিক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিত্বের এই প্রলক্ষণগুলির জন্ম।

চতুর্থতঃ, বাহ্য-অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এই প্রলক্ষণগুলির পরিবর্তন ঘটলেও ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে এগুলি কমবেশী স্থায়ী। এই প্রলক্ষণগুলি থেকে যে আচরণের উদ্ভব হয় সেই আচরণের মধ্যে প্রলক্ষণের প্রকাশ অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, যে ব্যক্তি উদার মনোভাবসম্পন্ন মোটামুটি সব অবস্থায় তার আচরণের মধ্যে উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রলক্ষণগুলি কমবেশী স্থায়ী

পঞ্চমতঃ, ব্যক্তিত্বের অধিকাংশ প্রলক্ষণই দ্বিমুখী অর্থাৎ, একটি গুণ এবং তার বিপরীত গুণ—এ দুটিকে নিয়েই ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের দ্বিমুখী সত্তা গঠিত হয়। এজন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষ প্রলক্ষণ নির্ণয় করতে হলে দুটি পরস্পর-বিরোধী গুণকে দু'দিকে রেখে তাদের একটি কাল্পনিক সরল রেখার দ্বারা যুক্ত করতে হবে এবং তারপর নির্ধারণ করতে হবে ব্যক্তির ঐ 'গুণটি' ঐ সরলরেখার কোন্ জায়গায় অবস্থিত। এই কাল্পনিক রেখাটিকে বলা হয় **ব্যক্তিত্বের পরিসর (dimension of personality)**। যেমন, সামাজিকতা বনাম অসামাজিকতা, প্রফুল্লতা বনাম বিষণ্ণতা। কোন ব্যক্তিকে প্রফুল্ল না হলেই যে বিষণ্ণ হতে হবে বা সামাজিক না হলে অসামাজিক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এর অর্থ হল, সামাজিকতা থেকে অসামাজিকতা, এই পরিসরের মধ্যে সংলক্ষণটি বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিদ্যমান। যে ব্যক্তির মধ্যে এই সংলক্ষণটি অধিক পরিমাণে থাকবে তাকে সামাজিক এবং যার মধ্যে খুব কম পরিমাণে আছে তাকে অসামাজিক বলা হবে। তেমনি একটি লোককে যখন ভীরু বলা

ব্যক্তিত্বের পরিসর

হচ্ছে তখন তার অর্থ এই নয় যে, তার মধ্যে সাহসিকতা নেই। তবে যেটুকু সাহসিকতা আছে তা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে কাজ করে এবং তার একটা সুসংবদ্ধ, সুসমঞ্জস ও ঐক্যবদ্ধ রূপ আছে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণগুলির যোগফলমাত্র নয় বা প্রলক্ষণগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে পরিমাপ করলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বোঝা যাবে না।

প্রশ্ন হল, ব্যক্তিত্বের এই প্রলক্ষণগুলির সংখ্যা কত? এই প্রশ্নের কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। অভিধানে প্রায় ১৭,৯৫০টি গুণবাচক এবং দোষবাচক শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, মৌলিক প্রলক্ষণগুলির সংখ্যা কত? ক্যাটেল (*Cattell*) ২০ জোড়া প্রধান প্রধান বাহ্য-প্রলক্ষণ এবং ১২ জোড়া অভ্যন্তরীণ প্রলক্ষণের একটা তালিকা দিয়েছেন।

ব্যক্তিত্বের এই অসংখ্য ও অনির্দিষ্ট গুণগুলির পৃথক পৃথক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই কারণে ক্যাটেল, উড্‌ওয়ার্থ ও মারকুইস, অলপোর্ট, আইসেঙ্ক প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ ব্যক্তিত্বকে শ্রেণীবদ্ধ করতে চেয়েছেন।

ক্যাটেলকৃত প্রলক্ষণের শ্রেণীবিভাগ

ক্যাটেল-এর প্রদত্ত ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ: প্রলক্ষণগুলির স্থায়িত্বকে কেন্দ্র করে ক্যাটেল তাদের দুভাগে ভাগ করেছেন—(১) **বাহ্য প্রলক্ষণ** (surface traits) এবং (২) **অভ্যন্তরীণ প্রলক্ষণ** (source tratis)। বাহ্য-প্রলক্ষণ বলতে ক্যাটেল বোঝেন সেই সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি যেগুলি ব্যক্তির বাহ্য-কার্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়, যেমন—সামাজিকতা (sociality), সাহসিকতা (boldness), একগুঁয়েমি (stubbornness) ইত্যাদি। অভ্যন্তরীণ প্রলক্ষণগুলিকে ব্যক্তির বাহ্য-কার্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না। এগুলির অস্তিত্ব রয়েছে অনেক গভীরে। এগুলি পরোক্ষভাবে বাহ্য-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই অভ্যন্তরীণ প্রলক্ষণগুলিই বাহ্য-প্রলক্ষণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং এগুলিই কমবেশী স্থায়ী, যেমন, 'নিরাপত্তার অভাববোধ' (feeling of insecurity)। এটি একটি অভ্যন্তরীণ সংলক্ষণ; একে সোজাসুজি বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সংলক্ষণটি কতকগুলি বাহ্য-সংলক্ষণ, যেমন—অস্থিরতা, ভীরুতা, অত্যধিক উত্তেজনা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। অন্যান্য মনোবিদ্ প্রলক্ষণের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগকে পরিবর্তিত করে 'মুখ্য প্রলক্ষণ' (Cardinal traits) এবং 'গৌণ প্রলক্ষণ' (Secondary traits)—এই ভাবে শ্রেণীভুক্ত করতে চান।

ক্যাটেল প্রলক্ষণ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ২০টি বাহ্য প্রলক্ষণ ও ১২টি মৌলিক অভ্যন্তরীণ প্রলক্ষণের উল্লেখ করেছেন। ক্যাটেল বর্ণিত ১২টি মৌলিক অভ্যন্তরীণ প্রলক্ষণের তালিকা নীচে দেওয়া হল।[1]

মৌলিক প্রলক্ষণ	বিপরীত
১। আযাসী, স্ফূর্তিবাজ, দরদী, উদার-প্রকৃতি (Easygoing, genial, warm, generous)।	১। অনমনীয়, অনুরাগবিহীন, ভীরু, শত্রু ভাবাপন্ন লাজুক (Inflexible, cold, timid, hostile, shy)।
২। বুদ্ধিমান, স্বাধীনচেতা, নির্ভরযোগ্য (Intelligent, independent, reliable)।	২। নির্বোধ, অপরিণামদর্শী, ছেবলা (Foolish, unreflective, frivolous)।
৩। ধীরস্থির, বাস্তববাদী, একাগ (Emotionally stable, realistic, steadfast)।	৩। স্নায়ুরোগাক্রান্ত, এড়ানোস্বভাব ও অস্থিরচিত্ত (Neurotic, evasive, emotionally changeable)।
৪। প্রভুত্বকামী, প্রভাবশালী এবং আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী (Dominant, ascendant, self-assertive)।	৪। বশ্যতাস্বীকারপ্রবণ, আত্মলোপকারী (Submissive, self-effacing)।
৫। শান্ত, প্রফুল্ল, মিশুক, গল্পপ্রিয় (Placid, cheerful, sociable, talkative)।	৫। বিষণ্ণ, ভগ্নোদ্যম, নির্জনতাপ্রিয়, উদ্বিগ্ন (Sorrowful, depressed, seclusive, agitated)।
৬। অনুভূতিপ্রবণ, কোমল হৃদয, সহানুভূতিসম্পন্ন (Sensitive, tenderhearted, sympathetic)।	৬। কঠিনহৃদয, উদাসীন, স্পষ্টভাষী, দয়ামায়াশূন্য (Hard boiled, poised, frank, unemotional)।
৭। মার্জিত রুচিসম্পন্ন, এবং সৌন্দর্যপ্রিয (Trained and cultured mind, sympathetic)।	৭। অমার্জিত ও স্থূলরুচিসম্পন্ন (Boorish, uncultured)।
৮। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, দাযিত্বজ্ঞানসম্পন্ন, কষ্টসহিষ্ণু (Conscientions, responsibls, pains-taking)।	৮। পরনির্ভর, আবেগপ্রবণ ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্য (Emotionally dependent, impulsive, irresponsible)।
৯। দুঃসাহসী, নিরুদ্বেগ ও সদয (Adventurous, carefree and kind)।	৯। সংযত, চাপা, সতর্ক ও অসরল (Inhibited, reserved, cautious, withdrawn)
১০। তেজস্বী, উদ্যমযুক্ত, অধ্যবসায়ী, তৎপর (Vigorous, energetic, persistent, quick)।	১০। নিস্তেজ, ঢিলে, স্বপ্নবিলাসী (Languid, (slack, day-dreaming)।
১১। অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণ, অতি অভিমানী, উত্তেজনাপ্রবণ (Emotionally hypersensitive; high strung, excitable)।	১১। নির্জীব, সহনশীল (Phelgmatic, Tolerant)।
১২। বন্ধুভাবাপন্ন,' বিশ্বাসপরায়ণ, (Friendly, trustful)।	১২। সন্দিগ্ধমনা, শত্রুতাভাবাপন্ন (Suspicious, hostile)

1. R. B. Cattell: Description and Measurement of Personality. Page 313-36.

অলপোর্ট প্রদত্ত ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ : মনোবিদ্ অলপোর্ট (*F. H. Allport*) ব্যক্তিত্বের পাঁচটি প্রধান সংলক্ষণ এবং এই সংলক্ষণগুলির অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করেছেন।

(১) **বুদ্ধি** (Intelligence) : বুদ্ধি হল জীবনের সমস্যাগুলির মুখোমুখী হবার এবং সেগুলি সমাধান করার সামর্থ। স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি, মনোযোগ, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা, গঠনমূলক কল্পনাশক্তি এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা প্রভৃতিও বুদ্ধির অঙ্গীভূত।

ফ্রয়েড-অলপোর্টের সংলক্ষণের শ্রেণীবিভাগ

(২) **গতীয়তা** (Motility) : স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম সম্পাদন করার যে মনোভাব তাই হল গতীয়তা। কোন কোন লোকের মধ্যে কর্ম করার জন্য উৎসাহ, উদ্দীপনা, সংকল্প প্রভৃতি দেখা যায়। আবার কারও মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য, শৈথিল্য প্রভৃতি গুণগুলি দেখা যায়।

(৩) **মানস-প্রকৃতি** (Temperament) : আবেগমূলক সংলক্ষণগুলি ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় উপাদান। কেউ বা শান্ত, কেউ বা উত্তেজনাপ্রবণ, কেউ বা প্রফুল্ল, কেউ বা বিষণ্ণ, কেউ বা সাহসী, কেউ বা ভীরু। ব্যক্তির জীবনে ভাবাবেগের যে পরিবর্তন, আবেগের তীব্রতা বা সাধারণ কথায় যাকে বলি মেজাজ বা মুড —এই মানস-প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত।

(৪) **আত্মপ্রকাশ** (Self-expression) : কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রচার করতে চায় ; আবার কেউ বা নীরবে কাজ করতে ভালবাসে। অন্তর্মুখীতা, বহির্মুখীতা, প্রভুত্ব, বিনয় প্রভৃতি সংলক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) **সামাজিকতা** (Sociability) : ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সুতরাং সামাজিকতা ব্যক্তিত্বের একটি প্রয়োজনীয় সংলক্ষণ। সহানুভূতি, দয়া, বিনয়, কর্তব্য-পরায়ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি সামাজিকতার অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন মনোবিদের মতে উপরিউক্ত তালিকার সঙ্গে দৈহিক প্রলক্ষণগুলি (Physical traits) ; যেমন, দৈহিক আকৃতি মুখশ্রী, উচ্চতা, দেহের রঙ, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি যুক্ত হলেই তালিকাটি সম্পূর্ণাঙ্গ হত।

ছয়টি প্রধান সংলক্ষণ এবং তার অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির একটা তালিকা দিয়েছেন **ডেসিয়েল (Deshiel)**। এই ছয়টি সংলক্ষণ হলো —(১) দেহ (Physique), (২) বুদ্ধি (Intelligence), (৩) গতীয়তা বা সংকোচনীয়তা (Motility), (৪) মানস-প্রকৃতি (Temperament), (৫) প্রেষণা (Motivation) এবং (৬) সামাজিকতা (Sociability)।

ডেসিয়েল এর তালিকা

ফ্রাই ও হেগার্ড এবং রোজানফপ্রদত্ত ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ : মনোবিদ্ ফ্রাই এবং হেগার্ড[1] (*Fry and Haggard*) প্রলক্ষণের যে তালিকা করেছেন সেই তালিকায় আছে—(১) দেহ (Physique), (২) তাড়না বা পরিচালনাশক্তি (Impulse or Driving force), (৩) বুদ্ধি (Intelligence), (৪) আয়ান বা মানস-প্রকৃতি (Temperament) এবং (৫) অহং যা ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান (Ego as constituting the prime element of personality)।

ফ্রাই এবং হেগার্ড-এর তালিকা

রোজানফ[2] (*Rosanoff*) ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের তালিকায় মানস প্রকৃতিগত উপাদানের (Temperamental factor) উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ ছাড়াও তিনি আরও যুক্ত করেছেন বুদ্ধি (Intelligence), যৌনতা (Sexuality), দৈহিক উপাদান (Physical factors) এবং অন্যান্য গৌণ উপাদান ; যেমন, গাণিতিক বা সঙ্গীত সম্পর্কীয় দক্ষতা (such mere minor components as mathematical and musical talent)।

রোজানফ এর তালিকা

এছাড়া, উপাদান বিশ্লেষণ (Factor Analysis) রূপ গাণিতিক পদ্ধতির সহায়তায় ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। গিলফোর্ড এবং তাঁর অনুগামীরা এই পদ্ধতির সহায়তায় ব্যক্তিত্বের তেরটি উপাদান আবিষ্কার করেছেন।

মন্তব্য : মনোবিদ্ গর্ডন অলপোর্টের মতে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অভিনব (unique), সে কারণে সাধারণ প্রলক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি হয় না।. তাঁর মতে, ব্যক্তিরই প্রলক্ষণের কথা বলা চলে, সমাজের প্রলক্ষণের কথা বলা চলে না।[3]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের বিজ্ঞান-সম্মত নিখুঁত তালিকা তৈরি করা এবং পরিমাপ করা কঠিন। তার কারণ হল :

প্রথমতঃ, এগুলি অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যকে একই প্রলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করেন।

1. C C. Fry and H W. Haggard : The Anatomy of Personality ; Page 17-30.
2. A. J. Rosanoff : Manual of Psychiatry, 6th edition ; Page 333-354.
3. "......Only the individual trait is true (a) because traits are always in individuals and not in the community at large........"

G. D. Allport ; Personality ; Page 399

দ্বিতীয়তঃ, এই সব প্রলক্ষণের নির্ধারণ ব্যাপারটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। কোন পিতা তাঁর ছেলেটির দুষ্টুমি দেখে মনে করতে পারেন যে ছেলেটি অবাধ্য। আবার কোন প্রগতিশীল পিতা তাঁর ছেলের মধ্যে এই রকম আচরণ দেখে মনে করতে পারেন যে তাঁর ছেলে উদ্যোগী।

ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত তালিকা গঠন ও পরিমাপের অসুবিধা

তৃতীয়তঃ, সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রলক্ষণের পরিমাপ করা হলে তা অনেকটা কৃত্রিম এবং কল্পনাপ্রসূত ব্যাপারে পরিণত হয়।

চতুর্থতঃ, মানুষের সকল আচরণ এতই জটিল এবং বিচিত্র উপাদান নির্ভর যে সব সময় লোক একই প্রলক্ষণের জন্য ক্রিয়া করছে এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত নয়।[1]

সব রকম অসুবিধা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব-প্রলক্ষণের বিজ্ঞানসম্মত তালিকা গঠন করা যদি কখনও ভবিষ্যতে সম্ভব হয় তবে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই সুস্পষ্ট হবে। আবার অপর দিকে এই পদ্ধতি এতই বিশ্লেষণাত্মক যে এই জাতীয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের মতো একটা গতিশীল জটিল সংগঠনকে বুঝে ওঠা কঠিন।

৬। ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ বা টাইপ (Personality Type) :

অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (trait)-এর সাহায্যে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ যথাযথভাবে জানা যায় না। ব্যক্তিত্ব এক সুসংহত সামগ্রিক সত্তা, পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলির বিশ্লেষণ ও বর্ণনার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের এই সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে না। সে কারণে অনেক মনোবিদ্ ব্যক্তিত্বের কতকগুলি নমুনা বা টাইপ (Type) নির্ধারণ করে তারই ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের স্বরূপকে জানার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। **জাতিরূপ** বা **'টাইপ' বলতে আমরা বুঝি, মানস-প্রকৃতি এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিন্যাস।**

ব্যক্তিত্বের টাইপ কাকে বলে ?

ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ বা টাইপের স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন মনোবিদ্ মনে করেন ব্যক্তিত্বের এই টাইপগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। একটি টাইপের বৈশিষ্ট্যকে কিছু মাত্রায়ও সবার টাইপের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার কোন কোন মনোবিদের মতে টাইপের

1. "Any particular piece of behaviour depends on such a multiplicity of factors in the personality structure and the environment that no one reacts in accordance with a trait all the time."
—P. E. Vernon : Personality Tests and Assessments ; Page 7.

বৈশিষ্ট্য প্রলক্ষণের মতনই জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বণ্টিত (distributed) থাকে। আবার কারও কারও মতে কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহলে ঐসব বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে ঐসব ব্যক্তিরা একটি গোষ্ঠীরূপে পরিগণিত হয়, গোষ্ঠীগত এই বৈশিষ্ট্যই হল টাইপ বা জাতিরূপ।

বেশীর ভাগ লোকই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব ঠিক পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণী নয়। একই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কখনও অন্তর্মুখী বা কখনও বহির্মুখী হতে পারে। বিপদের সময় যখন মানুষ নিরাপত্তা বোধ করে না তখন হয়ত সে অন্তর্মুখী। আবার যে পরিপেক্ষা নিরাপত্তা বোধ করে সে পরিপেক্ষ বহির্মুখী।

অতীতে দার্শনিকেরা মানুষের চরিত্র অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুতঃ, বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের যে বর্ণনা তাঁরা দিয়েছেন তা মোটামুটি ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা ছাড়া কিছুই নয়। যেমন—কৃপণ, উদারচেতা বা নীচ প্রকৃতির ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্বের এক বিশেষ নমুনা (Typical personality) হিসাবে গ্রহণ করা হত। বস্তুতঃ, ব্যক্তির একটি কেন্দ্রীয় সংলক্ষণকে কেন্দ্র করে তাদের যে চরিত্র বর্ণনা করা হত তাই ছিল ব্যক্তিত্বের নমুনা।

অতীতে দার্শনিককৃত মানুষের চরিত্রের শ্রেণীবিভাগ

হিপোক্রেটিস-এর মতে ব্যক্তিত্বের চারটি টাইপ : দৈহিক উপাদানের (Physiological factors) সঙ্গে চরিত্রগত স্বভাবকে যুক্ত করে ব্যক্তিত্বের নমুনা নির্ধারণের চেষ্টা করলেন হিপোক্রেটিস্ (*Hippocrates*)। তাঁর মতে ব্যক্তিত্বের প্রধান চারটি টাইপ হল—**দৃঢ় প্রত্যয়ান্বিত** (Sanguine), **মন্থর** (Phlegmatic), **সহজক্রোধী** (Choleric) এবং **বিষাদপ্রবণ** (Melancholic)। কোন্ ব্যক্তি কোন্ টাইপের অন্তর্ভুক্ত তা নির্ভর করছে তার দেহে রক্ত, শ্লেষ্মা, হলুদ রঙের পিত্ত বা কৃষ্ণবর্ণের পিত্তের প্রাধান্যের উপর। যার মধ্যে রক্তের প্রাধান্য সে ব্যক্তি দৃঢ়-প্রত্যয়ান্বিত, যার মধ্যে শ্লেষ্মার প্রাধান্য সে মন্থর, যার মধ্যে হলুদবর্ণের পিত্তের প্রাধান্য সে সহজক্রোধী এবং যার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের পিত্তের প্রাধান্য সে বিষাদপ্রবণ হয় ; আবার মস্তিষ্কতত্ত্ববিদরা (Phrenologists) মুখের ভাব এবং মস্তিষ্কের স্ফীতি দেখে ব্যক্তিত্বের তারতম্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এই সব মতবাদ হল মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগের কথা। বর্তমানে এসব মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে।

হিপোক্রেটিস-এর মতে ব্যক্তিত্বের চারটি টাইপ

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে মানসিক প্রকৃতি এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মানস-প্রকৃতির ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ : (ক) **য়ুঙ-এর টাইপ** (Jung's Type) : প্রসিদ্ধ মনোবিদ্ সি, জি, য়ুঙ (*Jung*) ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের কথা বলেছেন—(i) **অন্তর্মুখী** (Introvert) (ii) **বহির্মুখী** (Extrovert) এবং (iii) **উভয়মুখী** (Ambivert)।

(i) **অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব :** এই জাতীয় লোকেরা নিজেদের নিয়েই থাকতে ভালবাসে, বাইরের জগতের প্রতি এদের আকর্ষণ কম। কাজেই আত্মকেন্দ্রিকতা, বাহ্যবস্তুর প্রতি উদাসীনতা, স্বার্থপরতা, আত্মসচেতনতা প্রভৃতি এই জাতীয় লোকের বৈশিষ্ট্য। বাইরের জগতের কর্মকোলাহলে এরা অংশ গ্রহণ করতে চায় না। সাধারণতঃ এই সব মানুষ অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। আত্মবিশ্লেষণে এরা খুব পটু এবং এদের মধ্যে সামাজিকতাবোধের একান্ত অভাব। নতুন পরিবেশের সঙ্গে এরা সহজে সঙ্গতিসাধন করতে পারে না, এদের পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য এরা অলীক কল্পনা এবং দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকে। অনেক কবি, দার্শনিককে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

(ii) **বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব :** এই জাতীয় লোকেরা নিজেদের ভাবধারণা ছেড়ে দিয়ে অপরকে নিয়েই থাকতে ভালবাসে। বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলেই এরা অংশ গ্রহণ করতে চায়। এরা হল সামাজিক প্রকৃতির এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যোগদান করতে ভালবাসে। এরা স্বভাবতঃ চট্পটে এবং কর্মপ্রিয় হয়ে থাকে। এই জাতীয় লোক নতুন পরিবেশের সঙ্গে অতি সহজে খাপ-খাওয়াতে পারে এবং এরা খুব আবেগপ্রবণ।

(iii) **উভয়মুখী :** এই জাতীয় লোকেরা অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী—এই উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা একদিকে যেমন আত্মসচেতন তেমনি অপরদিকে সামাজিক পরিবেশের প্রতিও মনোযোগী অর্থাৎ এরা আত্মকেন্দ্রিক এবং সমাজকেন্দ্রিক উভয়ই। বেশীর ভাগ লোকই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

য়ুঙ (*Jung*) অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী এই উভয় জাতিরূপের প্রত্যেকটির আবার চারটি করে উপজাতি রূপ (sub-type)-এর কথা বলেছেন—**সংবেদন-প্রবণ** (Sensing type), **চিন্তাপ্রবণ** (Thinking type), **অনুভূতি-প্রবণ** (Feeling type) এবং **অন্তর্দৃষ্টিপ্রবণ** (Intuitive type)।

(খ) **ই. আর. যেনেশ**-এর জাতিরূপ বা **টাইপ** (E. S. Janensch's Type): জার্মান মনোবিদ্ ই. আর. যেনেশ[1]-এর ভাব-প্রতিরূপের (Eidetic Image) উপরই তাঁর ব্যক্তিত্বের টাইপ মতবাদের ভিত্তি। ভাব-প্রতিরূপ হল এমন একটি দৃষ্টিগত প্রতিরূপ যাকে বাস্তব প্রত্যক্ষণ থেকে পৃথক করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণতঃ দশ থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিরূপ দেখতে পায়। এই ভাব প্রতিরূপ গঠন করার ভিত্তিতে তিনি ব্যক্তিকে 'B' type বা (Basedowid type) এবং 'T' Type বা (Tetanoid type)-এ শ্রেণীভুক্ত করেছেন। প্রথম জাতের মধ্যে কুশলী মনোভাব থাকে এবং দ্বিতীয় জাতের মধ্যে যুঙ্-এর বহির্মুখী ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্ট হয়।

(গ) **স্প্রানগার-**এর জাতিরূপ বা **টাইপ** (Spranger's Type)[2]: যে জীবনদর্শন মানুষের আচরণ এবং ব্যবহারের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করে তার ভিত্তিতে মানুষকে শ্রেণীভুক্ত করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। মানুষ জীবনে কিছু মূল্যকে স্বীকার করে নেয় যা তার ব্যক্তিত্বকে সুসংবদ্ধ করে। এই মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্প্রানগার মানুষের ছয়টি টাইপের কথা বলেছেন, যথা—

(১) **তাত্ত্বিক** (Theoretical)—এই ধরনের ব্যক্তি হল সত্যানুসন্ধানী; চিন্তামূলক বা বুদ্ধিগত কাজেই এদের আগ্রহ। বিজ্ঞানী, দার্শনিকরা এই টাইপের অন্তর্ভুক্ত।

(২) **হিসাবী** (Economic)—জাগতিক প্রয়োজনের দিকেই এদের নজর। শিব, সত্য ও সুন্দরের আদর্শ নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না।

(৩) **সৌন্দর্যবোধ সম্পন্ন** (Aesthetic)—এরা সুন্দরের ধ্যান করে এবং জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করে গড়তে চায়।

(৪) **সামাজিক** (Social)—এই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি মানুষের প্রতি ভালবাসাকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্য বলে ধারণা করেন। মানবোচিত গুণ এবং মানবিক সম্পর্কের প্রতিই এদের আগ্রহ বেশী।

(৫) **রাজনৈতিক** (Political)—এই জাতীয় ব্যক্তি ক্ষমতালোভী এবং অপরের উপর নিজেদের প্রভুত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক।

1. "Eidetic Images were noticed by Janensch who even tried to classify people according to their capacity for having eidetic images."

—Boaz ; General Psychology : Page 348.

2. Spranger : Types of Men ; Page 395.

(৬) **ধার্মিক** (Religious)—জীবনের মধ্যে যে ঐক্য আছে তাকে কোন বৃহত্তর সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতে চায় এই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক।

স্প্রানগার-এর পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ অনেক মনোবিদ্ স্বীকার করে নিতে সম্মত হন নি। স্প্রানগার-এর শ্রেণীবিভাগের দোষ হল, তাঁর টাইপগুলি এত ব্যাপক যে এই এক একটি টাইপের অন্তর্ভুক্ত আরও অসংখ্য ব্যক্তিত্বের সন্ধান মেলে। অলপোর্ট তাই মন্তব্য করেছেন যে, এজাতীয় স্থূল শ্রেণীবিভাগের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা হারিয়ে যায় (Individual becomes lost in such coarse classification)।

(ঘ) **ফ্রয়েড-এর ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ বা টাইপ** (Freud's Type): শিশুর যৌন বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির ভিত্তিতে ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের উল্লেখ করেছেন।

(১) **মুখ-কামী** (Oral-erotic Type)-এর দুটি রূপ আছে, মর্ষকামী (sadistic) এবং নিষ্ক্রিয় (passive)। যারা মর্ষকামী তারা পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত হয় এবং এই কারণে শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে একটা ব্যর্থতা ও হতাশার ভাব থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনে এরা দুঃখবাদী, বিদ্বেষপরায়ণ এবং ব্যঙ্গকারী হয়। আবার যারা নিষ্ক্রিয় মুখ-কামী (oral-passive) হয়, তারা আশাবাদী, নির্ভরশীল এবং অপরিণত থাকে। এদের আচরণ অনেকটা শিশু সুলভ। এরা চায় সব কিছু এদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ঘটুক।

(২) **পায়ু-কামী** (Anal Erotic)—শৈশবে যদি শিশুর পিতামাতার প্রতি বিরাগ বা আক্রমণাত্মক ভাব দেখা দেয়, তাহলে শিশু পায়ু-কামী হয়। পায়ু কামী ব্যক্তিত্বের লোক একগুঁয়ে, খুঁতখুঁতে, বেয়াড়া, কৃপণ ও সুবিধাবাদী হয়। এদের কাজে নির্দিষ্ট নীতির অভাব দেখা দেয় এবং কথায় ও কাজে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

(৩) **উপস্থ-কামী** (Genital Type)—এর দুটি রূপ আছে, ফ্যালিক টাইপ এবং জেনিট্যাল টাইপ। প্রথম অবস্থায় শিশু মনে করে অপরের মত তারও লিঙ্গ আছে। সাধারণ যৌন সম্পর্কের প্রশ্ন এ স্তরে আসে না। এই স্তরে শিশু আত্মকামী ও দুরাকাঙ্ক্ষী হয়, একটুতেই হতাশ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় স্তরে স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্ন থাকে। এই স্তরে শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতা, অভিযোজনের ক্ষমতা, নির্ভরতাবোধ ও সহযোগিতার ভাব দেখা দেয়।

ফ্রয়েডের পূর্বোক্ত ব্যক্তিত্বের টাইপ সম্পর্কে বলা যেতে পারে, কামই ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের একমাত্র উপাদান নয়। ফ্রয়েড স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া কোন শিশু পায়ু কামী হলেই যে ভবিষ্যতে একগুঁয়ে, খুঁতখুঁতে বা কৃপণ স্বভাবের হবে, এ বোঝা কষ্টসাধ্য।

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ: (ক) **ক্রেৎসমার**-এর **টাইপ** (Kretschmer types): মানসিক ব্যাধি চিকিৎসক ক্রেৎসমার মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা করা কালীন লক্ষ্য করলেন যে, মানসিক বিকারের সঙ্গে দৈহিক বৈশিষ্ট্যর সংযোগ আছে। তিনি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, যারা সিজোফ্রেনিয়া বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতা রোগে আক্রান্ত তারা স্বভাবতঃ অন্তর্মুখী হয় এবং তারা ঢেঙ্গা, দীর্ঘওষ্ঠযুক্ত এবং ডিম্বাকার মুখবিশিষ্ট হয়; আর যারা খেদোন্মত্ত বাতুলতা রোগে ভুগছে (manic depressive), তারা স্বভাবতঃই বহির্মুখী হয় এবং তারা বেঁটে, স্থূলাকার এবং গোলাকার মুখবিশিষ্ট হয়। চিকিৎসাগারের বাইরে তাকিয়ে তিনি দেখলেন স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তি, যাদের সঙ্গে মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে, তাদের মধ্যেও উপরিউক্ত ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ক্রেৎসমার সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের চারটি ভাগে ভাগ করলেন। যথা—(১) **পিকনিক** (Pyknik), (২) **এসথেনিক** (Aesthenic), (৩) **এথলেটিক** (Athletic) এবং (৪) **ডিসপ্লাষ্টিক** (Dysplastic)। পিকনিক শ্রেণীর ব্যক্তিরা বেঁটে, স্থূলকায় এবং গোলাকারবিশিষ্ট হয় এবং এই শ্রেণীর লোকেরা বহির্মুখী হয়। এসথেনিকেরা দীর্ঘকায়, দীর্ঘ হস্তপদযুক্ত ও রুগ্নদেহবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এথলেটিক (Athletic) শ্রেণীর লোকেরা মাঝামাঝি আকারের দেহবিশিষ্ট হয়। এদের অস্থি ও পেশীগুলি পুষ্ট হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত হয়। এদের পেশী দৃঢ়, বুক চওড়া, ঘাড় প্রশস্ত এবং হাত পা বড় হয়। দেহ ও মনের দিক থেকে এরাই সুস্থ ও স্বাভাবিক এবং আদর্শ মানুষ। ডিসপ্লাষ্টিক শ্রেণীর লোকের দৈহিক বৃদ্ধি সম্পূর্ণতা লাভ করে না, সেহেতু এরা হীনমন্যতাবোধ রোগে ভোগে। এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বিরল।

ক্রেৎসমার-এর টাইপ

অন্য ধরনের নীতির ভিত্তিতে ক্রেৎসমার দুপ্রকার ব্যক্তিত্বের টাইপের কথা বলেছেন—(১) **সিজোথিম** (Schizothyme) বা **চিত্তভ্রংশী রূপ এবং** (২) **সাইক্লোথিম** (Cyclothyme) বা **খেদোন্মত্তরূপ**। পিকনিক (*Pyknik*) শ্রেণীর লোকেরা হল সাইক্লোথিম টাইপের লোক। এরা হল অন্তর্মুখী এই শ্রেণীর লোক অতি সহজেই উৎফুল্ল হয় আবার সহজেই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই টাইপের

লোকেরা নিজেদের আবেগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করে এবং এরা হল সামাজিক, উত্তেজনাপ্রবণ, বাস্তববাদী এবং সহিষ্ণু।[1] এই শ্রেণীর লোকেরা যখন মানসিক বিকারে ভোগে তখন এদের খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic depressive) রোগ দেখা দেয়। এসথেনিকেরা হল সিজোথিম টাইপের লোক। এই টাইপের লোকেরা গম্ভীর, স্বাবলম্বী, সাবধানী, আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু এবং পলাতক মনোবৃত্তিসম্পন্ন। এই টাইপের লোকেরা যখন মানসিক বিকারগ্রস্ত হয় তখন তাদের মধ্যেও সিজোফ্রেনিয়া রোগ বা চিত্তভ্রংশী বাতুলতা দেখা দেয়। এথলেটিক শ্রেণীভুক্ত লোকদের মানসিক প্রকৃতি স্বাভাবিক এবং এরা সিজোথিম টাইপের অন্তর্ভুক্ত। যারা ডিসপ্লাষ্টিক তারাও সিজোথিম টাইপের অন্তর্ভুক্ত।

ক্রেৎসমার-এর টাইপের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু সাদৃশ্য থাকলেও মনোবিদ্‌রা এই শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগ নিখুঁত নয়, কেননা, মানুষকে এত সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মানুষকে এভাবে শ্রেণীভুক্ত করা গেলেও, মানুষের মানসিক প্রকৃতি বিচিত্র, সে কারণেও এগুলিকে এত সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে না।

(খ) **সেলডন**-এর **টাইপ** (Sheldon's Types)ঃ ডব্লু. এইচ. সেলডন-এর ব্যক্তিত্বের টাইপ সম্পর্কীয় তত্ত্বটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও সেলডন ক্রেৎসমারের পথেই তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন, তবু তিনি ক্রেৎসমারকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর মতে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যখন ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হবে তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ গ্রহণের প্রয়োজন আছে। তিনি প্রায় চারশত নগ্নদেহ যুবকের ছবি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তোলেন এবং তারই ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের উল্লেখ করেন।

প্রথম টাইপ হল **এণ্ডোমর্ফ** (Endomorph)। এই শ্রেণীর লোকের বৈশিষ্ট্য হল, এরা গোলাকার, কোমল দেহবিশিষ্ট এবং এদের উদর-প্রদেশ বিশেষ স্ফীত, এরা ক্রেৎসমারের পিক্‌নিকদের সঙ্গে তুলনীয়। দ্বিতীয় টাইপ হল, **মেসোমর্ফ** (Mesomorph)। এই শ্রেণীর লোকদের দেহ সুগঠিত ও পেশীবহুল। এরা **প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট**; এরা ক্রেৎসমারের অ্যাথলেটিকদের সঙ্গে তুলনীয়। তৃতীয় **টাইপ হল, একটোমর্ফ** (Ectomorph)। **এই** শ্রেণীর লোকেরা ক্ষীণদেহী এবং **দীর্ঘকায়; এরা ক্রেৎসমারের এসথেনিকদের সঙ্গে তুলনীয়।**

1. G. D. Boaz : General Psychology ; Page 896.

সেলডন ব্যক্তিদের দৈহিক পরিমাপের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে ত্যেক ব্যাক্তকে একটি সাত মাত্রা বশিষ্ট স্কেলে পরিমাপ করেন। এভাবে দৈহিক

হিক টাইপকে ন ধরনের ব্যক্তিত্বের ঙ্গ সংযুক্তিকরণ

পরিমাপ নির্ধারণ করার পর সেলডন এ দৈহিক টাইপকে তিন ধরনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। এ তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব হল—**ভিসেরোটোনিক** (*Viscerotonic*), **সোমাটোটোনিক** *Somatotonic*) এবং **সেরিব্রোটোনিক** (*Cerebrotonic*)।

এণ্ডোমর্ফরা মানস প্রকৃতির দিক থেকে ভিসেরোটোনিক টাইপের। এরা বিশ্রাম ৷ আরামপ্রিয়, ভোজনবিলাসী ও সামাজিক। এরা আমোদ-প্রমোদ, হৈ-চৈ ালবাসে। তাছাড়া, এরা সহিষ্ণু, অপরের স্নেহ-ভালবাসার প্রত্যাশী এবং নিজেদের াবেগকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে।

মেসোমর্ফরা মানস-প্রকৃতির দিক থেকে সোমাটোটোনিক টাইপের। এরা ভ্যমী; দুঃসাহসিক কাজ করতে চায়, বেপরোয়া এবং উত্তেজনা ভালবাসে। এরা পরের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু অপরের অনুভূতির প্রতি এরা দাসীন। এরা আত্মপ্রতিষ্ঠ, সংকল্পে দৃঢ় এবং সোজাসুজি কাজ করতে ভালবাসে।

এক্টোমর্ফরা মানস-প্রকৃতির দিক থেকে সেরিব্রোটোনিক টাইপের। এরা গাপনতাপ্রিয়, সাবধানী ও মনোযোগী। এদের চলাফেরা সংযত ও আড়ষ্ট। এরা নের অনুভূতিকে গোপন রাখতে চায় এবং আবেগকে দমন করতে চায়। মাজিক মেলামেশা এদের পছন্দ নয়। এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযমের ভাব। এদের আচরণ যুবজনোচিত নয় এবং অসুবিধায় পড়লে এরা নির্জনতা খুঁজে ডায়। সেলডন দাবি করেন যে, আরও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি যে ীক্ষণকার্য চালিয়েছেন, তার দ্বারা দৈহিক টাইপের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের খুব স্পষ্ট ংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

ক্রেৎসমারের টাইপতত্ত্বের তুলনায় সেলডনের টাইপতত্ত্ব অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত, ন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে সেলডনের মতবাদের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কেউ

সমারের টাইপের সলডনের টাইপের রস্পারক তুলনা

কেউ সেলডনের গাণিতিক পদ্ধতিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল, পরবর্তীকালে যেসব ব্যক্তিরা অন্য ব্যক্তিদের স্কেলে মেপে তাদের হিক পরিমাপ ও মানস-প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন, তারা সকলেই সেলডনের বাদের সঙ্গে পূর্বপরিচিত। পূর্বপরিচয় পরীক্ষণকার্য নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার ে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

(গ) আইসেঙ্ক-এর আয়তন (Eysenck's Dimensions) **:** ব্রিটিশ মনো[বিজ্ঞানী] আইসেঙ্ক ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ ক[রে] দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিত্বের তিনটি মৌলিক উপাদান বা আয়[তন] আছে। যথা—**অন্তর্মুখীতা-বহির্মুখীতা** (Introversio[n-]Extroversion), **মনোবিকার-প্রবণতা** (Neuroticism) এবং **উন্মত্ততা-প্রবণ[তা]** (Psychoticism)। আইসেঙ্ক-এর মতে এই তিনটি আয়তনের মধ্যে কে[ান] পারস্পরিক সংযোগ নেই ; সে কারণে কোন একটি আয়তনের মধ্যে ব্যক্তির অব[স্থা] জানা গেলেও অন্য দুটি আয়তনের মধ্যে তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় ন[া]। আইসেঙ্ক-এর মতে প্রতিটি ব্যক্তি এই তিনটি আয়তনের মধ্যে কোন-না-কোন স্থা[নে] অবস্থিত। এই অভিমতানুযায়ী সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির সঙ্গে উন্মত্ত ব্যক্তির পার্থক্য তা মাত্রাগত, জাতিগত নয়। সব লোকের মধ্যেই যে মানসিক বৈশিষ্ট্যগু[লি] আছে, উন্মত্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও সেগুলি আছে, তবে অধিক মাত্রায় আছে।

ব্যক্তিত্বের তিনটি মৌলিক আয়তন

পূর্বোক্ত মৌলিক উপাদান ছাড়াও, ব্যক্তিত্বের মধ্যে আরও কয়েকটি উপাদা[নের] অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির ম[ধ্যে] লক্ষ্য করা যায়, পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির মতো এগুলি [ততটা] ব্যাপক নয়। এই সব অপ্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়ে[ছে] **রক্ষণশীলতা-প্রগতিশীলতা** (Conservatism-Radicalism), **সরলতা-জটিলতা** (Simplicity-Complexity) এবং **দৃঢ়চিত্ততা—কোম[ল]চিত্ততা** (Toughmindedness-Tendermindedness)।

মৌলিক উপাদান ছাড়াও আরও কয়েকটি উপাদানের অস্তিত্ব

আইসেঙ্ক এবং তাঁর অনুগামীদের মতে পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ (Statistic[al] analysis) এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষণের (Objective tests) উপর ভিত্তি না করে, যে পদ্ধতি ব্যক্তিত্বের স্বরূপ আলোচনা করতে চায়, সেগুলিকে সন্তোষজনক মনে করা যেতে পারে না। নিছক পর্যবেক্ষ[ণের] উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য অ[নেক] মনোবিদরা মনে করেন যে, এই পদ্ধতি অধিক মাত্রায় কঠো[র]। তাঁদের মতে অন্তর্দৃষ্টির সহায়তা ছাড়া কেবলমাত্র উপাদান-বিশ্লেষণের (Fact[or] analysis) সাহায্যে যদি ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হয় তাহলে ব্যক্তিত্বের আলো[চনা] অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য উভয় মতের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা যে[তে] পারে যে, অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যে প্রকল্প রচিত হবে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষণের ভিত্তি[তে] কেবলমাত্র সেই প্রকল্পগুলির যাথার্থ্য প্রমাণিত হতে পারে।

নিছক পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ সম্ভব নয়

৭। ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা ও পরিমাপ (Personality Tests d Measurements) :

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা বহু কাল থেকেই চলে আসছে। ব্যক্তির হিক গঠন ও বাহ্য-আচরণ লক্ষ্য করে, তার সম্পর্কে অপরের অভিমত সংগ্রহ করে বা ব্যক্তির চিন্তা, ভাবধারা, বিশ্বাস, আদর্শ, জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে তার ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টার পদ্ধতি অনেকটা সুপরিচিত পদ্ধতি। ন্তু বর্তমানে আরও নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ক্তিত্ব প'রিমাপের চেষ্টা করা হচ্ছে।

ানিক দৃষ্টির ধ্যে ব্যক্তিত্ব মাপের প্রচেষ্টা

কি পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হবে, সে সম্পর্কেও মতভেদ দেখা যায়। ান কোন মনোবিদের মতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার পক্ষে হোলিষ্টিক (*Holistic*) ৱতিই বিশেষভাবে উপযোগী। এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে, তার ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। এঁদের মতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলিকে ক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে একটি ঐক্যবদ্ধ ংহত জটিল সংগঠন, সে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়। আবার অনেকে মনে বন যে, এই পদ্ধতি এত বেশী ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective) যে তার দ্বারা ব্যক্তির ক্তিত্বের পূর্ণ স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয় না। সে কারণে অনেক মনোবিদ্ ব্যক্তিত্বের িমাপের জন্য নৈর্ব্যক্তিক (objective) পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী।

লিষ্টিক পদ্ধতি

বর্তমান যুগে ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করার জন্য যে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার ্য কয়েকটি নীচে আলোচনা করা হচ্ছে :

(ক) **সাক্ষাৎকার** (Interview) : ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার পদ্ধতি হিসেবে ক্ষাৎকার পদ্ধতি খুব পুরাতন পদ্ধতি। ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সঙ্গে লাপ-আলোচনায়, কথাবার্তায় এবং তাকে নানারকম প্রশ্ন করে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ ার চেষ্টা করা হয়। এই সাক্ষাৎকার চার রকমের হতে পারে; যথা— nstandardized Interview', 'Standardized Interview', 'Stress terview' এবং Exhaustive Interview'। দুটি লোকের মধ্যে যে সাধারণ থাপকথন হয় তার সঙ্গে প্রথম ধরনের সাক্ষাৎকারকে তুলনা করা চলে। দ্বিতীয় নটি নানারকমের হতে পারে, তবে সাক্ষাৎকারী কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা তে পারেন। তৃতীয় ধরনের সাক্ষাৎকারের সময় ব্যক্তিকে উত্তেজিত করা হয়

এবং লক্ষ্য করা হয় যে, ব্যক্তি উত্তেজনার মুহূর্তে কতখানি নিজেকে সংযত রেখে নিজের উপাদানগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারে। শেষের ধরনটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়।

এই পদ্ধতির উপকারিতাকে অস্বীকার করা না গেলেও, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি কোন সুনির্দিষ্ট নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার জন্য এর মধ্যে একটি প্রধান ত্রু দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মনোভাব ক্রিয়া করার জন্য সম্পূ নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।[1]

সাক্ষাৎকারের বিবরণগুলি অনেক সময় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ এবং স্মৃ শক্তি ও অধিকমাত্রায় সক্রিয় কল্পনার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তাছাড়া, যদি বিশে একটা শান্ত পরিবেশে কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হয় তাহলে তার মাধ্য তার ব্যক্তিত্বের যথার্থ রূপ ধরা না পড়তেও পারে, সে কারণে বর্তমানে 'Stre Interview' পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে, সমালোচ করে, তার মধ্যে চিত্তবিক্ষেপের সৃষ্টি করে, সেই অবস্থায় তার ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ক হয়।[2] বর্তমানে সাক্ষাৎকারের সময় কোন্ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা হবে, সেগু পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে এবং কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করে এই পদ্ধতিে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দান করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

(খ) জীবন-ইতিহাস অনুসরণ পদ্ধতি (Case History Method) এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তির আচরণ, শৈশবকালের অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, বংশগ বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ, গৃহের পরিবেশ, ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবে ব্যক্তির যৌন-বিকাশের বিবরণ প্রভৃতি সবগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্র করে, তারই ভিত্তিতে তার ব্যক্তিত্ব মাপ করার জন্য চে করা হয়। মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধ বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়।

জীবন ইতিহাস অনুসরণ পদ্ধতি

1, "The peace and quiet of a personal office may bring out in the subje behavioral tendencies quite different from those that he will show under pressu Hence Freeman et al (1962) developed the stress interview to study personal under pressure of criticism, distraction and excitement."

—Stagner : Psychology of Personality ; Page

2. "The stress interview was introduced to determine how well an individu can keep command of his resource when he is emotionally excited and also determine how quickly he recovers after the pressure is off."

—J.P. Guilford : Personality ; Page 1

(গ) **রেটিং স্কেল** (Rating Scale) **ঃ** গুণের পরিমাণ অনুসারে সঠিক বিচার করা এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য ব্যক্তিত্ব পরিসর রেখার ঠিক কোন্ পর্যায়ে তার গুণটি অবস্থিত সেটি পরিমাপ করা হয়। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির দুটি বিপরীত গুণকে একটি রেখার দুই প্রান্তে রেখে, রেখাটিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। একেই স্কেল বলা হয়। যেমন, 'সহযোগিতা' এই বৈশিষ্ট্যটির রেটিং স্কেল নিম্নোক্তভাবে তৈরি করা যেতে পারে। আমাদের প্রশ্ন হল, ব্যক্তি সহযোগী (co operative) না, অসহযোগী (non-co operative)? নীচের স্কেলটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে,

অতি বড় সহযোগী	বেশ সহযোগী	মাঝামাঝি সহযোগী	কম সহযোগী	অসহযোগী
রাম—···	×	···		···
শ্যাম—×	···	···	···	···
যদু—··	···	···	···	×

'সহযোগিতা' এই গুণটি তিনজন ব্যক্তির মধ্যে কি পরিমাণে আছে এবং ব্যক্তিত্ব পরিসর রেখায় কার স্থান কোথায় তা নির্দেশ করা হয়েছে। উপরের দৃষ্টান্তটি পাঁচ মাত্রার স্কেলের দৃষ্টান্ত. তবে পাঁচ মাত্রার ছাড়া ওই স্কেল তিন মাত্রার, সাত মাত্রার বা কখনও কখনও নয় মাত্রারও হতে পারে।

এই অভীক্ষার একটা দোষ হল যে, পরীক্ষক তার পরিচিত ব্যক্তির কোন গুণ পরিমাপ করতে গিয়ে স্কেলের একটা বিশেষ উপযোগী স্থানে তাকে বসিয়ে দিতে পারেন। একে *Woodworth* বলেছেন, 'generosity error'. আবার কোন একটি গুণের ব্যাপারে ব্যক্তির উৎকর্ষ পরীক্ষককে এমন ভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে যে, তিনি অন্য গুণ সম্পর্কেও সেরূপ ধারণা করতে পারেন। একে বলা হয় 'halo-effect'. তবে এই স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করে ব্যক্তিত্বের একটি চিত্র (Personality profile বা Psychograph) আমরা সহজেই পেতে পারি।

(ঘ) **প্রশ্নতালিকা পদ্ধতি** (Questionnaire) **ঃ** এই পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে বলা হয় প্রশ্নগুলির পাশে তার স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে সেগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য। সাধারণতঃ প্রশ্নের পাশে 'হাঁ' বা 'না' এই দুটি উত্তরের মধ্যে যে-কোন একটি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সব প্রশ্নাবলীর উত্তর থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের

বিভিন্ন দিক জানা যায়। যেমন, ব্যক্তি অন্তর্মুখী, না বহির্মুখী ; সে মিশুকে না নির্জনতাপ্রিয়, সামাজিক, না আত্মকেন্দ্রিক ইত্যাদি। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্ট (*Burt*) সর্বপ্রথম এই ধরনের একটা প্রশ্ন-তালিকা রচনা করেন।

প্রশ্ন-তালিকায় নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা যেতে পারে—

(১) আপনি কি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসেন ? হাঁ—না

(২) আপনি কি সব সময় চেষ্টা করেন যাতে অপর লোকে আপনার কথায় সায় দেয় ? হাঁ—না

(৩) অপরিচিত লোকের মাঝে আপনি কি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন ? হাঁ—না

(৪) সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনি যোগ দিতে ভালবাসেন কি ? হাঁ—না

(৫) অপর লোকে আপনার সম্পর্কে কি ভাবে তা নিয়ে মাথা ঘামান কি ? হাঁ—না

(৬) অপর লোকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি কি সন্দেহপ্রবণ ? হাঁ—না

প্রশ্নতালিকা-পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলি জানা গেলেও সংলক্ষণের যে নিজস্ব প্রকৃতি তাকে জানা যায় না। যেমন, দেখা গেল রাম এবং শ্যাম দুজনেই অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার ব্যাপারে খুবই দক্ষ, কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে এই সংলক্ষণটি ঠিক এক নয়। রাম প্রভুত্ব বিস্তার করে তার হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণের দ্বারা, আর শ্যাম করে তার স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণের দ্বারা।

(ঙ) **অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণ** (Free Association **Method and Dream Analysis**) **:** এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অবচেতন মনের রহস্য উদ্ঘাটন করে তার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা। মনঃসমীক্ষক অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির মনের নির্জ্ঞান স্তরে যেসব কামনা, বাসনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সামাজিক আদর্শের সঙ্গে বিরোধিতার জন্য বা অন্যান্য কারণে অবদমিত হয়ে থাকে, সেগুলিকে সচেতন স্তরে টেনে নিয়ে আসেন এবং তার ব্যক্তিত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করেন। পরীক্ষক প্রথমে ব্যক্তির বিশ্বাস অর্জন করেন এবং তারপর ব্যক্তিকে বেশ আরাম করে বসিয়ে তার মনের গোপন কথা স্বাধীনভাবে নিঃসঙ্কোচে বলে যাবার নির্দেশ দেন। এর ফলে মনঃসমীক্ষক বুঝতে পারেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন্ কোন্ সংলক্ষণ অবদমিত হওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। আবার মনঃসমীক্ষক স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে যেসব নির্জ্ঞান প্রেষণা ক্রিয়া করে সেগুলিও জানতে পারেন।

(চ) কৃতি পরীক্ষা (Performance Test)**ঃ** এই পদ্ধতিতে কোন একটি বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিকে কোন একটি কাজ করতে বলা হয় এবং তার কাজ লক্ষ্য করে ব্যক্তিত্বের কোন একটি সংলক্ষণ তার মধ্যে কি পরিমাণে আছে তা লক্ষ্য করা হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা খুব কার্যকর হয়। যেমন, শিশুরা অন্তর্মুখী, না বহির্মুখী তা নির্ধারণ করার জন্য কয়েকটি শিশুকে যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হল। দেখা গেল, কয়েকটি শিশু প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির দিকে বড় বেশী নজর দিচ্ছে না, খুব ধীরে ধীরে একটি থেকে আর একটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতঃই এই ধরনের শিশুরা অন্তর্মুখী। অপর কতকগুলি শিশুর মধ্যে বেশ স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল। এরা চটপট একটার পর একটা দেখে যাচ্ছে এবং বেশী মনোযোগ দিয়ে দেখছে। স্বভাবতঃই এই ধরনের শিশুরা বহির্মুখী।

(ছ) প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test)**ঃ** এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হল এই যে, এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির কাছে একটি উদ্দীপক উপস্থাপিত করা হয় এবং ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়া করার জন্য বলা হয়। এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে পরীক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত করে। 'প্রতিফলন' প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি তার নিজের কোন ইচ্ছা বা বৈশিষ্টাকে অপরের ওপর প্রতিফলিত করে মানসিক তৃপ্তি পেতে চায়। এখানে প্রতিফলন প্রক্রিয়াটিকে দেখা হয়েছে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ প্রকাশক হিসেবে। ব্যক্তি উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া করার সময় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলিকে বাইরে প্রকাশ করে। তাই ব্যক্তিত্ব নির্ধারক অভীক্ষা-গুলিকে বলা হয় প্রতিফলন অভীক্ষা। এই প্রতিফলন পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে :

(i) **রোরশা ইঙ্কব্লট অভীক্ষা** (Rorschach Inkblot Projective Test)**ঃ** সুইজারল্যাণ্ডবাসী একজন মনোবিদ্ চিকিৎসক হেরমান রোরশা (*Hermann Rorschach*) রোরশা ইঙ্কব্লট পদ্ধতির প্রবর্তক। এই পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষণ-পাত্রকে কয়েকটি কালির ছাপ দেখান হয় এবং তারপর পরীক্ষণ-পাত্রকে তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে বলা হয় অর্থাৎ কালির ছাপ দেখে পরীক্ষণ-পাত্র তার যা অর্থ নিরূপণ করে সেটি পরীক্ষককে জানায় এবং পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের বর্ণনা থেকে তার মানসিক সংগঠন কি প্রকার, তার মধ্যে আবেগ বা প্রেরণার আধিক্য আছে কিনা, কিংবা তার আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত বা সাবলীলভাবে আত্মপ্রকাশ করে কিনা, তার চিন্তাধারার পদ্ধতি অমূর্ত, না মূর্ত (concrete or abstract), তার মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা করেন এবং এর মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন

করেন। এই ধরনের দশটি কালির ছাপ থেকে তৈরি ছবির দ্বারা রোরশার অভীক্ষাটি গঠিত। ছবিগুলির এমনই বৈশিষ্ট্য যে তাদের অনির্দিষ্ট প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি নিজের মনের ভাব ও চিন্তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়।

রোরশা পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একটি কালির ছাপ। কলেজের দুটি ছাত্র ও দুটি ছাত্রীকে এই ছাপ দেখান হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে বলা হয়। ছাত্রী দুটির মধ্যে একজন বলেছিল—এটি কুমীর, হাতী, খরগোশ, প্রজাপতি ইত্যাদি, আবার আর একজন বলেছিল—দুটি ইঁদুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে; মানুষের হৃৎপিণ্ড, প্রজাপতির ডানা ইত্যাদি। ছাত্র দুজনের মধ্যে একজন বলেছিল—দুজন নর্তক, দুটি উড়ন্ত ঘোড়া, জন্তুর কঙ্কাল ইত্যাদি। আর একজন বলেছিল—দুটি নর্তকী, দুটি নর্তক, অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্র, উড়ন্ত ঘোড়া, জন্তুর কঙ্কাল ইত্যাদি।

(ii) **কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ পরীক্ষণ-পদ্ধতি** (Thematic Apperception Test বা TAT)**ঃ** মর্গান ও মারে (*C. D. Morgan & H. A. Murray*) উপরিউক্ত পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রবর্তক। এই পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষণ-পাত্রের সামনে একটি ছবি উপস্থাপিত করা হয়। ছবিটির নানারকম ব্যাখ্যা সম্ভব। পরীক্ষণ-পাত্রকে ছবিটি দেখে তার মনে যে গল্পের উদয় হয় সেটি বলতে বলা হয়। যেমন, পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবিটিতে দেখান হয়েছে যে, একটি মেয়ে হাতের উপর মুখটি রেখে জানালার দিকে তাকিয়ে বসে আছে এবং তার কাছে একজন বয়স্কা মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। ছবিটি

দেখে কেউ বলতে পারে যে মেয়েটির কোন্ কারণে গম্ভীর হয়ে বসে থাকার জন্য মহিলাটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে, কিংবা মহিলাটি তরুণীটির মা, কোন কারণে তাকে ভৎর্সনা করেছে, যার জন্যে মেয়েটি হাতের উপর মুখটি রেখে বসে আছে ইত্যাদি। পরীক্ষণ-পাত্র ছবিটি দেখে যে কাহিনীটি বর্ণনা করে, সেই বর্ণনার মাধ্যমে পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের আশা, আকাঙ্ক্ষা, অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা, মনোভাব, আবেগ, মানসিক

কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে উপরের ছবিটির অনুরূপ ছবি ব্যবহৃত হয়

দ্বন্দ্ব ও কল্পনাশক্তি প্রভৃতি জানবার চেষ্টা করে এবং তার সাহায্যে তার ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করেন। ছবিগুলির প্রকৃতি এতই অনির্দিষ্ট যে যে কোন রকম ব্যাখ্যা দিয়ে কাহিনী সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য এখানে যে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা এই পরীক্ষণের জন্য যে নির্দিষ্ট ছবিগুলি ব্যবহার করা হত সে রকম কোন ছবি নয়। এই ছবিটি ঐ জাতীয় ছবির অনুরূপ একটি ছবি। বর্তমানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী এই ধরনের অভীক্ষা গঠন করা হয়েছে। এগুলির নাম শিশু-সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা (Childrens' Apperception Test বা CAT)।

(iii) **শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা** (Word Association Test) : এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অথচ ব্যক্তিত্বসূচক 'শব্দ' (word) একটির পর একটি উদ্দীপক হিসেবে পরীক্ষণ-পাত্রের কাছে উপস্থাপিত করা হয় এবং কোনরকম চিন্তা না করেই যে শব্দটি প্রথম মনে আসে সেটি বলে প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। পরীক্ষণ-পাত্র

কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে এবং প্রতিক্রিয়া করতে কত সময় লাগে উভয়ই লক্ষ্য করা হয়। পরীক্ষার্থীর উত্তরের সাহায্যে তার নির্জ্ঞান মনের বহু রহস্য উদ্ঘাটিত হয় এবং তার আবেগ প্রবণতা, তার মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি জানা যায়। ফ্র্যান্সিস্ গলটন সর্বপ্রথম এই ধরনের অভীক্ষা গঠন করেন। পরবর্তীকালে ইয়ুং উন্নত ধরনের শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কাজে লাগান। উল্লেখযোগ্য শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষাগঠনের কৃতিত্ব কেন্ট এবং রোজানফের (*Kent* and *Rosanoff*)। সাম্প্রতিক কালে র‍্যাপাপোর্ট (*Rahahert*), গিল (*Gill*) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের ওপর এই অভীক্ষা প্রয়োগ করেছেন। এ তিনটি ছাড়া আরও প্রতিফলন অভীক্ষা গঠিত হয়েছে। যথা—রোজানউইগের (*Rosanwig*) ব্যর্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণ অভীক্ষা, বাক্য সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা ইত্যাদি।

(জ) **পরিস্থিতি অভীক্ষা** (Situation Test) : এই অভীক্ষায় কোন ব্যক্তিবিশেষ এক পরিস্থিতিতে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কিভাবে আচরণ করে, তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হয়। শিশুরা সাধু কি অসাধু এই অভীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়; বিশেষ একটা পরিস্থিতিতে শিশুদের এমন ভাবে আচরণের সুযোগ দেওয়া হয় যাতে তারা ইচ্ছা করলে অপরকে ঠকাতে পারে, কিন্তু পরীক্ষকের নজর তারা এড়াতে পারে না। পরীক্ষক শিশুদের আচরণ দেখে বুঝতে পারেন তারা সাধু কি অসাধু।

সমালোচনা : পূর্বোক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব পরিমাপক পদ্ধতিগুলির সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার চেষ্টা করা হলেও এই পদ্ধতিগুলির কতকগুলি দোষ বা ত্রুটি আছে।

অভীক্ষাগুলির ত্রুটি

(১) প্রথমতঃ, ব্যক্তি-প্রভাব সঠিক ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ধারণা বা মনোভাব, পূর্বধারণা, সংস্কার ও বিশ্বাস পরীক্ষণ-পাত্রের ব্যক্তিত্বের বিচারকে দোষদুষ্ট করে তুলতে পারে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্রমবিকাশমান ; গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা ব্যক্তিত্বের ধর্ম। কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে গতানুগতিকভাবে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের প্রচেষ্টায় ব্যক্তিত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি উপেক্ষিত হয়।

(৩) তৃতীয়তঃ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের একটা সামগ্রিক রূপ আছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র সংলক্ষণগুলির সমষ্টিমাত্র নয়, কেননা, বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি একত্রে কার্য করে ব্যক্তিত্বের রূপটি গড়ে তোলে। সুতরাং সংলক্ষণগুলিকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায়, তাহলে ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বকে বুঝে ওঠা যায় না।

(৪) বিভিন্ন পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য ও উপযুক্ত হওয়া উচিত নতুবা বিচার ত্রুটিযুক্ত হতে বাধ্য। তাছাড়া, পরীক্ষণ-পাত্রের বয়স, ক্ষমতা, শক্তি, এগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে এই পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি রচিত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) যে সমস্ত পরীক্ষণ-পদ্ধতিগুলি ভাষাভিত্তিক, অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ-পাত্রকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়, সেসব ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে, কেননা ভাষা ভাবের বাহক হলেও, সব সময় মনের ইচ্ছা, অবস্থা, আকাঙ্ক্ষা ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না।

(৬) পরীক্ষণ-পাত্রও সত্য গোপন করে এবং প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়ে পরীক্ষকের যথার্থ বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, পরীক্ষণ-পাত্র নিজের দুর্বলতা গোপন করার জন্য পরীক্ষকের কাছে দেখাবার চেষ্টা করতে পারে যে, সে মহৎ ব্যক্তিত্ব-গুণের অধিকারী।

পূর্বোক্ত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব পরিমাপক বিভিন্ন পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলির কোন উপকারিতা নেই, এরূপ ধারণা করলে ভুল হবে। ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের জন্য প্রতিফলন অভীক্ষাগুলি (Projective Test) আমাদের অনুসন্ধান ক্ষেত্রকে এতখানি বিস্তৃত করেছে যে ফ্র্যাঙ্ক (*Frank*) এই অভীক্ষাগুলির প্রবর্তনকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে রঞ্জনরশ্মির (X-Ray) প্রবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এই তুলনা খুবই যুক্তিযুক্ত। রঞ্জনরশ্মির আলোকচিত্রের মতো প্রতিফলন অভীক্ষাগুলি দেহের কোন ক্ষতি না করে দেহের অভ্যন্তরীণ অংশকে ব্যক্তি এবং মনের বিচিত্রতর গতিবিধি জানতে সহায়তা করে। বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপযোগী সুনির্দিষ্ট নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি রচনা করে, গুণগত দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোগসাধন দ্বারা ব্যক্তিত্ব পরিমাপক পরীক্ষণ-পদ্ধতিগুলিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার কাজে আরও বেশী উপযোগী করে তোলা যেতে পারে।

অভীক্ষাগুলির গুণ

৮। ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of Personality) :

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোন স্থির বস্তু নয়, উহা একটি গতিশীল সংগঠন। শিশু যখন জন্মায়, তখন তার মধ্যে কোন ব্যক্তিসত্তা লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু তার জন্মের পর থেকেই তার মধ্যে পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাব সক্রিয় হয়ে উঠে, আর শিশু তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে। পরিবেশ ও আপন অন্তর্নিহিত শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠিত হয়।

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোন নিশ্চল বস্তু নয়, সমগ্র জীবন ধরে ব্যক্তিত্বের বিকাশ-প্রক্রিয়া চলে। কিন্তু এই গতি ও পরিবর্তনধর্মী ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি ঐক্য

ও স্থায়িত্ব ধরা পড়ে—যার ওপর নির্ভর করে আমরা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি।

ব্যক্তিত্ব বিকাশে ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি (factors) সহায়ক ও আংশিক কারণ। যে প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ বংশধারা, দৈহিক গঠন, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সহায়ক, সেসব উপাদানের ত্রুটি ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রতি-বন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে সামাজিক উপাদানও ব্যক্তিত্ব-বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ-ভূমিকা অবলম্বন করে। সে যা হোক, শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে আমরা সাধারণতঃ দুটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে থাকি, একটি পৃথক্‌করণ, অন্যটি সমন্বয়ন। এখন এই প্রক্রিয়া দুটি সম্বন্ধে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি :

(ক) পৃথককরণ (Differentiation) : শিশু তার জীবনের শুরুতেই কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ করে থাকে, কিন্তু কোন বিশেষ আচরণ সম্পাদন তার পক্ষে তখন সম্ভব নয়। তার সকল আচরণই তখন দেহধর্মী, কোন বিশেষ আচরণ স্বতন্ত্রভাবে সে করতে পারে না। শিশু সাধারণতঃ সহজাত এবং প্রক্ষোভমূলক আচরণই করে, আর এই আচরণগুলি বয়স্কদের আচরণের মতো স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে না। বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি বিশেষ আচরণ শৈশবে শিশুর পক্ষে করা সম্ভব নয়। শিশুর যখন বয়স বাড়তে থাকে, তখন সে পৃথক পৃথকভাবে আচরণ করতে শেখে। বিভিন্ন উদ্দীপকের জন্য যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া করা প্রয়োজন, শিশুর বয়োবৃদ্ধিতেই তা করা সম্ভব হয়। পৃথক বা স্বতন্ত্র উদ্দীপকের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়াকেই আমরা এখানে পৃথককরণ বলে উল্লেখ করেছি। পৃথককরণের ফলেই ধীরে ধীরে শিশুর আচরণ সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারায় সংগঠিত হতে থাকে।

(খ) সমন্বয়ন (Integration) : শিশু যে উপাদানগুলি নিয়ে জন্মায়, সে উপাদানগুলি তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে। শৈশবের শুরুতে এসব মানসিক অবস্থা থাকে সুপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব মানসিক অবস্থা একটি ঐক্যবদ্ধ, সামগ্রিক ও সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমন্বয়ন (Integration)। এ সমন্বয়ন দীর্ঘকাল চলে এবং ব্যক্তিসত্তার মূল রূপটি এ সমন্বয়নেই ধরা পড়ে। আবার এ সমন্বয়ন প্রক্রিয়া নানা ধাপে জীবনে এগিয়ে চলে। আমরা এ ধাপগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি :

প্রথম স্তরে, শিশু অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ায় (conditioned response) নির্দিষ্ট উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে এবং সে সঙ্গে নির্দিষ্ট উদ্দীপকের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট

উদ্দীপকের প্রতিও প্রতিক্রিয়া করবে। এ অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু বিভিন্ন পরিবর্তিত নতুন নতুন উদ্দীপকের (বা পরিস্থিতির) সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয়।

দ্বিতীয় স্তরে, শিশুর জীবনে অভ্যাসের সৃষ্টি হয়। বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি বিশেষ এক প্রতিক্রিয়া বার বার সম্পাদনের নামই অভ্যাস। প্রথম স্তরে প্রতিবর্তিত ক্রিয়াগুলি থাকে অসংগঠিত, ধীরে ধীরে অসংহত প্রতিবর্তিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি সুসংহত ও সমন্বিতরূপ দেখা দেয়। অভ্যাস হল সেই সমন্বিত রূপ।

সমন্বয়ের তৃতীয় স্তরে নানা মানসিক প্রলক্ষণ (traits) সৃষ্টি হয়। নানা আগ্রহ, মনে ভাব, প্রক্ষোভ শিশুর মনে দেখা দেয়। এগুলি শিশুর আচরণের গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই মানসিক প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে।

চতুর্থ স্তরে, বিভিন্ন প্রলক্ষণের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায় এবং অহংবোধের সৃষ্টি হয়। প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রলক্ষণগুলি থাকে অসংলগ্ন ও সম্পর্কহীন। কিন্তু পরে এদের মধ্যে একটি ঐক্য বা সংহতি ধরা পড়ে এবং এর মধ্যে শিশুর মনে অহংবোধ (Ego or Self) জাগ্রত হয়। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুরুতে এই অহংবোধ কোন পূর্ণ বা সুসংগঠিত রূপ নেয় না, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাবে এ অহংবোধ আত্মপ্রকাশ করে।

পঞ্চম স্তরে, এ অহংবোধ একটি একক অনন্য (unique) ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টি করে। এক অর্থে ব্যক্তিত্ব এই অহংবোধের প্রসার। সকল পরিবর্তন, বিভিন্ন পরিবেশ, সবকিছুর মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বকে একটি স্বতন্ত্র ও স্থির বস্তুরূপে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ, মানসিক প্রলক্ষণ, অহংবোধ, সবকিছু তখন একটি সামগ্রিক ও একীভূত রূপ লাভ করে। সমন্বয়ের এই সার্থক রূপই ব্যক্তিত্বের বিকাশ-প্রক্রিয়ার পরিণতি।

দশম অধ্যায়

বুদ্ধি
(Intelligence)

১। বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Intelligence) :

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা[1] নির্দেশ করেছেন। আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা আলোচনা করব এবং এই সংজ্ঞাগুলির যাথার্থ্য বিচার করব।

কোন কোন মনোবিদ্ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন। উইলিয়াম স্টার্ন (*W. Stern*) বলেন, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সচেতনভাবে চিন্তার সামঞ্জস্যসাধনের জন্য ব্যক্তির সাধারণ ক্ষমতাই হল বুদ্ধি মনোবিজ্ঞানী ওয়েলস্ (*Wells*) বলেন, 'নতুন পরিস্থিতিতে পূর্বের তুলনায় আরও ভালভাবে ক্রিয়া করার জন্য আমাদের আচরণ ধারার পুনর্বিন্যাস করার মানসিক বৈশিষ্ট্যই হল বুদ্ধি'। এড্ওয়ার্ডস (*Edwards*) বলেন, 'পরিবর্তনশীল এবং বহুমুখী প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।' উডওয়ার্থ (*Woodworth*) বলেন, 'বুদ্ধি হল এমন ধী (intellect) যাকে কাজে লাগান হয় (Intelligence is intellect put to use)।' কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য বা কোন পরিস্থিতি সামলাবার জন্য মানসিক শক্তিকে প্রয়োগ করা হল বুদ্ধি।' বাকিংহাম (*Buckingham*) বলেন, 'বুদ্ধি হল শিক্ষালাভের ক্ষমতা।' ডিয়ারবর্ন (*Dearborn*) বলেন, 'বুদ্ধি হল অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হবার ক্ষমতা।' টারম্যান (*Terman*) বলেন, 'বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তা করার শক্তি।' এবিংহাউজ (*Ebbinghaus*) বলেন, 'বিভিন্ন বস্তু, ঘটনা এবং গুণকে মনের মধ্যে একীভূত করার ক্ষমতা হল বুদ্ধি।' আলফ্রেড বিনে (*A. Binet*) বলেন, 'বুদ্ধি হল বোধশক্তির সম্পূর্ণতা, উদ্ভাবনপটুতা, কোন কাজে অধ্যবসায় এবং সমালোচনামূলক

বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা

---

1. মনোবিজ্ঞানী পিণ্টনার (Pintner) বুদ্ধি সম্পর্কীয় সংজ্ঞাগুলিকে চারটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) জৈবিক সংজ্ঞা (biological definition)—এই সংজ্ঞাগুলিতে 'ব্যক্তির অভিযোজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; (২) শিক্ষামূলক (educational)—এই সংজ্ঞাগুলিতে ব্যক্তির শিখন ক্ষমতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে; (৩) মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত (faculty)—এই সংজ্ঞাগুলিতে বুদ্ধিকে মানসিক ক্ষমতা বা গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; (৪) পরীক্ষা নির্ভর (empirical)—এই সংজ্ঞাগুলিতে বুদ্ধির কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বচার-শক্তি। থর্নডাইক (*Thorndike*) বলেন, অনুষঙ্গ বা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগসাধনের ক্ষমতাই বুদ্ধি।' থার্সটোন (*Thurstone*) বলেন, 'সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে সামাজিক দিক থেকে কার্যকর করে তোলাই হল বুদ্ধির লক্ষণ।' আচরণবাদী ওয়াট্‌সনের (*Watson*) মতে, 'বুদ্ধি হল গুরুমস্তিষ্কের ক্রিয়া।' স্পীয়ারম্যানের (*Spearman*) মতে, "বুদ্ধি হল নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে লক্ষ্য করার ক্ষমতা, জ্ঞানের বিষয়ের প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ আবিষ্কারের ক্ষমতা, পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে কোন্‌টি অনুরূপ বা কোনটি বিপরীত বলতে পারার ক্ষমতা।" বার্ট (*C. Burt*) বলেন, 'ব্যক্তির জৈব-মানসিক সংগঠনের মধ্যে পুনর্বিন্যাস করে অপেক্ষাকৃত অভিনব পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।' গেস্টাল্ট-মতবাদীরা বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনার সংযোগসূত্র আবিষ্কার করার ক্ষমতাকেই বুদ্ধির লক্ষণ মনে করেন।

সমালোচনা : পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, কোন সংজ্ঞাই বুদ্ধির যথার্থ স্বরূপের ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ করার জন্য সংজ্ঞাগুলি বুদ্ধির কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে। উইলিয়ম স্টার্ন-এর সংজ্ঞানুযায়ী বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করার জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, কিন্তু বুদ্ধিকে কেবলমাত্র বাহ্যপরিবেশের সঙ্গতিসাধনের ক্ষমতা বলা হলে বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয় না। বুদ্ধি শিক্ষালাভের ক্ষমতা একথা বলা হলে বুদ্ধির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। টারম্যানের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা. বিমূর্ত চিন্তা করার জন্য যেমন বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার অর্থ উপলব্ধির জন্যও বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। থর্নডাইকের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা, বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করার ক্ষমতাকেই কেবলমাত্র বুদ্ধি বলা চলে না, বিভিন্ন সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর মধ্যে সঙ্গতি আছে কিনা, তা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এবিংহাউজের সংজ্ঞা সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ওয়াটসন যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির ব্যাখ্যা দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, সে কারণে তাঁর সংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়। বুদ্ধি হল একটি মৌলিক মানসিক শক্তি, তাকে দৈহিক ক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রতিটি সংজ্ঞা বুদ্ধির কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে

২। বুদ্ধির স্বরূপ (Nature of Intelligence) :

একটিমাত্র বাক্যে বুদ্ধির সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা না করে আমরা বুদ্ধির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করে বুদ্ধির স্বরূপটুকু বুঝে নেবার চেষ্টা করতে পারি।

প্রথমতঃ, বুদ্ধি হল মৌলিক মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা যা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি স্নায়ুতন্ত্রনির্ভর হলেও, কোন দৈহিক প্রক্রিয়া নয়।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধি আমাদের বাহ্য-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ করে। অতীত অভিজ্ঞতাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বুদ্ধি আমাদের নতুন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ করে। স্টার্ন (*Stern*), বার্ট (*Burt*) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করার মানসিক ক্ষমতাকেই বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন। মনোবিজ্ঞানী ফ্রিম্যানও বলেন, "কোন ব্যক্তি কি পরিমাণে নিজের অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস করে নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে তার উপর তার বুদ্ধি নির্ভর করে।"

তৃতীয়তঃ, কোন বস্তুর বা অবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ করে, সেই বস্তুর বা অবস্থার সামগ্রিক রূপটুকু অবধারণ করতে বুদ্ধি আমাদের সমর্থ করে।

চতুর্থতঃ, বাস্তব অভিজ্ঞতার তাৎপর্য নির্ধারণ এবং বিমূর্ত চিন্তনশক্তি বুদ্ধির পরিচায়ক। মনোবিজ্ঞানী টারম্যান (*Terman*)-এর ভাষায় 'বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তন করার ক্ষমতা'।

পঞ্চমতঃ, মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহার বুদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সামর্থ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেমন—চিন্তন, বিচারকরণ, অনুমানকরণ প্রভৃতি। ব্যক্তি এই সব মানসিক প্রক্রিয়ার উন্নততর ব্যবহারের দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিসাধনে সমর্থ হয় এবং পরিবেশের বিচিত্র শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে এবং বাস্তব সমস্যার সমাধানে তাদের প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। অনুমানকরণ আর দুরকমের হতে পারে। আরোহ (induction) এব অবরোহ (deduction)। প্রথম পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ করে আমরা একটা সামান্য সত্যে উপনীত হই, এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একট সামান্য সত্য থেকে কোনও একটা বিশেষ সত্যে উপনীত হই। এই দুই ধরনের অনুমান পদ্ধতিই আমাদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে এবং উভয় প্রক্রিয়াই বুদ্ধির উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। প্রত্যয় (concept) গঠনের জন্য পৃথকীকরণ (differentiation) ও সামান্যীকরণ (generalisation) প্রক্রিয়া অপরিহার্য। বস্তুর অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেওয়া হল পৃথকীকরণ এবং সেগুলিকে বস্তুর সমশ্রেণীভুক্ত অন্য বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হল সামান্যীকরণ, এই দুই প্রক্রিয়া একান্ত ভাবে বুদ্ধি নির্ভর।

ষষ্ঠতঃ, লক্ষ্যে উপনীত হওয়া বা উদ্দেশ্যসাধন করা এবং তার জন্য উপযুক্ত উপায় নির্বাচন বুদ্ধির পরিচায়ক।

সপ্তমতঃ, বুদ্ধি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এবং এই সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পরিবেশের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি নিরূপণ করে। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির এই সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অষ্টমতঃ, মানসিক কাজ দ্রুত সম্পাদন করা বুদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়।

নবমতঃ, বুদ্ধি হল এক সর্বজনীন ক্ষমতা যার কাজ অন্যান্য গৌণ ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা। মনোবিজ্ঞানী উডরো (*Woodrow*, বুদ্ধিকে কোনকিছু অর্জন করার ক্ষমতারূপে (an acquiring capacity) অভিহিত করেছেন।

বুদ্ধির কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা না করলেও পূর্বোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে বুদ্ধির স্বরূপ বোঝা যাবে।

৩। বুদ্ধিবৃত্তি এবং বুদ্ধি (Intellect and Intelligence) :

এ দুটি শব্দ সমার্থক নয়। ধী বা বুদ্ধিবৃত্তি হল একটা মানসিক বৃত্তি যেটি শিক্ষা এবং অভ্যাসের সহায়তায় গড়ে ওঠে এবং এই স্থায়ী মানসিক বৃত্তিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য যে মানসিক শক্তি ক্রিয়া করে তাই হল বুদ্ধি। মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (*Woodworth*)-এর ভাষায় 'Intelligence means Intellect put to use'. উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি বা ধীসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও কোন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির দৈন্য পরিলক্ষিত হতে পারে, আবার বুদ্ধির চমক লক্ষ্য করা গেলেও কোন ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি বা ধী উচ্চস্তরের নাও হতে পারে। ধী বা বুদ্ধিবৃত্তি হল তাত্ত্বিক। বুদ্ধি তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়ই।

৪। বুদ্ধি এবং জ্ঞান (Intelligence and Knowledge) :

বুদ্ধি হল সহজাত মানসিক ক্ষমতা আর জ্ঞান হল অর্জিত বিদ্যা। বুদ্ধির সাহায্যে আমরা জ্ঞান অর্জন করি এবং সেই জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। জ্ঞানকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই হল বুদ্ধি।

বুদ্ধি এবং জ্ঞানের পারস্পরিক সম্বন্ধ খুবই গভীর। সাধারণতঃ ব্যক্তির অর্জিত বিদ্যা বা জ্ঞান লক্ষ্য করে আমরা তার বুদ্ধির পরিমাপ করার চেষ্টা করি, যদিও বুদ্ধির অভীক্ষা এবং অর্জিত বিদ্যা সম্পর্কীয় অভীক্ষাগুলির (Achievement test) মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। তবে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের বুদ্ধির পরীক্ষায় অর্জিত

বিদ্যাকে একেবারে বর্জন করা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে কোন ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে তার বুদ্ধি যে তার জ্ঞান অর্জনের পক্ষে সহায়ক, তা আমরা মনে করি।

৫। বুদ্ধি-অভীক্ষা বা বুদ্ধি-পরীক্ষা (Intelligence Test) :

যদিও বুদ্ধির যাথার্থ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন এবং বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে যদিও বিভিন্ন মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, তবুও বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (Intelligence Test) রচনা করেছেন। বর্তমানে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন কর্ম-প্রতিষ্ঠানে এই অভীক্ষাগুলির বহুল ব্যবহারের সাহায্যে ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি প্রবর্তিত হবার পূর্বে অতীতে ল্যাভেটর দৈহিক আকৃতি দেখে, গল (*Gall*) এবং স্পারঝিম (*Spurzhim*) মস্তিষ্কের গঠন দেখে বিভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই সব পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয় বলে পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সর্বপ্রথম গ্যালটন (*Galton*)-ই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তারতম্য নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং একেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুদ্ধি-পরীক্ষার ভিত্তি বলা যেতে পারে। গ্যালটনের শিষ্য ক্যাটেল (*Cattel*) ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্মতার তারতম্য এবং প্রতিক্রিয়া কালের সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম বুদ্ধি অভীক্ষা বা 'Mental Test' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তবে বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি অভীক্ষার উদ্ভাবক হিসেবে ফরাসী মনোবিদ্‌ আলফ্রেড বিনে (*Alfred Binet*)-র নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ল্যাভেটর, গল এবং স্পারঝিম-এর বুদ্ধি পরিমাপের প্রচেষ্টা

(ক) বিনে-সিমোঁ বুদ্ধি-অভীক্ষা (Binet-Simon Intelligence Test) :

১৮৯৬ সাল থেকেই আলফ্রেড বিনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির তারতম্য সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা বিনের উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব ভার অর্পণ করেন—স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থার উদ্ভাবন করা।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলফ্রেড বিনে (*A. Binet*) এবং তাঁর সহকর্মী সিমোঁ (*Simon*) বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির মান নির্ণয় করার জন্য সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য একটি স্কেল বা একটি বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষা তৈরি করেন। এই অভীক্ষাটি 'বিনে-সিমোঁ স্কেল' (*Binet-Simon Scale*) নামে প্রসিদ্ধ। কোন স্কেলে

যেমন ক্রমবর্ধমান ধারায় কতকগুলি একক পর পর সাজান থাকে, তেমনি বিনের এই অভীক্ষার ক্ষেত্রেও কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা—সহজ থেকে কঠিন, কঠিন থেকে কঠিনতর এইভাবে ধাপে ধাপে সাজান ছিল। প্রশ্নগুলি নানা ধরনের। শিশুদের বিভিন্ন বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করা, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারণ করা বা বস্তুর পারস্পরিক তুলনা করা, ছবি দেখে বর্ণনা করতে বলা কোন কিছু দেখে নকল করতে পারা, কোন কিছু শুনে পুনরায় বলা, বিচার করা, ভুল বা অসঙ্গতি নির্ণয় করা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বা সমস্যা সমাধান করতে বলা হত। এই সব পরীক্ষায় বুদ্ধির নানা দিক প্রকাশিত হত। কিন্তু তখনও পর্যন্ত প্রশ্নগুলিকে শিশুদের বয়ঃক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়নি।

বিনে-সিমোঁ স্কেল

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনে এবং সিমোঁ প্রশ্নগুলির পরিবর্তন ও সংশোধন করেন এবং শিশুদের বয়স অনুযায়ী প্রশ্নগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। স্কেলের প্রথম ধাপে ছিল তিন বৎসর বয়সের শিশুদের উপযুক্ত নির্ধারিত প্রশ্ন বা সমস্যা, তারপর চার বছরের, তারপর পাচ বছরের এবং এইভাবে পনের বছরের উপযুক্ত প্রশ্নগুচ্ছ। তেমনি প্রথম প্রশ্নগুলি ছিল সোজা, পরের প্রশ্নগুলি আর একটু কঠিন এবং এইভাবে শেষ প্রশ্নগুলি ছিল সবচেয়ে কঠিন। এর থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধিও বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন শিশুর মানসিক ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য আছে।

বয়সানুসারে প্রশ্নের ক্রম নির্ণয়

বিনের বুদ্ধি অভীক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় 'মানসিক বয়স' (*Mental Age*)-এর ব্যবহার। বিনের অভীক্ষায় শিশুদের বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকত। যে ছেলে বা মেয়ে যে বয়সের উপযোগী প্রশ্নের শতকরা পঞ্চাশটির অধিক উত্তর দিতে পারত, তার প্রকৃত বয়স যাই হোক না কেন, তার মানসিক বয়স ঐ বছরের ধরা হত। যেমন, ৬ বছরের ছেলে যদি ৮ বছরের ছেলের উপযোগী প্রশ্নে শতকরা পঞ্চাশটির অধিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তার প্রকৃত বয়স ৬ হলেও, তার মানসিক বয়স ৮ ধরা হত; অর্থাৎ বুদ্ধির দিক থেকে এ ছেলে কিছুটা এগিয়ে আছে। আবার ৯ বছরের ছেলে যদি ৭ বছরের ছেলের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে, তাহলে তার প্রকৃত বয়স ৯ হলেও, মানসিক বয়স হবে ৭; অর্থাৎ তার বুদ্ধির মান ৯ বছরের ছেলের উপযোগী নয়।

মানসিক বয়সের ব্যবহার

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে ও সিমোঁ তাঁদের পূর্ববর্তী অভীক্ষাগুলিকে আরও পরিমার্জিত করে উন্নতি সাধন করেন।

বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্য বয়স অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান দুরূহতার নীতির ভিত্তিতে যে প্রশ্নের তালিকা রচিত হয় সেই প্রশ্নতালিকার প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে ছেলেমেয়েদের সাধারণ জ্ঞান, স্মৃতিশক্তির তীক্ষ্নতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, কারণ নিরূপণ করার ক্ষমতা, ভাষামূলক অসঙ্গতি নির্ণয় করার ক্ষমতা প্রভৃতি জানা যায়। সাধারণতঃ প্রত্যেক স্তরে ছয়টি করে প্রশ্ন দেওয়া হয়। এই প্রশ্নতালিকার কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

বিনে পদ্ধতি

তিন বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন:

(ক) নাক, চোখ, মুখ, দেখাতে বলা।

(খ) দুই অঙ্কের সংখ্যা শুনে পুনরাবৃত্তি করতে বলা।

(গ) কোন ছবির বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করতে বলা।

(ঘ) নিজের পদবী বলতে বলা।

(ঙ) ছয়টি পদ বিশিষ্ট একটি বাক্য শুনে সেটি পুনরাবৃত্তি করতে বলা। যেমন—'এখন খুব গরম, আমায় যেতে দাও'।

চার বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন:

(ক) নিজে ছেলে না মেয়ে বলতে বলা।

(খ) চাবি, ছুরি এবং পেনির নাম বলতে বলা।

(গ) তিনটি সংখ্যা শুনে পুনরায় বলতে বলা।

(ঘ) দুটি সরল রেখার দৈর্ঘ্যের তুলনা করতে বলা।

পাঁচ বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন:

(ক) দুটি ওজন তুলনা করতে বলা।

(খ) কোন জ্যামিতিক চিত্র, যেমন, বর্গক্ষেত্র দেখে ঐরকম চিত্র অঙ্কন করতে বলা।

(গ) দশটি পদ দ্বারা গঠিত একটি বাক্য শুনে পুনরায় বলতে বলা।

(ঘ) দুটি ত্রিভুজ দেখে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বলা।

(ঙ) চারটি মুদ্রা গণনা করতে বলা।

ছয় বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন:

(ক) সকাল এবং বিকালের মধ্যে পার্থক্য করতে বলা।

(খ) ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিচিত শব্দের সংজ্ঞা দিতে বলা।
(গ) একটি হীরক দেখে তার আকার নকল করতে বলা।
(ঘ) তেরটি পেনি (বা অনুরূপ মুদ্রা) গণনা করতে বলা।
(ঙ) সুন্দর এবং কুৎসিত মুখের ছবির পার্থক্য করতে বলা।

সাত বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন ঃ

(ক) ডান হাত এবং বাম কান দেখাতে বলা।
(খ) ছবির বর্ণনা করতে বলা।
(গ একই সঙ্গে করা হয়েছে এমন তিনটি আদেশ কার্যে পরিণত করা।
(ঘ) ছয়টি 'sous' (বা অনুরূপ মুদ্রা)-এর মূল্য গণনা করা, যার মধ্যে তিনটি হল দ্বিগুণ মূল্যের।
(ঙ) চারটি প্রধান রঙের নাম করতে বলা।

আট বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন ঃ

(ক) কোন ছবিতে কি কি অংশ বাদ পড়েছে সেগুলি বলতে বলা।
(খ কুড়ি থেকে এক পর্যন্ত উল্টোদিক থেকে গণনা করতে বলা।
(গ) স্মৃতি থেকে দুটি বিষয়ের তুলনা করতে বলা।
(ঘ) বার ও তারিখ বলা।
(ঙ) পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা।

নয় বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন ঃ

(ক) মুদ্রার খুচরা হিসাব করা।
(খ) শব্দের অর্থ বলা।
(গ) প্রচলিত মুদ্রার সব কয়টিকে চিনতে পারা।
(ঘ) পর পর মাসের নাম বলা।
(ঙ) সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝে উত্তর দেওয়া।

দশ বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন ঃ

(ক) ওজনের ক্রম অনুসারে পাঁচটি কাঠের টুকরা সাজানো।
(খ) দুটি ছবি স্মৃতি থেকে অঙ্কন করা।
(গ) কোন অবাস্তব বর্ণনার অবাস্তবতা দেখানো।
(ঘ) কোন কঠিন প্রশ্নের অর্থ অবধারণ করতে পারা।
(ঙ) তিনটি প্রদত্ত পদের প্রয়োগ করে বাক্য রচনা করা।

এগার বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন ঃ

(ক) কতকগুলি উক্তির অসম্ভাব্যতা দেখিয়ে দেওয়া।
(খ) তিনটি পরিচিত শব্দ দিয়ে একটি বাক্য গঠন করতে বলা।
(গ) তিন মিনিটে ষাটটি শব্দের নাম করা।
(ঘ) তিনটি বিমূর্ত শব্দের ভাবার্থ বলতে বলা।
(ঙ) উল্টোপালটা সাজানো কয়েকটি পদের সাহায্যে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করা।

পনর বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন ঃ

(ক) সাত অঙ্কের একটি সংখ্যা শুনে পুনর্বার বলতে বলা।
(খ) একটি শব্দের তিনটি সমোচ্চারিত শব্দ এক মিনিটে খুঁজে বার করতে বলা।
(গ) ছাব্বিশটি সিলেবেলের একটি বাক্য শুনে পুনর্বার বলতে বলা।
(ঘ) ছবির ব্যাখ্যা করতে বলা।
(ঙ) প্রদত্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করতে বলা।

পনর বছরের উর্ধ্ব বয়স্কদের উপযোগী প্রশ্ন ঃ

(ক) বিশেষ আকার অনুযায়ী কাগজ কাটা।
(খ) একটি ত্রিভুজকে কল্পনায় সাজান।
(গ) কতকগুলি বিমূর্ত পদের পার্থক্য বলতে পারা।
(ঘ) রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট এবং রাজার কাজের মধ্যে তিনটি পার্থক্যের উল্লেখ করা।
(ঙ) একটি পঠিত অংশের সংক্ষিপ্তসার বলতে পারা।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনের মৃত্যু হয়। কাজেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে-সিমোঁ যে অভীক্ষাগুলি উদ্ভাবন করেন, সেগুলিই বিনে-সিমোঁ অভীক্ষার সবশেষ সংস্করণ। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনে ও সিমোঁ যে সব অভীক্ষা প্রণয়ন করেন সেগুলির সঙ্গে তুলনায় এই সর্বশেষ অভীক্ষাগুলির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্করণে যেসব অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকারে সহজে প্রয়োগ করা যায়। সেগুলির মাধ্যমে শিশুদের মানসিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে-সব অভীক্ষায় সাফল্যলাভের জন্য বিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন হয় না।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে-সিমোঁ অভীক্ষার সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই অভীক্ষাগুলি পরিমার্জিত হয়ে বিভিন্ন দেশে বুদ্ধি

পরিমাপ করায় জন্য প্রযুক্ত হয়। এই অভীক্ষার জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে যে সাধারণ বুদ্ধি পরিমাপ করার ব্যাপারে এর গুরুত্ব উপেক্ষার বিষয় ছিল না। গ্যারেটের ভাষায় সংশোধন, সমালোচনা, আলোচনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা সত্ত্বেও, সাধারণ বুদ্ধি পরিমাপ করাব ব্যাপারে বর্তমানে প্রযুক্ত সেরা বুদ্ধি অভীক্ষার আদিরূপ হল এই অভীক্ষা।[1]

(খ) স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা (Standford-Binet Intelligence Test): বিনের অভীক্ষাটি প্রথম তৈরি হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জীবদ্দশায় ১৯০৫, ১৯০৮ এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অভীক্ষাটি তিনবার সংশোধিত হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে মারা যান। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েব (Stanford University) অধ্যাপক টারম্যান এই অভীক্ষাটির একটি সংস্করণ করেন। এই সংশোধিত সংস্করণটি স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ (*Stanford Revision of the Binet-Simon Scale*) বা স্ট্যানফোর্ড-বিনে-স্কেল (*Stanford-Binet-Scale*) সংস্করণ নামে পরিচিত। যেহেতু টারম্যান স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং মূলতঃ বিনে কে অনুসরণ করে এই নতুন স্কেল বা অভীক্ষা তৈরি করেছেন সেই কারণে একে স্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল আখ্যা দেওয়া হয়। এই স্কেলেই সবপ্রথম বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q. সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে টারম্যানের সহকারী মেরিল (*Merrill*)-এর সহযোগিতায় এই অভীক্ষাটির আব একটি পবিবর্তিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় যাকে টারম্যান-মেরিল স্কেল (*Terman Merrill Scale*) আখ্যা দেওয়া হয়।

স্ট্যানফোর্ডেব সংস্করণ

ষ্ট্যানফোর্ড বিনে স্কেল

এই সংশোধিত নতুন সংস্করণটিতে সর্বপ্রথম রয়েছে ২ বৎসর বয়সের জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন এবং একেবারে শেষের ধাপে রয়েছে পনর বৎসরের উর্ধ্বে পরিণত বয়স্ক (adult)-দের জন্য প্রশ্ন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের বিনে পরীক্ষায় প্রশ্নসংখ্যা ছিল চুয়ান্ন, স্ট্যানফোর্ড সংশোধনে এই সংখ্যা বেড়ে হল নব্বই এবং ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে দাঁড়াল একশ উনত্রিশটিতে।

এই প্রশ্ন তালিকার কয়েকটি প্রশ্নের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

(১) তিন বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন:

(ক) দেহের বিভিন্ন অংশ দেখাতে বলা।

1. H. E. Garrett: Great Experiments in Psychology, Page 219.

(খ) পরিচিত বস্তুর নাম বলতে বলা।

(গ) ছবির বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনা দিতে বলা।

(ঘ) ছয় থেকে সাতটি পদ শুনে পুনরায় বলতে বলা।

(ঙ) ছেলে না মেয়ে বলতে বলা।

(২) পাঁচ বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :

(ক) ওজনের তুলনা করতে বলা।

(খ) রঙের নাম বলতে বলা।

(গ) কোন্‌টি বেশী সুন্দর তার তুলনা করতে বলা।

(ঘ) ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংজ্ঞা দিতে বলা।

(ঙ) দুটি ত্রিভুজকে একত্র করে একটি আয়তক্ষেত্র রচনা করতে বলা।

(চ) তিনটি কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে বলা—টেবিলের উপর চাবি রাখা, দরজা বন্ধ করা এবং একটি বই নিয়ে আসা।

(৩) আট বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন :

(ক) বল এবং মাঠের পরীক্ষা (Ball and Field Test)।

(খ) ২০ থেকে ১ পর্যন্ত উল্টো দিক দিয়ে গণনা করা।

(গ) বিশেষ পরিস্থিতি অবধারণ করে তার সঙ্গে জড়িত কোন সমস্যার সমাধান করতে বলা। যেমন, তুমি কি করবে যদি তোমার কোন খেলার সাথী অনিচ্ছাসত্ত্বে তোমায় আঘাত করে ?

(ঘ) সাদৃশ্য বস্তুর বিবরণ দিতে বলা।

(ঙ) ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য না রেখে সংজ্ঞা দিতে বলা।

(চ) কুড়িটি শব্দ বলতে বলা।

৬। পরিণত বয়স্কদের বুদ্ধি অভীক্ষা (Intelligence Test of Adults) :

বিনে-সিমোঁ এবং স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি সাধারণত শিশু ও বালক বালিকাদের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল ; শিশুদের জন্য যেসব প্রশ্নাবলী রচিত হয়েছিল সেগুলি পরিণত বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে, নেহাত ছেলেমানুষী প্রশ্ন মনে করে পরিণত বয়স্করা পরীক্ষকের সঙ্গে সহযোগিতা নাও করতে পারেন। সে কারণে নিউইয়র্কের বেলেভ্যু সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালের ডক্টর ডেভিড ওয়েকস্‌লার (*Dr. David Wechsler*) বয়স্ক ব্যক্তিদের বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য কতকগুলি বুদ্ধি

অভীক্ষার উদ্ভাবন করেন। তাঁর নামানুসারে এই অভীক্ষাগুলি ওয়েক্‌স্‌লার বেলেভ্যু অভীক্ষা (Wechsler Bellevue Test) বলা হয়।

এই অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির (১) সাধারণ জ্ঞান, (২) বোধশক্তি বা অবধারণের ক্ষমতা, (৩) সংখ্যা সম্পর্কে স্মৃতি প্রখর (memory span for numbers), (৪) সাদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান, (৫) যুক্তি প্রকাশের ক্ষমতা (অঙ্কশাস্ত্রের মৌখিক প্রশ্নের দ্বারা এই ক্ষমতার পরীক্ষা করা হয়), (৬) কোন অসম্পূর্ণ চিত্রের কোন কোন অংশ অসম্পূর্ণ দেখবার ক্ষমতা, (৭) এমনভাবে কতকগুলি চিত্রকে সাজাতে বলা, যাতে একটা সুসংবদ্ধ কাহিনী প্রকাশিত হয়, (৮) অনুষঙ্গের সাহায্যে শিক্ষালাভের ক্ষমতা, (৯) বিভিন্ন রঙিন কাঠের টুকরার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের নকশা তৈরি করবার ক্ষমতা, (১০) একটি মানুষের ছবির বিভিন্ন অংশ জুড়ে, যেমন—হাত মুখ ইত্যাদির দ্বারা মানুষ তৈরি করবার ক্ষমতা, (১১) পদের সংজ্ঞা দেবার ক্ষমতা প্রভৃতি বিচার করা হয়।

এই অভীক্ষার দুটি রূপ আছে—ভাষাভিত্তিক (Verbal) এবং কৃতি অভীক্ষা (performance) সম্বন্ধীয়। যেমন এই অভীক্ষার ১০° বা ২নং অভীক্ষা ভাষাভিত্তিক অভীক্ষার উদাহরণ, আবার ৬নং বা ৭নং অভীক্ষা কৃতি অভীক্ষার উদাহরণ। কাজেই ওয়েক্‌স্‌লার বেলেভ্যু অভীক্ষা ভাষাভিত্তিক এবং কৃতি সম্বন্ধীয় উভয়ই।

৭। দলগত অভীক্ষা (Group Test):

এ পর্যন্ত আমরা যেসব অভীক্ষার আলোচনা করেছি সেগুলি ব্যক্তিভিত্তিক অভীক্ষা। এই অভীক্ষায় একবারে একজন মাত্র ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়। কাজেই ব্যক্তি ভিত্তিক অভীক্ষা যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টসাধ্য। এই কারণে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একই সঙ্গে যাতে একটি বড় দলকে পরীক্ষা করা যায় তার জন্য এই অভীক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে, এই কারণে এই অভীক্ষার নাম দেওয়া হয়েছে দলগত অভীক্ষা (Group Test)। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন কর্মে লোক নিযুক্ত করবার সময় তাদের বুদ্ধি পরিমাপ করবার জন্য এই জাতীয় দুটি অভীক্ষার প্রবর্তন করা হয়, একটির নাম 'আর্মি আলফা অভীক্ষা' (Army Alpba Test) এবং আর একটির নাম 'আর্মি বিটা অভীক্ষা' (Army Beta Test)। লেখাপড়া জানা সৈন্যদের জন্য উদ্ভাবিত অভীক্ষা পদ্ধতিকে 'আর্মি আলফা' এবং নিরক্ষর সৈন্যদের অভীক্ষা পদ্ধতিকে 'আর্মি বিটা' আখ্যা দেওয়া হয়। আর্মি আলফা অভীক্ষাতে ৮ প্রকার বিষয়ের পরীক্ষা করা হয়। যেমন—

পরীক্ষকের নির্দেশ অনুসারে কোন কিছু অঙ্কন করা, অঙ্ককষা শব্দের প্রতিশব্দ এবং বিপরীত শব্দ বিচার করা, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিচার ক্ষমতার পরীক্ষা করা, অসংবদ্ধ বাক্যকে সুসংবদ্ধ করা, একটি সংখ্যা-শ্রেণীকে নির্দেশানুযায়ী পূরণ করা, উপমালব্ধ জ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞান, প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

আর্মি বিটা অভীক্ষা ভাষাভিত্তিক নয়। এই অভীক্ষাতে সাত প্রকার বিষয় পরীক্ষা করা হয়। যেমন—গোলক ধাঁধার পথ খুঁজে বার করা, অসম্পূর্ণ ছবিকে সম্পূর্ণ করা, জ্যামিতিক চিত্র গঠন করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে একটি নতুন অভীক্ষা তৈরি করা হয়। এটির নাম 'সৈন্য-বিভাগীয় সাধারণ মান-নির্ধারক অভীক্ষা (Army General Classification Test বা সংক্ষেপে A G.C.T.)। এই অভীক্ষায় ভাষাগত, সংখ্যাগত এবং অবস্থানমূলক জ্ঞান সম্পর্কে ক্ষমতার পরীক্ষা করা হয়।

৮। ভাষাবর্জিত অভীক্ষা বা কৃতি অভীক্ষা (Non verbal Test for Performance Test) :

বিনে-সিমোঁ কিংবা ষ্ট্যানফোর্ড-বিনে অভীক্ষা মূলতঃ ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা, কিন্তু শিশুর পক্ষে সব সময় মনের ভাবকে ভাষায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। সেহেতু শিশুর বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ করা কঠিন হয়ে পড়ে। সে কারণে যেসব শিশু নিরক্ষর, মূকবধির অর্থাৎ যারা ভাষার ব্যবহারে অসুবিধা বোধ করে বা যেসব বিদেশী অপরের ভাষা জানে না তাদের জন্যই বিশেষ করে এই ভাষাবর্জিত বা কৃতি অভীক্ষাগুলি তৈরি করা হয়। এই ভাষাবর্জিত অভীক্ষাগুলি দুইপ্রকারের হতে পারে—(১) **ভাষাবর্জিত ব্যক্তিগত অভীক্ষা** (Non-verbal Individual Test) এবং (২) **ভাষাবর্জিত দলগত অভীক্ষা** (Non-verbal Group Test)।

(ক) **ভাষাবর্জিত ব্যক্তিগত অভীক্ষা** (Non verbal Individual Test)

(1) **ফর্ম বোর্ড অভীক্ষা** (Form Board Test) : ডিয়ারবর্ন (*Dearborn*) এই অভীক্ষার প্রবর্তন করেন। পরীক্ষণ-পাত্রের সামনে একটি কাঠের বোর্ড রাখা হয়, যেটিতে নানা আকারের খোপ কাটা আছে। পরীক্ষণ-পাত্রকে ঐ আকারের এবং মাপের কতকগুলি কাঠের টুকরো দেওয়া হয়। পরীক্ষণ-পাত্রকে কাঠের টুকরোগুলি দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ঐ খোপগুলি ভরতি করে দিয়ে বোর্ডটিকে সাজিয়ে দিতে হবে, সাজাবার পর দেখতে হবে যেন কোন খোপ খালি না থাকে বা কোন টুকরো পড়ে না থাকে। এই কাজ সম্পাদন করতে কত সময় লাগে এবং কতবার ভুল হয় তার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

(ii) **মানুষের ছবি অঙ্কন অভীক্ষা** (Man drawing Test) : এই অভীক্ষার প্রবর্তন করেন মনোবিদ্ গুডএনাফ (*Goodenough*)। এই অভীক্ষা তিন থেকে তের বছরের ছেলেমেয়েদের উপযোগী। পরীক্ষণ-পাত্রকে পেন্সিল দিয়ে একটি মানুষের মূর্তি আঁকতে বলা হয়। ছবিটা কতখানি সুন্দর হয়েছে তা দেখে নয়, ছবির মধ্যে কতখানি সামঞ্জস্য আছে বা ছবিটা কতখানি সম্পূর্ণ করতে পেরেছে তাই দেখে নম্বর দেওয়া হয়।
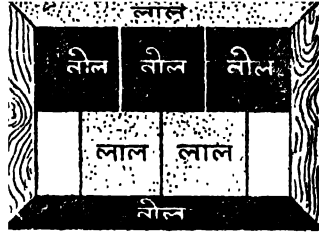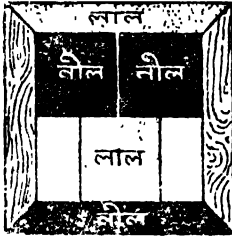
Pass along Test
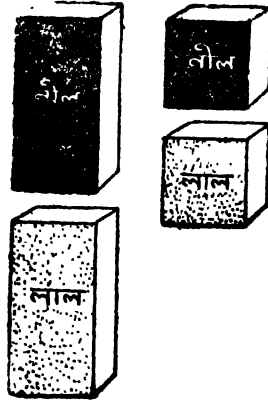
Pass along Tray

Pass along Blocks

(iii) **প্যাস অ্যালং অভীক্ষা** (**Pass Along Test**) : মনোবিদ্ আলেকজাণ্ডার (***Alexander***) এই অভীক্ষার প্রবর্তন করেন। এই অভীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর বিচারশক্তি, বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান ইত্যাদি জানা যায়। এই অভীক্ষায় প্রয়োজন চারটি ছোট ছোট চৌকা ও আয়তকার

কাঠের টুকরো এবং একটি ট্রে। ট্রের একদিকের কানাচে নীল ও অন্যদিকের কানাচে লাল রঙ। পরীক্ষণ-পাত্রকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে লাল টুকরোগুলি ট্রের লাল কানাচের দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরীক্ষণ-পাত্রের সামনে এক এক করে ছবিগুলি রাখতে হবে যাতে পরীক্ষণ-পাত্র ছবি অনুযায়ী টুকরোগুলো সাজাতে পারে।

(iv) **ধাঁধা-পথ অনুসন্ধান অভীক্ষা** (Maze Exploration Test): পোর্টিয়াস (*S. D Porteus*) বার এবং চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য ধাঁধা-পথ বার করার কতকগুলি অভীক্ষা রচনা করেন। এই অভীক্ষাগুলি নানা ধরনের হয়ে থাকে। একটি কাগজের উপর একটি ধাঁধা আঁকা থাকে পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি চিহ্নিত স্থান থেকে শুরু করে বন্ধপথের ভিতর না ঢুকে খোলাপথে বেরিয়ে আসতে বলা হয়। পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথটি বার করতে বলা হয়। পরীক্ষণ পাত্র কত নির্ভুলভাবে এবং কত অল্প সময়ে পথটি বার করতে পারে তার উপর ভিত্তি করে নম্বর দেওয়া হয়। এই অভীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর মনোযোগের স্থায়িত্ব, ধাঁধার সমাধান পথ পূর্ব থেকে দেখার, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা প্রভৃতি বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

(v) **ছবি-সম্পূরণ অভীক্ষা (Picture completion test)**: এই অভীক্ষা একটা ছবির কিছু অংশ কেটে নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীকে অনেকগুলি কাটা অংশ দেওয়া হয় এবং ঐ অংশগুলির মধ্য থেকে যেটি আলোচ্য ছবির অংশ সেটি বেছে নিয়ে ছবির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ছবিটিকে সম্পূর্ণ করতে বলা হয়।

(খ) **ভাষাবর্জিত দলগত বুদ্ধি অভীক্ষা** (Non-verbal Group Test): সৈন্যদের জন্য যে আর্মি বিটা অভীক্ষা (Army Beta Test) বা আর্মি আলফা অভীক্ষা (Army Alpha Test) প্রবর্তন করা হয়েছে, সেই অভীক্ষা এই জাতীয় অভীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এগুলিতে পরীক্ষণ-পাত্রের পক্ষে কোন ভাষা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। ধাঁধার পথ খুঁজে বার করা, অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, জ্যামিতিক চিত্র গঠন করা প্রভৃতি সমস্যার দ্বারা আর্মি বিটার (Army Beta) অভীক্ষাটি রচিত।

৯। বুদ্ধি অভীক্ষা এবং অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা (Intelligence Test and Achievement or Scholastic Test):

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরীক্ষণ পাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে যেসব পরীক্ষা নেওয়া হয় সেগুলিকে বলা হয় অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা (Achievement Test)। এই সব

পরীক্ষা থেকে পরীক্ষণ-পাত্র কোন একটি বিষয় সম্পর্কে কতখানি জ্ঞান অর্জন করেছে তা জানা যায়। অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষণ-পাত্র জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কতখানি জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করেছে তার পরিমাপ করা যায়। অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা হয় সেগুলি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপরই করা হয়ে থাকে এবং এই সব প্রশ্নের সাহায্যে পাঠ্য বিষয়ের কতখানি জ্ঞান পরীক্ষণ-পাত্র অর্জন করেছে তা জানা যায়।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা

নানা কারণে অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা বুদ্ধি-পরীক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষাগুলির ব্যাপকতা খুবই সীমিত। বিদ্যালয়ে যেসব বিষয় শেখান হয় কেবলমাত্র সে বিষয়ের অর্জিত জ্ঞানই এই পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়। বিদ্যালয়ের বাইরে যে বৃহত্তর পরিবেশ আছে সে সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা সাধারণতঃ এই সব অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষায় করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, যেসব ছেলে খুব পড়ুয়া তারা এই সব পরীক্ষার সুবিধা বিশেষভাবে গ্রহণ করতে পারে। তৃতীয়তঃ, যেসব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বালক-বালিকা তাদের বুদ্ধির উপযোগী পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায় না, এই সব অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তির যথার্থতা বিচার হবে না।

অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা বুদ্ধি-পরীক্ষার উদ্দেশ্য-সাধন করতে পারে না

বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষণ-পাত্রের সহজাত মানসিক শক্তির এবং পরিবেশ সম্পর্কে তার সাধারণ জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং বৃহত্তম দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় একটা নতুন পরিস্থিতিকে সে কতখানি অনুধাবন করতে পারে তা জানা যায়।

বুদ্ধি-অভীক্ষার উদ্দেশ্য

সুতরাং বুদ্ধি-অভীক্ষায় এমন কোন প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা চলবে না যার উত্তর দেবার জন্য পরীক্ষণ-পাত্রকে অর্জিত বিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। যেমন, শাজাহানের পিতার নাম কি বা একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ একত্রে কয়টি সমকোণের সমান প্রভৃতি প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষণ-পাত্রের অর্জিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু তার বুদ্ধির পরিমাপ করা চলবে না। বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রশ্নগুলি এমন হবে, যাতে পরীক্ষণ-পাত্র অর্জিত জ্ঞানের সহায়তা ছাড়াই তার সাধারণ মানসিক শক্তির সাহায্যেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারবে। যেমন, 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোন বালক যদি তার কোন খেলার সাথীকে আঘাত করে, 'তাহলে সে কি করবে', এই জাতীয় প্রশ্নের মাধ্যমেই পরীক্ষণ-পাত্রের

বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রশ্নগুলির স্বরূপ

বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হবে। কারণ এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য পরীক্ষণ-পাত্রের অর্জিত বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে একেবারে অর্জিত জ্ঞাননিরপেক্ষ করে তৈরি করা কঠিন। কেননা, বেশী বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য যেসব বুদ্ধির অভীক্ষা রচিত হয়, সেগুলিতে সাধারণতঃ কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে বলা হয় এবং এর জন্য কিছুটা অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সুতরাং অর্জিত জ্ঞানকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি গঠন করা যায় না। আধুনিক বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিতে শব্দবিন্যাস, বাক্যার্থ নির্ণয়, আঙ্কিক প্রশ্ন প্রভৃতি শিক্ষার্জিত বা অর্জিত অভিজ্ঞতা-নির্ভর নানা সমস্যার অবতারণা করা হয়। বিনে-সিমোঁ প্রবর্তিত বুদ্ধি-অভীক্ষায়ও অর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বহু সমস্যাকে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান বুদ্ধি-অভীক্ষাতে ভাষাভিত্তিক জ্ঞান বা বিদ্যাবত্তার এত প্রাচুর্য দেখা যায় যে, অনেকে এ অভীক্ষাগুলিকে আর বুদ্ধি-অভীক্ষা বলে অভিহিত করতে চান না, তাঁরা এ অভীক্ষাগুলিকে অর্জিত অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবত্তার দক্ষতার অভীক্ষা (Scholastic Aptitude Test) রূপে অভিহিত করেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন এগুলি বুদ্ধির পরিমাপ না করে শিক্ষামূলক দক্ষতাকেই পরিমাপ করে। এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, বুদ্ধি-অভীক্ষা গঠনে ভাষাধর্মী বা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অবতারণার প্রবণতা থেকে অভীক্ষাকারকগণ যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকবেন। অবশ্য এটাও উল্লেখযোগ্য যে, অভীক্ষাকারকগণ ভাষা বা অর্জিত জ্ঞানের ততটুকুই ব্যবহার করেন যতটুকু একটি নির্দিষ্ট বয়োগোষ্ঠী (age group) ছেলেমেয়েদের মধ্যে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে তাঁরা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার উপর নির্ভর করেই প্রশ্ন গঠন করেন।

১০। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির সুবিধা ও অসুবিধা (Uses and limitations of Intelligence Tests) :

সুবিধা (uses) : বর্তমান যুগে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে প্রায় সব দেশেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির নিম্নোক্ত সুবিধা লক্ষ্য করা যায় -

(ক) শিক্ষা-মনোবিদ্ রস্ (*Ross*) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির মূল্য সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি মানুষের মানসিক প্রকৃতি এবং তার ক্রমোন্নতি সম্পর্কে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করেছে।[1]

1. Ross : Groundwork of Educational Psychology ; Page 230.

টারম্যান বলেন, "বুদ্ধি অভীক্ষাগুলির আর একটি প্রয়োজনীয় উপকারিতা হল—যেসব উপাদান মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে সেগুলি আলোচনা করা।"[1]

(খ) ছাত্রদের বুদ্ধির পরিমাপ করে সেই বুদ্ধি অনুযায়ী ছেলেদের শ্রেণীভুক্ত করার জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি খুবই কার্যকর। ভালমন্দ, মাঝারি সব ছেলেমেয়েদের যদি একই শ্রেণীভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র উভয়ের প্রতি সমান অবিচার করা হয়। একই বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)-বিশিষ্ট ছাত্রদের একই শ্রেণীভুক্ত করে শিক্ষাদান করলে শিক্ষাকার্য ভালভাবে সম্পন্ন করা যায়। ভাল, মন্দ, মাঝারি শিক্ষার্থীদের এই শ্রেণীবিন্যাস বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারাই সম্ভব হয়।

একই বুদ্ধ্যঙ্কসম্পন্ন ছাত্রদের একইশ্রেণীভুক্ত করলে ভাল হয়

(গ) বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির সাহায্যে জানা যাবে ছাত্রের বুদ্ধি সম্পর্কে শিক্ষকের বিচার যথার্থ হয়েছে কিনা। তাছাড়া, এই বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষক নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কেও সচেতন হতে পারবেন। যদি বুদ্ধি-অভীক্ষায় পাওয়া সাফল্যাঙ্কের (score) সঙ্গে শ্রেণীর কাজের সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে শিক্ষক মহাশয় উপলব্ধি করতে পারেন, কি কারণে তা ঘটেছে।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োজনীয়তা

(ঘ) আজকাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক পরিচালনে (Educational Guidance) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির ব্যাপক প্রয়োগ স্বরু হয়েছে। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির সাহায্যে ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, অনুরাগ এবং বিশেষ সামর্থ সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা যায়। ছাত্রের বুদ্ধি ঠিকমত পরিমাপ করতে পারলে তার সামর্থ অনুযায়ী কোন বিষয়টি তার পক্ষে শিক্ষা করা সহজ হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। যে ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক কম তাকে সাধারণ স্কুল কলেজের শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত না করে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে তার শ্রম ও শক্তির অযথা অপচয় নিবারিত হয়। পূর্ব থেকে শিক্ষক যদি ছাত্রের বুদ্ধির পরীক্ষা করতে পারেন তাহলে তার সাহায্যে ছাত্রের শিক্ষামূলক অগ্রগতি কতটা হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি ধারণা করতে পারেন।[2]

বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষা-মূলক পরিচালনা

1. L, M, Terman, The Measurement of Intelligence : Page 19.

2। যে সব ছেলেমেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ এর নীচে তারা স্কুলে পড়লেও প্রায় ১০—১১ বছর পর্যন্ত তাদের প্রথম শ্রেণীতে পড়তে হয়। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৮৫-র মধ্যে এরা অষ্টম শ্রেণীর উপরে উঠতে পারে না। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮৫ থেকে ১১৫ পর্যন্ত তারা মানসিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়। এইসব প্রয়োজনীয় তথ্য বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যেই জানা যায়।

(ঙ) বৃত্তিমূলক পরিচালনেও (Vocational Guidance) বর্তমানে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কোন্ বৃত্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী সেটি নির্ধারণ না করে খেয়ালখুশিমত যে কোন একটি বৃত্তি গ্রহণ করলে ব্যক্তি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোন কোন বৃত্তি আছে যেগুলিতে সফলতা বুদ্ধির উচ্চমানের উপরে নির্ভর করে। যেমন—শিক্ষকতা, আইনজীবিকা, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যবসা পরিচালনা, শাসন সংক্রান্ত কাজ, আবার সাধারণ যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কাজ, মোটর চালনা, কারখানার কাজকর্ম বয়নশিল্প, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতিতে ব্যক্তি উন্নত বুদ্ধির অধিকারী না হলেও কোন ক্ষতি হয় না। বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির কোন বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তির সাধারণ বুদ্ধির মান, বিশেষ বিশেষ কর্ম করার মানসিক ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ প্রভৃতি বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে নির্ধারণ করা যায়। মাতাপিতা যদি সন্তানের বুদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হন তাহলে তাঁর সন্তানদের এমন কোন বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করবেন না, যা তাদের বুদ্ধির উপযোগী নয় এবং এর ফলে অযথা অর্থ ব্যয় বা অপচয় বন্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির সাহায্যে জানা যাবে যে, ছেলেমেয়েরা তাদের পূর্ণ সামর্থ অনুযায়ী কাজ করছে কিনা।

বৃত্তিমূলক পরিচালনায় বুদ্ধি-অভীক্ষার কার্যকারিতা

(চ) যারা স্বল্পবুদ্ধি তাদের বুদ্ধির স্বল্পতার কারণ নির্ধারণের জন্য, যাদের বুদ্ধি বিকারগ্রস্থ, তাদের বিকারের লক্ষণ নির্ণয় করার জন্য, যারা সামাজিক বা শিক্ষামূলক পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধান করে চলতে অপারগ, তাদের মধ্যে এই অসঙ্গতির কারণ কি তা নিরূপণ করার জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। যেসব শিশুরা লেখাপড়ায় শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়ে তাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে অনেক তথ্য জানা যায়। কখনও দেখা যায় যে, শিশুর বুদ্ধির স্বল্পতাই এর কারণ, শিক্ষক বা মাতাপিতার ত্রুটি নয়। আবার যদি দেখা যায় যে, শিশুর বুদ্ধি এর জন্য দায়ী নয়, তখন অনুমানের ক্ষেত্রকে অন্যদিকে পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

যারা স্বল্পবুদ্ধি, বিকারগ্রস্ত, তাদের স্বল্পবুদ্ধি এবং বিকারের কারণ নির্ধারণে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

(ছ) অপরাধপ্রবণ শিশুদের অপরাধমূলক মনোবৃত্তি নির্ধারণ করার ব্যাপারেও এই অভীক্ষাগুলি খুবই কার্যকর।

(জ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন ছাত্র ভর্তি করার জন্য, বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্মী নির্বাচনের জন্য, সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করার জন্য এই সব বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে

প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপযোগী বৃত্তি-নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। এই সব বিভাগ বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োগ করে ছাত্রদের উপযুক্ত বৃত্তি-নির্বাচনে সহায়তা করে।[1]

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োগ

(ঝ) বুদ্ধি-অভীক্ষা ব্যক্তিত্ব-নিরূপণে সহায়তা করে। বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান, কাজেই ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিচয়ের জন্য ব্যক্তির বুদ্ধির স্তর নির্ধারণ করা দরকার।

বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির অসুবিধা (Limitations of Intelligence Tests)**:** যদিও বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির পূর্বোক্ত সুবিধা আছে, তবু এগুলি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়।

(ক) বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ সম্ভব হয় না। শিক্ষা-দীক্ষা লাভের সমান সুযোগ না থাকলে বুদ্ধির পারস্পরিক তুলনা কার্যকর হয় না। কেননা, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পাওয়ার ফলে বহুলোক বুদ্ধি-অভীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করেছে।

বুদ্ধি-অভীক্ষার দ্বারা সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ সম্ভব নয়

(খ) ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ অনেক সময় হয় না। কেননা, ভাষার ব্যবহারে পরীক্ষার্থী নানারকম অসুবিধা ভোগ করতে পারে।

ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি-অভীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারে না

(গ) বুদ্ধি-অভীক্ষার সহায়তায় কোন ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপ সম্ভব নয়। কেননা, যে কোন অভীক্ষা ব্যক্তিত্বের একটি দিকই পরিমাপ করতে পারে।

বুদ্ধি-অভীক্ষায় সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপ সম্ভব নয়

(ঘ) বুদ্ধি-অভীক্ষার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ যে অভিযোগটি আনা হয় তাহল এই যে, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি যে বুদ্ধির পরিমাপ করে, সেই বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতের ঐক্য নেই। যে মানসিক শক্তির পরিমাপের চেষ্টা করা হচ্ছে, তার সম্পর্কে যদি কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকে তাহলে সে শক্তি পরিমাপের

1. "Intelligence tests then have many uses. They are of proved practical value in the diagnosis of mental deficiency, in the grading of pupils, in the clinical study of 'problem' children and in vocational guidance and selection."

—Rex and Knight: Intelligence and Intelligence Tests. Page 94.

কোন অর্থই হয় না।) অবশ্য, এই জাতীয় অভিযোগ যদি বুদ্ধি-অভীক্ষা-গুলির বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় তাহলে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির কার্যকারিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। (কিন্তু আসলে এই অভিযোগ টেকে না, কারণ বুদ্ধির কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না হলেও, বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা চলে না।)

বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতের অনৈক্য বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির অপ্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে না

(ঙ) (বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে আদর্শায়িত (Standardization) করা না হলে, পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের বা কর্মজীবনের সফলতা সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না।) তাছাড়া, কোন কোন কাজে কেবলমাত্র বুদ্ধিই সাফল্য আনতে পারে না।[1] (অফিসের কোন একজন টাইপিস্ট অন্যান্য টাইপিস্টদের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান হতে পারে কিন্তু সে একজন ভাল টাইপিস্ট নাও হতে পারে।) একজন লোকের ব্যবসায়ে উন্নতি করার পক্ষে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু তার নৈতিক ধারণা তার ব্যবসায়ের উন্নতি করার পথে অন্তরায়স্বরূপ হতে পারে। মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করতে হলে তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপের প্রয়োজন।

বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির আদর্শীকরণ না হলে পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বা কর্মজীবন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না

(চ) (বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয় যে, কোন ব্যক্তির দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা তার বুদ্ধির অভীক্ষার সাফল্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এ অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা, দ্রুত চিন্তনশক্তির জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন বুদ্ধি-অভীক্ষার ত্রুটি নির্দেশ করে না, কারণ, যথাযথ উত্তরের জন্যই কেবলমাত্র নম্বর দেওয়া হয়।) তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির তুলনায় সুনির্দিষ্টভাবে অধিক চিন্তা করতে পারে, তা নিঃসন্দেহে তার উন্নত বুদ্ধির লক্ষণ নির্দেশ করে।

দ্রুত চিন্তা বুদ্ধি-অভীক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে

(ছ) (বুদ্ধি-অভীক্ষার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ যে, এগুলির যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়, যেহেতু পরীক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান তার যথার্থ বুদ্ধির পরিমাপের পথে প্রধান অন্তরায়।) স্পীয়ারম্যান (Spearman) প্রমুখ কয়েকজন মনোবিদ্ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। বেরী (*Berry*) বুদ্ধি-অভীক্ষার

1. "Nor is intelligence always the factor which influences success."
—Rex and Knight: Intelligence and Intelligence Tests, Page 92.

ফল অনুযায়ী শিশুদের তিন দলে ভাগ করে দেখিয়েছেন যে, যারা বুদ্ধির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে রয়েছে তারাও প্রথম স্তরে যারা রয়েছে তাদের মতন প্রথমে স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেছিল। কোন বৌদ্ধিক কার্য সম্পন্ন করার যে মানসিক সামর্থ তার উপর শিক্ষার প্রভাবকে স্বীকার করে নেওয়া হলেও অভীক্ষাগুলি বুদ্ধির পরিমাপ করে না বা অধিক কিছু পরিমাপ করে একথা বলা চলে না। বুদ্ধি হল সহজাত শক্তি, কিন্তু বংশগতি অনুসারে একজন ব্যক্তি বুদ্ধির যে সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করতে পারে, তা করার জন্য তার একটা উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন।[1]

বুদ্ধি-অভীক্ষার যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়

(জ) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল আবেগ বা মেজাজ (emotional mood) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এর উত্তরে স্পীয়ারম্যান বলেন যে—অস্থিরতা, আত্মসংযমের অভাব প্রভৃতি তাদের মধ্যেই বেশী দেখা যায় যারা বুদ্ধি-অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায়। বেশির ভাগ লোক, বিশেষ করে শিশুরা যখন বুদ্ধির অভীক্ষায় নিজেদের নিযুক্ত করে, তখন সেগুলিকে আনন্দজনক বলেই মনে করে এবং আবেগজাত বাধা কদাচিৎ অনুভব করে। বিভিন্ন পরীক্ষণের সাহায্যে জানা গেছে যে, আবেগজাত প্রবণতার জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষায় কি পরিণতবয়স্ক বা কি শিশু, কেহই কোন সুবিধা বা অসুবিধা ভোগ করে না।

আবেগ বুদ্ধি অভীক্ষাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে

বুদ্ধি অভীক্ষাগুলির কিছু দোষ-ত্রুটি থাকলেও এগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই বা এগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হোক এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমতঃ, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির আদর্শীকরণের (Standardization) দ্বারা বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির অনেক দোষ-ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। তাছাড়া, পরীক্ষক যদি পরীক্ষার্থীর সঙ্গে একটা সহজ বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির সম্পর্ক (rapport) প্রতিষ্ঠা করে নেন, তাহলে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে।

বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না

১১। পরীক্ষা-পদ্ধতির আদর্শীকরণ (Standardizatian of Tests) :

পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করেছি। প্রশ্ন হল, এই পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি কিভাবে

1. "Intelligence is a native trait, but it requires an appropriate environment in order to reach the maximum that has been set for it by heredity"
—Rex and Knight : Intelligence and Intelligence Tests, Page 63.

নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ হতে পারে? প্রশ্নগুলি যদি পরীক্ষার্থীর বয়সের উপযোগী না হয় তাহলে পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগে কখনও সুফল আশা করা যাবে না।

পরীক্ষা-পদ্ধতির আদর্শীকরণ নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: যথা—(i) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity), (ii) **নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability) এবং (iii) **যাথার্থ্য** (Validity)।

(i) **নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity): পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ধারণা, চিন্তা, অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলিকে মুক্ত হতে হবে। পরীক্ষক যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষণকার্যে অগ্রসর না হন তাহলে পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার জন্য তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। অনেক সময় কোন পরীক্ষক শান্ত, ধীর-স্থির ছেলের তুলনায় বাচাল ছেলেকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করতে পারেন বা ভাল পোষাক পরা ফিটফাট ছেলেকে নোংরা পোশাক পরা ছেলের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান মনে করতে পারেন। একই পরীক্ষণকার্যে বিভিন্ন পরীক্ষক নিযুক্ত করে দেখা গেছে যে পরীক্ষকের খেয়াল, খুশি এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ছাত্রদের পরীক্ষণের বিষয়টির উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

বর্তমানে নতুন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা, যেমন—'multiple choice test,' 'true-false test,' 'best answer test', 'matching test' প্রভৃতির সাহায্যে এই অসুবিধা দূর করার চেষ্টা হচ্ছে।

(ii) **নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability): পরীক্ষা-পদ্ধতিকে তখনই নির্ভরযোগ্য মনে করা যাবে যখন দেখা যাবে পরীক্ষা-পদ্ধতি বার বার প্রয়োগে একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। যদি একই পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় তাহলে সেই পরীক্ষা-পদ্ধতির মান কখনও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিচার করা হয় বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে একই শিশুদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করে—তাদের সাফল্যাঙ্কের পারস্পর্য নির্ধারণ করে। অবশ্য এই সব পরীক্ষাগুলির পুনরাবৃত্তির মাঝে বেশ কিছু[1] সময়ের ব্যবধান থাকবে।

(iii) **যাথার্থ্য** (Validity): কোন পরীক্ষা-পদ্ধতিকে তখনই যথার্থ মনে করা যেতে পারে যখন দেখব যে, সেই পদ্ধতি যা পরিমাপ করার ইচ্ছা করে, তা-ই পরিমাপ করছে, অন্য কিছু নয় (A test is said to be valid when it does

1. "The reliability of intelligence tests is measured by correlating the score obtained by a number of applications of those very tests to the same children at different times."

—H. R. Bhatia: Elements of Educational Psychology; Page 336.

measure what it proposes to measure.)।[1] যেমন, বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে যখন বুদ্ধির পরিমাপ করা হবে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়, অন্য কিছু পরিমাপ করা না হয়; যেমন, পরীক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি। পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি তখনই যথার্থ হবে যদি পরীক্ষার্থীর আসল বয়সের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্নগুলি রচিত হয়। কোন নতুন বুদ্ধি-পরীক্ষাকে তখনই যথার্থ মনে করা যেতে পারে যখন তার সঙ্গে কোন স্বীকৃত দলগত পরীক্ষা-পদ্ধতি (recognized group-test) বিশেষ করে স্ট্যানফোর্ড-বিনে পদ্ধতি, নির্ভরযোগ্য শিক্ষকের বিচার, বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের পারম্পর্য থাকে।[2]

১২। বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence):

(i) **বুদ্ধ্যঙ্ক কিভাবে নির্ধারণ করা হয়** (How to determine I. Q.): প্রকৃত বয়স (Chronological Age) এবং মানসিক বয়স (Mental Age)—এ দুটির আনুপাতিক সম্বন্ধ হল বুদ্ধ্যঙ্ক। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টারম্যান যখন বিনের অভীক্ষাটির সংশোধন করে তার একটি সংস্করণ করেন তখন তিনিই সর্বপ্রথম বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যবহার করেন।

ছেলে বা মেয়ে যে বয়সের উপযোগী পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে তাই হবে তার মানসিক বয়স (mental age)[3]। একে সংক্ষেপে বলা

---

1. —Ibid. Page 337.

2. "Thus the validity of a new test of intelligence would be determined by correlating it with some recognized group test, or better with the Standford-Binet tests, with the estimates of intelligence given by a reliable teacher or with school marks."

—H. R. Bhatia: Elements of Educational Psychology; Page 338

3. শিশুর মানসিক বয়স হিসাব করার সময় শিশু সবচেয়ে যে বেশী বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষার সব কয়টি প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হবে, সেই বয়সকে শিশুর মৌলিক মানসিক বয়স (Basal mental age) গণ্য করে। মানসিক বয়সের হিসাব সেখান থেকে শুরু করতে হবে। তারপর ধরা যাক, সেই শিশু আরও বেশী বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষার মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল। উদাহরণ স্বরূপ ষ্টানফোর্ড-বিনে অভীক্ষায় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে, যেখানে ছয় থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত প্রতি বছরকে একটি স্তর ধরে প্রতি বছরের জন্য ছয়টি প্রশ্ন নির্দিষ্ট করা আছে। তার এগার বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নের দুটি প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হল একটি শিশু যে দশ বছরের অভীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে। এগার বছরের অভীক্ষার মোট দুটিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রতি প্রশ্নের জন্য দুমাস করে চার মাস মৌলিক মানসিক বয়সের সঙ্গে যোগ হবে।

হয় M. A. এই মানসিক বয়স ছেলে বা মেয়ের মানসিক পরিণতি নির্দেশ করে।

বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ

মানসিক বয়সকে (mental age), প্রকৃত বয়স (chronological age) দিয়ে ভাগ করে ঐ ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে কোন ছেলে বা মেয়ের বুদ্ধির পরিমাণ বা বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligent Quotient বা I. Q.) বলে।

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$$

$$\text{I. Q.} = \frac{\text{M. A. (in months)}}{\text{C. A. (in months)}} \times 100$$

[ভগ্নাংশ এড়াবার জন্যই ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হয়।]

ধরা যাক, একটি ৬ বছরের ছেলে ৬ বৎসরের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল। এক্ষেত্রে ছেলেটির প্রকৃত বয়স ৬ এবং মানসিক বয়সও ৬, তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক

$$\text{হবে} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} = \frac{\cancel{৬}}{\cancel{৬}} \times ১০০ = ১০০$$

অর্থাৎ **ছেলেটি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে।**

আবার কোন একটি ছেলের প্রকৃত বয়স ৮, কিন্তু সে ৬ বছরের উপযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল, অর্থাৎ তার মানসিক বয়স হল ৬। তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক

$$\text{হবে} = \frac{\text{মানসিক বয়স (M. A.)}}{\text{প্রকৃত বয়স (C. A.)}} = \frac{\overset{৩}{\cancel{৬}}}{\underset{৪}{\cancel{৮}}} \times \overset{২৫}{\cancel{১০০}} = ৭৫$$

অর্থাৎ, **ছেলেটি স্বল্পবুদ্ধি।**

আবার একটি বালকের প্রকৃত বয়স ৮ বৎসর এবং মানসিক ১২ বৎসর।

$$\text{তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে} = \frac{\text{মানসিক বয়স (M. A.)}}{\text{প্রকৃত বয়স (C. A.)}} = \frac{\overset{৩}{\cancel{\overset{৬}{\cancel{১২}}}}}{\underset{২}{\cancel{\underset{৪}{\cancel{৮}}}}} \times \overset{৫০}{\cancel{১০০}} = ১৫০$$

অর্থাৎ, **ছেলেটি অধিক বুদ্ধিশালী**

(ii) **বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা** (Constancy of I. Q.) : মনোবিদ্‌দের মতে বুদ্ধ্যঙ্ক অপরিবর্তনশীল। কেননা, মনের উন্নতি সত্ত্বেও ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক তার

জীবনে মোটামুটি একই থেকে যায়, যেটুকু বাড়ে-কমে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। যে বয়সে বুদ্ধ্যঙ্ক প্রযুক্ত হয়, সেই বয়সের সম্পর্কে সেটি অপরিবর্তনীয় থাকে। অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্ক যে বয়সের পরিমাপক সব সময় সেই বয়সের পরিমাপক হয়। যদি কারও প্রকৃত বয়স ১০ ও মানসিক বয়স ১২ এবং বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ হয়, তাহলে এই বুদ্ধ্যঙ্ক এরূপ বয়সের পরিমাপক হয়। স্বাভাবিক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০, বুদ্ধ্যঙ্ক কমলে বা বাড়লেও সে বাড়া-কমা ৫ থেকে ১০ অঙ্ক পর্যন্ত, এর বেশী নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্ক উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তবে তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে এই পরিবর্তনের পেছনে আছে শিশুর দৈহিক অসুস্থতা। তার উপর পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব, শিক্ষার অভাব, বা শিশুর মধ্যে ভয়, ক্রোধ বা অন্য কোন মানসিক আবেগের আবির্ভাব, পরীক্ষকের অনভিজ্ঞতাও কোন কোন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। চিকিৎসার ফলে অসুস্থতা দূর হওয়ার পর দেখা গেছে তার বুদ্ধ্যঙ্ক আবার আগের মতো হয়েছে। ১৬ বছরের পরে বুদ্ধি আর তেমন বাড়ে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায় তা বুদ্ধির বিষয়কে কেন্দ্র করে, বুদ্ধির আকার-প্রকার সম্পর্কে নয়। ১৬ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির মান একই থাকে। অবশ্য বুদ্ধি ঠিক কত বছরের পরে আর বাড়ে না সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কোন কোন মনোবিদ্ মনে করেন, সেই বয়স হল ১৪। বিনে, টারম্যান এবং মেরিলের মতে সেই বয়স হল ১৫ এবং ওটিস (*Otis*) ও মনরো (*Monroe*)-এর মতে তাহল ১৮। কিন্তু বেশীর ভাগ মনোবিদ্ যাঁরা বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে প্রয়োগ করে তার ফলাফল লক্ষ্য করেছেন তাঁদের মতে সেই বয়স হল ১৬। নীচের তালিকাটি থেকে সাফল্যাঙ্কের যে গড় পাওয়া যায় তার থেকেই বোঝা যায় যে, ১৬ বছরের পরে বুদ্ধির আর তেমন উন্নতি হয় না।

বয়স	সাফল্যাঙ্কের গড়
১১	১৩·১
১২	১৪·৪
১৩	১৫·১
১৪	১৭·৪
১৫	১৮·৫
১৬	১৮·৯
১৭	১৮·৯

'Otis Advanced Test' থেকে টমসন সাফল্যাঙ্কের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন—

বয়স	সাফল্যাঙ্কের গড	বয়স	সাফল্যাঙ্কের গড
১০	৫৫	১৮	১৩০
১১	৬৮	১৯	১৩০
১২	৭০	২০	১৩০
১৩	৯০	২১	১৩০
১৪	১০০	২২	১৩০
১৫	১১০	২৩	১৩০
১৬	১২০	২৪	১৩০
১৭	১২৭	—	—

উপরিউক্ত দুটি তালিকা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, আমাদের বুদ্ধি ষোল বছর বয়সের পরে আর বিশেষ বাড়ে না। জীবনের প্রথম দিকে বুদ্ধির বিকাশ যত তাড়াতাড়ি হয় শেষের দিকে সেরূপ আর হয় না। আর বুদ্ধি বাড়লেও বুদ্ধ্যঙ্ক প্রায় একই থেকে যায়। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ১৬ বৎসরের পরে যদি আর বুদ্ধির বিকাশ না হয় তাহলে কোন ব্যক্তি ১৬ বৎসর বয়সে যতখানি বুদ্ধিসম্পন্ন ৪০ বৎসরেও কি ঠিক ততখানি বুদ্ধিসম্পন্ন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ৪০ বৎসর বয়সে তার বুদ্ধির ক্ষেত্র বা পরিসর ১৬ বৎসরের তুলনায় বেশি, কিন্তু বুদ্ধির গভীরতা একই থেকে যায়। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি বেশি বিষয় সম্পর্কে সচেতন।

(iii) **বুদ্ধ্যঙ্কের পরিমাণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ** (Classification according to the degree of I. Q.): যেসব মানুষ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি নয় তাদের I. Q. বা বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ ধরে নেওয়া হয়। যার I. Q. ১০০-এর বেশি তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বলে ধরা হয়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের কতকগুলি বুদ্ধ্যঙ্ক নিয়ে দেখা গেছে যে, শতকরা ৬০ জনের বুদ্ধি মাঝারি প্রকৃতির অর্থাৎ তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০০ পর্যন্ত। এর নীচের দিকে শতকরা ২০ জন ক্ষীণবুদ্ধি বা Feeble-minded এবং উপরে শতকরা ২০ জন উন্নতবুদ্ধি বা Gifted. এরকমভাবে ক্রমশঃ নীচের দিকে যেতে যেতে নির্বোধ বা হাবা পর্যন্ত আর উপরের দিকে প্রতিভাবান পর্যন্ত যাওয়া যায়।

ক্ষীণবুদ্ধিদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা—

(ক) জড়ধী (Idiot): বুদ্ধির সোপানের সর্বনিম্নে রয়েছে এরা। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২০ থেকে ২৫ এবং মানসিক বয়স তিন থেকে পাঁচ বছরের বেশী নয়। এদের

বাকশক্তি বা বোধশক্তি দুই-ই নেই বললেই চলে। নিজেদের রক্ষা করার শক্তি বা ভাল-মন্দ বিচারশক্তি কিছুই এদের নেই। জীবনে সাধারণ বিপদ এড়িয়ে চলতে এরা পারে না। এরা না পারে নিজেরা খেতে, না পারে পরতে; খুব চেষ্টা করে সহজ কতকগুলি কাজ এদের শেখাতে পারা যায়।

(খ) **মন্দধী** বা **বোধহীন** (Imbecile): এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২৬ থেকে ৫০ এবং এদের মানসিক বয়স পাঁচ থেকে আট বছরের বেশী নয়। এদের প্রকাশ-শক্তি খুব অল্প। তাছাড়া, কোন কাজ নিজের থেকে এরা করতে পারে না। তবে খুব চেষ্টা করে অভ্যাস করিয়ে দিলে এরা কোন কাজ গতানুগতিকভাবে করতে পারে। জড়ধীর সঙ্গে এদের পার্থক্য যে, এরা মোটামুটি জীবনের সাধারণ বিপদ এড়িয়ে চলতে পারে।

(গ) **ক্ষীণধী** বা **স্বল্পবুদ্ধি** (Moron): ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্নদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক আছে যারা কোনরকমে দৈনন্দিন জীবন চালিয়ে নেবার মতো বুদ্ধিসম্পন্ন; এদের স্বল্পবুদ্ধি বা Moron বলে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০ থেকে ৭০ এবং এদের মানসিক বয়স আট থেকে এগারো বছরের অধিক হয় না, এরা মোটামুটি রকমের কাজ শিখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে। তাছাড়া, এরা অল্পস্বল্প লেখাপড়া চেষ্টা করে শিখতে পারে। কোন নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করা বা কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে এরা পারে না।

ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা (Education of the feeble minded): বুদ্ধি পরিমাপের ফলে যাদের ক্ষীণবুদ্ধি বলে গণ্য করা হয়, তারা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়ের মতো শিক্ষা গ্রহণে অপারগ। গতানুগতিক শিক্ষায় এসব ক্ষীণবুদ্ধিরা ছিল অবহেলিত। আধুনিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষা ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। এদের গ্রহণ ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত সামর্থ অনুসারে বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে করা হয়েছে। আমাদের দেশেও বেসরকারী উদ্যোগে এসব অবহেলিত মানবসন্তানদের জন্য কিছু কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা ভাষা বা বিষয়জ্ঞানে বিশেষ কোন পারদর্শিতা লাভ করতে পারে না। বিশেষ শিক্ষার দ্বারা এদের ইন্দ্রিয়শক্তির উৎকর্ষ সাধন ও পরনির্ভর না হয়ে যাতে নিজের কাজ নিজে করতে পারে এজন্য কতকগুলি আচরণে অভ্যস্ত করা হয়। সাধারণতঃ ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের (Special school) ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে বলেন, বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে এদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিশুদের সহজ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এজন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করাই উচিত।

সে যা হোক, ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অনিবার্য না হলেও অপরাধ-প্রবণতার নিকট সম্পর্কে বর্তমান। ক্ষীণবুদ্ধিরা সাধারণতঃ পরনির্ভর, এরা প্রায়ই দুষ্কৃতি পরায়ণ সমাজবিরোধীদের প্রভাবে পড়ে অসামাজিক হয়ে ওঠে। ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষাব্যবস্থায়, এদের সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করার চেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

(iv) **উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক:** উন্নতবুদ্ধিসম্পন্নদের মধ্যে প্রথম পর্যায়কে আমরা উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন (Bright) বলি। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ থেকে ১২০ এবং মানসিক বয়স ১৬ থেকে ২০। এর পরে রয়েছে বিশেষ উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন (very bright)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ থেকে ১৪০ এবং মানসিক বয়স ২০ থেকে ২২। এর উপর প্রতিভাবান (Genius) আছে যার সংখ্যা কম। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০ থেকে ১৬০ এবং মানসিক বয়স ২২ থেকে ২৪। সর্বোপরি অতিমানব বা Superman যার সংখ্যা খুবই বিরল। প্রতিভাবান এবং অসাধারণ প্রতিভাবান (Extraordinary genius) ব্যক্তিদের বুদ্ধির ক্রিয়ার মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৬০-এর উর্ধ্বে এবং মানসিক বয়স ২৪ এর উপর।

উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষা (Education of the gifted children):

ক্ষীণবুদ্ধিরা যেমন স্বাভাবিক শিশুর চাইতে কমবুদ্ধিসম্পন্ন, তেমনি উন্নত বুদ্ধিরা স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের চাইতে অধিক বুদ্ধির অধিকারী। এদের মানসিক চাহিদা ও শক্তি, মননশীলতা, উপলব্ধির ক্ষমতা অপরিসীম। এদের উপযুক্ত শিক্ষা সাধারণ বিদ্যালয়ে সম্ভব নয়। উন্নত মানের শিক্ষা-প্রদানের জন্য এদের জন্যও বিশেষ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। ইংলণ্ডের অনুকরণে আমাদের দেশের উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় বর্তমান।

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রবর্তন না করে সাধারণ বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করার অনেকেই পক্ষপাতী। তার কারণ, উন্নতবুদ্ধিরা সমাজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসামাজিক হয়ে ওঠে এবং অসঙ্গত শ্রেষ্ঠত্ববোধ ওদের মনে সৃষ্টি হয়। নিজেকে স্বাভাবিক মানুষের চাইতে উন্নত ভেবে তারা একটি সামাজিক দূরত্ব (social distance) সৃষ্টি করে।

(v) **প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধ্যঙ্ক** (The I. Q. of Adults): যেহেতু বুদ্ধি-অভীক্ষকদের মতে ১৬ বছরের পর ব্যক্তির মানসিক বয়স (mental age) আর বাড়ে না, অথচ তার প্রকৃত বয়স (chronological age) বাড়তে থাকে, সেহেতু সাধারণ নিয়মানুযায়ী যদি প্রাপ্তবয়স্কের বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করা হয় তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক ক্রমশঃ কমতে থাকবে। অর্থাৎ ৪০ বৎসর বয়সে একজন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক তার ২০ বৎসর

বয়সের বুদ্ধ্যঙ্কের অর্ধেক হবে। এইভাবে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করতে গেলে ক্রমশঃ দেখা যাবে যে, ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক মন্দধী বা বোধহীনের (Imbecilé) বুদ্ধ্যঙ্কের পর্যায়ভুক্ত হবে। এই কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করার সময়ে তাদের প্রকৃত বয়সের কোন পরিবর্তন না করে সকল ক্ষেত্রেই তাকে ১৬ বৎসর ধরে নিয়ে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ, একজন প্রাপ্তবয়স্কের, যার বয়স ১৬ বৎসর বা তার উর্ধ্বে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে—

$$\frac{M.A.}{১৬} \times ১০০ =$$

বুদ্ধি-অভীক্ষকদের মতে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক বয়স ১৬, অস্বাভাবিকদের ৩ থেকে ১৬ এবং প্রতিভাবানদের ২০ থেকে ৩২ পর্যন্ত হতে পারে।

তবে এই ভাবে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করার পদ্ধতি অনেকে সমর্থন করেন না। কারণ যদিও সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, মানসিক শক্তি মধ্যবয়স পর্যন্ত বাড়তে থাকে এবং বৃদ্ধ বয়সেই কমতে থাকে। বুদ্ধি-অভীক্ষার সাফল্যাঙ্ক (Intelligence Test Score) থেকে জানা যায় যে, মানসিক শক্তি ২০ বা ২৫ বছর বয়স থেকেই হ্রাস পেতে থাকে এবং এই হ্রাস পাওয়া ক্রমিক ভাবে এবং একই গতিতে (gradual but steady) চলতে থাকে। ১৩, ২০, ৪৫ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে পরীক্ষকরা যেসব পরীক্ষণকার্য চালিয়েছেন তার দ্বারাই এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়েছে। সুতরাং, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সাফল্যাঙ্ক কমতে থাকে, সেহেতু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধ্যঙ্ক ক্রমশঃ কমতে থাকবে এরূপ অনুমান করা হয়। ২০ বা ৪০ বৎসর বয়সে তার সাফল্যাঙ্ক যা হয়েছিল ৬০ বৎসরে তা হবে না। এই কারণে ব্যক্তিকে তার সমবয়সী অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা করে তার বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। এই বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করার পদ্ধতিটুকু এবার বুঝে নেওয়া যাক: ধরা যাক, ৬০ বৎসর বয়সী একদল লোকের উপর বুদ্ধি-অভীক্ষা প্রয়োগ করে তাদের সাফল্যাঙ্কের গড় নির্ধারণ করা হল। এই গড়কে ১০০ বুদ্ধ্যঙ্কের সমান বলে ধরে নিতে হবে এবং তারপর সেই সাফল্যাঙ্কের গড়ের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের সাফল্যাঙ্কের মানের ব্যবধান কি পরিমাণ তা নির্ধারণ করতে হবে। একেই বলা হয় Standard Deviation Score বা সংক্ষেপে S. D. Score।[1] যেহেতু সাফল্যাঙ্কের গড়কে

S. D. Score

[1] "The individual's S.D. score is his distance above or below the average, measured in terms of the S. D, as a unit......The S. D. score shows exactly where the individual stands in the group as a whole."

—Woodworth : Psychology; *Page 61.*

১০০ বুদ্ধ্যঙ্কের সমান ধরে নেওয়া হয়েছে, সেহেতু ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধ্যঙ্কের ব্যবধানটুকু অনুমান করে নেওয়া যাবে। এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী ; কেননা, কোন মনোবিদ্ই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে প্রমাণ করতে চান না, যদিও তার সমবয়সী লোকের বুদ্ধির গড়ের অনুপাতে তার বুদ্ধি কোন অংশে কম নয়।

তবে অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, বুদ্ধি-অভীক্ষায় প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের ভিত্তিতে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের বুদ্ধ্যঙ্কের যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কেননা, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি যে বুদ্ধি-অভীক্ষায় তেমন ভাল ফল দেখাতে পারে না তার কারণ কেবলমাত্র দৈহিক দুর্বলতা ও ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি-বিচ্যুতি নয়, যুবকদের তুলনায় বৃত্তিগত এবং শিক্ষাগত তারতম্যও এর জন্য দায়ী। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কোন এক বিশেষ বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকার জন্য সে সম্পর্কেই দক্ষতা অর্জন করেন। বয়সের জন্য কাজকর্ম চটপট করার অভ্যাস তাদের থাকে না এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য এই সব পরীক্ষার প্রতি তাঁরা কম আগ্রহ প্রকাশ করেন বা তেমন সহযোগিতা দেখাতে চান না।

১৩। বুদ্ধির বণ্টন (Distribution of Intelligence) :

বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির আসল তাৎপর্য হল, কোন এক ব্যক্তির বুদ্ধির সঙ্গে অপর ব্যক্তির বুদ্ধির তুলনা করা বা কোন ব্যক্তির বুদ্ধিকে তার সমবয়সী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা। ছয় বছরের একটি ছেলে কতখানি বুদ্ধিমান তা আমরা নির্ধারণ করি অন্য একটি ছয় বছরের ছেলের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করে।

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির তাৎপয হল কোন ব্যক্তির বুদ্ধির সঙ্গে সমবয়সী ব্যক্তির বুদ্ধির তুলনা করা

অনুরূপভাবে একজন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি কতখানি বুদ্ধিমান তা আমরা পরিমাপ করি সাধারণ পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির সঙ্গে তার বুদ্ধির তুলনা করে। আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের সঙ্গে সাধারণের বুদ্ধ্যঙ্কের তুলনা করে বুঝতে পারি সে কতখানি বুদ্ধিমান। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি বণ্টন কি ভাবে হয়েছে তা আমাদের জানা উচিত। শিশুদের উপর বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তার উপরই আমাদের বিশেষ করে নির্ভর করতে হবে, কেননা, পরিণত বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমেরিকায় ২ থেকে ১৮ বছরের প্রায় ২৯০০ জন ছেলেমেয়ের উপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০৯ পর্যন্ত। ১৪০ এবং তার উর্ধ্বে

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা হল প্রতিভাবান শ্রেণীভুক্ত এবং ৭০-এর নীচে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তারা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন (Feeble-minded)।

নিচের ছকটি লক্ষ্য করলে জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি বণ্টনের শতকরা হার কত জানা যাবে:

বুদ্ধ্যঙ্ক	জনসাধারণের শতকরা হার
১৪০ ও তার উর্ধ্বে	১
১৩০ — ১৩৯	২
১২০ — ১২৯	৮
১১০ — ১১৯	১৬
১০০ — ১০৯	২৩
৯০ — ৯৯	২৩
৮০ — ৮৯	১৬
৭০ — ৭৯	৮
৬০ — ৬৯	২
৬০-এর নিচে	১

উপরের তালিকা থেকে জানা যায় যে, শতকরা ৪৬ জনের (২৩+২৩) বুদ্ধি মাঝারি এবং তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০৯-এর মধ্যে, এটিই হল বুদ্ধির গড়পড়তা পরিসর (average range of intelligence)।

কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের প্রকৃত তাৎপর্য তখনই বোঝা যাবে যদি জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কের বণ্টন জানা যায়। যেমন, যদি আমরা জানি যে কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-এর উর্ধ্বে, তাহলে আমরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারব যে লোকটি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কিছু উপরে। অনুরূপভাবে যদি জানা যায় কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০, তাহলে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন, আবার যদি জানি যে কারও বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-এর কম, তাহলে বুঝব যে, সে ব্যক্তি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নীচে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কতটা উপরে বা কতটা নিচে, তা কি ভাবে বুঝব? যদি কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১৩০ হয় তাহলে কি মনে করব লোকটি প্রখর বুদ্ধিশালী আবার কারও বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০ হয় তাহলে সে কি একেবারে নির্বোধ? কেবলমাত্র বুদ্ধ্যঙ্ক জানা থাকলে এর উত্তর দেওয়া যাবে না। আমাদের বুদ্ধির গড়পড়তা বিস্তার এবং জনসাধারণের মধ্যে কি ভাবে বুদ্ধি বণ্টিত হয়েছে তা জানতে হবে। যদি বলা হয় কারও বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০,

কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের প্রকৃত তাৎপর্য জানা যায় যদি জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্কের তাৎপর্য জানা যায়

তাহলে বুঝতে হবে যে জনসাধারণের শতকরা (১+২=৩) ৩ ভাগ লোক তার থেকেও কম বুদ্ধিসম্পন্ন। আবার যদি বলা হয় কারও বুদ্ধ্যঙ্ক ১৩০, তাহলে বুঝতে হবে জনসাধারণের শতকরা ৩ জন (১+২) তার থেকে বেশী বুদ্ধিমান।

১৪। বুদ্ধি এবং আচরণ (Intelligence and Conduct) :

মানুষের বুদ্ধির এবং তার আচরণের মধ্যে যে একটা গভীর সম্বন্ধ আছে, দৈনন্দিন জীবনে আমরা তার অনেক প্রমাণ পেয়ে থাকি। বস্তুতঃ, মানুষের বুদ্ধি তার আচরণের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করে। বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মানুষের আচরণের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আচরণ তাদের শাণিত বুদ্ধির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। যাদের আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ, সৃষ্টিধর্মী, গঠনমূলক তাদের বুদ্ধি যে উন্নত স্তরের এ আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অপরপক্ষে, যারা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন, যেমন—জড়ধী (Idiots), মন্দধী বা বোধহীন (Imbeciles) এবং ক্ষীণধী বা অল্পবুদ্ধি (Moron)—তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধির মান নিম্নস্তরের এবং সেহেতু তাদের আচরণের মধ্যে নানারকম অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, যারা জড়ধী তারা জীবনের স্বাভাবিক বিপদ থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। জীবনের বহু বিচিত্র সমস্যার সমাধানে বুদ্ধিই মানুষকে সহায়তা করে। এ কারণে কোন ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাণ আমাদের জানা থাকলে তার আচরণ সম্পর্কে মোটামুটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। যেসব ব্যক্তির বুদ্ধির মান স্বাভাবিক স্তরের নিম্নে তারা জটিল সমস্যা সমাধানে অপারগ হয়, পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে পারে না, নতুন নতুন বিষয় শিক্ষা করতে পারে না বা কোন উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধি তার আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়

বুদ্ধির প্রকৃতি অনুসারে মানুষের আচরণের তারতম্য

সাম্প্রতিককালে অপরাধতত্ত্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধি অভীক্ষাগুলিকে প্রয়োগ করে বুদ্ধির সঙ্গে আচরণের সম্পর্ক নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির স্বল্পতাই ব্যক্তির অপরাধমূলক আচরণের অন্যতম কারণ। বিশেষ করে যারা স্বল্পবুদ্ধি (Moron), তাদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার সম্ভাবনার কথা মনোবিদ্‌রা বলে থাকেন। তবে বুদ্ধির স্বল্পতাই অপরাধের একমাত্র কারণ বলা যেতে পারে না। কতকগুলি বিশেষ ধরনের অপরাধ সম্পন্ন করার জন্য যে উন্নত ধরনের বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তা অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

অপরাধতত্ত্বের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োগ

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুর বুদ্ধি অনুযায়ী যদি তাকে কাজ করতে দেওয়া না হয়, তাহলে তার আচরণের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। যদি খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুকে কোন সহজ কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে কাজটি অল্প সময়ে সম্পন্ন করার পর, অবসর সময় সে অসামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োগ করে।

সহজাত বুদ্ধির সঙ্গে কাজের সঙ্গতি আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে

আবার অপরপক্ষে, কোন স্বল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট শিশুকে যদি খুব কঠিন কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে সে সেটি করতে পারে না এবং সকলের কাছ থেকে উপেক্ষা ও ভৎর্সনা লাভ করার জন্য তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। কাজেই সহজাত বুদ্ধির সঙ্গে কাজের সঙ্গতি কি শিশু, কি পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি সকলের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

তবে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের আচরণ কেবলমাত্র তার বুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, আবেগ, দৈহিক শক্তি, শিক্ষা মানুষের আচরণকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। অপরদিকে মানুষের আচরণের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও কম নয়। সমাজের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, নৈতিক আদর্শ সব কিছুই মানুষের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রণোদিত হয়েই মানুষ আচরণ করে, এ কথা বলা যেতে পারে না। অবশ্য ব্যক্তির চরিত্রের গঠন ও বিকাশের মূলে বুদ্ধির অবদানকে সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করে নিতে হয়। আচরণের মাধ্যমেই ব্যক্তি-চরিত্রের প্রকাশ। যে ব্যক্তি বুদ্ধির সাহায্যে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের তাৎপর্য উপলব্ধি করে নিজের আচরণের সঙ্গে তার সঙ্গতিসাধনে সচেষ্ট হয় এবং বুদ্ধির সাহায্যে তার বিভিন্ন শক্তিকে সুসংহত করতে পারে; তার চরিত্র যে সুগঠিত হয় সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং বুদ্ধির সঙ্গে মানুষের আচরণের গভীর সম্পর্ককে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না।

মানুষের আচরণ কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না

১৫। বুদ্ধি এবং অপরাধপ্রবণতা (Intelligence and Delinquency) :

'ডেলিংকোয়েন্সী' শব্দটির বাংলা অর্থ 'দুষ্ক্রিয়তা', 'অপরাধ', বা 'অপকর্ম'। কিন্তু আসলে 'ডেলিংকোয়েন্সী' শব্দটির দ্বারা আমরা বুঝি শিশু অপরাধপ্রবণতা। সিরিল বার্টের (*Cyril Burt*) মতে যখন কোন শিশুর মধ্যে অসামাজিক প্রবণতা দেখা দেয় এবং এমনভাবে দেখা দেয় যে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বনের

প্রয়োজন হয় তখন তাকে অপরাধী বলা যেতে পারে। সামাজিক অপরাধও বিচিত্র ধরনের। নরহত্যা, প্রতারণা, চৌর্যবৃত্তি, যৌন অপরাধ, মিথ্যা বলা, কলহ, বিদ্বেষ, ঘৃণা, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সবই সামাজিক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। যেসব অসামাজিক কাজের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের শাস্তি বা দণ্ড দেওয়া হয়, সেসব কর্ম করার জন্য শিশু বা কিশোরদেরও অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। তবে তাদের ক্ষেত্রে বয়সের একটা বিশেষ প্রশ্ন এসে পড়ে; যে জন্য বয়সের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা ও প্রকারের তারতম্য ঘটে থাকে।

সিরিল বার্ট-এর অভিমত

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি প্রচলিত হবার পর পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির এবং কিশোরদের অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধির কতখানি সম্বন্ধ আছে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় প্রথম অবস্থায় দেখা গেল যে বেশির ভাগ অপরাধীই ক্ষীণবুদ্ধি, কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে পূর্বে ধারণা পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিল। বস্তুতঃ দেখা গেল যে, অপরাধীদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনেরই ক্ষীণবুদ্ধি, বেশীর ভাগ স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বেশ কয়েকজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন। তবে বেশীর ভাগেরই বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে। অবশ্য কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ক্ষীণবুদ্ধি এবং পরিণতবয়স্ক অপরাধীর বুদ্ধির মান কিশোর অপরাধীদের বুদ্ধির মানের তুলনায় অধিক। ইংল্যাণ্ডে স্যার সিরিল বার্ট কিশোর-অপরাধপ্রবণতা সম্পর্কে যে ব্যাপক গবেষণা কার্য পরিচালনা করেন তার দ্বারাও পূর্বোক্ত তথ্য অনেকাংশে সমর্থিত। বার্টের মতে অপরাধের যতরকম মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে তার মধ্যে একটি হল ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতা (defective mind)। যদি কোন বালকের বয়স দশ হয় এবং মানসিক বয়স সাত হয় তাহলে তাকে ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন বালক বলা যেতে পারে। তবে এ জাতীয় ব্যক্তিরা একেবারে জড়ধী (Idiot) এবং বোধহীনের (Imbecile) অন্তর্ভুক্ত নয়। বার্টের মতে কিন্তু অধিকাংশ অপরাধী ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন। বার্ট বলেন, "ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন বালকের মধ্যে সেই প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টির অভাব আছে যার দ্বারা সে নিজেই প্রত্যক্ষ করতে পারে বা দৃঢ়ভাবে নিজের মনে ধারণা করতে পারে যে, যা তাকে প্রলোভিত করে তা অসাধু এবং অসাধুতা খারাপ।"[1] অন্য কথায়, বুদ্ধিহীন হয়ে যারা জন্মায় তারা অপরাধমূলক

অপরাধ প্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ

ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতা

1. "The defective child is without the necessary insight to perceive for himself, or to hold effectively in his mind, that tempts him is dishonest and that dishonesty is 'wrong."
—Burt : The Young Delinquent :Page 301.

আচরণ করে। কারণ অপরাধ হল বোকার মতো নিজের উদ্দেশ্য লাভ করা। রেক্স এবং নাইট (*Rex and Knight*) এই প্রসঙ্গে বলেন, "অপরাধ এবং বুদ্ধির স্বল্পতার মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তা এমন বিস্ময়জনক কিছু নয়; কেননা, যেখানে বুদ্ধির অভাব সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ চরিত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।[১]

বার্টের মতে অপরাধীদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দু-একজন দেখা গেলেও কেবলমাত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধিই অপরাধের কারণ নয়। বিশেষ পরিবেশে তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাকে অপরাধমূলক কার্য-সম্পাদনে সহায়তা করে মাত্র। তাঁর মতে অপরাধ প্রবণতার মূলে একাধিক কারণ বর্তমান। অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, মাতাপিতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব, শিশুর প্রতি মাতাপিতার বিরূপ মনোভাব, কুসঙ্গ, অত্যধিক উত্তেজনা ও আবেগ-প্রবণতা, দারিদ্র্য, শারীরিক ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রভৃতি কারণ অপরাধের মূলে বর্তমান। অপরদিকে নিকৃষ্ট বংশগতিও ব্যক্তির স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে অপরাধপ্রবণ করে তুলতে পারে।

বার্ট, রেক্স এবং নাইট-এর অভিমত

উডওয়ার্থের[2] মতেও কিশোর-অপরাধ-প্রবণতা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের অপরাধ-প্রবণতার মূলে কোন একটি বিশেষ কারণ, যেমন—ক্ষীণবুদ্ধি, আবেগজাত অস্থিরতা, দারিদ্র্য বা চারপাশের নিকৃষ্ট পরিবেশ রয়েছে বলা যেতে পারে না। কোন বিশেষ সময়ে এটা বা ওটা, কোন একটি বিশেষ বিষয়ের প্রভাব অধিকমাত্রায় দেখা যায়। কোন যুবতী নারী গৃহে লাঞ্ছিত বা উপেক্ষিত হওয়ার জন্য যৌন অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত হয়। কোন বালক দুঃসাহসিক কার্য করার জন্য এত বেশী ঝুঁকে পড়ে যে, পাড়ার কুসঙ্গে মিশে অসামাজিক কাজে নিজেকে লিপ্ত করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র বুদ্ধির অভাবকেই অপরাধের কারণ বলে নির্দেশ করা যায় না। অপরাধের একাধিক কারণের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধি হওয়া অন্যতম কারণ। যারা ক্ষীণবুদ্ধি তাদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু বুদ্ধির অভাবের সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার কোন অনিবার্য সম্বন্ধ নেই।

উডওয়ার্থের-এর অভিমত

1 "The connexion between crime and low degree of intelligence is not surprising, because where intelligence is lacking, it is impossible to establish a self-controlled and well organised character."

—Rex and Knight: Intelligence and Intelligence Tests; Page 89.

2. Woodworth: Psychology; Page 131.

১৬। বুদ্ধি ও বৃত্তি (Intelligence and Occupation) :

বুদ্ধি এবং বৃত্তির মধ্যে যে একটা পারস্পরিক সংযোগ আছে তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। যে-কোন্ ব্যক্তিই যে-কোন বৃত্তিতে সফলতা অর্জন করতে পারে না। যেসব ব্যক্তির বুদ্ধি অত্যন্ত অল্প তাদের পক্ষে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থেকে নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা খুবই কঠিন। কোন ক্ষীণবুদ্ধির পক্ষে শাসন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়। জড়ধী কোন বৃত্তিরই উপযুক্ত নয়। ক্ষীণবুদ্ধি যারা, তারা গতানুগতিক পেশায় নিযুক্ত হয়ে কোন কাজ যান্ত্রিকভাবে করতে পারে। যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক, তারা স্বাভাবিক বৃত্তিতে, যাতে বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে উপযুক্ত। আর যারা প্রতিভাবান তারা সেই সব পেশায় উপযুক্ত যাতে সৃজনীশক্তি বা কল্পনার মৌলিকতা দেখানোর প্রয়োজন।

বুদ্ধি ও বৃত্তির পারস্পরিক সংযোগ

সাম্প্রতিক কালে বুদ্ধি এবং বৃত্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করার জন্য মনোবিদগণ সচেষ্ট হয়েছেন এবং বিভিন্ন বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে তাঁরা বুদ্ধি এবং বৃত্তির মধ্যে যে প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছেন। দেখা গেছে যে, কোন বৃত্তিতে সফলতা অর্জন করতে হলে, একেবারে খুব কম করেও কিছু পরিমাণ বুদ্ধিগত সামর্থ থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, কোন বৃত্তিতে সাফল্য অর্জন করার জন্য সেই বৃত্তির প্রয়োজন অনুযায়ী বুদ্ধির একটা সর্বনিম্ন মান স্বীকার করে নিতে হবে। কোন ব্যক্তির বুদ্ধির মান যদি সেই বৃত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সর্বনিম্ন মান, তারও নীচে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি সেই বৃত্তির উপযোগী নয়, এমন কথা বলা যেতে পারে।

বুদ্ধি ও বৃত্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ

মনোবিদ্ উডওয়ার্থ-এর মতে সাধারণ কেরানীর কাজে মোটামুটি কাজ চালিয়ে যাবার জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যার মানসিক বয়স অন্ততঃপক্ষে কম করে দশ বৎসর। অবশ্য উচ্চস্তরের কেরানীর কাজে এই মানসিক বয়সের নিম্নতম হার আরও বেশি। অনেক সময় কোন কোন মাতাপিতা তাঁদের সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করেন, যদিও ছেলেটির বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-র বেশি নয়। ছেলেটি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও মাতাপিতার প্রত্যাশা সবটুকু পূর্ণ করতে পারে না। অবশ্য ব্যক্তি যদি নিজ সামর্থ অনুযায়ী নিজের বৃত্তি নির্বাচন করে, তাহলে তাঁর বৃত্তির সঙ্গে তার বুদ্ধিগত সামর্থের একটা সঙ্গতি থাকে এবং নিজ বৃত্তিতে সফলতা অর্জনের পথে কোন অন্তরায় দেখা দেয় না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে

রাখা প্রয়োজন যে, কোন বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্যলাভের জন্য শুধু বুদ্ধিই যে প্রয়োজন আছে তা নয়, বুদ্ধি ছাড়াও অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণগুলির প্রয়োজন। রেক্স এবং নাইট (*Rex and Knight*) বলেন, "যেকোন বৃত্তির জন্য কি পরিমাণ বুদ্ধির দরকার তা নির্ভর করে কেবলমাত্র সেই বৃত্তি বা বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপর নয়, কোন বিশেষ সময়ে সেই বৃত্তিতে কতখানি প্রতিযোগিতা আছে তার উপর।"[1]

কোন বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্যলাভের জন্য বুদ্ধি ছাড়া আরও অনেক গুণের প্রয়োজন

বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিতে যেসব ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন তাঁদের গড়পড়তা বুদ্ধির হার বা বুদ্ধ্যঙ্ক কত সে সম্পর্কে মনোবিদ্‌রা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, যারা বুদ্ধিজীবী, যেমন—হিসাবরক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, লেখক তাদের গড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্ক বেশী এবং কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি অদক্ষ কারিগরদের বুদ্ধ্যঙ্ক সবচেয়ে কম। মনোবিদ্ উডওয়ার্থের মতে, "গড়পড়তা হিসেবে দেখা গেছে, বুদ্ধির পরীক্ষায় স্বাধীন ব্যবসায়ীদের সাফল্যাঙ্ক সবচেয়ে বেশি। হিসাবরক্ষক ও কেরানীদের সাফল্যাঙ্ক বেশ উপরের দিকে; দক্ষ কারিগরদেরও মোটামুটি উপরের দিকে, তবে অদক্ষ কারিগরদের স্থান একেবারে নিচের দিকে।"[2] রেক্স এবং নাইট (*Rex and Knight*) পূর্বোক্ত অভিমত সমর্থন করেন।[3]

বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তির গড়পড়তা বুদ্ধির হার

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন মনোবিদ্ উডওয়ার্থ। বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির গড় কত? এ সম্পর্কে যেসব গবেষণা করা হয়েছে এবং তার ফলে যেসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার থেকে জানা যায়, ব্যবসায়ী এবং শাসনবিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দের ছেলেমেয়েরা বুদ্ধির পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এবং অশিক্ষিত দিনমজুর শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বুদ্ধির পরীক্ষায় সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করে।

1. Rex and Knight: Intelligence and Intelligence Tests; Page 79.

2. "On the average, to be sure, professional men score the highest in intelligence test, book-keepers, and clerks rather high, mechanics fairly high, unskilled labourers the lowest."—Woodworth: Psychology; Page 129.

3 ....in respect of average intelligence, the professions were at the top and unskilled manual occupations at the bottom."

—Rex and Knight: Intelligence and Intelligence Tests. Page 791.

টারম্যান এবং মেরিল (*Terman and Merrill*) আমেরিকার লোকদের উপরে এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যে ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হল।[1]

পিতার বৃত্তি অনুসারে সন্তানের বুদ্ধ্যঙ্কের গড় ঃ

	পিতারবৃত্তি	**সন্তানের বুদ্ধ্যঙ্কের গড়**
১।	স্বাধীন ব্যবসায়ী বা পেশাদার (professional)	১১১·৬২
২।	আধা-পেশাদার এবং পরিচালনা সম্পর্কীয় (Semi-Professional and managerial)	১১১·৯
৩।	কেরানীবৃত্তি, দক্ষ-ব্যবসাদার, খুচরা ব্যবসাদার (Clerical, skilled trades, retail business)	১০৭·৫
৪।	অর্ধ-দক্ষ, সামান্য কেরানী, সামান্য ব্যবসায়ী (Semi-skilled, minor clerical and business)	১০৫·০
৫।	যৎসামান্য দক্ষ এবং অদক্ষ (Slightly skilled and un-skilled)	৯৭·২
৬।	গ্রাম্য-স্বত্বাধিকারী (Rural owners)	৯৫·১

অবশ্য উপরিউক্ত তালিকাতে বুদ্ধ্যঙ্কের গড়ের কথাই বলা হয়েছে। এর যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না, তা নয়। শাসনবিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দের কোন সন্তান অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে, আবার কোন দিনমজুরের সন্তানও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সন্তানের বুদ্ধি নির্ধারণ করার ব্যাপারে পিতার বৃত্তি কোন একটি মুখ্য উপাদান নয়। তবে একান্তই কেন পিতার বৃত্তিকে একটি উপাদানরূপে গণ্য করা হয়? এর উত্তরে কেউ কেউ পরিবেশগত প্রভাব এবং বংশগত প্রভাব উভয়েরই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা খুবই মুশকিল। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে বংশগত এবং পরিবেশের প্রভাব সংমিশ্রিত হয়ে থাকে, সেহেতু কোন্ সন্তানের বুদ্ধি কতটা বংশগত, কতটা পরিবেশগত প্রভাবের ফল তা বলা মুশকিল।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধি এবং বৃত্তির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। যে ব্যক্তি যে বৃত্তিতে নিযুক্ত যদি সেই বৃত্তির উপযোগী বুদ্ধি তার মধ্যে থাকে, তাহলে সেই বৃত্তিতে সে সফলতা লাভ করতে পারে। সুতরাং কোন বৃত্তি কোন্ বৃত্তির জন্য উপযুক্ত বা সেই বৃত্তির প্রয়োজনীয় নিম্নতর বুদ্ধির পরিমাণ তার আছে কিনা তা নির্ধারণ করা গেলে বৃত্তির জন্য উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুবিধা হয়। কোন্ বৃত্তিটি কার পক্ষে উপযোগী তা নির্ধারণ করার জন্য সাধারণ বুদ্ধি-পরীক্ষা (General

বুদ্ধি ও বৃত্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে

1. --Garrett : Great Experiments in Psychology ; Page 256.

Intelligence Test), বিশেষ বুদ্ধি-পরীক্ষা (Special Ability Test) এবং অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির বুদ্ধির মান, বিশেষ ক্ষমতা, প্রবণতা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগৃহীত হলে, ব্যক্তিকে তার উপযোগী বৃত্তিতে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়। তার ফলে যেমন উচ্চস্তরের কাজের জন্য উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই নির্বাচন করা সম্ভব হবে তেমনি অপরদিকে অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার অনুপযোগী বৃত্তিতে নির্বাচিত না করে, শ্রম, সময়, অর্থের অযথা অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হবে।

একাদশ অধ্যায়

ব্যক্তিগত বৈষম্য
Individual Difference

১। ভূমিকা (Introduction) :

মানুষের মধ্যে যেমন নানা দিক দিয়ে মিল আছে তেমনি তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রভেদও দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি বিষয়ে একটি মানুষের সঙ্গে অন্য আর একজন মানুষের অবিকল মিল কখনও দেখা যায় না। প্রতিটি মানুষের এমন কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে অন্য মানুষ থেকে প্রভেদ করে।

মানুষের মধ্যে যেমন মিল, তেমন প্রভেদও আছে

এই প্রভেদ আমরা খুব পরিষ্কার করে দেখতে পাই যখন কোন একটি শ্রেণীর সমান বয়সের ছাত্রদের চেহারা, দৈর্ঘ্য, ওজন, স্বভাব ইত্যাদি বিচার করে দেখি। বিচার করলে দেখা যাবে কেউ খুব সুপুরুষ, কেউ কুৎসিত, কেউ বা খুব লম্বা, কেউ বা বেঁটে, কেউ শক্তিমান, কেউ বা দুর্বল। আরও নানা দিক দিয়ে প্রচুর অমিল খুঁজে পাওয়া যায়—কেউ লেখাপড়ায় খুব ভাল, কেউ খারাপ, কেউ রাগী, কেউ শান্ত, কেউ বাচাল প্রকৃতির, কেউ বা গম্ভীর প্রকৃতির।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত প্রভেদের বিশেষ তাৎপর্য আছে। বর্তমানে শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে ব্যক্তিগত সামর্থের ভিত্তিতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কাজেই আমাদের সামনে দুটি সমস্যা—সামর্থের পরিমাপ কিভাবে সম্ভব এবং ব্যক্তিগত সামর্থের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠন কি ভাবে সম্ভব। বর্তমানে আমরা দ্বিতীয় সমস্যা সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব।[1]

দুটি সমস্যা

২। ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রকারভেদ (Different Types of Individual Difference) :

ব্যক্তিগত বৈষম্যের বিষয়টির দিকে যদিও বিশেষ করে আধুনিক কালেই মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, তবু বিষয়টি খুবই প্রাচীন। প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌রা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের কথা যে স্বীকার করেছেন তার প্রমাণ আমরা পাই

1. প্রথম সমস্যা টি পরবর্তী স্তরে আলোচনা করা হবে।

প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রুশো প্রভৃতির রচনায়। প্লেটো মানুষকে তাদের মৌলিক বিভিন্নতা অনুযায়ী কয়েকটি দলে ভাগ করেছেন। গ্যাল্টন বংশগতির ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের বিষয়টি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। বৈজ্ঞানিক ক্যাটেল স্মৃতিশক্তি, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা প্রভৃতির ভিত্তিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। অ্যালফ্রেড জিন বুদ্ধির ভিত্তিতে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তালিকা নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের বিষয়টি প্রাচীন

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নিম্নোক্তরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে :

(ক) **দৈহিক গঠন** (Physical traits) : এই বৈষম্য নানারকম হতে পারে; যেমন—উচ্চতা বা ওজনের প্রভেদ, গায়ের রং বা মুখের গঠনের প্রভেদ, চেহারা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন জাতির দেহের গঠন বিভিন্ন প্রকার হয়। যেমন—ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়দের দৈহিক গঠনের পার্থক্য। দৈহিক শক্তির দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারও দৈহিক শক্তি বেশী, কারও কম। শক্তিমাপক যন্ত্র (Dynamometer)-এর সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশের শক্তি পরিমাপ করা যায়। মনোবিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এই শক্তির দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে। আবার ব্যক্তির কর্মক্ষমতার দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়, কারও কর্মক্ষমতা বেশী, কারও কম। কোন ব্যক্তি একটু হাঁটলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কেউ বা একনাগাড়ে দশ কিলোমিটার হাঁটতে পারে। আরগোগ্রাফ (Ergograph)-এর সাহায্যে মানুষের কর্মক্ষমতার পরিমাপ করে, কর্মক্ষমতার দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য নিরূপণ করা যায়।

দৈহিক গঠন

আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীরা দৈহিক প্রভেদের বিশেষ মূল্য দেন না। তবে একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সুস্থ সবল হলে মানুষের মন সতেজ ও কর্মপ্রবণ থাকে। অ্যাডলার (*Adler*) পরীক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন যে শারীরিক কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি, যেমন—বিকলাঙ্গ হওয়া কিংবা অন্য কোনও শরীরগত অপূর্ণতা থাকলে সে মানুষের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ (sense of inferiority) জন্মে থাকে। এর ফলে চারিত্রিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। কিংবা কোন কোন সময় আবার চারিত্রিক উন্নতিও ঘটতে পারে। দেহের একটি দিকের ত্রুটি পূরণ করার জন্য ব্যক্তি অপর কোন গুণের উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হয়।

(খ) **মানসিক গঠন** (Mental traits) : বুদ্ধি, বিশেষ সামর্থ বা ক্ষমতা, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি, ইন্দ্রিয়বোধের তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে

এই প্রভেদ দেখা দিতে পারে। প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যক্ষণের বিভিন্নতা অনুযায়ী মানুষকে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। যেমন কাউকে বিশ্লেষক প্রকৃতির (analyser)। আবার কাউকে সংশ্লেষক প্রকৃতির (synthesizer) বলা হয়। স্মরণ করার ক্ষমতার দিক থেকে, ধারণা গঠন করার দিক থেকে এবং অনুরাগের দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কল্পন প্রক্রিয়ার দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কারও কল্পন প্রক্রিয়া সৃজনাত্মক (creative), কারও বা গ্রহণাত্মক (receptive)। বিভিন্ন

মানসিক গঠন

ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধিবিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে নানা প্রকারের অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। বুদ্ধির এই পরিমাপকে বুদ্ধ্যাঙ্ক বা (*Intelligent Quotient*) বলে। সংক্ষেপে এটিকে *I. Q.* বলা হয়। যেসব মানুষ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের *I. Q.* বা বুদ্ধ্যাঙ্ক ৯০ থেকে ১০৯-এর মধ্যে ধরে নেওয়া হয়। যার *I. Q.* তার বেশী তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান, আর যার কম তাকে কম বুদ্ধিমান বলে ধরে নেওয়া হয়। কতকগুলি বিভিন্ন ধরনের মানুষের বুদ্ধ্যাঙ্ক নিয়ে দেখা গেছে যে শতকরা ৬০ জনের বুদ্ধি মাঝারি ধরনের অর্থাৎ তাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক ৯০ থেকে ১০৯ পর্যন্ত। শতকরা ২০ জন ক্ষীণবুদ্ধি (Feeble minded), যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক ৯০-এর থেকে কম এবং শতকরা ২০ জন উন্নত বুদ্ধিযুক্ত বা gifted এদের বুদ্ধ্যাঙ্ক ১০০ থেকে ১২০-এর মধ্যে। জড় বা নির্বোধের (Idiot) বুদ্ধ্যাঙ্ক ৬০-এরও নীচে; আর প্রতিভাবানদের (genius) বুদ্ধ্যাঙ্ক ১২০ থেকে ১৩০-এর মধ্যে।

সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধি ছাড়াও ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ মানসিক শক্তি (special ability) থাকে। বিশেষ মানসিক শক্তি বা সামর্থের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, কোন বিশেষ ছেলে বা মেয়ে সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধির পরীক্ষায় অত্যন্ত সাধারণ ফল বা খুব খারাপ ফল করলেও কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে, যেমন—চিত্রাংকনে বা সংগীতে বিশেষ মানসিক শক্তির দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—কারও মধ্যে সঙ্গীতের ক্ষমতা থাকে, আবার কারও মধ্যে চিত্রাংকনের ক্ষমতা থাকে।

ছাত্রদের বুদ্ধ্যাঙ্কের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় ক্লাসে পড়াতে গিয়ে শিক্ষকেরা সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের কথা চিন্তা করে পড়াতে থাকেন। তাঁরা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ও উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের অবহেলা করেন। এ দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

(গ) মানস-প্রকৃতিগত প্রভেদ (Temperamental Difference) : ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মানস-প্রকৃতিগত বা মেজাজগত প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—কেউ একটুতেই রেগে ওঠে, এরা হল খিটখিটে মেজাজের। আবার কেউ অনেক খোঁচালেও রাগে না, এরা হল শান্ত প্রকৃতির। কেউবা অল্প দুঃখেই অভিভূত হয়ে পড়ে, আবার কেউ বা সংযত থাকে।

(ঘ) নৈতিক চরিত্রগত প্রভেদ (Moral Differencc) : মানুষের মধ্যে নৈতিক চরিত্রগত পার্থক্য অত্যন্ত প্রবল, যেমন—কতকগুলি চারিত্রিক গুণ বা দোষ অর্থাৎ স্থৈর্য, ক্ষমাশীলতা, ঔদার্য, নিষ্ঠুরতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে উপস্থিত থাকে না।

(ঙ) স্বভাব অনুযায়ী বা **ব্যক্তিত্বের টাইপ অনুযায়ী প্রভেদ (Difference in personality types) :** মনোবিজ্ঞানী যুঙ (*Jung*) মানুষকে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপ (type) অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করেছেন—(১) অন্তর্মুখী (Introvert), (২) বহির্মুখী (Extrovert) এবং (৩) উভয়মুখী (Ambivert)। ক্রেৎসমার, সেলডন, স্প্রানগার, গ্যালেন, আইসেঙ্ক, জীংস্ক প্রমুখ মনোবিজ্ঞানিগণ মানুষকে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন টাইপ অনুযায়ী ভাগ করেছেন।

(চ) জাতিগত প্রভেদ (Racial and National Difference) : জাতিতে জাতিতে পার্থক্য দেখা যায়। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণ দৃষ্ট হয় যা এক জাতি থেকে অন্য জাতিকে প্রভেদ করে। তবে এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধিগত বা অন্যান্য গুণগত পার্থক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

(ছ) বংশগত প্রভেদ (Hereditary Difference) : প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী গ্যাল্টন (*Galton*) এ সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে বংশের প্রভাবের উপরই মানুষের চারিত্রিক গঠন নির্ভর করে, পরিবেশের কোন মূল্য নেই। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়, বংশগত প্রভাব ও পরিবেশগত প্রভাব দুই-ই প্রয়োজন।

(জ) পরিবেশগত প্রভেদ (Environmental Difference) : মানুষের জীবনে পরিবেশের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে দেখা যায়, অনেক সময় খুব মহৎ ব্যক্তির সন্তান দুর্নীতিপরায়ণ, আবার খুব চরিত্রহীন লোকেরও মহৎ চরিত্রের সন্তান হয়। অনেকের মতে মানুষের গুণগত পার্থক্যের কারণ হল পরিবেশ। কিন্তু পরিবেশকেই মানুষের গুণগত প্রভেদের একমাত্র কারণ বলে মনে করা

যায় না, বংশগতিরও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তবে অনুকূল পরিবেশে মানুষের সুপ্ত গুণগুলি বিকশিত হয় এবং প্রতিকূল পরিবেশ সুপ্ত গুণের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

(ঝ) কৃষ্টিগত প্রভেদ (Cultural Difference): সামাজিক পরিবেশের প্রভেদের জন্য কৃষ্টিগত প্রভেদ দেখা দেয়। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যক্তির মধ্যে কৃষ্টিগত প্রভেদ দেখা যায়। আবার এক ভারতেই নানান দেশের কৃষ্টিগত অর্থাৎ ভাবধারা, আচরণ ইত্যাদির মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

(ঞ) নারী ও পুরুষে প্রভেদ (Difference due to sex): নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তার কারণ তাদের দৈহিক গঠনের বৈষম্য, ভিন্ন স্বভাব ও চালচলনের প্রভেদ। বুদ্ধি ও কর্মকুশলতায় নারী পুরুষের থেকে হীন, এ সিদ্ধান্ত এখন আর সমর্থিত হয় না। বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্মকুশলতায় নারীরা এখন পুরুষদের সমান দক্ষতা দেখাচ্ছে। কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করার ব্যাপারে পুরুষদের দক্ষতা মেয়েদের তুলনায় বেশি প্রকাশ পায়, কিন্তু ভাষাগত সামর্থে মেয়েদের দক্ষতা বেশি। সাধারণ হিসেবে পুরুষরা বেশি দক্ষ, কিন্তু মেয়েদের স্মৃতিশক্তি পুরুষদের তুলনায় প্রখরতর। সাধারণ বুদ্ধির দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় না।

(ট) সমাজগত প্রভেদ (Social Difference): যে মানুষ শৈশব থেকে এক বিশেষ সমাজের আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়। সে সেই সমাজের আচার-ব্যবহার-পদ্ধতি প্রভৃতি শিক্ষা করে। ফলে, তার সঙ্গে অন্য সমাজের মানুষের এই কারণে প্রভেদ সৃষ্টি হয়। খুব ছোট শিশুদের মধ্যে এই সামাজিক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কোন কোন শিশু এতই ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির যে যখনই অন্য কোন পরিবারের ব্যক্তি তাদের পরিবারে আসে, তখনই তারা পালিয়ে বেড়ায়, আবার কোন কোন শিশু অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গেও বিনা সংকোচে বেশ বন্ধুত্ব করে নেয়।

(ঠ) আবেগগত প্রভেদ (Emotional Difference): মানুষের মধ্যে কারও স্নেহমমতা বোধ বেশী, কারও কম, কারও খুব তাড়াতাড়ি উত্তেজনা অনুভূত হয়। আবার কাউকে সহজে উত্তেজিত করা চলে না। কারও আবেগ এতই লঘু যে অল্পেতেই আবেগ উপস্থিত হয়, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। আবার কারও আবেগ দেরিতে এলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কেউ খুব সামান্য কারণেই ক্রুদ্ধ হন। আবার কেউ কেউ অত সহজে ক্রুদ্ধ হন না। কেউ ক্রুদ্ধ হলে অপরকে আঘাত করেন। আবার কেউ তর্কের মধ্যেই আচরণকে সীমিত রাখেন।

(ড) **মনোভাবের প্রভেদ** (Difference in attitude) : অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি মনোভাবের দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কেউ বা মনে করে সমাজের নিয়ম ভাল, কেউ বা মনে করে মন্দ। শিশুদের শিক্ষার প্রতি মনোভাব শিশুদের বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, গৃহ পরিবেশের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর। মাতাপিতার মধ্যে শিক্ষার প্রতি যদি সুস্থ মনোভাব থাকে তাহলে শিশুর মধ্যেও অনুরূপ মনোভাব দেখা দেবে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি খুব একটা সুস্থ মনোভাব নেই, সেহেতু তাদেব শিশুদেরও শিক্ষায় তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না।

(ঢ) **বিদ্যার্জনের সামর্থগত প্রভেদ** (Difference in achievement) : বিদ্যার্জনের সামর্থের ব্যাপারে শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ দেখা যায়। পড়া এবং অঙ্ক কষার ব্যাপারে এই পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আবার একই বুদ্ধ্যঙ্ক (*I. Q.*) সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিদ্যার্জন সামর্থের ব্যাপাবে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যদি শিশুর যোগ্যতা তার বুদ্ধ্যঙ্ক অনুযায়ী না হয তাহলে শিক্ষকের তার কারণ নির্ধারণ কবা উচিত। হয়ত দেখা যাবে শিশুর আগ্রহেব অভাবের জন্যই এরূপ ঘটেছে। আবার অনেক শিশু তাদের বুদ্ধির তুলনায় অধিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে। সুতরাং শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীর চাহিদার দিকে নজর রেখে শিক্ষা দেওয়া।

(ণ) **শিক্ষাগত প্রভেদ** (Educational Difference) : ব্যক্তি তার জীবন-যাত্রার প্রতিটি বৈচিত্র্যময় ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই বিচিত্র পরিবেশের প্রভাব দেখা দেয় ব্যক্তি-জীবনে। আর তা থেকে মানুষের কর্মরীতি, আচরণ ইত্যাদির মধ্যেও প্রভেদ দেখা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আচরণের ও অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কেউ বিদ্যালয়ের শেষ সোপানে পৌঁছতে পারে, কেউ বা পারে না। বিভিন্ন ব্যক্তি শিক্ষার বিভিন্ন পথ বেছে নেয়, যেমন—কেউ চিকিৎসাবিদ্যা শেখে, কেউ আইন বিদ্যা শেখে, কেউ বা শিল্প, কেউ বা সাহিত্য আবার কেউ বা কারিগরীবিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ করে। এই প্রভেদ থেকেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা দেয়।

বর্তমানে সব সভ্য সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা এমন সুন্দরভাবে গঠন করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক নাগরিক তার ইচ্ছামত, ক্ষমতা অনুযায়ী, নিজের রুচি অনুযায়ী শিক্ষণীয় বিষয়টি নির্বাচন করতে পারবে ও ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে পারবে।

৩। ব্যক্তিগত বৈষম্যের স্বরূপ (Nature of individual differences) :

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ থাকার জন্যই আমরা শিশুদের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের বিষয়টিতে অপরের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বর্তমান যুগে আমরা এই অভিমতই পোষণ করি যে, আগ্রহ এবং সামর্থের ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তির নিজ বৃত্তি নির্বাচন করা উচিত এবং যেহেতু বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামর্থ, প্রবণতা, অনুরাগ প্রভৃতির ব্যাপারে প্রভেদ বর্তমান সেহেতু বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে যথাযথ নির্দেশ দেবার প্রয়োজনও আছে।

শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে তত্ত্বাবধান

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের ব্যাপারে দুটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি বিষয় হল, স্বাভাবিকতা এবং পরিবর্তনশীলতা। যখন একদল ছেলের মধ্যে কোন একটি প্রলক্ষণ বা সামর্থের পরিমাপ করা হয়, তখন একদিকে যেমন সে ব্যাপারে দলের অন্তর্ভুক্ত ছেলেদের মধ্যে পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়, তেমনি স্বাভাবিকতাও দেখা যায়। ধরা যাক কর্মকুশলতা। দেখা গেল, দলের ছেলেদের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ছেলের কর্মকুশলতার মান প্রায় এক, আর ২০ ভাগের মধ্যে কর্মকুশলতা স্বাভাবিক হারে কম বা বেশী।

স্বাভাবিকতা ও পরিবর্তনশীলতা

ব্যক্তির শিখনের উন্নতি ও বিকাশের উপরও এই ব্যক্তিগত বৈষম্য নির্ভর করে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন শিখনের সামর্থের দিক থেকে প্রভেদ থাকে, তেমনি শিখনের উন্নতির ব্যাপারেও প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়।

শিখনের উন্নতির ব্যাপারে প্রভেদ

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল কোন একটি ব্যাপারে পার্থক্য অন্য ব্যাপারেও পার্থক্যের সৃষ্টি করে। যেমন, কোন ছাত্রের বুদ্ধ্যাঙ্ক যদি অপরের তুলনায় কম হয় তাহলে তার বিদ্যা অর্জনের কুশলতাও অপরের তুলনায় কম হবে। ফলে শুধু বুদ্ধির ব্যাপারে নয়, শিক্ষাগ্রহণ-ক্ষমতার ব্যাপারেও অপরের সঙ্গে তার পার্থক্য দেখা যাবে।

এক বিষয়ে প্রভেদ অন্য বিষয়ে প্রভেদের সৃষ্টি করে

বংশগত ও পরিবেশগত কারণেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন ধরনের বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই জগতে জন্মগ্রহণ করে, যা তার ব্যক্তিগত সামর্থ নির্ধারিত করে; ফলে, বংশগত কারণের জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা দেয়। আবার বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, তার ফলে জীবদ্দশায় যেসব বৈশিষ্ট্য সে অর্জন করে সেগুলি অপর শিশুদের থেকে পৃথক হয়।

বংশগত ও পরিবেশগত কারণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ

৪। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তাৎপর্য (Educational significance of Individual difference) :

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, যাকে অবহেলা করলে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। যদিও শিশুদের দলবদ্ধ করে, এক একটা শ্রেণীতে ভাগ করে শিক্ষা দেওয়ার সাধারণ রীতি প্রায় সর্বত্রই অবলম্বন করা হয়, তবু শিক্ষা দেবার সময় আমাদের লক্ষ্য থাকে প্রতিটি শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়া, তার সুপ্ত গুণের বিকাশ সাধন করা, তার সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের সংগঠনের চেষ্টা করা। দলভুক্ত বা শ্রেণীবদ্ধ করে শিক্ষা দিলেও কোন দল বা শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শ্রেণীভুক্ত প্রতিটি শিশুকেই শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। কাজেই শিক্ষা দেবার সময় বুদ্ধি, যোগ্যতা, রুচি, প্রবণতা, সামর্থ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে শিশুতে শিশুতে যে পার্থক্য তার কথা বিস্মৃত হয়ে শিক্ষাদান করলে, সে শিক্ষাদান কখনই সার্থক হতে পারে না। যে শিশুর দক্ষতা ভাষায়, গণিতে নয়, তাকে যদি গণিতে পারদর্শী এমন কয়েকটি ছেলের সঙ্গে দলভুক্ত করে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তার অক্ষমতার জন্য তাকে বিদ্রূপ করা হয় তাহলে সে শিশুর মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জাগবে এবং তার মানসিক বিকাশ কখনও সম্পূর্ণ হবে না। কাজেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেবার সময় শিশুতে শিশুতে ব্যক্তিগত প্রভেদের কথা স্মরণ রেখে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। একথা ঠিক যে প্রতিটি ছাত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ, রুচি, প্রবণতা এবং চাহিদার কথা চিন্তা না করে সবাইকে এক দলভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়াও কোন যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি নয়: এই উভয় সমস্যার মধ্যে সঙ্গতি বিধান করে শিক্ষাব্যবস্থাকে কিভাবে সংগঠিত করা যায়, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীরা তারই কথা চিন্তা করেছেন। এ কাজ খুব সোজা নয়। এ ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ; এর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

দলভুক্ত করে শিক্ষা দিলেও আমরা ব্যক্তি-শিশুকেই শিক্ষা দিই

এক দলভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া সব ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়

(১) শিক্ষার্থীর যোগ্যতা (ability) পরিমাপের জন্য নির্ভরযোগ্য অভীক্ষার ব্যবস্থা করা। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত ধারণা করতে না পারলে তার সার্থক শিক্ষার জন্য কি সুযোগ দেওয়া যেতে পারে তা নিধারণ করা যাবে না।

(২) যোগ্যতা নিরূপিত হবার পর তার যোগ্যতানুসারে তাকে সুযোগ দিতে হবে যাতে সে শিক্ষায় সফলতা অর্জন করতে পারে।

(৩) শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও আগ্রহ অনুযায়ী তার পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে, চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম হয় যদি তাকে তার আগ্রহ ও শক্তি অনুযায়ী তার সুপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া হয়। যে বিষয়ে তার আগ্রহ সে বিষয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তাকে দিতে হবে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

(৪) যে পরিবেশে শিক্ষার্থী তার জন্মগত ক্ষমতাকে বিকশিত করতে সমর্থ হবে, সেই পরিবেশে শিক্ষার সুযোগ শিক্ষার্থীকে দিতে হবে।

(৫) ব্যক্তিগত তারতম্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে আগ্রহ ভরে শিক্ষা দেবে এমন উপযুক্ত শিক্ষককে শিক্ষাকার্যে নিয়োগ করতে হবে।

(৬) যথাযথ প্ররোচকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সঞ্চারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথা বিবেচনা করে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। যেসব শিক্ষার্থী নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী সবচেয়ে অধিক ফল দেখাতে পারবে তাদের পুরস্কৃত কবতে হবে। এই ব্যবস্থায় যারা যোগ্যতম কেবল যে তারাই পুরস্কার লাভের সুযোগ পাবে তা নয়, প্রতিটি শিক্ষার্থী যথাসাধ্য ও আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করার জন্য পুরস্কার লাভ করার সুযোগ পাবে।

(৮) একই বিষয়ে আগ্রহ থাকলেও শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। দশটি উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে যদি একটি ক্ষীণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে, শেষোক্ত ছেলেটি অনেক পিছিয়ে পড়বে এবং অন্য ছাত্রদের সঙ্গে সমান তালে তাকে চালনার চেষ্টা করে বিশেষ সুফল লাভ করা যাবে না। আবার দশটি ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রের সঙ্গে যদি একটি প্রতিভাবান ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে প্রতিভাবান ছাত্রটির বুদ্ধির সম্যক বিকাশ কখনই ঘটবে না; তার শক্তি সামর্থের অপচয় ঘটবে।

(৯) অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাধারণ ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা না দিয়ে পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে হবে, তাহলেই তাদের শক্তি ও সামর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

(১০) বুদ্ধি ছাড়াও মানসিক, প্রকৃতিগত ও আবেগগত প্রভেদের কথা স্মরণ রেখে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের অনুভূতি, আবেগ প্রভৃতি শিক্ষাদানের সংগে বিবেচনা করা চাই।

(১১) বুদ্ধিগত যোগ্যতা ছাড়াও কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতাকেও শিক্ষা-ব্যবস্থায় মর্যাদা দিতে হবে। সব ছাত্রেরই যে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল এবং অঙ্কে আগ্রহ থাকবে এমন কোন কথা নেই। কারও বা হাতের কাজে, কারও বা চিত্রাঙ্কনে, কারও বা সঙ্গীতে অনুরাগ থাকতে পারে। শিক্ষার্থীকে তার যথাযথ অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে।

(১২) বিদ্যালয়ে দলগত শিক্ষা ব্যবস্থায়, দল গঠনের সময় সম-প্রকৃতি বিশিষ্ট (homogeneous) দল গঠন করাই যুক্তিযুক্ত হবে। এই ব্যবস্থায় উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন, মধ্যমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সম-প্রকৃতি বিশিষ্ট শ্রেণী গঠনের বিরোধিতা করেছেন ভিন্ন-প্রকৃতি বিশিষ্ট (heterogeneous) শ্রেণী গঠনের সমর্থকবৃন্দরা। তাঁদের বক্তব্য যে, যদি উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের থেকে পৃথক করে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে শেষোক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের অনুকরণ করে প্রেরণালাভের সুযোগ পাবে না, ফলে তাদের শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হবে। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় একটি বিশেষ শ্রেণীকক্ষে উৎকর্ষগত মর্যাদা দেওয়া হয়। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কাছে থেকে প্রেরণালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

তবু শারীরিক, সামাজিক ও আবেগগত পার্থক্যের কথা বিবেচনা করে সম-প্রকৃতিক শ্রেণী গঠন যুক্তিযুক্ত। প্রতিটি শ্রেণীকে বোঝাতে হবে যে, কোন বিশেষ শ্রেণীকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া এই শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য নয়।

(১৩) অস্বাভাবিক ধরনের শিশু, পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর ছেলে অর্থাৎ যাদের সাফল্যাঙ্ক ৭০ থেকে ৮৫-এর মধ্যে এবং অন্ধ, খঞ্জ, বোবা প্রভৃতি শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন শিশু এবং প্রতিভাবান শিশুদের স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৪) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের কথা বিবেচনা করে প্রয়োজনমত শিক্ষা-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া ছেলেদের পড়াবার জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, প্রতিভাবান ছেলেদের পড়াবার জন্ম অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা সমীচীন নয়। পিছিয়ে পড়া ছেলেদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করতে পারে এমন পদ্ধতি অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত।

পূর্বে সাহিত্য, ভাষা এবং কয়েকটি বিমূর্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হত না। ফলে খুব অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়েই শিক্ষায়

পারদর্শিতা দেখাতে পারত। কিন্তু শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করার ফলে সাহিত্যধর্মী বিষয়গুলি ছাড়াও যন্ত্রশিল্প, পূর্তশিল্প, কারিগরী বিদ্যা, অঙ্কন, সঙ্গীত বাণিজ্যবিদ্যা প্রভৃতিকে শিক্ষার পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ রুচি, শিখন-ক্ষমতা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। বস্তুতঃ, এই কারণেই একই ধরনের সাহিত্যধর্মী পাঠক্রমের পরিবর্তে বহুমুখী পাঠক্রম পৃথিবীর সব সভ্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়েছে।

৫। বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতি (Principle of Individual Difference and Vocational Guidance) :

বৃত্তি-নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতির যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। বৃত্তি বলতে আমরা বুঝি কোন বিশেষ কাজ বা বিশেষ ধরনের জীবিকা যা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে ব্যক্তি জীবন ধারণ করতে পারে। ব্যক্তির এমন একটি বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত যা তার পক্ষে উপযুক্ত অর্থাৎ যা সে আপন দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা দ্বারা যথাযথ ভাবে সমাধা করতে পারে এবং কর্মসম্পাদন দ্বারা কাজের তৃপ্তি (job satisfaction) লাভ করতে পারে। যদি এই দুটি বিষয়ের একত্র সংযোগ ঘটে তবেই মনে করতে হবে যে ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচন সঙ্গত হয়েছে। ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচনে যদি সঙ্গতি না থাকে তাহলে ব্যক্তির নিজের বৃত্তিমূলক জীবন যেমন হতাশায় ভরে ওঠে তেমনি নিয়োগকর্তার মধ্যেও দেখা দেয় বিরক্তি ও হতাশা। বৃত্তি নির্বাচন সঙ্গত না হওয়ার জন্য ব্যক্তি নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তেমনি নিয়োগকর্তাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচন যদি সঙ্গত হয় তাহলে ব্যক্তির বৃত্তিমূলক জীবন ব্যক্তিকে তৃপ্তি দান করে এবং নিয়োগকর্তার প্রতিও ব্যক্তি সুবিচার করতে সক্ষম হয়।

বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন বৃত্তির জন্য বিভিন্ন বুদ্ধ্যঙ্কের কর্মী প্রয়োজন। ব্যক্তির বুদ্ধিগত সামর্থ তাই বৃত্তি-নির্বাচনে অপরিহার্য। তাছাড়া যে জীবিকাই আমরা গ্রহণ করি না কেন তাতে আমাদের আগ্রহ বা অনুরাগ আছে কিনা তাও বিচার্য। জীবিকায় অনুরাগ না থাকলে কিছুদিন পরই কাজে বিরক্তি, অবসাদ ও ক্রমবর্ধমান অসন্তুষ্টি দেখা দেবে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য আমরা লক্ষ্য করি, সে অনুসারে আমাদের বৃত্তি নির্বাচন করা উচিত। তা না হলে জীবিকার সঙ্গে আমাদের জীবনের সঙ্গতিবিধান হবে না। কোন কোন বৃত্তিতে উচ্চমানের বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির আবশ্যক হয় যেমন আইনবিদ্যা, শিক্ষকতা, শাসন সংক্রান্ত কাজ, সংবাদপত্র সম্পাদনা, চিকিৎসা ইত্যাদি। আবার কোন কোন বৃত্তিতে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়। যেমন

যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কাজে, কলকারখানার সাধারণ শ্রমিকের কাজে, মৃৎশিল্পে, ভাস্কর্যে, বয়নশিল্পে, গৃহনির্মাণে ইত্যাদি। যাদের বুদ্ধির মান কম, তাদের জটিল ও সূক্ষ্ম কাজে নিযুক্ত করলে কাজে সুফল পাওয়া যাবে না। কাজেই বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে যদি ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচিত হয় তাহলেই বৃত্তি নির্বাচনে সঙ্গতি দেখা দেয়। তাছাড়া কোন কোন বৃত্তির পক্ষে একটা বিশেষ ধরনের মানসিক প্রকৃতির আবশ্যকতা দেখা দেয়। যে কাজে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন সে কাজে ক্ষীণ বা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত নয়, যে কাজে প্রচুর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে কাজে চপলমতি ব্যক্তিকে গ্রহণ করা উচিত নয়। উদ্দীপকের উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়া ঘটার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধানকে প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction Time) বলে। ব্যক্তিভেদে প্রতিক্রিয়া কালের তারতম্য ঘটে। একই উদ্দীপক যখন বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন দেখা যায় বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কাল বিভিন্ন রকমের। কারও বেশী, কারও কম। যে সব বৃত্তিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া করার দরকার। যেমন, হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষা, সেখানে যদি এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় যার প্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ। তাহলে সুফল পাওয়া যাবে না।

ব্যক্তির প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বৈষম্য বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে প্রভাব বিস্তার করে। বুদ্ধিগত, মানসিক শক্তিগত সামর্থ থাকা সত্ত্বেও প্রক্ষোভগত ও সামাজিক বৈষম্যের ফলে ব্যক্তি বৃত্তিমূলক সঙ্গতি লাভ করতে পারে না। এ জন্য আধুনিক শিক্ষায় প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক পরিচালনার বা নির্দেশদানের (vocational guidance) গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্যক্তির পরিমাপ

(Assesment of Individuals)

১। ব্যক্তির পরিমাপ বলতে কি বুঝি? (What is Assesment of Individuals) ঃ

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই ব্যক্তিকে পরিমাপ করার বা ব্যক্তিগত বৈষম্য যাচাই করার কোন-না-কোন পন্থা অনুসৃত হয়ে আসছে। অতীতে ব্যক্তির চেহারা, চালচলন, কর্মশক্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিকে পরিমাপ করা হত। বলা বাহুল্য, এ ধরনের পরিমাপক প্রণালী অনেক সময়ই যুক্তিসিদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যক্তির পরিমাপ করার কোন কৌশল প্রাচীন কালে আমাদের জানা ছিল না। ইদানীং কালে বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে নানা ধরনের পরিমাপ প্রণালী এবং তার সহায়ক সাধিত্র বা যন্ত্রপাতি (instrument) আবিষ্কৃত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'পরিমাপ' বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণতঃ 'পরিমাপ' বলতে আমরা বুঝি কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা, অন্য বস্তুর তুলনায় ঐ বস্তুটি বৃহৎ না ক্ষুদ্র ইত্যাদি বিবেচনা করা। ঐ সাধারণ কথাটি যে কোন বস্তু বা বিষয়কে পরিমাপ করার ব্যাপারেও প্রযোজ্য। এক বস্তা চাল বা কোন ছাত্রের কৃতিত্বকে পরিমাপ করতে হলে আমরা এভাবে পরিমাণই নির্ধারণ করি। চালের ওজন কিলোতে (Kilo) আর ছাত্রের কৃতিত্ব নম্বরে (marks) প্রকাশ করি।

থর্নডাইক বলেন: যাহা অস্তিত্বশীল, তার কোন একটা পরিমাণ আছে এবং পরিমাণযুক্ত অস্তিত্বকে পরিমাপ করা যায়।[1] অর্থাৎ যে বস্তুর পরিমাণ রয়েছে সে বস্তুকেই আমরা পরিমাপ করতে পারি। মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধি, সামর্থ ইত্যাদি বিষয়কেও আমরা এজন্য পরিমাপ করতে পারি। অবশ্য যেভাবে সহজে আমরা এক বস্তা চাল বা ডাল ওজন করতে পারি, ব্যক্তির গুণাবলীকে তত সহজে পরিমাপ করা যায় না। ব্যক্তির পরিমাপে প্রয়োজন খুব-সূক্ষ্ম কলাকৌশল, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, পরিমাপকারী ব্যক্তির দক্ষতা এবং যে গুণকে পরিমাপ করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তার সঠিক জ্ঞান।

---

1. "Any thing that exists at all exists in some quality, and anything that exists in quantity is capable of being measured."—Thorndike.

আমরা ব্যক্তির কি পরিমাপ করি ? ব্যক্তির পরিমাপ বলতে মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তির দৈহিক ওজন আমরা বুঝি না। ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ ব্যাখ্যা করার জন্য সময় বিশেষে ব্যক্তির ওজন পরিমাপের হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু ব্যক্তির দৈহিক ওজনের সঙ্গে মানসিক গুণাবলীর কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। আমরা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মানসিক গুণাবলী, তার গ্রহণক্ষমতা, সামর্থ, বুদ্ধি ইত্যাদি পরিমাপ করি।

ব্যক্তির পরিমাপকে আমরা নিম্নোক্তভাবে ভাগ করতে পারি, যথা—(১) কৃতিত্বের পরীক্ষা (Achievement test), (২) প্রবণতা পরীক্ষা (Aptitude test), (৩) আগ্রহের বর্ণনামূলক তালিকা (Interest inventory), (৪) চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা (Character and Personality test), এবং (৫) বুদ্ধি-পরীক্ষা (Intelligence test)।

(১) কৃতিত্বের পরীক্ষা (Achievement test) : এ পরীক্ষায় পরীক্ষণ পাত্রের কোন কাজের সাফল্যের তুলনামূলক বিচার করা হয়। সাধারণতঃ দুই ধরনের কৃতিত্বমূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথমটিকে বলা হয় সাধারণ কৃতিত্বের পরীক্ষা (General achievement test)। এ পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষণ পাত্রের কাজের সমগ্র ক্ষেত্রকে বিচার করা হয় এবং কৃতিত্বসূচক নম্বর প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ত্রুটি-নির্ণায়ক পরীক্ষা (Diagnostic test)। এ পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষণ পাত্রের এক বা একাধিক কাজের পরীক্ষা করে পরীক্ষণ পাত্রের ত্রুটি বা দুর্বলতা স্থির করা হয়। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এ ধরনের পরীক্ষা খুবই প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ বা শিক্ষকের শিক্ষাদান সার্থক হচ্ছে কিনা তা এই পরীক্ষার সাহায্যেই নির্ধারণ করা যায়।

কৃতিত্বের পরীক্ষাকে আমরা নিম্নোক্তরূপ গ্রহণ করতে পারি :

(ক) মৌখিক পরীক্ষা (Oral test) : শিক্ষার্থী বা পরীক্ষণ পাত্রকে অনেক সময় মৌখিকভাবে প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। লঘু সমস্যা সমাধানের জন্য পরীক্ষণ পাত্রের কৃতিত্ব যাচাই করতে অনেক সময় মৌখিক জবাবই যথেষ্ট।

(খ) রচনামূলক পরীক্ষা (Essay type test) : রচনামূলক পরীক্ষা নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করছি : (পৃঃ ৪২৫)

(গ) বিষয়াত্মক পরীক্ষা (Objective test) : এ সম্বন্ধেও পরবর্তী স্তরে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

(ঘ) কৃতি পরীক্ষা (Performance test) : এ ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষণ পাত্রকে কোন প্রশ্নের জবাব কাগজে লিখতে হয় না, কিন্তু পরীক্ষকের নির্দেশমত

বিশেষ বিশেষ যন্ত্রপাতি পরিচালনা করতে হয়। মনোবিজ্ঞানী সেগুঁইর (*Seguin*)-র তৈরি ফর্মবোর্ড অভীক্ষা, হিলির চিত্র-সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Healy Picture Completion test), হিলির পাজল (Healy Puzzle) অভীক্ষা, নক্স কিউব টেষ্ট (Knox Cube test), পোর্টিয়াস আবিষ্কৃত পোর্টিয়াস মেজ টেষ্ট (Porteus Maze Test), কোহস্ ব্লক ডিজাইন (Kohs Block Design) আলেকজাণ্ডারের প্যাস এ্যালংগ (Pass Along) অভীক্ষা, মানবমূর্তির অভীক্ষা (Manikin test), গুড-এনাফের মানুষ আকার অভীক্ষা (Goodenough's Man Drawing Test) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কৃতি পরীক্ষার উদাহরণ।

(২) **প্রবণতা পরীক্ষা** (Aptitude test): অনেক সময় দেখা যায় যে পরীক্ষণ পাত্রের বুদ্ধি পরীক্ষার দ্বারা অন্যান্য কোন কর্মসম্পাদন বা বিশেষ কোন বিষয়ে (অর্থাৎ সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি) পরীক্ষণ পাত্রের ঝোঁক বা প্রবণতা পরীক্ষা করা যায় না। কোন যন্ত্রের কাজে (mechanical work) দক্ষতা বা সঙ্গীতে দক্ষতা যাচাই করার জন্য এ ধরনের পরীক্ষা গৃহীত হয়। সৈন্যবিভাগের লোক নিয়োগ ও পদোন্নতির ব্যাপারে এ পরীক্ষা খুব সহায়ক। যান্ত্রিক দক্ষতার পরীক্ষার জন্য ষ্টেনকুইষ্ট মেকানিকাল টেষ্ট (Stenquist Mechanical Test), সঙ্গীতপ্রবণতা পরীক্ষা করার জন্য সিসোর মিউজিক্যাল এবিলিটি টেষ্ট (Seashore Musical Ability Test), ভাষাবোধ, সংখ্যা ব্যবহার, স্মৃতি প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য থার্ষ্টোনের প্রাথমিক শক্তি অভীক্ষা (Thrustone's Primary Ability Test), সাইকোলজিকাল কর্পোরেশনের (Psychological Corporation) তৈরী পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা (Differential Aptitude Test or DAT), যুক্তরাষ্ট্রের জননিয়োগ বিভাগের তৈরি জেনারেল এ্যাপটিটিউড টেষ্ট ব্যাটারি (General Aptitude Test Battery or GATB), বিশেষ প্রবণতার অভীক্ষা, যেমন ইন্দ্রিয়মূলক দক্ষতার অভীক্ষা, দর্শনমূলক অভীক্ষা, শ্রবণমূলক অভীক্ষা, সঞ্চালনমূলক দক্ষতার অভীক্ষা (Motor Dexterity) প্রভৃতি প্রবণতা পরীক্ষা সম্পর্কীয় উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা। কেণ্ট শ্যাকো (*Kent shakow*)-র শিল্পমূলক ফর্মবোর্ড (Industrial Form Board), ম্যাক্‌কোয়ারী (*Macquarrie*)-র যান্ত্রিক দক্ষতার অভীক্ষা, মিনেসোটা (*Minnesota*) র মেকানিকাল এ্যাসেম্বেলী টেষ্ট প্রভৃতি যান্ত্রিক দক্ষতা পরিমাপের উন্নত ধরনের অভীক্ষা। করণিক দক্ষতা (Clerical Aptitudes) পরিমাপের অভীক্ষা হিসেবে মিনেসোটা ক্লারিকাল টেষ্ট (Minnesota Clerical Test), জেনারেল ক্লারিকাল টেষ্ট (General Clerical Test or GCT) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অভীক্ষা।

(৩) **আগ্রহের বর্ণনামূলক তালিকা** (Interest inventory) : এ ধরনের পরীক্ষা দ্বারা কোন বিষয়ে পরীক্ষণ পাত্রের আগ্রহকে সেই বিষয়ে যারা সফলতা অর্জন করেছে তাদের আগ্রহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। আগ্রহের এ ধরনের তুলনা থেকে বোঝা যায় পরীক্ষণ পাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ ধরনের জীবিকার উপযোগী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আগ্রহ পরীক্ষা, আসলে পরীক্ষা নয়, উহা তুলনামূলক বিচার মাত্র। এতে আগ্রহের কোন পরিমাণ নির্ধারিত হয় না। অর্থাৎ কোন পরীক্ষণ পাত্র যদি কোন বিশেষ বিষয়ে প্রচুর আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এতে তার দক্ষতা থাকে, আর ঐ একই বিষয়ে যদি কোন বৈজ্ঞানিকও সমানভাবে আগ্রহ ও দক্ষতা প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে আমরা বলতে পারি ভবিষ্যৎ জীবনে আমাদের পরীক্ষণ পাত্র বৈজ্ঞানিক হবে।

সোজাসুজি শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করে এবং তার উত্তরের সাহায্যে আগ্রহ পরিমাপ না করে, পরোক্ষভাবে তার আগ্রহ পরিমাপের জন্য অনেক অভীক্ষা রচিত হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী ই. কে. ষ্ট্রং (*E. K. Strong*)-র ভোকেশানাল ইণ্টারেষ্ট ব্লাঙ্ক (Vocational Interest Blank বা VIB) আগ্রহ পরিমাপের ব্যাপারে একটি উল্লেখ-যোগ্য অভীক্ষা। এই অভীক্ষাটির দুটি বৈশিষ্ট্য—প্রথমতঃ, এই অভীক্ষা থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু, কার্য সম্পর্কে পরীক্ষণ পাত্রের পছন্দ অপছন্দ জানা যায়। আর দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি অনুযায়ী উত্তরগুলির শ্রেণীবিভাগ যার থেকে জানা যায় যে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহের দিক থেকে সাদৃশ্য বর্তমান।

আগ্রহ পরিমাপের ব্যাপারে কুডার প্রেফারেন্স রেকর্ড (*Kuder Preference Record*) আর একটি উল্লেখযোগ্য অভীক্ষা। এই অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য হল যে, বিশেষ কোন বৃত্তিতে আগ্রহ পরিমাপ না করে কতকগুলি ব্যাপক ক্ষেত্রে ব্যক্তির আগ্রহ এই অভীক্ষাতে পরিমাপ করা হয়। এ ছাড়াও আগ্রহ পরিমাপ করার জন্য আরও কিছু কিছু অভীক্ষা তৈরি করা হয়েছে, যেমন থার্ষ্টোন ইণ্টারেষ্ট শিডিউল (Thurstone Interest Schedule), গিলফোর্ড-স্নিডম্যান-জিমারম্যান ইণ্টারেষ্ট সার্ভে (Guildford Sneidman-Zimmerman Interest Survey) প্রভৃতি।

(৪) **চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা** (Character and Personality test) : এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

(৫) **বুদ্ধি পরীক্ষা** (Intelligence test) : এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

২। বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা (Different Types of Examination) :

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত গুণ বা ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত উন্নতির পরিমাপক হিসেবে নানা ধরনের পরীক্ষা নানা ভাবে গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষাকে আমরা রচনামূলক (essay) বা বিষয়াত্মক (objective) এই দু'ভাগে ভাগ করেছি। বিষয়াত্মক পরীক্ষাগুলির মধ্যে আবার নানা শ্রেণীর পরীক্ষা-পদ্ধতি আছে। এগুলির প্রচলন খুব বেশি দিন ধরে হয় নি এবং এখনও এদের প্রয়োগ ও গঠন সম্বন্ধে নতুন নতুন গবেষণার ফল বেরুচ্ছে। এজন্য এগুলোকে নতুন ধরনের অভীক্ষা (New-Type test) বলা হয়। এগুলির বহুল প্রচলিত একটি পরীক্ষা হল আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test)। আবার যদি পরীক্ষার্থী মুখে মুখে প্রশ্নের জবাব দেয় তবে তাকে মৌখিক পরীক্ষা (Oral Test) বলে। পরীক্ষাকে অনেক সময় যোগ্যতা বৃদ্ধির পরীক্ষা (Qualifying Test) এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (Competitive Test) – এ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যোগ্যতা বৃদ্ধির পরীক্ষা বলতে বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যান্য কোন সংস্থার দ্বারা গৃহীত পরীক্ষা বোঝায়। এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থী যে শিক্ষা গ্রহণ করছে তার পরিমাপ করা হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর বৃত্তিগত (vocational) যোগ্যতার পরিমাপ বোঝায়। যাঁরা শিক্ষার্থীকে কোন কাজ বা বৃত্তি (vocation) বা পেশাতে নিয়োগ করবেন তারাই তাঁদের উদ্দেশ্য অনুসারে এ পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এই গেল পরীক্ষার প্রকারভেদ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয়।

এছাড়া পরীক্ষাগ্রহণকারী ভেদে পরীক্ষাকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়— আন্তর বা অভ্যন্তরীণ (internal) এবং বহিঃস্থ (external) পরীক্ষা। প্রতি বিদ্যালয়েই অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রচলন আছে। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা বা শিক্ষকের শিক্ষাদান এগিয়ে চলেছে কিনা, এ সব নির্ণয় করার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা তাদের মনোনীত শিক্ষকগণ এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকেন। বহিঃস্থ পরীক্ষা বিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুত প্রশ্নপত্রের দ্বারা শিক্ষার্থীর যোগ্যতা নির্ণয়ের ব্যবস্থা। এই বহিঃস্থ পরীক্ষাই সাধারণী পরীক্ষা (Public Examination) বলে অভিহিত হয়েছে। আন্তর পরীক্ষার বিশেষ কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। সাধারণী বা বহিঃস্থ পরীক্ষাকেই রাষ্ট্র বা সমাজ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ

অভিজ্ঞানপত্র (certificate) বা পদবী (degree) দেওয়া হয়। এগুলোর একটি সামাজিক মানও (standard) রয়েছে।

পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose of taking an Examination): (১) পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়। শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের শিক্ষাদানই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল, যে বিশেষ পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে তাকে শিক্ষাপ্রদান করা হচ্ছে, সে তা যথাযথ গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা তার পরিমাপ করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

(২) শিক্ষার্থীর কোথায় কোন্ ত্রুটি হয়েছে বা সে কেন পিছনে পড়ে আছে তা পরীক্ষার মাধ্যমেই ধরা পড়ে। শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে কিনা বা তার ত্রুটির কারণ কি—এসব নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় পরীক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার ব্যর্থতার কারণ নির্ধারণ (diagnosis) করা যায়। কিভাবে শিক্ষার্থী তার ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারে এজন্য শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ই সচেষ্ট হতে পারেন।

(৩) শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষা গ্রহণ পরিচালনা করা, তার ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনে সহায়তা করাও (Prognosis) পরীক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনে কি ধরনের দায়িত্ব নিতে পারবে, কোন্ বৃত্তি গ্রহণ তার পক্ষে উপযুক্ত হবে ইত্যাদিও পরীক্ষার মাধ্যমে স্থির করা যায়।

(৪) পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যে শুধু শিক্ষার্থীর শিখনের পরিমাপ করা যায় তা নয়, অনেক সময় শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতারও বিচার করা হয়। যদিও শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণে অক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষকের অযোগ্যতার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, তবুও শিক্ষকের শিক্ষাদানের সার্থকতার পরিচয় বহন করে পরীক্ষার্থীর সাফল্য।

(৫) পরীক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টি করে, ইহা অনেক সময় একটি কৃত্রিম উদ্‌বোধকের (artificial incentive) কাজ করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীকে সমাপ্ত করতে হবে, এ ধরনের একটি তাড়না শিক্ষার্থী অনুভব করে। শিক্ষার্থীর বিক্ষিপ্ত মনের উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা এক ধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) রূপে কাজ করে।

(৬) পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের পরিমাপই শুধু হয় না, পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর অন্যান্য গুণের পরিমাপও হয়। যে শিক্ষার্থী পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছে বা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে সে যে শুধু পাঠ্যসূচীর বিষয়গুলোই অধ্যয়ন করেছে তা নয়, পাঠ্যসূচীর বাইরেও অন্যান্য বিষয়ের সে অনুশীলন করেছে এবং তার পেছনে

শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিয়মানুবর্তিতা, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ রয়েছে। অর্থাৎ পরীক্ষার মাধ্যমে কেবল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ হয় না, এর সঙ্গে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত অন্যান্য মানসিক গুণাবলীরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Conventional Essay-Type Examination) :

রচনামূলক (essay-type) পরীক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি? রচনামূলক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়, তার মধ্যে একাধিক প্রশ্ন থাকে। শিক্ষার্থী যথাসম্ভব নিজ ভাষায় এই প্রশ্ন বা প্রশ্ন সমষ্টির জবাব দেয়। সিমৃস (*Sims*) রচনামূলক পরীক্ষা সম্বন্ধে বলেন : রচনামূলক পরীক্ষার যে সমস্যাধর্মী পরিস্থিতি থাকে, অধিকতর স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থী তার উত্তর লিখতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর মানসিক অভিজ্ঞতার গঠন, গতিশীলতা এবং ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। এই আলোচনা থেকে রচনামূলক পরীক্ষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে: (ক) পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নের জবাব লিখতে তার নিজস্ব মতামতের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।[1] (খ) সম্পূর্ণ এবং যথাযথ হিসেবে এসব প্রশ্নের একটি মাত্র জবাব নেই, এমনকি বিশেষজ্ঞরাও ঠিক করে দিতে পারে না।[2] (গ) বিভিন্ন গুণ ও কৃতিত্বের তারতম্যের দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।[3]

রচনামূলক পরীক্ষার সুবিধা (Advantages of Essay-Type Examination) : (১) প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার প্রধান সুবিধা হল, শিক্ষার্থীর অধীত পাঠ্যসূচীর বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ করা যায়। (২) এই পরীক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও মতের স্বাধীনতা থাকে। শিক্ষার্থীর জীবনে স্বাধীন মত প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (৩) শিক্ষার্থীর ভাষা-জ্ঞান, রচনাশৈলী, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই যাচাই করা যায়। (৪) এই পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থীর যুক্তি বা অনুমান ক্রিয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে, জ্ঞান অর্জনের শ্রেষ্ঠ মানসিক প্রক্রিয়া হল যুক্তি। সুতরাং এদিক থেকে, রচনামূলক পরীক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে। (৫) রচনা-মূলক পরীক্ষাকে অনেকে সমালোচনা করে বলেন যে উহা ব্যক্তির আচরণের

---

1. The examinee is permitted freedom of response in answering the question.
2. There is no single answer to the question which can be regarded as correct and complete, even by experts.
3. Answers of the question are characterised by different degrees of quality or merit Sims—The Essay Examination is a Projective Technique.

প্রলক্ষণকে (individual traits) পরিমাপ করতে পারে না। কিন্তু এখানে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক পরীক্ষা কি পরিমাপ করতে চায়? পরীক্ষার্থীর সাবলীলভাবে গদ্যে একটি প্রশ্নের জবাব লিখবার কতটুকু ক্ষমতা আছে, তা এই পরীক্ষা মাপ করে। সুতরাং ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত আচরণ পরীক্ষা করা এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

রচনামূলক পরীক্ষার সার্থকতা সম্বন্ধে বলা হয় যে, ভাবসংগঠন ও নির্বাচনে, প্রকল্প গঠন ও সমর্থনে, তর্কসম্মতভাবে যুক্তি প্রসারে, গঠনধর্মী ভাষা প্রকাশে যে উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়া নিয়োজিত তা পরিমাপ করাই রচনামূলক পরীক্ষার উদ্দেশ্য। সুতরাং এই পরীক্ষার দ্বারাই শিক্ষার কতকগুলি ব্যাপক ফলাফল যাচাই করা যেতে পারে, যা অন্য কোন কাগজ-কলমে বা লিখিত পরীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

রচনামূলক পরীক্ষার অসুবিধা (Disadvantages of Essay-Type Examination): (১) প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রধান ত্রুটি হল এতে কোন নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নেই। একই পরীক্ষক এই ধরনের প্রশ্নের খাতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নম্বর (marks) দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন পরীক্ষক সম্বন্ধে তো কথাই নেই। কারণ বিভিন্ন পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর সাফল্য পরিমাপের বিভিন্ন মান (standard) প্রয়োগ করেন। পরীক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক অবস্থার উপরও তার পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। সুতরাং এ ধরনের পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীর শিখনের পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া, পরীক্ষকের মেজাজ বা মানসিক অবস্থার উপরও পরীক্ষার্থীর সাফল্য নির্ভর করে। একই উত্তরপত্র ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে যে পরীক্ষক দেখছেন, উহা সুস্থ বা প্রফুল্ল মনে দেখলে এ খাতায় দুপ্রকার নম্বরদানের পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। আসল কথা, পরীক্ষার ফলাফল বিচার অনেকটা ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective) ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

(২) প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার প্রয়োগশীলতার (administrability) অভাব রয়েছে। প্রথমতঃ, প্রশ্নপত্রের মধ্যে পরীক্ষক কতটুকু জবাব চান বা একটা প্রশ্নের জবাব লিখতে পরীক্ষার্থী কোন্ কোন্ দিক বিবেচনা করবে এ ধরনের কোন ইঙ্গিত প্রশ্নপত্রে থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নম্বর দেবার (scoring) কোন ব্যবস্থা নেই। উহা অনেকটাই ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার।

(৩) রচনাধর্মী পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে যথেষ্ট সময় লাগে। পরীক্ষার্থীরা প্রায়ই অভিযোগ করে যে, যে ধরনের প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয় তা তিন-চার ঘণ্টায় যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় না। তারপর প্রশ্নের উত্তরপত্র পরীক্ষা এবং পরীক্ষার

ফল প্রকাশ ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ এবং সময়ের অপব্যবহার হয়। এ পরীক্ষাব্যবস্থায় তাই পরিমিততার (economy) অভাব রয়েছে।

(৩) এই রচনাধর্মী পরীক্ষাতে কোন নির্দিষ্ট মান (norm) নেই। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর একটি বিষয়ের ফলাফলের সঙ্গে অন্য বিষয়ের ফলাফলকে যথাযথ ব্যাখ্যা করার এবং তুলনা করার (interpretation and comparability) কোন সুযোগ নেই। নম্বরদান (scoring) এত ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার যে তার কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই।

(৫) এ ধরনের পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থী অধ্যয়নের চাইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকেই বড় করে দেখে। তাই তারা শিক্ষকের শিক্ষাদান বা ভাবসংগ্রহের চাইতে পরীক্ষাতে কি ধরনের প্রশ্ন আসবে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে আর বাজারের নোটবই ইত্যাদি (Sure Success, Made Easy, One Minute's preparation) পড়ে। শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় পরীক্ষায় পাস করানোর একটি কল বা কারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এর পেছনে কারণও রয়েছে। রচনাধর্মী পরীক্ষাতে সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর প্রশ্ন থাকে না, সুতরাং পরীক্ষার্থীরাও পাঠ্যবই পড়বার আগেই কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

রচনামূলক পরীক্ষার এসব অসুবিধার জন্য এ পরীক্ষার তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। সে আন্দোলনের ফলস্বরূপ আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার (New-Type test) প্রচলন হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক পরীক্ষাকে কি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া চলে? এ পরীক্ষার ভবিষ্যৎ কি?

৪। রচনামূলক পরীক্ষার ভবিষ্যৎ (Future of Essay-Type Examination):

প্রথমতঃ, অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বিদ্যালয়গুলি থেকে রচনামূলক পরীক্ষাকে নির্বাসিত করা উচিত। কিন্তু পরে দেখা গেল আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার মধ্যেও এমন কতকগুলি ক্রটি রয়েছে যার ফলে উহা রচনামূলক পরীক্ষাকে স্থানচ্যুত করতে পারে না। রচনামূলক পরীক্ষায় যে সুবিধা বর্তমান, শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত প্রকাশ, অনুমান করার সুযোগ, ভাব প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি কোন কিছুই অন্য কোন পরীক্ষাতে সম্ভব নয়। আর শিক্ষার মূলসূত্র শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত গঠন এবং ভাব সৃষ্টিতেই নিহিত। সুতরাং এ পরীক্ষাকে পরিত্যাগ করা চলে না।

এজন্য ১৯৪৮—৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন এই রচনামূলক পরীক্ষার সংস্কার করতে চেয়েছেন।[1] প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন তৈরির সময় যদি সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর

1. If examinations are necessary, a thorough reform of these are still more necessary. (The Report of the University Education Commission. 1948-49.)

প্রশ্ন করেন, প্রশ্নের কোন্ কোন্ অংশের উপর কিভাবে কত নম্বর দেবেন ইত্যাদি স্থির করেন, তবে পরীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তরকে যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। আর শিক্ষার্থীও পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার জন্য সহজ বই না পড়ে পাঠ্যবই পড়বার প্রবণতা দেখাবে।

তাছাড়া, প্রশ্নপত্র তৈরির সময় প্রশ্নগুলি যাতে নির্ভরশীল হয় তাও বিবেচনা করতে হবে। কারণ, সময় সময় এমন প্রশ্ন করা হয় যার সঠিক উত্তর পরীক্ষার্থী ঠিক করতে পারে না। এজন্য বিশেষ কোন সমস্যা প্রশ্নের মধ্যে উপস্থাপিত করলে পরীক্ষার্থী ঠিক বুঝতে পারে, কোন্ সমাধান তার কাছে থেকে চাওয়া হচ্ছে।

পরীক্ষার নম্বরদান (scoring) যাতে পুরোপুরি ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায় তার জন্য একই প্রশ্নোত্তর একাধিক পরীক্ষক পরীক্ষা করতে পারেন।

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষার সঙ্গে রচনাধর্মী পরীক্ষার যথাসম্ভব একটি সমন্বয় বা একটিকে আর একটির সহায়করূপে বিবেচনা করলে রচনামূলক পরীক্ষার উন্নতি সম্ভব।

রচনাধর্মী পরীক্ষা থেকে ব্যক্তিসাপেক্ষতা (subjectivity) দূর করার জন্য এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবনের একটি সামগ্রিক রূপ বিবেচনা করার জন্য আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধারাবাহিক পরিমাপ পত্র (Cumulative Record Card) প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর শুধু বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবনের শিক্ষার অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করা হয় না, তার ব্যক্তিগত ইতিহাস (পারিবারিক, সামাজিক), ব্যক্তিগত গুণাবলী (আগ্রহ, কর্মক্ষমতা, উৎসাহ, সামাজিক কর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির বিবরণ), ব্যক্তিসত্বা ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, সহপাঠক্রমিক কাযাবলীতে তার অংশ গ্রহণ, তার স্বাস্থ্যের বিবরণ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সকল বিষয় উল্লিখিত হয়।

যদিও এই ধারাবাহিক পরিমাপপত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মত ও আকর্ষণের ছাপ পড়ার আশঙ্কা আছে, তবুও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় গ্রহণ করলে এতে শিক্ষার্থীর একটি সামগ্রিক জীবনের পরিচয় আমরা পেতে পারি।

৩। আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষা (New-Type Objective Test) :

আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষাকে সাধারণতঃ দু শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short answer item) এবং অন্যটিকে বলা হয় বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর (Multiple-choice item)। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষার্থী একটি শব্দ, সংখ্যা বা প্রতীক চিহ্ন বসিয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়। বহু নির্বাচনী

প্রশ্নোত্তরে প্রশ্নের অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তর বা উত্তরটি এলোমেলোভাবে বিভিন্ন স্তরে সাজান থাকে, পরীক্ষার্থীকে যথাযথ প্রশ্নটি নির্বাচন করে নিতে হয়। অনেক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরকে স্মৃতিমূলক (recalling) এবং বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরকে প্রত্যভিজ্ঞা-মূলক (recognition) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে স্মৃতিই একমাত্র সহায়ক নয়, অনেক সময় নতুন বিষয়ও থাকে বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তরে অনেক সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর থাকে যার সঙ্গে পরীক্ষার্থীর কোন পরিচয়ই নেই। আমরা নিম্নে এ দুই ধরনের বিষয়াত্মক অভীক্ষার কয়েকটি বহুল প্রচলিত উদাহরণ দিচ্ছি :

৬। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short Answer Item)** :

(ক) **সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Completion or Recall Type) :** এখানে একটি বাক্য এবং এ বাক্যের মধ্যে বিশেষ শব্দ বা শব্দসমষ্টি উহ্য থাকে, পরীক্ষার্থীকে তা পূরণ করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ—

১। গীতাঞ্জলির রচয়িতা হলেন—।

২। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস হল—।

(খ) হ্যাঁ অথবা না (Yes or No Type) :

১। জলের চেয়ে বরফ হালকা। হ্যাঁ/না

২। সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। হ্যাঁ/না

৩। সম্রাট আকবর ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন। হ্যাঁ/না

'হ্যাঁ' অথবা 'না' ধরনের অভীক্ষা 'সত্য-মিথ্যা' বিচারের (True or False Type) নামান্তর। এ ধরনের প্রশ্নের গঠননীতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন শুধু সত্য কিনা বা মিথ্যা কিনা জিজ্ঞাসা করা হবে। অথবা শুধু যে প্রশ্ন সত্য বা যে প্রশ্ন মিথ্যা তা-ই জিজ্ঞাসা করা হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সত্য বা মিথ্যা প্রশ্নের প্রতি প্রশ্নকর্তার পক্ষপাতিত্ব না থাকাই ভাল। প্রশ্নের সংখ্যা যত বেশী হবে ততই এ ধরনের অভীক্ষার নির্ভরশীলতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। সত্য বা মিথ্যা প্রশ্নের মধ্যে অনুপাত না থাকাই ভাল। এ ধরনের অভীক্ষাতে সাধারণতঃ অনুমান করার কোন সুযোগ থাকে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে অনুমান করার সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক বা অর্জিত জ্ঞানের উপর পরীক্ষা গৃহীত হলে অনুমানের কোন সুযোগ দেওয়া হয় না।

(গ) **উপমান অভীক্ষা (Analogy Type) :** এখানে দুই বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখা থাকে, শিক্ষার্থীকে তৃতীয় বস্তুর সঙ্গে চতুর্থ বস্তুর সাদৃশ্য খুঁজে নিতে হয়।

১। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ শিক্ষকের সঙ্গে—সে সম্বন্ধ।

২। ফুলকোর সঙ্গে মাছের যে সম্বন্ধ ব্যাঙের সঙ্গে—সে সম্বন্ধ।

৩। দুঃখের সঙ্গে সুখের যে সম্পর্ক অন্ধকারের সঙ্গে—সে সম্পর্ক।

৭। বহু নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর (Mulitiple Choice Test) ঃ

(ক) নির্বাচনী পরীক্ষা (Choice Test) ঃ এখানে প্রশ্নের জবাবের অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে বা এলোমেলোভাবে প্রশ্নের জবাব লেখা থাকে, পরীক্ষার্থীকে সেটা খুঁজে নিতে হয় অথবা ঠিকভাবে সাজিয়ে নিতে হয়।

১। ভারতে নোবেল পুরস্কার পান গান্ধীজী/রবীন্দ্রনাথ/দাদাভাই নৌরজী।

২। অর্থনীতিতে ভারতের অনগ্রসরতার কারণ—ভারতের মানুষ অলস/শিল্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির অভাব/দক্ষ কারিগরের অভাব।

(খ) মিলনকরণ পরীক্ষা (Matching Test) : এখানে প্রশ্নের ডান দিকে উত্তর দেওয়া থাকে, যেখানে যে উত্তরটি খাটে সেখানে সেটি সাজিয়ে শূন্যস্থানে উত্তরের ক্রমিক সংখ্যাটি লিখতে হয়।

(১) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন	( )	সি. ভি. রমন
(২) ভারতের প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন	( )	ডঃ রাধাকৃষ্ণন
(৩) ভারতের একজন খ্যাতনামা পদার্থবিদ্ হলেন	( )	জওহরলাল
		রবীন্দ্রনাথ
		ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
		ইন্দিরাগান্ধী

৮। আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test) ঃ

পরীক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে তার যাথার্থ্য এবং নৈর্ব্যক্তিতার উপর। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষার (এমন কি নতুন অভীক্ষারও) ত্রুটি হল এদের ফলাফলকে অন্যান্য ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অর্থাৎ একটি পরীক্ষার্থী অঙ্কে ৩৫ নম্বর পেয়েছে, তার এই ফলকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? যদি ধরা যায় অঙ্কে মোট নম্বর ছিল ১০০ এবং উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর ৩০, তবে ছেলেটি মোটামুটিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু অঙ্কে কাঁচা। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এ ব্যাখ্যা মোটেই যথাযথ নয়। ছাত্রের কৃতিত্ব বা দুর্বলতাকে বিচার করতে গেলে আমাদের আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে হয়। যেমন, এই শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা কত? তারা কে কত নম্বর পেয়েছে। তাদের গড় (average) নম্বর কত? সে তুলনায় ছাত্রটি যদি ৩৫ পায় তবে এ নম্বর গড় নম্বরের উর্ধ্বে, না নিম্নে ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের সমাধান না করে ছাত্রের ফলকে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং নম্বর দান কখনও বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না।

অতএব একটি সাধারণ মান (Standard or Norm) নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই মানের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরকে তুলনা করে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। এ ধরনের মানকে জনসাধারণের মান (Population Norm) বলা হয়ে থাকে। বারবার প্রয়োগের দ্বারা একটি অভীক্ষার প্রতিনিধিমূলক গড় মান স্থির করা হয় এবং জনসাধারণ একে আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test) হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ ধরনের পরীক্ষার সহায়করূপে নম্বর দানের জন্য নানা ধরনের পরিমাপক (Scale) আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গড় নম্বর এবং আদর্শায়িত মান এক জিনিস নয়। গড় নম্বর হল শিক্ষার্থী গড়ে যে নম্বর পেয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিয়ে সকলের মোট নম্বরকে ভাগ করে যা লাভ করা যায়। কিন্তু আদর্শ মান হল শিক্ষার্থীর যা ন্যায্য প্রাপ্য। মনে করা যাক, যে শিক্ষার্থী অঙ্কে ৩৫ পেয়েছে, সেই শ্রেণীতে ২০ জন ছাত্র এবং গড়ে প্রত্যেকে ২৫ পেয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সে ছেলে অঙ্কে ৩৫ পেলেও অঙ্কে দুর্বল নয় বরং অন্যতম ভাল ছাত্র। প্রতিটি পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আদর্শায়িত মান ঠিক করা হয়। মনে করা যাক সেই আদর্শ মানটি ৪০। যদি পরীক্ষার্থী ৩৫ বা ৫০ নম্বর পায়, তখন ঐ আদর্শ মানের সঙ্গে তুলনা করে তার ফলাফল ব্যাখ্যা করা যাবে। তাছাড়া, পরিমাপক ব্যবহার করার ফলে নম্বর দান নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিসাপেক্ষকতা থেকে মুক্ত। আধুনিক বিষয়াত্মক অভীক্ষাগুলিকে এভাবে আদর্শায়িত মানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

৯। আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of Objective-Type Test) :

আধুনিক বিষাত্মক পরীক্ষার সুবিধা (Advantages of Objective Type Test) **:** এই নতুন পরীক্ষাপদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, উহা নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুনিষ্ঠ (objective), পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিসাপেক্ষতা (subjectivity) থেকে উহা মুক্ত। এজন্য উহা নির্ভরশীল। প্রশ্নের জবাব স্থির করা থাকে ; সুতরাং নম্বরদান এতে যথাযথভাবে করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এতে সময় এবং পরিশ্রম কম লাগে। তৃতীয়তঃ, সমগ্র পাঠ্য বইয়ের উপর ব্যাপকভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে বলে শিক্ষার্থী কয়েকটি প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় না। চতুর্থতঃ, অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কেহ প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করতে পারেন।

আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষার অসুবিধা (Disadvantages of Obiective Type Test) **:** এ পরীক্ষায় নিছক তথ্যগত জ্ঞানের (subject knowledge) উপর

গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভাব, ভাষা বা রচনা কৌশলের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এ ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা ব্যয়বহুল এবং বিশেষজ্ঞ (expert) ছাড়া প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার অভাব রয়েছে। কারণ, এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে প্রচুর কৌশলের প্রয়োজন। সাধারণ বিদ্যালয়ে এ ধরনের কৌশলী পরীক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। চতুর্থতঃ, এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন মতামত ও ভাব প্রকাশের সুযোগ নেই। এ জন্য অনেকে বলেন, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ এ পরীক্ষার দ্বারা সম্ভব নয়। স্যাণ্ডিফোর্ড (*Sandiford*) বলেন : পরীক্ষকের পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কোথায় জ্ঞানের পরিসমাপ্তি আর কোথায় অনুমান শুরু হয়। বিষয়াত্মক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর পক্ষে বুদ্ধি-চর্চার বিশেষ কোন সুযোগ নেই। পরীক্ষার্থী অনেক সময় না বুঝেই প্রশ্নোত্তরে একটি দাগ বসিয়ে দেয়, কোন কোন সময় উহা ঠিক হয়ে যায়, কোন ক্ষেত্রে বা ঠিক হয় না। পঞ্চমতঃ, যে কোন বিষয়াত্মক পরীক্ষায় ফলাফলের ব্যাখ্যা এবং তুলনা সম্ভব নয়। একমাত্র আদর্শায়িত অভীক্ষায় ফলাফলকে ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য ফলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

তারপর এ ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর মৌলিকতা (originality) পরিমাপ করা যায় না।

১০। বিষয়াত্মক পরীক্ষার বিষয়বস্তু গঠনের সাধারণ নিয়ম (General Maxims for Item Writing on Objective Test) :

বিষয়াত্মক পরীক্ষার ত্রুটিগুলি অনেক সময় বিষয়বস্তু গঠনের ত্রুটি থেকে উদ্ভূত হয়। বিষয়বস্তু নির্বাচন ও গঠনে যথেষ্ট রচনাশৈলীর প্রয়োজন। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বিষয়াত্মক পরীক্ষা-পরিচালনা যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন।[1] বিষয়বস্তু গঠনে (construction) কোন মৌলিক নীতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে আজও পরীক্ষিত হয়নি। অর্থাৎ, বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির কোন বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম নেই।[2]

তবুও অভিজ্ঞদের অভিজ্ঞতা এবং অবধারণ থেকে উদ্ভূত কতকগুলি সাধারণ নিয়ম এক্ষণে আলোচনা করব। এ নিয়মগুলি বিষয়াত্মক পরীক্ষার সব রকম প্রশ্ন-

1. তুলনীয় : "Writing good test items is an art. It is a little like writing a good sonnet and a little like baking a good cake. The operation is not quite so free and fanciful as writing the sonnet. It is not quite so standardised as baking the cake.

Thorndike and Hagen : Measurement and Evaluation in Psychology and Education ; Page 50.

2. তুলনীয় : "The point we wish to make is that we do not have a science of test construction."—Ibid, Page 50.

প্রস্তুতির জন্য মোটামুটি সমানভাবে প্রযোজ্য। এ ছাড়াও প্রতিটি অভীক্ষার বিশেষ বিশেষ নিয়ম বর্তমান।

(১) **পরীক্ষার বিষয়বস্তু পঠনে যেন খুব কম অসুবিধা হয়** (**Keep the Reading Difficulty of Test Items low**): প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার সময় আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে পরীক্ষার্থী যেন পরিষ্কারভাবে প্রশ্ন পড়তে পারে, অর্থাৎ, শব্দবাহুল্য না থাকাই শ্রেয়। প্রশ্নপত্র তৈরির উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপ করা। সুতরাং প্রশ্নপত্রপাঠে পরীক্ষার্থীর যাতে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর দেওয়া কর্তব্য। অবশ্য যদি প্রশ্নপত্র দ্বারা পরীক্ষার পঠন বা লিখন ক্ষমতা বিচার করা হয় সেস্থলে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

(২) **পাঠ্যপুস্তক থেকে কোন বক্তব্যকে আক্ষরিকভাবে উদ্ধৃত না করা** (**Do not quote a Statement Verbatim from the textbook**): পাঠ্যপুস্তক থেকে পংক্তি উদ্ধৃত করে প্রশ্নপত্র তৈরি না করাই শ্রেয়। কারণ, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার প্রবণতার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার একটি প্রধান ত্রুটি হল, উহা শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার প্রবণতাকেই উৎসাহিত করে। সুতরাং বিষয়াত্মক পরীক্ষাতে যেন এ ধরনের ত্রুটি না থাকে।

(৩) **যদি প্রশ্নের কোন বিষয় কোন ব্যক্তিবিশেষের অভিমতের উপর নির্ভরশীল হয়, তবে সে ব্যক্তি বিশেষের (বা প্রামাণিক নজির) নাম উল্লেখ করা** (**If an Item is based on Opinion or Authority, Indicate whose Opinion or what Authority**): সাধারণতঃ, বিতর্কমূলক বিষয় প্রশ্নপত্রে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবুও কোন কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেসব ক্ষেত্রে মতামতকে উদ্ধৃত করলে কার মতামত বা কোন্ প্রাথমিক নজির থেকে গৃহীত হয়েছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

(৪) **প্রশ্নগুচ্ছ পরিকল্পনার সময় যাতে একটি প্রশ্ন অন্য প্রশ্নের জবাব প্রদানে কোন সঙ্কেত প্রদান না করে এ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করা** (**In planning a set of Items for a test, care must be taken that one Item does not provide Cues to the answer of another Item or Items**):

বিষয়াত্মক পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করা হয় সে সকল প্রশ্নের জবাব দেবার সময় পরীক্ষার্থী যেন একটি প্রশ্ন থেকে অন্য প্রশ্ন বা প্রশ্নগুলির জবাবের কোন সংকেত বের করতে না পারে। এ সকল প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে আলাদা থাকবে।

(৫) **প্রশ্নপত্রে পরস্পর নির্ভরশীল প্রশ্ন যেন না থাকে (Avoid the Use of Interlocking or Interdependent Items) :** প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার সময় যাতে একটি প্রশ্নের জবাব অন্য প্রশ্নের জবাবের একটি শর্ত (condition) না হয়ে পড়ে তা বিবেচনা করা উচিত। অর্থাৎ, প্রশ্নগুলি যেন স্বনির্ভর ও নিরপেক্ষ হয়। এই নিয়ম পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়মেরই একটি দিক মাত্র।

(৬) **একটি প্রশ্নপত্রে সঠিক জবাব যেন এলোমেলো ধরনের হয় (In a set of Items, let the occurrence of correct responses follow essentially a random pattern) :** প্রশ্নের জবাব বিশেষ কোন ধরনের অর্থাৎ হয় সত্য হবে, না হয় মিথ্যা হবে অর্থাৎ বিশেষ স্থলে সর্বত্রই একইভাবে চিহ্ন বসাতে হবে, এরূপ যেন না হয়। পরীক্ষার্থীর উত্তরদান একই ভাবে বা একই ধরনের করতে হবে, এমনটি যেন না হয়।

(৭) **প্রশ্নপত্রে কৌশল বা চাতুরীপূর্ণ প্রশ্ন না থাকা (Avoid trick and catch question) :** বিশেষ কোন প্রশ্নে কোন কৌশল বা চাতুর্যে শিক্ষার্থী কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে, তা পরিমাপ করার জন্য কৌশল বা চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। তবে সাধারণক্ষেত্রে যেন কৌশল বা চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্ন না থাকে। এতে অভীক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

(৮) **প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্নবাক্যে ও অর্থে যেন কোন দ্ব্যর্থকতা না থাকে (Try to avoid ambiguity of statement of meaning) :** বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রশ্নবাক্য যেন সুবিন্যস্ত, সরল ও সহজবোধ্য হয়। অর্থের মধ্যে যেন কোন জটিলতা না থাকে। অর্থাৎ, প্রশ্নপত্র অনুধাবন ও বিচার করতে পরীক্ষার্থী যেন অযথা ভারাক্রান্ত না হয়।

(৯) **অতি সাধারণ বিষয় উল্লেখ করা থেকে সাবধান হওয়া (Beware of Items dealing with Trivia) :** অতি সাধারণ মামুলি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন না করাই উচিত। কোন অর্থপূর্ণ বা আবশ্যকীয় বিষয় প্রশ্নপত্রে স্থান পাওয়া উচিত। প্রশ্ন করার আগে পরীক্ষক যে প্রশ্নটি করছেন তা জানা বা না জানার মধ্যে কোন জ্ঞানগত পার্থক্য আছে কিনা বিবেচনা করে দেখবেন। অর্থাৎ, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর সঠিক জ্ঞান যাচাই করার জন্য পরীক্ষক বিষয়ের অংশগুলি বেছে নেবেন।

১১। বিষয়াত্মক পরীক্ষা ও রচনাধর্মী পরীক্ষা (Objective type and Essay-type Examinations) : আমরা রচনাধর্মী পরীক্ষার সমালোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রচনাধর্মী

পরীক্ষা অপরিহার্য। রচনাধর্মী পরীক্ষার মারাত্মক দুর্বলতা হল এর ব্যক্তি-সাপেক্ষতা। আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষা এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার ফলে রচনাধর্মী পরীক্ষার উপরে বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রভাব আজ স্বীকৃত। নানাভাবে বিষয়াত্মক পরীক্ষা রচনাধর্মী পরীক্ষার উন্নতিসাধন করেছে। প্রথমতঃ, প্রশ্নপত্র রচনায় ও নম্বরদানে যাতে ব্যক্তিগত প্রভাব বেশী না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। দ্বিতীয়তঃ, কিছু সংখ্যক প্রশ্ন বিষয়াত্মক করার চেষ্টা হয়। তৃতীয়তঃ, প্রশ্নোত্তরের জন্য নমুনা ও সঙ্কেত প্রদান করে বিচার করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থীর অর্জিত নম্বরের সাধারণ মান নির্ণয় করা হয়।

এসব পরিবর্তন বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সহজাত প্রবৃত্তি

(Instincts)

১। সহজাত প্রবৃত্তির স্বরূপ (Nature of Instinct) :

প্রবৃত্তি থেকেই ক্রিয়ার উৎপত্তি। এই প্রবৃত্তি দু-রকমের হতে পারে, অর্জিত (acquired) এবং সহজাত (inherited)। ধূমপান, মাদকদ্রব্য পান, চা-পান—এগুলি হল অর্জিত প্রবৃত্তি। এগুলি জন্মগত নয় বা বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নয়। এসব প্রবৃত্তি নিজের চেষ্টায় অর্জিত। কিন্তু পাখীর বাসা তৈরি করার প্রবৃত্তি, শিশুর স্তন্য পানের প্রবৃত্তি—এগুলি হল সহজাত প্রবৃত্তি।[1] প্রাণী এগুলি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করে। শিক্ষার দ্বারা এগুলিকে আয়ত্ত করতে হয় না। এগুলি বংশগত বা সহজাতভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীতে একই ভাবে বর্তমান থাকে।

প্রবৃত্তি দুপ্রকার—অর্জিত ও সহজাত

আমরা এখন সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি। যে সকল জন্মগত প্রবৃত্তির বশে একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জীব কোন রকম শিক্ষা বা পূর্বসংকল্পের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এবং কাজের ফলাফল সম্পর্কে কোন ধারণা না করে

1. 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে অনেকে লৌকিক অর্থে ব্যবহার করেন এবং যে কোন প্রকার কর্ম করার শক্তি বা প্রবণতাকে সহজাত প্রবৃত্তি নামে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আবার অনেকে একে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করে যে কোন প্রকার জন্মগত প্রবৃত্তিকেই সহজাত প্রবৃত্তি বলে গণ্য করেন। যেমন, সঙ্গীত প্রবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তি। কিন্তু মনোবিদ্যার 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে কোন প্রকার কর্মপ্রবণতাই সহজাত প্রবৃত্তি নয়, অথবা, কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সঙ্গীত প্রবৃত্তি জন্মগত হলেও এগুলিকে সহজাত প্রবৃত্তি নামে আখ্যাত করা যুক্তিযুক্ত নয়। সহজাত প্রবৃত্তি একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত সকলের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে, শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা প্রাণীবিশেষের মধ্যে থাকে না। যেমন সঙ্গীত প্রবৃত্তি বা চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে দেখা গেলেও, যেহেতু এই প্রবৃত্তি সমগ্র জাতির সম্পত্তি নয়, এদের সহজাত প্রবৃত্তি বলা যায় না। সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন মনোবিদ্ কোন কোন ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তি এবং 'আবেগের' সহ অবস্থান লক্ষ্য করে উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেন। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিকে আবেগের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। জেম্‌স (James) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আবেগ হল অনুভূতিপ্রবণতা, আর সহজাত প্রবৃত্তি হল কর্ম প্রবণতা।' ("An emotion is a tendency to feel, and an instinct is a tendency to act."—James)

বংশপরম্পরায় প্রায় একই রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে আত্মরক্ষা বা স্বজাতিরক্ষার জন্য একাধিক কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করে, সেই জন্মগত প্রবৃত্তিকে বলা হয় **সহজাত প্রবৃত্তি**। পাখীর বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি, ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি, শিশুর স্তন্যপানের প্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির উদাহরণ। সহজাত প্রবৃত্তিবশে যে কাজ করা হয় তাকেই বলা হয় **সাহজিক ক্রিয়া** (Instinctive Action)।

সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা

সাহজিক ক্রিয়া

সহজাত প্রবৃত্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, সহজাত প্রবৃত্তি হল জন্মগত বা বংশগত প্রবৃত্তি। প্রাণী জন্মগত বা বংশপরম্পরায় এই সব প্রবৃত্তির অধিকারী হয়। এগুলিকে শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত হলেও সব সহজাত প্রবৃত্তিই জন্মের সময় থেকেই আত্মপ্রকাশ করে না। যেমন, পাখীর বাসা বাঁধার প্রবৃত্তি বা ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্ম সময় থেকেই নিজেকে ব্যক্ত করে না। উপযুক্ত সময়ে এই প্রবৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর স্তন্যপানের প্রবৃত্তি জন্ম সময় থেকেই নিজেকে ব্যক্ত করে, কিন্তু মানুষের যৌন প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে অনেক পরে।

সহজাত প্রবৃত্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

তৃতীয়তঃ, সহজাত প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া সমগ্র দেহযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র দেহযন্ত্রটি নিযুক্ত থাকে।

চতুর্থতঃ, একটা সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সহজ প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে।

পঞ্চমতঃ, সহজাত প্রবৃত্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়; একটি জাতির সম্পত্তি। সহজাত প্রবৃত্তি একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই দেখা যায়। যেমন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনপ্রবৃত্তি, বাৎসল্য, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি যে কোন জাতির প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান।

ষষ্ঠতঃ, সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত, যেহেতু বংশপরম্পরায় এই প্রবৃত্তি একই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সে কারণে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার মধ্যে একটা যান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়।

সপ্তমতঃ, সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। অবশ্য এটি বিতর্কমূলক বিষয়। অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি যে কেবলমাত্র পরবর্তীকালেই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তা নয়, সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যেও বুদ্ধির পরিচালনা থাকে। মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা, সে প্রশ্ন আপাততঃ উত্থাপন না করে বলা যেতে পারে যে,

মানুষের ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষা, রুচি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অভ্যাসের সহায়তায় কোন কোন সহজাত প্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে অবদমিত ও বর্জিত হয়। তবে এ সম্পর্কেও মতভেদ দেখা যায়।

অষ্টমতঃ সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীর কোন-না-কোন উদ্দেশ্য সাধন করে, যদিও প্রাণীর মধ্যে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ব থেকে কোন সুস্পষ্ট চেতনা থাকে না। সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন মেটায় এবং আত্মরক্ষা ও স্বজাতি রক্ষায় সহায়তা করে। কাজেই সহজাত প্রবৃত্তি চেতনাযুক্ত, জ্ঞাতসারে উদ্দেশ্যমূলক নয়, জৈবভাবে উদ্দেশ্যমূলক।

নবমতঃ, সহজাত প্রবৃত্তি মূলতঃ কর্মপ্রবণতা, অর্থাৎ, কর্মের মাধ্যমে এ প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে।[1] এই কারণে আবেগের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। আবেগ হল জটিল অনুভূতি, সহজাত প্রবৃত্তি হল কর্মপ্রবণতা। আবেগ অন্তর্মুখী ; সহজাত প্রবৃত্তি বহির্মুখী। অবশ্য মনোবিদ্ ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে প্রত্যক্ষণ, আবেগ ও কর্মপ্রবণতা, এই তিনটি উপাদানই বিদ্যমান।

দশমতঃ, প্রাণীর শারীরিক ও স্নায়বিক সংগঠনের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির বিশেষ সংযোগ আছে। প্রাণীর এই বিশেষ দেহসংগঠনের জন্যই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

একাদশতঃ, অনেক ক্ষেত্রেই সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ যুক্ত থাকে, তবে আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক নিয়ত বা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কিনা সে বিষয়ে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়।

২। সহজাত প্রবৃত্তির উৎপত্তি সম্পর্কীয় বিভিন্ন মতবাদ (Different Theories of the origin of Instinct) :

সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে প্রধান প্রধান মতবাদগুলি আলোচনা করা হচ্ছে :

(ক) **লুপ্তবুদ্ধি মতবাদ (The Theory of Lapsed Intelligence) :** এই মতবাদ অনুযায়ী সহজাত প্রবৃত্তি হল লুপ্তবুদ্ধি (Lapsed Intelligence)। এই মতবাদ অনুসারে যেসব কার্যকে বর্তমানে সাহজিক ক্রিয়া বলে গণ্য করা হয়, সেগুলি আমাদের পূর্বপুরুষেরা বুদ্ধির সাহায্যেই সম্পন্ন করতেন, অর্থাৎ অতীতে এগুলি ছিল বৌদ্ধিক কার্য (Intelligent Action)। কিন্তু একই কাজ বার বার করার ফলে এগুলি

1. Though we speak of instinctive action or behaviour. an instinct is more a tendency or disposition to act, to behave."

—H. R. Bhatia : Elements of Educational Psychology, Page 83.

ক্রমশঃ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হতে লাগল এবং অভ্যাসে পরিণত হল। তারপর এইসব অভ্যাস পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে সহজাত প্রবৃত্তির আকারে গ্রহণ করল। জীববিদ্ কোপ্ (*Cope*) এবং ভূণ্ট্ (*Wundt*) এই মতবাদের সমর্থক।

সহজাত প্রবৃত্তি হল লুপ্তবুদ্ধি

সমালোচনাঃ লুপ্তবুদ্ধি মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ, এই মতবাদে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা অমানুষিক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এ নিছক অনুমান বা কল্পনা। দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধিক ক্রিয়া হল ঐচ্ছিক ক্রিয়া এবং সহজাত প্রবৃত্তি হল অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় রূপান্তর বিবর্তনের ধারাকে পশ্চাৎমুখী করে তোলে। তৃতীয়তঃ, জার্মান জীববিদ্ ভাইজমান (*Weismann*) এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দের মতে অর্জিত অভ্যাস বা অভিজ্ঞতালব্ধ গুণ বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় না। তাঁর মতে একমাত্র জনন-কোষের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই (Internal Germinal Variation) বংশানুক্রমে সংক্রামিত হতে পারে।

(খ) সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে যন্ত্রবাদীদের অভিমত (Mechanical View of Instinct)ঃ হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*), লোয়েব (*Loeb*), উইলিয়ম জেমস্ (*William James*), থর্নডাইক (*Thorndike*), এবং ওয়াটসন (*Watson*) প্রমুখ আচরণবাদীরা এই মতবাদের সমর্থক। এঁদের মতে প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি হল অন্ধ এবং যান্ত্রিক প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল (Chained Reflex)। ওয়াটসন নিজেই বলেছেন যে, 'an instinct is a series of chained reflexes'. একটি উদ্দীপক একটি প্রতিবর্তক্রিয়া শুরু করে এবং সেই প্রতিবর্ত-ক্রিয়াটি আর একটি প্রতিবর্তক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল রচিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়াটি একটি সফল পরিণতি লাভ করে। এই মতবাদ অনুসারে সহজাত প্রবৃত্তি প্রথম থেকেই জন্মগত নয়। জীবন সংগ্রামে অভিযোজনের প্রচেষ্টা থেকে উৎপন্ন। আকস্মিকভাবে এই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অনুক্রমটি বার বার সাধিত হয়ে ক্রমশঃ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত এটি জীবের এমন একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হল যে, এটি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত হল এবং সহজাত প্রবৃত্তির আকারে আত্মপ্রকাশ করল।

সহজাত প্রবৃত্তি অন্ধ এবং যান্ত্রিক প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল

সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার মধ্যে বুদ্ধির কোন স্থান নেই। প্রত্যেকটি ক্রিয়া অন্ধ এবং যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হলেও একটি পরিণতি লাভ করে। ক্রিয়ার শেষে যদিও একটা উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব নির্দেশ করা যায়, তবু উদ্দেশ্যটি সামনে থেকে

প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খলকে নিয়ন্ত্রিত করে না। আসলে উদ্দীপকের জন্যই সহজাত প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: সিংহের পশু শিকার একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু এই সহজাত প্রবৃত্তি একটি জটিল প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল, যেটি অন্ধ ও যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়। সিংহের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে একটি নতুন উদ্দীপকের সৃষ্টি হয় এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ একটি নতুন অঙ্গ সঞ্চালন শুরু হয়। সিংহের ক্ষুধার অনুভূতি, দূর থেকে শিকারের গন্ধ পাওয়া, শিকার সন্ধান করা, শিকারের সন্ধান পেলে শিকারকে চুপি চুপি অনুসরণ করা, শিকারের নিকটবর্তী হয়ে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়া—এই সবই প্রতিবর্ত-ক্রিয়া। একটির পর একটি ক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করা হয় বা শেষ পর্যন্ত সিংহের শিকারকে আয়ত্ত করা—এই সফল পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ সমগ্র প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল প্রাণীর বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধির পরিচালনা নেই

আচরণবাদী ওয়াটসনও সহজাত প্রবৃত্তির মানসিক দিকটি (psychical aspect) উপেক্ষা করে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে উদ্দীপকপ্রতিক্রিয়া (stimulus-response) সূত্রের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে অঙ্গ সঞ্চালন সম্পর্কীয় জটিলতা (motor complexity) সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর সংজ্ঞা দিতে দিয়ে ওয়াটসন বলেছেন, "এ হল উপযুক্ত উদ্দীপনার ফলে সমষ্টিগত সুস্পষ্ট সহজাত প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ।"[1]

ওয়াটসনের ব্যাখ্যা

থর্নডাইক (*Thorndike*) ও প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে মানসিক উপাদান স্বীকার করে নিতে চান না। আচরণবাদীদের মত তিনিও মনে করেন, প্রাণীর আচরণ একটি বিশেষ পরিবেশে প্রাণীর প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।[2] এই প্রতিক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, দেহের সংগঠনের মধ্যে নিউরনের বিন্যাস ও ব্যবস্থার (order of arrangement) উপরই পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধটি নির্ভর করে। সুতরাং প্রাণীর জন্মগত আচরণ প্রতিবর্ত-ক্রিয়া ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়।[1] সুতরাং কি উদ্দেশ্যসাধন

থর্নডাইকের ব্যাখ্যা

1. "......a combination of explicit congenital responses unfolding serially under appropriate stimulation.—Watson.

2. এই ক্রিয়ার মধ্যে তিনটি উপাদান আছে। যথা—(১) প্রথমতঃ পরিবেশ—ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে এবং দেহের বাইরের পরিবেশ বা ব্যক্তির মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। (২) দ্বিতীয়তঃ, প্রতিক্রিয়া—এই প্রতিক্রিয়া হল উদ্দীপনাহেতু প্রাণীর দেহে কতকগুলি পরিবর্তন। (৩) তৃতীয়তঃ, একটি যোগসূত্র যা পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগকে সম্ভব করে তোলে।

করছে, তার সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং কোন্ উদ্দীপক এই সহজাত প্রবৃত্তিকে কার্যকর করে তুলছে তারই সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিসঙ্গত।

সমালোচনা : সহজাত প্রবৃত্তির যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্বোক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি আনা যেতে পারে :

(১) প্রথমতঃ, এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যামাত্রই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং সে কারণে প্রাণীর আচরণকে যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করলেই প্রাণীর আচরণের যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। যে ব্যাখ্যা-পদ্ধতি পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতির ক্ষেত্রে উপযোগী, সে ব্যাখ্যা মন এবং প্রাণের ক্ষেত্রেও যে উপযোগী হবে এমন কোন কথা নেই।

মন ও প্রাণের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ব্যাখ্যার অসারতা

তাছাড়া প্রাণীর আচরণ উদ্দেশ্যমূলক। প্রাণী তার আচরণের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করে। সাহজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা খুব সুস্পষ্ট নয় সত্য, তবু সাহজিক ক্রিয়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল বলা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। কফ্কা (*Koffka*)-র মতে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন আংশিক ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত, যেটি প্রাণিদেহের নিউরনের সংস্থানের দ্বারাই বাহ্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা আছে এবং এই ক্রিয়ার একটা অবিচ্ছিন্ন গতি লক্ষ্য করা যায়। এই ক্রিয়াকে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সমষ্টি বলে মনে হয় না, বরং একটি সমগ্র ক্রিয়া বলেই অনুভব করা যায়, যার একটা শুরু আছে এবং একটা শেষ আছে। সুতরাং সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া ঐচ্ছিক ক্রিয়ার তুল্য, প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার তুল্য নয়। উভয় ক্ষেত্রেই সম্মুখ দিকে অগ্রসর হবার জন্য একটা গতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই সম্মুখগতিই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য।

কফকার অভিমত

(৩) তৃতীয়তঃ, প্রতিবর্ত-ক্রিয়া ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও, উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল মনে করেন যে, প্রাণীর উদ্দেশ্যমূলক আচরণের যেসব বৈশিষ্ট্য ; যেমন, স্বতঃস্ফূর্ততা (spontaneity), বিভিন্ন প্রচেষ্টাসহ অধ্যবসায়ের লক্ষণ, কোন

1. "One sees, therefore, that from this point of view there can be no form of inherited behaviour that is essentially different from the reflexes."
—Koffka : The Growth of Mind. Page 99.

লক্ষ্যের কথা চিন্তা করে কাজ করা এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই লক্ষ্যকে লাভ করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ার বৈচিত্র্য প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার দেখা যায় না। উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়ায় ভবিষ্যতের প্রত্যাশা আছে, যা প্রতিবর্ত-ক্রিয়ায় নেই : উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু প্রতিবর্ত-ক্রিয়া পুনরাবৃত্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয় না।

প্রতিবর্ত ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বর্তমান

(৪) চতুর্থতঃ, যন্ত্রবাদীরা সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার কোন অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে ক্রিয়া স্বীকার করে না নিলে এ কিভাবে সম্ভব ?

(৫) এই মতবাদে আকস্মিকতার উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। এই মতবাদ অনুসারে প্রতিবর্ত-ক্রিয়াগুলি আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে আকস্মিকভাবেই যুক্ত হয়েছে, অথচ তার শেষ ফল জীবনের পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু এ কি ভাবে সম্ভব হতে পারে ?

আকস্মিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ

(৬) এই মতবাদ সহজাত প্রবৃত্তির মূলে যে মানসিক উপাদান আছে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেমন, যে পাখী সহজাত প্রবৃত্তিবশে বাসা তৈরি করছে তার মনোযোগ বা আগ্রহ কেন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অসংখ্য বস্তুর মধ্যে খড়কুটোর দিকেই ধাবিত হবে, অর্থাৎ সহজাত প্রবৃত্তি-সম্পাদনের পেছনে জীবের যে আগ্রহ থাকে সেই আগ্রহের কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এই মতবাদ দিতে পারে না। এই মতবাদ সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যায় কোনরকম মানসিকতাকে স্বীকার করে না।

এই মতবাদ সহজাত প্রবৃত্তির মূলে যে মানসিক উপাদান আছে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না

সুতরাং, সিদ্ধান্তে এ কথা বলা যেতে পারে, সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল (chained reflex) নয় এবং প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণীর আচরণের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। প্রাণীর আচরণ উদ্দেশ্যমূলক এবং সে কারণে প্রাণীর আচরণের কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হতে পারে না। প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যার মানসিক উপাদানকে অস্বীকার করা চলে না।

সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়

৩। সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে জীববিজ্ঞানীদের অভিমত (Biological View of instinct) :

সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জেম্‌স (*James*), স্পেন্সার (*Spencer*) প্রমুখ ব্যক্তিরা নিছক জীববিজ্ঞানের দিক থেকে সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা

করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। যেসব মানসিক কারণে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে, সেগুলি এঁদের ব্যাখ্যায় স্থান পায় নি। এঁদের বক্তব্য, সহজাত প্রবৃত্তি জীবদেহের যান্ত্রিক ক্রিয়া এবং সাহজিক ক্রিয়া প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল। সহজাত প্রবৃত্তি জৈব উপযোজনে (biological adaptation) সহায়তা করে মাত্র।

যেসব মৌলিক ক্রিয়া প্রাণীকে পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনে সহায়তা করে সেগুলিই সহজাত প্রবৃত্তি

জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর উপযোজন (adaptation) জীবনের মূলধর্ম। জীবকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে বেঁচে থাকতে হয়। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করে বেঁচে থাকবার জন্য যেসব মৌলিক ক্রিয়া প্রাণী সম্পন্ন করে, সেইগুলিই সহজাত প্রবৃত্তি। এই জাতীয় ক্রিয়া জৈবিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এগুলি শিক্ষালব্ধ নয়। প্রাণী জন্মগতসূত্রে এগুলির অধিকারী হয়।

প্রত্যেকটি প্রাণী সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশের উপযোগী একটি দেহের গড়ন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং তার সেই দেহের গড়নই তাকে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক কর্ম করায়। মাকড়সার দেহের জন্মগত গড়নই এমন যে, জাল বোনার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ তার দেহেই রয়েছে। জাল বোনার প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং জাল

সহজাত প্রবৃত্তি প্রকাশের উপযুক্ত দৈহিক গড়ন

বোনার যে প্রবণতা—এই জটিল ব্যবস্থা মাকড়সার অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজন। এই সব কর্ম প্রাণীর আত্মরক্ষায় এবং স্বজাতিরক্ষায় সহায়তা করে, যদিও সে সম্পর্কে প্রাণীর মধ্যে কোন পূর্ব-চেতনা নেই। যদি প্রশ্ন করা যায় যে পরিণতি সম্পর্কে প্রাণীর মধ্যে যখন কোন পূর্ব-চেতনা নেই তখন সহজাত প্রবৃত্তি কিভাবে সেই পরিণতির উপযোগী হতে পারে। এর উত্তরে তখন জীববিজ্ঞানীরা তাঁদের সাধারণ সূত্রগুলি অর্থাৎ, জীবন সংগ্রাম (Struggle for Existence), প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection), বংশগতি (Heredity), পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন (Adjustment to the Environment) প্রভৃতির উল্লেখ করেন।

সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য এবং পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের জন্য

প্রাণীর দেহ-গড়নই দেহের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সংগঠিত করে

প্রকৃতির দান। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলার জন্য প্রাণীকে কোন চিন্তা করতে হয় না। প্রাণীর দেহের গড়নের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যে, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যদি কোন পরিবর্তন ঘটে এবং প্রাণীর সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যেও যদি কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহলে প্রাণীর দেহের মধ্যেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়।

কাজেই সহজাত প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে কার্য করে; কোন বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। দেহের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যে, পাকস্থলীর হজম ক্রিয়া যেন আপনাআপনি সম্পন্ন হয়, চোখ এমনভাবে গঠিত যে, তার মাধ্যমে দেখা ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। প্রাণীর দেহের গঠনও এমন যে, সাহজিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব-অভিজ্ঞতার সহায়তা ছাড়াই সম্পন্ন হয়।

সমালোচনা: জীববিজ্ঞানীদের অভিমতের মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। কিন্তু প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এ অভিমত খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। এ মতবাদ যথার্থই নির্দেশ করে যে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে যার জন্য প্রাণী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। কিন্তু এ মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ আনা যেতে পারে।

সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে

প্রথমতঃ, এই মতবাদের যাঁরা সমর্থক তাঁরা সাহজিক ক্রিয়া এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মধ্যে কোন প্রভেদ করেন না। কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া এবং প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও, উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে।

সাহজিক ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ অনুসারে প্রাণীর মধ্যে লক্ষ্য সম্পর্কে কোন পূর্ব চেতনা নেই। প্রতিবর্ত-ক্রিয়াগুলি একটির পর একটি সম্পন্ন হয় এবং এগুলিই যান্ত্রিকভাবে প্রাণীকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে সহায়তা করে। কিন্তু আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তিপ্রসূত কার্যের মধ্যে লক্ষ্য সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও একটা ক্ষীণ ও অস্পষ্ট চেতনা থাকে। নতুবা কোন প্রাণী সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপায়গুলি নির্বাচন করে নিত না। বাসা বাঁধার সময় পাখী যেসব উপাদান বাসা বাঁধার উপযোগী সেগুলিকেই নির্বাচন করে, লক্ষ্যহীনভাবে অন্ধের মতো যে কোন উপাদানই গ্রহণ করে না। সুতরাং পাখীর মধ্যে যে কিছুটা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অস্পষ্ট সচেনতা আছে তা স্বীকার করতে হয়। এই মতবাদ প্রাণীর আচরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন মানসিক উপাদান (psychical factor) স্বীকার করে নেয় না। কিন্তু প্রাণীর আগ্রহ, মনোযোগ, লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনা প্রভৃতিকে বর্জন করে প্রাণীর আচরণকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সাহজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানসিকতাকে অস্বীকার করা চলে না।

সাহজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানসিকতাকে অস্বীকার করা চলে না

৪। সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে মনস্তত্ত্বমূলক মতবাদ (Psychological Theory of Instinct) :

এই মতবাদ জীববিজ্ঞানীদের সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কীয় মতবাদের বিরোধী মতবাদ। স্টাউট, ম্যাক্‌ডুগাল, উডওয়ার্থ, লয়েড মর্গান (*Lloyd Morgan*) এবং মায়ার্স (Myers) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ এই মতবাদের সমর্থক। এঁদের মতানুসারে প্রাণীর আচরণের পেছনে যে মানসিক উপাদান আছে তাকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন, বংশগতি, পরিবেশের সঙ্গে উপযোজন এবং দৈহিক ও স্নায়বিক সংগঠনের দ্বারা প্রাণীর উদ্দেশ্যমূলক আচরণকে যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রাণীর আচরণের মূলে যে মানসিক উপাদান আছে তাকে পরিহার করা চলে না

এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ স্বীকার করেন না যে, সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল (chained reflex) মাত্র, কারণ প্রতিবর্ত-ক্রিয়া ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ বর্তমান। প্রতিবর্ত-ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে কোন বুদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে যে আগ্রহ, মনোযোগ, একাগ্রতা, কর্মবৈচিত্র্য এবং অভিজ্ঞতার সহায়তায় শিখনের বিষয় লক্ষ্য করা যায় তা স্পষ্টই সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধিগত চেতনার (intellectual consciousness) উপস্থিতি নির্দেশ করে।

সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিবর্ত ক্রিয়া-শৃঙ্খল নয়

সাহজিক ক্রিয়া ও প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার পার্থক্য

মনোবিদ্ স্টাউটের মতে সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যেই প্রাণীর অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।[1] অভিজ্ঞতা মনোযোগের ফল এবং মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যে মনোযোগের বাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের উপযোজন (adaptation), প্রাণীর সতর্কতা, প্রত্যাশা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রস্তুতি—সকল কিছুই প্রাণীর এই মনোযোগের বিষয়টি নির্দেশ করে। প্রাণীদের জটিল ক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমষ্টিমাত্র নয়। বিড়ালের শিকার অনুসন্ধান করা, শিকারের দেখা পেয়ে চুপি চুপি তাকে অনুসরণ করা এবং শেষ পর্যন্ত নিজ আয়ত্তের মধ্যে এনে তাকে নিহত করা এই সব

সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে মনোযোগ রূপ মানসিক ক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়

1. "......even in the first performance of an instinctive act the influence of previous experience is by no means altogether excluded."
Stout : Manual of Psychology ; Page 392.

কাজ একই জটিল কাজের ধারাবাহিক বিভিন্ন স্তর। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণীর মধ্যে যে মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়, সেই মনোযোগই একটি ঐক্যের সূত্র হিসেবে বিভিন্ন ক্রিয়াগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে চালিত করে।

জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, প্রাণীর সাহজিক ক্রিযার মধ্যে লক্ষ্য সম্পর্কে কোন পূর্ব-চেতনা নেই, সাহজিক ক্রিয়া অন্ধ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শেষ লক্ষ্য (ultimate end) সম্পর্কে প্রাণীর কোন সুস্পষ্ট চেতনা না থাকলেও বর্তমান লক্ষ্য (proximate end) সম্পর্কে প্রাণী সচেতন। পাখী তাব বাসা নির্মাণ করার জন্য যে কোন উপাদানই সংগ্রহ না করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে। নির্বাচন ও বর্জন (selection and rejection) বুদ্ধিগত প্রক্রিযা, সেহেতু প্রাণীর মধ্যে যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট চেতনা আছে তা অস্বীকার করা চলে না। তাছাড়া, প্রাণী প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন-পদ্ধতির (trial and error method) মাধ্যমে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে প্রযোজনীয় পরিবর্তন নিযে আসে।

সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যেও প্রাণীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনা লক্ষ্য করা যায

লয়েড মর্গান মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অধ্যবসায় (persistency with varied effort) লক্ষ্য করা যায। কোন একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাণী যদি উদ্দেশ্যসাধনে বিফল হয় তাহলে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাণী উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য সচেষ্ট হয়। মনোবিদ্ ম্যাকডুগালের মতে বুদ্ধি, অনুভূতি এবং কর্মপ্রবণতা—এই তিনটি মানসিক উপাদান সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বিদ্যমান।

মর্গান ও ম্যাকডুগালের অভিমত

প্রাণী যে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে, প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে এ সম্পর্কে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করে না নিলে প্রাণীর পক্ষে অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। লয়েড মর্গান, মায়ার্স, স্টাউট প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহজিক ক্রিয়া বারবার সম্পাদিত হওয়ার ফলেই যে সাহজিক ক্রিয়া পরবর্তীকালে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, তা নয়, সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যেই বুদ্ধির পরিচালনা আছে। সুতরাং প্রাণী তার লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে সচেতন না হলেও, প্রাণীর মধ্যে কিছু পরিমাণে ভবিষ্যৎদৃষ্টি বা দূরদর্শিতা প্রথম থেকেই দেখা যায়।

সুতরাং মানসিক উপাদান পরিহার করে কেবলমাত্র যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহজিক ক্রিয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার তুল্য মনে করে, প্রাণীর লক্ষ্যাভিমুখী আচরণের ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না।

৫। ম্যাকডুগালের সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ (McDougall's Theory of Human Instincts) :

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কিনা, এটি একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন। এই সম্পর্কে মনোবিদ্ ম্যাকডুগালের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। ম্যাকডুগালের মতে মানুষের মধ্যে এমন কতকগুলি সহজাত প্রবণতা আছে, যেগুলি মানুষের, কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত সব রকম চিন্তা এবং কার্যের প্রয়োজনীয় উৎস। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষের কাজকে পরিচালিত করে।[1] সহজাত প্রবৃত্তি-মূলক উত্তেজনাই সমস্ত কাজের লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে (the instinctive impulses determine the ends of all activities...)। সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে ম্যাক-ডুগালের মতবাদ যন্ত্রবাদীদের মতবাদের (Mechanistic view of instinct) সম্পূর্ণ বিরোধী। ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে মানসিক উপাদান বর্তমান; সাহজিক ক্রিয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। তার মতে যে সকল অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ, তাদের সহায়তায় সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়। সহজাত প্রবৃত্তির গতি হল একটি লক্ষ্যাভিমুখী, একটি বিশেষ ধরনের অবস্থার পরিবর্তন—যেটি জীবদেহের উত্তেজনা ও অস্থিরতা দূর করতে পারে। সেই লক্ষ্যের সাহায্যেই সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এ হল "উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা সহজাত দৈহিক-মানসিক প্রবণতা যা তার অধিকারীকে কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করতে (তার প্রতি মনোযোগী হতে) প্রবৃত্ত করে ও এরূপ একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর কোন বিশেষ প্রকৃতির আবেগজনিত উত্তেজনা অনুভব করতে এবং একটি বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য প্রেরণা দেয়।"[2]

ম্যাকডুগালের সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা

1. "......that directly or indirectly the instincts are the prime movers of all human activity ,, McDougall : An Introduction to Social Psychology. Page 38.

2. "We may therefore define 'an instinct' as an innate disposition which determines the organism to perceive (to pay attention to) any object of a certain class and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which find expression in a specific mode of behaviour in relation to that object"
McDougall : An Introduction to Social Psychology, Page 110.

পূর্বোক্ত সংজ্ঞা থেকে জানা যায় যে, সহজাত প্রবৃত্তিজাত কার্যধারার কয়েকটি স্তর আছে। যথা—(ক) ব্যক্তি একটি উদ্দীপক প্রত্যক্ষ করে বা তার প্রতি মনোযোগী হয়। যেমন শিকারী বনের মাঝে কোন বাঘকে তার সামনে দেখতে পেল। (খ) ব্যক্তি একটা আবেগের উত্তেজনা অনুভব করল। যেমন, শিকারী বাঘটিকে দেখল এবং তার মনে ভয় জাগল। (গ) ব্যক্তি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে উদ্যত হয়। যেমন, শিকারীর মনে পলায়ন প্রবৃত্তি জেগে উঠল এবং তারপর হয়ত সে সত্য সত্যই দৌড়তে আরম্ভ করল। এক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তিটিই হল পলায়ন প্রবৃত্তি (instinct of escape) এবং এই প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল আবেগ হল ভয়।

সহজাত প্রবৃত্তির তিনটি স্তর

ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তি হল জটিল মানসিক প্রবণতা। এর তিনটি দিক আছে—(১) জ্ঞানমূলক (Cognitive), (২) অনুভূতিমূলক (Conative) ও (৩) ক্রিয়ামূলক (Affective—Achive) অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ, আবেগ ও কর্মপ্রবণতা সহজাত প্রবৃত্তির তিনটি উপাদান।

ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তির অনুভূতিমূলক উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির অপরিহার্য উপাদান এবং একটি করে মৌলিক আবেগ প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির অনুগামী।

ম্যাকডুগাল মোট চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং তাদের প্রত্যেকের অনুগামী করে এক একটি মৌলিক আবেগের উল্লেখ করেছেন। এই চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে :

সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)	মৌলিক আবেগ (Primary Emotion)
(১) পলায়ন প্রবৃত্তি (Instinct of Escape)	ভয় (Fear)
(২) সংগ্রাম প্রবৃত্তি (Instinct of Combat)	ক্রোধ (Anger)
(৩) বিতৃষ্ণা প্রবৃত্তি (Instinct of Repulsion)	বিরক্তি (Disgust)
(৪) বাৎসল্য প্রবৃত্তি (Parental Instinct)	স্নেহ (Tender feelings)
(৫) অনুনয় প্রবৃত্তি (Instinct of Appeal)	দুঃখ (Distress)
(৬) যৌন প্রবৃত্তি (Sex Instinct)	কাম (Lust)
(৭) কৌতূহল প্রবৃত্তি (Instinct of Curiosity)	বিস্ময় (Wonder)
(৮) খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তি (Instinct of Food-Seeking)	ক্ষুধা (Hunger)

সহজাত প্রবৃত্তি	মৌলিক আবেগ
(৯) যূথ প্রবৃত্তি (Gregarious Instinct)	নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ববোধ (Feeling of Loneliness)
(১০) আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি (Instinct of Self-assertion)	আত্মগরিমাবোধ (Feeling of Superiority)
(১১) বশ্যতা প্রবৃত্তি (Instinct of Submission)	হীনমন্যতা (Feeling of Inferiority)
(১২) সংগ্রহ প্রবৃত্তি (Instinct of Acquisition)	অধিকারবোধ (Feeling of Ownership)
(১৩) সংগঠন প্রবৃত্তি (Instinct of Construction)	সৃষ্টির আনন্দ (Feeling of Creativeness)
(১৪) হাস্য প্রবৃত্তি (Instinct of Laughter)	কৌতুক বা আনন্দবোধ (Feeling of Amusement)

এই চৌদ্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও ম্যাকডুগাল কয়েকটি অপ্রধান প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। যেমন—হাসি, কাশি, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে পূর্বোক্ত চৌদ্দটি সহজাত প্রবণতার সঙ্গে ম্যাকডুগাল আরও তিনটি সহজাত প্রবণতাকে যুক্ত করে এই তালিকায় মোট সতেরটি সহজাত প্রবৃত্তির স্থান নির্দেশ করেছেন। এই নতুন তিনটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি মৌলিক আবেগ হল—

(১৫) বিশ্রাম প্রবৃত্তি (Instinct of Rest)	ক্লান্তিবোধ (Fatigue)
(১৬) আরাম প্রবণতা (Instinct of Ease)	দুঃখ বিমুখতা (Aversion to Pain)
(১৭) আবিষ্কার প্রবৃত্তি (Instinct of Exploration)	ভ্রমণস্পৃহা (Desire for Travels)

ম্যাকডুগালের মতে মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মনুষ্য উভয়েই এই সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে জ্ঞানমূলক উপাদান থাকার জন্য এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। যখন একাধিক সহজাত প্রবৃত্তি যুগপৎ ক্রিয়া করে, তখন আমরা একটি মিশ্র আবেগগত উত্তেজনা অনুভব করি এবং মিশ্র আবেগের মধ্যে মৌলিক আবেগের গুণগুলির কিছুটা অনুভব করতে পারি।[1]

1. "While two or more instincts are simultaneously at work in us, we experience a confused emotional excitement in which we can detect some thing of the qualities of the corresponding Primary emotion."
—McDougall: Outlines of Psychology; Page 128.

সমালোচনা : (১) ম্যাকডুগাল 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি হাঁচি, কাশি, চুলকান প্রভৃতি প্রক্রিয়াকেও সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু অনেক মনোবিদ এই ধরনের ক্রিয়াকে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী নন।

(২) ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে মানুষের জটিল ও বিচিত্র আচরণকে অত্যন্ত সরলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানুষের আচরণ এত জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, এত সহজ ও সরল সূত্রের সাহায্যে সেই কারণের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

তাছাড়া, ম্যাকডুগাল মানুষের সব বিচার-বুদ্ধিজনিত আচরণের (rational conduct) মূলে সহজ প্রবৃত্তির তাড়নাকে স্বীকার করে নিয়ে 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মনোবিদ্যায় 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয়।

(৩) মনোবিদ্ ড্রেভারের (*Drever*) মতে প্রতিটি আবেগের সঙ্গেই যে সহজাত প্রবৃত্তি যুক্ত থাকবে এমন কোন কথা নেই। আবেগ ছাড়াও সাহজিক ক্রিয়ার গতি অব্যাহত থাকতে পারে, তবে কোন কারণে সাহজিক ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলে আবেগের আবির্ভাব ঘটে।

মনোবিদ্ জেমসের (*James*) মতে প্রত্যেক আবেগের অনুগামী হিসেবে কোন সহজাত প্রবৃত্তিব অস্তিত্ব আছে, একথা বলা যেতে পারে না। সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যান করার জন্য আমাদের মধ্যে যে প্রশান্তির ভাব জাগে, তার সঙ্গে কোন সহজাত প্রবৃত্তি জড়িত আছে বলে মনে হয় না। তাছাডা, একই আবেগের ক্ষেত্রে একাধিক সহজাত প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ভয়ের আবেগ দেখা দিলে আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি এবং পলায়ন প্রবৃত্তি উভয়ই সক্রিয় হতে পারে। আবার বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে একই সহজাত প্রবৃত্তি ক্রিয়া করতে পারে। যেমন, পাখীর আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি ভয় ও ক্রোধ এই উভয় প্রকার আবেগের ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারে।

(৪) ম্যাকডুগালের তালিকাটি অভিনব হলেও বিজ্ঞানসম্মত নয়। সবক্ষেত্রেই সংগ্রাম প্রবৃত্তি থেকে ক্রোধের উদ্ভব হয় বা বাৎসল্য প্রবৃত্তি থেকেই স্নেহের উদ্ভব হয়, তা বলা যায় না।

ম্যাকডুগালের তালিকা বিজ্ঞানসম্মত নয়

(৫) ম্যাকডুগালের মতে সব সহজাত প্রবৃত্তিই অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। কিন্তু কোন কোন মনোবিদের মতে যৌন প্রবৃত্তি, বাৎসল্য প্রবৃত্তি, সংগ্রাম প্রবৃত্তি প্রভৃতি কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়, সামাজিক পরিবেশ থেকেও প্রাপ্ত।

সব সহজাত প্রবৃত্তিই অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নয়

(৬) যেসব প্রবণতাগুলিকে ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তি বলে আখ্যাত করেছেন, সেগুলি বিভিন্ন ধরনের। সে কারণে সবগুলিকে একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি, খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তি এবং যৌন প্রবৃত্তির সঙ্গে একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, যেহেতু শেষোক্ত সহজ প্রবৃত্তিগুলি মানুষের দেহ-সংগঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।[1]

সহজাত প্রবৃত্তিকে একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা চলে না

(৭) সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে মানুষের আচরণকে ব্যাখ্যা করার যে প্রচেষ্টা তা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের আচরণের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করে না, শুধুমাত্র বর্ণনা করে। পাখী ডিমে তা দেয় কেন, এর উত্তরে যদি বলা হয় ডিমে তা দেবার সহজাত প্রবৃত্তির জন্য; বা মানুষ ভীতিজনক বস্তু দেখে পালায় কেন, কারণ মানুষের পলায়ন প্রবৃত্তি আছে—তাহলে একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়। সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে কার্যের ব্যাখ্যা করা হলেও কার্যের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করা হয় না।

সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের আচরণের বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করে না

ম্যাকডুগালের তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি সহজাত প্রবৃত্তি এবং সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানেন নি। সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। আবেগের ধর্ম হল অনুভূতি এবং সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করা।

(৮) অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে সহজাত প্রবৃত্তি ও মতবাদ তত্ত্বের দিক থেকে যথার্থ বা অযথার্থ যাই হোক না কেন, ব্যবহারিক দিক থেকে মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এ মতবাদ খুব কাজে আসে না। মানুষ তার শৈশব অতিক্রম করার পর, নেহাৎ সহজ প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কাজ করে না, তার কাজ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। 'সহজাত প্রবৃত্তি' কথাটিকে অনেকে বংশগত অপরিবর্তনীয় কতকগুলি মৌলিক প্রবৃত্তি অর্থে গ্রহণ করেন এবং এই

মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তি ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বিশেষ উপযোগী নয়

1. "Another more justified criticism was that the tendencies McDougall called instinctive are of widely different types. Such tendencies as self-assertion, for example (which is far from specific whether in the situations that arouse it, or in the type of activity to which it gives rise) cannot readily be put in the same category as impulses like sex and hunger which involve specialised psychological mechanisms." Rex and Knight: An Introduction to Psychology, Page 185.

অর্থে তাঁরা মনে করেন যে, মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহজনক। অনেক আধুনিক মনোবিদ্ এই কারণে সহজাত প্রবৃত্তি শব্দটি ব্যবহার না করে, 'প্রেষণা' (Motive), নোদনা (Drive), চাহিদা (Need) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। তবে প্রেষণা, নোদনা প্রভৃতি যে শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন, তার দ্বারা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ধারণাকে অসার্থক প্রতিপন্ন করা যায় না। 'প্রেষণা' ও 'নোদনা'-র মাধ্যমে যাকে বোঝান হয়, সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমেও তাকেই বোঝান হয়েছে। মানুষ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু মানুষের এই সব বুদ্ধি-প্রসূত ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে অনেক ক্ষেত্রে তার পশ্চাতে কোন না কোন সহজাত প্রবৃত্তির বা প্রবণতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যেতে পারে। মানুষের আচরণের পিছনে সহজাত প্রবৃত্তির সক্রিয় প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না, যতই মানুষ তার লক্ষ্য, কিছু করার জন্য অভ্যাস ও বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করুক। সহজাত প্রবৃত্তির মানসিক উপাদানকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়াতে ম্যাক্‌ডুগালের সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেছে।

৬। সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি (Instinct and Intelligence) :

সহজাত প্রবৃত্তি হল জন্মগত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রবৃত্তি যেগুলি প্রাণীকে কতকগুলি জৈবিক অভাব এবং প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করে। সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষালব্ধ নয়। সহজাত প্রবৃত্তিবশে যে ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় তা প্রাণীর উদ্দেশ্যসাধন করে, যদিও প্রাণী তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূব থেকে সচেতন নয়। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে উপায়গুলি অবলম্বন করা হয় সেগুলি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় না। সহজাত প্রবৃত্তি যদিও জন্মগত তবু সব সহজাত প্রবৃত্তিই জন্মের সময় থেকে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে না।

বুদ্ধি হল একটা মানসিক শক্তি যার সহায়তার ব্যক্তি নতুন নতুন অবস্থায় সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। বুদ্ধির মধ্যে থাকে বিচার ও বিবেচনাশক্তি। বুদ্ধি হল সহজাত এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটে। বুদ্ধি প্রণোদিত কার্যেরও লক্ষ্য থাকে কোন উদ্দেশ্যসাধন করা। কিন্তু বুদ্ধি-প্রণোদিত কার্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ব-চেতনা থাকে এবং উদ্দেশ্যসাধনের উপায়গুলি পূর্ব থেকে স্থির করে নির্বাচন করা হয়।

মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল (*McDougall*) সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া এবং বিচার-বুদ্ধিজনিত ক্রিয়ার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ নির্দেশ করেছেন :

সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া হল উদ্দেশ্যমূলক, কিন্তু অনুরূপ পরিবেশের কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রাণী এ ধরনের ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বিচারবুদ্ধি-জনিত ক্রিয়ার লক্ষণ হল—প্রাণী পরিবেশের পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে লাভবান হতে পারে এবং এর সাহায্যে বর্তমান কার্যকে পরিচালিত করতে পারে। সহজাত প্রবৃত্তি হল উদ্দেশ্যমূলক কাজ করার জন্মগত ক্ষমতা, কিন্তু বুদ্ধি হল পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে জন্মগত ক্ষমতার মধ্যে উন্নতিসাধন করার ক্ষমতা।[1]

ম্যাকডুগালের অভিমত

অনেকে মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে একটা বৈপরীত্যের ভাব আছে। তাঁদের মতে ইতর প্রাণীর ক্রিয়া সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়; কিন্তু মানুষ পরিচালিত হয় বুদ্ধির দ্বারা, সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নয়।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি পরস্পর বিপরীত

সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধির পরিচালনা আছে কি নেই এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

জেম্‌স (*James*), স্পেন্সার (*Spencer*) প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি হল বুদ্ধিবিযুক্ত। সাহজিক ক্রিয়া অন্ধ প্রবৃত্তিবশে চালিত হয়। সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে সচেতন বুদ্ধি বিবেচনার কোন স্থান নেই। এই সব মনোবিদ্‌দের মতে সহজাত প্রবৃত্তিজনিত ক্রিয়া হল প্রতিবর্ত ক্রিয়া-শৃঙ্খল (chained reflex) এবং সাহজিক ক্রিয়া নিতান্তই যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। যে পাখীটি বাসা তৈরি করছে, সে পাখীটি যে তার অনাগত শাবকদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে, সে সম্পর্কে তার কোন সচেতনতা নেই। এমন কি সে যে একটা বাসা তৈরি করছে সে সম্পর্কেও সে সম্পূর্ণ সজাগ নয়।

জেমস্, স্পেন্সার প্রভৃতির মতে সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধিহীন

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে কিছুটা বৈপরীত্যের ভাব আছে তা অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু তবু উভয়ের মধ্যে খুব সুস্পষ্ট ভেদ রেখা টানা যায় না। বিচার-বুদ্ধিজনিত কাজের মধ্যে যে দূরদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়, সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার মধ্যেও তা লক্ষ্য করা যায়। মানুষ যেমন ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে, পিপীলিকা এবং মৌমাছিও তেমনি ভবিষ্যতের জন্য

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সাদৃশ্য

1. "We may properly call "instinctive" those actions of animals which seem to be purposive (i. e exhibit the mark of behaviour) and which are performed by any animal independently of previous experience of similar situations.'

"Intelligent action on the other hand, is generally defined as one which seems to show that the creature has profited by prior experience of similar situations that it somehow brings to bear its previous experience in the guidance of the present action. Instinct is native or inborn capacity for purposive action. Intelligence is the capacity to improve upon native tendency in the light of past experience.—McDougall; Outlines of Psychology. Page 70.

খাদ্য সঞ্চয় করে। বিচারবুদ্ধিজনিত কাজের মধ্যে যে একাগ্রতা, নিষ্ঠা, মনোযোগ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কার্যাবলীর ক্ষেত্রে এক নিবিড় যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়, মনুষ্যেতর প্রাণীর সহজাত ক্রিয়ার মধ্যেও এই গুণগুলি লক্ষ্য করা যায়। বিচারবুদ্ধিজনিত কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট চেতনা। কেন বাসা তৈরি করছে, সে সম্পর্কে পাখীর চেতনা না থাকলেও, সে যে বাসা তৈরি করছে, এ সম্পর্কে চেতনা তার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। অর্থাৎ লক্ষ্য সম্পর্কে পাখীর মধ্যে একটা অস্পষ্ট চেতনা আছে।

কিন্তু ম্যাকডুগাল, স্টাউট প্রমুখ মনোবিদ্‌গণ সাহজিক ক্রিয়ার এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধিবিযুক্ত নয় এবং সাহজিক ক্রিয়া অন্ধ প্রবৃত্তিবশে পরিচালিত হয়ে নিছক যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। যে পাখীটা খড়কুটো দিয়ে তার বাসা তৈরি করছে সে যে তার অনাগত শাবকদের আশ্রয়ের জন্যই বাসা তৈরি করছে এই চরম বা দূরবর্তী লক্ষ্য (ultimate or remote end) সম্পর্কে সে সচেতন না হতে পারে; কিন্তু অদূরবর্তী বা বর্তমান লক্ষ্য (proximate end) এবং সেই লক্ষ্যসাধনের জন্য যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে সে যে একেবারেই সচেতন নয় এমন কথা বলা চলে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অন্ধ নয়, তার মধ্যে কিছুটা দূরদর্শিতা আছে। যে পাখী ঠোঁটে করে খড়খুটো সংগ্রহ করছে, সে তার বাসা তৈরি করার জন্য যে কোন উপাদানই সংগ্রহ করে না, কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে এবং অপ্রয়োজনীয় উপাদান বর্জন করে। পাখীর এই উপাদান সংগ্রহের মধ্যে যে নির্বাচন ও বর্জনের বিষয়টি রয়েছে তা বুদ্ধিনির্ভর।

ম্যাকডুগাল, স্টাউট প্রভৃতির মতে সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে বুদ্ধির পরিচালনা আছে

থর্নডাইক (*Thorndike*) প্রমুখ একদল মনোবিদ্ মনে করেন যে, শিক্ষার ব্যাপারে মানুষ এবং ইতর প্রাণী উভয়েই ‘প্রচেষ্টা এবং ভুল সংশোধন পদ্ধতি’-র (Trial and Error Method) মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে এবং শিক্ষার ব্যাপারে সহজাত প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়। আবার স্টাউট, লয়েড মর্গান, মায়ার্স প্রভৃতি মনোবিদ্‌দের মতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি নিহিত থাকে এবং সে কারণেই ইতর প্রাণীর পক্ষেও বুদ্ধির সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবর্তিত করা সম্ভব হয়। যে কোন খাদ্যই খুঁটিয়ে খাবার জন্মগত প্রবৃত্তি মুরগীর বাচ্চার মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতার সহায়তায়

থর্নডাইকের অভিমত

সহজাত প্রবৃত্তি অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিবর্তিত হয়

সে অল্পদিনেই বুঝতে পারে কোন্‌টি অখাদ্য আর কোন্‌টি সুখাদ্য। শিকারী প্রাণী পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে তার শিকার করার পদ্ধতিকে নানাভাবে পরিবর্তিত করে। যে ইঁদুর একবার খাঁচা থেকে পালাবার সুযোগ পেয়েছে সেই ইঁদুর তার খাদ্য গ্রহণের সহজাত প্রবৃত্তিকে রোধ করে আর খাঁচার খাবারের দিকে পা বাড়ায় না। মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে বুদ্ধি-ও সহজাত প্রবৃত্তির পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়, যার জন্য ম্যাকডুগাল বলেন, "সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি কার্যসম্পাদন এবং পরিচালনার দুটি ভিন্ন নীতি নয়.. কোন বাহ্যলক্ষণের সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ এবং বৌদ্ধিক আচরণের মধ্যে তারতম্য করা যায় না।"[1]

বুদ্ধি ও সহজাত প্রবৃত্তির পারস্পরিক সহযোগিতা

অবশ্য এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যে বুদ্ধির কোন পরিচালনা থাকে না এবং সাহজিক ক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হওয়ার জন্যই, সহজাত প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়।

কিন্তু এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষা করাই-ত বুদ্ধির লক্ষণ। প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে প্রথম থেকেই বুদ্ধি নিহিত আছে এ কথা স্বীকার করে না নিলে প্রাণীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাহজিক ক্রিয়াকে পরিবর্তিত করার বিষয়টিকে স্বীকার করা সম্ভব হয় না। তা না হলে মনোবিদ্‌ স্টাউটের (*Stout*) ভাষায় আমাদের বলতে হয়, "পূর্ব-বুদ্ধির পরিণাম হিসেবেই প্রথম বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটছে" (intelligence first arises as a consequence of previous intelligence)। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত স্ব-বিরোধী, সেহেতু ভ্রান্ত।

অভিজ্ঞতার দ্বারা সাহজিক ক্রিয়ার পরিবর্তন। সাহজিক ক্রিয়ার বুদ্ধির উপস্থিতি নির্দেশ করে

সুতরাং, প্রাণীর সাহজিক ক্রিয়া যখন প্রথমবার সম্পন্ন হয়, তখনও তার মধ্যে বুদ্ধির পরিচালনা থাকে। তবে এ বুদ্ধি মানুষের সুপরিণতবুদ্ধির সমতুল নয়। সাহজিক ক্রিয়ার প্রথম প্রকাশের মধ্যেও প্রাণীর লক্ষ্য সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট চেতনা আছে যদিও প্রাণীর লক্ষ্য সম্পর্কে এই সচেতনতা, বাইরের লোকের কাছে, খুব সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না।[2]

1. "......Instinct and Intelligence are not two diverse principles of action or of guidance of action"......"instinctive behaviour is indistinguishable from intelligent behaviour by any outward mark."—McDougall. Ibid.

2. "In the first performance of an instinctive action, there will not be purely blind restlessness, but a rudimentary connection or active tendency directed towards an end which is an end for the animal itself and does not merely appear as if it were so to the external observer."
Stout : Manual of Psychology ; Page 345.

উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির তাডনাই প্রবল। সময় সময় মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে এমন অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় যে, তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বানরী তার মৃত সন্তানের মৃতদেহটি বহন করে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ায়। গরুর বাছুর মারা যাবার পর সেই মৃত বাছুরের চামড়া ও খড দিয়ে তৈরি নকল বাছুরকেই নিজের সন্তান বলে মনে করে গরু তার দেহ লেহন করে। মানুষের মধ্যেও সহজাত প্রবৃত্তি আছে; কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। জৈব প্রয়োজনের তাড়না অনুভব করা মাত্রই মানুষ ইতর প্রাণীর মতো সেগুলিকে চরিতার্থ করার জন্য উদ্যত হয় না। মানুষের বুদ্ধি তার উদ্দেশ্যের মূল্য নিরূপণে সহায়তা করে; তাই মানুষের বুদ্ধি তার সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত করে; কখনও বা তার নির্বুদ্ধিতার জন্য তাকে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে দেখা যায়।

মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণের ক্ষেত্রে অসংগতি

৭। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কি? (Has man instinct?)

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কি নেই, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ডারউইনের বিবর্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ (Darwin's Theory of Evolution) প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে একদল মনোবিদ্ মনে করতেন যে, মনুষ্যেতর প্রাণীই সহজাত প্রবৃত্তির অধীন। ক্ষুধা, বাসা নির্মাণ, যৌন-কামনা প্রভৃতি প্রবৃত্তির প্রকাশ মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। মনুষ্যেতর প্রাণীর সব ক্রিয়াই অন্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষ আত্মসচেতন বুদ্ধিমান জীব। মানুষের জীবন মূলতঃ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না। কিন্তু ডারউইন পরবর্তী যুগের মনোবিদ্‌গণ মনে করেন যে, মানুষের মধ্যেও অনেক প্রকারের সহজাত প্রবৃত্তি আছে, তবে মানুষ যেহেতু বুদ্ধিমান সে কারণে সে তার অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং প্রয়োজন হলে অবদমিত ও বর্জন করতে সক্ষম হয়।

ডারউইনের পূর্ববর্তী লেখকদের অভিমত

ডারউইন-পরবর্তী লেখকদের অভিমত

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের প্রথম বুঝে নেওয়া দরকার যে, 'সহজাত প্রবৃত্তি' শব্দটিকে কি অর্থে আমরা ব্যবহার

করব। যদি সহজাত প্রবৃত্তি বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি 'সহজাত অঙ্গসঞ্চালন প্রবণতা' (inborn motor aptitude), তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রবৃত্তির সংখ্যা খুবই অল্প। স্তন্যপান করা, কোন কিছু নিয়ে মুখে পুরে দেওয়া, মুখের মধ্যে কিছু দিলে তা কামড়ান, হামাগুড়ি দেওয়া, হাসা, কাঁদা প্রভৃতি আবেগের প্রকাশ—এই কয়েকটি মাত্র সহজাত প্রবৃত্তি আমরা মানুষের মধ্যে দেখি। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে গেলে মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে মানুষের তুলনায় সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা অনেক বেশী এবং তার প্রকাশও অনেকটা সুস্পষ্ট। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি বলতে যদি আমরা 'সহজাত মানসিক প্রবণতা' (innate mental aptitude) বুঝি তাহলে মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা মনুষ্যেতর প্রাণীর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। ম্যাকডুগাল যে চৌদ্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন, সেগুলি ছাড়াও আমরা আরও অনেক সহজাত প্রবৃত্তির কথাও বলতে পারি। এই অর্থে সহজাত প্রবৃত্তি বলতে জন্মগত অনুরাগ, আগ্রহ এবং বিশেষ কয়েক ধরনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষালাভ করার ক্ষমতাকেও বোঝাবে। এই অর্থে নিউটনের অঙ্কের প্রতি, মোজার্টের (*Mozart*) যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতি এবং ডারউইনের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি যে সহজাত অনুরাগ বা আগ্রহ, তাকেও সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

সহজাত প্রবৃত্তিকে কি অর্থে গ্রহণ করা হবে

কিন্তু মনোবিদ্যায় আমরা 'সহজাত প্রবৃত্তি'কে এতখানি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে প্রস্তুত নই। সহজাত প্রবৃত্তি বলতে আমরা বুঝব সেই সব প্রবৃত্তি যেগুলি শিক্ষালব্ধ নয় ও যেগুলি একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং যেগুলি প্রাণীর কতকগুলি জৈব প্রয়োজন মেটায় ও যা অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। কোন রকম মতবিরোধের মধ্যে না গিয়ে বলা যেতে পারে যে, পূর্বোক্ত অর্থে মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সব সহজাত প্রবৃত্তি হল কতকগুলি মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় প্রবৃত্তি, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই সব সহজাত প্রবৃত্তি তার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও রুচির প্রভাবে পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়। মনুষ্যেতর জীব ক্ষুধা বা যৌন কামনার তাড়না অনুভব করা মাত্রই তার তাড়নাকে পরিতৃপ্ত করতে চায়। মানুষও এই সব প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করে, তবে সভ্য মানুষ রুচিসম্মত ও সমাজ-অনুমোদিত পথে অগ্রসর হয়ে সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি থাকলেও, সে মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত না হয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধি

মানুষের কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি আছে তবে এগুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়

বা যুক্তির দ্বারাই চালিত হয়। পশুর প্রবৃত্তির প্রকাশ উন্মুক্ত ও অসংযত। মানুষের মধ্যে যদিও সেই একই সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তবু তার প্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রুচিসম্মত, সুসংযত ও সমাজসম্মত। মানুষের বুদ্ধিই তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে পরিবর্তিত করে।

৮। সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগ (Instinct and Emotion) :

যেসব জন্মগত প্রবৃত্তির বশে একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জীব কোনরূপ শিক্ষা বা পূর্ব-সঙ্কল্পের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এবং কাজের ফলাফল সম্পর্কে কোন পূর্ব-ধারণা না করে, বংশপরম্পরায় প্রায় একই রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে আত্মরক্ষা বা স্বজাতির মঙ্গলের জন্য একাধিক কাজ ধারাবাহিক ভাবে করে, সেই সব জন্মগত প্রবৃত্তিকে সহজাত প্রবৃত্তি বলা হয় এবং ক্রিয়াগুলিকে বলা যায় সাহজিক ক্রিয়া। পাখীর বাসা বাঁধার প্রবণতা, ডিমে তা দেওয়ার প্রয়াস, প্রাণীর আত্মরক্ষার প্রেরণা, শিশুর স্তন্যপান, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির উদাহরণ। অপরদিকে আবেগ হল এক ধরনের জটিল অনুভূতি; কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণা একে জাগরিত করে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য বিশেষ ধরনের কতকগুলি দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্য আমরা নানা রকম কাজে প্রবৃত্ত হই। ক্রোধ, ভয়, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি হল আবেগের উদাহরণ।

সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে পার্থক্য

সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং যদি কোন সম্পর্ক থাকেও, তাহলে সেই সম্পর্কের প্রকৃতি কি, এ বিষয়কে কেন্দ্র করে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে।

কোন কোন মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। বস্তুতঃ, দৈনন্দিন জীবনে উভয়ের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি কাজ সহজাত প্রবৃত্তিগত, না আবেগগত, কোন্‌টির বহিঃপ্রকাশ, বলা কঠিন হয়ে পড়ে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: একটি কুকুর যখন আক্রমণকারী কোন ব্যক্তিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে, তখন কুকুরের এই চিৎকারকে ক্রোধ বা ভয় আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করতে পারি বা 'আত্মরক্ষা' এই সহজাত প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বলে ধারণা করতে পারি। কোন ব্যাখ্যাই অযৌক্তিক নয়। আবার যে বস্তু আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে জাগরিত

সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

করে তা আমাদের মধ্যে আবেগেরও সঞ্চার করে। পায়ের কাছে একটা সাপ দেখলে আমরা আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে দূরে সরে যাই এবং ভয়ে আমাদের বুক দুরু দুরু করতে থাকে। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষারূপ সহজাত প্রবৃত্তি এবং 'ভয়' রূপ আবেগ, উভয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল সিদ্ধান্ত করলেন যে, উভয়ের মধ্যে একটি নিয়ত সম্বন্ধ (invariable relation) বর্তমান। ম্যাকডুগালের মতে, আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত অংশ (integral part)। যেখানে সহজাত প্রবৃত্তি আছে, সেখানে আবেগ আছে; যেখানে পলায়ন প্রবৃত্তি আছে, সেখানে ভয় আছে; যেখানে সংগ্রাম প্রবৃত্তি আছে, সেখানে ক্রোধ আছে, যেখানে বাৎসল্য প্রবৃত্তি আছে, সেখানে স্নেহ আছে; আবার যেখানে যৌন প্রবৃত্তি আছে, সেখানে কাম আছে। ম্যাকডুগাল চৌদ্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তির এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি করে আবেগের উপস্থিতির কথা বলেছেন।

ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে নিয়ত সম্পর্ক বর্তমান

অনেক মনোবিদ্ কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছুক নন। মনোবিদ্ ড্রেভার মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগের সম্পর্ক আছে বটে, তবে উভয়ের মধ্যে কোন অনিবার্য বা নিয়ত সম্পর্ক নেই। তাঁর মতে আবেগের অনুপস্থিতিতেও সাহজিক ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হতে পাবে; তবে সাহজিক ক্রিয়া কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলে আবেগ দেখা দেয়।

ড্রেভারের মতে উভয়ের মধ্যে কোন নিয়ত সম্পর্ক নেই

মনোবিদ্ স্টাউটের অভিমত ড্রেভারের অভিমতেরই অনুরূপ। তাঁর মতে আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল। আবেগ হল পরগাছা (Emotion is parasitical in character); অপরের উপরই আবেগের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

হেড (*Head*), মায়ার্স প্রভৃতি মনোবিদ্গণও মনে করেন যে, জীবনের ক্রমবিকাশের পথে সহজাত প্রবৃত্তির আবির্ভাব আবেগের পূর্বে ঘটেছে এবং আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তির একত্র উপস্থিতি বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেলেও, উভয়ের মধ্যে কোন অবিচ্ছেদ্য বা নিয়ত সম্পর্ক বর্তমান নেই।

হেড, মায়ার্স প্রভৃতির অভিমত

আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল, কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির সহগামী হলেও, উভয়ের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ আছে একথা বলা চলে না।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক আবেগের সঙ্গেই কোন-না-কোন সহজাত প্রবৃত্তি জড়িত আছে, এমন কথা বলা চলে না। সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যান করার জন্য আমাদের মনে যে উচ্চস্তরের নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উদয় হয়, তার সঙ্গে কোন সহজাত প্রবৃত্তির সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। আধ্যাত্মিক চিন্তায় যখন আমাদের মনে এক প্রশান্তির ভাব জাগে, তখন দেহে কোন রকম ক্রিয়াশীলতা থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তি পরস্পর জড়িয়ে থাকলেও, উভয় অভিন্ন একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও আছে। জেম্‌স বলেন, "আবেগ হচ্ছে অনুভূতি-প্রবণতা, আর সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে কর্ম-প্রবণতা" (An emotion is a tendency to feel and instinct an is a tendency to act)। আবার সাহজিক ক্রিয়া হল বহির্মুখী ; আবেগের বহিঃপ্রকাশ থাকলেও, আবেগ অন্তর্মুখী।[1]

ব্যবহারবাদী ওয়াটসনের অভিমতও জেমসের অভিমতের অনুরূপ। ওয়াটসনের মতে[2] উদ্দীপকজনিত উপযোজন (adjustment) যখন অভ্যন্তরীণ এবং ব্যক্তির দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন পাই আবেগ ; যেমন, লজ্জার ভাব। আর যখন উদ্দীপক সমস্ত দেহকেই বস্তুর সঙ্গে উপযোজনের জন্য পরিচালিত করে, তখনই পাই সহজাত প্রবৃত্তিকে ; যেমন, আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া। তাছাড়া, তাঁর মতে আবেগের ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তি সমস্ত দেহের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে তা উপযোজনের জন্য দেহের কয়েকটি অঙ্গে ঘনীভূত হয়। এই বিষয়টিকেই জেমস্ প্রকাশ করেছেন সংক্ষিপ্তভাবে—আবেগের ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি হল প্রচ্ছন্ন ব্যাপক ক্রিয়া, আর সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি হল সুপরিব্যক্ত, সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ।[3]

---

1. এ ছাড়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে জেমস্ বলেছেন "আবেগ সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার তুলনায় দূরপ্রসারী নয়, কারণ আবেগের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ ব্যক্তির দেহকে কেন্দ্র করেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিজনিত ক্রিয়া আরও অগ্রসর হয়ে অস্তিত্বশীল বস্তুর সঙ্গে কার্যকর সম্পর্কযুক্ত হয়"। "(Emotions fall short of instincts in that the emotional reaction usully terminates in the subject's own body whilst the instinctive reaction is apt go to farther and enter into particular relations with the existing objects.") —James : Principles of Psychology, Vol. II, Page 442.

2. When the adjustments called out by the stimulus are internal and confined to the subjeet's body we hate emotion e.g., blushing ; when the stimulus leads to adjustment of the organism as a whole to objects, we have instinct e. g., defence, responses, grasping etc."
—Watson ; Psychology from the standpoint of a Behaviorist, Page 227,

3. "......this means that while in emotion the organic energy scatters itself over the whole body, in instinct it is concentrated in certain limbs for the purpose of adaptation......In emotion the action is implicit mass action, whereas in instinct it is explicit, definitized and localised action."
—James ; Principles of Psychology, Vol. II, Page 262.

৯। অভ্যাস ও প্রবৃত্তি (Habit and Instinct):

সহজাত প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি বলে, এখানে এ প্রসঙ্গে আর সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

১০। প্রবৃত্তি ও শিক্ষা (Instinct and Education):

শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে কি সম্পর্ক তা নির্ণয় করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। আমরা এ সম্পর্ককে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করার প্রস্তাব করছি।

শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব (Effect of Instinct on Education): প্রাচীন শিক্ষাদর্শে শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ছিল অস্বীকৃত। অবশ্য এ অস্বীকৃতির মূলে অবৈজ্ঞানিক মনস্তাত্ত্বিক ধারণা কাজ করেছিল। প্রবৃত্তিকে নিম্নতর প্রাণীর অপরিহার্য ধর্ম বলে প্রাচীন কালে বিবেচনা করা হত। মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির প্রভাব স্বীকার করা অতি নিন্দনীয় ব্যাপার। প্রবৃত্তি-নিরোধই ছিল শিক্ষার সার্থকতা। প্রবৃত্তিকে পরিহার করে যুক্তিধর্মী হওয়াই শিক্ষার কাম্য। প্রবৃত্তিকে স্বীকার করার অর্থ নিম্নস্তরের আচরণকে মেনে নেওয়া।

অন্যদিকে প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তিবাদীরা বলেন, মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির প্রভাব অপরিসীম। শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে প্রবৃত্তিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি যে ভাবে প্রবৃত্তিনিয়ন্ত্রিত সেভাবে তার পরিণত জীবনের বিচিত্র ও জটিল আচরণাবলীও প্রবৃত্তিপ্রসূত। শৈশবের কৌতূহলপ্রবৃত্তিই পরিণত জীবনের শিক্ষা ও গবেষণার মূলে কাজ করে। শৈশবের আসঙ্গলিপ্সাই তার ভবিষ্যৎ জীবনের নানা সংগঠন-সৃষ্টি ও সমাজ-চেতনার কেন্দ্রশক্তিরূপে পরিণত হয়।

আধুনিক যুগে ম্যাকডুগাল মোটামুটি প্রবৃত্তিবাদীদের বক্তব্য সমর্থন করেছেন। তিনি প্রবৃত্তির যে সংব্যাখ্যান দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে, প্রবৃত্তি একা কোন আচরণ সংগঠিত করতে পারে না, প্রতিটি প্রবৃত্তির মূলে বর্তমান এক একটি প্রক্ষোভ। ব্যক্তির বিকাশে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ যৌথভাবে কাজ করে। শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রবৃত্তি ও তার সহযোগী প্রক্ষোভ সমানভাবে কাজ করছে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভগুলি নানা রসে (sentiment) পরিণত হয় এবং তখনই ব্যক্তিসত্তার গঠন শুরু হতে থাকে।

অবশ্য প্রবৃত্তি ও তার সহগামী প্রক্ষোভ ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি কিনা, বা কেবলমাত্র প্রবৃত্তিই ব্যক্তিত্বের সংগঠনী শক্তি, এ নিয়ে মত পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু প্রবৃত্তিবাদীরা এ ব্যাপারে একমত যে, ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির অপরিমিত প্রভাব এবং প্রবৃত্তিই মানুষের আচরণের প্রেরণা-শক্তি।

প্রাচীন শিক্ষাদর্শে প্রবৃত্তি-পরিহার মতবাদ যেমন বিজ্ঞানসম্মত নয়, তেমনি প্রবৃত্তিবাদীদের সংব্যাখ্যানও সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে সহজাত ও সক্রিয়, মানুষের উন্নততর আচরণের মূলে প্রবৃত্তি বর্তমান—একথা আমরা জানি। অন্যদিকে মানবাচরণে প্রবৃত্তির যে সর্বাত্মক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, তাও সমর্থনযোগ্য নয়।

'শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব'—এ প্রশ্নটি 'ব্যক্তিসত্তাগঠনে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব'—এ সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত। ব্যক্তিত্ববিকাশে বংশগতি একমাত্র নির্ণায়ক নয়। বংশগতি ও পরিবেশের যৌথক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান, এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রবৃত্তি বংশগতির একটি উপাদান। সুতরাং, শিক্ষাকে যদি ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায় হিসেবে বর্ণনা করি তবে প্রবৃত্তির যথেষ্ট ভূমিকা শিক্ষায় বর্তমান একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া পরিবেশের প্রভাবও রয়েছে প্রবৃত্তির উপর। পরিবেশ ও সহজাত প্রবৃত্তি যৌথভাবে শিশুর জীবনে নানা চাহিদা (needs) সৃষ্টি করে চলে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে এই চাহিদাই ব্যক্তিত্ব সংগঠনে সবচেয়ে বেশী কাজ করে। সহজাত চাহিদা (যেমন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন কামনা) সীমিত ও সার্বিক, কিন্তু পরিবেশগত চাহিদা (সামাজিক বা ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক চাহিদা) অফুরন্ত, সদা পরিবর্তনশীল, জটিল ও বহুমুখী। জীবনবিকাশের প্রাথমিক স্তরে শিশুর জীবনে প্রবৃত্তিজাত চাহিদারই আধিপত্য, কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সন্নিকর্ষে নিত্য নতুন চাহিদা শিশু অর্জন করে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিণতি নির্ভর করে এসব পরিবেশগত বা অর্জিত চাহিদার অতৃপ্তি বা তৃপ্তির উপর।

কিন্তু আমাদের এ আলোচনার এই অর্থ নয় যে শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিক্ষা একান্তভাবে প্রবৃত্তিনির্ভর নয়, কিন্তু প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক না হলে শিক্ষা অবাস্তব এবং জীবনবিরোধী হয়ে পড়বে। শিক্ষাবিদ্‌ ও শিক্ষক শিক্ষা প্রদান ও প্রবর্তনে প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হবেন। প্রবৃত্তিকে কিভাবে স্বীকার করে নিয়ে বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষাকে সার্থক, সক্রিয় ও ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন, এ নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি :

প্রথমতঃ, শিক্ষককে শিশুর জীবনবিকাশে প্রবৃত্তির প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষাকে প্রবৃত্তিমুখী করা চাই। তা না হলে শিক্ষা কৃত্রিম ও যান্ত্রিক হয়ে পড়বে। স্বভাববাদী (naturalist) শিক্ষাকে যখন স্বাভাবিক করে তুলতে চান তখন প্রবৃত্তির উপরই গুরুত্ব দেন বেশী। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক রুশো (Rousseau)

প্রবৃত্তির উপর এমন গুরুত্ব দিতে চান যে তিনি কোন সামাজিক চাহিদা বা পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করতে রাজী নন। রুশোর বক্তব্যে অত্যুক্তি থাকলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রবৃত্তিমুখী না হলে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও জীবনধর্মী হতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তির গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যসূচী রূপায়ণ ও শিক্ষা-প্রদান করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রবৃত্তি কিভাবে শিক্ষাসহায়ক হয়, শিক্ষকের দৃষ্টি সেদিকে থাকবে। সার্থক শিক্ষাদানে আগ্রহ, মনোযোগ ইত্যাদি অপরিহার্য। শিক্ষক যদি শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তিকে সুপরিচালিত করতে পারেন তবে শিশুর নানা বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ এবং মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ধিত হবে। শিক্ষায় আমরা যে সামাজিক আদর্শ ও সমাজচেতনতাকে লক্ষ্য রূপে স্থির করি, যৌথপ্রবৃত্তিকে সুপরিকল্পিত ভাবে শিক্ষায় মর্যাদা দিলে সে সব উদ্দেশ্যসাধন বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ, মানব-প্রবৃত্তিকে বিচিত্র ও বহুবিধ কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করে শিক্ষক শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে দিতে পারেন। যেমন—ঘৃণা প্রবৃত্তিকে অসঙ্গত, রুচিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে শিক্ষক শিশুর জীবনে রুচি ও সংস্কৃতিমূলক আচরণ বৃদ্ধি করতে পারেন। সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব এবং অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ক বস্তু সংগ্রহের কাজে লাগান যেতে পারে। অবশ্য প্রবৃত্তির এ রূপান্তরে পরিবেশ পরম সহায়ক।

প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব (Influence of Instinct on Education) : শিক্ষা প্রবৃত্তির উপর নানা প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, একথা অতি সুপ্রাচীনকাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কিন্তু শিক্ষায় প্রবৃত্তিকে কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করা উচিত এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। প্রবৃত্তির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ শিক্ষায় অভিপ্রেত। এ প্রসঙ্গে সাধারণতঃ তিনটি পন্থা লক্ষ্য করা যায় ;

(ক) **অবদমন** (Repression) : প্রাচীন শিক্ষাদর্শে প্রবৃত্তিনিরোধ সমর্থিত হয়েছিল। প্রবৃত্তি মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়, সুতরাং প্রবৃত্তিকে দমন করা চাই। মানসিক শৃঙ্খলা (mental discipline) মতবাদ যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বলেন, যখন কোন প্রবৃত্তির প্রকাশ অবাঞ্ছিত বলে মনে হবে, তখন সে প্রবৃত্তিকে দমন করা কর্তব্য।

কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান দেখিয়েছে প্রবৃত্তিনিরোধ মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। অবদমিত প্রবৃত্তি নানা মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে প্রতিবন্ধী হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) বিরেচন (Catharsis) : অবদমনের বিপরীত মতবাদ হল বিরেচন। প্রবৃত্তিকে যথাযথভাবে প্রকাশের সুযোগ দিতে হয়। ফ্রয়েড বলেন, প্রবৃত্তিকে দমন করার ফলে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেই বিশেষ প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ দ্বারা তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা যায়।

কিন্তু এ মতবাদও নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত প্রকাশ ব্যক্তির জীবনে ও সমাজ-জীবনে অনেক অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, যুযুৎসা প্রবৃত্তি, বা যৌন প্রবৃত্তিকে যদি অবাধ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় তবে সমাজ-জীবনে নানা বিশৃঙ্খলা এবং অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যার পরিণামে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে বসবাস মোটেই আকর্ষণযোগ্য হবে না।

(গ) উন্নীতকরণ (Sublimation) : উন্নীতকরণ মতবাদ পূর্বোক্ত দুই বিরোধী মতবাদের মধ্যবর্তী পন্থা। এ মতবাদ অবদমনকেও যেমন সমর্থন করে না, তেমন প্রবৃত্তির অবাধ বহিঃপ্রকাশকেও সমর্থন করে না। উন্নীতকরণ মতবাদ বিশ্বাস করে প্রবৃত্তি দমন করার অর্থ প্রবৃত্তির জৈবিক দিককে অস্বীকার করা, আর প্রবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশের অর্থ মানবজীবনের বুদ্ধিগত দিককে অস্বীকার করা। উন্নীতকরণ পন্থায় প্রবৃত্তিগুলির অবাঞ্ছিত প্রকাশকে রোধ করে সমাজ ও ব্যক্তির মঙ্গলাদর্শে প্রবৃত্তির অভিপ্রেত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা বোঝায়।

'উন্নীতকরণ' শব্দটি সর্বপ্রথম ফ্রয়েডপন্থীরা (Freudians) ব্যবহার করেন। যৌন প্রবৃত্তির তাড়নাকে উন্নততর সামাজিক ধারায় প্রধাবিত করা প্রসঙ্গে প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ করা উচিত বলে তাঁরা মনে করেন। অবশ্য অধুনা 'উন্নীতকরণ' শব্দটি সকল প্রকার প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, কেবলমাত্র যৌন প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এটা সীমিত নয়। ম্যাকডুগাল 'উন্নীতকরণ' শব্দের সংব্যাখ্যানে বলেছেন, এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা সহজাতপ্রবৃত্তিমূলক শক্তিগুলিকে আমরা বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত করে সমাজ-সংস্কৃতিমূলক উন্নততর কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ, শিশুর যৌন প্রবৃত্তিকে নানা সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকাশ করাতে পারি, শিশুর যুযুৎসা প্রবৃত্তিকে খেলাধূলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর আচরণের রূপ দিতে পারি। শিক্ষায় আমরা আচরণের যে পরিবর্তন কামনা করি, সে পরিবর্তন অনেকটাই প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ। মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি প্রভৃতি প্রবৃত্তির উন্নত প্রকাশ। এজন্য সকল প্রকার শিক্ষাকে সহজাত ধর্ম ও প্রক্ষোভের শিক্ষা বলে আখ্যাত করা হয়।

১১। প্রবৃত্তি কি শিক্ষাযোগ্য ? (Is Instinct Educable ?) :

প্রবৃত্তি সহজাত (innate), শিক্ষা-অর্জিত (acquired) নয় ; সুতরাং, সহজাত যে প্রবৃত্তি সে কি শিক্ষাযোগ্য অর্থাৎ, প্রবৃত্তির প্রকাশে আমরা কি বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন আনতে পারি ? মানব প্রবৃত্তি সহজাত, কিন্তু নমনীয় (Plastic), সম্পূর্ণ অন্ধ নয়। শিক্ষায় আমরা প্রবৃত্তি-বিনাশ কামনা করি না, কিন্তু প্রবৃত্তির অসংযত, অনিয়ন্ত্রিত এবং অবাধ প্রকাশও সমর্থন করি না। প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রবৃত্তির বিলুপ্তি উচিত নয়। মনোবিজ্ঞানী জেম্‌স মনে করেন, প্রবৃত্তির বিকাশপথ রুদ্ধ করলে প্রবৃত্তির অবলুপ্তি ঘটানো যায়। কিন্তু প্রবৃত্তি-নিরোধ জৈবিক দিক থেকে অসঙ্গত ও জীবন বিকাশের পরিপন্থী। সুতরাং আমরা প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে উন্নীতকরণ পন্থাই সমর্থন করি। প্রবৃত্তি শিক্ষার যোগ্য বলেই আমরা বিশ্বাস করি। প্রবৃত্তি সহজাত, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ নিম্নপ্রাণীর ক্ষেত্রে যেভাবে বৈচিত্র্যহীন এবং একরূপ (uniform), মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। মানবপ্রবৃত্তি শিক্ষার দ্বারা নানা বিকাশপথ খুঁজে বিচিত্রধারায় প্রধাবিত হয়ে মানব-প্রকৃতিতে নানা পরিবর্তন, প্রবণতা ও রসের লীলা-খেলা সৃষ্টি করে। তাই প্রবৃত্তি সহজাত হলেও তার সার্থক পরিণতির জন্য শিক্ষানির্ভর, এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

চতুর্দশ অধ্যায়

আবেগ বা প্রক্ষোভ

(Emotion)

১। আবেগ বা প্রক্ষোভের স্বরূপ (Nature of Emotion) :

বিভিন্ন মনোবিদ্ আবেগের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। কোন কোন মনোবিদের মতে, **আবেগ হল দৈহিক পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত একজাতীয় সংবেদন**। কোন কোন মনোবিদের মতে **আবেগ হল অতীত সুখ-দুঃখের পুনরাবির্ভাব**। আবার কোন কোন মনোবিদের মতে **আবেগ হল কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী আচরণ করার প্রবণতা এবং এটি একপ্রকার ইচ্ছামূলক চেতনা**।

আবেগের সংজ্ঞা

আবেগের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে—**আবেগ বা প্রক্ষোভ হল এমন এক ধরনের জটিল অনুভূতি যার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান ; কোন বিশেষ বস্তু** বা **ধারণা একে জাগরিত করে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য এমন কতকগুলি বিশেষ ধরনের দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্য আমরা নানারকম কাজে প্রবৃত্ত হই**। **ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি আবেগের উদাহরণ**।

আবেগের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত দিকগুলি লক্ষ্য করা যায়: (১) আবেগ সৃষ্ট হয় কোন ভাব বা ধারণার দ্বারা, কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার ফলেও আবেগের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু আসলে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার ফলে কোন ভাব বা ধারণা মনে জাগরিত হয় এবং ধারণাটি আবেগের সৃষ্টি করে।

(২) আবেগ হল একটি জটিল অনুভূতি, অর্থাৎ সুখ দুঃখ বা এ জাতীয় কোনরূপ অনুভূতির অভিজ্ঞতা।

(৩) আবেগ জাগরিত হলে দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়।

(৪) আবেগের ক্ষেত্রে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে কতকগুলি বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। যেমন, ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করা, দাঁত কড়মড় করা, মুষ্টি বদ্ধ করা, ভ্রূকুটি করা ইত্যাদি।

(৫) আবেগ আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে ; যেমন, ভয় পেলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করি বা আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

মনোবিদ্ জেম্‌স-এর মতে বস্তুর প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি করে, তাই হল আবেগ। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল-এর মতে আমাদের সব রকম আচরণ ও চিন্তার মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান। প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে একটি করে আবেগ। এই আবেগ যখন প্রাণীর মনে জাগে, তখন ঐ সহজাত প্রবৃত্তিটি কার্যকর হয়ে ওঠে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পলায়নবৃত্তি হল একটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে মৌলিক আবেগ সেটি হল ভয়। প্রাণীর মনে যখন ভয় জাগে তখন ঐ সহজাত প্রবৃত্তিটি অর্থাৎ পলায়ন প্রবৃত্তিটি কার্যকর হয়।

জেম্‌স এর মত

ম্যাকডুগাল এর মত

মনোবিদ্ মেলন (*Mellone*) আবেগের দুটি উপাদানের কথা বলেছেন :

(i) **মানসিক দিক :** (ক) কোন একটা অবস্থা বা পরিস্থিতি (situation) প্রত্যক্ষ করা, স্মরণ করা, কল্পনা করা বা চিন্তা করা। এই পরিস্থিতি ব্যক্তির জাগতিক, মানসিক, সামাজিক বা উচ্চতর কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। (খ) একটা অনুভূতির দিক যা সুখকর বা দুঃখজনক। (গ) কর্ম করার প্রবৃত্তি এবং (ঘ) দৈহিক সংবেদন ও পেশীগত সংবেদন। আর (ii) **দৈহিক দিক :** (ক) দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং (খ) পেশী সঞ্চালন।

পূর্বোক্ত উপাদানগুলি মিলিত হয়ে আবেগ সৃষ্টি করে।

প্রথমতঃ, কোন একটি অবস্থা বা পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলে, কল্পনা করলে, স্মরণ করলে বা চিন্তা করলে আবেগ জাগরিত হয়। যেমন, ছাড়া বাঘ দেখলে মনে ভয় জাগে ; অতীত দুর্ঘটনার কথা চিন্তা করলে মনে ভয় জাগে।

দ্বিতীয়তঃ, আবেগের একটা অনুভূতির দিক আছে যা হয় সুখজনক বা দুঃখজনক। যেমন, ভীতি যে অনুভূতি সৃষ্টি করে তা সুখকর নয়।

তৃতীয়তঃ, আবেগ ইচ্ছার উপর ক্রিয়া করে এবং আমাদের মধ্যে কর্মপ্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। সে কারণে বাঘ দেখে যখন মনে ভয়ের আবেগ জাগে তখন আমরা পালাবার জন্য সঙ্কল্প করি।

চতুর্থতঃ, আবেগ দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সেই উদ্দীপনা যখন সংবেদনবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছয়, তখন কতকগুলি দৈহিক সংবেদনের সৃষ্টি হয়। এই দৈহিক সংবেদন আবেগের প্রয়োজনীয় অংশস্বরূপ।

পঞ্চমতঃ, আবেগ পেশীগুলির মধ্যে গতি সঞ্চার করে। এই সঞ্চালনের ফলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সেই উদ্দীপনা যখন সংবেদনবাহী-স্নায়ু মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় তখন পেশীগত সংবেদন (motor sensation) সৃষ্টি হয়।

সুতরাং আবেগের মধ্যে জ্ঞানগত, অনুভূতিমূলক এবং ইচ্ছাগত তিনটি দিকই বর্তমান। প্রত্যক্ষণ, কল্পনা বা স্মরণ হল জ্ঞানগত দিক, সুখ-দুঃখের অনুভূতি হল অনুভূতিমূলক দিক এবং কর্মপ্রবৃত্তি হল ইচ্ছামূলক দিক।

২। আবেগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Emotion) :

মনোবিদ্ স্টাউট আবেগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

(ক) আবেগের ব্যাপক পরিধি (Wide Range) : প্রত্যক্ষণ থেকে আরম্ভ করে ধারণা পর্যন্ত—মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই আবেগ দৃষ্টিগোচর হয়। বিড়ালের বাচ্চাটির গায়ে হাত দিলে বিড়ালটি রেগে যায়। একটি শিশুর কাছ থেকে খেলনাটি কেড়ে নিলে সে ক্রুদ্ধ হয়। উভয় ক্ষেত্রে ক্রোধরূপ আবেগটি উদ্দীপিত হচ্ছে প্রত্যক্ষণের দ্বারা। আমরা ক্রুদ্ধ হই যখন অতীতের অপমানের কথা স্মরণ করি। এক্ষেত্রে স্মরণক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে। আমরা যখন কল্পনা করি যে, আমাদের শত্রু সুযোগ পেলেই আমাদের আঘাত করবে তখনই মনে ক্রোধের উদ্রেক হয়। এক্ষেত্রে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে কল্পনার মাধ্যমে। আবার যখন অন্য ব্যক্তি আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝতে চায় না, তখনও আমরা ক্রুদ্ধ হই। এক্ষেত্রে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে চিন্তার দ্বারা। সুতরাং মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই একই আবেগ দৃষ্ট হচ্ছে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই আবেগের মূলে রয়েছে কোন ধারণা। এই আবেগ মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীব সকলের ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে।

(খ) একই আবেগ বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে (Varied Nature of the Conditions) : একটি বিশেষ আবেগ, যেমন—ভয়, বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে। আমাদের সামনে যদি একটা পাগলা কুকুর দেখি তাহলে আমরা ভীত হই। ভাল চাকরিটা অপরের ষড়যন্ত্রে হারাতে পারি এই ভয়ে ভীত হই। আবার কোন প্রিয়জনের আকস্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে—এই ভয়ে ভীত হই। একই ভয় নানা কারণে উদ্দীপিত হচ্ছে। কোন কুকুরের কাছ থেকে তার খাবার কেড়ে নিয়ে আমরা তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারি, বা তার বাচ্চাদের বিরক্ত করে বা তার লেজ ধরে টানাটানি করেও তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারি। এভাবে একই ক্রোধ নানা কারণে জাগছে। মনোবিদ্ স্টাউট-এর মতে, কোন বিশেষ ধরনের অবস্থা বা পরিস্থিতিই বিশেষ ধরনের

আবেগ জাগিয়ে তোলে।[1] আবেগটি যে আচরণের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে তা বস্তুবিশেষের তারতম্যের উপর নির্ভর করে না। যেমন—কুকুরকে যেভাবেই ক্রুদ্ধ করে তোলা যাক না কেন, তার বাইরের আচরণ মোটামুটি একই প্রকৃতির। যেমন—দাঁত দেখান, গর্জন করা, কামড়াবার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

(গ) আবেগ জাগার কারণ ঃ প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষণ, চিন্তা, কল্পনা, স্মরণক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে আবেগ জাগতে পারে ; যেমন—ভাল সংবাদ পেলে মনে আনন্দের আবেগ জাগে। আবার দৈহিক পরিবর্তনের (organic changes) ফলেও আবেগ জাগতে পারে : যেমন—কোন মানুষ মদ্যপান করে আনন্দ লাভ করে।

(ঘ) কোন আবেগ উদ্দীপিত হলে তা একটা মেজাজ (Mood) সৃষ্টি করে যার মাধ্যমে আবেগটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় ঃ যখন আমাদের মনে কোন আবেগ জেগে ওঠে, সেই আবেগের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পরও আবেগটি স্থায়ী হয়। সেই আবেগ একটা আবেগের মেজাজ (emotional mood) সৃষ্টি করে। যদি কোন কারণে আমরা ক্রুদ্ধ হই, তখন অনেক সময় লক্ষ্য করি যে, আমাদের ক্রোধের উপশম হলেও একটা খিটখিটে ভাব বা বদমেজাজ অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে যার জন্য যেকোন সামান্য উত্তেজনাতেই আমরা আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি।

(ঙ) আবেগ হল পরাশ্রয়ী (Parasitical) : আবেগ পরাশ্রয়ী, যেহেতু সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই আবেগ উদ্ভূত হয়। ক্ষুধার্ত কুকুরের সামনে থেকে যদি মাংসের টুকরোটি কেড়ে নেওয়া হয়-তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়। এই ক্রোধের কারণ তার ক্ষুধার প্রবৃত্তিকে মেটাবার পথে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। ক্ষুধা হল তার সহজাত প্রবৃত্তি। যদি কোন বিড়ালীর নবজাত সন্তানকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবে ; কারণ, অপত্য স্নেহের পথে বাধার সঞ্চার হচ্ছে। তার মাতৃত্বই তাকে তার সন্তান রক্ষা করার জন্য প্রবৃত্ত করে। মাতৃত্ব হল সহজাত প্রবৃত্তি। সুতরাং আবেগের পূর্বাবস্থাই হল সহজাত প্রবৃত্তি। সে কারণেই মনোবিদ্ স্টাউট বলেছেন যে, আবেগ হল পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির পরগাছা।

(চ) তীব্র আবেগের ক্ষেত্রে দৈহিক সংবেদন (Organic Sensation) : যখনই আমাদের মধ্যে কোন আবেগ তীব্র হয়ে ওঠে ; যেমন, অতিরিক্ত ভীতি বা ক্রোধ, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে দৈহিক সংবেদন দেখা দেয়। মনোবিদ্ জেম্‌স-এর মতে এসব দৈহিক সংবেদনই হল আবেগ।

---

1. "It is a certain general kind of situation, not a specific class of objects which excites a certain kind of emotion."

—Stout : Manual of psychology ; Page 368.

মনোবিদ্ স্টাউট প্রদত্ত পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও আমরা আবেগের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। (ছ) **আবেগের আবির্ভাব আকস্মিকভাবে ঘটে থাকে :** যে ব্যক্তি কিছু পূর্বেও বেশ শান্ত ছিল, হঠাৎ সামান্য উত্তেজনায় সে এমন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠল যে তার আবেগের এই তীব্রতা বিস্ময়কর বলে মনে হয়।

(জ) **আবেগ অনেক সময় আমাদের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে :** অনেক সময় খুব বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও ক্রোধবশতঃ অপরের প্রতি এমন দৃঢ় আচরণ করে যে, সাময়িকভাবে সে তার সকল রকম বিচারক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় আবেগবশতঃ মানুষ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় বা আত্মহত্যা করে থাকে।

যদিও আবেগের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমরা মনে করি তবু সব আবেগের ক্ষেত্রেই যে বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা নয়। তীব্র আবেগের ক্ষেত্রে (যেমন—ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি) এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেরূপভাবে প্রকাশিত হয়, মৃদু আবেগের ক্ষেত্রে (স্নেহ, প্রেম, সহানুভূতি প্রভৃতি) এগুলি সেরূপভাবে প্রকাশিত হয় না।

৩। আবেগ ও দৈহিক পরিবর্তন : জেম্‌স-ল্যাঙ্গ মতবাদ (Emotion and Organic changes : James-Lange Theory) :

আবেগের দুটি দিক আছে—একটি হল মানসিক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক এবং অপরটি হল দৈহিক পরিবর্তনের দিক।

প্রশ্ন হল, কোন্‌টি আগে? অর্থাৎ, প্রথমে আবেগ জাগে এবং পরে দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়, না প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং তারপর আবেগটি জাগে? যেমন, যখন কোন ব্যক্তি বাঘ দেখে, তখন প্রথমে সে ভয় পায় এবং তারপর দৌড়ে পালায়, না প্রথমে সে দৌড়ায় পরে ভয় পায়?

সাধারণ মতানুযায়ী প্রথমে আমাদের মধ্যে আবেগ উদ্দীপিত হয় এবং তারপর কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। যেমন, কোন একটি লোক একটি পাগলা কুকুর দেখে 'ভয়' পেল—অর্থাৎ তার মধ্যে 'ভয়' এই আবেগটি জাগল, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সে দৌড়ে পালাল। সুতরাং লৌকিক মতানুযায়ী প্রথমে আবেগ, তারপর দৈহিক পরিবর্তন। আবেগ দৈহিক প্রকাশের পূর্বগামী।

আবেগ দৈহিক প্রকাশের পূর্বগামী

কিন্তু আমেরিকান মনোবিদ্ উইলিয়াম জেম্‌স ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং ড্যানিস শরীরতত্ত্ববিদ কার্ল ল্যাঙ্গ (*Carl Lange*) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মতবাদের ঠিক বিপরীত একটি মতবাদ উপস্থিত করেন। তাঁদের মতে আবেগ হল দৈহিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ। দেহগত পরিবর্তন যে দৈহিক সংবেদন (organic sensations) সৃষ্টি করে, সেই দৈহিক সংবেদন হল আবেগ।

জেম্‌স ও ল্যাঙ্গ-এর মতে দৈহিক সংবেদনই আবেগ

জেম্‌স-এর মতে দৈহিক পরিবর্তন আবেগের অনুগামী নয়, পূর্বগামী। তাঁর মতে, আমরা যখন কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে। সংবেদনবাহী স্নায়ু এই পরিবর্তনের সংবাদ মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় ও তার ফলে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি হয় এবং আবেগ হল এই দৈহিক সংবেদনের অনুভূতি। কোন একটি লোক যখন তার সামনে একটি বুনো ভালুক দেখতে পেল, তখন বুনো ভালুকটি দেখা মাত্রই তার মস্তিষ্কে উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। সেই স্নায়বিক উদ্দীপনা স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে নানা প্রকার শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই প্রতিক্রিয়াগুলি ঘটার ফলে স্নায়বিক উদ্দীপনা স্নায়ুপথ বেয়ে আবার মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছল, তার ফলে 'ভয়'—এই আবেগের সৃষ্টি হল। সুতরাং **জেম্‌স-এর মতে প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন, তারপর আবেগ। প্রথমে আবেগ তারপর দৈহিক পরিবর্তন নয়।**

প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন এবং পরে আবেগ

জেমস্‌-এর মত এবং সাধারণ মত : জেম্‌স-এর মতানুযায়ী আবেগ অনুভব করার প্রক্রিয়াটি হল :

পরিস্থিতি→দেহগত পরিবর্তন→দৈহিক সংবেদন বা **আবেগ**

সাধারণ মতানুযায়ী এই প্রক্রিয়াটি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত।

যথা—**পরিস্থিতি→আবেগ→দেহগত পরিবর্তন→দৈহিক সংবেদন**

জেম্‌স তাঁর মতবাদের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন।

জেম্‌স-এর যুক্তি : (ক) জেম্‌স-এর মতে প্রত্যক্ষণ এবং দৈহিক সংবেদনের মাঝামাঝি আবেগ বলে কিছুই নেই। অন্ধকারে যদি আমরা কোন একটি অজানা মূর্তিকে বন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার স্বাভাবিক গতি বাধা প্রাপ্ত হয়। কোন রকম ভয়ের ধারণা করার পূর্বেই দেহগত পরিবর্তনগুলি ঘটে যায়। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ এবং দেহগত পরিবর্তনের মাঝামাঝি কোন আবেগ মনে উদ্দীপিত হয়েছে বলে আমরা অনুভব করি না। বস্তুটি প্রত্যক্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই দেহগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সুতরাং যাকে আবেগ বলছি তা দেহগত পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়।[1]

আবেগ দেহগত পরিবর্তন ছাড়া কিছুই নয়

1. জেম্‌স বলেন, "আমার মতবাদটি হল, উত্তেজনামূলক বস্তু প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক পরিবর্তন তার অনুগামী হয় এবং সেই পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের যে অনুভূতি তা-ই হল আবেগ। সাধারণ বুদ্ধি বলে, আমাদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে, আমরা দুঃখিত হই এবং ক্রন্দন করি। একটি ভালুকের

(খ) যদি আমরা কোন একটি আবেগ সম্পর্কে মনে মনে চিন্তা করি এবং এই আবেগের যে দৈহিক প্রকাশ সেগুলিকে যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আবেগের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না; যা অবশিষ্ট থাকবে তাহল, 'উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষণ' (a cold and neutral state of intellectual perception)। দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আমরা কোন আবেগের কথা ভাবতে পারি না। কোন লোক ক্রুদ্ধ হয়েছে অথচ ক্রোধের কোনরূপ বাহ্যিক প্রকাশ, যেমন—ভ্রুকুটি করা, দাঁত কড়মড় করা, নাসিকা স্ফীত করা বা ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেওয়া, কোনটিই প্রকাশ করছে না—এ আমারা ভাবতেই পারি না। জেম্‌স বলেন, "কায়াহীন মনুষ্য-আবেগ অলীক বস্তু ছাড়া কিছুই নয়" (A disembodied human emotion is a sheer non-entity)।

দৈহিক প্রকাশ ভিন্ন আবেগ হল উত্তেজনাহীন বুদ্ধিগত প্রত্যক্ষণ

(গ) আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে যদি রুদ্ধ করা যায়, তাহলে আবেগটিও তিরোহিত হয়। ক্রোধের সময় ক্রোধকে রোধ করার উপায় হল ক্রোধের বহিঃপ্রকাশকে প্রকাশ হওয়ার সুযোগ না দেওয়া।

(ঘ) মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের (pathological cases) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাহ্য জগতের কোন উদ্দীপক ছাড়াই তাদের মনে আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। উন্মাদ বা মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত রুগীদের (hysterical patient) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কখনও তারা হাসছে, কখনও কাঁদছে বা কখনও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাহ্যিক কারণ ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের আবেগ—যেমন, রাগ, আনন্দ, দুঃখ তাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এ কিভাবে সম্ভব? এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র দৈহিক অবস্থা বা পরিবর্তনের ফলেই আবেগ জন্মাতে পারে।

বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উদ্দীপক ছাড়াই আবেগ সৃষ্ট হয়

(ঙ) কৃত্রিমভাবে যদি আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে ঘটানো যায়, তাহলে মনের মধ্যে আবেগের সঞ্চার হয়। অনেক সময় দেখা যায় অভিনয় করার সময় ক্রোধ, দুঃখ, বিরক্তি, ভয় প্রভৃতি আবেগের বহিঃপ্রকাশকে বাইরে ঘটাবার প্রচেষ্টায় অভিনেতাদের মনে সেই সব আবেগ জেগে ওঠে।

কৃত্রিমভাবে দেহগত প্রকাশ দ্বারা আবেগ সৃষ্টি

সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, আমরা ভীত হই এবং দৌড়াই। আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বারা আমরা অপমানিত হই, আমরা ক্রুদ্ধ হই, আঘাত করি।" অধিক যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হল, "আমরা কাঁদি বলেই দুঃখ অনুভব করি, আমরা আঘাত করি বলেই ক্রুদ্ধ হই, আমরা কাঁপি বলেই ভীত হই এবং দুঃখিত হই, ক্রুদ্ধ হই বা ভীত হই বলে কাঁদি, আঘাত করি বা কাঁপি।"—W. James—Text Book of Psychology, Page 375-76.

(চ) মাদক দ্রব্য এবং উত্তেজক বস্তু গ্রহণ করার পর দেখা গেছে, অনেক লোক বেশ প্রফুল্ল বোধ করছে বা কেউ কেউ খুব সাহসী হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে দেহগত অবস্থাই যে আবেগগুলিকে জাগিয়ে তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মাদক দ্রব্য দেহগত অবস্থার পরিবর্তন এনে আবেগ সৃষ্টি করে

(ছ) দৈহিক প্রকাশের মাত্রাকে যতই বাড়ানো যায় আবেগও সে অনুপাতে বাড়তে থাকে। ভয়ের সময় মানুষ যত অধিক কাঁপতে থাকে, ভয়ের মাত্রা সে অনুপাতে বাড়তে থাকে। রাগের সময় যত বেশী হৈ-চৈ করা যায়, রাগও সেই পরিমাণে আরও বেড়ে যায়।

দৈহিক প্রকাশ বাড়লে আবেগ বাড়ে

পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে জেম্‌স (*James*) বলতে চান যে, কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করার ফলে যে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং এ সকল দৈহিক পরিবর্তন যে দৈহিক সংবেদন (organic sensation) সৃষ্টি করে তা-ই হল আবেগ। **আবেগ দৈহিক সংবেদন ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছুই নয়।**

ড্যানিশ মনোবিদ্ কার্ল ল্যাঙ্গ (*Carl Lange*) পূর্বোক্ত মতবাদটিকে স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর মতবাদে বাহ্-নিয়ামক প্রতিক্রিয়া (vaso-motor reactions) এবং আন্তরযন্ত্রীয় প্রতিক্রিয়ার (visceral reactions) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ল্যাঙ্গ-এর মতে আবেগের মধ্যে দুটি উপাদান আছে—একটি হল কারণ (cause) এবং অপরটি হল কার্য (effect)। কারণ হল কোন প্রত্যক্ষণ বা ধারণা ও কার্য হল বাহ্-নিয়ামক প্রতিক্রিয়া (Vaso-motor reactions) বা দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত-প্রবাহগত পরিবর্তন এবং তার ফলে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন। উভয়ের অন্তবর্তী হিসেবে কোন অনুভূতির স্থান নেই। ল্যাঙ্গও মনে করেন যে, আবেগ হল অনুভূতি-বর্জিত দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি। তিনি বলেন, "আমাদের মানসিক জীবনের সমগ্র আবেগময় দিকটি, আমাদের আনন্দ এবং বেদনা, সুখ এবং দুঃখ—এ সব কিছুর জন্যই আমাদের বাহ্-নিয়ামক প্রণালীর (Vaso-motor system) কথা চিন্তা করতে হবে।

কার্ল ল্যাঙ্গ-এর মতবাদ

যেহেতু ল্যাঙ্গ স্বাধীনভাবে জেম্‌স-এর পূর্বোক্ত মতটিকেই সমর্থন করেছেন সেহেতু মতবাদটিকে জেম্‌স-ল্যাঙ্গ মতবাদ নামে অভিহিত করা হয়।

জেম্‌স-ল্যাঙ্গ মতবাদের সমালোচনা (Criticism of the James-Lange Theory) : জেম্‌স-ল্যাঙ্গ-এর মতবাদের মধ্যে যে বেশ কিছুটা অভিনবত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই। এই অভিনবত্বের জন্যই একদিন এই মতবাদ মনোবিজ্ঞান জগতে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি

সমালোচনা

করেছিল এবং বহু মনোবিদ্‌কে এ বিষয়ে গবেষণাকার্যে প্রণোদিত করেছিল। এই সব গবেষণাও প্রমাণ করেছে যে দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের একমাত্র কারণ নয়। কোন রকম মানসিক অনুভূতি ছাড়া আবেগ সম্ভব নয়। সমালোচকরা এই মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন :

দৈহিক পরিবর্তনই আবেগের একমাত্র কারণ নয়

(ক) জেম্‌স-এর মতে দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আবেগ সম্ভব নয়। কিন্তু সে কারণে এ কথা বলা যায় না যে, দৈহিক প্রকাশ এবং আবেগ অভিন্ন। দৈহিক প্রকাশ এবং আবেগের সহ-অবস্থান এ কথাই প্রমাণ করে যে, একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করা চলে না। কিন্তু উভয়কে অভিন্ন মনে করার কোনরূপ যুক্তি নেই। মনোবিদ্‌ স্টাউট এই মতবাদেব সমালোচনায় বলেন যে, "একটা পাথর জলের মধ্যে পড়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি না করে পারে না। তাই বলে ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই পাথর নয়।····আগুন ছাড়া ধুঁয়ো হয় না। কিন্তু ধুঁয়ো এক জিনিস এবং আগুন আর এক জিনিস।"[1]

দৈহিক প্রকাশ ও আবেগ অভিন্ন নয়

(খ) যেসব দৈহিক সংবেদন আবেগ সৃষ্টি করে এবং যেগুলি আবেগ সৃষ্টি করে না—এই উভয় প্রকার দৈহিক সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মনোবিদ্‌ স্টাউট বলেন, 'সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, দৈহিক সংবেদনই আবেগ নয়, ক্ষুধা বা পেট ব্যথা আবেগ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা নয়'।[2] জেম্‌স দৈহিক সংবেদন বলতে কি বোঝেন তা সুস্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করেন নি।

জেম্‌স দৈহিক সংবেদনের অর্থ সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করেননি

(গ) বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে কোন রকম বাইরের জগতের উদ্দীপক ছাড়াই আবেগের সঞ্চার হয়। জেম্‌স-এর অভিমতের বিরুদ্ধে একথা বলা যেতে পারে যে, এ সব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাকে আমরা আবেগ বলি সেগুলি হল আবেগের মেজাজ (emotional mood) এসব ক্ষেত্রে দৈহিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে কোন আবেগের সৃষ্টি করে না, আবেগের একটা মেজাজ সৃটি করে এবং কোন প্রত্যক্ষণ বা ধারণা সঙ্গে সঙ্গে এই আবেগের মেজাজটিকে আবেগে রূপান্তরিত করে। উন্মাদ ব্যক্তির সব সময়ই একটা বিশেষ ধরনের মেজাজ থাকে এবং কোন উদ্দীপক, যখন সামান্য কারণেও তার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তখনই তার আবেগ প্রকাশিত হয়।

বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তা আবেগ নয়, আবেগের মেজাজ

1. **Stout : Manual of Psychology Fifth Edition, Page 366.**
2. **Ibid ; Page 367.**

অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যে, মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য আবেগে সৃষ্টি করে না, আবেগের মেজাজ সৃষ্টি করে। দৈহিক পরিবর্তনও আবেগের মেজাজ সৃষ্টি করে, আবেগ সৃষ্টি করে না।

(ঘ) জেম্‌স-এর মতে যদি কৃত্রিমভাবে আবেগের দৈহিক প্রকাশগুলিকে ঘটান যায় তাহলে আবেগের উদ্ভব হয়, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। অভিনেতারা কৃত্রিমভাবে যে আবেগের সৃষ্টি করে তা স্থায়ী হয় না। অনেক অভিনেতাকে রঙ্গমঞ্চে করুণভাবে ক্রন্দন করার পরই যবনিকার অন্তরালে গিয়ে হাসতে দেখা গেছে ; অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবেগটি দূরীভূত হয়েছে।

(ঙ) জেম্‌স আবেগ এবং দৈহিক সংবেদনকে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু মনোবিদ্ ওয়ার্ড (*Ward*)-এর মতে আবেগ হল অনুভূতিমূলক অবস্থা (affective state) এবং দৈহিক সংবেদন হল জ্ঞান-সম্পর্কীয় অবস্থা (cognitive state)। আবেগের প্রতি মনোযোগী হলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু দৈহিক সংবেদনের প্রতি মনোযোগী হলে সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় না। যে লোক খুব সামান্য রাগ করেছে, সেই রাগের প্রতি যেই সে মনোযোগী হতে যায় তখনই রাগ পালায়। কিন্তু ক্ষুধার প্রতি মনোযোগী হলে ক্ষুধা অদৃশ্য হয়ে যায় না।

আবেগ হল অনুভূতি সম্পর্কীয়, দৈহিক সংবেদন হল জ্ঞান সম্পর্কীয়

(চ) আবেগ এবং তার দৈহিক প্রকাশ যদি অভিন্ন হয় তাহলে একই রকম দৈহিক প্রকাশ একই আবেগকে নির্দেশ করত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে একই রকম দৈহিক প্রকাশ ঘটে থাকে। আমরা ভীত হলেও আঘাত করি আবার ক্রুদ্ধ হলেও আঘাত করি। ব্যস্ত হলেও দৌড়াই আবার ভীত হলেও দৌড়াই। তাছাড়া, একই আবেগের বিভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। সভ্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি একভাবে রাগকে প্রকাশ করে, আবার অসভ্য ও অশিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ অন্যভাবে দেখা দিতে পারে।

একই আবেগের ক্ষেত্রে একই রকম দৈহিক প্রকাশ ঘটে না।

এ ছাড়াও, যে দৈহিক প্রকাশকে আমরা কোন একটি আবেগের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করি, সেই দৈহিক প্রকাশটি দেখা দিলেও সেই আবেগটি দেখা নাও দিতে পারে। যেমন, আমরা ভীত হলে কাঁপি, আবার শীতেও কাঁপি। যখন শীতে কাঁপি, তখন মনে ভয়ের আবেগ কোথায়? সুতরাং কম্পনই ভয় নয়। মনোবিদ্ টিচেনার (*Titchener*)-এর মতেও দৈহিক সংবেদন—দৈহিক সংবেদনই ; হৃৎপিণ্ডকে

ধুক ধুক করাকেই ভয়ের আবেগ বলা যেতে পারে না, রক্তগণ্ড হওয়াকেই লজ্জার আবেগ বলা চলে না।[1]

(ছ) আবেগের মধ্যে যে একটা চেতনা বা অনুভূতির দিক আছে, তা কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। মনোবিদ্ টিচেনার বলেন, "আবেগ হল খুব জটিল চেতনা, যেহেতু এর উদ্দীপক কোন বস্তু নয়, কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপক নয় বরং একটা সমগ্র পরিস্থিতি বা সঙ্কট। এ হল পুরোপুরি অনুভূতিমূলক চেতনা, যেহেতু এই পরিস্থিতি এবং আবেগের প্রতিক্রিয়াজনিত দৈহিক সংবেদন সুনিশ্চিতভাবে হয় প্রীতিকর বা না হয় অপ্রীতিকর।"[2] মনোবিদ্ স্টাউট-এর মতেও অনুভূতি আবেগের একটা উপাদান।[3]

(জ) জেম্‌স-এর মতে বস্তু প্রত্যক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি দেহগত প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই দেহগত প্রতিক্রিয়াগুলি আসলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex Action) এবং এগুলিই আবেগ। কিন্তু দেহগত প্রতিক্রিয়া যদি প্রতিবর্ত ক্রিয়া হয় তাহলে একই বস্তু বা উদ্দীপক একই প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া সব ক্ষেত্রেই এক প্রকার। কিন্তু বস্তু অনুযায়ী যে আমাদের দেহগত প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়, দৈনন্দিন জীবনে আমরা এর বহু উদাহরণ দেখি। খাঁচার ভালুক দেখলে আমরা ভয় পাই না, কিন্তু ছাড়া ভালুক দেখলেই দৌড়তে শুরু করি। সুতরাং বস্তু দেখে নয়, আসলে পরিস্থিতিই আমাদের মনে আবেগ জাগিয়ে তোলে।

দেহগত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবর্তক ক্রিয়া এক নয়

(ঝ) মনোবিদ্ স্টাউট-এর মত জেম্‌স, আবেগ যে পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির উপরই যে আবেগের ভিত্তি, সে কথা ভুলে গেছেন। কোন বিড়ালীর বাচ্চাগুলিকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে যে ক্রুদ্ধ হয় তার কারণ হল তার অপত্যস্নেহের পথে বাধার সঞ্চার হচ্ছে। মনোবিদ্ ম্যাকডুগাল-এর মতে আবেগের একটা ইচ্ছামূলক দিক আছে। উডওয়ার্থ এবং ড্রেভারও মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলির ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলেই আবেগের সঞ্চার হয়।

আবেগ পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল

---

1. "A group of organic sensation is after all, a group of organic sensations; palpitation of the heart is not, in itself, the emotion of dread; and blushing is not in itself, the emotion of shame."—Titchener : Text Book of Psychology, Page 482.

2. "It is a highly complex consciousness, since its stimulus is not an object, a perceptive stimulus, but some total situation or predicament. It is through and through an affective consciousness, since both the situation itself and the organic sensations of the emotive reaction are definitely pleasant or unpleasant."
—Titchener; Text Book of Psychology: Page 482.

3. "......and emotions would seem to involve a specific affective component."
—Stout: Manual of Psychology: Page 367.

(ঞ) শেরিংটন একটি কুকুরীর উপর পরীক্ষণকার্য চালিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জেমস্-ল্যাঙ্গ মতবাদ ভ্রান্ত। তিনি কুকুরীটির সংবেদনবাহী স্নায়ুগুলি কেটে দিয়ে তার সব রকম আন্তরযন্ত্রীয় সংবেদন (visceral sensations) রহিত করে দিলেন, কিন্তু দেখা গেল তার পরেও কুকুরীটি ক্রোধ, আনন্দ, বিরক্তি এবং ভয় প্রকাশ করছে। সুতরাং আবেগ আন্তরযন্ত্রীয় সংবেদন নির্ভর নয়।

শেরিংটন-এর পরীক্ষণ

(ট) ক্যানন, লুইস ও ব্রিটন বিড়ালের উপর অনুরূপ পরীক্ষণকার্য চালিয়ে জেমস্-ল্যাঙ্গ মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছেন। তাঁরা কয়েকটি বিড়ালের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু (sympathetic nerves) অস্ত্রোপচারের সহায়তায় অপসারিত করলেন এবং স্নায়ুর উপর নির্ভর যে ক্রোধের আবেগটি তার প্রকাশের সকলপথ রুদ্ধ করে দিলেন। কিন্তু তবু দেখা গেল যে, বিড়ালগুলি ক্রোধের বাহ্যিকলক্ষণগুলি, যেমন—গর্জন করা, দাঁত দেখান প্রভৃতি প্রকাশ করছে। সুতরাং দৈহিক অবস্থা যে ক্রোধরূপ আবেগের কারণ নয়—এর দ্বারা তা প্রমাণিত হল। আবেগ দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি নয়।

ক্যানন, লুইস ও ব্রিটন-এর পরীক্ষণ কার্য

জেমস্ পরবর্তীকালে তাঁর মতবাদটিকে পবিবর্তিত করেছিলেন। তিনি তাঁর মূল মতবাদটির মধ্যে দুটি পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি প্রত্যক্ষণের অনুভূতির দিকটিকে স্বীকার করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন প্রত্যক্ষণ অনুভূতিবর্জিত ও উত্তেজনাহীন নয়। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিস্থিতিতে বস্তুটিকে প্রত্যক্ষণ করা হয়, সেই পরিস্থিতিকেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সুতরাং জেমস্-এর মতবাদটির পরিবর্তিত রূপটি হল, আমরা প্রথমে একটি পরিস্থিতি (situation) পর্যবেক্ষণ করি যার একটি অনুভূতিমূলক দিক আছে। এই অনুভূতিযুক্ত প্রত্যক্ষণ দেহগত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছলেই আবেগের সঞ্চার হয়।

James-এর মতবাদে পরিবর্তন

প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষণ এবং দেহগত প্রতিক্রিয়ার অন্তবর্তী অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ, বস্তুটি যে অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে বর্তমান সেই পরিস্থিতিকে স্বীকৃতি দিয়ে জেমস্ মূল মতবাদটির অভিনবত্বকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছেন এবং পরোক্ষভাবে লৌকিক মতবাদটিকেই যেন স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সমালোচনা

সুতরাং **আমাদের সিদ্ধান্ত হল আবেগ দেহগত প্রকাশের পূর্বগামী।** **জেমস্-এর মতবাদের মূল্য হল এই যে, দেহগত সংবেদন যে আবেগের অপরিহার্য অংশ, সেটি তিনি নির্দেশ করেছেন।**

ম্যাকডুগালের আবেগ ও প্রবৃত্তিতত্ত্ব (McDougall's theory of Instinct and Emotion): আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৪। আবেগ ও শিক্ষা (Emotion and Education):

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সার্থক শিক্ষার উপর আবেগের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। মানুষ যদিও চিন্তাশীল জীব কিন্তু তার জীবনের আচরণ ও কর্ম কেবল চিন্তাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না, তার মনের আবেগ, অনুভূতি তার আচরণ ও কর্মকে গভীরভাবে প্রবাবিত করে। মানবজীবনের সকল কর্মই আবেগবিধৃত। ম্যাকডুগালের ভাষায়, আবেগই আমাদের সকল কাজের প্রেরণা যোগায়! প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রে যে ইচ্ছামূলক ও অনুভূতিমূলক শক্তি বর্তমান তাকেই আবেগ বলা হয়। সে যেহোক, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আবেগ ও শিক্ষার সম্পর্ককে আলোচনা করলে দেখা যায়, শিক্ষার সাফল্য আবেগের সার্থক প্রয়োগের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

শিক্ষাপ্রদানকালে শিক্ষার্থীর আবেগ সম্বন্ধে শিক্ষকের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষাকে স্বতঃস্ফূর্ত করার কথা বলা হয়ে থাকে। শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত হতে হলে সে-শিক্ষা শিশুর জীবনধর্মী হওয়া উচিত এবং এখানেই আবেগের সঙ্গে শিক্ষার সহজ সম্পর্ক বর্তমান। ভয় বিরক্তি, বিষাদে যদি শিশুর মন ভারাক্রান্ত থাকে, সে যদি সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সহপাঠী এবং শিক্ষকের সঙ্গে যদি তার প্রীতির সম্পর্ক না থাকে বিদ্যালয়ের পরিবেশে সে যদি গৃহের আনন্দ লাভ না করে তবে শিশুর শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাহত হবে। অন্যদিকে আনন্দ, বিস্ময়, কৌতূহল, আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করে। এজন্য শিক্ষককে শিক্ষা-প্রদান কালে শিশুর মনে শিক্ষার অনুকূলে আবেগ সঞ্চার করতে হবে। অধিতব্য বিষয়ের প্রতি যাতে সহজে শিশু-মনে অনুরাগ, আনন্দ, কৌতূহল ইত্যাদি সঞ্চারিত হয়, সেদিকে শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষা যাতে আবেগধর্মী হয় সেজন্য আবেগের বিকাশ ও পরিবর্তন অনুসারে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও শিক্ষা প্রদান করা উচিত। শিশু যখন সর্ব ব্যাপারে কৌতূহলী, তখন তার কৌতূহলকে অহেতুক মনে করে তিরস্কার করা উচিত নয়। শিক্ষার্থীকে যদি পাঠে উৎসাহ প্রদান করা হয়, তবে তাকে পাঠে অগ্রসর হতে দেখা যায়। কিন্তু সামান্য অসাফল্যের জন্য যদি শিশুকে ভর্ৎসনা করা হয়, তবে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপপ্রতিযোজনমূলক আচরণ অর্থাৎ বিদ্যালয় পালানো, অন্যের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পরিণামে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে সে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। প্রথমতঃ, রাগ, ভয়, হীনমন্যতাবোধ প্রভৃতি আবেগ সাধারণভাবে শিক্ষায় অনুকূল বা সহায়ক নয় বলে ধরা হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এসব আবেগও শিক্ষার সহায়ক হতে পারে। পাঠে ব্যর্থতার জন্য ক্রোধের সৃষ্টি হলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কঠোর কর্মপ্রবণ ও অধ্যবসায়শীল হয়ে ওঠে। হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হলে শিক্ষার্থী অনেক সময় আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, প্রতিকূল আবেগও সময় বিশেষে এবং শিক্ষার্থী বিশেষে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব আবেগ স্বাভাবিক পন্থায় মোটেই শিক্ষাসহায়ক নয়, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রদানে এসব আবেগ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত রাখাই উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আবেগ যদি তীব্র হয় অর্থাৎ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে আবেগ শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে। কৌতূহল, আনন্দ, প্রভৃতি শিক্ষাসহায়ক আবেগগুলিও যদি খুব তীব্র হয়, তবে নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ প্রদান এবং স্মরণক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাহত হবে। অপ্রতিকূল আবেগ তীব্র হল তো আর কথাই নেই, শিক্ষণকার্য সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং শিক্ষণের ক্ষেত্রে আবেগের যথাযথ বিকাশ ও প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষায় আবেগের তীব্রতাকে সংহত করে উন্নীত করা চাই। আবেগকে উন্নীতকরণের ফলে শিশুর মনে শিক্ষা ও জীবনবিকাশের সহায়ক রস সৃষ্টি হয়। কিন্তু আবেগ অবদমিত হলে মনে নানা বিকৃতি (complexes) সৃষ্টি হবে। আবেগের উপযুক্ত বিকাশে আমাদের তিনটি দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। (১) শিক্ষাসহায়ক আবেগগুলি অর্থাৎ আনন্দ, বিস্ময়, কৌতূহল, ভালবাসা প্রভৃতি যাতে শিশুর মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করে, শিক্ষাপ্রদানকালে শিক্ষক সেদিকে নজর দেবেন। (২) প্রতিকূল আবেগগুলি অর্থাৎ, ভয়, রাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতি আবেগগুলি যাতে শিশুর মনে জাগ্রত হয়ে শিক্ষণকার্যকে প্রতিহত না করে সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি দেবেন। (৩) প্রক্ষোভ অনুকূল বা প্রতিকূল হোক তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু যাতে তীব্র না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আবেগ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে যাতে প্রকাশিত না হয়, সেদিকেও শিক্ষক সজাগ দৃষ্টি দেবেন। ওয়াটসন (*Watson*) বলেন, আবেগ পরিবেশের দ্বারা সৃষ্ট, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে সাপেক্ষীকরণ (conditioned) করা হয়, এবং শিশুমনে আবেগ সঞ্চারিত করা হতে থাকে। যদি দেখা যায় সাপেক্ষী-করণের দ্বারা অবাঞ্ছিত আবেগের সৃষ্টি হয়েছে তবে তা প্রতিরোধ করে বাঞ্ছিত আবেগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৩। আবেগ নিয়ন্ত্রণ (Guidance in Emotional Development) :
আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই প্রেষণারূপে কার্য করে এবং আমাদের নানাবিধ কার্যে প্ররোচিত করে। আবেগসমূহ যদি যথাযথভাবে স্বাভাবিক পথে বিকশিত না হয় তবে শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, শিক্ষা-গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাহত হয়। পরিণামে শিশু অভিযোজন (adaption) ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং নানা সমস্যামূলক আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, শৈশব থেকেই শিশুর আবেগসমূহ সুপরিচালিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

আবেগে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতসারেও নিজের দোষ-ত্রুটি অন্যের উপর আরোপ করার চেষ্টা না করেন। নিজের দোষ অন্যের উপর চাপালে শিশুরা ভীষণ বিরক্ত হয়ে ওঠে। তারপর শিক্ষক বিভিন্ন মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে শিশুর জীবনে বাঞ্ছিত আবেগ প্রকাশের সুযোগ দেবেন। শিশু মনের উপর উচ্চ ভাবাদর্শ বা উপদেশ আরোপের দ্বারা আবেগের উৎকর্ষসাধন করা যায় না। প্রতি শিশুর আবেগকেই ব্যক্তিগতভাবে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। কোন সাধারণ নিয়ম দিয়ে আবেগকে বিচার করা উচিত নয়।

আবেগের প্রকাশ দৈহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ঘটে। দৈহিক পরিবর্তন ও বিকাশ সময়সাপেক্ষ এবং দৈহিক বিকাশ নানা স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক গড়নের বৈশিষ্ট্য তার আবেগকে প্রভাবিত করে। সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী যে শিশু, স্বাভাবিক ভাবে সে উৎফুল্ল ও আত্মপ্রত্যয়ী হবে। কিন্তু যে শিশু ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল, সে সদা বিরক্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে আবেগও শিশুর দৈহিক ও সর্বাঙ্গীন মানসিক বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর গৃহে, বিদ্যালয়ে যদি সুস্থ ও বাঞ্ছিত আবেগগুলি উপস্থিত না থাকে, শিশু যদি ভয়, রাগ, হতাশা, হীনমন্যতা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত আবেগের দ্বারা পীড়িত হয়, তবে যতই সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী সে হোক না কেন, তার দৈহিক ও মানসিক বিকাশ প্রতিহত হবে এবং সে দেহ ও মনের সাম্য (balance) হারিয়ে ফেলবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, বাঞ্ছিত আবেগের সুষ্ঠু পরিচালনব্যাপারে শিক্ষককে পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। বিদ্যালয় শিশুর কাছে হবে একাধারে সমাজ ও পরিবার। যদি শিশু তার বিভিন্ন আবেগ প্রকাশের সুযোগ থেকে বিদ্যালয়ে বঞ্চিত হয়, তবে তার শিক্ষাগ্রহণ প্রতিহত হবে।

শিশুর জীবনে আদর্শ আবেগ কি? এ সম্বন্ধে কোন তালিকা প্রদান সম্ভব নয়। তবে সার্থক আবেগের উৎকর্ষসাধনের জন্য শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা প্রদান করতে হবে যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল ও সামাজিকবোধসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

৬। প্রাথমিক ও মিশ্র আবেগ (Primary and Secondary Emotion) :

ম্যাকডুগাল আবেগকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছেন; প্রাথমিক (Primary) এবং মিশ্র (Mixed or Secondary)। তিনি মনে করেন, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সতের এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির সহিত একটি আবেগ সংশ্লিষ্ট আছে। সতেরটি সহজাত প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত সতেরটি আবেগ হল প্রাথমিক। এ প্রাথমিক আবেগ হল সহজাত প্রবৃত্তির কেন্দ্র বা সারাংশ (core or essence)। কিন্তু প্রাথমিক আবেগগুলি নিজেদের মিশ্রণে আবার নতুন আবেগ সৃষ্টি করে, এ আবেগ মৌলিক নয় কিন্তু মৌলিক বা প্রাথমিক আবেগের সমবায়ে সৃষ্ট। ম্যাকডুগাল বলেন, কৃতজ্ঞতা, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি হল গৌণ বা মিশ্র আবেগ। কৃতজ্ঞতা—মমতা ও হীনমন্যতার; ঘৃণা—রাগ, বিরক্তি ও ভয়ের; লজ্জা—হীনমন্যতা ও অহংবোধের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়।

একথা ঠিক যে আমাদের মনে নানা মিশ্র আবেগ বর্তমান। কিন্তু ম্যাকডুগাল যেভাবে মিশ্র আবেগগুলির বর্ণনা দিয়েছেন বা কতকগুলি প্রাথমিক আবেগের মিশ্রণ বলে ব্যাখ্যা করেন তা অতি সরলীকরণ দোষে (over simplication) দুষ্ট। মিশ্র আবেগগুলির এ ধরনের ব্যাখ্যা অনেকেই গ্রহণ করেন না। তাছাড়া, ম্যাকডুগাল বর্ণিত প্রাথমিক আবেগগুলি সম্পূর্ণ অমিশ্র কিনা সে ব্যাপারেও মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। উপরন্তু মৌলিক বা প্রাথমিক আবেগের সংখ্যা মাত্র তিনটি বলে অনেকে গ্রহণ করেন। তাদের মতে ভয়, রাগ ও আনন্দ—এই তিনটিই হল মৌলিক বা প্রাথমিক আবেগ। দার্শনিক ডেকার্ট (*Descartes*) মনে করেন যে, বিস্ময়, ভালবাসা, কামনা, ঘৃণা, আনন্দ, দুঃখ এই ছয়টি হল মৌলিক আবেগ। ওয়াটসনের মতে ভয়, রাগ ও ভালবাসা-এই তিনটিই প্রধান বা প্রাথমিক আবেগ। অন্যদিকে একদল মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, যেহেতু সকলপ্রকার আবেগের মূলে একই প্রকার উত্তেজনামূলক অবস্থা বর্তমান থাকে, সেকারণ আবেগ মূলতঃ একটি, একাধিক নয়।

৭। আবেগের বিকাশ (Development of Emotion) :

মানব শিশু কোন্ কোন্ আবেগ নিয়ে জন্মায় এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন্। সহজাত মৌলিক আবেগের সংখ্যা নির্ণয়েও তাঁদের মধ্যে মতৈক্য নেই। কিন্তু একথা সবাই স্বীকার করেন যে, নবজাত শিশু কতকগুলি আবেগ নিয়ে জন্মায় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুপ্ত আবেগগুলিকে সে নানা অভিজ্ঞতা ও আচরণের মধ্যে প্রকাশ করে। আবেগের দুটো দিক বর্তমান—একটি মনোগত (subjective), অন্যটি দেহগত (physical), দৈহিকদিকটি আবেগমূলক আচরণের দিক।

ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন (*Watson*) আবেগের কোন্ মনোগত দিক স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, আবেগ দৈহিক উত্তেজনাজনিত পরিবর্তন। মানবশিশু কোন সুনির্দিষ্ট আবেগপ্রবণতা নিয়ে জন্মায় না। ওয়াটসন এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা চালান। একটি বালক সাদা রঙের ইঁদুর দেখলে ভয় পায় না, সে ইঁদুরের সঙ্গে খেলতে চায়। কিন্তু যেই বালকটি ইঁদুরকে ধরতে যাবে, তখন বিরাট এক শব্দ করা হল। ফলে শিশুটি ভয় পেল। তারপর সাদা ইঁদুর দেখলেই সে ভয় পায়। এ ভয় সাপেক্ষীকরণের (conditioning দ্বারা সৃষ্ট হল। অর্থাৎ, ওয়াটসনের মতে মানবজীবনের আবেগের বিকাশ সাপেক্ষীকরণের নামান্তর মাত্র। রাগ, ভয়, ভালবাসা—এ তিনটি মৌলিক আবেগ সাপেক্ষীকরণের ফলে দেখা দেয়। প্রতিটি আবেগ পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ফলে সৃষ্টি হয়। যে বস্তু উদ্দীপক কোন বিশেষ আবেগ সৃষ্টির পক্ষে নিরপেক্ষ (neutral), তাকেও বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার দ্বারা আবেগ সৃষ্টিকারক করা যায়।

শারমান (*Sherman*), মান (*Mann*) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসনের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তাঁরা মনে করেন, একমাত্র 'চমকে ওঠা' (startle pattern) হল প্রাথমিক শিক্ষানিরপেক্ষ আবেগ। যদিও শিশুর বোধ বা চিন্তাশক্তি জাগ্রত নয়, তবুও শিশুর আবেগগুলি একমাত্র দৈহিক প্রতিক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নয়।

আমেরিকার শিশু মনোবিজ্ঞানী ক্যাথরিন ব্রিজেস (*Katharine Bridges*) আবেগের বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ব্রিজেস লক্ষ্য করেন, নবজাত শিশুর মনে তীব্র উদ্দীপক উত্তেজনা (excitement) সৃষ্টি করে। তিনি এ উত্তেজনাকেই মূল আবেগ বলে অভিহিত করেন। এ উত্তেজনা ধীরে ধীরে দুটো পৃথক আবেগে প্রকাশিত হয়—একটি অস্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখ, অন্যটি আনন্দ বা হর্ষ।

আবেগের পরিবর্তন ও বিকাশ সম্বন্ধে ব্রিজেস বলেন, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবেগের তীব্র প্রতিক্রিয়া ক্ষীণ হতে থাকে। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের দ্বারা সংগঠিত আবেগগুলি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে থাকে। শিশুর চার মাস বয়সে অস্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখাবেগ বিশেষায়িত হয় রাগে; পাঁচ মাস বয়সে বিরক্তিতে; সাত মাস বয়সে ভয়ে পরিণতি ও নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। আনন্দ বা স্বাচ্ছন্দ্য রূপ আবেগ ছয় মাস বয়সে বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছ্বাসের (elation) রূপ লাভ করে। এই উচ্ছ্বাস বা আনন্দই প্রথম বড়দের প্রতি ভালবাসার রূপ নেয় এবং শিশুর পনর মাস বয়সের মধ্যেই এই ভালবাসা শিশুর সমবয়সী বা তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি প্রসারিত হতে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, আবেগজ আচরণ সম্পাদন করার যে সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে শিশু জন্মায়, তার জন্মের প্রথম দিনগুলিতে এ আচরণগুলি এতই সাধারণধর্মী থাকে যে আবেগের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি না। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের প্রাথমিক উত্তেজনা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন রূপ নিতে থাকে। একে আমরা আবেগের বিশেষীভবন (specialisation) বলে আখ্যা দিতে পারি। গুড এনাফ (*Good Enough*) দশ মাস বয়সের শিশুর বিভিন্ন মুখভঙ্গী দেখে বিভিন্ন আবেগের প্রকৃতি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। শিশুর বয়স যত বৃদ্ধি পেতে থাকে আবেগসঞ্জাত প্রতিক্রিয়াগুলি একটি উদ্দীপক থেকে অন্য উদ্দীপকে সংক্রমিত হয় এবং ধীরে ধীরে জটিল আকার ধারণ করে।

এক্ষণে আমরা শৈশবোত্তর স্তরে আবেগের বিকাশ ও বৃদ্ধি আলোচনা করার প্রস্তাব করছি। শৈশবোত্তরে আবেগের পরিবর্ধনে আবেগের সংখ্যাবৃদ্ধি, আবেগের গভীরতা ও স্থায়িত্ব, আবেগের জটিলতা লাভ ও প্রকাশভঙ্গিমার পরিবর্তন ইত্যাদি লক্ষণীয়। একথা উল্লেখযোগ্য যে, আবেগের বিকাশ শিশুর জীবনের অন্যান্য বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শিশুর জীবনের ব্যক্তিত্বের পরিণতির সঙ্গে আবেগগত পরিণমন (emotional maturity) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শিশু বয়োপ্রাপ্ত হলে তার অনুভূতি বোধ সুস্পষ্ট হয়, অভিজ্ঞতা বহুমুখী হয়, কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিস্তার ঘটে, সামাজিকতাবোধ জাগ্রত হয়। এর ফলে আবেগগুলি নিয়ন্ত্রিত, সুনির্দিষ্ট, সুসংযত হয়ে ওঠে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে আবেগের বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে। শৈশবে সামান্য ক্রোধের বশেই যেখানে শিশু হাত পা ছুড়ে চেঁচাতে থাকে, জিনিসপত্তর তছনছ করে, বা যার উপর রেগে যায়, তাকে কামড়ায়, মার ধোর করে, সেই শিশুর বয়স বাড়তে থাকলে এসব আচরণ কমে যায়। এ পরিবর্তনের মূলে সামাজিক দৃষ্টান্ত, নিন্দা, প্রশংসা, পরিবেশ ও নিজস্ব অতীত অভিজ্ঞতার সক্রিয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সমাজের পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের পরিচালনায় শিশু তার শিশুসুলভ আবেগগুলিকে সমাজানুমোদিত প্রকাশ-ভঙ্গিমায় রূপ দিতে থাকে। আবেগের বাহ্যিক প্রকাশকে সাত আট বছরেই ছেলেমেয়েরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলতে পারে, এ সময় থেকেই তারা আবেগকে অবদমিত করতে থাকে। আবেগের এই অবদমন সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি মানুষ যদি আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত, অনিয়ন্ত্রিত ও যথেচ্ছ প্রকাশের স্বাধীনতা পায়, তবে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক সংগঠন ভেঙ্গে পড়বে। পৃথিবীতে আমাদের বসবাস করা মোটেই সুখকর হবে না। কিন্তু

আবেগের এ অবদমন ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল মনে করেন নি। আবেগের বাহ্যিক প্রকাশকে প্রতিহত এবং আবেগকে অবদমিত করলেই আবেগ তিরোহিত হয়ে যায় না। অবদমিত আবেগ নির্জ্ঞান স্তরে উপনীত হয়ে ব্যক্তিচরিত্রে নানা অপসঙ্গতি (maladjustment) সৃষ্টি করে। কিন্তু আবেগকে বাহিরে অভিব্যক্ত করতে পারলে আবেগের অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে ব্যক্তি মুক্ত থাকে। দুঃখে কাঁদলে, রাগে মেজাজ দেখালে মনটা হালকা হয়ে যায়। কিন্তু এগুলি মনে মনে পোষণ করলে ব্যক্তি-চরিত্রে নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। গৃহে, বিদ্যালয়ে মানসিক শৃঙ্খলার নামে, শাসন এবং নিন্দার নামে শিশুদের আবেগগুলিকে অবদমিত করা হয়। উহা আত্মপীড়নের নামান্তর। এ অবদমন পরিণামে শিশু-চরিত্রে নানা ক্ষতিকর আচরণের জন্ম দেয়! এজন্য শিক্ষায় আমরা প্রবৃত্তির উন্নীতকরণ কামনা করি, অবদমন নয়।

সুতরাং শিক্ষায় আবেগের বাহ্যিক প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করার সময় শিক্ষককে দেখতে হবে নিয়ন্ত্রণ যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়। শাসন ও ভয় সৃষ্টির দ্বারা শিশুর আবেগকে রুদ্ধ করে দেওয়া উচিত নয়। তার মনে সমাজচেতনা, সংযত আবেগের কার্যকারিতা বোধ জাগ্রত করলে আবেগ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে বিকশিত ও বর্ধিত হতে থাকে। শিক্ষক প্রতিটি শিশুর আবেগের প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ বিবেচনা করে আবেগকে সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করবেন।

বয়সের অগ্রগমনের ফলে শিশুর মধ্যে অনেক নতুন নতুন আবেগও দেখা দেয়, যেমন, কামাবেগ, উৎকণ্ঠা, লজ্জা ইত্যাদি। শৈশবে এসব আবেগ শিশুর জীবনে লক্ষ্য করা যায় না। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অহং (ego) বোধ প্রসারিত হয় এবং বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে শিশু তার সম্পর্ক বুঝতে পারে। ফলে, আবেগগুলি বিচিত্র ও জটিল ধারায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং পরিণমন (maturity) লাভ করে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি

(Mental Hygiene and Maladjustment)

১। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কাকে বলে? (What is Mental Hygiene ?) :

যে বিজ্ঞান বা শাস্ত্র মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে তাকে মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বলে। দেহের স্বাস্থ্য বলতে আমরা বুঝি, নিরোগ, কর্মক্ষম দেহ ও ত্রুটিহীন ইন্দ্রিয় বা দেহপ্রত্যাঙ্গাদি। সেরূপ মনেরও স্বাস্থ্য বিদ্যমান। শিশুর জীবন-বিকাশে তার সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ, বুদ্ধি, প্রবণতা প্রভৃতি বহু সমস্যা ও চাহিদা নিয়ে উপস্থিত হয়। এ বহুবিধ চাহিদা ও সমস্যার সুষ্ঠু প্রকাশ ও সমন্বয় শিশুর জীবনে না ঘটলে মানসিক দিক থেকে শিশু সমাজ ও পরিবেশের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। সে পরিণামে অভিযোজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং তার মনে নানা মানসিক ত্রুটি ও দ্বন্দ্ব দেখা দেবে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মানসিক দ্বন্দ্ব (conflict) অপঅভিযোজন (maladjustment) প্রভৃতি অনভিপ্রেত মানসিক বৈলক্ষণ্যের কারণ নির্ধারণ, এগুলির প্রতিরোধ এবং মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক (normal) জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় নির্ণয় প্রভৃতি আলোচনা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে, মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ত্রিবিধ কর্ম পরিকল্পনা বর্তমান—(১) রোগ নির্ণয় বা রোগনিদান (diagnosis), (২) রোগের চিকিৎসা (therapy) এবং (৩) রোগের প্রতিষেধ (prevention)। রোগনিদান ও চিকিৎসা মানসিক স্বাস্থ্যের তাত্ত্বিক (theoritical) দিক এবং প্রতিষেধ মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যবহারিক (practical) দিক।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তির মনের স্বাভাবিক ধারাকে বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের স্বাস্থ্য ও সমতা রক্ষা করতে সহায়তা করে। এ ছাড়াও মানসিক বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে সহায়তা করা এর কাজ।

মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী বার্নার্ড (Bernard) বলেন, এটি একটি ব্যবহারিক বিদ্যা যা নিজেকে এবং অপরকে অধিকতর পরিপূর্ণ, সুখী, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ জীবনের উপলব্ধিতে সহায়তা করে।"[1]

---

1. "It is the practical art of assisting oneself and others to the realization of a fuller, happier, more harmonious and more effective life."
Bernard : Psychology of Teaching and Learning.

২। মানসিক স্বাস্থ্য কি (What is Mental Health ?)

মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি ? অধুনা 'মানসিক স্বাস্থ্য', 'সামাজিক স্বাস্থ্য' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি (concepts) সমাজবিজ্ঞানের দৌলতে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রত্যয়গুলির ন্যায়শাস্ত্রসম্মত কোন সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়, কেননা মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা এমন একটি মানসিক স্তর বা অবস্থা বুঝি না যা সহজেই লাভ করা যায় বরং মানসিক স্বাস্থ্য একটি আদর্শ যা আমরা জীবনভর লাভ করবার চেষ্টা করি। তাছাড়া, 'মানসিক স্বাস্থ্য' কথাটিকে মনোবিজ্ঞান শারীরবিজ্ঞান (Physiology), সমাজবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (domestic science) প্রভৃতি শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখ্যা করা হয় বলে সর্বসম্মতভাবে এর কোন সংজ্ঞা প্রদান করা যায় না। মনোবিজ্ঞানী বার্নার্ড (*Bernard*) বলেন, "মানসিক স্বাস্থ্য দৈহিক স্বাস্থ্যের মতনই মাত্রাগত তারতম্যের ব্যাপার। উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য এবং ক্ষীণ মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে বিভেদের সীমারেখা মাত্রাগত তারতম্যের ব্যাপার।" তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, 'মানসিক স্বাস্থ্য' বলতে আমরা ব্যক্তির মানসিক সমতা বা সমন্বয় (harmony) বুঝি অর্থাৎ যার দ্বারা ব্যক্তি নিজে নিজের সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য এ অর্থে ব্যক্তির অভিযোজন-ক্ষমতা (power of adjustment) বোঝায়। মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তির নিরবছিন্ন অভিযোজন প্রক্রিয়াই (A process of continuons adjustment on the part of the individual) হল মানসিক স্বাস্থ্য। এই সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়ার দিক থেকে মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যারা পরিপূর্ণ ভাবে সঙ্গতি বিধান করতে পারে তারা স্বাভাবিক মানসিকতা সম্পন্ন (normal), যারা একেবারেই পারে না তারা অস্বাভাবিকতা মানসিক সম্পন্ন (abnormal), যারা আংশিক ভাবে পারে তারা অনুস্বাভাবিক (Sub-normal)। কাজেই মানসিক স্বাস্থ্য হল অনেকটা আপেক্ষিক বিষয়। যে ব্যক্তির মানসিক কোন দ্বন্দ্ব নেই, আচার-আচরণে বা চিন্তায় কোন অপসঙ্গতি নেই (maladjustment) বা অস্বাভাবিকতা (abnormality), অসামাজিকতা প্রকাশ পায় না, সে ব্যক্তি মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মানসিক স্বাস্থ্য কোন স্থির মানসিক অবস্থা নয়। ব্যক্তির জীবনের মানসিক স্বাস্থ্য একটি আদর্শ বিশেষ, ব্যক্তি তার মনোজগতে সকল মানসিক অবস্থার মধ্যে একটি সুস্থিতি, স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার বুদ্ধি, আবেগ, প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে।

৩। শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য (Education and Mental Health):

শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব-বিকাশ, আর মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্য হল শিশুর মানসিক অপসঙ্গতি দূরীভূত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথগুলিকে সুগম করে দেওয়া। এদিক থেকে দেখতে গেলে শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য অভিন্ন।[1] উভয়ই শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনক্ষম করে তুলতে চায় যাতে শিশু তার সকল ক্ষমতা ও সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে পারে। উভয়ই শিশুকে কতকগুলি সুঅভ্যাস ও প্রবণতা গঠনের জন্য পরিচালিত করে যাতে শিশুজীবনের সমস্যাগুলি অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সমাধান করতে পারে। সামাজিক পরিবেশে জীবনের দৈনন্দিন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শিশু যাতে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থক পরিণতি লাভ করে, শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান উভয়ই সে লক্ষ্যে নিজের আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করে।

প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষায় মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত হয়নি। সেদিন শিক্ষা অর্থে নিছক পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন বোঝাত। আর শিক্ষার সার্থকতা নির্ণীত হত ব্যক্তির জ্ঞানের পরিমাণের দ্বারা। ভাবসর্বস্ব এ ধরনের মানসিকতাকে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আধুনিক শিক্ষা জীবনধর্মী, শুধু জ্ঞান আহরণই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিশুর সর্বাঙ্গীন জীবন বিকাশ—তার বুদ্ধিগত, প্রবৃত্তিজাত, আবেগগত সকল চাহিদার সুষ্ঠু প্রকাশ ও পরিতৃপ্তি সার্থক ব্যক্তিত্বগঠনের শর্ত হিসেবে আজ স্বীকৃত। অর্থাৎ শিশুর চাহিদা আজ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই চাহিদাগুলি যাতে অতৃপ্ত, অবদমিত, অবহেলিত হয়ে শিশুমনে নানা দ্বন্দ্ব ও অপসঙ্গতি সৃষ্টি না করে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সেদিকে লক্ষ্য রাখে।

উদ্দেশ্যগত এ মিল ছাড়াও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। সার্থক শিক্ষাপ্রদানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সুস্থ মন একটি অপরিহার্য শর্ত। শিক্ষক যদি মানসিক সুস্থতা থেকে বঞ্চিত হন তবে তিনি তাঁর উপর আরোপিত শিক্ষাকার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারবেন না। শিক্ষার্থীর মনে স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীর চাহিদাগুলিকে ধৈর্য ও সহানুভূতি সহকারে বিচারবিশ্লেষণ ও সমাধান, অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষকের পক্ষে মোটেই

1. "The aim of modern education and of mental hygiene is essentially the same a well adjusted child integrated with his environment, making good use of his abilities and utilising his potentialitities."

Encyclopaedia of Modern Education Page 110.

সম্ভবপর নয়। সর্বোপরি শিক্ষকতার দ্বারা তাঁর মনে কোন তৃপ্তি (job satisfaction) সঞ্চারিত হয় না। অতএব দেখা যাচ্ছে শিক্ষাকার্যে সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষককেও তাঁর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

অন্যদিকে সার্থকভাবে শিক্ষা-গ্রহণ ও শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিশুর মানসিক সুস্থতা অপরিহার্য। স্বাভাবিক গতিতে গৃহ-পরিজন, শিক্ষক, বিদ্যালয় সহপাঠী প্রভৃতিকে ঘিরে শিশুর আবেগ বর্ধিত হতে থাকে এবং সাধারণত শৈশবে আবেগ সম্বন্ধীয় অপসঙ্গতিই শিশুর জীবনে দেখা দেয়। গৃহে যদি নিরাপত্তার অভাব থাকে, মাতাপিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার স্নেহপ্রীতি থেকে শিশু যদি বঞ্চিত হয়, বিদ্যালয়ে যদি তিরস্কৃত হয়, সহপাঠীদের দ্বারা যদি অবহেলিত বা উপহাসপ্রদ হয়, তবে শিশুর মনে নানা আবেগমূলক অসুস্থতা দেখা দিতে থাকে। ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি প্রভৃতি শিক্ষার প্রতিকূল আবেগ শিশুর মনে নানা অপসঙ্গতির সৃষ্টি করে এবং শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। শিশুর পাঠগ্রহণে অসাফল্যের মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক সুস্থিতি ও সুস্থতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এজন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সার্থক শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

৪। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য (Goals of Mental Hygiene) :

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিক থেকেই আলোচনা করা চলে। ব্যক্তিগতদিক থেকে প্রতিটি ব্যষ্টিকে মানসিক সুস্থিতি প্রদান করা যাতে সে সঙ্গত এবং উদ্দেশপূর্ণ কার্যে প্রণোদিত হয়ে নিজস্ব মেধা ও শক্তির সার্থক প্রয়োগ করতে পারে ; যাতে প্রতিটি শিশু আত্মসম্মান, আত্মনির্ভশীলতা লাভ করে সকলের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্ক লাভ করতে পারে, যাতে সে সকলের প্রিয় এবং সকলেই যাতে তার নিকট প্রিয় হয় অর্থাৎ সকলের সঙ্গে তার সম্পর্কানুভূতি যাতে সদা বর্ধিত হতে থাকে, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সেদিকে লক্ষ্য রাখে। ব্যক্তিগত জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্যকে ব্লস (*Blos*)[1] আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে নির্ধারিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের অভিপ্রেত লক্ষ্য হবে যাতে শিশু আপন অনুভূতি ও বস্তুর (fact) মধ্যে, চিন্তায় এবং বাস্তবে বিচারপূর্ণ কাজ সম্পাদনের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনের ক্ষমতা অর্জন করে। আমাদের অভিজ্ঞতায় নিত্যনিয়ত যে উত্তেজনা (tension) উপস্থিত হয়, সেগুলিকে কিছুটা সহ্য করার ক্ষমতা, আপন আবেগকে চরিতার্থ করার অস্থিরতা প্রতিহত করার ক্ষমতা,

1. Blos Peter : 'Aspects of Mental Health in Teaching and Learning.'

সমাজানুমোদিত বৃহত্তর তৃপ্তিমূলক কাজের জন্য ক্ষুদ্র কাজকে বিসর্জন দেবার ক্ষমতা, প্রভৃতি ব্যাপারে শিশু যেন মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সহায়তায় লাভ করে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তিকে জীবনে দ্বন্দ্ব, হতাশা, বিপদ প্রভৃতির সম্মুখীন হবার ব্যক্তিত্ব অর্জনে সাহায্য প্রদান করে।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনে সুখী, সক্রিয় ও প্রতিবেশীর প্রিয়ভাজন করে গড়ে তোলা। এক কথায় ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে উপযোগী করে তোলাই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। অবশ্য ব্যষ্টিগত ও সামাজিক উভয় দিকই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ কোন অশরীরী স্তরে পৌঁছাতে পারে না।

এ আলোচনা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে পারি: (১) ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং জীবন-অভিজ্ঞতার সম্পর্ক অনুধাবন করে মানসিক অসুস্থতা নিবারণ করা, (খ) ব্যক্তিগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা, (৩) মানসিক রোগ নিবারণের পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করা।

৫। অপসঙ্গতির লক্ষণ (Symptoms of Maladjustment):

ব্যক্তি চরিত্রে অপঅভিযোজন বা অপসঙ্গতি তার মানসিক দ্বন্দ্ব (conflict), উত্তেজনা (tension) বা হতাশার (frustration) প্রতিক্রিয়া মাত্র। এ প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশকে প্রতিহত করে, ব্যক্তির মানসিক সুস্থিতিজনিত সুখ ও তৃপ্তি হরণ করে, ব্যক্তির আচরণে সাম্য (balance) বিনষ্ট করে। নানা ভাবে এ প্রতিক্রিয়া বা অপসঙ্গতি ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আমরা নিম্নে অপসঙ্গতির প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি আলোচনা করছি:

(ক) **পলায়ন প্রবৃত্তি (Withdrawal or Retreat)**: মানসিক দ্বন্দ্ব ও আবেগ-মূলক অস্থিরতার জন্য কোন কোন ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পায়। বাস্তবকে এড়িয়ে চলার পলায়নী মনোবৃত্তি তাদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন—শিশু পরিশ্রমের ভয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে চায়, বয়স্কব্যক্তি পরিশ্রম এড়াবার জন্য শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দেয়। সমাজের কার্যকারিতার সঙ্গে পলায়নী মনোবৃত্তি দেখা দিলেই অপসঙ্গতি উপস্থিত হয়। এরই এক চরম রূপ হল আত্মহত্যা। বাস্তব জীবনের সঙ্গে মুখোমুখী না হয়ে পালিয়ে বেড়াবার প্রবণতা ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আর তীব্র অন্তর্মুখীতার জন্যই ব্যক্তি চরিত্রে পলায়ন প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

(খ) **তীব্র অন্তর্মুখীতা (Extreme Introversion)**: ব্যক্তি সব সময় নিজের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চায়। সে সব সময় নিজের ব্যর্থতা, হতাশা,

দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সম্পর্কে চিন্তা করে। নিরাপত্তার অভাব, ভীতি, ব্যর্থতা, হতাশা, বাধাবিঘ্ন ও অন্যান্য অপ্রীতিকর অবস্থা মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যার ফলে ব্যক্তি দুর্বল ও ভীরু (timid) হয়ে পড়ে এবং অন্তর্মুখী হয়।

(গ) **দিবাস্বপ্ন** (Day-dreaming) : ব্যক্তি যখন মানসিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সমাধানে ব্যর্থ হয়, যখন সে তার কামনা-বাসনাকে অবদমন করতে বাধ্য হয়। আর যখন তার ইচ্ছাপূরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন এই দিবাস্বপ্ন দেখা দেয়। বাস্তবে যা পূর্ণ হয় নি, অলীক স্বপ্নের মধ্যে তার পূর্ণতাকে সে আস্বাদন করে তৃপ্তি পায়। কল্পনায় সে তার সাফল্যের চিত্র প্রত্যক্ষ করে আনন্দ লাভ করে। এগুলিও পলায়নী মনোবৃত্তিরই অন্যতম রূপ। দিবাস্বপ্ন যে একেবারে স্বপ্ন তা নয়, অনেক মহৎ ব্যক্তিরও দিবাস্বপ্ন দেখার অভ্যাস ছিল। কিন্তু দিবাস্বপ্ন অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি করে তখনই যখন ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পায় এবং নিজের মনগড়া রাজ্যের অধিবাসী হয়।

(ঘ) **যৌক্তিকরণ** (Rationalization) : অবদমনের ফলে দ্বন্দ্বলিপ্ত বাসনাগুলি আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তরে সমবেত হয় এবং যখন তারা আমাদের চেতন মনে উপস্থিত হয়ে প্রভাব বিস্তার করে তখন আমরা মিথ্যা যুক্তির দ্বারা এ দ্বন্দ্বগুলিকে সমর্থন করার চেষ্টা করি। কোন একটা যুক্তি তার যাথার্থ্য থাক বা না থাক উপস্থিত করে আমরা নিজেদের দুর্বলতা বা দোষকে ঢাকতে চাই। যেমন, বাসের ভাড়া না দিয়ে চুপি চুপি সরে পড়ার সময় অনেক লোক নিজের এরূপ আচরণের সমর্থন খুঁজে বেড়ায় যে তাকে সারাক্ষণ বাসে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। এ গুলি অপসঙ্গতিমূলক আচরণ।

(ঙ) **অনুকম্পন** (Compensation) : হীনমন্যতা দেখা দিলে অনুকম্পনরূপ অপসঙ্গতি ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। শারীরিক ত্রুটিযুক্ত শিশুরা কাজে অতিরিক্ত সক্রিয়তা দেখিয়ে নিজেদের শারীরিক ত্রুটি ঢেকে রাখতে চায়। অনেক সময় কোন কোন শিশু চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাচারণ, নির্যাতন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বা নিজের স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট হয়।

(চ) **প্রক্ষেপণ** (Projection) : এরূপ অপসঙ্গতি প্রকাশিত হয় যখন আমরা নিজেদের কোন অপরাধকে অপরের উপর চাপিয়ে দিই। এগুলিও একপ্রকার প্রক্ষেপণ। যেমন, ফেল করা ছাত্র পরীক্ষকের বিরুদ্ধে, অযোগ্য কর্মী উপরওয়ালার পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়।

থোরপ (*Thorpe*) পলায়ন প্রবৃত্তি, যৌক্তিকরণ, অনুকম্পন, প্রক্ষেপণ ইত্যাদি অপসঙ্গতিমূলক লক্ষণকে বাস্তবের প্রতি অপপ্রাতিযোজনশীল ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীজনিত আচরণ বলে শ্রেণী বিভাগ করেছেন।

(ছ) **উন্নীতকরণ** (Sublimation) : কোন ব্যক্তির ঈপ্সিত আচরণের পথে অন্তরায় দেখা দিলে, বিকল্প আচরণের অবতারণা করে মানসিক উত্তেজনা হ্রাসের চেষ্টা করতে দেখা যায়। যেমন, সন্তানহীনা নারী মাতৃবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে চায় কোন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে। একে উন্নীতকরণ বা উদ্গতি সাধন বলে।

(জ) **অভেদীকরণ** (Identification) : হীনমন্যতাবোধ থেকে ব্যক্তিচরিত্রে এ লক্ষণ দেখা যায়। যে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে হীন মনে করে, সে অন্যের সঙ্গে ঐকাত্ম স্থাপন করে নিজের হীনতা দূর করতে চায়। শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের সমতুল মনে করে তার ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে। আসলে অভেদীকরণ ক্ষতি-পূরণমূলক (Compensatory) আচরণ। যেমন, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ভৃত্য নিজেকে তার প্রভুর সমান মনে করে অনেক সময় দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ করে।

(ঝ) **অবদমন** (Repression) : অনেক সময় কামনা-বাসনাগুলি সমাজ অনুমোদিত স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না, সেগুলি অবদমিত হয়ে মনের নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় লাভ করে এবং মনের চেতনস্তরের বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে, যেমন আকস্মিক বিস্তৃতি, ভুল, ত্রুটি প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

(ঞ) **প্রত্যাবৃত্তি** (Regression) : অনেক সময় দেখা যায় বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়সেও শিশুসুলভ আচরণ করে। যখন দেখা যায়, কিশোর, যুবক বা বৃদ্ধ শিশুসুলভ আচরণ করে, তখন এ আচরণকে শৈশবাবস্থায় পশ্চাদপসরণ বা প্রত্যাবৃত্তি বলে। এ ধরনের আচরণ প্রকাশিত হলে বুঝতে হবে, ব্যক্তি কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হবার ক্ষমতা হারিয়ে শৈশবের নিরাপত্তার আশ্রয় সন্ধান করছে।

(ট) **নেতিবাচকতা** (Negativism) : এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ হল, যা করার প্রয়োজন তার বিপরীত কাজ করা। এ মনোভাবসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে সব সময়ই একটি বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের প্রবণতা দেখা যায়। এই জন্য অনেকে একে নঞর্থক আচরণ বলে অভিহিত করেন।

(ঠ) **মিথ্যাভয়** (Phobia) : যদি বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি যখন নিজেকে অসহায়, বিপদগ্রস্ত মনে করে এবং বাস্তব পরিস্থিতির তুলনায় নিজেকে হীন বা অকিঞ্চিৎকর ভেবে বাস্তবকে এড়িয়ে চলে তখন তার মনে অহেতুক আতঙ্ক দেখা দেয়। পরিণামে এ আতঙ্ক সর্বক্ষেত্রে একটি স্থায়ী উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তার রূপ পরিগ্রহ করে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিহত করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশু বিদ্যালয়ে যেতে ভয় পায়—তার এ ভয়কে বিদ্যালয়াতঙ্ক (School-phobia) বলে। অপ্রতিযোজিত বা অপসঙ্গত ব্যক্তির মধ্যে নানা ধরণের মিথ্যা ভয় দেখা যায়। যেমন—

অন্ধকারের ভয় (Nicto phobia), বদ্ধজায়গার ভয় (clusho phobia) উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় (aerophobia) রক্তের ভয় (heniatophobia) ইত্যাদি।

৬। অপসঙ্গতির কয়েকটি রূপ (Some forms of Maladjustment) :

অপসঙ্গতিমূলক আচরণের বিভিন্ন রূপ আছে। কয়েকটি প্রচলিত এ সাধারণ অপসঙ্গতিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত নীচে আলোচনা করা হচ্ছে :

(১) **ভীরুতা (Timidity) :** বিদ্যালয়ে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, কোন কোন ছেলেমেয়ে খুব শান্তশিষ্ট, চুপচাপ। সাধারণতঃ এদের ভাল ছেলে বলেই মনে করা হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এদের মধ্যে অনেকেরই এজাতীয় আচরণ অপসঙ্গতিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত। এই সব ছেলেমেয়ে দেখা যায়, বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি সাধনে ব্যর্থ হয়ে বাস্তব থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে এসে নিজেদের জগতে থাকতে চায়। এইসব ছেলেমেয়েরা তাদের চাহিদার অপরিতৃপ্তির জন্যও এ ধরনের আচরণ করে। ইচ্ছা পূরণের অপরিতৃপ্তি তাদের মধ্যে দুঃখ, বেদনা ও হতাশাবোধ সৃষ্টি করে যার জন্য বাস্তব থেকে তারা নিজেদের অপসৃত করে। মনঃসমীক্ষকদের মতে এরা হল অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন (introvert) নিজেদের বাস্তব থেকে প্রত্যাহৃত করে নেবার জন্য এদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা পিতামাতা বা শিক্ষকশিক্ষিকার দ্বারা নিপীড়িত, ভং´সিত ও কঠোর শাসনের বশীভূত হবার জন্য এরূপ আচরণ করে।

এইসব ছেলেমেয়েদের ভীরুতা দূর করতে হলে এদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন। এদের মনের মধ্যে থেকে হতাশার গ্লানি, ব্যর্থতার নৈরাশ্যবোধ দূর করে এদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করতে হবে। বাস্তবকে এড়িয়ে না গিয়ে এরা যাতে সাহস করে বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারে সেদিকেও নজর দিতে হবে। যদি প্রক্ষোভমূলক বিষয়গুলির জন্য তাদের মধ্যে এই ভীরুতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সেই কারণটি নিরূপণ করে তার চিকিৎসা করে সেটি দূর করা এবং তার মানসিক সমতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাই হবে যুক্তিযুক্ত কাজ।

অবশ্য কোন ছেলেমেয়ের শান্তশিষ্ট আচরণই বা ভীরুতার ভাব যে অপসঙ্গতিমূলক তা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ঐ ভীরুতার সঙ্গে নখকাটা, তোতলামি, অস্থিরতা প্রভৃতি উপসর্গগুলি যুক্ত কিনা।

(২) **ক্লাস পালানো (Truancy) :** শিশুদের ক্লাস পালানো এক ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ। এর নানারকম কারণ আছে। শিশুর শিক্ষাসম্পর্কীয়

চাহিদার অপরিতৃপ্তি এর অন্যতম কারণ। এই অপরিতৃপ্তিরও নানা উৎস থাকতে পারে। শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আর উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের যদি ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষাদান করা হয় তাহলে উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের পাঠ্যবিষয়কে খুবই সাধারণ মনে হয়। সেকারণে তারা ক্লাসে থাকতে চায় না। আবার যেসব ছেলেমেয়ে বিশেষ মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তারা সাধারণ পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে তাদের শক্তির সদ্ব্যবহার বিফল হয়ে যায় বলে তারা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে। এছাড়াও শিক্ষক শিক্ষিকার অনুদার মনোভাব, অতিরিক্ত শাসন, বিদ্যালয় শৃঙ্খলায় কঠোরতা কোন শিশুর ইন্দ্রিয়গত ত্রুটির জন্য সহপাঠীদের উপহাস, অর্থ নৈতিক দুরবস্থার জন্য নিকৃষ্ট পোশাক প রধান করায় হীনমন্যতাবোধের জন্য ছেলেমেয়েরা ক্লাস থেকে পালায়।

সেইজন্য পাঠ্য বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলা, শিক্ষাপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করা, শিশুর শিক্ষাসম্পর্কীয় স্বাভাবিক চাহিদাগুলি মেটানো, শিক্ষক শিক্ষিকার সহৃদয় ব্যবহার, শিক্ষণ পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করার জন্য নানারকম শিক্ষা-সরঞ্জাম ব্যবহার, ব্যক্তিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে শিক্ষাদান, মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের তাদের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং তাদের মানসিক শক্তির যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ যাতে তারা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, শাসনের কঠোরতা হ্রাস করে ছেলেমেয়েদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি ক্লাসপালানোরূপ ব্যাধির প্রতিকার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

(৩) **মিথ্যা ভাষণ (Lying):** শিক্ষার্থীদের মিথ্যা কথা বলা অপসঙ্গতিমূলক আচরণের একটি সাধারণ রূপ। খেলার ছলে মিথ্যা কথা বলা, বিষয়বস্তুকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া, গোপন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা, প্রভৃতি তেমন মারাত্মক নয়।[১] কেননা এই সব মিথ্যাভাষণ শিশুর কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় বহন করে না। কিন্তু অনেক সময় চাহিদার অপরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষার্থী ইচ্ছা করে মিথ্যাকথা বলে। এসব অস্বাভাবিক মিথ্যাভাষণই অপসঙ্গতি-মূলক আচরণের দৃষ্টান্ত। শিশু বিদ্যালয়ে তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্য সহপাঠীদের কাছে আত্মস্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে মিথ্যা কীর্তিকলাপের কাল্পনিক কাহিনী বর্ণনা করতে পারে। এই জাতীয় মিথ্যাভাষণ তার ব্যর্থতা ও হতাশার পরিণতি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল। কিন্তু এই জাতীয় মিথ্যাভাষণে তার চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটে না এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন সমাধান হয় না। ফলে মিথ্যার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে, ফলে অপরাধবোধ তার মনকে আচ্ছন্ন করে সে দুর্বল হয়ে পড়ে।

বাইরের জগতেও তার মিথ্যাবাদী পরিচয়টা রটে যায়। এর ফলে তার আকাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি ত সে লাভ করেই না বরং তার অপসঙ্গতিমূলক আচরণ আরও বাড়তে থাকে।

এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণকে দূর করতে হলে শিশুর মিথ্যাভাষণের প্রকৃত কারণটি অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করতে হবে। শিশুর যে চাহিদার অপরিতৃপ্তির জন্য এই মিথ্যা ভাষণ তার যথাসম্ভব পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) **চুরি করা** (Stealing) : শিশুদের বিদ্যালয়ে চুরি করার অভ্যাসও এক ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত। শিশুর কোন চাহিদা অপরিতৃপ্ত থাকার জন্য শিশু এই চুরির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। অনেক সময় আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা মেটাবার জন্য শিশু সহপাঠীদের বই, খাতা, পেন্সিল চুরি করে এবং সহপাঠীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে চায়। শিশুর এই ধরনের প্রবৃত্তি তাকে ধীরে ধীরে অপরাধ প্রবণ (delinquent) শিশু করে তোলে। আবার অনেক সময় কোন বিশেষ অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুর নির্জ্ঞান মনে নিহিত থেকে তার মধ্যে মনোবিকারমূলক চুরির (pathological stealing) প্রবণতা সৃষ্টি করে, যা কোন বিশেষ চৌর্যকার্যের মধ্য দিয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। এই সব ক্ষেত্রে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বহেতু শিশু কোন বস্তুকে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতীক হিসেবে মনে করে এবং ঐ বস্তুটির অধিকারী হয়ে সে চাহিদা পরিতৃপ্ত করে।

সাধারণ অপসঙ্গতিমূলক চুরির ক্ষেত্রে শিশুর চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে; তার চুরির প্রবৃত্তি দূর করা যেতে পারে। যে সব শিশু লেখাপড়ায় তার যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ সে যাতে খেলাধুলা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, বিতর্ক প্রভৃতিতে তার যোগ্যতা প্রমাণে সমর্থ হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। যেসব চুরি মনোবিকারমূলক, সেসব ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তা দূর করা প্রয়োজন।

(৫) **আক্রমণাত্মক মনোভাব** (Aggressiveness) : বিদ্যালয়ে অনেক শিশুকে দেখা যায় যারা অন্য সহপাঠীদের অকারণে মারধোর করে। এই ধরনের ছেলেমেয়ে ভাই-বোন সহপাঠী সকলকেই অকারণে নিপীড়িত করে আনন্দ পায়। এদের এই আক্রমণাত্মক মনোভাব অপসঙ্গতিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত। মনোবিজ্ঞানীদের মতে নিরাপত্তাবোধের অভাবই শিশুদের মধ্যে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব সৃষ্টি করে। নিরাপত্তা বোধের অভাব হেতু শিশু নিজেকে অবহেলিত মনে করে এবং নিজের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অকারণে অপরকে উৎপীড়ন করে। অপরের স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যেও অনেক শিশু আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক পথে আত্মস্বীকৃতি আদায়ে বিফল হয়েই শিশুরা এই অস্বাভাবিক আচরণে লিপ্ত হয়।

শিশুর আক্রমণাত্মক মনোভাব দূর করতে হলে প্রয়োজন শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাকে যথাবম্ভব মেটাবার চেষ্টা করা। স্নেহ ভালবাসার দ্বারা শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ এবং অবহেলাজনিত যে বেদনা তাকে বিদূরিত করতে হবে এবং তার আত্মবিশ্বাস যাতে সে ফিরে পায় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। শিশু যদি আত্মস্বীকৃতি চায় তাহলে যাতে সে তা পেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কোন মতেই শিশুর আক্রমণাত্মক মনোভাবকে অবদমিত করা যুক্তি সঙ্গত নয়। বরং তাকে অন্য পথে চালিত করে গঠনধর্মী করে তোলাটাই যুক্তিযুক্ত, আক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন শিশুর এই মনোভাবকে অবদমিত না করে তাকে যদি প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে তার অপসঙ্গতি মূলক আচরণ নিবারিত হতে পারে।

(৬) **নেতিমনোভাব (Negativism):** নেতিমনোভাব হল আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা। যে কোন রকম সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা, আইন লঙ্ঘন করা এবং নিজের খুশীমত কাজ করা। এই ধরনের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সব সময়েই বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এদের এই মনোভাবই, কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, এবং গৃহে অভিভাবকবৃন্দের এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার মনে প্রচণ্ড বিরক্তির সৃষ্টি করে। সব ব্যাপারেই এই বিদ্রোহী মনোভাব, এক ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ এবং এই ধরনের ছেলেমেয়েদের অসামাজিক মনে করে শাস্তি দান করলেই তাদের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ-সমস্যার সমাধান হয় না। শিশু স্বাধীনতার চাহিদা থেকেই এই নেতিমনোভাবের জন্ম। শিশুরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়, অপরের নিয়ন্ত্রণ তারা পছন্দ করে না। সে চায় কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে নিজের খুশীমত চলতে। কিছুটা নেতিমনোভাব সব শিশুর মধ্যেই থাকে। কাজেই সাধারণ ভাবে বলতে গেলে এই মনোভাব খুব মারাত্মক নয়। বরং শিশু মনের বেড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া তারই বাহ্য প্রকাশ, কিন্তু সাধারণ নেতিমনোভাব যদি গুরুতর আকার ধারণ করে, তখনই তা অপসঙ্গতিমূলক হয়ে ওঠে।

শুধু মাত্র শাসন বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই অস্বাভাবিক আচরণকে দূর করা যায় না। শিশুর স্বাধীনতার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করলে এই মনোভাব তার মধ্য থেকে দূর হতে পারে। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে, সে নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং নিজের খুশীমত কাজ করছে।

(৭) **যৌন অপরাধ (Sex offences):** শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৈশোরে নানারকম যৌন অপরাধ দেখা দেয়। শিক্ষার্থীর যৌন কৌতূহল অপরিতৃপ্ত থাকার জন্য নানাধরনের

অস্বাভাবিক আচরণের মধ্য দিয়ে তার পরিতৃপ্তি খুঁজে পেতে চায়। অশ্লীল সাহিত্য পাঠ, অশ্লীল আচরণ, অশালীন মন্তব্য ও ইঙ্গিত করা, যৌনধর্মী নিরীক্ষণ, বিকৃত যৌন আচরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তার যৌন চাহিদা নানাধরনের যৌন অপরাধের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তি খুঁজে পেতে চায়। শিক্ষার্থীর এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ নিবারিত না হলে কালক্রমে তা গুরুতর অপরাধ প্রবণতার রূপ গ্রহণ করে।

শিক্ষার্থীর যৌন কৌতূহল মিটিয়ে তার যৌন চাহিদাকে স্বাভাবিক পথে মেটাবার চেষ্টা করে, যৌন রহস্য সম্পর্কে তাকে যৌন শিক্ষাদান করে তার এই অপরাধ প্রবণতা দূর করা যেতে পারে। প্রতি বিদ্যালয়েই তাই কিশোর শিক্ষার্থীদের যৌন শিক্ষা দান করা উচিত যাতে যৌন বিষয়গুলি সম্পর্কে তার কৌতূহল অপরিতৃপ্ত থেকে তাকে যৌন অপরাধে লিপ্ত না করে।

অসঙ্গতির অন্যান্য রূপ : উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও নানাধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, বদমেজাজ, প্রভৃতি অপসঙ্গতির অন্যান্যরূপ। এসব ক্ষেত্রেও এই জাতীয় আচরণের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এগুলির মুলে আছে কোন চাহিদার অপরিতৃপ্তি। এই সব চাহিদাগুলিকে স্বাভাবিক সমাজানুমোদিত পথে পূরণ করার ব্যবস্থা করলে অনেক ক্ষেত্রেই এই সব অপসঙ্গতিমূলক আচরণ নিবারিত হতে পারে। চাহিদাগুলিকে অবদমিত না করে সেগুলির উদ্‌গতিসাধনের (sublimation) দ্বারাও এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ নিবারিত হতে পারে। সমবেদনা ও ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর অপসঙ্গতিমূলক আচরণের কারণটি নিরূপণ করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং যেখানে এই অপসঙ্গতি মনোবিকারমূলক সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তার প্রতিকার করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা রক্ষার দায়িত্ব শুধুমাত্র শিক্ষক শিক্ষিকার নয়; সমাজের সকলেরই এ ব্যাপারে দায়িত্ব আছে।

৭। অপসঙ্গতির কারণসমুহ (Causes of Maladjustment) :

ব্যক্তিচরিত্রে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দিলে তার প্রতিকার ও চিকিৎসার (therapy) জন্য অপসঙ্গতির সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণ (diagnosis) করা প্রয়োজন। আমরা নিম্নে অপসঙ্গতির প্রধান প্রধান কারণগুলি বর্ণনা করছি :

(ক) অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conflict) : সকল প্রকার অপসঙ্গতির অন্তরালে মানসিক দ্বন্দ্ব বর্তমান। এজন্য অন্তর্দ্বন্দ্বকে কোন বিশেষ কারণ না বলে সাধারণ কারণ বলে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন কামনা-বাসনাকে ঘিরে ব্যক্তিমনে নানা আবেগ সৃষ্টি হয়।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের বাসনাগুলি বহুমুখী এবং বিরোধপূর্ণ। পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা বা অতৃপ্ত বাসনার অবস্থিতি থেকে ব্যক্তিমনে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

শৈশব থেকে শুরু করে বাস্তব পরিবেশের সন্নিকর্ষে কামনা-বাসনার একটি প্রবাহ আমাদের জীবনে চলতে থাকে। সব কামনা-বাসনা নিজ সামর্থের অভাবে অথবা সহায়তা ও সহানুভূতির অনুপস্থিতিতে পূরণ করা সম্ভব নয়। আবার সকল বাসনা সমাজ-অনুমোদিত নয় বা জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও প্রথার বিরোধী। অনেক ইচ্ছার মধ্যে স্ববিরোধিতাও বর্তমান। অনেক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য শিশু কাল্পনিক বা বাস্তব বাধার সম্মুখীন হয়।

ব্যক্তি তার মানসিক, শারীরিক, সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করে থাকে। এ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তিমনে নানা চাহিদা, ইচ্ছা ও আচরণ দেখা দেয়। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই আমাদের চাহিদা ও ইচ্ছার পরিতৃপ্তিসাধন করে না—সকল আচরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে নেবার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা মানুষের নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কামনাকে চরিতার্থ করার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যেও বিরোধিতা বর্তমান। সুতরাং আমাদের মনে দ্বন্দ্ব অবধারিত একটি ঘটনা। শিশু যখনই সামাজিক দিক থেকে সক্রিয় হয়ে উঠে, তখন দ্বন্দ্ব তার মনে বাসা বাঁধে।[1]

কিন্তু যে কোন দ্বন্দ্বই মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না। কামনা-বাসনা চাহিদা পূরণের অতৃপ্তি বা নিজের অসমর্থতাবোধ, বা বহুমুখী ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হলেই ব্যক্তিমন দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় না। অতৃপ্তি ব্যর্থতা. বাসনার বিরোধ ব্যক্তিকে কতটুকু বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত করল তার তীব্রতা ও ব্যাপকতার উপর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ও স্বরূপ নির্ভর করে। অতৃপ্ত ইচ্ছা বা অবদমিত বাসনা ব্যক্তি মনে যে আবেগমূলক উত্তেজনা (emotional tension) সৃষ্টি করে তার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গতিসাধন না হলে মানসিক দ্বন্দ্ব জন্ম নিতে থাকে। এই আবেগধর্মী অপ্রীতিকর মনোভাব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এজাতীয় দ্বন্দ্ব দুপ্রকারের হতে পারে—ব্যক্তি তার মানসিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যদি অবহিত থাকে, তার মনে যে বিক্ষুব্ধ আবেগ ও উত্তেজনা বর্তমান সে সম্বন্ধে ব্যক্তি যদি সজাগ থাকে, তবে তার মানসিক দ্বন্দ্ব **সচেতন মনের দ্বন্দ্ব**। সচেতন মনের বিরোধী মানসিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে ব্যক্তি যদি অবহিত না থাকে অর্থাৎ অবদমনের ফলে দ্বন্দ্বগুলি যখন চেতন মন থেকে নির্জ্ঞান মনে স্থানান্তরিত হয়,

1. "Conflicts arise early in life as soon as the child becomes active socially. ; Sherman—Mental Hygiene and Education."

তখন সে দ্বন্দ্বকে **নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব** বলা হয়। সচেতন মনের দ্বন্দ্বজনিত আচরণ ব্যক্তির মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিও সচেষ্ট হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি মীমাংসা করে নিতে পারে। কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরের দ্বন্দ্ব পরোক্ষভাবে ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে এবং এ দ্বন্দ্বের বিচার-বিশ্লেষণ সহজ নয়। কারণ এ ধরনের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিমনে নানা গূঢ়ৈষা (complexes) সৃষ্টি করে এবং জটিল আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, শিশুর জীবনে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত হয়। দ্বন্দ্ব মাত্রই অস্বাভাবিক নয়। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অতি শৈশবে শিশু তার স্বতন্ত্র সত্তা বা ইচ্ছা সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও পরিবেশের সংস্পর্শে শিশুমনে নানা বিরোধ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। শিশু তার গৃহ-পরিজন, সঙ্গী-সাথী, পরিচিত ব্যক্তি, বিদ্যালয়ের সহপাঠী, শিক্ষক সকলের সঙ্গে যখন মেলামেশার সুযোগ লাভ করে এবং অন্যের সন্নিকর্ষে (contact) নিজ স্বাতন্ত্র্য এবং পরিবেশ ও 'অন্যসত্তা' (other selvcs) সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তখন স্বাভাবিক ভাবেই দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর এ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করার বা সমাধানের উপর তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নির্ভর করে।

শিশুর বয়সের অগ্রগতি এবং সমস্যার প্রকৃতি ও সংখ্যার উপর দ্বন্দ্ব নির্ভর করে। শৈশবে ও যৌবনাগমের মানসিক দ্বন্দ্ব, বয়স এবং সমস্যার প্রকৃতি ও সংখ্যার দিক থেকে ভিন্ন হবে। যৌবনাগমে (adolescence) শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্তরে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসে তার সঙ্গে শৈশবের মিল নেই। শৈশবে গৃহ-পরিজন খেলাধূলা, পাঠ-প্রস্তুতি, সহপাঠী, শিক্ষক প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে শিশুমনে যে আবেগ সৃষ্টি হয়, তা সরল ও সংক্ষিপ্ত, সুতরাং এ ধরনের আবেগ উত্তেজনা সঞ্জাত দ্বন্দ্ব মাতাপিতা, শিক্ষক বা বয়স্কদের সহায়তায় অনেক ক্ষেত্রেই তিরোহিত হয়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যৌবনাগমে যে বিচিত্র ভাবসংঘাত ও চাহিদার লীলাখেলা ব্যক্তির জীবনে চলে তার সঙ্গতিসাধন সহজ নয়। অভিভাবক, শিক্ষক, বিদ্যালয় ও সমাজ সর্বতোভাবে সচেষ্ট না হলে কিশোর-কিশোরীর মানসিক দ্বন্দ্ব অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান স্তরে জড় হয়। আর নির্জ্ঞান স্তরের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকে বিক্ষিপ্ত, অসংহত করে তোলে। একমাত্র মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist) ছাড়া এ ধরনের দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব নয়। এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তির আচরণকে অপসঙ্গতিপূর্ণ করে অস্বাস্থ্যকর মনোভাব সৃষ্টি করে।

(খ) **নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব** (Sense of Insecurity) : নিরাপত্তাহীনতার মনোভাব নানাভাবে শিশুমনে উপস্থিত হয়ে শিশুকে অপসঙ্গতিশীল করে

তোলে। শিশুমনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে শিশুর মনে নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি করা উচিত। শিশু যে নিরাপদে রক্ষিত হচ্ছে সে কথা বড নয়; সে যে নিরাপত্তা সহকারে রক্ষিত হচ্ছে এ ধারণা তার মনে গ্রথিত করা উচিত। কোন কারণে যদি শিশু মনে করে যে, সে অবহেলিত বা অবাঞ্ছিত তবে তাব মনে নিরাপত্তাহীনতার ভাব জন্মায়। এব ফলে সে দুর্বল, সদাসন্ত্রস্ত হয়ে পডে। একটি অহেতুক ভয়ে সব কিছুকেই আপন অস্তিত্বের পরিপন্থী বলে সে মনে করে। গৃহে, বিদ্যালয়ে, সামাজিক সকল পরিবেশে এ ধরনের মানসিকতা দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি নানা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করে থাকে। কোন উদ্যম, কোন নতুন প্রচেষ্টা বা কোন কাজে সে অগ্রণী হতে চায় না। সে সদা সঙ্কুচিত ও উৎকণ্ঠিত। বিদ্রূপ, নিন্দা, লজ্জা, সমালোচনার ভয়ে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। শিক্ষক পড়া জিজ্ঞেস করলে সে উত্তরপ্রদানে ইতস্ততঃ করে, সঙ্গী-সাথী বা সহপাঠীর সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সে নীরব দর্শক। সব সময়ই তার এক উৎকণ্ঠা যে তার পরিবেশের শক্তিগুলি তার নিরাপত্তা বা সকল স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলবে।

অতি শৈশবে এ নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি স্বাভাবিক। মাতাপিতা বা পরিজন শিশুকে তাদের স্নেহ, মমতা ও শিশুর চাহিদা, আবদার প্রভৃতি পরিতুষ্টির দ্বারা শিশুমনে নিরাপত্তা জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু যেখানে মাতাপিতা বা আত্মীয় পরিজন দ্বারা শিশু অবহেলিত হয়, তার চাহিদা, আবদার যতই মূল্যহীন হোক না কেন, অপরিতৃপ্ত থাকে, সেখানে শিশু নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করবেই।

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশ থেকে সঞ্জাত নানা ঘটনা বা অপ্রীতিকর অবস্থা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে। কঠোর কাজ, অহেতুক ভর্ৎসনা, নিন্দা, শাস্তি শিশুকে দুর্বল এবং ভয়গ্রস্ত করে তোলে, পরিণামে সে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় ভাবতে থাকে। বিদ্যালয়ে যদি সহানুভূতির অভাব থাকে, শিক্ষক বা সহপাঠীর দ্বারা যদি শিশু অবহেলিত হয়, বিদ্যালয় পরিবেশে যদি শিশু উৎসাহ আনন্দ লাভ না করে তবে সে নিজেকে অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত বলে ধারণা করে।

শৈশবে মাতাপিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হলে, মাতাপিতার বিবাহ বিচ্ছেদ (divorce) বা মাতাপিতার মধ্যে অসম্প্রীতি, কলহ প্রভৃতির ফলে, জাতি (caste) বা ধর্মগত কারণে শিশুকে অবহেলা, বা সমাজ কর্তৃক শিশুকে প্রত্যাখ্যান, দারিদ্র্য, সামাজিক অস্থিরতা (instability) ত্রুটিমূলক শিক্ষণ-পদ্ধতি, কুসংসর্গ, মন্দ অভ্যাস ইত্যাদির ফলে শিশুর মনে নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি করতে পারে।

ব্যক্তিমনে নিরাপত্তার অভাব থেকে নানা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ দেখা দেয়।

তার আচরণে দিবাস্বপ্ন, প্রক্ষেপণ (projection), হীনমন্যতাবোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা, ঐকাত্মবোধ (identification) প্রভৃতি লক্ষ্য করা যায়।

নিরাপত্তাবোধে অভাব দেখা দিলে প্রথমতঃ তার সঠিক কারণ নির্ধারণ করা চাই। তারপর গৃহে বা বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে সে কারণ বিদূরিত করা এবং নিরাপত্তাবোধের সহায়ক পরিবেশ প্রদান করা উচিত। যদি নিরাপত্তার অভাববোধ জটিল আকার ধারণ করে তবে মনঃসমীক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয়।

(গ) **আক্রমণাত্মক মনোভাব** (Tense of Hostility) : অপসঙ্গতির আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল আক্রমণাত্মক মনোভাব। এই আক্রমণাত্মক মনোভাব ব্যক্তির চেতন বা নির্জ্ঞান মনে সৃষ্টি হতে পারে। নানা ধরনের মনোবিকার থেকে আক্রমণমূলক মনোভাব উদ্ভূত হয়। মাতাপিতার পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার, অতিরিক্ত শাসন ও নিয়ন্ত্রণ, অনাদর, অবহেলা প্রভৃতি শিশুকে আক্রমণধর্মী করে তোলে। যেসব ক্ষেত্রে মাতাপিতা নিজেরাই নিরাপত্তাবোধহীনতায় পীড়িত, তাঁদের পক্ষে শিশুর প্রতি সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ, দরদ ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মাতাপিতা স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা এবং পক্ষপাতপূর্ণ। এঁরা তাঁদের সন্তানসন্ততির মনে ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্যের অতি সহায়ক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করতে পারেন না। সন্তানের প্রতি তাঁদের আচরণ সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে, কখনও তাঁরা কঠোর, কখনও বিশেষ সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহপ্রবণ। মোটের উপর তাঁদের আচরণ বৈষম্যমূলক হবার ফলে শিশু হয়ত তাঁদের আচরণ সহ্য করে নেয় কিন্তু মেনে নেয় না, মনে মনে সে বিদ্রোহী, আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে।

শৈশবে শিশুর আচরণে উদ্দামতা, তার মনে স্পর্শকাতরতা, কিছুটা নিরাপত্তা-বোধহীনতা স্বাভাবিক। অনেক মাতাপিতা সংযম ও শৃঙ্খলার নামে শিশুর শৈশব-সুলভ আচরণে বাধা সৃষ্টি করেন। তার খেলাধূলা, কাজকর্মকে অহেতুক সমালোচনা ও তিরস্কারের দ্বারা সীমিত রাখবার চেষ্টা করেন। স্নেহপ্রার্থী, স্পর্শকাতর শিশুদের কাজের বিরূপ সমালোচনা, তাদের আবদার চাহিদার উপেক্ষা ইত্যাদি দ্বারা আমরা শিশুমনে আক্রমণধর্মিতা সৃষ্টি করে থাকি।

সচেতন মনে এই আক্রমণধর্মিতা সৃষ্টি হলে শিশু তার আচরণে যাতে এ মনোভাব প্রকাশ না পায় সে সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়। কিন্তু মনোভাব ও আচরণের মধ্যে এর ফলে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং সমবয়সীদের প্রতি ঝগড়া-বাদ-বিসংবাদ, মারামারি, নিষ্ঠুর আচরণ প্রভৃতির মাধ্যমে বিক্ষুব্ধ আচরণ প্রকাশ পায়। অনেক ক্ষেত্রে অবদমনের ফলে শিশুর এ মানসিক বিদ্রোহ নির্জ্ঞান স্তরে উপস্থিত হয় এবং নানাভাবে তার

আচরণকে প্রভাবিত করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যক্তি অহেতুকভাবে অপরকে পীড়ন করা, আসবাব পত্র বিনষ্ট করা, বইপত্র ছিঁড়ে ফেলা, এমনকি অসহায় পশুপ্রাণীর উপর অযথা উৎপীড়ন করার প্রবণতা প্রদর্শন করে। এর প্রবণতার কারণ সম্পর্কে ব্যক্তি সজাগ নয়। নির্জ্জান মনের আক্রমণধর্মিতাই এর মূলে কাজ করে।

(ঘ) **অপরাধবোধ** (Sense of Guilt) : অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তি নিজেকে তার আচরণের জন্য অপরাধী মনে করে। এ অপরাধবোধ যদি ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসম্মত হয়, তবে ব্যক্তি অনুশোচনার দ্বারা বা অপরাধ স্বীকৃতির দ্বারা নিজেকে সংশোধন করে নেয়। কিন্তু এমন এক ধরনের অপরাধবোধ ব্যক্তি মনে মনে পোষণ করে যা তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিকৃষ্ট ধারণা থেকে সঞ্জাত। হীনমন্যতাবোধ বা আপন ব্যক্তিত্বকে অতি নিম্নস্তরের ভেবে ব্যক্তি নির্দোষ কাজের জন্যও নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে ফেলে, এবং মনে অপরাধের অনুভূতি লালনপালন করে। ফলে, আত্মগ্লানি বা অহেতুক আত্মনিন্দার প্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয়। সে অনেক সময় নিজেকে কষ্ট দেয়, পীড়া দেয়, আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত করে প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ খোঁজে, অনেকে নিজেকে এতই অপরাধী মনে করে যে সে আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করে।

এ অপরাধানুভূতির কারণ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। সাধারণতঃ অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা বা বয়স্কদের নিন্দা, বিদ্রূপ, তুচ্ছজ্ঞান শিশুদের মনে অপরাধবোধ উদ্রেক করে। অর্থাৎ শিশুর মনে নিজের সম্বন্ধে নিম্নতাবোধ সৃষ্ট হলেই অপরাধবোধ জন্ম নেয়। ক্ষণিক উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে যদি ব্যক্তি হঠাৎ কোন গর্হিত কাজ করে বসে, আর যদি আমরা তাকে অনবরত ধিকৃত করি তবেও তার অপরাধবোধ মনে বাসা বাঁধে।

আধুনিক মনঃসমীক্ষকরা বলেন, শিশুর যৌনতাবোধকে ঘিরে অপরাধবোধ ব্যক্তি-চরিত্রে দেখা দেয়। অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী হেতু শিশুর যৌন কৌতূহলকে আমরা প্রকাশিত হতে দিই না। যৌন শিক্ষা আমাদের সামাজিক প্রথানুসারে নিষিদ্ধ পাপ স্বরূপ। কিন্তু শিশুর এ কৌতূহল সমাজ-অনুমোদিত ভাবে পরিতৃপ্ত না হয়ে গোপনে প্রকাশিত হতে থাকে। শিশুও ভাবতে থাকে এ কৌতূহল পাপ—যৌন প্রবণতা পাপ—যৌন আচরণ পাপ ; এ পাপকে সে গোপনে পোষণ করছে। ফলে তার মনে অপরাধের অনুভূতি বাসা বাঁধে। কিন্তু একথা আমরা ভুলে যাই, যৌন কৌতূহল শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক, নানা কর্মধারায় একে আমরা প্রভাবিত করতে পারি। আমাদের সংস্কার, সামাজিক অনুশাসন যৌনশিক্ষাকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে—আর এক কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও অবদমন শিশুমনে পাপানুভূতির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

একদল মনোবিজ্ঞানী বলেন, ধর্মীয় অনুশাসন, পাপ ও অপরাধ সম্বন্ধে শিশুমনে ধারণা সৃষ্টি করে। ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে নীতিবোধের নামে অনর্থক ভয় সৃষ্টি করে কৃত্রিম আচরণ ও পাপ সম্বন্ধে ধারণা জাগিয়ে তোলে। ধর্মীয় আচরণ ভঙ্গ হলে ব্যক্তি নিজে পাপী বলে ধরে নেয় এবং দুশ্চিন্তা ও আত্মগ্লানিতে ভোগে। ফলে ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে।

অপরাধবোধ সঞ্জাত আচরণ মানসিক ব্যাধির কারণ এবং ব্যক্তির আচরণের সকল সংহতি ও অহংসত্তা বিকাশের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায় তার কারণ কি? কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও কতকগুলি সাধারণ কারণ আছে যার জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করে। গৃহের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিদ্যালয়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিদ্যালয়ের অনাকর্ষণীয় পাঠ্যক্রম, শিক্ষকের কঠোর-শাসন, ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিতে শিক্ষাদান না করা যার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে হীনমন্যতাবোধের সঞ্চার, শিক্ষার্থীর সৃজনীমূলক ক্ষমতা প্রকাশে অন্তরায়, দল থেকে বহিষ্কৃতি, অযথা কোন শিক্ষার্থীকে অপরাধ প্রবণ মনে করে তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, বিদ্যালয়ের প্রতি পিতামাতার বিরূপ মনোভাব ইত্যাদিকে এইসব সাধারণ কারণ বলে মনে করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে ব্যর্থতা প্রদর্শন করে।

৮। অপসঙ্গতির চিকিৎসা (Therapy of Maladjustment):

আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে অপসঙ্গতির চিকিৎসা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অপপ্রতিযোজন বা অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয়ের সঙ্গে চিকিৎসার প্রশ্নটি জড়িত। মানসিক অসুস্থতা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থি এবং সামাজিক সংহতির অনিষ্টকারী বহু আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এসব আচরণের কারণ উদ্ঘাটন সহজ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, মিথ্যা বলা (lying), বিদ্যালয় থেকে পলায়ন (truancy) প্রভৃতি অপসঙ্গতিমূলক আচরণ কোন্ নির্দিষ্ট কারণে সংগঠিত হয়েছে বলা দুরূহ ব্যাপার। এ দুটো অপসঙ্গতিমূলক আচরণ একই কারণ নিরাপত্তার অভাব থেকে উদ্ভূত হতে পারে। সুতরাং অপসঙ্গতির চিকিৎসার পূর্বে মানসিক কারণ খুঁজে বের করে নিতে হয়। যে কোন চিকিৎসা করা হোক না কেন, প্রথমতঃ রোগ সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করতে হয়, তারপর সে তথ্যগুলির সংব্যাখ্যানের প্রয়োজন। চিকিৎসা-বিধানে মনঃসমীক্ষণ ও খেলাভিত্তিক চিকিৎসা এ দুটো পন্থাই অবলম্বন করা হয়। আমরা পরপর এ সোপানগুলি আলোচনা করছি:

(ক) তথ্যসংগ্রহ (Data Collection): অপপ্রতিযোজনের চিকিৎসার প্রথম কাজ হল রোগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ। অপসঙ্গতি ব্যক্তির আচরণে ধরা পড়ে সত্য কিন্তু অসংলগ্ন, অস্বাস্থ্যকর আচরণের কারণটি মানসিক। এ মানসিক কারণের স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। এজন্য প্রথমে রোগীর সঙ্গে **সাক্ষাৎকারের** (Interview) প্রয়োজন। চিকিৎসক রোগীর আস্থাভাজন হবার চেষ্টা করবেন এবং তার অতি আপনজন ও বন্ধুর মতো তার সঙ্গে আচরণ করবেন। ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার দ্বারা চিকিৎসক রোগীর সমস্যা, রোগের প্রকৃতি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করবেন। এই সাক্ষাৎকার অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রোগীর মানসিক ব্যাপার সহজেই চিকিৎসকের কাছে ধরা পড়ে না, রোগীও নিঃসঙ্কোচে তার মানসিক ব্যাপার খুলে বলে না। প্রচুর ধৈর্য ও সহানুভূতি সহকারে চিকিৎসক রোগীকে সঙ্গ দেবেন। তারপর নানা কথাবার্তা, গল্প ইত্যাদি দ্বারা তার মানসিক ত্রুটি কোথায়, কি প্রকৃতির, কবে শুরু হয়েছে ইত্যাদি জানবার চেষ্টা করবেন।

মনঃসমীক্ষকরা (Psycho-analyist) সাক্ষাৎকারের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিতে চান না। তাঁরা বলেন রোগের প্রকৃত কারণটি ব্যক্তির নির্জ্ঞান স্তরে থাকে। ব্যক্তিমনের এ গোপন স্তরটি সচেতন মনে ধরা পড়ে না। সাক্ষাৎকারের দ্বারা ব্যক্তির রোগের যে প্রকৃতি আমরা নির্ধারণ করি আসলে তার সঙ্গে মূল রোগের কোন সম্পর্ক থাকে না। মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যক্তিমনের নির্জ্ঞান স্তরে সমবেত গোপন কথাটি খুঁজে বার করার উপদেশ দিয়েছেন। ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব নির্জ্ঞান স্তরে উপস্থিত হয়েই নানা মনোবিকার ও অপসঙ্গতি সৃষ্টি করে।

তবে নির্জ্ঞান মন ও মনঃসমীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও আমরা বলতে পারি, শিশুর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারই সম্ভবতঃ উপযুক্ত পন্থা। অ্যাডলার অবাধ অনুষঙ্গ-পদ্ধতি স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, শিশুর মানসিক অপসঙ্গতি ও বিকারের মূলে রয়েছে নিজস্ব ক্ষমতা সম্বন্ধে শিশুর ধারণা ও বাস্তব সামর্থ্যের মধ্যে তার পার্থক্য। তিনি সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বারা রোগ নির্ণয় করতে বলেছেন।

(খ) সংব্যাখ্যান (Interpretation): সাক্ষাৎকারের দ্বারা চিকিৎসক রোগী, রোগ ও সমস্যা সম্বন্ধে যেসব তথ্য সংগ্রহ করলেন, তার যথাযথ বিন্যাস ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর রোগীর মানসিক বিকারের স্বরূপ ধরা পড়ে এবং তার চিকিৎসা নির্ভর করে। সঠিকভাবে তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ না

1. Kaplan and O'Dea.

করলে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কোনটিই সফল হবে না। রোগী নানা কথা ও সংবাদ এলোমেলোভাবে বলে যায়, এর বেশির ভাগই অপ্রয়োজনীয়, আসল রোগের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। চিকিৎসক তাঁর দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এ তথ্য স্তূপ থেকে প্রয়োজনীয় ও রোগসম্পর্কিত কথাগুলি খুঁজেবার করবেন।

মনঃসমীক্ষকরা বলেন, সাক্ষাৎকারলব্ধ তথ্যগুলি থেকে মানসিক রোগ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কারণ, মানসিক বিকার বা রোগের কারণ রোগীর নির্জ্ঞান মনে সঞ্চিত থাকে। নির্জ্ঞান মনে যে দ্বন্দ্ব বাধে তাকে খুঁজে বার করতে না পারলে এ সংব্যাখ্যানের দ্বারা কোন চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। ব্যক্তির চেতনমনের তথ্য থেকে নির্জ্ঞান মনের সংবাদ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করতে না পারলে রোগ নির্ণয় করা যা: না। অবশ্য যাঁরা মনঃসমীক্ষণবাদ বা মনের সকল সমস্যার মূলেই নির্জ্ঞান মনের প্রভাব বর্তমান একথা স্বীকার করেন না, তাঁরাও নির্জ্ঞান মন যে সচেতন মনের উপর সময়-বিশেষে এবং ব্যক্তিবিশেষে যথেষ্ট প্রভাবশালী, একথা মেনে নেন। তাঁরা সাক্ষাৎকার ও সংব্যাখ্যানের দ্বারা নির্জ্ঞান মনকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেন।

(গ) **মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা (Psycho-analytical Therapy) :** মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসার উদ্ভাবক হলেন ফ্রয়েড। মনঃসমীক্ষণবাদীরা বিশ্বাস করেন, আমাদের মনের একটি বৃহত্তর অংশ অচেতন, মনের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই চেতন। চেতন মনে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত উপস্থিত হলে ব্যক্তি তাকে অবদমিত করে। এ অবদমিত কামনা-বাসনার দ্বন্দ্ব নির্জ্ঞান স্তরে সমবেত হয়ে ব্যক্তির চেতন-আচরণে নানা প্রতিক্রিয়া এবং অপপ্রতিযোজন সৃষ্টি করে। মনের এই গভীর তলদেশ থেকে অবদমিত দ্বন্দ্ব খুঁজে বার করতে না পারলে ব্যক্তির মানসিক রোগ নির্ণয়, প্রতিকার ও চিকিৎসা সম্ভব হতে পারে না।

কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরে অবদমিত দ্বন্দ্ব সোজাসুজি বা প্রকাশ্যভাবে জানা যায় না। ফ্রয়েড এজন্য **অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি (Free Association Method)** উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতি অনুসারে রোগীকে যা মনে আসে তাই বলে যেতে বলা হয়। রোগীর এ বর্ণনা বিশ্লেষণ করে তার অবদমিত ইচ্ছা খুঁজে বার করা হয়। ফ্রয়েডের মতে অপপ্রতিযোজনের একমাত্র চিকিৎসাই হল নির্জ্ঞান মন থেকে অবদমিত দ্বন্দ্বটির উদ্ঘাটন। মনঃসমীকক্ষ ব্যক্তিকে তার অজ্ঞাত দ্বন্দ্ব বা অবদমিত ইচ্ছার সঙ্গে পরিচিত করে দেন এবং তার ভবিষ্যৎ আচরণ থেকে অপসঙ্গতি কি ভাবে অপসারণ করা যায়, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত মনোভাব ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের সুপরামর্শ প্রদান করেন।

মনংসমীক্ষণ দ্বারা ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা বা অতৃপ্ত বাসনাকে প্রকাশ করে ব্যক্তির মনকে হালকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু অবদমিত ইচ্ছার উদ্ঘাটনেই চিকিৎসা

শেষ হয়ে যায় না। রোগীর ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান চিকিৎসার অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

মনঃসমীক্ষণকে যাঁরা প্রামাণ্য চিকিৎসা হিসেবে গ্রহণ করেন না তাঁরা অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির কার্যকারিতাও অস্বীকার করেন। আমাদের মানসিক সকল বিকার ও দ্বন্দ্বের মূলে অবদমন এবং নির্জ্ঞান মনের প্রভাব বর্তমান, এই সার্বিক নিয়মটি মানতে এঁরা প্রস্তুত নন। ফ্রয়েডের অনুগামী অ্যাডলার তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে নির্জ্ঞান মন ও অবদমনের প্রভাব স্বীকার করেন নি। তিনি সাক্ষাৎকার এবং প্রত্যক্ষভাবে আলাপ আলোচনার দ্বারা মানসিক দ্বন্দ্বের উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা এবং বাস্তবের অসামঞ্জস্যই অপপ্রতিযোজন এবং মানসিক রোগের কারণ।

মনঃসমীক্ষণ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও আমরা বলতে পারি অন্তর্দ্বন্দ্ব আবিষ্কার ও তার পুনরাগমন রোধ করার পরামর্শই ব্যক্তিকে মানসিক দিক থেকে সুস্থ করে তোলে না। এজন্য সুপরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। যে শিশু পাঠে ব্যর্থ হয়ে হীনমন্যতায় ভোগে—তার মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ এবং হীনমন্যতা নিবারণের পরামর্শই তাকে সুস্থ করে তুলবে না। শিশুদের পক্ষে তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ বা আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষক, অভিভাবক, চিকিৎসক শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত আচরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন। যে শিশু নিজ সামর্থ্যের অভাবে পাঠে ব্যর্থ হয়ে আত্মগ্লানিতে ভোগে, তাকে পঠন-পাঠন ছাড়া তার দক্ষতা অনুসারে অন্য কোন কাজে প্রবৃত্ত করে পারদর্শিতা অর্জন না করাতে পারলে, মানসিক দ্বন্দ্ব যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। [এখানে নির্জ্ঞান মন এবং মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি। এজন্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ অধ্যায়ে দুটো পৃথক অনুচ্ছেদে করা হল।]

(ঘ) **খেলাভিত্তিক চিকিৎসা** (Play Therapy) ঃ খেলা শিশুর স্বাভাবিক প্রাণশক্তির বিকাশ, শিশুর সক্রিয়তা, মানসিক স্ফূর্তি, স্বতস্ফূর্তভাবে খেলার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। খেলার মধ্যেই শিশুর আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, রাগ অভিমান, দুঃখবেদনা, পুঞ্জীভূত উত্তেজনা প্রকাশিত হয়, প্রশমিত হয়। শিশুমনের ভাববিরোধ, দ্বন্দ্ব সবই খেলার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এজন্য খেলার মাধ্যমে শিশুকে চিকিৎসা করার পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে।

ছোট ছোট শিশুর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা রোগ সম্বন্ধীয় সত্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। কারণ, এই অল্প বয়সে শিশুদের নিজের ভাব ব্যক্ত

করার কোন ক্ষমতা নেই, যথাযথ ভাষাজ্ঞান তারা অর্জন করতে পারে না। সুতরাং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব জানবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু এই অল্প বয়সেই শিশুদের মধ্যে নানা ধরনের অপপ্রতিযোজন দেখা দেয়। মনঃসমীক্ষকরা ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ জানবার জন্য **বিরেচনপদ্ধতি** (Catharsis) বা অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি প্রয়োগ করার কথা বলেন। কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। এজন্য মনশ্চিকিৎসকগণ অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশুকে নানা খেলার সুযোগ দেন এবং খেলার প্রকৃতি ও ধরন দেখে শিশুর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটির স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেন। শিশু ভাষার দ্বারা বা বয়স্কদের মতো বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না। খেলাই শিশুর স্বাভাবিক আত্ম-প্রকাশের মাধ্যম ; খেলার মাধ্যমেই শিশু তার জীবনের সমস্যা, তার রুদ্ধ, অবদমিত আবেগ ও মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করে।[1]

এ পদ্ধতি অনুসারে শিশুর আচরণে অপসঙ্গতি দেখা যায়, তাকে মনশ্চিকিৎসক চিকিৎসাগারের খেলাঘরে নিয়ে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী তার সামনে তুলে ধরেন। শিশু তার ইচ্ছানুসারে খেলতে শুরু করে। শিক্ষক অলক্ষ্যে থেকে শিশুর আচরণ অনুধাবন করেন। বয়স্কদের ভাষায় শিশু নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না—কিন্তু খেলার মাধ্যমে তার মনোভাব নানা প্রতীক (symbol or sign) অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়। একটি সত্য ঘটনার সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক : খেলাঘরে খেলারত একটি শিশুকে লক্ষ্য করে মনশ্চিকিৎসক দেখলেন, শিশুটি একটি মেয়ে পুতুলকে বার বার একটি বাঘের মূর্তির সামনে ঠেলে দিচ্ছে। শিশুটির এ অদ্ভুত আচরণ অনুসরণ করে চিকিৎসক জানতে পারলেন, শিশুটি তার মা কর্তৃক অবহেলিত। সুতরাং মেয়ে পুতুল তার মার প্রতীক। মার প্রতি সে ভীষণ বিরক্ত—সে প্রতিশোধ নিতে চায়। তাই সে মেয়ে পুতুলটিকে বার বার বাঘের মূর্তির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। খেলা-বিশ্লেষণ (Play Analysis) দ্বারা চিকিৎসক শিশুর রুদ্ধ অবদমিত অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারলেন।

উপরে যে খেলাভিত্তিক চিকিৎসার আলোচনা হল সে খেলা অনিয়ন্ত্রিত (un-controlled) কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকরা খেলাকে নিয়ন্ত্রিত (controlled)

1. "Play Therapy is based upon the fact that play is the child's natural medium of self expression. It is an opportunity which is given to the child to 'play out' his feelings and problems, just as in certain types of adult therapy, an individual 'talks out' his difficulties."

—W. M. Axline : Play Therapy.

করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। নিয়ন্ত্রিত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় চিকিৎসক খেলা পরিচালিত করেন এবং শিশুকে খেলার ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশ দান করেন।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খেলাভিত্তিক চিকিৎসার উপকারিতা ও উপযোগিতা অনেক। প্রথমতঃ, শিশুর খেলা বিশ্লেষণের দ্বারা মনশ্চিকিৎসক শিশুর মানসিক পরিস্থিতি বুঝতে পারেন। শিশুর চাহিদা কি, তার সমস্যা কোথায়, সে কি ধরনের মানসিক বিকারগ্রস্ত তা জানবার সুযোগ এতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, অভিব্যক্ত মানসিক অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় করে চিকিৎসক শিশুর চিকিৎসার আয়োজন করতে পারেন। তৃতীয়তঃ, শিশুর প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে খেলার সামগ্রী উপস্থিত করে শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে সহায়তা করতে পারেন। চতুর্থতঃ, শিশুর আচরণে অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখা গেলে তা দূরীকরণের জন্য নিয়ন্ত্রিত খেলার মাধ্যমে চিকিৎসক অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করতে পারেন।

৯। নির্জ্ঞান স্তর (The Unconscious) :

মনোবিজ্ঞানীরা মনের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) চেতন বা সংজ্ঞান (Conscious), (২) অবচেতন বা অন্তর্জ্ঞান (Sub conscious Pre-Conscious অথবা Fore-Conscious) এবং (৩) নির্জ্ঞান (Unconscious)। চেতন স্তর বলতে আমরা বুঝি যে বিষয় সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্টভাবে সচেতন, অর্থাৎ যে বিষয়টি আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে থাকে। সালি (*Sully*), স্টাউট (*Sotut*), এঞ্জেল (*Angell*) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের মতে চেতনার কেন্দ্রস্থলের পর থেকে শুরু করে চেতনার প্রান্তদেশ পর্যন্ত ক্ষেত্রই অবচেতন বা অন্তর্জ্ঞান। যে বিষয়টি আমাদের চেতনার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করেনা, অথচ যেটি চেতনার ক্ষেত্র বহির্ভুত নয় সেটি অবচেতন স্তরে রয়েছে বলতে হবে। অর্থাৎ, চেতনার কেন্দ্রস্থলকে ঘিরে রয়েছে যে অস্পষ্ট স্বল্প চেতনার প্রান্তদেশ, তাকেই অবচেতন স্তর বলা হয়।

সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীরা চেতনার আর একটি গভীরতর স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। চেতনার এই স্তর সম্পর্কে আমরা কি সুস্পষ্টভাবে, কি অস্পষ্টভাবে, কোন ভাবেই চেতন নই। এটা চেতনার বহির্ভূত স্তর ; একেই বলা হয় নির্জ্ঞান স্তর (Unconscious)। এই নির্জ্ঞান স্তর চেতনার ক্ষেত্র-বহির্ভুত কিন্তু মনোরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। নির্জ্ঞান স্তর সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, এটি এমন একটি চেতনার স্তর যা একদিন চেতনার ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ চেতনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গেছে, মন থেকে সরে যায় নি। সুযোগ মতো চেতনার অন্তরাল থেকে এ আবার চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছতে পারে।

মন এবং চেতনার ক্ষেত্র সমব্যাপক নয়। মনের চেতনার ক্ষেত্রকে অতিক্রম করেও এক গভীরতর স্তর আছে যেটি মনের নির্জ্ঞান স্তর। এই নির্জ্ঞান স্তর চেতনার স্তরবহির্ভূত, কিন্তু মনোরাজ্যের বহির্ভূত নয়। প্রশ্ন হল—এই নির্জ্ঞান স্তরের যে অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ কি? কি যুক্তির উপরে ভিত্তি করে এই নির্জ্ঞান স্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, নির্জ্ঞান স্তরে বিশ্বাস স্থাপন না করলে আমাদের অনেক মানসিক ঘটনার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। যাঁরা মনকে চেতনার ক্ষেত্রের সঙ্গে সমব্যাপক মনে করেন তাঁরাই মনের নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। কিন্তু মনোবিদ্‌রা নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। ফ্রয়েডের মতে শৈশবকালে ব্যক্তির অনেক অন্যায় কামনা স্বাভাবিক ও সমাজ-অনুমোদিত পথে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় না। শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতির ভয়ে এই সব অন্যায় কামনা অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে, কিন্তু স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হতে না পেরে বিকৃতরূপ নিয়ে বা ছদ্মবেশে সেগুলি প্রকাশিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, স্বপ্ন, মানসিক রোগ প্রভৃতির মাধ্যমে এগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে। মনঃসমীক্ষণের (Psycho-analysis) ফলে এগুলি জানা যায়। কাজেই ফ্রয়েডের মতে নির্জ্ঞান মন অবদমিত ইচ্ছার আশ্রয় স্থল। অনেক মনোবিদ্ মনে করেন যে, অবদমিত ইচ্ছার ব্যাখ্যা ছাড়াও স্বভাবী মনের মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্যও নির্জ্ঞান স্তরের সহায়তার প্রয়োজন হয়। আমরা এবার নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে প্রমাণগুলি উপস্থাপিত করা হয় সেগুলি আলোচনা করব:

মনের নির্জ্ঞান স্তর স্বীকার করে না নিলে অনেক মানসিক ঘটনার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না

নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (Proofs of the Existence of the Unconscious): (১) **দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তি:** ফ্রয়েডের মতে দৈনন্দিন জীবনের অনেক ভুল-ভ্রান্তি,—যেমন, নাম ভুলে যাওয়া, কথা বলার ভুল, লেখার ভুল প্রভৃতি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি কতকগুলি নিমন্ত্রিত ব্যক্তির তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখলেন যে, একটি পরিচিত ব্যক্তির নাম তিনি ভুলে গেছেন। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল যে, লোকটিকে আদৌ তাঁর পছন্দ নয়। আসল কারণ তাঁর নির্জ্ঞান মনে লুকিয়ে আছে।

(২) **স্বপ্ন:** নির্জ্ঞান মনের অবদমিত কামনা-বাসনা যখন চেতন বা সংজ্ঞান (Conscious) মনে বিকৃতভাবে প্রবেশ করে তখনই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে। কাজেই স্বপ্ন নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(৩) **দিবা-স্বপ্ন** (Day-dream) : অনেক সময় ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায়ও স্বপ্ন দেখে। অলীক কল্পনায় বিভোর হয়ে সে হাস্যকর আচরণ করে। নিজেকে বিরাট ধনী ব্যক্তি ভেবে কল্পিত কোন অধীনস্থ ব্যক্তিকে আঘাত করার চেষ্টা করে। এই রকম আচরণের ক্ষেত্রেও বর্তমান থাকে কোন অবদমিত ইচ্ছা যা নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় নিয়ে তার সংজ্ঞান মনের আচরণকে প্রভাবিত করে।

(৪) **সংবেশন ও সংবেশনোত্তর অভিভাবন** (Hypnotism and post-hypnotic suggestion) : সংবেশনে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত স্বপ্নাবস্থাও মনের নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আমাদের অতীত জীবনের অনেক ঘটনা আমরা অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারি না। কিন্তু সংবিষ্ট অবস্থায় আমরা সেসব স্মরণ করতে পারি। আবার সংবিষ্টকাল অতীত হয়ে গেলে, জাগ্রত অবস্থায় সে-সব ঘটনা আমরা বিস্মৃত হই। সুতরাং এই সব ঘটনার স্মৃতি মনের নির্জ্ঞান স্তরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, এইরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

আবার সংবিষ্ট অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে সংবেশনোত্তর কালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কার্য করার জন্য আদেশ করে দেখা গেছে যে, ব্যক্তি সংবেশনোত্তর কালে কার্যটি সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সংবেশকের আদেশের কথা তার মোটেই মনে নেই। এই ঘটনা নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(৫) **অনেক উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ যেমন—উদ্গতি, অভিক্রান্তি** (Displacement), **বিপরীত গঠন** (Reaction formation) **প্রভৃতি** নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন নারী সেবিকাব্রত গ্রহণ করেছে, কিন্তু আসল কারণ মাতৃত্বের কামনা নির্জ্ঞান মনে আত্মগোপন করে আছে। একে বলা হয় উদ্গতি। আবার কোন নারী হয়ত পশুপাখী পুষে খুব আনন্দ পান, আসল কারণ অবদমিত মাতৃত্বের কামনা। একে বলা হয় অভিক্রান্তি। কোন সৎ ব্যক্তির অন্যায় শাস্তি লাভ করে হঠাৎ বিরাট দুষ্কৃতকারীরূপে পরিণত হওয়া বিপরীত গঠনের উদাহরণ। এরূপ ক্ষেত্রে নির্জ্ঞান ইচ্ছা তার বিপরীত রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া প্রক্ষেপণ (Projection), যুক্ত্যাভাস (Rationalisation), ক্ষতিপূরণ (Compensation), অবাধ-কল্পনা (Fantasy), প্রত্যাবৃত্তি (Regression) প্রভৃতি ঘটনাও নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

(৬) **মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ** নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেমন, ভয়বায়ুগ্রস্ত (Fear mania) রোগী অকারণে ভীতিগ্রস্ত হয়। শৈশবের কোন অবদমিত অন্যায় কামনা নির্জ্ঞান মনে লুকিয়ে থেকে সংজ্ঞান

মনের আচরণকে প্রভাবিত করে। শুচি বায়ু (Touch mania), হিষ্টিরিয়া, বিষাদ বায়ু (Melancholia), চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (Dementia præcox) প্রভৃতি মানসিক ব্যাধিগুলির মূলেও কোন অবদমিত নির্জ্ঞান কামনা থাকে, যেগুলি নির্জ্ঞান মনে আত্মগোপন করে থাকে।

(৭) **আকস্মিক স্মৃতি:** অনেক সময় কোন একটি বিষয় আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমরা মনে আনতে পারি না। কিন্তু অন্য আর একটি বিষয় চিন্তা করার সময় সেই বিষয়টি হঠাৎ মনে জেগে ওঠে। নির্জ্ঞান মনের স্তর থেকেই সেই বিষয়টি চেতনার কেন্দ্রস্থলে এসে পৌঁছায়, এরূপ অনুমানই এ জাতীয় ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

(৮) **নিদ্রাকালে মনের ক্রিয়া:** ঘুমুতে যাওয়ার আগে যে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় নি, দেখা গেছে ঘুম ভাঙবার পর বিনা প্রচেষ্টায় তার সমাধান খুঁজে পাওয়া গেছে। মনের চেতনস্তর যখন এই সমস্যার সমাধান যোগায়নি তখন নির্জ্ঞান স্তরই সে সেই সমস্যার সমাধানটি যুগিয়ে দিয়েছে এরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

(৯) **অগোচর আবেগ:** অনেক সময় কোন লোকের প্রতি আমরা অকারণেই আকর্ষণ বোধ করি বা অকারণেই ঘৃণা বোধ করি বলে মনে হয়। কিন্তু এই আকর্ষণ বা ঘৃণা বিনা কারণেই মনে উৎপন্ন হয়েছে এরকম অনুমান যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ, মনের নির্জ্ঞান স্তরেই আবেগগুলি মনের অগোচরে জন্মলাভ করেছে, দিন দিন বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং সুযোগমত মনের চেতন স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে, এরূপ অনুমানই যুক্তিসংগত।

(১০) **কবি ও শিল্পীদের সৃষ্টি প্রেরণা:** যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও উৎসাহ কবি ও শিল্পীদের সৃষ্টিকার্যে উদ্বুদ্ধ করে, নির্জ্ঞান স্তরকেই সেই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও প্রেরণার উৎস বলে ধারণা করা হয়। কবি কোলরিজ (*Coleridge*) বলেছিলেন যে তাঁর বিখ্যাত কবিতা '*Kubla Khan*'-এর বেশীর ভাগ অংশই তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় রচিত, জাগ্রত অবস্থায় তিনি কেবল লিপিবদ্ধ করেছেন।

১০। শিক্ষা ও নির্জ্ঞান মন (Education and the Unconscious):

শিক্ষায় এই নির্জ্ঞান স্তরটির প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সার্থক শিক্ষার সঙ্গে নির্জ্ঞান মনের যথাযথ ব্যবহারের সম্পর্ক বর্তমান। তিরস্কার, ভৎর্সনার দ্বারা শিশুকে শিক্ষাপ্রদান করতে গেলে শিশু হয়ত শিক্ষকের প্রাধান্য মেনে নেয়, কিন্তু তার রাগ, অভিমান, বিরক্তি নির্জ্ঞান স্তরে সমবেত হয়ে নানা মানসিক বিকার ও

অপর্সঙ্গতির সৃষ্টি করে। শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী, চাহিদাকেন্দ্রিক করে তুলতে গেলে শিশুর আবেগকে শিক্ষায় স্থান দিতে হবে। অবহেলিত আবেগ অবদমিত হয়ে শিশু মনের নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় লাভ করে শিক্ষাগ্রহণের পরিপন্থী মনোভাব সৃষ্টি করে। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যান অনুসারে নির্জ্ঞান মন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ব্যক্তির আচরণের মূল নিয়ন্ত্রক এই নির্জ্ঞান মন। শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে রক্ষিত না হলে শিখনের অগ্রগতি অসম্ভব। কিন্তু শিক্ষার পরিপন্থী মনোভাব সৃষ্টি হলে নির্জ্ঞান স্তর সক্রিয় হয়ে বিস্মৃতি ঘটায়। যদি শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণে বিমুখ হয়, তবে তার মনে কোন ভয় সঞ্চার না করে, তাকে বিদ্রূপ বা অবহেলা না করে, তার মানসিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হয়। আর এ অনুধাবনের সময় নির্জ্ঞান মনের অবস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়েই মনশ্চিকিৎসক ও শিক্ষককে শিক্ষাপ্রদানের কথা চিন্তা করতে হয়। এক্ষণে শিক্ষা ও নির্জ্ঞান মনের সম্পর্ক নির্ণয়ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

আমাদের মনে নির্জ্ঞান স্তরের আবিষ্কার বোধকরি মনোবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এর স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আজও অন্তহীন গবেষণা চলছে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ণয়ে, মানুষের আচরণ সংব্যাখ্যানে, শিক্ষাপ্রদানে সর্বত্র আজ নির্জ্ঞান মনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া স্বীকৃত ব্যাপার।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে মন ও চেতনাকে আমরা সমার্থক এবং সমব্যাপক বলে জানতাম। চেতনার বাইরে মনের অস্তিত্ব ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। আমরা জানতাম আমাদের সকল আচরণ সচেতন মনপ্রসূত। আর চেতনার বাইবে যা দূরীভূত করা যায় তা মনের বাইরেও বিলীন হয়। আচরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দ্বারা মনেরও পরিবর্তন করা যায়। আমরা বিশ্বাস করে এসেছি, শিক্ষা বা পরিবেশের প্রভাবে মনকে ইচ্ছামত প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করা যায়। আর এ বিশ্বাসের উপর নিভর করেই আমরা মানসিক শৃঙ্খলা প্রবর্তন করতে চেয়েছি, শিক্ষার্থীর মনকে কেন্দ্র না করে সামাজিক অভিরুচি অনুযায়ী পাঠ্য-বোঝা শিক্ষার্থীর উপর আরোপ করেছি।

কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরের অবস্থিতি জানবার পর মনের পরিধি সম্বন্ধে আমাদেন জ্ঞান পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা এতদিন মানবাচরণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জন করেছিলাম, নির্জ্ঞান মনের আবিষ্কারে সে জ্ঞান অপর্যাপ্ত এবং অবৈজ্ঞানিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের আচরণে তার সচেতন মনের চাইতে নির্জ্ঞান মনের প্রভাব বেশি। আমরা আরও জেনেছি, সচেতন মনের বাইরে চলে গেলেই আমাদের কামনা, বাসনা ইত্যাদি মনের বাইরে উধাও হয়ে যায় না। আমাদের অতৃপ্ত চাহিদা, আমাদের

অপূর্ণ কামনা নির্জ্ঞান স্তরে আশ্রয় লাভ করে এবং নানাভাবে আমাদের সচেতন মনকে প্রভাবিত করে। নিন্দা, শাসন, ভৎর্সনার ভয়ে যেসব ইচ্ছা আমরা অবদমিত করি, সেগুলি আমাদের নির্জ্ঞান মনে উপস্থিত হয়ে নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। আর তারফলে আমাদের আচরণে, চিন্তায় নানা অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে।

মানবমনের এই অস্বাভাবিকতাকে কেন্দ্র করে আধুনিক অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের (Abnormal Psychology) জন্ম হয়েছে। আর এ অস্বাভাবিক আচরণ নির্জ্ঞান মনের উৎপীড়ন মাত্র।

যে ছেলে পাঠ বিস্মৃত হয়, দেখা যাবে হয়ত তার নির্জ্ঞান মনই তার স্মৃতিকে প্রতিহত করেছে। শাসনের ভয়ে হয়ত সে পড়াশোনা করছে, কিন্তু তার মানসিক চাহিদা হয়ত অতৃপ্ত। যে মিথ্যা কথা বলছে, তার হয়ত আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা স্বাভাবিক বিকাশ-পথ না পেয়ে অস্বাভাবিক পন্থায় আত্মম্ভরিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। যে ছেলে ক্লাস থেকে পালাচ্ছে, তার আনন্দমূলক আবেগ হয়ত বিদ্যালয়ে অতৃপ্ত, তাই সে তার কোন কৌতূহল বা চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে বিদ্যালয়ের বাইরে যাচ্ছে। কিন্তু এসবই অপসঙ্গতিশীল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ এবং ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের বিরোধী। কিন্তু এর কারণ তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এগুলি নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব-ঘটিত প্রভাব।

ব্যক্তির চরিত্রে এ ধরনের অপসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতার সঙ্গে পরিচয় আমাদের নতুন নয়। যে জিনিসটি নতুন সেটি হচ্ছে তার প্রতিকার ব্যবস্থা ও কারণ-নির্ধারণ প্রণালী। আগে আমরা শাসন, ভৎর্সনা অথবা প্রশংসা দ্বারা বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে অপসঙ্গতি দূর করতে চেয়েছি। আমরা এগুলির কারণ-নির্ধারণে ব্যক্তির সচেতন মনকে দায়ী করেছি। আমরা ব্যক্তির সঙ্গত আচরণকে তার সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ মনে করে তার প্রতিকার করতে চেয়েছি নানা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা। কিন্তু নির্জ্ঞান মনোবিজ্ঞান (Psychology of the Unconscious) দেখিয়েছে, অপসঙ্গতি ও অস্বাভাবিক আচরণ সচেতন মনের ক্রিয়া নয়, নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্বজনিত আচরণ। সুতরাং তার চিকিৎসা (therapy) মনোবিজ্ঞানসম্মত হওয়া দরকার। বাইরের নিন্দা, প্রশংসা, শাসন, ভয়, নীতি-উপদেশ ইত্যাদি কোন প্ররোচক দ্বারা তার কোন প্রতিকার করা যায় না। যতক্ষণ না নির্জ্ঞান মনের গভীর তলদেশে নিহিত অন্তর্দ্বন্দ্বটি বিদূরিত হচ্ছে, ততক্ষণ ব্যক্তি-চরিত্রের অস্বাভাবিকতা দূর হবে না সুতরাং শাসন, দমন না করে আজ আমরা সমস্যাগ্রস্ত শিশুকে চিকিৎসামূলক সুপরিচালনা দ্বারা (Child Guidance Clinic) মানসিক রোগমুক্ত করার চেষ্টা করে থাকি।

নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে জানবার পর শিক্ষাতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পরিবর্তন

এসেছে। পাঠ্যসূচী প্রণয়নে আমরা শিশুর চাহিদা, ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদির উপর নির্ভর করি। কারণ, আমরা জানি শিশুর আবেগ, চাহিদা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষায় অতৃপ্ত হলে অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞান স্তরে সমবেত হয় এবং নানা গূঢ়ৈষা(Complexes) ও আচরণ-সমস্যা (Problem-behaviour) সৃষ্টি করে।

শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে আজ আমরা যে মনস্তত্ত্বমূলক পদ্ধতি (psychological method), ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি (individualised method) গ্রহণ করে থাকি, নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব জানবার পর এ শিক্ষাপদ্ধতিগুলির অনেক পরিবর্তন ও প্রগতি সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ববিকাশ—কিন্তু ব্যক্তিত্ববিকাশ ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর নির্জ্ঞান মনের সঞ্চিত কামনা-বাসনার সঙ্গে বাস্তব জগতের সামাজিক অনুশাসনের সঙ্গতিবিধান ব্যক্তিত্বের প্রগতির লক্ষণ। কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরের অবদমিত অতৃপ্ত বাসনাপুঞ্জ যদি ব্যক্তির আচরণে অস্বাভাবিকতা, অপসঙ্গতি বা মনোবিকার সৃষ্টি করে তবে ব্যক্তিত্ববিকাশ প্রতিহত হবে। এজন্য শিক্ষক নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব ও প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষা-প্রদান করেন। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখবার জন্য আধুনিক শিক্ষক মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের (Mental Hygiene) সাহায্য গ্রহণ করেন। এক কথায় শিক্ষার সঙ্গে নির্জ্ঞান মন আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

১১। মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) :

(ক) **ফ্রয়েডের মত (Freud's Theory) :** 'মনঃসমীক্ষণ' পদটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, 'মনাসমীক্ষণ' বলতে মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্য ফ্রয়েড যে বিশেষ পদ্ধতি (Technical Method) আবিষ্কার করেছেন তাকে বোঝায় : আর দ্বিতীয়তঃ, মনঃসমীক্ষণ বলতে মনের গঠন ও স্বরূপ সম্পর্কে ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক মতবাদকে (theory) বোঝায়।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীরা মনের সচেতন প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ ও তার স্বরূপ নির্ণয় এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণের মধ্যেই মনোবিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামী মনোবিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম মনের নির্জ্ঞান স্তরের কথা বিশ্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে চেতন মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ধারণের মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় না। মনের গভীরে রয়েছে নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব ; মানুষের অবদমিত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনাগুলি একে আশ্রয় করে থাকে এবং নির্জ্ঞানস্তরের স্বরূপ নির্ধারণ না

করি, সহপাঠ্যসূচীর যথাযথ ব্যবস্থা থাকলে ছাত্রদের তারুণ্য-শক্তি বিপথগামী না হয়ে নানা গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হবে এবং চারিত্রিক শক্তিও দৃঢ় হবে।

১৪। আচরণমূলক সমস্যা (Behaviour Problem) :

শিক্ষার্থীর আচরণমূলক সমস্যা অপসঙ্গতির একটি দিকমাত্র। তবে অপসঙ্গতি যে ভাবে ব্যক্তিচরিত্রের একটি স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, আচরণমূলক সমস্যা শিশুর জীবনে সেভাবে স্থায়ী রূপ না নিয়ে ক্ষণস্থায়ী হয়। যখন এ সমস্যা স্থায়ী রূপ নেয়, তখন বুঝতে হবে, এর কারণ অতি ব্যাপক এবং ইহা অপসঙ্গতির নামান্তর। আচরণমূলক সমস্যা বলতে আমরা শিক্ষার্থীর সাধারণ, ক্ষণস্থায়ী অশোভন, শিক্ষা-গ্রহণ-প্রতিকূল, অবাধ্য আচরণগুলিই বুঝি।

শিশুর স্বাভাবিক জীবনবিকাশের এবং শিক্ষাগ্রহণের সহায়করূপে আমরা কতকগুলি সুশোভন সামাজিক আচরণের প্রবর্তন উচিত বলে মনে করি। শিক্ষকের বাধ্য হওয়া, সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান অনুসারে (social and cultural norms) অভিপ্রেত আচরণ করা প্রতিটি শিক্ষার্থীর উচিত। কিন্তু শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি এ সব আচরণের অভাব আমরা লক্ষ্য করি এবং শিক্ষার্থীকে যদি এগুলির বিপরীত আচরণ করতে দেখি অর্থাৎ শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের অবাধ্য, কলহপ্রিয় এবং অভদ্র আচরণের অভ্যস্থ হয়, তবে সে শিক্ষার্থী সমস্যাগ্রস্ত।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি শিশুর আচরণমূলক সমস্যা অতি সাধারণ (trivial) ক্ষেত্রেও দেখা দিতে পারে, যেমন—হাতের আঙুল চোষা, ভীরুতা, আক্রমণ-ধর্মিতা প্রভৃতি আচরণ। মোট কথা শিক্ষাগ্রহণের প্রতিকূল সকল আচরণই সমস্যামূলক। এ ধরনের আচরণকারী শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে গণ্ডগোল করে, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষার্থীর নানাভাবে বিরক্তি উৎপাদন করে, নিজেও লেখাপড়া বিশেষ পছন্দ করে না। প্রতি বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের পরিচিতি ঘটে এবং তাকে এজন্য বিব্রত হতে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ-ধরনের আচরণমূলক সমস্যার কারণ কি? বলা বাহুল্য যে আচরণমূলক সমস্যা যদি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাঁড়ায় তবে তা অপসঙ্গতির maladjusted) নামান্তর এবং অপসঙ্গতির কারণগুলিই তা ব্যাখ্যা করতে পারে। থানে আমরা কয়েকটি সাধারণ কারণ উল্লেখ করছি : প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর পারিবারিক, ামাজিক পরিবেশের মধ্যে এর কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। শিশু যে পরিবারে ন্ম নিয়েছে সে পরিবারের পরিজনের আচার-আচরণ তার উপর প্রতিফলিত হয়। ার সামাজিক আচরণ পরোক্ষভাবে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে যে সঙ্গী-

সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের প্রভাবও তার উপর কম নয়। সুতরাং এসব যে কোন একটি ক্ষেত্র থেকে শিশু সমস্যামূলক আচরণ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, অনেকক্ষেত্রে শিশুর প্রক্ষোভজনিত বা দৈহিক কোন ক্রটির জন্যও শিশু অসংযত এবং অশোভন আচরণে অভ্যস্ত হতে পারে। আচরণমূলক সমস্যার যে কারণই হউক না কেন, এসবের আচরণের উপস্থিতি শ্রেণীকক্ষে সার্থক শিক্ষাদান ব্যাহত করে।

এ সবের আচরণের প্রতিকার কি? সুষ্ঠু এবং অভিপ্রেত আচরণ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকের একান্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। শিশুর পরিবার শিশুকে যদি অভিপ্রেত আচরণে অভ্যস্ত না করায় তবে সমস্যাগ্রস্ত আচরণ নিয়ে শিশু বড় হবে এবং সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। পরিবারের সহায়তার পর বিদ্যালয়ে সমস্যামূলক আচরণ দূর করার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন ও নানা কর্মানুষ্ঠানের পরিকল্পনা থাকা উচিত। নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আচরণের সুযোগ এদের দিতে হবে এবং যেহেতু শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক পরিবেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু বিদ্যালয়কেই আদর্শ সমাজের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য এ কার্যসম্পাদনে শিক্ষককে বিশেষ পারদর্শী হতে হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয়। তাছাড়া অনেকে বিদ্যালয়ে শিশুপরিচালন-আগার (Child-guidance Clinics) গড়ে তোলার প্রস্তাব করেন। এসব কেন্দ্রে সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের আচরণের কারণগুলি অনুসন্ধান করে প্রতিকারের পন্থা উদ্ভাবন করা হয়। এসব কেন্দ্রে সাধারণতঃ মানসিকরোগের চিকিৎসক (Psychiatrist) থাকেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে বিশেষ শিখন প্রাপ্ত কর্মিগণ সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের আচরণ বিশ্লেষণ করেন। তারপর বিদ্যালয়ে এ ধরনের শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা করেন বা এদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ বিদ্যালয়ে (Special School for Problem Children) এদের প্রেরণ করেন।

পরিমাপের ব্যাখ্যা

(Interpretation of Assessment)

১। পরিসংখ্যান বলতে কি বোঝায়? (What is Statistics) ?

সংখ্যা বা সংখ্যাত্মক শব্দের (Numerical Terms) সাহায্যে কোন বিষয়ের আলোচনা সাধারণ মানুষের কাছে অতি সহজেই বোধগম্য হয়। যে বিজ্ঞান, সংখ্যাগতভাবে ঘটনা সংগ্রহ করে, তাকে তুলনামূলকভাবে সজ্জিত এবং সুসংবদ্ধ করে, বিশেষ বিশেষ ভাবে তাকে উপস্থাপিত করে (presentation) ও সেগুলির বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে (analysis and interpretation) তাকে রাশিবিজ্ঞান (Statistics) বলে। তুলনামূলকভাবে সজ্জিত কতকগুলি রাশিতথ্য বোঝাবার জন্য 'পরিসংখ্যান' কথাটি ব্যবহার করা হয়। যদিও '*Statistics*' এই ইংরেজী প্রতিশব্দটি রাশিবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়, তবু রাশিবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান সমার্থক শব্দ নয়। পরিসংখ্যানের পরিমাণগত তথ্যের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা হল রাশিবিজ্ঞানের কাজ।

পরিসংখ্যানের প্রথম কাজ হল সংখ্যাগতভাবে তথ্য সংগ্রহ অর্থাৎ ঘটনা বা তথ্য সংগ্রহ করে তাকে সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা। নানাভাবে এই তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিবরণী, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বিবরণী, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তরাদি, ব্যক্তিগত গবেষণার ফলাফল বা গবেষণাগারের প্রকাশিত ফলাফল প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য বা উপাত্ত (data) সংগ্রহ করা সম্ভব। এলোমেলোভাবে সংগৃহীত তথ্য যদি সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ হয়ে নির্দিষ্ট আকারে প্রকাশিত না হয় তাহলে সংগৃহীত তথ্য সাধারণের কাছে বোধগম্য হয় না। সে কারণে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত ও ছকবিন্যস্ত করে (classification and tabulation), নির্দিষ্ট আকারে উপস্থাপিত করা হয় ও লেখচিত্রে (graphs) প্রকাশ করা হয়। তারপর সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়।

তথ্য সংগ্রহের কাজটি যাতে বিশুদ্ধ বা নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হয়, তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কতকগুলি প্রয়োজনীয় পন্থা অবলম্বন করলে এই সংগ্রহণ কার্য নির্ভুল হতে পারে। প্রথমতঃ, যে বিষয়-সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হবে, সেই বিষয়-সংক্রান্ত বিবরণীগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি সংগ্রহ করতে হবে তা প্রথমেই

স্থির করে নিতে হবে। যেমন, ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার সময় ছাত্র-সংখ্যা, ছাত্রদের পারিবারিক অবস্থা ও আর্থিক অবস্থা, ছাত্রদের বয়স, ছাত্রদের ব্যবহৃত খাদ্যের পরিমাণ ও গুণাগুণ, ছাত্রদের বাসগৃহের অবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ বিবরণগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি সংগ্রহ করতে হবে তা প্রথমেই স্থির করে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, যে এককে (unit) সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করতে হবে তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। যেমন, দৈর্ঘ্য গণনার সময় মিটার, সেন্টিমিটার প্রভৃতির একটিকে একক নেওয়া হয়। তৃতীয়তঃ, তথ্য সংগ্রহের জন্য কখনও সমগ্র অংশের কখনও বা সীমিত অংশের নমুনার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। যেমন, আদমসুমারীর জন্য সমগ্র জনসংখ্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হলে প্রতি শ্রেণী থেকে নমুনা হিসেবে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার ছাত্র নির্বাচন করে নিয়েও ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। সর্বশেষে ভ্রান্তিশূন্যতা বা নির্ভুলতার মাত্রার (degree of accuracy) প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

২। মনোবিজ্ঞানে পারিসাংখ্যিক-পদ্ধতি (Statistical method in Psychology) :

অধুনা পারিসাংখ্যিক-পদ্ধতি বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কারণ, এঁদের মতে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিসংখ্যানের একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিজ্ঞানীরা এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির তুলনামূলক বিচার করেন। এই তুলনামূলক বিচারের সময় একপ্রকার পরিমাপের সাহায্য নিতে হয়। যেমন, আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অনেক বস্তুর মাপ করি—কোন্ জিনিস বেশি ভারী, কোন্‌টি কম, কোন্ বস্তুর বেশী দৈর্ঘ্য, কোন্‌টির কম ইত্যাদি। আবার কার্য-কলাপের মাপও করা যায়—যেমন, খেলাধূলায় কে কার চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত লাফাতে পারে, কে কতদূর সাঁতরাতে পারে ইত্যাদি। এমনিভাবে মানুষের অন্যান্য গুণাবলীর পরিমাপ আমরা করে থাকি। এই পরিমাপের জন্য আমাদের নানারকম যন্ত্রের প্রয়োজন হয়—যেমন, দৈর্ঘ্য মাপার ফিতা, ওজন নেবার যন্ত্র, উচ্চতা মাপার যন্ত্র ইত্যাদি।

মনোবিজ্ঞানে যে পরিমাপের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার নাম Psychometry. *Metry* অর্থে মাপ বোঝায়। অতএব Psychometry-র অর্থ হল মনোবিজ্ঞানের পরিমাপ যা মানুষের চরিত্র, বুদ্ধি ও অন্যান্য গুণাবলীর পরিমাপ করে।

৩। পরিসংখ্যানের আলোচনায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ (Some Terms used in Statistics) :

(১) সারিবিন্যাস (Ranking) : প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বিভিন্ন বস্তুর পরিমাপ করে থাকি। পরিমাপ করতে গিয়ে পরিমাপের বস্তুগুলিকে যখন তার

বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সারিবদ্ধ করে সাজাই তখন তাকে বলা হয় সারিবিন্যাস। যেমন, কতকগুলি লোককে তাদের ওজন অনুযায়ী সারিবিন্যাস করার অর্থ হল, সেই ওজন যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে, তাকে সর্বপ্রথমে রাখা। তারপর তার থেকে কম পরিমাণ ওজন যার, তাকে রাখা। এইভাবে সব শেষে সেই লোকটিকে রাখা যার ওজন সবচেয়ে কম। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বেশি থেকে কম ওজন বা কম থেকে বেশি ওজনের লোককে পরপর সাজিয়ে যাওয়া। এই সারিবিন্যাসের সুবিধা হল এতে ব্যক্তির নিজস্ব স্থান ও অন্যান্যদের তুলনায় তার অবস্থানের ধারণা সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু সারিবিন্যাস থেকে ব্যক্তির প্রকৃত পরিমাপ জানা যায় না—আমরা জানতে পারি না কোন ব্যক্তির প্রকৃত ওজন কত।

(২) **স্কোর** (Score): বিশেষ সংখ্যার সাহায্যে আমরা ব্যক্তির পরিমাপ প্রকাশ করি, একে *Score* বলা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির পরীক্ষার ফলাফল 25, 30, 35, 60, 70 প্রভৃতি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করি। কোন ব্যক্তির উচ্চতা পরিমাপ করতে গিয়ে ব্যক্তির স্কোর গজ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে বা ওজনের পরিমাপ করতে গিয়ে গ্রাম, কিলোগ্রাম প্রভৃতি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি।

(৩) **চল** (Variable): যে মান (value) পরিবর্তনশীল, তাকেই চল বলে। চলকেই স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তির যেসব বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল তাকেই স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেসব বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনশীল অর্থাৎ সকলের ক্ষেত্রে একরূপ সেগুলিকে স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা চলে না।

ধরা যাক তিরিশ জন লোকের একটি দল। এই দলের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে গুণের দিক থেকে নানারকম প্রভেদ দেখা যায়। কোন লোকের বুদ্ধির মান উঁচু, কারও বা নীচু, কেউ বেশি চালাক, কেউ কম চালাক, কাজেই এই সব গুণ হল চল (Variable)। চল দুপ্রকার হতে পারে—পরিমাণগত (quantitative) ও গুণগত (qualitative)। ওজন, উচ্চতা হল পরিমাণগত চল; বুদ্ধি, চাতুর্য হল গুণগত চল। এগুলিকে স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা চলে। কিন্তু ব্যক্তির দেহের বিভিন্ন অংশের কোন স্কোরের কথা বলা চলে না, যেহেতু এগুলি অপরিবর্তনশীল (constant) এবং সকলের ক্ষেত্রে এক।

(৪) **স্কেল** (Scale): স্কেল হল একটি পরিমাপক। ব্যক্তির স্কোরগুলি যখন সমান ইউনিটের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং সেগুলিকে যখন পাশাপাশি সাজানো হয়, তখন তাকে স্কেল বলা হয়। 10, 20, 30, 40 প্রভৃতি হল সমান একক, যেহেতু এদের দূরত্ব হল 10. অনুরূপভাবে 2, 4, 6, 8, 10 ইত্যাদি সমান একক, (unit) যেহেতু এগুলিও সমদূরত্বসম্পন্ন সংখ্যা। এদের দূরত্ব হল 2। যে কোন স্কেলে এরূপ সমদূরত্ববিশিষ্ট সংখ্যা পাশাপাশি থাকে।

(৫) **সারি** (Series) : একই ধরনের উপাত্ত বা তথ্য সমষ্টিকে পরপর সাজানো হলে তাকে বলে সারি। 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 এই স্কোরগুলি হল একটি সারি। এই সারি দুরকমের হতে পারে—অবিচ্ছিন্ন (Continuous) এবং বিচ্ছিন্ন (Discrete) সারি। পর পর সারি করে সাজান যে বস্তু তার মাঝখানে যদি কোনও ছেদ না থাকে তাকে অবিচ্ছিন্ন সারি (*Continuous series*) এবং যে সারি পরপর সাজান অথচ ছেদযুক্ত তাকে বিচ্ছিন্ন সারি (*Discrete series*) বলা হয়, যেমন— 1, 5, 9, 11, 13.

অবিচ্ছিন্ন সারির-এর উদাহরণস্বরূপ দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নিতে পারি। যেমন, গজ থেকে ফুট এবং তার থেকে ইঞ্চি ধাপে ধাপে নেমে এসেছে, তার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। মনোবিজ্ঞানের পরিসংখ্যানে অবিচ্ছিন্ন সারির-এরই প্রয়োজন। কেননা, মানসিক কার্যকলাপগুলিকে পর পর ধারাবাহিক ভাবে সাজানো যায়।

এখন অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের অর্থ কি তা নিরূপণ করে দেখা যাক। এখানে স্কোরকে সম্পর্কশূন্য বিচ্ছিন্ন মান মনে করলে ভুল করা হবে। দুটি সীমার মধ্যে এই স্কোরের অবস্থিতি। অবিচ্ছিন্ন সারির ধারাটিকে আমরা একটা সরলরেখা ভেবে নিই। এতে এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর দূরত্বকে স্কোর ধরে নিই। যেমন, কোন পরীক্ষার স্কোর বলতে আমাদের বুঝে নিতে হবে এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর মধ্যে কত ব্যবধান। যদি কোন ব্যক্তির স্কোর 125 হয় তাহলে ধরতে হবে তার স্কোর 124·5 থেকে 125·5 পর্যন্ত যে দূরত্ব ঠিক তার মধ্যবিন্দু।
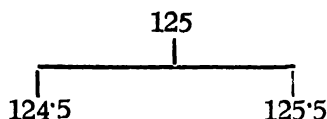
এখানে 124·5 থেকে 125·4 পর্যন্ত যতগুলি স্কোর আছে সবগুলিকেই 125 স্কোর বলে ধরা হয়। তাই 125 স্কোর-এর সবচেয়ে নীচের স্কোর হচ্ছে 124·5, যাকে নিম্ন সীমা বা *lower limit* বলা হয়। আর সবচেয়ে উপরের স্কোর হচ্ছে 125·5 যাকে উচ্চ-সীমা বা *upper limit* বলা হয়।

৪। পৌনঃপুন্য-বিভাজন (Frequency Distribution) :

পরিসংখ্যানের জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সুবিন্যস্ত এবং তার তাৎপর্য নিরূপণ করার জন্য যেসব পদ্ধতি সহায়ক, পৌনঃপুন্য বিভাজন তার মধ্যে অন্যতম।

পরিসংখ্যানের জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলি অসজ্জিত বা শ্রেণীবিহীনভাবে (unclassified or ungrouped) অথবা, সজ্জিত বা শ্রেণীবদ্ধভাবে (grouped or arranged) পরিসংখ্যায়কদের কাছে আসতে পারে। প্রথমে আমরা অসজ্জিত বা

শ্রেণীবিহীন তথ্য, যাকে কাঁচা তথ্য (raw data) বলা হয়, তাকে কি ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

কোন শ্রেণীর 50 জন ছাত্র ইতিহাসের পরীক্ষায় 100 নম্বরের মধ্যে যে নম্বর পেয়েছে তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল :

No 1 Table · Raw Data

75	71	41	51	56	62	67	69	61	73
37	46	58	77	71	48	61	83	70	69
63	38	48	77	60	62	55	57	78	74
87	68	66	32	46	62	52	60	63	68
65	56	74	35	43	81	62	54	63	64

১নং ছকের তালিকাটিতে তথ্যগুলি এলোমেলো বা অবিন্যস্তরূপে লেখা হয়েছে। এই তালিকা দেখে চট্ করে বলা সম্ভব হবে না সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন নম্বর কত। সবচেয়ে বেশী কতজন একই নম্বর পেয়েছে, 60-এর উপর বা 45-এর কম নম্বর কতজন পেয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু এই নম্বরগুলোকে তাদের মানের ঊর্ধ্বক্রমে বা অধঃক্রমে সাজালে তালিকাটি নিম্নোক্তরূপ হবে :

No. 2. Table : Arrayed Data

87	77	71	68	64	62	60	56	48	41
83	75	71	68	63	62	60	55	48	38
81	74	70	67	63	62	58	54	46	37
78	74	69	66	63	62	52	57	46	35
77	73	69	65	62	61	51	56	43	32

উপরের ছকের তথ্যগুলো (নম্বরগুলো) তাদের মানের ঊর্ধ্বক্রম থেকে নিম্নক্রমে সাজানো হয়েছে। এখন চট্ করে দেখেই বলা সম্ভব হবে যে সর্বোচ্চ নম্বর হল 87 এবং সর্বনিম্ন নম্বর হল 32. অনেকের মতে নম্বরগুলির মানের প্রসার (Range) = 87 − 32 = 55. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 87·5 হইতে 31·6 বাদ দেওয়া উচিত। তাহলে প্রসার দাঁড়ায় 56. অতএব প্রসার নির্ণয়ের সময় উচ্চতম সাফল্যাঙ্ক—নিম্নতম সাফল্যাঙ্ক + ১ (·৫ উর্দ্ধসীমা + ·৫ নিম্নসীমার জন্য)।

এক নম্বর ছকের (Table) তুলনায় দুনম্বর ছক যে অধিক মূল্যবান ও কার্যকর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এভাবে সজ্জিত বা ক্রমবিন্যস্ত ছক তৈরী করা সময়সাপেক্ষ, তাছাড়া এর বিস্তৃতিও কম নয়। এই কারণেই পৌনঃপুন্য বিভাজক-ছক (Frequency Distribution Table) প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

সংগৃহীত তথ্যগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে, উচ্চতম বিভাগ এবং নিম্নতম বিভাগ সীমার মধ্যবর্তী অংশকে প্রয়োজনমত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে, প্রত্যেক সীমার অন্তর্গত পৌনঃপুন্য (frequency) নির্ণয় করে যে ছক তৈরী করা হয় তাকেই পৌনঃপুন্য-বিভাজক ছক বলে। ৩নং ছকটি দেখে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক :

No. 3. Table : Frequency Distribution

(Class-interval)	F (Frequency)
85—89	1
80—84	2
75—79	4
70—74	6
65—69	7
60 – 64	12
55—59	5
50 – 54	3
45—49	4
40—44	2
35—39	3
30—34	1
Total—	50

উপরের ছকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এখানে বারটি বিভাগ রয়েছে। প্রথম বিভাগ 85—89, দ্বিতীয় বিভাগ 80—84, শেষ বিভাগ 30—34, প্রতিটি বিভাগের পাশে ঐ বিভাগের পৌনঃপুন্য দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ সাফল্যাঙ্ক বা score কতবার আবির্ভূত হয়েছে। যেমন, প্রথম বিভাগে 85—89-এর মধ্যে 87 এই একটি সংখ্যা একবার মাত্র আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং, এই বিভাগের পৌনঃপুন্য বা frequency হল 1; দ্বিতীয় বিভাগে 80—84-এর মধ্যে 83 এবং 81 এই দুটি সংখ্যা প্রত্যেকে একবার করে আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং, এর পৌনঃপুন্য হল 2, অনুরূপভাবে 60—64-এর মধ্যে 60 সংখ্যাটি 2 বার, 61 সংখ্যাটি 2 বার, 62 সংখ্যাটি 4 বার, 63 সংখ্যাটি 3 বার ও 64 সংখ্যাটি 1 বার অর্থাৎ, (2+2+4+3+1=12) বার আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং, এই বিভাগের পৌনঃপুন্য হল 12।

প্রশ্ন হল, ছকটিতে শ্রেণীব্যবধান (class-interval) বা বারটি শ্রেণীবিভাগ করা হল কেন? বিভাগ করার নিয়ম কি? এই নিয়ম হল সর্বোচ্চ স্কোর থেকে সর্বনিম্ন

স্কোরের প্রসার (range) কত দেখতে হবে। উপরের ছকে সাধারণভাবে সেই range হল 87 − 32 = 55। তারপর বিভাগের সংখ্যা ও আয়তন নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণতঃ 3, 5, 10 একক নিয়ে বিভাগের বিস্তার বা আয়তন নিরূপণ করা হয় এবং 5 থেকে 15টি বিভাগে নম্বরগুলিকে সাজান হয়। প্রসারকে বিভাগের আয়তন দিয়ে ভাগ করলে class-interval বা বিভাগের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। পূর্বপৃষ্ঠার ছকে প্রসার হল 55 ও interval হল 5. অতএব আমরা 11টি শ্রেণী পাচ্ছি। যখন লেখ বা গ্রাফে প্রকাশ করব তখন এক (1) যোগ দিয়ে বারটি করতে হবে। সে কারণে পূর্বপৃষ্ঠার ছকে বারটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীবিভাগ নিরূপণ করার সূত্র হল :

$$\text{Total number of class-intervals} = \frac{\text{Range}}{\text{Length of class-interval}} + 1$$

অর্থাৎ,

$$\text{শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা} = \frac{\text{প্রসার}}{\text{শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা বিস্তার}} + 1$$

তাহলে পূর্বোক্ত ছকে শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা হবে $\frac{55}{5} + 1 = 12$টি। পৌনঃপুনিকতা বিভাজন ছক তৈরী করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে। 2নং ছক থেকেই বিভাজন করা সুবিধাজনক, তবে 1নং অর্থাৎ কাঁচা তথ্যের (Raw Data) ছকের সাহায্যেও বিভাজন করা যায়।

(১) প্রথমে স্কোরগুলির প্রসার (range) বার করে নিতে হবে। সর্বোচ্চ স্কোর থেকে সর্বনিম্ন স্কোরের ব্যবধান বার করলেই প্রসার পাওয়া যাবে।

(২) এবার শ্রেণীবিভাগের (class-interval) সংখ্যা ও আয়তন নিরূপণ করতে হবে। শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা কত হবে তার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সাধারণতঃ আমরা বলতে পারি যে এই সংখ্যা 10-এর কম এবং 20-র বেশি হবে না। কিন্তু যেখানে স্কোরের সংখ্যা খুবই কম বা খুবই বেশি সেখানে এ নিয়ম খাটবে না। তবে শ্রেণীবিভাগের মোট সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে শ্রেণীবিভাগের বিস্তার দিয়ে প্রসারকে ভাগ করে 1 যোগ করে দিতে হবে।

$$\text{Total No. of class-interval} = \frac{\text{Range}}{\text{Length of class-interval}} + 1$$

শ্রেণী বিভাগের বিস্তার বা আয়তন 3, 5, 10 একক নিয়ে সাধারণতঃ করা হয়। যেমন 3 নং ছকের শ্রেণীবিভাগগুলির আয়তন হল 5.

(৩) এবার স্কোরগুলিকে তাদের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে নিতে হবে।

(৪) এখন নীচের 4নং ছকের মতো শ্রেণীবদ্ধ করে প্রতিটি স্কোরের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগে মিল (Tally) করার জন্য একটি করে দেরা দিতে হবে। কোন বিভাগের ঘরে 5টির অধিক সংখ্যা থাকলে প্রত্যেক 5টির জন্য 4নং ছক অনুযায়ী 4টি দেরা এবং ঐ চারটি রেখাকে কেটে 1টি কোণাকুণি রেখা টানতে হবে। এতে সহজে গণনা করা যেতে পারে। এবার নীচের ছকটি লক্ষ্য করা যাক :

No. 4. Table : Tallies

Class-interval	Mid Points	Tallies	Frequency (f)
85 - 89	87	/	1
80—84	82	//	2
75—79	77	////	4
70—74	72	~~////~~ /	6
65—69	67	~~////~~ //	7
60 —64	62	~~////~~ //// //	12
55 — 59	57	~~////~~	5
50 54	52	///	3
45 -- 49	47	////	4
40—44	42	//	2
35 39	37	///	3
30—34	32	/	1
		50	50

উপরের ছকটিতে চারটি স্তম্ভ আছে। বামদিক থেকে ধরলে প্রথমটি হল শ্রেণীবিভাগ বা class-interval-এর স্তম্ভ। এতে মোট বারটি শ্রেণীবিভাগ আছে। সর্বনিম্ন স্কোর-এর শ্রেণীবিভাগ সবচেয়ে নীচে এবং ধাপে ধাপে 12টি শ্রেণীবিভাগ উপরের দিকে উঠে গেছে। শ্রেণীর বিস্তার হল 5' সর্বোচ্চ স্কোর এবং সর্বনিম্ন স্কোরের অন্তর হল $(87-32)=55\div5+1=12$টি class-interval.

দ্বিতীয় স্তম্ভ হল মধ্যবিন্দু (Mid-point)। কোন বিভাগের আপাত বা প্রকৃত সীমাদ্বয়ের গাণিতিক গড়কে বিভাগটির মধ্যবিন্দু বলে।

মধ্যবিন্দু নিরূপণ করার সূত্র হল—

Mid-point of the class-interval = lower limit of the class-interval + $\frac{\text{upper limit of the class interval} - \text{lower limit of the class interval}}{2}$

অথবা, একে এভাবেও লেখা যেতে পারে

$$X = L + \frac{U - L}{2}$$

মধ্যবিন্দু = বিভাগের নিম্নতম সীমা

$$+ \frac{\text{বিভাগের উচ্চতর সীমা} - \text{বিভাগের নিম্নতর সীমা}}{2}$$

যেমন, 80—84 শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু হবে—

$$= 79{\cdot}5 + \frac{84{\cdot}5 - 79{\cdot}5}{2}$$

$$= 79{\cdot}5 + \tfrac{5}{2} = 79{\cdot}5 + 2{\cdot}5 = 82$$

তৃতীয় স্তম্ভে শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যখনই একটি স্কোর দেখা গেল তখনই Tally বা ঢেরা দেওয়া হল। যেমন, 30—34 class-interval-এ 30, 31, 32, 33, 34-এর মধ্যে 32 এই স্কোরটি একবার পাওয়া গেছে। সে কারণে একটি ঢেরা দেওয়া হয়েছে। সব ঢেরা পড়বার পর দেখা যাবে ঢেরার সংখ্যা ও সংখ্যাগুলির সংঘটনের সংখ্যাও এক হবে। উপরিউক্ত ছকে উভয় ক্ষেত্রে সংখ্যা হল 50.

চতুর্থ স্তম্ভে একটি স্কোর কতবার আবির্ভূত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

পৌনঃপুন্য-বিভাজনে শ্রেণীবিভাগের উচ্চ ও নিম্ন সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে তিনটি নিয়ম প্রচলিত আছে। পরপৃষ্ঠায় I, II এবং III এই তিন প্রকারে সাজিয়ে দেখান হয়েছে :

No. 5 Table

I		II		III	
Calss-Interval	Frequency	Class-Interval	Frequency	Class-Interval	Frequency
30—35	1	29·5—34·5	1	30—34	1
25—30	2	24·5—29·5	2	25—29	2
20—25	5	19·5—24·5	5	20—24	5
15—20	4	14·5—19·5	4	15—19	4
10—15	6	9·5—14·5	6	10—14	6
5—10	2	4·5—9·5	2	5—9	2

উপরের ছকে 20টি ছাত্রের ইতিহাসের নম্বর পরিসংখ্যা-বিভাজনে তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাজান হয়েছে।

প্রথম (I) পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগের বিস্তৃতি বা আয়তন নেওয়া হয়েছে 5; কিন্তু কোন শ্রেণীবিভাগেই উচ্চতম সীমার পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ 5—10 এই শ্রেণীবিভাগে 5 থেকে 10 বাদে 9 পর্যন্ত সব সাফল্যাঙ্ককে নেওয়া হয়েছে। 10-কে পরবর্তী শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় (II) পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগের স্কোরগুলির সীমাগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পদ্ধতির তুলনায় এটি বেশি স্পষ্ট। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি 5, 4·5 থেকে 5·5 পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং 5 থেকে 10 না লিখে 5-এর নিম্ন সীমা 4·5 এবং 10-এর নিম্ন সীমা 9·5 উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয় (III) পদ্ধতিও প্রথম পদ্ধতির তুলনায় স্পষ্ট। তথ্যগুলিকে দ্রুত এবং যথাযথভাবে সাজানোর পক্ষে এই পদ্ধতিই কার্যকর। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে শুদ্ধভাবে দ্রুত ঢেরা চিহ্ন দেওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা শেষোক্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করেছি।

ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য ছক (Cumulative Frequency Table): ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য ছক বলতে কি বোঝায় তা নীচের ছক থেকে বোঝা যাবে। যে প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে 4নং ছক তৈরী করা হয়েছে, সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই নীচের ছকটি তৈরী করা হল।

No. 6 Table : Cumulative Frequency Table

প্রাপ্ত নম্বর	Cumulative Frequency
85—89	50=49+1
80—84	49=47+2
75—79	47=43+4
70—74	43=37+6
65—69	37=30+7
60—64	30=18+12
55—59	18=13+5
50—54	13=10+3
45—49	10=6+4
40—44	6=4+2
34—39	4=1+3
30—34	1

৫। পৌনঃপুন্য বিভাজনকে লেখচিত্রে প্রকাশ (Graphic representation of Frequency Distribution) :

বর্তমান যুগে সংখ্যাগত তথ্যকে (numerical data) লেখচিত্রে প্রকাশ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রীতি হয়ে উঠেছে। লেখচিত্রে প্রকাশিত হলে সংখ্যাগত তথ্যগুলি স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে মনের সামনে উপস্থাপিত হয়। এই কারণে পৌনঃপুন্য বিভাজনকে লেখচিত্রে প্রকাশ করা হয়। এই লেখচিত্র তথ্য বিশ্লেষণে সহায়তা করে। এই লেখচিত্র সংখ্যাগত তথ্যকে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করতে এবং সিদ্ধান্তে পৌছতে সহায়তা করে। সাধারণতঃ চারভাবে পৌনঃপুন্য বিভাজনের তথ্যগুলিকে লেখচিত্রে প্রকাশ করা যেতে পারে।—(১) পৌনঃপুন্য বহুভুজ (Frequency Polygon), (২) আয়ত লেখ (Histogram), (৩) ক্রম পৌনঃপুন্য যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য বিভাজন রেখা (Cumulative Frequency Distribution Curve) এবং (৪) ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী শতকরা হার রেখা (Cumulative Percentage Curve or Ogive)। প্রথম তিনটি বর্তমানে আলোচনা করা হবে এবং শেষেরটি পরে আলোচনা করা হবে।

(ক) পৌনঃপুনিক বহুভুজ (Frequency Polygon) : এটি কিভাবে অঙ্কিত করতে হয়, তা বলার আগে গ্রাফ-আঁকার নিয়ম সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

গ্রাফ পেপারে কোন কিছু আঁকতে গেলে আমরা সমগ্র গ্রাফ পেপারটিকে দুটি সরল রেখার (এখানে xox´ এবং yoy´) দ্বারা চারভাগে ভাগ করি। একটি রেখাকে আড়াআড়িভাবে ও আর একটি রেখাকে লম্বালম্বিভাবে অঙ্কন করতে হয়, যাতে রেখা দুটি লম্বভাবে পরস্পরকে একটি বিন্দুতে ছেদ করে। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে xox´ রেখাটিকে আড়াআড়িভাবে ও yoy´-টিকে লম্বালম্বিভাবে আঁকা হয়েছে। রেখা দুটি 'O' বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখন গ্রাফ-পেপারে কোন বিন্দু (মনে কর P) পেতে হলে xox´ এবং yoy´ রেখা দুটি থেকে কত ঘর দূরে সেই বিন্দুটি আছে জানলে বিন্দুটির অবস্থান নির্ণীত হবে। সে কারণে বিন্দুটি থেকে xox´ এবং yoy´ রেখার উপর দুটি লম্ব টানতে হবে। লম্ব দুটি xox´ ও yoy´ রেখা দুটিকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখন এই দুটি বিন্দু O বিন্দু হতে কত ঘর দূরে, তা জানলেই P বিন্দুটির অবস্থান নির্ণয় করা যাবে। আমরা প্রতিটি ক্ষুদ্র ঘর বা বর্গক্ষেত্রকে হয় 1 একক, 2 একক বা 3 একক ধরে নিতে পারি। আবার প্রয়োজনমত 1, 2, 3 ইত্যাদি ধরে নিই, যাতে সমগ্র গ্রাফটি গ্রাফ পেপারে ভালভাবে আঁকা যায়; সেইজন্যই প্রায়ই O বিন্দুটি গ্রাফ পেপারে বাঁ দিকে নীচের দিকে ধরে নিই।

O বিন্দু থেকে OX-এর দিকের সব ঘরকে ধনাত্মক (positive) এবং OX′-এর দিকের সব ঘরকে ঋণাত্মক (negative মনে করি। সেইরূপ O থেকে OY দিকের সব ঘরকে ধনাত্মক ও OY′ দিকের ঘরগুলিকে ঋণাত্মক (negative) ধরি। X ও Y রেখা দুটি O বিন্দুতে ছেদ করার জন্য সমগ্র গ্রাফটি চারটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে।
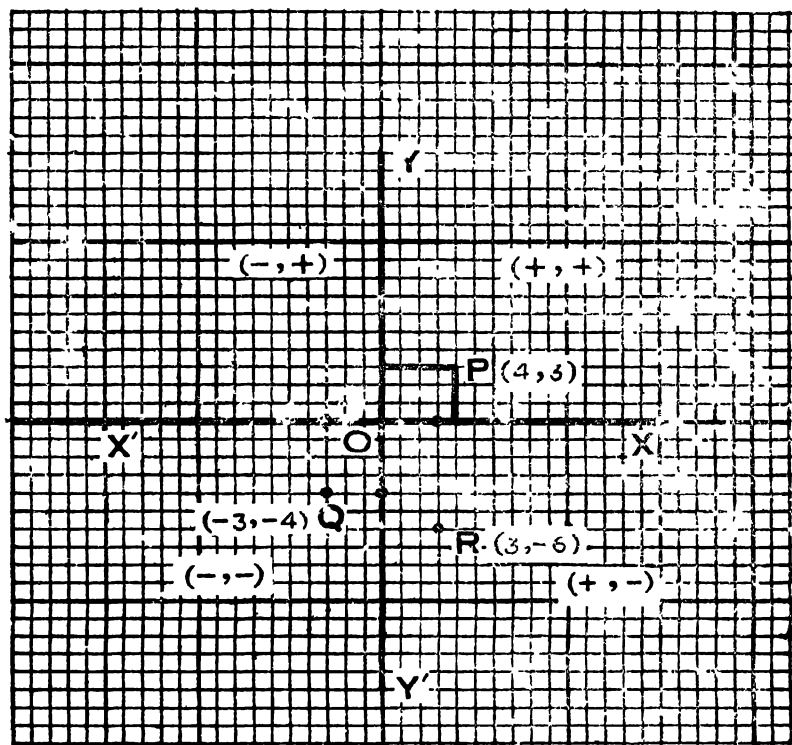
1 নং চিত্র—লেখচিত্র (Graph)

ডানদিকের উপরের ভাগটিতে X এবং Y-এর মান উভয়ই হবে ধনাত্মক (++), উপরের দিকে বাঁ পাশে দ্বিতীয় ভাগটিতে X হল ঋণাত্মক এবং Y হল ধনাত্মক (−+), নীচের দিকে বাঁ পাশে X এবং Y উভয়ই হল ঋণাত্মক (−−), এবং নীচের দিকে ডান পাশে X হল ধনাত্মক এবং Y হল ঋণাত্মক (+−), P এই বিন্দুটি, যার স্থানাঙ্ক (4, 3) বসাতে হলে O এই ছেদ বিন্দু থেকে X অক্ষরেখার উপর 4 একক ডান পাশে যেতে হবে, এবং O বিন্দু থেকে উপরের দিকে OY-এর উপরের তিন একক যেতে হবে। তারপর OX এবং OY থেকে (চিত্র দ্রষ্টব্য) বিন্দুর উপর লম্ব টানতে হবে। যেখানে ছেদ করবে, সেটিকেই P বিন্দু বলে ধরে

নিতে হবে। অনুরূপভাবে Q যার স্থানাঙ্ক (−3, −4), এবং R যার স্থানাঙ্ক (+3, −6), অঙ্কিত হল। O থেকে X অক্ষরের উপর কোন বিন্দুর দূরত্বকে ভুজ (abscissa) এবং O থেকে Y অক্ষরেখার উপর কোন বিন্দুকে কোটি (ordinate) বলা হয়। যেমন, R বিন্দুর ভুজ হল +3 এবং কোটি হল − 6.

পৌনঃপুনিক বহুভুজ অঙ্কন : নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে একটি frequency polygon অঙ্কিত করা হল। 10 একক নিয়ে এক-একটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু (Mid-point) নিরূপণ করে শ্রেণীবিভাগের পাশে দেখান হয়েছে। XO অক্ষরেখায় শ্রেণীবিভাগ না বসিয়ে শ্রেণীবিভাগের মধ্যমান বসাতে হবে। শেষ স্তম্ভে Frequency দেখান হয়েছে।

No. 7 Table

Class interval	Mid-Points	Tally	Frequency
20—29	24·5	////	4
30—39	34·5	~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~	20
40—49	44·5	~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ///	43
50—59	54·5	~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~	70
60—69	64·5	~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~ ~~////~~	50
70—79	74·5	~~////~~ ~~////~~ /	11
80—89	84·5	//	2

একটি গ্রাফ পেপারে আনুভূমিক রেখা (Horizental Line) OX এবং উল্লম্ব রেখা (Vertical line) OY নেওয়া হল। OX রেখা বরাবর শ্রেণী বিভাগগুলির মধ্যবিন্দু (mid-points of the class-interval এবং OY রেখা বরাবর স্কোরগুলি (f) বসান হল। পরপৃষ্ঠায় 2নং চিত্রে OX রেখা বরাবর প্রতিটি বর্গক্ষেত্র বাহুকে

সংখ্যাটি (lowest limit of the lowest class interval) থেকে শুরু করতে হবে, তারপর Y অক্ষরেখার পৌনঃপুন্য বা frequency গণনা করে বার করতে হবে এবং Y অক্ষরেখায় তাকে স্থাপন কবতে হবে। তারপর ঐ বিন্দুটির উচ্চতা
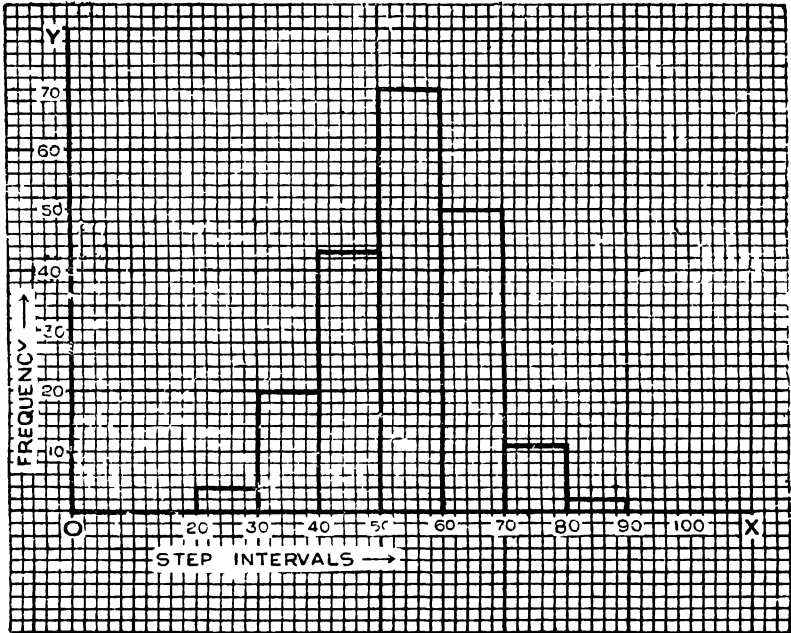
3নং লেখচিত্র : আয়তলেখ বা *Histogram*

পর্যন্ত ঐ শ্রেণীবিভাগের উপর একটি আয়তক্ষেত্রে অঙ্কিত করতে হবে। এইভাবে frequency গণনা করে সব কয়টি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন শেষ করতে হবে। প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের বিস্তার শ্রেণীবিভাগের দূরত্বের সমান হবে এবং যেহেতু সব শ্রেণীবিভাগের দূরত্ব এক, আয়তক্ষেত্রগুলির বিস্তারও হবে এক। কিন্তু উচ্চতায় পার্থক্য থাকবে, কারণ, প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে frequency score-এর সংখ্যা অনুযায়ী। উপরের চিত্রটি লক্ষ্য করলে সব বোঝা যাবে।

(গ) ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুনিক রেখা (Cumulative Frequency Curve) : পৌনঃপুনিক বিভাজনের তথ্যগুলিকে ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য রেখার দ্বারা অন্যভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে।

No 8 Table (Cumulative Frequency Table.)

Class-interval	*f*	*um f.*
80—89	2	200
70—79	11	198
60—69	50	187
50—59	70	137
40—49	43	67
30—39	20	24
20—29	4	4
10 19	0	0

N=200

ক্রমযৌগিক পৌনঃপুন্যের *f* স্তম্ভটি পূর্ণ করার সময় নীচ থেকে পৌনঃপুন্যগুলির ক্রমান্বয়ে যোগ করে সেই শ্রেণীবিভাগ বরাবর এগুলিকে বসাতে হয়। উপরের ছকে 20-29 শ্রেণীবিভাগের 29·5 পর্যন্ত 4টি frequency আছে। তাই Cum. f স্তম্ভে 4 লেখা হল। আবার 20-29 শ্রেণীবিভাগ এবং 30-39 শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অর্থাৎ 19·5 (20-এর নিম্ন সীমা) থেকে 39·5 (39-এর উচ্চ সীমা) পর্যন্ত 4+20=24টি score আছে। তাই 30-39 শ্রেণীবিভাগ বরাবর Cum. f স্তম্ভে 24 লেখা হয়েছে। এইভাবে Cum. f স্তম্ভটি পূরণ করা হয়েছে। মোট পৌনঃপুন্যের সংখ্যা 200 থাকার জন্য এই ছকের সবচেয়ে উপরে Cum. f হল 200. লেখ-চিত্র অঙ্কনের সুবিধার জন্য 20-29 শ্রেণীবিভাগের নীচের শ্রেণীবিভাগ 10-19 নেওয়া হয়েছে এবং ঐ শ্রেণীবিভাগ বরাবর f স্তম্ভে '0' বসান হয়েছে।

ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য রেখা (Cumulative Frequency Curve) লেখচিত্রে অঙ্কন করার সময় X অক্ষের উপর শ্রেণীবিভাগ এবং Y-অক্ষের উপর সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য (Cumulative frequencies) বসান হয়। পৌনঃপুনিক বহুভুজ (polygon) অঙ্কন করার সময় আমরা শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর ঠিক উপরে Y অক্ষরেখায় ঐ পৌনঃপুন্যের (f) অবস্থান ছকে নিই। কিন্তু সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য রেখা অঙ্কন করার সময় আমরা প্রতি শ্রেণীবিভাগের উচ্চ সীমার (upper limit) ঠিক উপরে Y অক্ষরেখায় ঐ পৌনঃপুন্যের অবস্থান নির্দেশ করি। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য রেখাটি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। উপরের ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী বিভাজন ছক অনুযায়ী সঞ্চয়ী পৌনঃপুনিক রেখাটি অঙ্কিত হয়েছে। এঃ রেখা অঙ্কন করার সময় শ্রেণীবিভাগের উচ্চ সীমার উপরই Cum. f বিন্দু বসান হয়েছে। কিন্তু আমরা সর্বশেষ শ্রেণীবিভাগের নিম্ন সীমা (lower limit) নিয়ে আরম্ভ করেছি।

বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের উচ্চতর সীমার দূরত্ব সমান। Y অক্ষরেখার সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য (Cum. f)-গুলি ছকা হয়েছে। যখন সব বিন্দুগুলি ছকা হয়ে গেছে তখন তাদের
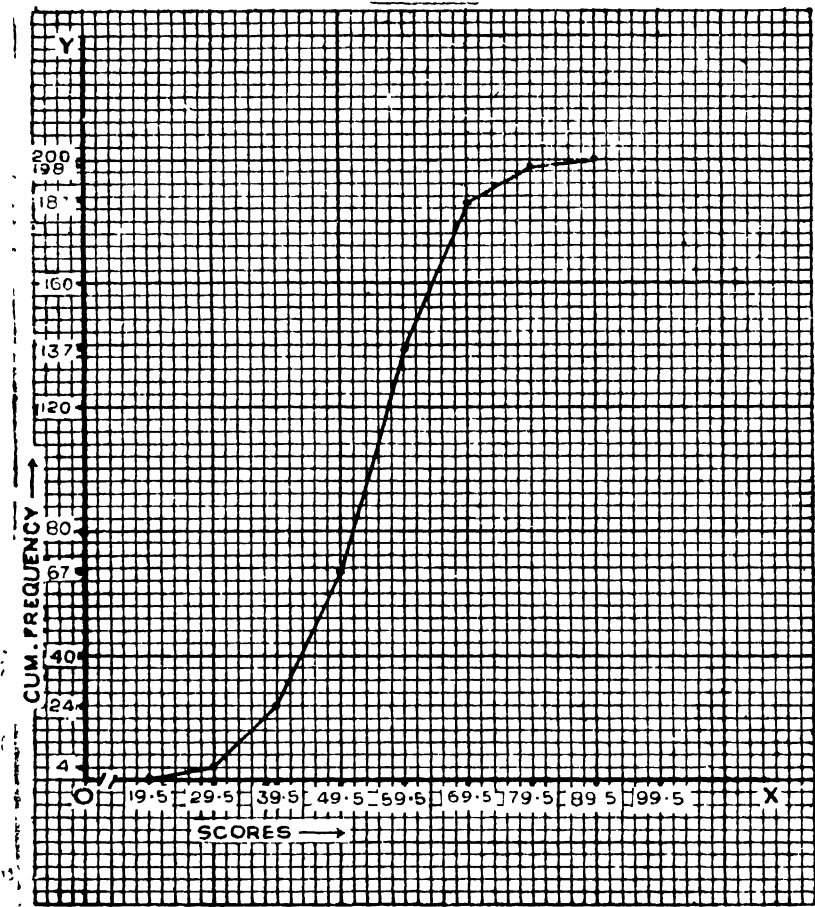
৪নং লেখ চিত্র—ক্রম-যৌগিক পরিসংখ্যা রেখা বা Ogive

সরলরেখার দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে এবং এভাবে আমরা ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুনিক রেখা অঙ্কন করি।

৬। **কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ (Measures of Central Tendencies):**

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency) কাকে বলে?

পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণলব্ধ অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে পৌনঃপুন্য বিভাজনে (Frequency Distribution) **সাজাবার পর তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করা হয়।** কোন পৌনঃপুন্য বিভাজনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে বোঝায় সেই স্কোর বা মান যেটি সমস্ত বিভাজন বা বণ্টনের (distribution) প্রকৃতি নির্দেশ করে বা যেটি সমস্ত বণ্টনের প্রতিনিধিরূপে কাজ করে (That point which represents the whole of the distribution)। কোন একটি গড় সংখ্যা সেই দলটির কেন্দ্রীয় প্রবণতা প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় প্রবণতা কেন্দ্রীয় অবস্থানের (Central Position) সূচক।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের দুটি মূল্য আছে– (১) প্রথমতঃ, এটি হল 'গড' (average) যা দলের সব কয়টি স্কোরের প্রতিনিধি স্বরূপ এবং (২) দ্বিতীয়তঃ, দুই বা ততোধিক দলের কাজের বৈশিষ্ট্যের তুলনা এর দ্বারা সম্ভব হয়।

এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করার সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা— (ক) **গাণিতিক গড়** (Arithmetic Mean বা Mean)। একে শুধু *M* দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। (খ) **মধ্যমান** (Median)। একে '*Md*' দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং (গ) **ভূযিষ্টক** (Mode); একে '*Mo*' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

(ক) **গাণিতিক গড় বার করার রীতি** (How to calculate the Mean)।

(i) **যখন তথ্যগুলি বিন্যস্ত থাকে না তখন মিন বার করার রীতি** (Calculation of the Mean when data are ungrouped)।

যখন তথ্যগুলি বিন্যস্ত থাকে না অর্থাৎ Ungrouped অবস্থায় থাকে তখন মিন বার করার নিয়ম হল, সমস্ত স্কোরগুলিকে একত্রে যোগ করে যোগফলকে স্কোর (score)-এর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা।

$$\text{সূত্র হল } M=\frac{\Sigma X}{N}$$

[*M* = mean বা গাণিতিক গড়; N স্কোরগুলির মোট সংখ্যা; X = স্কোর (score); ΣX = স্কোরের যোগফল]

উদাহরণ : ধরা যাক, একটি পরীক্ষার্থীর 6টি বিষয়ের স্কোর হচ্ছে যথাক্রমে 85, 70, 90, 65, 50, এবং 55.

তাহলে তার নম্বরের Arithmetic Mean বা গাণিতিক গড় হচ্ছে :

$$\frac{85+70+90+65+50+55}{6}=69{\cdot}17$$

(ii) **যখন তথ্যগুলি শ্রেণীবদ্ধ বা বিন্যস্ত থাকে** অর্থাৎ Grouped **অবস্থায় থাকে তখন মিন বার করার উদাহরণ রীতি** (Calculation of the Mean when data are grouped)।

যখন তথ্যগুলি সাজান থাকে বা grouped অবস্থায় থাকে তখন মিন বার করার সূত্র হল :

$$M = \frac{\Sigma fX}{N}$$

[M = Arithmetic Mean বা গাণিতিক গড় ; f = frequency বা পৌনঃপুন্য X = প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু বা midpoint ; N = frequency-র সংখ্যা]

উদাহরণ : **No. 9 Table**

Class-interval	X	f	fx
80—89	84·5	2	169·0
70—79	74·5	11	819·5
60—69	64·5	50	3225·0
50—59	54·5	70	3815·0
40—49	44·5	43	1913·5
30—39	34·5	20	690·0
20—29	24·5	4	98 0
		N = 200	10730·0

$$M = \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{1073·0}{200} = 53·65$$

কল্পিত গড়ের সাহায্যে গাণিতিক গড় নির্ণয়ের প্রণালী (**Calculation by Assumed Mean**) **:** অথবা **সংক্ষেপে গড় বার করার সহজ পদ্ধতি** (**How to calculate mean by short method**) **:** পরিসংখ্যা বিভাজনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

$$\text{সূত্র } M = A.M + ci$$

$$c = \frac{\Sigma fx'}{N}$$

M = AM + ci = কল্পিত গড় + Correction × শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা ব্যাপ্তি।

No. 10 Table

Class-interval	Midpoints X	f	x´	fx´
80—89	84·5	2	3	6
70—79	74·5	11	2	22
60 - 69	64 5	50	1	50
50 —59	54·5	70	0	+78
40—49	44·5	43	-1	-43
30—39	34 5	20	-2	-40
20 29	24·5	4	-3	-12
		N=200		—95
				-17

কল্পিত গড়ের সাহায্যে নির্ণয়: শ্রেণীবিভাগের যে কোন রাশিকে গড় হিসেবে ধরে নিলে তাকে কল্পিত গড (Assumed Mean) বলে এবং কল্পিত গড থেকে প্রত্যেক রাশির অন্তরকে পার্থক্য (Deviation) বলে। রাশিবিজ্ঞানে 'x¹' অক্ষর দ্বারা এই 'deviation'-কে চিহ্নিত করা হয়। এই পার্থক্য ধনাত্মক (+) অথবা ঋণাত্মক (−) যে কোন রকম হতে পারে।

মনে করি কল্পিত গড=54·5

$$M = 54{\cdot}5 + \frac{-17}{200} \times 10$$

$$= 54{\cdot}5 - 0{\cdot}85 = 53{\cdot}65$$

পদ্ধতির ব্যাখ্যা: (১) Score-গুলিকে পৌনঃপুন্য বিভাজনে সাজাতে হবে। (Score-এর মাঝামাঝি জায়গা থেকে একটি score-কে গড বলে ধরে নিতে হবে। একে বলা হয় কল্পিত গড় বা Assumed Mean. যে শ্রেণীবিভাগের পৌনঃপুন্য (frequency) সবচেয়ে বেশি সেটির মধ্য বিন্দুকেই কল্পিত গড় হিসেবে ধরে নিলে ভাল হয়। ওপরের উদাহরণে 50 − 59 শ্রেণীবিভাগের পৌনঃপুন্য সবচেয়ে বেশি। সে কারণে ঐ শ্রেণী-বিভাগের মধ্য বিন্দু 54·5 কে কল্পিত গড বা AM হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

(৩) x´ ঘরটি পূরণ করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু ও কল্পিত গড়ের অন্তরকে শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা ব্যাপ্তি দিয়ে ভাগ করে ফলটি লিখতে হবে। যেমন, 80—89 শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু 84·5; কল্পিত গড় নেওয়া হয়েছে 54·5. কাজেই উভয় রাশির অন্তর 84·5 − 54·5 = 30·0. শ্রেণীবিভাগের

ব্যাপ্তি হল 10 তাহলে 30÷10=3 অর্থাৎ এক্ষেত্রে $x' = \frac{d}{10}$. কল্পিত গড় থেকে প্রত্যেক রাশির অন্তরকে Deviation বলে, যাকে 'd' দ্বারা সূচিত করা হয়।

(৪) fx´ কলমে x´ কে f দিয়ে গুণ করে ফলাফল লিখতে হবে। f হল frequency আর x´ হল কল্পিত গড় থেকে বিভাগের পার্থক্যসূচক রাশি। পূর্ব পৃষ্ঠার উদাহরণে প্রথম ঘরটিতে 3×2=6 fx´ কলমে লেখা হয়েছে।

(৫) fx´ কলমের রাশিগুলির যোগফল নির্ণয় করতে হবে। ধনাত্মক ও গুণফলগুলি পৃথক পৃথক ভাবে যোগ করতে হবে। পূর্ব পৃষ্ঠার উদাহরণটিতে উপরের দিকে ধনাত্মক রাশিগুলির যোগফল 6+22+50=78 আর নীচের দিকে ঋনাত্মক রাশিগুলির {(−43)+(−40)+(−12)}=95 যোগফল বার করতে হবে। এক্ষেত্রে উদাহরণটিতে যোগফল হয়েছে −17.

(৬) c হল fx´ কলমের সব রাশিগুলির যোগফলকে N (অর্থাৎ মোট frequency) দিয়ে ভাগ করলে যে ফল হবে সেটি।

(৭) i হল শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি। উপরের উদাহরণে শ্রেণী বিভাগের ব্যাপ্তি হল 10।

(৮) c-কে i দিয়ে গুণ করে, তার সঙ্গে AM যোগ করলেই Mean বা গাণিতিক গড় পাওয়া যাবে।

(খ) মধ্যমমান বার করার নিয়ম (How to Calculate the Median): যখন অশ্রেণীবদ্ধ রাশিগুলিকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট অর্থাৎ মানের ঊর্ধ্বক্রমে বা অধঃক্রমে সাজান হয়, তখন ঠিক মাঝখানে যে রাশিটি থাকে, সেই রাশিটিকেই মধ্যমমান বা Median বলা হয়।

বিজোড় সংখ্যক রাশিকে যদি উপরিউক্ত নিয়ম অনুযায়ী সাজান হয় তাহলে ঠিক মাঝখানের রাশিটি হবে মধ্যমমান বা Median। যেমন—3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, এখানে মোট 9টি রাশি আছে। কাজেই রাশির সংখ্যা বিজোড়। তাহলে মাঝের রাশি 8-ই হবে মধ্যমমান বা Median. এর উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যক রাশি থাকবে। এক্ষেত্রে উভয় পার্শ্বে 4টি রাশি রয়েছে।

যদি জোড় সংখ্যক রাশি হয় তাহলে মাঝে এমন কোন রাশি পাওয়া যাবে না যার দুপাশে সমান সংখ্যক রাশি থাকবে। সেক্ষেত্রে মাঝের দুটি রাশির গড়কেই মধ্যমমান বা Median ধরতে হবে। যেমন—3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, এখানে মধ্যমমান বা Median হচ্ছে 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 অর্থাৎ মাঝের দুটি সংখ্যা 7 এবং 8-এর গড=7·5.

অশ্রেণীবদ্ধ রাশির ক্ষেত্রে মধ্যমমান নির্ণয়ের নিয়ম (Calculation of Median from ungrouped data) :

(১) রাশিগুলিকে মানের ক্রম অনুসারে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজিয়ে নিতে হবে।

(২) রাশিগুলির সংখ্যা (অর্থাৎ n) বিজোড় হলে মধ্যমমান হবে $\frac{n+1}{2}$ তম রাশিটি।

(৩) রাশিগুলির সংখ্যা (অর্থাৎ n) জোড় হলে মধ্যমমান হবে $\frac{n}{2}$ তম এবং $\frac{n}{2}+1$ তম এই রাশি দুটির গড়।

উদাহরণ : কয়েকটি বিজোড় সংখ্যক রাশি নেওয়া হল।

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

সূত্র : $\frac{n+1}{2}$ তম রাশিটি মধ্যমমান।

এখানে মধ্যমমান $=\frac{7+1}{2}=4$, অর্থাৎ চতুর্থ রাশিটি $=12$ মধ্যমমান।

কয়েকটি জোড় সংখ্যক রাশি নেওয়া হল।

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

সূত্র : $\frac{n}{2}$ তম এবং $\frac{n}{2}+1$ তম রাশি দুটির গড়।

এখানে মধ্যমমান $=\frac{8}{2}$ তম এবং $\frac{8}{2}+1$ তম রাশি দুটির গড়।

(চতুর্থ রাশি এবং পঞ্চম রাশির গড়)

$=12+13$-এর গড়

$=12.5$ সংখ্যক রাশিটি মধ্যমমান

পরিসংখ্যা বিভাজনে যখন রাশিগুলি সজ্জিত থাকে তখন মধ্যমমান নির্ণয়ের সূত্র (Calculation of Median from Grouped data in a Frequency Distribution).

মধ্যমমান নির্ণয়ের সূত্র :

$$\text{Mdn}=l+\frac{\frac{N}{2}-fc}{fm}\times i$$

$l=$ যে শ্রেণীবিভাগে মধ্যমমান বা Median আছে তার নিম্নসীমা ;

N = মোট পরিসংখ্যান।

fc = সর্বনিম্ন শ্রেণীবিভাগ থেকে শুরু করে Median যে শ্রেণীবিভাগে পড়েছে সেই পর্যন্ত 'f'-এর যোগফল।

fm = যে বিভাগে মধ্যমমান আছে সেই বিভাগের frequency।

i = শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি।

উদাহরণ ঃ

No 11 Table

Class-interval	f	
80—89	2	
70 79	11	
60—69	50	
50—59	70	
40—49	43	67
30—39	20	
20—29	4	
	N=200	

মধ্যমমানের সূত্রটি- -

$$\text{মধ্যমমান} = l + \frac{\frac{N}{2} - fc}{fm} \times i$$

এই সূত্রটি প্রয়োগ করে মধ্যমমান বার করতে হলে নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হতে হবে।

(১) প্রথমে $\frac{N}{2}$ বার করতে হবে। অর্থাৎ মোট frequency বা স্কোর সংখ্যার অর্ধেক কত বার করতে হবে।

(২) সর্বনিম্ন class-interval-এর frequency থেকে শুরু ক'রে (উপর থেকে নীচে বা নীচ থেকে উপরে যেভাবে class intereal সাজান থাকে) এগোতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই শ্রেণীবিভাগটি পাওয়া যায় যেখানে $\frac{N}{2}$ সংখ্যক স্কোর শেষ হচ্ছে। বুঝে নিতে হবে সেই শ্রেণীবিভাগেই মধ্যমানটি পড়েছে। তারপর সেই শ্রেণীবিভাগের নিম্নসীমাটি বার করতে হবে, সেটি হবে l

(৩) সর্বনিম্ন class interval থেকে শুরু করে l পর্যন্ত 'f'-এর যোগফল বের করতে হবে। প্রয়োজনমত উপর বা নীচের দিক থেকে যোগ করে যেতে হবে, যেভাবে class-interval সাজান থাকবে। যেমন, এখানে উপর থেকে যোগ করে দেখান হয়েছে।

এখানে $l=49{\cdot}5$ (যে শ্রেণীবিভাগে মধ্যমমান পড়েছে তার নিম্নসীমা)

$$\frac{N}{2}=\frac{200}{2}\ ;\ fc=67\ ,\ fm=70\ ;\ i=10$$

$$\text{Mdn}=49{\cdot}5+\left(\frac{\frac{200}{2}-67}{70}\right)\times 10$$

$$=49{\cdot}5+\frac{33}{70}\times 10$$

$$=49{\cdot}5+\frac{33}{7}=49{\cdot}5+4{\cdot}71=54{\cdot}21$$

(গ) ভূয়িষ্টক নির্ণয় করার পদ্ধতি (How to Calculate Mode)**:** যখন কতকগুলি স্কোর অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে তখন যে স্কোরটি সবচেয়ে বেশিবার থাকে তাকে ভূয়িষ্টক (Mode) বলা হয়। যেমন, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7 7 7, 8 8 8 8 8, 9, 10, 11, 11, 12—এই স্কোরগুলির ভূয়িষ্টক (Mode) হল 8, কারণ 8 সংখ্যাটি অন্য সংখ্যার তুলনায় অধিকবার আছে। ভূয়িষ্টক or Mode এক বা একাধিক হতে পারে। যেমন, 2, 3, 3, 3, 3, 4 4 4 4, 5, 6, 8 8 8 8, 9, 10, 11, 11, 12—এখানে 3, 4, 8 প্রতিটি স্কোর 4 বার করে আছে। সুতরাং এই তিনটি রাশিই হল ভূয়িষ্টক।

ভূয়িষ্টক নির্ণয় করার সূত্র হল : Mode=3 Median—2 mean.

No. 12 Table

Class-interval	X	f	x″	fx
80—89	84·5	2	4	8
70—79	74·5	11	3	33
60—69	64·5	50	2	100
50—59	54·5	70	1	70
40—49	44·5	43	0	+211
30—39	34·5	20	−1	0
20—29	24·5	4	−2	−20
				−8
				−28
		N=200		183

$$\text{Median}=l+\left(\frac{\frac{N}{2}-f}{fm}\right)\times i$$

$$=49{\cdot}5+\left(\frac{\frac{200}{2}-67}{70}\right)\times 10$$

$=54{\cdot}21$ (বিস্তারিত আলোচনার জন্য ২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

Mean = AM + ci

$AM = 44{\cdot}5$,, $c = \frac{\Sigma f x'}{N} = \frac{183}{200} = {\cdot}915$

$= 44{\cdot}5 + {\cdot}915 \times 10 = 44{\cdot}5 + 9{\cdot}15 = 53{\cdot}65$

(কল্পিত গড় কিভাবে বার করতে হয়, তার জন্য ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Mode = 3 Median—2 Mean = $3 \times 51{\cdot}21 - 2 \times 53{\cdot}65 = 55{\cdot}33$

৭। কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের বিভিন্ন উপায় কখন প্রয়োগ করতে হয়? (When to use the various measure of central tendency?) ঃ

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের জন্য কখন কোন্ উপায়টি অবলম্বন করতে হবে পরিসংখ্যানের ছাত্রদের কাছে তা প্রায়ই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের জন্য অন্যান্য উপায়গুলির তুলনায় গাণিতিক গড় বা Mean-এর ব্যবহারই বেশী প্রচলিত, যেহেতু তিনটি পরিমাপের মধ্যে এটিই বেশি নির্ভুল। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় মধ্যমান (Median) এবং ভূয়িষ্টক (Mode)-এর প্রয়োগ বেশি কার্যকর। কখন কোন্‌টির প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মগুলি অনুসরণ করা চলে :

(i) **কখন গাণিতিক গড় বা Mean-এর প্রয়োগ করতে হয় :**

(১) যখন একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুর দুপাশে স্কোরগুলি সমানভাবে অবস্থিত থাকে।

(২) সবচেয়ে নির্ভুল কেন্দ্রীয় প্রবণতা পেতে গেলে অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার তুলনায় Mean-ই সবচেয়ে কার্যকর।

(৩) অন্যান্য পরিসংখ্যান যেমন, সমক পার্থক্য (SD), সহপরিবর্তনের মান (Co-efficient of correlation) ইত্যাদি নির্ণয় করতে হলে পূর্বেই Mean নির্ণয় করে নিতে হয়।

(ii) **কখন মধ্যমমান বা Median-এর প্রয়োগ করতে হয় :**

(১) যখন বিভাজনের যথাযথ-মধ্যবিন্দু (mid-point) অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশতম বিন্দুটি নিরূপণ করতে হয়।

(২) যখন বিভাজনের প্রান্তসীমায় খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর থাকে, তখন Mean-টি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর থাকার জন্য Median-এর কোন পরিবর্তন ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ 6, 8, 9, 10, এবং 12 এই সারির Mean এবং Median উভয়ই 9, কিন্তু যদি 12-র জায়গায়

42 বসান হয় এবং অন্যান্য স্কোর অপরিবর্তিত থাকে তাহলে Median সেই 9-ই থেকে যায় কিন্তু Mean হয়ে যায় 15.

(৩) যখন বিভাজনটি অসম্পূর্ণ থাকার জন্য Mean বার করা যায় না এবং গৃহীত এককটি সর্বত্র সমান কিনা তা জানা না থাকে।

(iii) কখন ভূষিস্টক (Mode) প্রয়োগ করতে হয় :

(১) যখন খুব দ্রুত এবং আনুমানিক (approximate) কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের প্রয়োজন দেখা দেয়।

(২) যখন প্রদত্ত স্কোরগুলির মধ্যে কোন্ স্কোরটি সবচেয়ে বেশী বার আবর্তিত হয়, তা নিরূপণ করার প্রয়োজন হয়।

৮। গড় থেকে পার্থক্য বা বিস্তৃতির পরিমাপ (Measurement of Variability or Dispersion) :

সংগৃহীত তথ্যের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করা যায় যদি তার প্রতিনিধি স্থানীয় তথ্যটি নিরূপণ করা যায়। গড় হল সেই প্রতিনিধিস্থানীয় তথ্য যার দ্বারা আমরা কোন সমষ্টি বা শ্রেণী সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা করি। কিন্তু গড়ের সাহায্যে
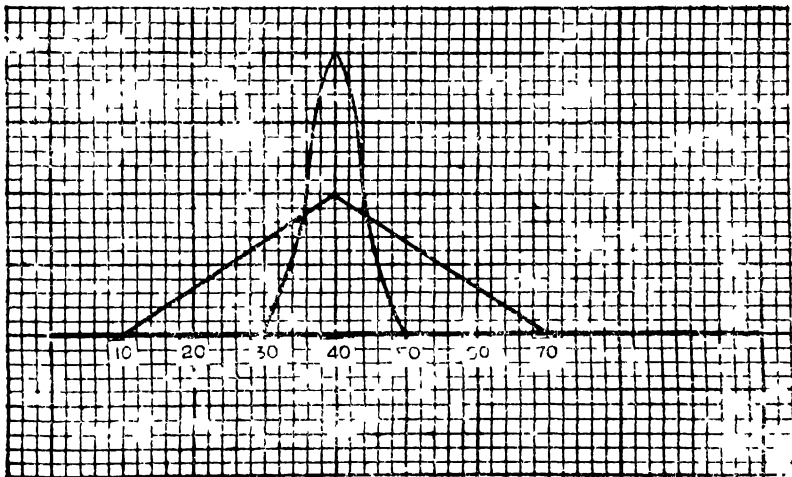
৮নং লেখচিত্র : 50 জন ছেলে ও 50 জন মেয়ের স্কোরের লেখচিত্র

সংগৃহীত তথ্যের প্রতিটির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব হয় না। এই কারণে গড় থেকে এর অন্তর্গত মানগুলির পার্থক্য বা বিস্তৃতি (Dispersion) নিরূপণ করা দরকার। শ্রেণীবদ্ধ স্কোরগুলির (f) কেন্দ্রের দিকে যত বেশি প্রবণতা থাকে, গড়,

মধ্যমমান ও ভূষিস্টক ততই নির্ভুল প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, সে কারণ স্কোরগুলি প্রতিনিধির দুপাশে কিভাবে ছড়িয়ে বা বিস্তৃত হয়ে থাকে তা জানা দরকার। স্কোরগুলির প্রতিনিধি বা গড় থেকে পার্থক্য বা বিস্তৃতি যত কম হবে, ততই তাদের গড় বেশী প্রতিনিধি স্থানীয় হবে। প্রতিনিধির নির্ভরযোগ্যতা তার দুপাশের স্কোরগুলির মানের উপর নির্ভর করে।

ধরা যাক, কোন একটি বিদ্যালয়ে ৫০ জন ছেলে এবং ৫০ জন মেয়ের উপর একটি বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগ করা হল। ফলাফল থেকে দেখা গেল মেয়েদের এবং ছেলেদের গড় নম্বর একই, কিন্তু মেয়েরা 30 থেকে 50 নম্বরের মধ্যে পেয়েছে, কিন্তু ছেলেরা 10 থেকে 70 নম্বরের মধ্যে পেয়েছে।

মেয়েদের স্কোরের বিস্তৃতি 21 = 50—29, কিন্তু ছেলেদের স্কোরের বিস্তৃতি 61 = 70—9 কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যদিও পূর্বোক্ত স্কোরের গড় সমান তবু মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের স্কোর বেশী বিস্তৃত অর্থাৎ বেশী জায়গা জুড়ে আছে। সুতরাং বিস্তৃতির ধারণা করতে হলে এই বিস্তৃতির পরিমাপের প্রয়োজন।

বিস্তৃতি পরিমাপ করার নিয়ম : বিস্তৃতি চার উপায়ে পরিমাপ করা যায়, যথা—(ক) প্রসার Range), (খ) গড় পার্থক্য (Mean Deviation) (গ) চতুর্থক পার্থক্য (Quartile Deviation) এবং ঘ) সমক পার্থক্য Standard Deviation)।

(ক) প্রসার (Range)**:** কোন তালিকার সর্বোচ্চ স্কোর থেকে সর্বনিম্ন স্কোরের অন্তরকে (difference) প্রসার বলে। পূর্বোক্ত উদাহরণে মেয়েদের স্কোরের প্রসার (Range) হচ্ছে 50 − 29 = 21 ; এবং ছেলেদের স্কোরের প্রসার হচ্ছে 70 − 9 = 61. প্রসারের সাহায্যে অতি সহজে বিস্তৃতি পরিমাপ করা গেলেও, এই প্রণালী খুব সন্তোষজনক নয়। প্রান্তীয় স্কোরের উপরই প্রসার নির্ভর করে। যদি কোন কারণে প্রান্তীয় স্কোর দুটি খুব বেশী বড় বা ছোট হয়, তখন প্রসারের দ্বারা স্কোরগুলির বিস্তৃতি ধরা পড়বে না। মোট স্কোরের সংখ্যা অল্প হলেও বিস্তৃতি পরিমাপের ব্যাপারে প্রসার খুব কার্যকর হয় না।

(খ) **গড় পার্থক্য** (Mean Deviation)**:** কোন শ্রেণীর স্কোরগুলির গড় থেকে তার প্রতিটি স্কোরের চিহ্নিনিরপেক্ষ অন্তর ফলের গড়কে গড় পার্থক্য (Mean Deviation or MD) বলা হয়। একে Average Deviation বা সংক্ষেপে AD-ও বলা হয়ে থাকে।

গড় পার্থক্য নির্ণয় করার নিয়ম : ১) প্রথমে স্কোরগুলির গড় নির্ণয় করতে হবে।

(২) গড় থেকে প্রত্যেকটি স্কোরের চিহ্ন নিরপেক্ষ অন্তর বার করতে হবে।

(৩) অন্তরগুলির যোগ (+) এবং (−) বিয়োগ চিহ্নগুলি অগ্রাহ্য করে, এদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে।

(৪) সমষ্টিকে স্কোরগুলির মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। প্রাপ্ত ভাগফলটিই নির্ণেয় গড় পার্থক্য।

সুতরাং, AD বা MD নির্ণয় করার সূত্র হল।

$$AD = \frac{\Sigma |d|}{N}$$

d = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের অন্তর; Σ | d | = চিহ্ন নিরপেক্ষ d-এর যোগফল অর্থাৎ প্রতিটি d-কে ধনাত্মক (Positive) হিসেবে গণ্য করতে হবে।

N = মোট স্কোরের সংখ্যা।

যখন স্কোরগুলি অসজ্জিত অবস্থায় থাকে (When scores are ungrouped)। **উদাহরণ** –

4, 6, 12, 18, 20, 24 এই স্কোরগুলির গড় পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

নির্ণেয় স্কোরগুলির গড় $= \frac{4+6+12+18+20+24}{6} = 14$

এই গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের অন্তর হল $4-14=-10$, $6-14=-8$; $12-14=-2$; $18-14=4$; $20-14=6$; $24-14=10$;

$$AD \text{ বা } MD = \frac{\Sigma |d|}{N}$$

$$= \frac{10+8+2+4+6+10}{6}$$

$$= \frac{40}{6} = 6{\cdot}66$$

যখন স্কোরগুলি সজ্জিত (When scores are grouped): যখন স্কোরগুলি সজ্জিত থাকে অর্থাৎ পৌনঃপুন্য বিভাজনের ক্ষেত্রে গড় পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে পরপৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে।

(১) গড় থেকে প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু অন্তর বার করতে হবে।

(২) পৌনঃপুন্য বিভাজন থেকে স্কোরগুলির গড় নির্ণয় করতে হবে।

(৩) মধ্যবিন্দুর অন্তরগুলিকে যথাক্রমে বিভাগের পরিসংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে।

(৪) গুণফলগুলির সমষ্টিকে মোট স্কোরের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। তাহলে যে ভাগফলটি পাওয়া যাবে সেটিই গড় পার্থক্য।

পৌনঃপুন্য বিভাজনের ক্ষেত্রে গড় পার্থক্য নির্ণয়ের সূত্র হল—

$$AD = \frac{\Sigma \mid fd \mid}{N}$$

No. 13 Table

Class-interval	X	f	(X−M=d)	fd	| fd |
80—89	84·5	2	+30·85	+ 61·70	61·70
70—79	74·5	11	+20·85	+229·35	229·35
60—69	64·5	50	+10·85	+542·50	542·50
50—59	54·5	70	+ ·85	+ 59·50	59·50
40—40	44·5	43	− 9·15	−393·45	393·45
30—39	34·5	20	−19·15	−383·00	383·00
29—29	24·5	4	−29·15	−116·60	116·60
		N=200			Σ|fd| = 1786·10

X = মধ্যবিন্দু; d = গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের অন্তর; fd = প্রতিটি d-কে f দ্বারা গুণ করা হয়েছে।

Σ | fd | = fd-র চিহ্ন নিরপেক্ষ যোগফল।

Mean = 53·65 (১৮-১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

$$AD = \frac{\Sigma \mid fd \mid}{N} = \frac{1786 \cdot 10}{200} = 8 \cdot 93$$

(গ) **চতুর্থক পার্থক্য** (Quartitle Deviation) : চতুর্থক পার্থক্য বা Q হল কোন পৌনঃপুন্য বিভাজনের স্কোরের 75তম পার্সেণ্টাইল এবং 25তম পার্সেণ্টাইল-এর দূরত্বের অর্ধেক। চতুর্থকগুলি (Quartile) স্কোরের অন্তর্গত কোন স্কোর নয়। এগুলি স্কোরের স্কেলে এক একটি বিন্দু। 25তম পার্সেণ্টাইল বা Q_1, স্কোরের স্কেলে প্রথম চতুর্থক এর নীচে শতকরা 25জনের স্কোর থাকে। 75তম পার্সেণ্টাইল বা Q_3 স্কোরের স্কেলে তৃতীয় চতুর্থক, যার নীচে শতকরা 75 জনের স্কোর থাকে। Q_3র উপরে শতকরা 25 জনের স্কোর থাকে। Q_1 এবং Q_3র বিন্দু দুটি যেই পাওয়া গেল, অমনি Quartile Deviation বা Q-র সূত্রটি পাওয়া গেল। সূত্রটি হল—

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

Qনির্ণয় করতে হলে 75তম এবং 25তম পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করতে হবে। মধ্যমমান (Mdn.) যে উপায়ে নির্ণয় করতে হয় সেই একই উপায়ে 75তম এবং 25তম পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করতে হবে। Mdn. স্কোরের স্কেলে 50তম পার্সেণ্টাইল। তবে Mdn. এর এর সঙ্গে পার্থক্য হল এই, Mdn. নির্ণয় করার সময় আমরা স্কোরের সংখ্যা অর্থাৎ

Nকে 2 দিয়ে ভাগ করি অর্থাৎ $\left(\frac{N}{2}\right)$। কিন্তু Q_1 নির্ণয় করার সময় N এর $\frac{1}{4}$ গণনা করতে হবে এবং Q_3 নির্ণয় করার সময় N এর $\frac{3}{4}$ গণনা করতে হবে। কারণ স্কোরের সংখ্যা যদি N হয় তাহলে প্রত্যেক Quartile বা চতুর্থক হবে N এর $\frac{1}{4}$ অংশ, এর থেকে Q_1 এবং Q_3 নির্ণয় করার দুটি সূত্র পাওয়া গেল।

$$Q_1 = l + \frac{\frac{N}{4} - Cumf_1}{fq} \times i$$

$$Q_3 = l + \frac{\frac{3N}{4} - Cumf_1}{fq} \times i$$

এখানে l = যে ধাপে Quartile পড়ে তার ঠিক নিম্নসীমা
$Cumf_1$ = যে ধাপে Quartile পড়ে তার পূর্ব ধাপগুলির f-র যোগফল
fq = যে ধাপে Quartile পড়ে সেই ধাপ বরাবর f
i = শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা ব্যাপ্তি।

No. 14 Table

Class-interval	Mid point	Frequencies (f)	Cum. Fre F
90 – 94	92	2	60
85 – 89	87	2	58
80 – 84	82	4	56
75 – 79	77	8	52
70 – 74	72	8	44
65 – 69	67	13	36
60 – 64	62	9	23
55 – 59	57	6	14
50 – 54	52	5	8
45 – 46	47	1	3
40 – 44	42	2	2
		N = 60	

Quartile Deviation বা Q নির্ণয়

(ক) Q_1 নির্ণয় করার সূত্র—

$$Q_1 = l + \frac{\frac{N}{4} - Cumf_1}{fq} \times i$$

এখানে $\frac{N}{4} = \frac{60}{4} = 15$

$l = 59.5$ (মোট frequency-র $\frac{1}{4}$ অংশ অর্থাৎ 15 যে শ্রেণী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তার নিম্নসীমা)

$Cumf_1 = 6+5+1+2 = 14.$

$fq = 9,\ i = 5.$

এবার সূত্র প্রয়োগ করলে

$$Q_1 = 59{\cdot}5 + \frac{15-14}{9} \times 5$$

$$= 59{\cdot}5 + \tfrac{5}{9}$$

$$= 59{\cdot}5 + {\cdot}56$$

$$= 60{\cdot}06$$

(খ) Q_3 নির্ণয় করার সূত্র—

$$Q_3 = l + \frac{\frac{3N}{4} - Cumf_1}{fq} \times i$$

এখানে $\frac{3N}{4} = \frac{180}{4} = 45$

$l = 74{\cdot}5$

$Cumf_1 = 2+1+5+6+9+13+8 = 44$

$fq = 8$

$i = 5$

$$\therefore\quad Q_3 = l + \frac{\frac{3N}{4} - Cumf_1}{fq} \times i$$

$$= 74{\cdot}5 + \frac{45-44}{8} \times 5$$

$$= 74{\cdot}5 + {}^5/_8$$

$$= 74{\cdot}5 + {\cdot}63$$

$$= 75{\cdot}13$$

এখন Q নির্ণয় করতে হলে—

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

$$= \frac{75{\cdot}13 - 60{\cdot}06}{2}$$

[Q_3 এবং Q_1 এর মানসূত্রে স্থাপন করে]

$$= \frac{15{\cdot}07}{2}$$

$$= 7{\cdot}54$$

(গ) সমক পার্থক্য (Standard Deviation) **:** কোন শ্রেণীর রাশিগুলির গড় থেকে রাশিগুলির পার্থক্যগুলির বর্গসমূহের গড়ের বর্গমূলকে ঐ রাশিগুলির সমক পার্থক্য (Standard Deviation) বলা হয়। গড় পার্থক্য (AD বা MD) থেকে সমক পার্থক্য একটু স্বতন্ত্র এবং গড় পার্থক্যের থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য। সমক পার্থ্যকের দ্বারা আরও নিখুঁত ফলাফল পাওয়া যায়। গড় পার্থক্য (AD বা MD) নির্ণয় করার সময় গড থেকে প্রতিটি স্কোরের অন্তরকে অর্থাৎ 'd'গুলিকে ধনাত্মক (positjve) হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তার ফলে পরিমাপ নিখুঁত হয় না। কিন্তু সমক পার্থক্য (SD) নির্ণয় করার সময় গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের পার্থক্যকে অর্থাৎ 'd'গুলিকে বর্গ করে নেওয়া হয়। ফলে সব স্কোরগুলিই ধনাত্মক হয়ে পড়ে। এতে 'd' যদি ঋণাত্মক (Negative) হয় তবু d^2 করলে তা ধনাত্মক হয়ে যায়। ফলে পরিমাপে আর ত্রুটি থাকে না। SD কথাটিকে গ্রীক চিহ্ন σ (সিগমা)-র সাহায্যে প্রকাশ করা হয়।

স্কোরগুলি অসজ্জিত থাকলে সমক পার্থক্য নির্ণয় করার নিয়ম (Calculation of SD from ungrouped data) **:**

(১) প্রদত্ত স্কোরগুলির গাণিতিক গড় (Arithmetic mean) নির্ণয় করতে হবে।

(২) গাণিতিক গড় থেকে স্কোর সমূহের অন্তরগুলির অর্থাৎ 'd'গুলির বর্গ নির্ণয় করতে হবে।

(৩) ঐ বর্গগুলির যোগফলকে স্কোরগুলির মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে।

(৪) ঐ ভাগফলের বর্গমূল (square root) বার করলে, প্রাপ্ত বর্গমূলই হবে সমক পার্থক্য বা SD.

তাহলে স্কোরগুলি অসজ্জিত থাকলে SD নির্ণয় করার সূত্র হল—

$$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$$

উদাহরণ : এখন অশ্রেণীবদ্ধ কয়েকটি স্কোর নেওয়া যাক, 2, 4, 6, 8, 10, 12

প্রদত্ত স্কোরগুলির গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean) $=\frac{42}{6}=7$.

গাণিতিক গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের পার্থক্য = d

$d=-5,-3,-1,1,3,5$

$d^2=25,9,1,1,9,25$

N = স্কোরের মোট সংখ্যা = 6

বর্গগুলির যোগফল $[\Sigma d^2] = 25+9+1+1+9+25 = 70$

$$\therefore \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{70}{6}}$$

3·415

শ্রেণীবদ্ধ স্কোর থেকে সমক পার্থক্য বের করার নিয়ম (Calculation of SD from grouped data) :

রাশিগুলি যখন শ্রেণীবদ্ধ থাকে তখন সূত্র হল—

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sqrt{\Sigma f d^2}}{N}}$$

σ = SD বা সমক পার্থক্য, N = স্কোরের মোট সংখ্যা, f = পৌনঃপুন্য।

Σfd^2 = প্রতি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু ও গড়ের (Mean) অন্তর নির্ণয় করে, তার বর্গ করে তাকে f দিয়ে গুণ করে গুণফলগুলির যোগফল।

উদাহরণ :

No. 15 Table

Class-interval	X	f	d	fd	fd²
80 – 89	84 5	2	+30 85	61·70	1903 4450
70 – 79	74 5	11	+20 85	229 35	4781 9475
60 – 69	64 5	50	+10 85	542 50	5886 1258
50 – 59	54 5	70	+ 85	59 50	50 5750
40 – 49	44 5	43	+ 9 15	393 45	3000 0675
30 – 39	34 5	20	– 19 15	– 383 00	7334 4500
20 – 29	24 5	4	– 29·15	– 116 60	3398·89 0
		N = 200			26955 5008

$\therefore \quad \Sigma fd^2 = 26955\ 5008$

Mean = 53 65

$$\text{SD বা } \sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N}} = \sqrt{\frac{26955{\cdot}5008}{200}} = 11{\cdot}6 \text{ (approx)}$$

ব্যাখ্যা—এখানে প্রথম স্তম্ভ হল শ্রেণীবিভাগ, দ্বিতীয় স্তম্ভ হল X বা মধ্যবিন্দু, তৃতীয় স্তম্ভ হল f, চতুর্থ স্তম্ভ হল 'd' বা deviation অর্থাৎ গড় ও প্রতি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর অন্তর।

$$[\text{Mean} = \frac{\Sigma fx}{N} = 53{\cdot}65.]$$

পঞ্চম স্তম্ভ হল fd = গড় ও প্রতি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর অন্তরকে f দিয়ে গুণ করে তার গুণফল,

fd^2 = d এর বর্গ করে f দিয়ে গুণ।

Σfd^2 = পূর্বোক্ত fd^2 এর যোগফল।

N = মোট f এর সমষ্টি।

SD নির্ণয় করার সহজ উপায় :

দীর্ঘ পরিসংখ্যা বিভাজনের 'd' বা পার্থক্যগুলির বর্গ এত বড় হয় যে সেগুলি নিয়ে কাজ করতে খুব অসুবিধা দেখা দেয়। সে কারণে SD নির্ণয় করার একটা সহজ উপায় আছে।

সহজ উপায়ে SD নির্ণয় করার সূত্র হল--

$$\sigma = i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - c^2}$$

d' = কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর অন্তর।

$fd'^2 = d'$ এর বর্গ করে f দিয়ে গুণ।

$\Sigma fd'^2 = fd'^2$ এর যোগফল।

c^2 = কল্পিত গড়ের সংশোধনের বর্গ।

N = মোট স্কোর সংখ্যা।

i = শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি।

উদাহরণ :

No. 16 Table

Class-interval	X	f	d'	fd	fd'²
80 – 89	84·5	2	4	8	32
70 – 79	74·5	11	3	33	99
60 – 69	64·5	50	2	100	200
50 – 59	54·5	70	1	70	70
40 – 49	44·4	43	0	+ 211	0
30 – 39	34·4	20	– 1	0	20
20 – 29	24·4	4	– 2	– 20	16
				– 8	
		N = 200		– 28	437
				$\Sigma fd' = 183$	$\Sigma fd'^2 = 437$

$$C = \text{Correction} = \frac{\Sigma fd'}{N} = \frac{183}{200} = \cdot 91$$

$$= i = 10$$

$$\therefore \text{ SD বা } \sigma = i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - c^2}$$

$$= 10.\sqrt{\frac{437}{200} - (\cdot 91)^2}$$

$$= 10\cdot \sqrt{1\ 3519} = 11\cdot 6 \text{ (apporx)}$$

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বোক্ত পৌনঃপুন্য বিভাজনটির 40—49 শ্রেণীবিভাগের মধ্য বিন্দু 44·5-কে কল্পিত গড় বা Assumed Mean হিসেবে নেওয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে ২৩ পৃষ্ঠায় এই ছকেরই কল্পিত গড়নির্ণয় করা হয়েছে। কাজেই 20—29 এই শ্রেণীবিভাগের d' হচ্ছে $(24{\cdot}5-44{\cdot}5)\div 10=-2$। অনুরূপভাবে সব কটি d' নির্ণয় করা। তারপর fd নির্ণয় করা হল d'কে f দিয়ে গুণ করে। তারপর শেষ স্তম্ভে fd'^2 নির্ণয় করা হল d' গুলির বর্গ নির্ণয় করে এবং তাকে f দিয়ে গুণ করে। fd'^2-র যোগফল হল 437। এইবার কল্পিত গড়ের সংশোধন অর্থাৎ c নির্ণয় করতে হবে। এর সূত্র হল $\frac{\Sigma fd'}{N}$ অর্থাৎ fd' গুলি যোগ করে মোট f-সমষ্টি অর্থাৎ N দিয়ে ভাগ করা, c হল ·91 তারপর c-এর বর্গ করে নেওয়া হল।

অবশেষে $\sigma=i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N}-c^2}$ সূত্রটি প্রয়োগ করা হল। ফলাফল পূর্ব পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে।

৯। পার্সেণ্টাইল এবং পার্সেণ্টাইল মান (Percentiles and Percentile Ranks) ঃ

পার্সেণ্টাইল হল পৌণঃপুন্য বিভাজনের স্কোরের স্কেলের এমন একটি বিন্দু যার নীচে শতকরা কিছু স্কোর থাকে। আমরা ইতিপূর্বে Quartile সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে, মধ্যবিন্দু পরিসংখ্যা বিভাজনের স্কোরের স্কেলের সেই বিন্দু যার নীচে শতকরা 50 জনের স্কোর থাকে এবং Q_1 বা Q_3 হল তেমনের সেই বিন্দু যার নীচে যথাক্রমে 25% এবং 75% স্কোর থাকে। যে ভাবে মধ্যমমান এবং Quartile নির্ণয় করা হয়েছে অনুরূপভাবে আমরা পরিসংখ্যা বিভাজন স্কোরের স্কেলে এমন বিন্দু নিরূপণ করতে পারি যার নীচে 12%, 45%, 83% স্কোর থাকে। এই বিন্দুগুলিকেই পার্সেণ্টাইল (Percentile) বলা হয়। Pp এই প্রতীকের সাহায্যে এই বিন্দুগুলিকে প্রকাশ করা হয়। P বললে সেই বিন্দুটিকে বোঝাবে যার নীচে শতকরা কিছু স্কোর রয়েছে। P_{12}, P_{40}, P_{30} বললে যথাক্রমে সেই বিন্দুগুলিকে বোঝাবে যার নীচে বোঝাবে যার নীচে মোট স্কোরের 12%, 40%, 30% প্রভৃতি স্কোর আছে। Median বা মধ্যবিন্দুর নীচে যেহেতু 50% স্কোর থাকে, সেহেতু Median Percentile হিসেবে প্রকাশ করতে হলে P_{50} প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে প্রকাশ করতে হবে। অনুরূপভাবে Q_1 এবং Q_3-কে যথাক্রমে P_{25} এবং P_{75} চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করার পদ্ধতিটি Median নির্ণয় করার পদ্ধতির অনুরূপ।

সূত্র হল $Pp = l + \left(\frac{pN - F}{fp}\right) \times i$

নীচ থেকে উপরে গণনা করে Percentile নির্ণয় করার সূত্র :

এখন Pp = পরিসংখ্যা বিভাজনের যে শতকরাটি নিরূপণ করতে হবে—যথা, 20%, 30% বা 40% ইত্যাদি।

l = Pp যে শ্রেণীবিভাগে রয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগের ঠিক নিম্ন সীমাটি।

pN = Ppতে পৌছতে হলে মোট পরিসংখ্যানের (N) যে অংশটুকুর প্রয়োজন।

$F = i$ এর নীচে অবস্থিত f এর যোগফল।

fp = যে শ্রেণীবিভাগে Pp রয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগের পরিসংখ্যা (f)।

i = শ্রেণীবিভাগের ব্যাপ্তি।

No. 17 Table.

Class-interval	f	Cum. f
80—89	1	200
70—79	18	199
60—69	51	181
50—59	66	130
40—49	40	64
30—39	16	24
20—29	8	8
	N=200	

উদাহরণ: ধরা যাক পূর্বোক্ত পরিসংখ্যা বিভাজনের কয়েকটি পার্সেণ্টাইল নির্ণয় করতে চাই—70%, 40%, 30%।

ব্যাখ্যা : নীচে P_{70}, P_{40}, P_{30}, ও প্রভৃতির পার্সেণ্টাইল পূর্বোক্ত সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছে এবং তার ফলাফল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা P_{70}-র পার্সেণ্টাইল কিভাবে নির্ণয় করেছি তা বুঝে নিই।

এখানে Pp হচ্ছে P_{70}

এখানে pN হচ্ছে 70% *of* 200 = 140

140 পড়েছে 60 – 69 এই শ্রেণীবিভাগে, সুতরাং এই শ্রেণীবিভাগের নিম্নসীমা অর্থাৎ l হবে 59.4 ; F হচ্ছে l-এর নীচে অবস্থিত সমস্ত f-এর যোগফল, অর্থাৎ $(66+40+16+8)=130$.

fp হচ্ছে = 51 (যে শ্রেণীবিভাগে Pp পড়েছে তার f অর্থাৎ 60—69 শ্রেণীবিভাগের f-টি)। i হচ্ছে = 10

তাহলে এবার সূত্র প্রয়োগ করে—

$$Pp = l + \left(\frac{pN - F}{fp}\right) \times i$$

$$\therefore \quad P_{70} = 59{\cdot}5 + \left(\frac{140 - 130}{51}\right) \times 10$$

$$= 59{\cdot}5 + \left(\frac{10}{51}\right) \times 10$$

$$= 59{\cdot}5 + \frac{100}{51}$$

$$= 59{\cdot}5 + 1{\cdot}96 = 61{\cdot}46.$$

এইভাবে অন্যান্য পার্সেণ্টাইলগুলি বার করতে হবে।

[40% *of* 200 = 80] ; $P_{40} = 49{\cdot}5 + \left(\frac{80 - 64}{66}\right) \times 10$

$$= 51{\cdot}92.$$

[30% 200 = 60] ; $P_{30} = 39{\cdot}5 + \left(\frac{60 - 24}{40}\right) \times 10$

$$= 39{\cdot}5 + \frac{9}{10} \times 10$$

$$= 48{\cdot}5.$$

পার্সেণ্টাইল মান (Percentile Rank) : কোন পরিসংখ্যা বিভাজনের পার্সেণ্টাইল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। *Percentile* হল অবিচ্ছিন্ন স্কোর সারির মধ্যে এমন একটা বিন্দু যার নীচে *N*-এর শতকরা তত ভাগ আছে। এবার আমরা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (*Percentile Rank*) কাকে বলে এবং কিভাগে তা নির্ণয় করতে হবে আলো চনা করব।

শতের মধ্যে একটি ছাত্রের নম্বরের সঠিক স্থান (The position on a scale of 100 to which the subjects' score entiles him) হল *Percentile Rank* কোন বিশেষ ছাত্রের নম্বরের স্থান তখনই উপলব্ধ করা যায় যখন অন্যান্য ছাত্রদের নম্বরের মধ্যে তার স্থানটি কোথায় নিরূপণ করি। *Percentile Rank*-কে সংক্ষেপে *PR* বলা হয়।

Percentile-এর সঙ্গে *Percentile Rank*-এর পার্থক্য হল, *Percentile*-এর বেলায় মোট পরিসংখ্যান বা *N*-এর শতকরা হিসেব করে নম্বরটি নির্ণয় করতে হয়। (পূর্ব দৃষ্টান্তে P_{70} নির্ণয় করার সময় 70% *of* 200 (N) = 140 নির্ণয় করা হয়েছে)। তারপর পৌনঃপুন্য বিভাজনের মধ্যে সেই নম্বরটি খুঁজে বার করে যে বিন্দুতে পৌঁছই, সেই বিন্দুটি হল *Percentile*। কিন্তু *Percentile Rank* নির্ণয় করার পদ্ধতি ঠিক

এর বিপরীত। এখানে ব্যক্তিবিশেষের স্কোরটি দেওয়া থাকে। সেই স্কোরের নীচের স্কোরগুলির শতকরা হিসেব গণনা করতে হয়। যদি এই শতকরা হয় 65, তাহলে স্কোরটির *Percentile Pank* বা PR হবে শতে 65.

৩৭ পৃষ্ঠায় যে ছকটি দেওয়া হয়েছে (No 17 Table) তার থেকে 60 এবং 75 স্কোরের *PR* নিরূপণ করতে দেওয়া হল।

সূত্রটি হল —

$$PR=\frac{100}{N}\left[F+\left(\frac{X-L}{i}\right)\times f\right]$$

X = সেই স্কোরটি যার *Rank* নির্ণয় করতে হবে।

L = সেই শ্রেণীবিভাগের নিম্নসীমা যাতে স্কোরটি পড়েছে।

F = যে শ্রেণীবিভাগে স্কোরটি রয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগের নীচের সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য (cumulative frequency)।

f = যে শ্রেণীবিভাগে স্কোরটি পড়েছে তার frequency.

N = মোট পৌনঃপুন্যের যোগফল।

i = শ্রেণীবিভাগের ব্যপ্তি।

উপরিউক্ত সূত্র অনুসরণ করে 60 এবং 75 স্কোরের *PR* নির্ণয় করা যাক।

$$PR\ of\ 60=\frac{100}{200}\left\{130+\left(\frac{60-59\cdot5}{10}\right)\times51\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\left\{30+\frac{0\cdot5}{10}\times51\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\times132\cdot55=66\cdot275$$

$$PR\ of\ 75=\frac{100}{200}\left\{181+\left(\frac{75-69\ 5}{10}\right)\times18\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\left\{181+\frac{5\cdot5}{10}\times18\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\left\{181+9\cdot9\right\}$$

$$=\frac{100}{200}\times190\cdot9=95\cdot45$$

Percentile Rank **নির্ণয় করার নিয়ম—**

যখন পরীক্ষার্থীর স্কোর মানের ক্রমানুসারে সাজান থাকে তখন সূত্র হল—

$$PR=100-\left(\frac{100R-50}{N}\right)$$

এখানে *P* হল *Percentile,*

R হল *Rank*

N = মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

পরীক্ষার্থী	স্কোর	স্থান (R)
জগন্ময়	90	1
হিরণ্ময়	85	2
চিন্ময়	70	3
রণধীর	65	4
বীরেন	62	5
অলক	55	6
জীবন	50	7
অশোক	48	8
নগেন	40	9
পুলকেশ	31	10

এখন হিরণ্ময়ের *PR* হবে—

$$100-\frac{100\times 2-50}{10}$$

$$=100-\frac{150}{10}=85$$

বীরেনের *PR* হবে—

$$100-\frac{100\times 5-50}{10}$$

$$=100-45$$

$$=55$$

পুলকেশের *PR* হবে—

$$100-\frac{100\times 10-50}{10}$$

$$=100-95=5$$

১০। ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য রেখা ঃ

ক্রম-যৌগিক রেখা (Ogive বা Cumulative Frequency Curve) হল ক্রম-যৌগিক পৌনঃপুন্য বিভাজনের লেখচিত্র।

নীচের উদাহরণটির সাহায্যে ক্রম-যৌগিক পৌনঃপুন্য রেখা অঙ্কন করার প্রণালী বোঝান হল।

No 18 Table.

Class-interval	f	Cum. f.	Cum. percentage f
80—89	1	200	100
70—79	18	199	99 5
60—69	51	181	90·5
50—59	66	130	65
40—49	10	64	32
30—39	16	24	12
20—29	8	8	4

6 নং লেখ চিত্র—ক্রম-যৌগিক পৌনঃপুন্য রেখা বা Ogive
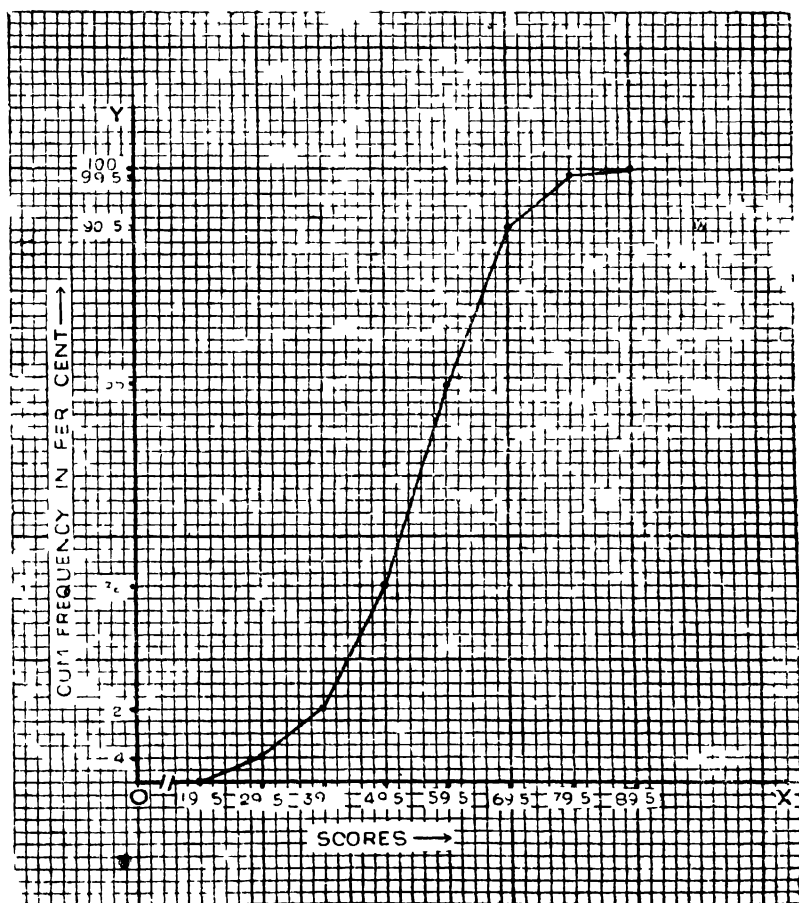
একটি গ্রাফ পেপারে OX অনুভূমিক রেখা এবং OY উলম্ব রেখা অঙ্কিত করা হল। OX বরাবর বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্যকে 2 একক হিসেবে গ্রহণ করে নম্বরগুলির উচ্চসীমাগুলি লেখা হল। গ্রাফটিকে সুদৃশ্য করার জন্য শেষ শ্রেণীবিভাগ হতে আর এক শ্রেণীবিভাগ পিছিয়ে সেই শ্রেণীবিভাগের উচ্চসীমা 19·5 লেখা হল। OY রেখা বরাবর Cumulative percentage frequency-গুলি বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুকে 2 একক ধরে নির্দিষ্ট স্থানে লেখা হল। OY উলম্ব রেখার দুটি বর্গক্ষেত্র শ্রেণীবিভাগের শতকরা 4· বিন্দু ও 10·5 OX রেখার প্রথম বিন্দু। এইরূপ (29·5,4, (36·5,12) (49·5, 32), (59·5,65), (69 5,90·5), (79·5,99 5), (8)·5, 100) স্থানাঙ্কবিশিষ্ট বিন্দুগুলি স্থাপন করলাম। গ্রাফটি সুদৃশ্য করার জন্য আমরা (19·5,0) স্থানাঙ্ক বিন্দু স্থাপন করলাম। 19·5 হল শেষ শ্রেণীবিভাগের অর্থাৎ নিম্নতম শ্রেণীবিভাগের উচ্চসীমা। তারপর প্রথম বিন্দু হতে আরম্ভ করে পর পর বিন্দুগুলি যোগ করলে Ogiveটি পাওয়া যাবে।

১১। পারম্পর্য বা সহগতি (Correlation) :

দুটি বস্তু বা গুণের সম্বন্ধকে পারম্পর্য বা সহগতি বলে। অনেক সময় দেখা যায়, দুটি বস্তু বা ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় যে একটির মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটলে অপরটির মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন, সরবরাহ বাড়লে দ্রব্য মূল্যের হ্রাস ঘটে, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত ঘটলে খাদ্যের উৎপাদন বেড়ে যায়। আবার শিশুদের উচ্চতা বাড়লে তাদের ওজন বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তির গুণের মধ্যেও এইরূপ সম্বন্ধ লক্ষ্য করি। যেমন কোন ব্যক্তির সঙ্গীতে দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা দেখা যায়। কোনও ছাত্রের ইতিহাসে দক্ষতা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় অনুরূপ দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সম্বন্ধ নিরূপণ করার প্রয়োজন আছে। যখন এই সম্বন্ধ পরিমাণগত তখন আমরা পরিসংখ্যানের সহপরিবর্তনের সাহায্যে তা নিরূপণ করার জন্য সচেষ্ট হই, তাহলে দেখা যাচ্ছে, যখন দুটি বা তার অধিক চলের (variables) পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা পরিসংখ্যানের সহপরিবর্তনের সহায়তা গ্রহণ করি।

পারম্পর্য বা সহগতি দুপ্রকারের হতে পারে—ধনাত্মক (positive) এবং ঋণাত্মক (negative)। চলের গতির উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। যদি একটি চলের হ্রাস বা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরটির মধ্যেও অনুরূপ হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে,

তাহলে দুটির সম্বন্ধের পারম্পর্য ধনাত্মক (positive) হবে। যদি কোন একটি চলের হ্রাস ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একটি চলের বৃদ্ধি ঘটে বা একটির বৃদ্ধিতে অপরটির মধ্যে হ্রাস লক্ষ্য করা যায় তাহলে দুটির সম্বন্ধের পারম্পর্য ঋণাত্মক (negative) হবে।

সহপরিবর্তনের মান বা r নির্ণয় :

সহপরিবর্তনের মানকে (Co-efficient of Correlation) সাধারণত: 'r' অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। 'r' নির্ণয় করার নির্ভরযোগ্য প্রচলিত পদ্ধতির নাম হল প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (Product Moment Method)।

১২। প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (Product Moment Method)।

এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পরীক্ষার্থীর প্রতিটি স্কোরের গড় পার্থক্য (Mean Deviation) নির্ণয় করতে হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর দুটি করে স্কোর থাকে, ফলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর দুটি করে গড় পার্থক্য x এবং y পাওয়া যায়। এরপর গড় পার্থক্য দুটিকে গুণ করে নিতে হয়, তাহলে xy পাওয়া যায়। তারপর xyগুলির মোট যোগফল Σxy নির্ণয় করতে হয়।

তারপর স্কোর শ্রেণী দুটির S. D. বার করতে হয়। যথা, σx এবং σy। তারপর দুটির গুণফল ($\sigma x \sigma y$) বার করে মোট সংখ্যা N দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে পাওয়া যায় $N\,\sigma\,x\,\sigma y$। তারপর Σxyকে $N\sigma x\sigma y$ দিয়ে ভাগ করলে স্কোর শ্রেণী দুটির r পাওয়া যায়। সুতরাং প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করার সূত্র হল—

$$r=\frac{\Sigma xy}{N\sigma x\sigma y}=\frac{\Sigma xy}{N:\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}}\ \frac{\sqrt{\Sigma y^2}}{N}}=\frac{\Sigma xy}{\sqrt{x^2}\sqrt{\Sigma y^2}}$$

উদাহরণ: 5 জন পরীক্ষার্থীর ইতিহাস ও ভূগোলের স্কোর নেওয়া হল। স্কোরগুলির সহগতির মান (Co-efficient ও Correlation) বা r কিভাবে নিরূপণ করতে হয় তা দেখান হচ্ছে।

No. 19 Table.

(1)	2)	(3)	(4)	(5)	(6		
পরীক্ষার্থী	ইতিহাসের স্কোর	ভূগোলের স্কোর	x	y	xy	x^2	y^2
রাম	25	32	6	5	30	36	25
যদু	18	24	−1	−3	−3	1	9
মধু	14	7	−5	−20	100	25	409
শ্যাম	22	30	3	3	9	9	
বিপিন	16	42	−3	15	−45	9	225
					$\Sigma xy=97$	80	668

ইতিহাসের স্কোর : 25, 18, 14, 22, 16. [মিন = 19]

মিন থেকে পার্থক্য (d) = 6, −1, −5, +3, −3

$$r = \frac{97}{\sqrt{80}\sqrt{668}} = \frac{97}{231{\cdot}17}$$

$$= 0{\cdot}42$$

১৩। সারিগত পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Method) :

প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (Product Moment Method) ছাড়াও সহগতির মান নির্ণয় করার আর একটি পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় সারিগত পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Method)। এই পদ্ধতিতে দুটি স্কোরের সারি কোরে স্কোর দুটির মধ্যকার পার্থক্য থেকে সহগতির মান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিটি খুব চলতি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সম্বন্ধ বার করার আর একটি নাম রো (ρ)।

এই পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পরীক্ষার্থীদের স্কোর অনুযায়ী সারিবিন্যাস করা হয়। আর সর্বোচ্চ স্কোরেব অধিকারী ব্যক্তির Rank হবে 1. তার নীচের স্কোরটির Rank হবে 2 ; যদি দুজন পরীক্ষার্থী একই স্কোর পায় তবে তাদের প্রত্যেককে পরের দুই সারির মধ্যবর্তী স্থানে বসান হয়। তারপর প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সারি দুটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। যেমন, কারও যদি প্রথম স্কোরের Rank হয় 4, দ্বিতীয় স্কোরের Rank হয় 2, তবে তার Rank Difference হবে 2. এই Rank Difference-কে D বলা হয়, D-এর যোগফল সব সময়ই শূন্য হবে। তারপর D-এর বর্গ করে নিতে হবে। এরপর D^2র যোগফল নির্ণয় করতে হবে।

ρ বার করার সূত্র হল :

$$\rho = 1 - \frac{6\Sigma D^2}{N(N^2-1)}$$

উদাহরণ : 12 জন বালকের ইতিহাস পরীক্ষার score ও ভূগোল পরীক্ষার score-এর সম্বন্ধ নির্ণয় করা হচ্ছে।

No. 20 Table

(1) বালক	(2) Score ইতিহাসের পরীক্ষা	(3) Score ভূগোলের পরীক্ষা	(4) ইতিহাস পরীক্ষার Score-R_1 এর সারি	(5) ভূগোল পরীক্ষার Score-R_2 এরসারি	(6) পার্থক্য (D) $=R_1 \sim R_2$	(7) পার্থক্যের বর্গ $(D)^2$
ক	7	8	12	11	1	1
খ	9	6	11	12	−1	1
গ	11	14	9	9	0	0
ঘ	13	13	7	10	−3	9
ঙ	15	23	6	1	5	25
চ	19	21	2	2	0	0
ছ	22	20	1	3	−2	4
জ	18	14·5	3	8	−5	25
ঝ	10	15	10	7	3	9
ঞ	12	16	8	6	2	4
ট	17	19	4	4	0	0
ঠ	16	18	5	5	0	0
N=12						$\Sigma D^2=78$

1নং স্তম্ভে বালকের সংখ্যা দেখান হয়েছে। 2নং স্তম্ভে ইতিহাস পরীক্ষার স্কোর। 3নং স্তম্ভে ভূগোল পরীক্ষার স্কোর। 'ছ' পেয়েছে সবচেয়ে বেশী স্কোর, 22 ইতিহাস পরীক্ষায়। সেকারণে ইতিহাস পরীক্ষার স্কোরের সারিতে তার Rank হল 1. 'চ' পেয়েছে 16 তাই, তার Rank হল 2. এইভাবে সকলের সারি করা হল। তারপর

$$\rho=1-\frac{6\times\Sigma D^2}{N(N^2-1)}=1-\frac{6\times78}{12(144-1)}$$
$$=1-\frac{468}{12\times143}=\frac{103}{143}=\cdot73 \text{ approx.}$$

ভূগোল পরীক্ষার স্কোর অনুযায়ী সারি করা হল। এখানে 'ঙ' পেয়েছে 23, কাজেই তার Rank হল 1, 'চ' পেয়েছে তার থেকে কম অর্থাৎ 21, কাজেই তার Rank হল 2; এইভাবে সকলের সারি করা হল। এবার দুই সারির পার্থক্য বা D বার করা হল। যেমন, ক-এর D হল $(12-11)=1$. খ-এর D হল $(11-12)=-1$ ইত্যাদি। Dগুলির মোট যোগফল O হয়েছে (6নং স্তম্ভে)। 7নং স্তম্ভে Dগুলির বর্গ করে সব বর্গগুলি যোগ করা হল। যোগফল বা ΣD^2 হল 78. এবার সূত্রটি প্রয়োগ করে স্কোরগুলির সহগতির রো বা ρ পাওয়া গেল ·73.

Raw Score and Foint Score :

পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর উপর বুদ্ধি-অভীক্ষা ও অন্যান্য মানসিক অভীক্ষাগুলিকে প্রয়োগ কোরে, পরীক্ষার ফলাফলকে সাংখ্যমানে প্রকাশ করেন। সাধারণতঃ একে

Raw Score বা কাঁচা নম্বর বলা হয়। এইসব কাঁচা নম্বর অর্থহীন, কারণ এই নম্বরের সহায়তায় কোন পরীক্ষার্থী মোটের উপর ভাল কি মন্দ বোঝা যায় না। তাছাড়া মানসিক অভীক্ষাগুলির সঙ্গে 'পাশ-ফেলের' কোন প্রশ্ন জড়িত নেই।

Point Score (পয়েন্ট স্কোর) হল 'Raw Score'-এর পরিচিত সংস্করণ। এই পয়েন্ট স্কোর নির্ণয় করার নিয়ম হল—ছাত্র যে যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে, সেই সেই প্রশ্নের জন্য প্রাপ্ত score-এর যোগফল নির্ণয় করা।

যখন কাঁচা স্কোরগুলিকে সাধারণ স্কোরে রূপান্তরিত করা হয় এবং যার দ্বারা অন্য পরীক্ষার্থীর সঙ্গে নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর তুলনা সম্ভব হয় তখন তাকে 'Derived score' বলা হয়। এই score তিন প্রকারের হতে পারে : (১) কোন শিশুর স্কোরের সঙ্গে বিভিন্ন বয়সের গড় শিশুর যোগ্যতার তুলনা। (২) কোন শিশুর স্কোরের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রেডের গড় শিশুর সমস্থার তুলনা। (৩) একই বয়সের বা গ্রেডের ছাত্রদের যোগ্যতার পারস্পরিক তুলনা। এই স্কোরগুলিকে বলা হয় Age Score, Grade Score এবং Scale Score। বুদ্ধিগত অভীক্ষার কোন স্কোরকে যেমন মানসিক বয়সে (MA) রূপান্তরিত করা যায়, তেমনি কোন শিক্ষা সংক্রান্ত অভীক্ষায় প্রাপ্ত Raw Score-কে শিক্ষাগত বয়সে (EA) রূপান্তরিত করা যায়। ১০ বছরের EA পাবার অর্থ হল দশ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীর গড় যোগ্যতা নিরূপণ করা।

Grade score কাকে বলে ? চতুর্থ grade-এর প্রারম্ভে শিক্ষার্থীর গড় কাঁচা নম্বরের সমান কোন শিশুর নম্বর হলে, শিশুটি 4·0 Grade score লাভ করবে। 'Scale Score'-এর বেলায় প্রদত্ত ছাত্রদের বয়স ও গ্রেডের বণ্টন থেকে Scale-টি পাওয়া যায়।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে কাঁচা নম্বরের সহায়তায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ঠিক পরিমাপ হয় না। অন্যান্য শিক্ষার্থীর কাঁচা নম্বরের সঙ্গে তুলনা করলে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। এ কারণেই Norm-এর প্রশ্ন এসে যায়। কোন একটি বিশেষ দল বা টাইপের প্রতিনিধি স্থানীয় সংখ্যামান হল Norm (Norm is a representative or Standard value of pattern for a group or type)। পরিসংখ্যানের দিক থেকে এটি Mean, Median বা Mode যে কোন একটিই হতে পারে—যাকে কোন একটা অভীক্ষার প্রতিনিধিস্থানীয় মানরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'Above the norm,' 'below the norm,' খুবই পরিচিত শব্দ। অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থীর স্কোর যদি বিশেষ শিক্ষার্থী-দলের প্রাপ্ত নম্বরের গড় থেকে কম হয় তাহলে 'below the norm' এবং যদি বেশি হয় তাহলে

'above the norm' কথাটির ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক, 10 বছরের শিক্ষার্থীর এ কটা প্রয়োগসিদ্ধ অভীক্ষা আমরা প্রস্তুত করতে চাই। ঐ বয়সের প্রতিনিধিস্থানীয় একদল ছেলেমেয়ের উপর ঐ অভীক্ষা প্রয়োগ করে দেখতে হবে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের গড় কত। দেখা গেল 10 বছরের ছেলেরা 20টির মধ্যে 10টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তাহলে এই Raw score-টি ঐ অভীক্ষার দশ বছরের Norm-এ পরিণত হবে।

Norm শিক্ষার্থীর উৎকর্ষের কোন পরিমাপ নয়। Norm হল তুলনা মূলক দক্ষতা বিচারের পরিমাপক। Norm-এর সাহায্যে গড় যোগ্যতার সঙ্গে কোন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতার তুলনা করা যেতে পারে। এই গড় যোগ্যতা খুব উঁচু বা নীচু বা মাঝামাঝি, norm থেকে তা কিছু বোঝা যায় না।

Standard Score (প্রমাণ স্কোর) :

কোন একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে যে নম্বর পেয়েছে তার তুলনা-মূলক বিচার কাঁচা নম্বর থেকে সম্ভব নয়। সকল বিষয়ে গড় নম্বরের সঙ্গে ঐ নম্বরের পার্থক্য নির্ধারণ করে তা বোঝা যেতে পারে। এখন কোন শিক্ষার্থী যদি দুটি বিষয়ে গড় নম্বর থেকে বেশি নম্বর পায়, তাহলে ঐ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোন্‌টিতে তার ব্যুৎপত্তি অধিক তা কিভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব? আবার দুটি প্রতিযোগী ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেল যে প্রথম ছাত্রটি দুই বিষয়ে এবং অন্য ছাত্রটি অপর তিন বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে নির্ভুল তুলনামূলক বিচার কিভাবে সম্ভব? এসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র Mean বা গড়ের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের ফলের মধ্যে কতখানি সামঞ্জস্য আছে তা নির্ধারণ করা যায় না। তখন প্রয়োজন হয় 'Standard Score' বা প্রমাণ স্কোরের।

প্রমাণ স্কোর বা 'Standard Score' কোন একটি বিশেষ ছাত্রের যোগ্যতাকে তার দলের অন্যান্য ছাত্রের যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে।

প্রমাণ স্কোর নির্ণয় করার নিয়ম হল প্রথম দলের শিক্ষার্থীদের স্কোরগুলির সমক পার্থক্য (Standard Deviation) নিরূপণ করা। তারপর দলের গড় নম্বরের সঙ্গে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর স্কোরের ব্যবধান নিরূপণ করতে হবে (চিহ্ন নিরপেক্ষভাবে নয়)। তারপর এই পার্থক্যকে সমক পার্থক্য দিয়ে ভাগ করলে প্রমাণ স্কোর পাওয়া যাবে।

সূত্র হল : Sigma Score $= \dfrac{M-S}{SD}$

অর্থাৎ প্রমাণ স্কোর $= \dfrac{\text{কাঁচা নম্বর} - \text{গড় নম্বর}}{\text{সমক পার্থক্য}}$

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে Standard স্কোর নিরূপণ করা কিছুটা জটিল ব্যাপার। সেই কারণে কাঁচা নম্বরকে Standard Score-এ পরিণত করার একটা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। একে বলা হয় T-স্কোর বা T-Scale। *W. A. Macall* এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। T-Scalc-এ গড়কে 50 ধরা হয় এবং সমক পার্থক্য 10 ধরা হয়। গড় সকল সময়ই 50, যদি কোন score গড় স্কোরের উপরে থাকে তাহলে স্কোরটি হবে, 50+10=60। আবার গড় থেকে নীচে থাকলে হবে 50−10=40. T-scale-এর সীমা 0 থেকে 100 পর্যন্ত। এর একক হল 1 এবং Mean 50. T-স্কোরের মাপকের বিভিন্ন অংশ সমান।

Rating Scale : আমেরিকার 'Council of Education এই স্কেলের উদ্ভাবন করেছেন। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের পরিমাণগত পরিমাপ এর দ্বারা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-সংলক্ষণের (traits of personality) বিচার করতে গিয়ে আমরা দেখি তার মাত্রার প্রশ্ন এসে যায়। যেমন, কোন ব্যক্তি অত্যধিক সামাজিক, মাঝামাঝি সামাজিক বা কম সামাজিক হতে পারে। কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর এক একটি বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত পরিমাপ নির্ধারণ করতে পারলে অপর শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাকে তুলনা করা যেতে পারে।

রেটিং স্কেল পদ্ধতিতে কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য স্কেলের ঠিক কোন্ পর্যায়ে তার গুণটি অবস্থিত সেটি পরিমাপ করা হয়। যেমন, 'অধ্যবসায়ী' এই বৈশিষ্ট্যটির রেটিং স্কেল এভাবে তৈরী করা যেতে পারে।
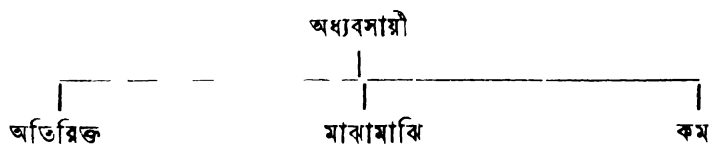
উপরিউক্ত দৃষ্টান্তটি একটি তিন মাত্রার স্কেলের দৃষ্টান্ত। তবে এই স্কেল তিন মাত্রার, পাঁচ মাত্রার, সাত মাত্রার বা কখনও দশ মাত্রারও হতে পারে।

কাঁচা নম্বরের সাহায্যে শিক্ষার্থীর উৎকর্ষের মাত্রা সম্পর্কে কোন ধারণা করা যায় না এবং অপরের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনাও সম্ভব হয় না, কিন্তু রেটিং স্কেলের সাহায্যে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে অপরের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

এই স্কেলের অসুবিধা হল পরীক্ষার্থী তার পরিচিত ব্যক্তির কোন গুণ পরিমাপ করতে গিয়ে স্কেলের একটা বিশেষ উপযোগী স্থানে তাকে বসিয়ে দিতে পারেন।

অনুশীলনী

1. What is the meaning of frequency distribution and how is it arranged from raw data ? Explain with illustration.

2. Tabulate the follwing 69 Scores into a frequency distribution using an interval of Seven. Begin the first interval with 0

22, 25, 15, 31, 13, 18, 40, 29, 20, 24, 26, 10, 25, 17,
41, 15, 24, 11, 48, 11, 18, 29, 27, 40, 26, 22, 36, 31,
22, 30, 22, 32, 24, 16, 26, 18, 36, 30, 21, 5, 7, 33,
26, 25, 31, 15, 25, 59, 4, 31 26, 16, 17, 34, 10, 14,
18, 13, 21, 24, 23, 36, 31, 42, 17, 8, 31, 14, 30.

3. Write short notes on : (a) Mean, (b) Median, (c) Mode, (d) **Mean** deviation, (e) Frequency Polygon, (f) Assumed Mean.

4. Compute the Mean, the Median and the Mode for the following frequency distribution.

Scores	*f*
43·50—44·50	2
44·75—45·75	1
46·0—47·0	3
47·25—48.25	6
48·50—49·50	17
49·75—50·75	27
51·0—52·0	52
52·25—53·25	24
53·50—54·50	25
54·75—55·75	8
56·0—57·0	4
57·25—58·25	1
	170

Ans. Mean = 51·58
Median = 51·572
Mode = 51·463

5. Find out the median from the scores.
16, 18, 12, 9, 30, 20, 25, 6, 10, 40. [Ans. 1'

6. Calculate mode from the following grouped scores.

Midpoint $(=X)$	*Frequency* $(=f)$	*d*	*fd*
15	1		
14	2		
13	3		
12	.6		
11	12		
10	15		
9	20		
8	33		
7	16		
6	2		
5	1		
4	2		
	N=110		

[**Ans.** 8·1

7. Calculate the Mean by the short Method from the following frequency distribution.

Class-interval	120 − 139	100 − 119	80 − 99	60 − 79	40 − 59
frequency	50	150	500	250	50

[Ans. 87·5

8. Draw a frequency polygon and a histogram from the following frequency distribution.

Class-interval	20 − 29	30 − 39	40 − 49	50 − 59	60 − 69	70 − 79	80 − 89
frequency	8	16	40	66	51	18	1

9. What do you mean by dispersion ? What is meant by Range ? Explain with suitable examples ?

10. What are the measures of variability or dispersion ? How would you determine Quartile Deviation ?

11. Find the quartile deviation from the following distribution.

Class-interval	*f*	*Cum. f*
120—139	50	1000
100—119	150	950
80—99	500	800
60—79	250	300
40—59	50	50

]Ans. 1·1

12. Find the (a) Quartile, (b) Mean deviation and (c) Standard deviation from the following distribution.

Class-interval (= *X*)	*f* (= *frequency*)
195—199	1
190—194	2
185—189	4
180—184	5
175—179	8
170—174	10
165—169	6
160—164	4
155—159	4
150—154	2
145—149	3
140—144	1
	N = 50

[Ans. Q = 8·28
MD = 10·04
SD = 12·63

13. Find the standard deviation from the following distribution.

Class-interval (= *x*)	25 − 29	30 − 34	35 − 39	40 − 44	45 − 49	50 − 54
Frequency (= *f*)	1	1	0	2	2	9

55 − 59	60 − 64	65 − 69	70 − 74	75 − 79
2	7	1	2	1

[Ans. $\sigma = 11·03$

14. Calculate the standard deviation by short method from the following distribution.

Class-interval $(=x)$	*Frequency* (f)
50—54	3
45—49	4
40—44	5
35—39	8
30—34	10
25—29	6
20—24	4
15—19	4
10—14	3
5—9	3

[Ans. SD = 12·05

15. Find the percentile ranks of the scores 80 and 95 from the following table.

Class-interval	*Frequency*	*Cumulative Frequency*
120—139	50	1000
100—119	150	950
80—99	500	800
60—79	250	300
40—59	50	50

16. Define correlation, coefficient of correlation and partial correlation and indicate their uses in educational measurement.

17. Compute the coefficient of corelation by the rank difference method between the two sets of scores given in the following table and comment on the result.

Student	*Marks in History*	*Marks in Mathametics*
A	52	48
B	38	40
C	35	50
D	42	36
E	50	42
F	54	38
G	60	58
H	46	44
I	25	42
J	32	48

18. Find the correlation between the two sets of scores given below using the Product Method and Rank Difference Method.

Subject	*Scores* (x)	*Scores* (x)
A	40	120
B	36	140
C	43	141
D	48	143
E	45	138
F	58	149
G	23	142
H	45	166

19. How do you distinguish between raw score and point score ? What is meant by a norm ? How is it calculated from raw scores ? How many kinds of norms are there ?

20. What is standard score ? How is it determined ? What is T-score ? What is its utility ?

21. What is a rating-scale ? Describe briefly the steps you would take in preparing a rating scale. What is its limitation ?

Q. 22. The following marks were obtained by 28 pupils in an arithmetic test.

18, 28, 26, 44, 52, 60, 52, 44, 40, 98, 88, 86, 84, 96, 86, 80, 74, 76, 72, 62, 66, 52, 44, 30, 84, 80, 82, 74. Draw a histogram of frequency distribution and calculate arithmetic mean and standard deviation of the scores. [C. U. 1963

Ans. এখানে কল্পিত গড় (A)=66 ধরা হল।

Scores X	Frequency f	fx	d' $=X-A$	fd'	fd'^2
18	1	18	−48	−48	2304
26	1	26	−40	−40	1600
28	1	28	−38	−38	1444
30	1	30	−36	−36	1296
40	1	40	−26	−26	676
44	3	132	−22	−66	1452
52	3	156	−14	−42	588
60	1	60	−6	−6	36
62	1	62	−4	−4	16
66	1	66	0	0	0
72	1	72	6	6	36
74	2	148	8	16	128
76	1	76	10	10	100
80	2	160	14	28	392
82	1	82	16	16	256
84	2	168	18	36	648
86	2	172	20	40	800
88	1	88	22	22	484
96	1	96	30	80	900
98	1	98	32	32	1024
	N=28	Σfx =1778		$\Sigma fd'$ =−70	$\Sigma fd'^2$ =14180

গাণিতিক গড় (Arithmetic mean) $=\frac{\Sigma fx}{N}=\frac{1778}{28}=63{\cdot}5$

সমক পার্থক্য (Standard deviation)=

$$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N}-\left(\frac{\Sigma fd'}{N}\right)^2}$$

$$=\sqrt{\frac{14180}{28}-\left(\frac{-70}{28}\right)^2}$$

$$=\sqrt{506{\cdot}4-6{\cdot}25}$$

$$=\sqrt{500{\cdot}15}$$

$=22{\cdot}37$ (approx)

Q. 23. The following marks were obtained by forty six students in an examination :

24, 25, 24, 25, 31, 22, 30, 24, 25, 27, 28, 29, 19, 28, 27, 25, 30, 31, 26, 30, 32, 30, 25, 32, 26, 24, 26, 29, 24, 17, 29, 29, 27, 30, 26, 25, 30, 28, 30, 26, 23, 20, 25, 15, 21.

Draw a histogram of frequency distribution and calculate arithmetic mean and standard deviation of the scores,

[C. U. 1964

Ans. এখানে কল্পিত গড় (A)=24 ধরা হল।

Scores x	frequency f	fx	d' = X − A	fd'	fd'²
15	1	15	−9	−9	81
17	1	17	−7	−7	49
19	1	19	−5	−5	25
20	1	20	−4	−4	16
21	1	21	−3	−3	9
22	1	22	−2	−2	4
23	1	23	−1	−1	1
24	5	120	0	0	0
25	7	175	1	7	7
26	5	130	2	10	20
27	3	81	3	9	27
28	3	84	4	12	48
29	4	116	5	20	100
30	7	210	6	42	252
31	2	62	7	14	98
32	3	64	8	16	128
	$N=46$	Σfx =1179		$\Sigma fd'$ =99	$\Sigma fd'^2$ =865

পাণিতিক গড় (Arithmetic mean) $=\frac{\Sigma fx}{N}=\frac{1179}{46}=25{\cdot}6$

সমক পার্থক্য (Standard deviation) $=\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N}=\left(\frac{\Sigma fd'}{N}\right)^2}$

$=\sqrt{\frac{865}{46}-\left(\frac{99}{46}\right)^2}$

$=\sqrt{14{\cdot}38}\quad 3{\cdot}79$ (approx)).

Q. 24. Find the mean, median and standard deviation from the following distribution of scores.

Scores	Frequency
21−25	3
16−20	7
11−15	16
6−10	12
1− 5	4

[C. U. 1968

Ans. এখানে কল্পিত গড় $(A) = 13$ ধরা হল।

Scores	Frequency f	mid-pt X	$X' = \frac{X-A}{5}$	fx'	fx'²
1−5	4	3	−2	−8	16
6−10	12	8	−1	−12	12
11−15	16	13	0	0	0
16−20	7	18	1	7	7
21−25	3	23	2	6	12
	N = 42			Σfx' = −7	Σfx'² = 47

এখানে স্কোরগুলিকে কম থেকে বেশীর দিকে সাজানো হ'য়েছে।

$$c = \text{Correction} = \frac{\Sigma fx'}{N} = \frac{-7}{42}$$

$$\text{গড় (mean)} = AM + ci = 13 + \frac{-7}{42} \times 5$$

$$= 13 - {\cdot}17 \times 5 = 12{\cdot}15 \text{ (approx)}$$

$$\text{মধ্যমমানের সূত্র} = l + \left(\frac{\frac{N}{2} - f}{f_m} \right)$$

এখানে $\frac{N}{2} = 21$ এবং প্রথম দুইটি frequency'র যোগফল = 16, উহা 21 হতে কম। প্রথম তিনটি frequency'র যোগফল = 32, উহা 21 হতে বেশী। ∴ মধ্যমান 11 − 15 বিভাগে থাকবে। উহার Limit 10·5 − 15·5

তাহলে —

$l = 10{\cdot}5,\ f = 16,\ f_m = 16,\ i = 5$

সূত্র প্রয়োগের দ্বারা আমরা পাই—

$$\text{মধ্যমমান (Median)} = 10{\cdot}5 + \frac{21-16}{16} \times 5$$

$$= 10{\cdot}5 + 1{\cdot}56 = 12{\cdot}06 \text{ (approx).}$$

সমক পার্থক্য (Standard deviation),

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fx'^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fx'}{N}\right)^2}$$

$$= 5\sqrt{\frac{47}{42} - \left(\frac{-7}{42}\right)^2}$$

$$= 5\sqrt{\frac{47 \times 42 - 49}{42^2}}$$

$$= \frac{5}{42} \times \sqrt{1925} = \frac{5}{42} \times 43.87 = 5{\cdot}22$$

$$= 5 \sqrt{27{\cdot}29}$$

$$= 26{\cdot}12 \text{ (approx)}$$

Q. 25. The following marks were obtained by fifty students in an examination.

31, 13, 20, 31, 30, 45, 38, 42, 30, 30, 30, 46, 56, 2, 41, 44, 18, 25, 44, 30, 19, 5, 41, 15, 9, 13, 7, 25, 12, 30, 6, 22, 24, 31, 15, 6, 39, 32, 21, 20, 42, 31, 19, 14, 23, 28, 17, 53, 2, 21.

Draw a histogram of frequency distribution. Calculate (a) median, (b) arithmetic mean and (c) standard deviatition of the scores. [C.U.1962

Ans. নম্বরগুলিকে মানের ক্রমানুসারে সাজালে দাঁড়ায়—

2, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 28, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 42, 44, 44, 44, 45, 46, 53.

মানের সংখ্যা 50. সুতরাং $\frac{1}{2}\times 50$তম এবং $\frac{1}{2}(50+2)$তম সংখ্যাদ্বয়ের গড় মধ্যমমান হবে। এখানে 25তম ও 25তম সংখ্যা হচ্ছে 25 ও 25. তাহলে—

মধ্যমমান $=\frac{1}{2}(25+25)=25$ (approx)

এখানে কল্পিত গড় (A) = 28 ধরা হল।

Scores ×	frequency f	$f\times$	$d'=\times - A'$	fd'	fd'^2
2	2	4	−26	−52	1352
5	1	5	−23	−23	529
6	2	12	−22	−44	968
7	1	7	−21	−21	441
9	1	9	−19	−19	361
12	1	12	−16	−16	256
13	2	26	−15	−30	450
14	1	14	−14	−14	196
15	2	30	−13	−26	388
17	1	17	−11	−11	121
18	1	18	−10	−10	100
19	2	38	−9	−18	162
20	2	40	−8	−16	128
21	2	42	−7	−14	98
22	1	22	−6	−6	36
23.	1	23	−5	−5	25
24	1	24	−4	−4	16
25	2	50	−3	−6	18
28	1	28	0	0	0
30	6	180	2	12	24
31	4	128	3	12	36
32	1	32	4	4	16
36	1	36	8	8	64
38	1	38	10	10	100
39	1	39	11	11	121
41	1	41	13	13	169
42	2	84	14	28	392
44	3	132	16	48	768
45	1	45	17	17	289
46	1	46	18	18	324
53	1	53	25	25	625
	N=50	Σfx =1271		Σfd' =−129	Σfd'² =8523

(b) গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean) $= \frac{\Sigma fx}{N} = \frac{1271}{50} = 25{\cdot}42$

সমক পার্থক্য (Standard deviation) :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - \left(\frac{\Sigma fd'}{N}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{8523}{50} - \left(\frac{-129}{50}\right)^2}$$

$$= \sqrt{170{\cdot}46 - 6{\cdot}66}$$

$$= \sqrt{163{\cdot}80} = 12{\cdot}79 \text{ (approx).}$$

Q. 26. In a spelling test, the following scores are obtained' Calculate the mean, median and mode, and add your comments.

15 10, 12, 0, 8, 4, 15, 14, 20, 18.

Ans. রাশিগুলোকে সাজানো হল,

0, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 15, 18, 20

এখানে কল্পিত গড় = 12 ধরা হল।

তাহা হইলে কল্পিত গড় হতে প্রদত্ত রাশিগুলির পার্থক্য যথাক্রমে

−12, −8, −4, −4, 0, 2, 3, 3, 6, 8

গড় (Mean) $= 12 + \frac{(-12-8-4-2+0+2+3+3+6+8)}{10}$

$$= 12 + \frac{-4}{10} = 12 - {\cdot}4 = 11{\cdot}6$$

মধ্যমমান বের করার নিয়ম :

প্রথম দিক থেকে $\frac{N}{2}$ ও $\frac{N}{2}+1$ রাশিদ্বয়ের গড় হচ্ছে মধ্যমমান। এখানে $\frac{N}{2} = \frac{10}{2} = 5$ তম ও $\frac{N}{5}+2 = 6$তম রাশিদ্বয়। 5তম ও 6তম রাশিদ্বয় হচ্ছে 12 ও 147 তাহলে মধ্যমমান $= \frac{12+14}{2} = 13.$

যেহেতু উপরের রাশিগুলিতে 15 অন্যান্য রাশির চেয়ে বেশীবার অর্থাৎ দুবার আছে. অতএব mode 15 হবে।

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency) পরিমাপের সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে। উপরে সেই তিনটি পদ্ধতির দ্বারা তিন রকম ফল পাওয়া গেল। সবচেয়ে নির্ভুল কেন্দ্রীয় প্রবণতা পাওয়া গেল Mean-এ।

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সমস্যাবলী

(Problems of Educational Psychology)

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একটি ফলিত (applied) বিজ্ঞান। এটিকে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের অন্যতম ব্যবহারিক দিক (practical aspect) বলে গণ্য করা হয়। এটি মানুষের আচরণ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসেবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বাস্তব পটভূমিতে আচরণ ও অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ঘটনা ও তথ্যগুলিকে প্রয়োগ করে।[1] শিক্ষার যে কোন পরিস্থিতি মূলতঃ শিখনের যে কোন অবস্থারই প্রকাশ। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান প্রধানতঃ মানুষ কিভাবে শেখে ও সেক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানের পথ নির্দেশ করে। ব্যক্তির বিকাশে শিখনের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাই শিখন-পরিস্থিতি উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান, ব্যক্তিত্ববিকাশের যথাযোগ্য সুযোগ দান, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের সমস্যা ও আলোচনা, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের সম্পর্ক ইত্যাদি নির্ণয় করার ব্যাপারে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা নিঃসন্দেহে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার যেমন সমস্যার অন্ত নেই, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেরও সমস্যার অন্ত নেই। এসব সমস্যার মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উল্লেখ করা হচ্ছে।

সমস্যাবলীর বিবরণ (Statement of Problems) :

(ক) সুসমন্বিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of balanced personality) : সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠন বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির মধ্যে প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও সামাজিক সংলক্ষণগুলোর পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক বিকাশ। শিশু তার জীবনে চলার পথে নানা বাঞ্ছিত, অবাঞ্ছিত, ভালো-মন্দ—সব রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতার ফললাভই তার বিকাশের পথে সহায়তা করে ; কিন্তু তার বিকাশের পথ যদি অবাঞ্ছিত গতি লাভ করে তাহলে তার ব্যক্তিত্ব গঠনে নানা ত্রুটি দেখা দেয়। ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে তার বিকাশের ধারা ব্যাহত হয়। তাই শিশুর সঙ্গতি স্থাপনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তার ব্যবহারের অসঙ্গতি বা অপসঙ্গতির দিকে সুতীক্ষ্ণ

1. Educational psychology utilizes those findings that deal specifically with the experiences and behaviours of human beings in educational situations—*Skinner.*

ও সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বৃহত্তর সমাজের পরিবেশের নানা ঘটনা শিশুর মনে দাগ কাটে; তার মধ্যে কোন্ প্রভাব তার পক্ষে শুভ, আর কোনটি অশুভ, সেটি বিচার করে নেবার দায়িত্ব শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীদের উপর ন্যস্ত। একথা মনে রাখা দরকার যে, অপসঙ্গত ব্যক্তিত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। শিশুর সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠনের সার্বিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধান একান্ত প্রয়োজন। তাই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুষ্ঠু সমাধানের উপর শিশুর ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভরশীল।

(খ) প্রেষণার ব্যবস্থাবিধি (Provisions of motivation): প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে সঙ্গতিবিধানের অসুবিধার মূল কারণ হল উপযুক্ত প্রেষণার অভাব। ব্যক্তির জীবনে প্রেষণার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। এর অভাব ব্যক্তির অগ্রগতি ও প্রগতি ব্যাহত করে। অনিচ্ছুক বা অনাগ্রহী ব্যক্তিকে দিয়ে কোন কাজ করানো সম্ভব নয়। প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শত চাবুক মেরেও অনিচ্ছুক ঘোড়াকে দৌড় করানো যায় না। তেমনি যে শিশুর মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রেষণার সঞ্চার হয়নি তাকে দিয়ে শিখনের কোন কাজ করানো নিতান্ত দুরূহ। প্রেষণার ব্যবস্থা-বিধির ক্ষেত্রে তাই নানা সমস্যা আমরা দেখতে পাই। শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার অবদান অসীম। শিশুর শিখনের ক্ষেত্রেও শিক্ষকের পক্ষে প্রয়োজনমত প্রেষণার সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। পরীক্ষণ ও অবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এটা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রশংসা, পুরস্কার কিংবা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে শিশুর শিখনের অগ্রগতিকে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ বাড়ানো গেছে। উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত বা প্রণোদিত হয়ে মনে যে গতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে প্রেষণা বলা হয়। উদ্দেশ্যকে লাভ করার প্রকৃষ্ট প্রেষণাই ব্যক্তির মনে তীব্র অনুভূতির সৃষ্টি করে। তার ফলে তার আচরণ হয় দৃঢ়বদ্ধ, অচঞ্চল।[1] পারিবেশিক ও সহজাত, দুরকমের প্রেষণাই শিশুর মনে ক্রিয়াশীল। শিক্ষা পরিবেশের মধ্যে তাই প্রেষণার উপযুক্ত ব্যবস্থাবিধির সুযোগ রাখতে হয়। বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের নির্বাচন, শিখন প্রসঙ্গে সব রকমের প্রচেষ্টা ও ক্রিয়াকলাপজনিত সমস্যা মূলতঃ প্রেষণার সমস্যা।

(গ) বোধশক্তির বৃদ্ধি (Increase in understanding): অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ বোধশক্তি জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রেষণার ক্ষেত্রেও এটি একটি সমস্যা বিশেষ। যে কোন অবস্থা, পরিস্থিতি ও ঘটনার সম্বন্ধে যদি ঠিকমত ধারণা

1. "Motivation then refers to conditions or states within the organism that cause persisting behaviour." — *Wenger et al.*

বা বোধ না জন্মায় তাহলে ব্যক্তির পক্ষে সেগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। বুদ্ধিকে অনেকে সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং শিখন প্রক্রিয়াকেও নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সমতাবিধানের উপায় বলে মনে করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই বোধশক্তির গুরুত্ব আছে। ঠিকমতভাবে এ শক্তিকে কাজে লাগাতে না পারলে জীবন পরিবেশে সঙ্গতিবিধান রীতিমত জটিল হয়ে দাঁড়ায়। শিশুর জীবনে এটা আরও গভীর ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। আজকাল নানা প্রগতিশীল শিক্ষাচিন্তায় ও পদ্ধতিতে শিশুর জানা পরিবেশ থেকে শিক্ষার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করার কথা স্বীকৃত হয়েছে। এর মূল কারণ হিসেবে বলা যায় যে অপরিচিত বা অল্প পরিচিত পরিবেশের মধ্যে পড়ে তার বোধশক্তি যেন খেইহারা না হয়। শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশের স্তরগুলির সঙ্গে সমতা রেখেই শিক্ষাসূচী পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বোধশক্তির সুষ্ঠু বিকাশ ও তার প্রত্যাশিত বৃদ্ধির সমস্যা তাই শিক্ষা-চিন্তাবিদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

(ঘ) **ব্যক্তিবৈষম্যের ক্ষেত্রে বংশধারা ও পরিবেশের গুরুত্ব** (Importance of heredity and environment in individual difference): শিশুর সার্বিক বিকাশে বংশধারা ও পরিবেশ উভয়ের সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় এ দুটির কোন একটিকেও অগ্রাহ্য করা যায় না। শিশুদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত যে বৈষম্য আছে তার জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা যায়। বংশধারা বাহিত প্রলক্ষণগুলিকে শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তন করা যায় কি না বা একই পরিবেশে প্রত্যেক শিশু তার আপন আপন সহজাত প্রলক্ষণগুলির বিকাশ ঘটাতে পারে কিনা—এটা আজ প্রতি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে। শিশুর বংশধারাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে শিক্ষার দ্বারা উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে গড়ে তোলা যায় কিনা আজ তার সম্ভাব্যতা ভেবে দেখার সময় এসেছে। এ সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধানের জন্যই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীরা তুলনামূলকভাবে উভয় উপাদানের প্রভাবের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস উল্লেখ করা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশধারাজনিত সমস্যাগুলিকে মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় করা হয়েছে। বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করে এবং মানসপ্রকৃতির স্বরূপ জানার মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রয়োজনমত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে বংশধারাজনিত সমস্যা-মূলক শিশুদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার বিকাশে ও প্রকাশে সাহায্য করা হচ্ছে। এ

সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীরা নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে গবেষণার আলোকে নানা তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন।

(ঙ) **প্রক্ষোভের সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রতিপালন** (Development of Emotions): আধুনিক শিক্ষার মূলকথা হল শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ আর এই বিকাশ সাধনের জন্য প্রক্ষোভের অপরিহার্য প্রভাব রয়েছে। মনের বিচিত্র প্রক্ষোভ মানুষের আচরণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা জানতে হলে সেই আচরণের পেছনে কোন্ কোন্ প্রক্ষোভ কাজ করছে তা জানতে হবে। আধুনিক শিক্ষায় শিশুর দৈহিক ও মানসিক উন্নতিসাধন স্বীকৃত এবং এ দুটোর সঙ্গে প্রক্ষোভ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রক্ষোভের সঙ্গে বুদ্ধিগত বিকাশেরও নিবিড় সম্পর্ক আছে। অবদমিত প্রক্ষোভ ও প্রক্ষোভজনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব অনেক সময় বুদ্ধিমান শিশুর শিক্ষাগত বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিত্ব সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রক্ষোভের প্রভাব অতি প্রবল। সুতরাং, শিক্ষা-পরিকল্পনা ও পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাক্ষোভিক দ্বন্দ্ব ও তার ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান একান্তভাবে কাম্য। কতকগুলি প্রক্ষোভ শিক্ষাসহায়ক হিসেবে কাজে লাগে তাই সেগুলির সুষ্ঠুবিকাশ, প্রতিপালন ও সমন্বয়সাধন করা প্রত্যেকটি শিক্ষকের কাজ। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের নানা গবেষণালব্ধ তথ্য শিক্ষককে জানতে হয়।

(চ) **বুদ্ধির ও সাফল্যের পরিমাপ** (Measurement of Intelligence and attainment): বুদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিখনের উৎকর্ষ ও দ্রুততা বুদ্ধির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রকার শিখনের সাফল্যের পেছনে বিভিন্নধর্মী মানসিক শক্তির প্রভাব আছে। তাই শিক্ষা দিতে গেলে প্রথমেই শিশুর বুদ্ধির পরিচয় নিতে হয়। বুদ্ধির পরিচয় পেতে নানা অভীক্ষা (Tests) প্রয়োগ করে শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ধারণ করতে হয়। তাই বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর বুদ্ধিগত বিকাশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ণয়ে বুদ্ধি পরিমাপের গুরুত্ব অনেক। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নানা ধরনের বুদ্ধি-অভীক্ষা সংগঠনে সাহায্য করেছে। উন্নত-ধী অথবা স্বল্প ধী-সম্পন্ন শিশুকে কিভাবে শেখাতে হবে, কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তার বৌদ্ধিক বিকাশ সম্ভব হবে এবং তার ক্ষমতানুযায়ী সাফল্য আসবে তার দিকে শিক্ষককে যত্নপর হতে হয়। পক্ষান্তরে প্রদত্ত শিক্ষা শিশু কি পরিমাণে ও কতটুকু গ্রহণ করতে পারল তার সাফল্যাঙ্ক নির্ণয় করার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। প্রচলিত গতানুগতিক পদ্ধতিতে এই পরিমাপ বা মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না দেখেই শিক্ষা-

মনোবিজ্ঞান আজ নানা ধরনের শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Tests) গঠন করেছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সাফল্য পরিমাপ করে শিক্ষা সূচক (Educational quotient) নির্ণয় করার নানা কৌশলও উদ্ভাবিত হয়েছে। বর্তমানে তাই শিক্ষার নানা সমস্যার সমাধানে শিক্ষ-মনোবিজ্ঞান পথ নির্দেশ করে চলেছে। শিক্ষা ও বৃত্তি উভয়বিধ নির্দেশনা বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

(ছ) **ব্যক্তিগত বৈষম্য** (Individual differences): ফলিত মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতিকে অপরিসীম মূল্য দান করে। কোন্ কোন্ দিকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ বা পার্থক্য আছে তা নির্ধারণ ক'রে মনোবিজ্ঞান নানা রকমের উপায়ের মাধ্যমে তার সীমা নির্দেশ করে দেয়। গতানুগতিক শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীর সামর্থ, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদির দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। বয়স্ক বা সমাজ পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিশুর নিজস্ব বিকাশের ধারা পূর্বোক্ত জিনিসগুলোকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাধারা শিশুকেন্দ্রিক। এই শিক্ষার সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেকটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশসাধন। সুতরাং ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিকে আজ কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। মনোবিজ্ঞান, বিশেষ করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আজ এসব বৈষম্যকে সামনে রেখে শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে। পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং পাঠক্রম নির্ণয়ে ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষককে এ নীতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেই আজ শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। বর্তমানের শিক্ষা সার্থক হবে তখনই যখন বৈষম্যনীতির যথোচিত মর্যাদা রক্ষিত হবে। আজ শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনে এ নীতিকে অন্যতম বিভাগ বলে মনে করা হয়েছে। বয়স, লিঙ্গ, বংশধারা শিখনক্ষমতা, নানা দক্ষতা, পরিবেশ, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি নানা দিক দিয়ে এই বৈষম্য পরিস্ফুট। শিক্ষককে এ সব জানতে হবে। শিশুর কল্যাণের জন্যে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যেই শিক্ষাকে উপযুক্ত পরিকল্পনার মধ্যে থাকতে হবে আর সেজন্যে এ নীতিকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে।

(জ) **শিখনের সমস্যাবলী ও সর্বাধিক প্রগতি** (Problems relating to learning and maximum progress in learning): শিখনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা এগিয়ে চলে। পুরানো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন আচরণদক্ষতা অর্জন

"Today we think of individual differences as including any measureable aspect of the total personality."—*Skinner*

করাকেই আমরা শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষা ও শিখনের মধ্যে তাই নিবিড় সম্পর্ক। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে ঠিকমত অভিযোজন করে চলার যোগ্যতা অর্জন করাই শিখনের মূল কথা। শিখনের মূলে তাই মানুষের প্রচেষ্টা, প্রেষণা ও পরিণমন সবই রয়ে গেছে। কিভাবে অভ্যাস বা আয়াস করলে, কি কি প্রেষণা থাকলে এবং কি ধরনের শিখন অনুশীলন করলে পরিণমন প্রভাবিত হবে—এ সবই শিক্ষার সমস্যা। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও ভূমিকা আছে। তাই শিখনের বিবিধ সমস্যাগুলি আলোচনা করা দরকার। প্রথমতঃ, জানা দরকার শিখনের প্রকৃতি কি হবে; দ্বিতীয়তঃ, শিখনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের সমস্যাকে কিভাবে দূর করা যাবে; তৃতীয়তঃ, কোন্ পদ্ধতিতে শিখন হলে তার ফল বাঞ্ছিত পথে এগিয়ে যাবে; চতুর্থতঃ, সামাজিক কোন্ কোন উপাদান শিখনের বা শিক্ষার্থীর মনে কতখানি প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া ঘটায়; পঞ্চমতঃ, শিক্ষার্থীর নিজের মধ্যে শিখন কতখানি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন নিয়ে আসে; ষষ্ঠতঃ, শিখনের প্রগতির হারকে কিভাবে পরিমাপ করা যায়; সপ্তমতঃ, শিখনের নানা পদ্ধতির তুলনামূলক সুবিধা ও গুরুত্ব এবং শিক্ষার্থীর ওপর সামাজিক প্রভাব জনিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞান সাধারণভাবে এবং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসব সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দান করেছে। কোথায় প্রতিযোগিতা, কোথায় সহযোগিতা, কোথায় অনুকরণ, কোথায় নিজস্ব সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে—এসবের অব্যর্থ সন্ধান দিয়েছে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। শিক্ষকের পক্ষে শিখনের তত্ত্ব, নীতি ও পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে জানা দরকার। শ্রম ও সময়ের অপব্যয় নিবারণ করে শিক্ষাকে কিভাবে ফলপ্রসূ করা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে সেটাই একটা মস্ত বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে শিক্ষা-মনোবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে যেতে হয়। তাই শিখনের সমস্যাবলীর সমাধান ও সর্বাধিক প্রগতির দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিতে হয়।

(ঝ) শিক্ষায় গণমন সম্বন্ধীয় সমস্যা (Problems of group mind): আধুনিককালে শিক্ষায় গণমনের লীলা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। দলগত ভাবে শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষে যখনই শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন গণমনের নানা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কিভাবে এই বিচিত্র ধারার সঙ্গে শিক্ষক পরিচিত হবেন, কোন্ পথে গিয়ে তিনি এই সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন, এবং প্রকাশ ভঙ্গীকে সাধারণভাবে সকলের কাজে লাগাতে পারবেন, তার জন্যে তাঁকে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের

সাহায্য নিতে হয়। ব্যক্তি ও দল যে পারস্পরিক সূত্রে প্রতিক্রিয়া সূত্রে বাঁধা তাকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন।

(এও) অন্যান্য বাস্তব সমস্যাবলী (Other practical problems): শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যেহেতু একটি ফলিত বিজ্ঞান, তাত্ত্বিক অপেক্ষা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অবদান অনেক বেশি। শিক্ষক তাই শিক্ষাদানের সময়ে অন্যান্য যে সমস্ত বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হন তার দিকেও নজর দেওয়া দরকার; বিশেষ করে শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে, বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়। তাছাড়া শিক্ষা-প্রক্রিয়া ও শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সব ব্যবহারিক ও মনোবৈজ্ঞানিক কারণ আছে তার যথার্থ অনুধাবনও নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। বর্তমান ব্যবস্থায় যখন শিক্ষার গণতান্ত্রিক ভিত্তিভূমি স্বীকৃত হয়েছে, শিক্ষায় গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে, তখন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেও সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। একদিকে বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞান, অন্যদিকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রসারিত এবং প্রভাবিত করেছে। সর্ববিধ সমস্যার সমাধানের দিকে গভীর দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। এর উপরেই ব্যক্তির, সমাজের ও বৃহত্তর পৃথিবীর নানা উন্নতি নির্ভর করছে। তাই আজ শিক্ষার নানা সমস্যার সমাধানে মনোবৈজ্ঞানিক নীতি প্রযুক্ত হচ্ছে এবং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে মর্যাদার আসন দাবি করছে।

সুতরাং আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষাবিজ্ঞান আজ পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ উন্নতি ও প্রগতির পথে। তাই উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, একরূপ অবিচ্ছেদ্যও বলা চলে।

প্রশ্নাবলী

1. Mention some of the educational problems that demand psychological study.

2. "Educational psychology utilizes those findings that deal specifically with the experiences and behaviour of human beings in Educational situations."—Discuss the statement.

3. What are the problems of Educational psychology? How, as a practical teacher, do you like to solve them?

দ্বিতীয় অধ্যায়

চাহিদা

(Needs)

মানুষকে জানার কৌতূহল এক সর্বজনীন প্রক্রিয়া। তাকে জানার প্রাথমিক পর্যায়ে আছে তার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করা। তার প্রকাশভঙ্গী, তার বাহ্যিক আচরণ—এসব না জানলে একজন মানুষকে ঠিকমত বোঝা যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের যে ব্যবহার বা আচরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি তার পেছনে কোন জিনিসের ক্রিয়া বা প্রভাব বা তাড়না আছে কি? একটু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি, মানুষ সচেতন প্রয়াসে যে কাজগুলি করে থাকে ত উদ্দেশ্যমুখী। উদ্দেশ্য সামনে থাকলে মানুষ মনে মনে একটা আলোড়ন অনুভব করে। এই আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মনের কোন একটা অভাববোধ থেকে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে সে তখন কতকগুলি আচরণ প্রকাশ করে। সেই আচরণগুলি কিছু পুরানো, কিছুবা নতুন। নতুন আচরণগুলির পেছনে যে জিনিস সবচেয়ে বেশি কাজ করে চলে তাহল তার চাহিদা। চাহিদার জন্ম হয় অভাববোধ থেকে। য নেই, বা পাওয়া যাচ্ছে না তাকে পাবার জন্যে মনে তীব্র আন্দোলন দেখা দেয় আর তার ফলই হচ্ছে নানা ধরনের আচরণ। চাহিদাই মানুষের সকল কাজের পেছনে অমিত এক প্রেষণা-শক্তি জুগিয়ে দেয়, তাই অনেকে চাহিদাকে মানুষের তথা সকল প্রাণীর আচরণের মূল উৎস (sources of animal behaviour) বলে মনে করে থাকেন। মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অন্যতম কাজ। তাই মনোবিজ্ঞানে এই চাহিদার এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

১। চাহিদার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Need—Definition and Nature):

চাহিদার মূল কথা হল একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি, যার পেছনে রয়েছে অভাববোধ আর সেই অভাব দূর করার একটা প্রচেষ্টা[1] সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এই অভাববোধ ও চাহিদা বর্তমান। তবে নিম্নপ্রাণীর জীবনে মৌলিক প্রয়োজন (basic needs) নিতান্তই জন্মগত। ক্ষুধার তৃপ্তি, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষাই তার মৌলিক প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও উন্নত প্রাণী।

1. "a condition mark‹d by the feeling of lack or want of something, or of requiring the performance of some action."—Dictionary of Psychology—J. Drever.

সভা মানুষের জীবনে তাই নানা চাহিদা রয়েছে। মানুষের মৌল প্রয়োজন এবং অন্য প্রাণীর মৌল প্রয়োজনের মধ্যে অনেক পার্থক্য থেকে গেছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এমন কি প্রাণীতে প্রাণীতে চাহিদা সম্পর্কিত নানা প্রভেদ রয়েছে। একজনের বিকাশধর্ম ও তার পরিবেশানুযায়ী চাহিদার পার্থক্য দেখা যায়।

আবার ক্রমবিকাশের ধারায় জীবনের জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদার ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতি অনুসারে মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদাকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—(১) মুখ্য (Primary) এবং (২) গৌণ (Secondary)। মুখ্য চাহিদগুলি অপূর্ণ থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না। তবে মুখ্য চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির পরেই মানুষের নানা গৌণ চাহিদা দেখা দেয়। যদিও এগুলির পরিতৃপ্তি মানবজীবনে অপরিহার্য নয় তবুও সভ্য ও উন্নত জীবনযাপনে এগুলি আজ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মানুষ আজ কেবল ক্ষুধার নিবৃত্তি করে বা আশ্রয় জোগাড় করে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় না—তার ইচ্ছা ভাল খেয়ে, ভালভাবে বাস করে বেঁচে থাকা। তাই বর্তমান সমাজে মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্যগুলি প্রায়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

২। চাহিদার প্রকারভেদ (Types of Needs):

মানুষের বিভিন্ন চাহিদা আলোচনা করে একদল মনোবিজ্ঞানী প্রধান প্রধান চাহিদাগুলিকে মূল দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি জৈবিক বা দৈহিক (organic needs), আর একটি মানসিক বা সামাজিক (Psychological or Sociological needs)। আবার অন্যদল এগুলিকে পৃথক দুভাগে ভাগ করে নাম দিয়েছেন—(১) সহজাত (Innate), এবং (২) শিক্ষালব্ধ (Learned)। এঁরা বলতে চেয়েছেন যে, নিছক দৈহিক প্রয়োজনগুলি সহজাত। আর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সংগে সংগে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত কতকগুলো শিক্ষালব্ধ বা অভিজ্ঞতালব্ধ চাহিদাও মানবজীবনে দেখা যায়। যেভাবেই মনোবিজ্ঞানীরা চাহিদাকে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে চান না কেন, এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনগুলি একে অপরের থেকে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না।

আমরা এবার মানুষের দৈহিক চাহিদার কতকগুলি উল্লেখ করব। কারণ, নবজাত শিশুর জীবনে এর প্রয়োজন সর্বাধিক। শিশুজীবনে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তি, মল মূত্রাদি নিষ্কাশন ও বিভিন্ন প্রকার গতিভঙ্গিমা সাধনের দ্বারা শারীরিক বৃদ্ধি, বিকাশ ও সুস্থতা বজায় রাখাই মূল চাহিদার

দৈহিক অথবা মুখ্য চাহিদা

পর্যায়ে পড়ে।[1] উডওয়ার্থ কেম্ফ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ও পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়াকে জৈবিক কাজ বলে বর্ণনা করে বলেছেন যে, এগুলি স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের সংগে সংযুক্ত এবং শৈশবকাল থেকে আমাদের নানা কাজে প্রবোচিত করে থাকে। তাপ, শৈত্য ও বর্ষণ থেকে দেহকে রক্ষা করতে হয় বলে মানুষের জীবনে আশ্রয়ের অভাববোধ সৃষ্টি হয়। আশ্রয় পেলে তার মনে সঙ্গলিপ্সা জেগে ওঠে। তখন সে সঙ্গীর খোঁজে প্রবৃত্ত হয়। আত্মরক্ষা বা বংশরক্ষা সঙ্গী ছাড়া ঘটতে পারে না।

দৈহিক চাহিদার পরিতৃপ্তির পর মানুষের কতকগুলি মানসিক বা সামাজিক চাহিদা দেখা দেয়। সেগুলিরও পরিতৃপ্তির প্রয়োজন আছে।

অবশ্য মানসিক চাহিদারও দৈহিক ভিত্তি লক্ষ্য করা যায়। আত্মস্বীকৃতির চাহিদা বা আত্মপ্রাধান্যের চাহিদা শিশুর মানসিক জগতের একটি প্রধান চাহিদা। সে চায় তার বাবা, মা তাকে ভালোবাসুক, বাড়িতে তার যথেষ্ট নিরাপত্তা থাকুক, নিজের কাজের জন্য সে সকলের কাছে মর্যাদা পাক, তার নিজের জিনিসপত্রগুলি তার সম্পূর্ণ অধিকারে থাকুক। সে যত বড় হতে থাকে ততই তার অহংবোধ তাকে নিজের সম্বন্ধে মর্যাদাসম্পন্ন ও সচেতন করে তোলে। সে বয়সে ছোট অথচ বড়দের মতো সব কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে, তাই বড়দের জিনিসপত্র পরিধান করে এবং সেগুলি ব্যবহার করতে চেয়ে বা নিজেকে বড় হিসেবে কল্পনা করে স্বীকৃত হতে চায়। তার কল্পনায় সে নিজেকে 'বাবার মতো বড়' বলে মনে করে। এই ভাব কিন্তু বয়সের সংগে সংগে সাধারণতঃ কমে যেতে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের ও স্বাধীনতার চাহিদার মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। অপরের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার জন্যে যে চাহিদা শিশুর মধ্যে জন্ম নেয়, পরিণত জীবনে ঐশ্বর্যলাভ, সম্মান অর্জন এবং বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে নেতৃত্ব লাভের মধ্যে দিয়ে তা চরিতার্থতা লাভ করতে চায়। তাই আত্মসম্মান বোধ ব্যক্তির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদাও এ বয়সে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নিজস্ব অধিকার বোধের যে মনোভাব শৈশবে জাগে তার উদ্‌গতি সাধিত হয়—দেশপ্রেমে ও সাংস্কৃতিক

মানসিক ও সামাজিক চাহিদা

1. 'The human body has inflexible demands It must have food, water and oxygen, it must maintain its own temperature within narrow limits I must eliminate waste products' it needs to eject products manufactured by sex organs".—Child Psychology.—*Skinner*

ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের প্রতি অনুরাগে। এজন্যে ঐটিকে অবিকৃতির চাহিদাও (Need of belongingness) বলা হয়েছে। এর পর আসে আত্মসক্রিয়তা বা ক্রিয়াশীলতার চাহিদা (Need of Self Activity or Achievement)। নিজে কিছু করার মধ্য দিয়ে একদিকে সে যেমন নির্মাণ কৌশলভিত্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করে তেমনি অন্যদিকে সৃজনীশক্তির প্রকাশের ব্যাকুলতা তার অভাববোধ জাগিয়ে তোলে। তাই পরিতৃপ্ত হলেই যে তার চাহিদা দূর হয় তা নয়, একটি চাহিদা পরিতৃপ্তির পর পুরাতনের স্থলে নতুন চাহিদা দেখা দেয়। তার নানা আচরণের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায়। নতুন নতুন দেশদেখা, জিনিষ সংগ্রহকরা, ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা—সবই নতুনত্বের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত।

৩। চাহিদার শিক্ষাগত মূল্য (Educational significance of Needs) :

চাহিদার পরিতৃপ্তি শিশুর জীবনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। তার আচরণের গতি-প্রকৃতিকে বাঞ্ছিত ও অনুমোদিত পর্যায়ে আনার জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে চাহিদাগুলির যথাযোগ্য মূল্যায়ন ও পরিতৃপ্তি হওয়া প্রয়োজন। যখন শিশুর চাহিদাগুলির বাঞ্ছিত ফল লাভ ঘটে না তখন সে নানা অদ্ভুত ও অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্য দিয়ে সেগুলিকে মেটাতে চায়। অনেক সময় তাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের সামনে সে সমস্যার সৃষ্টি করে। সমস্যামূলক আচরণ (Problem behaviour) মূলতঃ চাহিদার অতৃপ্তি থেকে জন্ম নেয়। এগুলিকে সে তার সঙ্গতিবিধানের অন্যতম উপায় (Adjustment Mechanism) বলে মনে করে। আজকাল আমরা অপসঙ্গত শিশু (maladjusted child) কথাটির উপর খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আসলে অপসঙ্গত শিশুর চাহিদা ও লক্ষ্যের মাঝখানে বিরাট ব্যবধান বা বাধার সৃষ্টি হয়। এই বাধা যাতে দূর করা যেতে পারে তার জন্য আমাদের সবিশেষ চেষ্টা করা দরকার। শিশুর দৈহিক চাহিদাগুলির পূর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য অভিভাবকদের সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে, কিন্তু শিশুর মানসিক বা সামাজিক চাহিদাপূরণের বিরাট দায়িত্ব বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর রয়েছে। তাই নানা কার্যকর পন্থা অবলম্বন করে সেগুলির যথাযথ মোকাবিলা করা দরকার। এমন কি দৈহিক চাহিদাপূরণের ব্যাপারেও প্রগতিশীল দেশগুলিতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যে সময় বিদ্যালয়ে খাবার, বিশ্রাম ও নিদ্রা লাভের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে শিশুর স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। আর সামাজিক ও মানসিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার জন্যে শিক্ষাকে চাহিদাকেন্দ্রিক (need centric) করে তোলা দরকার। বিদ্যালয় পরিবেশে

প্রত্যেকটি শিশুই আত্মস্বীকৃতি লাভের ও নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল হয়। স্বাভাবিক-ভাবে যদি সে পঠনপাঠনে উৎকর্ষ দেখাতে পারে তাহলে অতি সহজেই আত্মস্বীকৃতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি কোন কারণে তা ব্যাহত হয় তখন সে নানারকমের বিকল্প বা প্রতিকল্প কৌশলের আশ্রয় নেয়। শ্রেণীর বা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টায় সে প্রবৃত্ত হয়। শিশুর অতি সাধারণ কতকগুলি সমস্যামূলক আচরণ, যেমন—বিদ্যালয় থেকে পালানো, চুরি করা, মিথ্যাকথা বলা বা মারামারি করা এ পর্যায়ে পড়ে। শিশুকে তখন নানা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সংগঠন ও সম্পাদনের মধ্যে এনে আত্মস্বীকৃতির সুযোগ করে দিতে হবে। যতক্ষণ না তাকে এ বিষয়ে ঠিক পথে পরিচালনা করা যায় ততক্ষণ তার ঈপ্সিত আত্মস্বীকৃতি দেওয়া যায় না। সুষ্ঠু ও সুসমন্বিত ব্যক্তিসত্তা গঠনে চাহিদা-পরিতৃপ্তির ভূমিকার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নানা দলগত কর্মোদ্যোগের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে সুগঠিত করতে হবে। তার নিরাপত্তা যাতে আদৌ বিঘ্নিত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সে যেন মনে করতে পারে যে সমগ্র বিদ্যালয় পরিবেশের কোন-না-কোন কাজে তার কিছু-না-কিছু অবদান রয়েছে। তার সৃজনী প্রতিভার যাতে সম্যক্ বিকাশ ঘটে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সৃজনমূলক অভিজ্ঞতা ও নতুন কাজের উদ্যমের মধ্য দিয়ে তার সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষক মহাশয়দের মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি চাহিদাই শিশুর কাছে মূল্যবান। প্রত্যেক শ্রেণীর চাহিদা পরিতৃপ্তির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি বিদ্যালয়ের পক্ষে একান্ত কর্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবৃত্তি সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ

(Modern Viewpoints of Instincts)

প্রবৃত্তি সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব ও মতবাদ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। এবার আমরা একজন ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কনরাড লোরেঞ্জের (*Konrad Lorenz*) মতবাদ উল্লেখ করব। তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রাণীর আচরণের উপর গবেষণা করে প্রবৃত্তিজাত আচরণের কাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উল্লেখ করছি।

১। সহজাত আচরণের শ্রেণীবিন্যাস (Classification of Instinctive Actions)।

লোরেঞ্জ প্রাণীর সহজাত আচরণের শ্রেণীবিন্যাস করে তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন, যথা—(ক) রিফ্লেক্স (Reflex), (খ) ট্যাক্সিস (Taxis), (গ) প্রবৃত্তিজাত আচরণ (Instinctive Actions)।

রিফ্লেক্স

রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত হল বাহ্য উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপে স্বতঃক্রিয়ভাবে পেশী বা গ্রন্থীর দ্বারা সাধিত কাজ।[1] এটি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, সুতরাং এতে কল্পনা বা চিন্তার কোন অবকাশ থাকে না। এতে দুরকমের স্নায়ুতরঙ্গের সৃষ্টি হয়—(ক) সংবেদন (Sensory) এবং (খ) চেষ্টীয় (motor)। প্রথমটি অন্তর্মুখী এবং দ্বিতীয়টি বহির্মুখী। হাঁচি, পেশীসঙ্কোচন, লালাক্ষরণ ইত্যাদি এই ক্রিয়ার উদাহরণ।

ট্যাক্সিস

ট্যাক্সিস বা অভিমুখী ক্রিয়া হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের জন্য প্রাণীর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া অস্তিবাচক ও নঞর্থক দুই-ই হতে পারে। এতে যে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে তার বিশেষ আচরণ প্রকাশ পায় এবং গতির নির্দেশও পাওয়া যায়।[2] প্রদীপের আলোর দিকে পতঙ্গের ছুটে যাওয়া কিংবা নতুন জলের স্রোতের মুখে মাছের সাঁতার

1. 'the direct and immediate response of an effector (muscle or gland) or group of effectors, to the stimulation of a receptor (sense organ); sometimes employed loosely of any apparently mechanical or automatic response to a stimulus, or even to an object.'—Dictionary of Psychology.

2. 'an orienting response of organiser to physical forces, having direction.'

কেটে যাওয়া ইত্যাদি এই জাতীয় ক্রিয়ার উদাহরণ। এ ক্রিয়াগুলো উদ্দীপকজাত ও নিয়ন্ত্রিত।

প্রবৃত্তিজাত আচরণ এদের থেকে অনেক দিক দিয়ে আলাদা একই রিফ্লেক্স বা ট্যাক্সিস বহু বিভিন্ন প্রাণিজাতির মধ্যে থাকতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াও একই ধরনের হতে পারে ; কিন্তু একই প্রবৃত্তিজাত আচরণ দুটি ভিন্ন জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না। প্রবৃত্তিজাত আচরণের পার্থক্য দেখে প্রাণীজাতির শ্রেণীবিভাগ করা লোরেঞ্জের মতে অনেক সহজ ও প্রায় নির্ভুল। এ বিষয়ে তিনি নিজে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিস উদ্দীপকজাত ও নিয়ন্ত্রিত। যতক্ষণ উদ্দীপক উপস্থিত থাকে ততক্ষণ এ দুটি প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে এরাও অদৃশ্য হয় কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দীপকজাত হলেও নিয়ন্ত্রিত নয়। প্রবৃত্তিজাত আচরণ একবার ঘটতে আরম্ভ করলে উদ্দীপক থাকুক বা না থাকুক পরপর অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে তা ঘটে যেতে থাকবে। এজন্যে অনেকে প্রবৃত্তিজাত আচরণের সঙ্গে যন্ত্র চালাবার জন্যে কলটেপা প্রক্রিয়ার তুলনা করেছেন। নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে লোরেঞ্জ প্রমাণ করেছেন যে উদ্দীপক-নিরপেক্ষ শূন্য-সক্রিয়তার (Vacuum Activity) মাধ্যমে প্রবৃত্তিজাত আচরণ সম্পাদিত হতে পারে।

প্রবৃত্তিজাত আচরণ

প্রবৃত্তিজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে কোন আচরণ সম্পাদিত হওয়ার আগেই প্রাণীর মধ্যে বিশেষ প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে প্রতিক্রিয়ামূলক এক ধরনের বিশেষ শক্তি সঞ্চিত হয়। যতক্ষণ না উদ্দীপকের সামনে প্রাণী আসে এবং আচরণ সম্পাদিত হয় ততক্ষণ এই শক্তি সঞ্চিত থাকে। এর ফলে প্রাণীর মধ্যে একটা চাপা-উত্তেজনা (Tension) থাকে এবং প্রাণীর উদ্দীপক বিচার করার অনুভূতি ক্রমশঃ কমে আসে। অবশেষে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে উপযুক্ত উদ্দীপক ছাড়াই যে কোন উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে উত্তেজনার তীব্রতা ও তার দমনের আকাঙ্ক্ষাই প্রাণীকে সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত ও সক্রিয় করে তোলে। লোরেঞ্জের মতে উপযুক্ত উদ্দীপক লক্ষ্যের কাজ করে এবং কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য প্রাণী মানসিক তাড়নার বশবর্তী হয়ে সক্রিয় আচরণের জন্য সচেষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তি ও উত্তেজনা সব থেকে বেশি কাজ করে বা প্রাণীকে উদ্দীপিত করে। লোরেঞ্জের 'প্রবৃত্তি—প্রচেষ্টা—লক্ষ্য' এই

উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া

পারম্পর্য সংক্রান্ত মতবাদ প্রাচীন মতবাদগুলি থেকে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। তাই আমরা লোরেঞ্জের মতবাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করছি।

২। লোরেঞ্জের মতবাদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Lorenz s Theory of Instinct) :

(ক) আধুনিক মতবাদে রিফ্লেক্স বা ট্যাক্সিস জাতীয় অন্যান্য সহজাত আচরণের সংগে প্রবৃত্তিজাত আচরণের একটা সুনির্দিষ্ট ও পরিমাণগত পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

(খ) এটি বহুলাংশে বিজ্ঞানভিত্তিক ও নির্ভরযোগ্য কারণ, এখানে প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে মতবাদটি গঠন করা হয়েছে।

(গ) প্রবৃত্তিজাত আচরণ যে শিক্ষাপ্রসূতও হতে পারে এবং এটা যে নিছক অশিক্ষিত-পটুত্ব নয় সে বিষয়েও লোরেঞ্জ যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তিনি রিফ্লেক্স, ট্যাক্সিস ও প্রবৃত্তিজাত আচরণের পারস্পরিক পার্থক্য নির্দেশ করে প্রাণী-আচরণের নিখুঁত, সুচিন্তিত ও যথাযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

(ঘ) মানুষের আচরণকে তিনি নিছক অন্ধ যান্ত্রিক প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলে ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতবাদের সূত্র ধরে আমরা দেখি যে, সত্যকার প্রবৃত্তিজাত আচরণ মানুষের মতো উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে খুবই কম। মানুষের আচরণ অনেক জটিল, বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল। সুতরাং প্রাচীনপন্থীরা যেভাবে প্রবৃত্তিজাত আচরণের ব্যাখ্যা করেছেন তা অনেকখানি অনুমান ও কল্পনাভিত্তিক।

লোরেঞ্জের মতবাদের মূল্যায়ন : লোরেঞ্জের মতকে আধুনিক বলবার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, এই মতবাদ প্রবৃত্তির স্বরূপ সম্পর্কে দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতাকে অপসারিত করেছে। দ্বিতীয়তঃ, এটিতে প্রবৃত্তিকে শিক্ষা নিরপেক্ষ শক্তি বলে মনে করা হয়নি। তৃতীয়তঃ, এটি দীর্ঘ গবেষণালব্ধ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। চতুর্থতঃ, মানব-আচরণের পরিবর্তনশীলতা, প্রেষণাকেন্দ্রিকতা ইত্যাদিও এ মতবাদে যথোপযুক্তভাবে স্বীকৃত।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিন্যাস

(Attitudes)

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তনসাধন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখি যে পূর্বতন ও আধুনিক কালের শিক্ষাবিদ্‌রা ব্যক্তির মধ্যে বিশেষ এক ধরনের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রতিন্যাস গড়ে তোলার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তিজীবনে দৃষ্টিভঙ্গি অথবা প্রতিন্যাসের মূল্য অপরিসীম। বিশেষ করে মানুষের সামাজিক ও নাগরিক জীবনে এর প্রভাব প্রভূত পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। 'প্রতিন্যাস' শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য আছে। অথচ এটির যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করতে না পারলে শিক্ষক বা শিক্ষাব্রতী হিসেবে আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা। তাই সর্বাগ্রে আমরা প্রতিন্যাসের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করব। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষয়টি আলোচনা করছি :

১। প্রতিন্যাসের প্রকাশভঙ্গি (Expression of attitudes):

একই শ্রেণীর দুটি ছাত্র কোন একটি বিষয়কে কিভাবে দেখে তাই আমরা এখানে বিচার করার চেষ্টা করব : সুধীর আর শৈবাল দুজনেই এবারের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছে। সুধীর অত্যন্ত পড়ুয়া ছেলে। সারা 'বছর যথেষ্ট পরিশ্রম করে বিভিন্ন বিষয়ের পড়া তৈরি করেছে। সে ভাবছে, পরীক্ষার আর তো বেশি দেরি নেই, মাত্র তিনটি মাস। তারপরই তাকে তার যোগ্যতার পরিচয় রাখতে হবে। মনে মনে তার কেবলই চিন্তা যদি উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ না ঘটে, তবে? তাহলে?—তাই 'পরীক্ষা' সম্বন্ধে সে স্বভাবতই খুবই চিন্তিত। এদিকে শৈবাল পড়াশোনায় মোটামুটি যোগ্যতার পরিচয় রাখে, কিন্তু খেলাধূলায় দারুণ উৎসাহী। তার ভাবনা, যাক এখনও তো তিন মাস বাকি। ক্রিকেট মরশুমটা পার করে দিয়ে বই পত্তর নিয়ে আদা জল খেয়ে লাগা যাবে। 'মাত্র তিনমাস' আর 'এখনও তো তিন মাস'। এই দুরকমের অনুভূতি বা ভাবপ্রকাশ থেকে সুধীর ও শৈবালের 'পরীক্ষা' সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রতিন্যাস ফুটে উঠেছে। তেমনি একই বিদ্যালয়ের আশাবাদী ও নিরাশাবাদী দুজন শিক্ষকের একদিনের কথোপকথনের খানিকটা উল্লেখ করা যাচ্ছে : মৃণালবাবু প্রবীরবাবুকে আক্ষেপ করে বলছেন—"দিনে দিনে হল কি দেখছেন, ছাত্ররা আর আগের মতো আমাদের সম্মান

করে না, কেমন একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে। ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ঘর থেকে বারান্দায় এসে নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করে চলে। আপনি পাশ দিয়ে যান, দেখবেন শ্রদ্ধা করার একটু ইচ্ছেও নেই। অথচ আমাদের সময় কোন শিক্ষকমশায়কে দেখলে আমরা ভয়ে জড়সড় হতাম। শুধু তাই নয়, দু'টা ঘণ্টার মাঝখানে বারান্দায় বের হওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। শৃঙ্খলাবোধ এদের একটুও নেই।"

প্রবীরবাবু ধৈর্যধরে সব শুনে বললেন, "মৃণালবাবু দিন তো বদলাচ্ছে শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণাও তো পাল্টাচ্ছে। গুরুতর কিছু না ঘটলে এসব ঘটনাগুলোকে শৃঙ্খলা-হীনতা না মনে করাই উচিত। আমার তো মনে হয় ওদের ওসব আচরণের উপর আদৌ গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। যত আপনি গুরুত্ব দেবেন ততই পেয়ে বসবে। একটু স্বাধীনতা দিলে বোধ হয় বিদ্যালয়ের গুরুতর শৃঙ্খলহানি ঘটবে না। শৃঙ্খলাটা আর যাই হোক শৃঙ্খল তো নয়।" উপরের কথোপকথনের মাধ্যমে দুজন শিক্ষকের 'শৃঙ্খলা' সম্বন্ধে প্রতিন্যাসের পরিচয় উপস্থাপিত করা হল।

২। প্রতিন্যাসের সংজ্ঞা (Definition of attitudes) :

প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিন্যাস বলতে কি বোঝায়? এক কথায় বলা যেতে পারে, প্রতিন্যাস হল একটা মানসিক অবস্থা। কোনো একটা বস্তু ব্যক্তি, ঘটনা বা ভাবধারার প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাবার ধরণ, পন্থা বা প্রস্তুতিকে এককভাবে বা সামগ্রিকভাবে আমরা প্রতিন্যাস বলে অভিহিত করতে পারি। কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রতিষ্ঠান, মতবাদ—এ সবের প্রতি আমরা কোনো সময় উদার হতে পারি, আবার কোন সময় অনুদার হতে পারি, কখনও কাউকে শ্রেয়ঃ বলে মনে করি আবার কখনও বা তাকে হেয় জ্ঞান করতে পারি। কেউ আমাদের কাছে হতে পারে গ্রহণীয়, কেউ বা বর্জনীয়। একই সময়ে কিন্তু একই জিনিস আমাদের কাছে দুরকম দৃষ্টিভঙ্গীতে উপস্থিত হয় না। এরূপ নির্দিষ্ট ভাবে কোনো জিনিসের প্রতি আমরা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে থাকি তা হল প্রতিন্যাসের অবদান বা এটি প্রতিন্যাস ঘটিত প্রক্রিয়া।

৩। প্রতিন্যাসের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য (Characteristics of attitudes) :

প্রতিন্যাস অস্ত্যর্থক ও নঞর্থক দুই-ই হতে পারে। আমাদের মনের বিভিন্ন অনুভূতির রঙে এটিকে রাঙানো হয়। যখন কোনো জিনিস প্রত্যক্ষ করি বা অনুভব করি তখনকার মানসিক প্রক্ষোভগুলি, যথা—দুঃখ, বেদনা, আনন্দ ভয়, ক্রোধ—সব কিছুর উপর ভিত্তি করে যে পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগ, আগ্রহ, ঔৎসুক্য অভিমত,

কোন-কিছু ব্যক্ত করার প্রবণতা, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন ইত্যাদি গড়ে ওঠে তাকে ব্যাপক অর্থে প্রতিন্যাস বলতে পারি।

প্রতিন্যাসকে প্রকৃতি অনুসারে বা অভিব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে : যথা—

অনুকূল — প্রতিকূল	সাধারণ — নির্দিষ্ট
ইতিবাচক— নেতিবাচক	অস্থায়ী বা — স্থায়ী ইত্যাদি
সচেতন — অচেতন	সাময়িক

পরিবর্তনশীলতা এর একটা মস্ত বড় ধর্ম। ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক ও ভাব জগতে এটিকে প্রেরণা, প্রক্ষোভ, প্রত্যক্ষণ ও জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার মোটামুটি স্থায়ী সংগঠিত রূপ বলে বলা যায়।*

ব্যক্তির জীবন-অভিজ্ঞতা, তার অর্জিত বা অনর্জিত আগ্রহ, প্রবণতা, অনুরাগ, নীতি-চেতনা, মূল্যবোধ, ধ্যান, ধারণা প্রতিটিই তার প্রতিন্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে নিজস্ব ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিস্থিতি ও সমকালীন মানসিকতার অবদানকেও এই প্রসঙ্গে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। বিশেষ করে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় ও চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রেই আমাদের প্রতিন্যাসগুলির সম্যক্ প্রতিফলন ঘটে থাকে। তাই ব্যক্তির জীবনের সীমা যতই বিস্তৃত হয়, তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয়, পরিচয়ের গণ্ডী যত ব্যাপক হয়, আবেষ্টনী ব পরিবেশ যত জটিল ও বহুমুখী হয়—প্রতিন্যাসের ক্রিয়া ততই বিচিত্রতররূপে অভিব্যক্ত হয়। ব্যক্তি যখনই ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বৃহৎ অঙ্গনে তার পদ চারণা শুরু করে তখনই তার প্রতিন্যাসগুলি দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে। তাই আমরা প্রতিন্যাসকে ব্যক্তিত্বের (Personality) অন্যতম সংলক্ষণ (trait) হিসেবে মনে করি। ব্যক্তির আচরণের প্রকাশ, ব্যক্তির চরিত্র গঠনের—সর্বোপরি তার ব্যক্তিত্ব সংগঠনে প্রতিন্যাস অন্যতম নির্ধারক বা নির্দেশক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।*

৪। প্রতিন্যাস কিভাবে গঠিত হয় (How attitudes develop):

প্রতিন্যাস বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—প্রেষণা, সংপ্রত্যক্ষ, প্রক্ষোভ বা অভিজ্ঞতা প্রতিন্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একটা সহজ উদাহরণ উল্লেখ করে বলা যায় যে, "ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়"। কিংবা "পুড়ে যাওয়া ছেলে আগুন দেখলে শিউরে ওঠে"। অনেক সময় দেখা যায়, একই বস্তু ব্যক্তি মানসে একাধিক প্রক্ষোভের সৃষ্টি করে। একটি ছোট ছেলে ব্যাঙ দেখলে ঘৃণা করে। এই ঘৃণা করার মধ্যে একদিকে ভয় আছে আবার আর একদিকে আছে বিরক্তি। বাবাকে বা শিক্ষকমশায়কে দেখে ছেলের বা ছাত্রের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগে। এই শ্রদ্ধার মধ্যে ভয় সম্মান ও বিস্ময় এই অনুভূতিগুলির সংমিশ্রণ রয়েছে। এই মিশ্রানুভূতি প্রতিন্যাসের ভিত্তিস্বরূপ। প্রতিন্যাস রসের (Sentiment) জন্ম দেয়। স্থান, কাল, পাত্র ও বয়স ভেদে প্রতিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে। এমন কি একই লোকের মধ্যে অভিজ্ঞতার পরিপক্কতার ফলে এই পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ব্যক্তির প্রতিন্যাসও বিশেষ করে যা সামাজিক ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয় তা গড়ে ওঠে অপরে তার সম্বন্ধে কোন দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে তার বাস্তব বা কল্পিত ধারণার উপরে। তাই একই ব্যক্তিকে সমাজ পরিবেশে কখনও সক্রিয় 'কর্তা' Subject) আবার কখনও বা নিষ্ক্রিয় কর্ম (Object) হিসেবে দেখা যায়। তাই বর্তমানে শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ বিজ্ঞানে 'প্রতিন্যাস গঠন' এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রতিন্যাস গঠনে আমাদের বুদ্ধি, প্রত্যক্ষণ ক্ষমতা, যুক্তি, শিখন ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিন্যাস অর্জিত হয় পুনরাবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার নতুন সংযোজনার ফলে। সুপরিকল্পিত শিক্ষা, অনুকূল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সামাজিক সঙ্গতি বিধান ইত্যাদির ফলে এটি সুগঠিত হয়। কুশলী প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই প্রচার বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে চালানো হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—নাৎসী জার্মানীর প্রচারবিদ্ গোয়েবেলস তাঁর প্রচার দক্ষতায় নানা বীভৎস ক্রিয়া কলাপের প্রতি জনসাধারণের অনুকূল প্রতিন্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৫। প্রতিন্যাস আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে (Attitudes influence our behaviour):

প্রতিন্যাসের প্রভাবে আমাদের আচরণও অনেক সময় যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত

হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোনো ব্যক্তি হয়ত মটরশুঁটি খেতে আদৌ পছন্দ করে না। নিজের বাড়িতে তো নয়ই, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেও মটরশুঁটি ব্যবহার পছন্দ করে না। অথচ এই ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে অপর একদল ব্যক্তির সান্নিধ্যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এক বাটি মটরশুঁটির তরকারি খেয়ে এলো। তার ব্যবহারের এই বৈপরীত্যটুকু কেবল দলগত প্রতিন্যাসের প্রভাবে প্রভাবিত হল। আগেই বলা হয়েছে যে, সামাজিক সঙ্গতিবিধানের খাতিরে প্রতিন্যাস পরিবর্তিত হয়। 'আমিত্ব'কে অনেক সময় বহুজন সুখায় বা বহুজন হিতায় বিসর্জন দিতে হয়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি—'দলগত প্রতিন্যাস' ব্যক্তিকে আপন প্রতিন্যাসের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনা করতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

প্রতিন্যাস একটি লোক সমাজের বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। গোষ্ঠী জীবনে স্থান পেতে হলে অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হয়। মত প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর প্রতিফলন ঘটে। সমাজ ক্ষেত্রে তিন রকমের প্রতিন্যাস গড়ে ওঠে; বিষঙ্গমূলক (dissociative), সংকোচনমূলক (restrictive) এবং অনুষঙ্গমূলক (associative)। সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিভ্রান্তিকর এবং বাধা সৃষ্টিকারী। সংকোচনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ধরনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসে আর সংযুক্তিমূলক প্রতিন্যাস সমাজ বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

৬। প্রতিন্যাস কিভাবে পরিমাপ করা যায়? (How can attitudes be measured)?:

কোনো মতবাদ, বিষয় বা ঘটনার প্রতি সকল মানুষের সমান বা এক দৃষ্টিভঙ্গি হয় না। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরিবর্তনশীলতা এর একটা বড ধর্ম। তাই ব্যক্তিভেদে বা সমাজভেদে প্রতিন্যাস ভিন্নতর হয় কিভাবে তার আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং এই ভিন্নতর প্রতিন্যাসকে কিভাবে বিচারের তুলাদণ্ডে স্থাপন করা যায় তার জন্যে নানা অভীক্ষা ও পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ 'বিবাহ বিচ্ছেদ' বিষয়টিকে ধরা যাক্। কোনো কোনো ব্যক্তি বা সমাজ এ ব্যাপারটিকে প্রচণ্ডভাবে সমর্থন করে, আবার কোনো সমাজ বা ব্যক্তি একে আদৌ সমর্থন করে না, আবার একদল লোক বা কোন সমাজ এ ব্যাপারে উদাসীন অথবা ইচ্ছা থাকলেও সোচ্চারে কোনো কিছু বলতে নারাজ। এতে তিন রকম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিললো। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পরিমাপের একটা উপায় মিললো—যার একপ্রান্তে সমর্থন আর এক প্রান্তে অসমর্থন বা প্রতিকূল মনোভাব এবং মাঝখানে রইলো ঔদাসীন্য। এই মতবাদকে মোটামুটি সর্বজনীন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে;

কারণ এ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে এইতিন ধরনের অভিমতের কথাই জানা যাবে। আধুনিক কালে বিভিন্ন অভীক্ষার সাহায্যে প্রতিন্যাসগত তারতম্যের পরিমাপ করা হচ্ছে। সাধারণতঃ এই অভীক্ষা প্রশ্নগুচ্ছের (questionnaire) আকারে ব্যক্তি বা দলের কাছে রাখা হয়। আবার একটি বিষয়ের উপর অধিক সংখ্যক লোকের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্যে 'গ্যালপ পোল' ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। অনেক সময় সুপরিকল্পিতভাবে অল্পসংখ্যক কিন্তু প্রতিনিধিমূলক প্রশ্নমালার মাধ্যমে মতামত জানার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর দিয়ে থাকি তা যথার্থ আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিন্যাস ঘটিত কিনা তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহ থেকে যায়। বুদ্ধি, সমাজ নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাস বা সমকালীন মানসিকতার প্রভাবে পড়ে আমরা আসল অনুভূতি ব্যক্ত না করতেও পারি। তবুও প্রতিন্যাস-অভীক্ষাগুলো নির্ভরশীলতা দাবি করতে পারে। থারস্টোন (Thurstone), লাইকার্ট (Likert) ও জর্ডন (Jordon) চাচ, মৃত্যুদণ্ড, যুদ্ধ, নানাবিধ শিক্ষামূলক ও সামাজিক সমস্যামূলক বিষয়ের উপর প্রতিন্যাস সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়েছেন। প্রকাশভঙ্গী অনুসারে এঁরা পাঁচটি 'পয়েণ্ট স্কেল'-এ প্রতিন্যাসকে বিভক্ত করেছেন ; যেমন—

দৃঢ়ভাবে সমর্থন	সাধারণভাবে সমর্থন	উদাসীন	সাধারণভাবে অসমর্থন	দৃঢ়ভাবে অসমর্থন
|	|	|	|	|

৭। প্রতিন্যাসের সামাজিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য (Social and educational significance of attitudes) :

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় সমাজ পরিবেশে। সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক পরিবারের মধ্যে তার জন্ম। ক্রমশঃ নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মাধ্যমে তার আত্মবিকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে সামাজিক সঙ্গতি বিধানের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হয়। আধুনিক সমাজের পরিবেশ নানা জটিলতায় পূর্ণ, তার পরিধিও যথেষ্ট ব্যাপক, মানুষের জীবনধারা তাই খুব স্বাভাবিক কারণে দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই অবস্থার সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাকে সামাজিক সচেতনতা, আচরণ দক্ষতা, যোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা গঠন করতে হবে। ব্যক্তি জীবনের সামাজিকীকরণের পথে সামাজিক প্রতিন্যাস গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বর্তমানকালে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিশুকে যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক রূপে গড়ে তোলা। নাগরিকতাবোধ তার মনে জাগাতে হলে যোগ্য পৌর দৃষ্টিভঙ্গি (civic-attitudes) তার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। শিশু যেমন

সামাজিক প্রতিন্যাসের (social attitude) মধ্য দিয়ে তার অন্তরে সমাজ বন্ধন অনুভব করবে তেমনি সুস্থ ও বাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষার সার্থকতা খুঁজে পাবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাই এর মূল্য অপরিসীম। শিশুর যথাযথ বিকাশের জন্যে তার কল্যাণকর ব্যক্তিত্ব গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিন্যাসের অবদান অপরিসীম। সামাজিক ও পৌর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের পথে বিদ্যালয়ের বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ রচনা করে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থী যেন মানুষের অতীত জীবনসংগ্রাম, তার সমাজ গঠন, পরিবর্তিত জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই নানা সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের পঠনপাঠন এবং বিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা এবং নানা সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াতে হবে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে, যে হবে আগামী দিনে পৃথিবীর নাগরিক, তাকে যোগ্য প্রতিন্যাস গঠন করতেই হবে। সকল সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের রূপায়ণে ও বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃবোধের বিকাশে উপযুক্ত প্রতিন্যাস গড়ে তোলা একান্তভাবে কাম্য। আর এই বিষয়ে বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলের গুরু দায়িত্ব অনস্বীকার্য।

বিদ্যালয়ের ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায়

রস

(Sentiment)

১। 'রস' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ (Different meanings of Sentiment) :

'রস' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, রস বলতে কোন কোমল অনুভূতি বা আবেগ (Tender emotion) বোঝায় ; যেমন, আমরা কথায় কথায় বলে থাকি 'sentiment of love'। দ্বিতীয়তঃ, রস বলতে কোন কোমল অনুভূতি বা আবেগ বোধ করার স্থায়ী প্রবণতা বোঝায় ; যেমন, আমরা বলি নারীরা স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ (Sentimental)। তৃতীয়তঃ, রস বলতে যে কোন আবেগ অনুভব করার মেজাজকে (emotional disposition) বোঝাতে পারে, সে আবেগ মূর্তই হোক বা বিমূর্তই হোক ; যেমন, ঘৃণা, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি। চতুর্থতঃ, রস বলতে কোন বিমূর্ত আবেগকে (abstract emotion) বোঝাতে পারে। পঞ্চমতঃ, রস বলতে কোন অমূর্ত আবেগ অনুভব করার স্বভাবকে (abstract emotional disposition) বোঝাতে পারে। সর্বশেষে, রস বলতে বিমূর্ত আবেগ এবং এই আবেগ অনুভব করার প্রবণতা বা মেজাজ উভয়কেই বোঝাতে পারে।

মনোবিজ্ঞানী স্যাণ্ড (*Shand*) রসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, রস হল, "কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে আবেগমূলক প্রবণতার গঠনমূলক এক সংহতি" (organised system of emotional tendencies centred about some object.)।

কোন রকম বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা এখানে রস' শব্দটি বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের (abstract impersonal ideals) চিন্তায় মনে যে আবেগের সৃষ্টি হয়, বা সহজ কথায়, কোন ধারণা বা বস্তুকে কেন্দ্র করে মনে যে বিশেষ একটি আবেগ সুসংহত সংগঠন সৃষ্টি করে তাকে বোঝাতে পারি ; যেমন, ভালবাসা একটি আবেগ, যখন এ আবেগ কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে একটি সুগঠিত ও সুসংহত রূপ ধারণ করে তখনই রস সৃষ্টি হয়। রস সহজাত নয়, অর্জিত। আমার জন্মভূমিকে ঘিরে যে ভালবাসা বা দেশাত্মবোধ আমার মনে সৃষ্টি হয়, সে রস আমি নিজে সৃষ্টি করি, জন্মসূত্রে লাভ করি না।

২। রস ও আবেগ (Sentiment and Fmotion) :

রস এবং আবেগ আমাদের সাধারণ কথাবার্তায় সমার্থক হিসেবে প্রয়োজ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। তবে রস আবেগ নির্ভর। যেখানে কোন বস্তুর প্রতি আমরা আবেগ অনুভব করি না, সেখানে বস্তুকে কেন্দ্র করে কোন রসও সৃষ্ট হয় না। প্রতিটি রস বিশেষ বিশেষ আবেগের উপর নির্ভরশীল।

আবেগ সহজাত। ম্যাকডুগাল বলেন, প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির কেন্দ্রে এক একটি আবেগ বর্তমান। কিন্তু রস সহজাত নয়, রস মনের অর্জিত সংগঠন, পরিবেশের দ্বারা আমাদের মানসিক সংগঠনের এক পরিবর্তিত রূপ হল রস—এটি একটি স্থায়ী প্রবণতা। আমরা শিক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রসের সৃষ্টি করি।

আবেগ সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী মানসিক অভিজ্ঞতা। কিন্তু রস আমাদের একটি স্থায়ী মানসিক সংগঠন। আবেগের বস্তু সহজেই পরিবর্তিত হয়। কোন ব্যক্তির স্ত্রীর প্রতি রাগ সহজেই তার ছেলেমেয়ে বা গৃহভৃত্যের উপর স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে। কিন্তু রসের এ ধরনের পরিবর্তনশীলতা নেই। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে কেন্দ্র করে আমাদের যে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা রসের সৃষ্টি হয়, তা অতি সহজে এক ব্যক্তি বা এক বস্তু থেকে অন্যব্যক্তি বা বস্তুতে স্থানান্তরিত হয় না।

একই ধরনের আবেগ একই ধরনের রসের সৃষ্টি করে। ভালবাসা বা ঘৃণা প্রক্ষোভ, ভালবাসা বা ঘৃণা রসের সৃষ্টি করে। কিন্তু ভালবাসা রস একাধিক আবেগের সৃষ্টি করতে পারে ; যেমন, আমাদের ভালবাসার পাত্রকে ঘিরে রাগ, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি আবেগের সৃষ্টি হতে পারে। ভালবাসার পাত্রের কেহ ক্ষতি সাধন করতে পারে এ ধারণায় অনিষ্ট সাধনকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে ভয় বা তাকে ঘৃণা, বা তার প্রতি রাগ আমরা মনে মনে পোষণ করি। অর্থাৎ একটি রস একাধিক আবেগের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু একথা আবেগের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়।

৩। রস ও সহজাত প্রবৃত্তি (Sentiment and instinct) :

প্রবৃত্তি হল মানবজীবনের সহজাত আচরণ-প্রবণতা। প্রবৃত্তি ও আবেগ শিশুর জীবনের সকল আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কিন্তু বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ছাড়াও শিশুর জীবনে নতুন নতুন আচরণ-প্রবণতা দেখা দেয়। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর সংস্পর্শে এসে শিশুর আবেগ একাধারে যেমন কেন্দ্রীভূত থাকে, তেমনি সে আবেগ বা অনুভূতিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়। এই অর্জিত মানসিক সংগঠন হল রস। রস শিশুর জীবনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বহুবিধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট হয়। প্রবৃত্তিকে যদি শিশুর

প্রাথমিক আচরণের নিয়ন্ত্রক বলে অভিহিত করি, তবে রস হল ব্যক্তির উন্নততর অর্জিত আচরণের নির্ধারক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রবৃত্তি হচ্ছে সহজাত, রস হচ্ছে অর্জিত। কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি আমাদের স্থায়ী অনুভূতি বা আবেগমূলক প্রবণতাই হচ্ছে রস। রস পূর্ব পরিকল্পিত আদর্শ বা ধারণার দ্বারা সংগঠিত হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিসঞ্জাত আচরণে কোন পূর্বপরিকল্পিত ধারণার স্থান নেই। রস প্রবৃত্তি নির্ভর হতে পারে, কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক আচরণে আমরা বিচারবাদী নই। রসের ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সমাজচেতনার দ্বারা নিষিক্ত। রস সৃষ্টি হলে আমরা আবেগ ও প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। শিশুর জীবন মূলতঃ প্রবৃত্তিপ্ররোচিত, শিক্ষার দ্বারা মহৎ রস সৃষ্টি করে আমরা তার জীবনকে মহৎ করে তুলি। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে প্রবৃত্তির প্রভাব শিথিল হতে থাকে, তখন রস আমাদের আচরণগুলিকে পরিচালিত করে। সত্যাশ্রয়ীরস, সৌন্দর্য-রস, নীতিবোধাশ্রয়ীরস, প্রভৃতিই তখন আমাদের জীবনযাত্রায় নিয়ামক হতে থাকে। গৃহ-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী, বিদ্যালয়ের সহপাঠী সকলকে কেন্দ্র করে শিশুর জীবনে যে রসের সৃষ্টি হতে থাকে, তা তাকে প্রবৃত্তির জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে রসের নবগঠিত জগতে সমাসীন করে।

প্রবৃত্তি ও রস উভয়ই আবেগমূলক। আবেগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রেষণা যোগায়। বিশেষ আবেগে বিশেষ প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়। আবেগ সৃষ্ট না হলে রসও সৃষ্টি হয় না।

৪। রস ও গূঢ়ৈষা বা মনোবিকৃতি (Sentiment and Complexes):

প্রবৃত্তির উন্নীতকরণের ফলে মনে রসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রবৃত্তিকে অবদমিত করলে মনে নানাধরনের বিকৃতি সৃষ্টি ও সঞ্চিত হতে থাকে। সামাজিক পরিবেশ, বয়স্কদের শাসন, নিন্দা-প্রশংসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ব্যক্তি তার বহু আবেগ ও ইচ্ছাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। অনেক আবেগ সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় শৃঙ্খলার নামে প্রতিহত করা হয়। মাতাপিতা ও শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে শিশুর আবেগ প্রকাশকে তিরস্কার ও নিন্দার দ্বারা প্রতিহত করে আবেগ সম্বন্ধে অমনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে থাকেন।

রস ও গূঢ়ৈষা মানসিক প্রকৃতির দিক থেকে অভিন্ন। আবেগের দ্বারা উভয়ই সংগঠিত হয়। রস ও গূঢ়ৈষা উভয়ই কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। উভয় ক্ষেত্রেই বস্তু বা ব্যক্তি বা তাদের চিন্তায় আবেগ সঞ্চারিত হয় এবং বিশেষ

বিশেষ আচরণ দেখা যায়। কিন্তু রস ও গূঢ়ৈষা উভয়ই আবেগসঞ্জাত হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান।

ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যান অনুসরণ করে বলা যায়, ব্যক্তির সচেতন মনে মনোবিকার সৃষ্টি হয় না—ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনেই অবদমিত আবেগের দ্বারা মনোবিকৃতি সৃষ্ট হয়। মনোবিকৃতি জনিত আচরণের কোন ব্যাখ্যা ব্যক্তির পক্ষে প্রদান করা সম্ভব নয়, বা প্রদান করলেও সে ব্যাখ্যা অত্যন্ত কষ্ট কল্পিত (conceit) হয়। গূঢ়ৈষা সম্বন্ধে ব্যক্তি মোটেই সচেতন থাকে না। কিন্তু রস ব্যক্তির জ্ঞাতমনে সৃষ্ট হয়, আর রসানুভূতিমূলক আচরণ সম্বন্ধে ব্যক্তি সদা সচেতন। রস সৃষ্টি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য অঙ্গ সুস্থমানসিক সংগঠনের উপাদান, কিন্তু গূঢ়ৈষা ব্যক্তির মানসিক বিকাশ ও স্বাস্থ্যের পরিপন্থী, বহু সামাজিক ব্যাধির কারণ।

নানা ধরনের বিকৃতি মানুষের মনে দেখা দেয়। আমরা নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিকার আলোচনা করছি :

(ক) **আত্ম-প্রভাবমূলক গূঢ়ৈষা** (Self-assertion Complex) : হীনমন্যতা-মূলক মনোবিকারের বিপরীত এ মনোবিকারটি সাধারণ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত আদর ও স্নেহ, ভোগবিলাস এদের শিশুর চলনে-পরনে এমন এক উদ্ভট আভিজাত্য সৃষ্টি করে, যার ফলে অন্যের উপর নিজেকে জাহির করার, নিজেকে সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার এক অবাঞ্ছিত প্রবণতা তারা অর্জন করে। এমন কি পরিণামে এরা বহু গুপ্ত ও অসঙ্গত কাজের দ্বারাও নিজেদের মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে। এধরনের আত্মবিকৃতি উপস্থিত হলে, শিক্ষার্থীর মনে হীনমন্যতা বোধ সৃষ্টি করাই শ্রেয়।

(খ) **হীনমন্যতামূলক গূঢ়ৈষা** (Inferiority Complex) : শিক্ষাগ্রহণে বা কোন কাজে ক্রমাগত ব্যর্থতা বা সাধারণ ত্রুটির জন্য শিশু যখন মাতাপিতা, পরিজন বা শিক্ষক কর্তৃক ভর্ৎসনা লাভ করে তখন এ মনোবিকৃতি দেখা দেয়। শিশুর ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য যদি আমরা তাকে অনবরত নিরুৎসাহিত করি, নিন্দা করি, বা তার সামর্থ সম্বন্ধে যদি সন্দেহ প্রকাশ করি, তবে তার মনে এমন ধারণা সৃষ্ট হয় যে তার দ্বারা কোন কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈষম্য নীতি অনুসারে দেখা যায় যে-কোন ব্যক্তিই যে কোন কাজে দক্ষতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু শিশুর মনে যদি হীনমন্যতা বোধ সৃষ্টি করি, তা তার নির্জ্ঞান মনে যে বিকার সৃষ্টি করে, তার ফলে চিরতরে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং শিশুকে উৎসাহ, সহায়তা দান দ্বারা তার মন থেকে সৃষ্ট হীনমন্যতাবোধ দূরীভূত করা উচিত।

(গ) যৌন বিকার (Sex Complex) **:** মানবজীবনে যৌন প্রবৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণে যৌনাবেগকে আমরা অবদমিত করে থাকি। কিন্তু কোন নিযন্ত্রণেই এ প্রবৃত্তি লয় প্রাপ্ত হয় না। বয়ঃসন্ধিকালে যৌনাবেগকে কেন্দ্র করে ব্যক্তি চরিত্রে নানা পরিবর্তন ও সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু যেহেতু যৌনশিক্ষাকে আমবা নিষিদ্ধ কথা বলে মেনে আসছি, সেহেতু কিশোর-কিশোরী তাদেব এ আবেগকে পাপ মনে করে, বা আবেগকে চরিতার্থ করার জন্য কুসঙ্গে মিশে, কুআলাপে অভ্যস্ত হয়। যৌন কৌতূহল স্বাভাবিকভাবে পরিতৃপ্ত না হযে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত ভাবে তৃপ্ত হবার ফলে কিশোর কিশোরীর মনে নানা যৌনবিকার দেখা দেয। ফ্রয়েড তাঁর মনঃসমীক্ষণে যৌনবিকারকে নানাভাবে ব্যাখ্যা কবে দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির অপসঙ্গতির মূলে যৌনবিকারই প্রধান। যৌনবিকাবকে প্রতিহত করাব জন্য আমবা যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি।

(ঘ) আত্মকর্তৃত্বমূলক গূঢ়ৈষা (Authority Complex) **:** শিক্ষক ও মাতাপিতা শিশুকে অহেতুক নিযন্ত্রিত করা বা তার আচার আচরণে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার ফলে শিশুর মনে আত্মকর্তৃত্বমূলক বিকার দেখা দেয। শিশু নানা কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে, বড়দের চোখে শিশুব ছোটখাট কাজে ব্যাপৃতি হযত অর্থহীন মনে হতে পারে, কিন্তু শিশুর কাছে তার কাজগুলি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং শিশুকে অযথা বিরক্ত করা, তাকে দিয়ে ফাইফরমাস খাটানো, বা নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার নামে নিয়ন্ত্রিত করা মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। শাসন ও ভয় হেতু শিশু বড়দেব আদেশ মেনে চলে সত্য, কিন্তু মনে মনে সে এদের প্রতি ভীষণ বিরক্ত হয় এবং আত্মকর্তৃত্বলাভের জন্য সে বিদ্রোহী হতে থাকে। তার অসন্তুষ্টিজাত বিদ্রোহ নির্জ্ঞান মনে বাসা বাঁধে এবং পরিণামে বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজ, ধর্ম, সকল নীতি ও প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এমন কি ডাকাত, অপরাধপ্রবণ হযেও সে সমাজ ধ্বংসের স্বপ্ন দেখে।

মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) দ্বারাই মনোবিকারেব অপসারণ করা যেতে পারে। মনোবিকারের স্বরূপ নির্ধারণ করে, বিকারজনিত ত্রুটি দূরীভূত করা উচিত। মনোবিকারের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও কারণ নির্ধারণই প্রথম ও প্রধান চিকিৎসা। তারপর শিক্ষায় অভিপ্রেত আচরণ ও পরিবেশ সৃষ্টি দ্বারা বিভিন্ন রস সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

৫। রসঃ শিক্ষা ও চরিত্র গঠন (Sentiment : Education and Character) :

শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে রসের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। এজন্য সার্থক শিক্ষাকে সার্থক রসসৃষ্টি বলে আমরা অভিহিত করি। প্রবৃত্তি ও আবেগ আমাদের কর্মে প্রেরণা সঞ্চার করে, শিক্ষাকে সক্রিয় করে তোলার জন্য প্রবৃত্তি ও আবেগের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক শিক্ষানীতিতে স্বীকৃত। কিন্তু আবেগ বা সহজাত প্রবৃত্তির অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত প্রকাশ আমরা কামনা করি না। প্রবৃত্তি ও আবেগের উদ্‌গতিসাধন (sublimation) আমরা অভিপ্রেত বলে মনে করি। এ উদ্‌গতিসাধন বিভিন্ন রসসৃষ্টির দ্বারা সম্ভব।

অতি শৈশবে শিশুর জীবন সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। শিশুর আচরণগুলি প্রবৃত্তিসঞ্জাত। ধীরে ধীরে শিশুর মনে নানা আবেগের সঞ্চার হতে থাকে। আর আবেগকে কেন্দ্র করে নানা কর্মপ্রবণতার প্রবাহ শিশুর জীবনে চলতে থাকে। কিন্তু এ কর্মপ্রবণতার মধ্যে নানা অসংলগ্ন আচরণ দেখা যায়। কারণ, সে সময় শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আবেগজনিত প্রচেষ্টাগুলি ব্যক্তি, বস্তু বা ধারণাকে কেন্দ্র করে বাড়তে থাকে। তখনই শিশুর মনে নানা রসের সৃষ্টি হয় এবং অসংঘবদ্ধ কর্মগুলি তখন সংঘবদ্ধ ও সংহত হতে থাকে। এই স্তরই শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তর। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রবৃত্তি, আবেগ ও অন্যান্য মানসিক ভাবধারার সংগঠনকেই আমরা লক্ষ্য করি। বিভিন্ন রসের জন্মের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যক্তিসত্তার এ সংগঠন আমরা লাভ করি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রসের জন্ম ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রাথমিক ও প্রথম সোপান। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আচরণের নির্ণায়ক হয় তার অর্জিতরস—প্রবৃত্তি ও আবেগ রসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন কর্মপ্রবণতায় প্রকাশিত হতে থাকে। অর্থাৎ বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন নতুন আচরণ আমরা অর্জন করি, সেগুলি রসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্ররোচিত হয়।

রস অর্জিত, শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা রস গঠিত, বর্ধিত ও স্থায়িত্ব লাভ করে। পরিবেশের প্রভাবে শিশুমনে যে ধরনের রস সৃষ্টি হয়, তার আচরণও সে ধরনের হয়। শিশুর মাতাপিতা, পরিজন, সঙ্গীসাথী, বিদ্যালয়ের সহপাঠী, শিক্ষক সকলের সঙ্গে যদি ভালবাসা ও স্নেহের রস সৃষ্টি হয় তবে সে সকলের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ও হৃদ্যতাময় আচরণ করবে। সুতরাং শিক্ষক ও অভিভাবকদের দেখা উচিত শিশুর মনে কি কি আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে, সে আবেগগুলি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মানসিক

স্বাস্থ্যের পক্ষে অভিপ্রেত কিনা। কারণ এ আবেগগুলিই ব্যক্তি বা বস্তুকে কেন্দ্র করে রসের সৃষ্টি করবে। শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে রসের প্রভাব সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা আলোচনা করব। এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, আমরা কয়েকটি প্রধান রস এ-প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করছি :

আত্মবোধ রস : (Self-Regarding Sentiment) : শিশুর অহংসত্তাকে (ego or self) কেন্দ্র করে আত্মবোধ-রস জন্মলাভ করে। অহংবোধ শিশুর আত্ম-সচেতনার নামান্তর। অতি শৈশবে এ আত্মবোধ স্তিমিত থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অহংসত্তা জাগ্রত হতে থাকে। জীবনভর শিশুর মনে যে অভিজ্ঞতার শোভাযাত্রা চলে, সে অভিজ্ঞতা শিশুর মনে নানা বস্তু, নানা ঘটনা উপস্থিত করে— এ সব অভিজ্ঞতার ফলে শিশু বুঝতে পাবে বহু ঘটনা তার অহংসত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলী কোন না কোন দিক থেকে আমাদের অহং সত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু যে ঘটনা বা বস্তু অহংসত্তার অতি নিকটে, বা আত্মচেতনার অপরিহার্য অঙ্গ প্রধানতঃ তাকেই কেন্দ্র করে শিশুর অহংসত্তা পুষ্টি লাভ করে। মাতাপিতা তাঁদের সন্তানসন্ততিকে ঘিরে আত্মবোধ-রস লাভ করেন। যদি কোন চিত্রকলা পুস্তক, ব্যক্তি, বা কোন ঘটনা আমাদের অহংবোধের কাছে প্রিয় বা বাঞ্ছিত বলে মনে হয়, তাকে কেন্দ্র করেই অহংবোধ বৃদ্ধি লাভ করে। আমাদের এই অহংবোধ অন্যান্য সকল রসের প্রভাবে নিজস্ব আদর্শ নির্ধারণ করে। এ আদর্শ সংগঠন ব্যক্তির মানসিক পরিণতির সর্বশেষ ধাপ আর এ আদর্শ (যা রসের পরিণতি) ব্যক্তি সারা জীবন ধরে রচনা করে। আত্মবোধ-রস জীবনের অন্যান্য সকল দিক, সকল আচরণের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

আত্মবোধ রস অন্যান্য রসের মতো অল্প সময়ে বা সহজে গঠিত হয় না। দীর্ঘ সময় ব্যাপী বা জীবনব্যাপী এ রসের বিকাশ চলে। আমাদের যে যে বিচ্ছিন্ন ভাবধারা ও রস সৃষ্টি হয় তার সমন্বয়সাধক রস হচ্ছে আত্মবোধ-রস। আত্মবোধ-রসের দ্বারা পরস্পর বিরোধী, অসংলগ্ন রসের মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ম্যাকডুগাল এ রসের নাম দিয়েছেন অধিশাসক রস (Master Sentiment)।

আত্মবোধ রস আমাদের সকল আচরণ ও মানসিক সংগঠনের প্রবোচক। আমাদের সৌন্দর্যরস, নৈতিকরস এক কথায় সমগ্র জীবনবোধ আত্মবোধ-রসে নিষিক্ত। ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ এই রসের সার্থক পরিপুষ্টির সঙ্গে জড়িত। ব্যক্তিত্ব এমন একটি মানসিক সংগঠন যার দ্বারা আমরা সকল আচরণ ও চিন্তার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করি। বিভিন্ন মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিত্বের বিকাশই

চরিত্র সংগঠন। সুতরাং আত্মবোধ-রস চরিত্র সংগঠনের প্রাথমিক শর্ত। শিক্ষায় চরিত্র গঠনই আমরা অন্যতম অভিপ্রেত লক্ষ্য বলে স্বীকার করি। সুতরাং শিক্ষা-প্রদানে আত্মবোধ-রস সৃষ্টি দ্বারাই এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যায়। প্রবৃত্তি, আবেগ প্রভৃতি শিশুর জীবনে নানা বিচ্ছিন্ন প্রভাব ও আচরণ প্রবর্তিত করে। আত্মবোধ রসের দ্বারা ব্যক্তি অসংলগ্ন ও অসংযত আচরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে—তা না হলে ব্যক্তির জীবনে নানা অসামঞ্জস্য ও বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্য আত্মবোধ-রস যাতে গঠিত হতে পারে তার অনুকূল পরিবেশ গৃহে, বিদ্যালয়ে, সমাজ-জীবনে থাকা উচিত।

কিভাবে এই আত্মবোধ-রস গঠিত হতে পারে? মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ দুটো পন্থা এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ শিশুর চাহিদা, সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের সঙ্গত বিকাশসাধন ; দ্বিতীয়তঃ, শিশুর সামাজিক সচেতনার পরিবর্ধন।

শিশুর গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ এ দুটো পন্থাই অবলম্বন করে তার অহংসত্তার অবাধ বিকাশে সহায়তা করতে হবে। শিশুর চাহিদা ও নানাবিধ ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন না হলে পরিণত জীবনে শিশুর চরিত্রে নানা অপসঙ্গতি (maladjustment) দেখা দেবে। শিক্ষা শিশুর চাহিদা কেন্দ্রিক, প্রবৃত্তি প্রক্ষোভমুখী না হলে অহংসত্তার বিকাশ সম্ভব হবে না। নানা অবদমন ও অবহেলায় অহংসত্তা স্তিমিত হয়ে পড়বে এবং শিশু হবে দুর্বল ও উদ্যোগহীন চরিত্রের অধিকারী।

অহংবোধ নানা সংঘাত, সন্নিকর্ষ ও সংগ্রামের মধ্যে বর্ধিত হয়। শিশু যে অভিজ্ঞতা লাভ করে সে অভিজ্ঞতার উপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। সুতরাং পরিবেশ যদি সমাজধর্মী না হয়, তাহলে সমাজ-চেতনা শিশুর জীবনে বর্ধিত হবার সম্ভাবনা নেই। তাই কি গৃহ, কি বিদ্যালয় সর্বত্র সামাজিক দিক থেকে অভিপ্রেত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সমবেত কর্মানুষ্ঠান, সহযোগিতা, খেলাধূলা, সেবাকার্য প্রভৃতির মূল্য শিক্ষায় স্বীকৃত না হলে শিশুর চরিত্রে সামাজিক সচেতনতা সঞ্চারিত করা যায় না, তার অহংসত্তা পুষ্টিলাভ করে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আত্মবোধ-রস ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, চরিত্র সংগঠন ও সার্থক শিক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

নৈতিক রস (Moral Sentiment)ঃ নৈতিক আদর্শের চিন্তা এবং নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আচরণ করার জন্য যে অনুভূতির উদ্রেক হয় তাকে নীতিবোধাশ্রয়ী বা নৈতিক রস বলে। মানুষের আচরণে যে মূল্যবিচার আমরা লক্ষ্য করি, তা অনেকটাই নৈতিক মূল্য (moral values) বিচার থেকে সঞ্জাত। শিশুর চরিত্র গঠনে নৈতিক রসের অবদান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চরিত্রকে মূল্যনিরূপিত

(evaluated) ব্যক্তিসত্তা বলে অভিহিত করি। ব্যক্তির সকল আচরণই চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে না। যেসব আচরণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত মঙ্গলাদর্শের সহায়ক বা বাঞ্ছিত আদর্শ ও মূল্যবোধে প্রণোদিত, সেসব আচরণই চরিত্র সৃষ্টির অনুকূলে কাজ করে। চরিত্র সংগঠন শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য, সুতরাং নৈতিক রস শিক্ষার্থীর জীবনে সৃষ্টি করতে না পারলে শিক্ষার এ উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। ব্যক্তিত্ব বিকাশ সামাজিক জীবনের সাফল্য অর্থাৎ সুস্থ জীবন ও সমাজ সংগঠন নির্ভর করে সুচরিত্রের উপর। নৈতিক রস গঠিত না হলে শিশুর আচরণ অসঙ্গত অস্বাস্থ্যকর, অসামাজিক হয়ে পড়ে।

শৈশবের শুরুতেই শিশু নৈতিক রস-সম্পন্ন হতে পারে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে যখন গৃহ, পরিবেশ, আত্মীয় পরিজন ও বিদ্যালয়-জীবনে শিশু সামাজিক অনুশাসনে তার আচরণের ভালমন্দ বিচার করতে শেখে, প্রতিটি আচরণের পরিণাম ভাবতে শেখে তখনই চরিত্ররূপ মানসিক সংগঠন গঠিত হতে থাকে। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচরণে শিশুকে অভ্যস্ত করা সহজ নয়। কারণ চারিত্রিক আদর্শ বিমূর্ত। শৈশবে বিমূর্ত ধারণা শিশুমনে সঞ্চার করা কঠিন এবং অনেক সময় উচিতও নয়। আমরা বিদ্যালয়ে বা গৃহে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ দ্বারা শিশুর মনকে উদ্দীপিত করতে পারি। সততা, নিষ্ঠা, ধৈয প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর উদাহরণ ও আচরণ, ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে শিশুর সামনে তুলে ধরতে পারি। তাছাড়া কতকগুলি পরিচ্ছন্ন অভ্যাস গঠনে শিশুকে উৎসাহ ও প্রশংসা প্রদানের দ্বারাও নৈতিক আচরণ গঠন করা যেতে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, নৈতিক রস শিক্ষায় অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষক ও অভিভাবক সমবেতভাবে শিশুর জীবনে নৈতিক রস গঠনে সহায়তা না করলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব হতে পারে না।

দেশাত্মবোধ-রস (Sentiment for Patriotism) : স্বদেশকে ঘিরে শিশুর মনে যে প্রেম, ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় সে অনুভূতিই দেশাত্মবোধ-রস। নিজের দেশ, পরিবেশ সম্বন্ধে যদি শিশুর মনে কোন আকর্ষণ না জাগে, তবে তার অহংসত্তার বিকাশই ব্যাহত হবে। এজন্য শিক্ষায় দেশাত্মবোধকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করি। দেশাত্মবোধ জাতীয় চেতনারই একটি দিক। স্বাধীন ভারতে শিক্ষায় দশাত্মবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয় বলে সমালোচনা করা হয়। দেশাত্মবোধ ্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর মনে স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন একটি অপরিহার্য শর্ত। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা

প্রভৃতির পঠন-পাঠনের দ্বারা শিশুমনে দেশাত্মবোধ সঞ্চার করা যেতে পারে। দেশের সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি মহৎ ও গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা দ্বারা শিশুর মনে দেশাত্মবোধকে গভীরতর করা যায়।

৬। রসের বিকাশ (Development of Sentiment) :

শিশু রস নিয়ে জন্মায় না, রস অর্জিত গুণ—সামাজিক, প্রাকৃতিক, মানসিক, শিক্ষামূলক পরিবেশের প্রতি শিশুর প্রতিক্রিয়ার ফলে নানা রস জন্মলাভ করতে থাকে। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রবৃত্তি ও আবেগমূলক নানা অভিজ্ঞতা রসের রূপ ধারণ করে। তবে নিছক অভিজ্ঞতা থেকে রস সৃষ্টি হতে পারে না। রস সৃষ্টিতে অভিজ্ঞতার বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ব্যক্তি বা বস্তুকে কেন্দ্র করে শিশুর অভিজ্ঞতা যখন চিন্তামূলক হয়, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তখনই রস সৃষ্টি হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তির মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে রসের বিকাশ ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং ব্যক্তিমানসের বিকাশ অনুসারে রসের বিকাশ আমরা আলোচনা করছি :

প্রত্যক্ষণমূলক স্তর (Perceptual level) : সাত-আট বছর বয়স অবধি শিশুর মানসিক বিকাশের স্তর প্রত্যক্ষণের বিস্তৃতি ও বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতিই বিকশিত হতে থাকে। এ স্তরে প্রবৃত্তি ও আবেগই শিশুর সকল আচরণ ও অভিজ্ঞতার প্রবোচক ও নিয়ন্ত্রক। বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন আবেগ, প্রবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত অবাধ প্রকাশ শিশুর জীবনে তখন কোন সমন্বয় ও ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস গঠন সৃষ্টি করতে পারে না। এ স্তরে রসের কোন প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি না।

চিন্তনমূলক স্তর Thinking level) : মানসিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে শিশুর মধ্যে চিন্তামূলক মানসিক প্রক্রিয়া বিকাশলাভ করতে থাকে। প্রথম স্তরে প্রবৃত্তি ও আবেগের যে উদ্দাম, অসংহত লীলাখেলা শিশুর মধ্যে দেখা দেয়, ধীরে ধীরে সেগুলি সুসম্বদ্ধ, সংযত রূপ ধারণ করে। সাত আট বছর পরেই শিশু নিজের চিন্তাশক্তির দ্বারা প্রবৃত্তি ও আবেগকে প্রশমিত করতে শেখে—ফলে অসংলগ্ন প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে একটি সংগঠন দেখা দেয় এবং তখনই রস জন্ম নেয়। ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘিরে শিশুর আবেগ তখন নানা স্থায়ী অনুভূতি সৃষ্টি করে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। এ নিয়ন্ত্রণ রসের দ্বারাই ঘটে থাকে।

বিচার-বিশ্লেষণমূলক স্তর (Reasoning level) : শিশুর মানসিক বিকাশের

তৃতীয় স্তরে রস সুসংগঠিত ও স্থায়ী রূপ ধারণ করে এবং জীবনভর শিশুর মনে রসের প্রভাব বর্ধিত ও বিকশিত হতে থাকে। এ স্তরে শিশু প্রত্যক্ষণ ও চিন্তাপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও আচরণের মূল্যায়ন করে। আচরণ ও অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ করার ফলে শিশুর মানসিক স্তরে ব্যাপক সমন্বয়মূলক সংগঠন সৃষ্টি হয়। সকল আচরণ ও অভিজ্ঞতা আত্মবোধ বা অহংসত্তার সঙ্গে সংশ্লেষিত ও সম্পর্কযুক্ত হয়। এ অহংসত্তাকে কেন্দ্র করে শিশুর জীবনের সামগ্রিক বিকাশ ঘটে, তার জীবনবোধ ও জীবনাদর্শ সৃষ্টি হয়। আত্মবোধ রস (Self regarding sentiment) জাগ্রত হয়ে ব্যক্তির সকল কর্মধারা, চিন্তাধারা এবং পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে একটি একতা সৃষ্টি করে। এজন্য ম্যাকডুগাল এ রসের নাম দিয়েছেন অধিশাসক রস (Master Sentiment)। এই আত্মবোধ রস মানসিক বিকাশের বিচার-বিশ্লেষণমূলক স্তরে পরিণতি লাভ করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানসপ্রকৃতি

(Temperament)

মানুষে মানুষে যতখানি মিল আছে তার চেয়ে প্রভেদ আছে অনেক বেশি। এই প্রভেদই প্রত্যেক মানুষকে কিছু বৈশিষ্ট্য দান করে তাকে অন্য অনেকের থেকে পৃথক করে রেখেছে। শারীরিক গঠনে, মানসপ্রকৃতিতে, বুদ্ধি ও অনুভূতিতে, মানসিক গঠনে নানা বিভিন্নতা মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে। সকল বৈষম্যই তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তবে তার মানসপ্রকৃতিগত (Temperamental) বৈষম্য অপরের কাছে নিজেকে প্রকাশ করতে বা নিজের পরিচয় রাখতে যতখানি সাহায্য করেছে এমন আর কোন প্রকার বৈষম্যই করেনি। তাই মানসপ্রকৃতির্গত বৈশিষ্ট্য আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়ে গেছে। এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংগঠনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং মানসপ্রকৃতি বলতে কি বোঝা যায় তা দেখা দরকার।

১। মানসপ্রকৃতির সংজ্ঞা (Definition of Temperament):

জীবনে চলার পথে নানাশ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয়। এদের মধ্যে কেউ একটুতেই রেগে ওঠেন, তাঁদের বলি—রগচটা; এঁরা সাধারণতঃ খিটখিটে মেজাজের হন। আবার কেউ বা বেশি শান্ত, নানাভাবে উত্যক্ত করলেও এঁদের চটানো যায় না। কেউ অল্প দুঃখে অভিভূত বা কাতর হয়ে পড়েন আবার কেউ শত দুর্দশাতেও অচঞ্চল ও সংযত থাকেন। কেউ বেশ মিশুকে, সবসময় হাসিখুশী, কেউ বা সবকিছু এড়িয়ে নিজের মধ্যেই থাকতে চান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সকল মানুষকে মানসপ্রকৃতির দিক থেকে একই শ্রেণীতে আমরা ফেলতে পারছি না। এখন প্রশ্ন হল, মানসপ্রকৃতি বা মেজাজ কাকে বলা যেতে পারে?

মনোবিজ্ঞানীরা মানসপ্রকৃতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে রীতিমত সমস্যায় পড়েছেন। নানাভাবে তাঁরা একে সংব্যাখ্যাত করতে চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের চেষ্টার একটা ফলশ্রুতি হল এই যে, সকলেই মানসপ্রকৃতির একটা দৈহিক ও প্রাক্ষোভিক ভিত্তির কথা স্বীকার করেছেন। মানসপ্রকৃতির ইংরেজী প্রতিশব্দ Temperament কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ *Temperamentum* থেকে। এর অর্থ হল 'উপযুক্ত অনুপাতে মিশ্রণ' (a mixing in due proportion)। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে আমাদের স্বভাবতঃই দেখতে হবে কি কি উপাদানের মিশ্রণের ফলে এই

মানসপ্রকৃতি সংগঠিত হবে। এটিকে আমরা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মানসিক গঠন বলে মনে করতে পারি। ব্যক্তি-মানুষের আনুভূতিক প্রতিক্রিয়া ও আচরণের উপর ভিত্তি করে মেজাজ বা ধাত (temperament) গড়ে ওঠে।*

মানুষের দেহকোষগুলির মধ্যে সব সময়েই একটা রাসায়নিক ও জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া চলেছে। তার ফলে দেহাভ্যন্তরে নানা রাসায়নিক রূপান্তর (metabolism) সংঘটিত হচ্ছে। ব্যক্তির মনের উপর এর প্রভাবও পড়ছে। এই পরিবর্তনের সামগ্রিক ফলই হল মানসপ্রকৃতি বা মেজাজ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মানসপ্রকৃতি হল একটি একান্ত নিজস্ব স্থায়ী মানসিক সংগঠন যা ব্যক্তির প্রক্ষোভ, মেজাজ, উত্তেজনার প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা।

২। শারীরিক গঠন ও মানসপ্রকৃতির প্রকারভেদ (Physiological basis and types of Temperament):

সুদীর্ঘকাল ধরে মানুষ এই বিশ্বাস নিয়ে আছে যে মানসপ্রকৃতি মূলতঃ দৈহিক গঠনের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহনিঃসৃত রস (বিশেষতঃ রক্ত, কফ, পিত্ত ও বাতের যে কোন একটি) মানসপ্রকৃতি বা ধাত গঠনে সাহায্য করে। হিপ্পোক্রেটিস (*Hippocrates, 400 B. C.*) এবং পরবর্তীকালে গ্যালেন (*Galen-150 A. D*) এই রসের উপর ভিত্তি করে মানসপ্রকৃতি অনুসারে মানুষকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন, যথা—আশাপ্রবণ (Sanguine), ক্রোধপ্রবণ (Choleric), বিষাদগ্রস্ত (Melancholic), শ্লেষ্মাপ্রবণ (Phlegmatic) ইত্যাদি। প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যও আছে। বৈশিষ্ট্যগুলি পর পর আলোচনা করা হল:

মানসপ্রকৃতি গঠনে রস (humour)

যারা **আশাপ্রবণ** তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য: শ্বাসযন্ত্র ও রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা সুদৃঢ়, চুল লালচে, চোখ নীল, গায়ের চামড়া মসৃণ, মুখমণ্ডল প্রাণচঞ্চল। এদের দেহে রক্তের আধিক্য আছে। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা সজীব, উচ্ছল, সহজে উত্তেজিত হয়, চটপটে, সাধারণতঃ অনুভূতিপ্রবণ।

---

* We use the term 'temperament' in referring to a person's more or less persistent manner of thinking, feeling and acting which we cannot account for through physique, intelligence, definable motive, sex classification or other traceable factors.— *Educational Psychology.* —*Skinner, C. E*

যারা **ক্রোধপ্রবণ** তাদের দেহে পিত্তাধিক্য রয়েছে : এদের পেশী বেশ সবল, চুল ও চোখ কালো, মুখমণ্ডল আবেগশূন্য। এরা খিটখিটে, রাগী, সহজে উত্তেজিত হয় না, কিন্তু উত্তেজিত হলে সেই উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এদের আত্মবিশ্বাস আছে এবং এরা সাধারণতঃ ইচ্ছাপ্রবণ।

যারা **শ্লেষ্মাপ্রবণ** তাদের মুখ গোল ও ভাবলেশহীন, ঠোঁট মোটা, দেহ যেন কখনই অবসন্ন হয় না, পেট মোটা। এদের মন ভারাক্রান্ত ও মন্থর যেন প্রায় অবশ। অনেকটা জড় বলে মনে হয়। এরা ধৈর্যশীল কিন্তু এদের অলস ও বুদ্ধিহীন বলে মনে হয়।

যারা **বিষাদপ্রবণ** তাদের মাথা বড়, চোখ উজ্জ্বল ও ভাবপ্রবণ, একহারা রোগা রোগা চেহারা তবে চটপটে। এরা কবিতা, গান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভালবাসে—সব সময়ে যেন বিষণ্নতা এদের ঘিরে থাকে, বাস্তব জগতের ব্যাপারে এরা অনেকটা উদাসীন। তবে কোন মানুষই উল্লিখিত শ্রেণীগুলির একেবারে কোন এক বিশেষ শ্রেণীতে সব সময় পড়ে না। দুই বা ততোধিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত মিশ্রিত মানুষ সাধারণতঃ দেখা যায়।

বর্তমানে শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা এই শ্রেণীবিভাগকে পুরোপুরি মেনে নেননি। তাঁরা মনে করেন, এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা স্থূল চিন্তাপ্রসূত। তবে সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, দেহের গড়ন ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মানসিক প্রকৃতির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ক্রেৎসমার দেহের গঠন অনুসারে মানুষকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—এথলেটিক (Athletic), এস্থেনিক (Asthenic), পিকনিক (Pyknic), ডিসপ্লাস্টিক (Dysplastic)।

প্রথম শ্রেণীর মানুষের দেহ বেশ সুগঠিত, পেশী দৃঢ়, বুক চওড়া ও হাত পা দীর্ঘকায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ দীর্ঘকায় তবে কৃশদেহ বিশিষ্ট, পেশী ও অস্থি খুব সবল ও দৃঢ় নয় কটি ও উদরদেশ ক্ষীণ। স্থূলতা ও পুষ্টির অভাবের সঙ্গে দীর্ঘতার

'Temperament refers to the characteristic phenomena of an individual's emotional nature including his suspectibility to emotional stimulation, his customary strength and speed of response, the quality of his prevailing mood and all peculiarities of fluctuation and intensity in mood; these phenomena being regarded as depended upon constitutional make up. and therefore largely hereditary in origin. —*Personality* : A Psychological interpretation. *Allport G. W.*

সমন্বয়ই এস্থেনিক শ্রেণীর প্রধান লক্ষণ। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষরা বেঁটে, স্থূলকায় ও গোলগাল চেহারার হয়। মস্তিষ্ক, বক্ষঃদেশ ও উদরদেশ স্ফীত। স্থূলতা এদের প্রধান লক্ষণ। চতুর্থ শ্রেণীর মানুষদের দেহ অপুষ্ট ও হীনবল। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল হল প্রথম শ্রেণীর মানুষ। ক্রেৎসমারের মতে এদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এরা দৈহিক গঠনের দিক থেকে যেমন ক্ষমতাপন্ন তেমনই প্রক্ষোভ সৃষ্টি ও প্রকাশের দিক থেকেও এরা সুসমন্বিত। পিকনিক শ্রেণীর মানুষেরা প্রক্ষোভের দিক থেকে চরমভাবাপন্ন। এস্থেনিক শ্রেণীর মানুষ প্রক্ষোভ সৃষ্টি ও প্রকাশে খুবই সংযত; এরা প্রকৃতিতে আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু ও রুক্ষ। প্রায়ই এরা বাস্তব থেকে পালিয়ে আপন কল্পনার জগতে আশ্রয় নেয়।

সেলডনও ক্রেৎসমারের মতো দেহের গঠন অনুসারে মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যথা—

(১) এণ্ডোমর্ফ : এরা কোমল দেহী, আকৃতিতে গোলাকার, উদরদেশ স্ফীত। (পিকনিক শ্রেণীর সঙ্গে তুলনীয়)।

(২) মেসোমর্ফ এরা সুগঠিত পেশীবহুল দেহের অধিকারী, শক্ত-সমর্থ অস্থিসম্পন্ন প্রশস্ত বক্ষঃদেশের মানুষ। (এথলেটিক শ্রেণীর সঙ্গে তুলনীয়)।

(৩) এক্টোমর্ফ এরা দুর্বল দেহবিশিষ্ট, শীর্ণ ও দীর্ঘকায়। (এস্থেনিকদের সঙ্গে তুলনীয়)।

মানসিক প্রকৃতি অনুসারে এই তিন শ্রেণীর মানুষকে আবার তিনি তিনটি টাইপে ভাগ করেছেন :

(১) ভিসেরোটোনিক : (Viscerotonic) এরা দৈহিক আরামপ্রিয়; উৎসব, হৈ-চৈ পছন্দ করে, এরা প্রশংসা ও মনোযোগের প্রত্যাশী, এদের মনের আবেগ বিনা বাধায় প্রকাশিত হয়।

(২) সোমাটোটোনিক (Somatotonic) এরা উদ্যমশীল, কাজে ও কথায় প্রভুত্বপ্রিয়, উত্তেজনাপূর্ণ কাজ করতে ভালবাসে, অপরের অনুভূতি তত গ্রাহ্য করে না। এরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আক্রমণধর্মী হয়।

(৩) সেরিব্রোটোনিক : (Cerebrotonic) এরা প্রায় সব সময়ে ভয়ে ভয়ে কাটায় ও সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলে। এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযমের অভাব দেখা যায়।

বর্তমানে দেহবিজ্ঞানীরা দেহের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা মানসপ্রকৃতি গঠনে অনালী রসক্ষরা গ্রন্থির প্রভাব ও ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে থাকেন।

ক্যানন, বার্ড, বারম্যান, ডিক্রুইফ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের নানা গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এ্যাড্রিনাল গ্রন্থির (Adrenal glands) অতিরিক্ত রসক্ষরণে ব্যক্তির মানসপ্রকৃতি হয় উদ্যমশীল, উচ্ছল, জেদী ও কর্মদক্ষ। আর এর ব্যতিক্রমে স্নায়বিক দৌর্বল্য, সংশয়, খিটখিটে মেজাজ (Peevish temperament) ও উদ্যমহীনতা দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থির (Thyroid glands) অতিরিক্ত রসক্ষরণে ব্যক্তির মধ্যে চাঞ্চল্য, উদ্যমশীলতা, আবেগপ্রবণতা দেখা দেয়। আর এ গ্রন্থির রসক্ষরণ কম হলে ব্যক্তি অমনোযোগী, নিষ্প্রভ, রোগপ্রবণ ও অপরিণত মানসিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে পড়ে। পিটুইটারী গ্রন্থির (Pituitary glands) বিভিন্ন অংশের (lobe) রসক্ষরণে স্ত্রীলোকের মধ্যে পুরুষালি ও পুরুষের মধ্যে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়। থাইমাস্ গ্রন্থির (Thymus glands) অতিরিক্ত রসক্ষরণে দৈহিক দুর্বলতা, যৌনবিকৃতি ও অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়। রস স্ট্যাগনার (*Ros stagner*) ও কিম্বলইয়ং (*Kimball young*) এই ব্যাখ্যাকে পুরোপুরি মেনে নেননি, তবে ব্যক্তির অস্মিতা সংগঠনে এই রসক্ষরণ প্রক্রিয়ার প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে অনালী গ্রন্থিগুলি ব্যক্তির মানসপ্রকৃতি গঠনে সত্যসত্যই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিভিন্ন অনালী গ্রন্থির প্রভাব

পরবর্তীকালে ফ্রয়েড শিষ্য ইয়ুং (*Jung*) ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ভঙ্গির উপর জোর দিয়ে মানুষকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: (১) অন্তর্বৃত্ত (Introvert), এবং (২) বহির্বৃত্ত (Extrovert)। প্রথম শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আত্মকেন্দ্রিক, মন বাস্তবমুখী ও ভাবুক প্রকৃতির। সে যেন নিজের কল্পনা রাজ্যে আত্মলীন থাকতে চায়। আর এর বিপরীত ব্যক্তি হল বাইরের কর্মকোলাহলময় জগতের প্রতি সদা আকৃষ্ট। নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকতে তার ভীষণ অনীহা। এরা সবসময় সমাজে মেলামেশা করতে চায় এবং সঙ্গকামী হয়ে ওঠে। নানা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নেতৃত্ব লাভ করার জন্য এরা বিশেষ ভাবে উন্মুখ। উপযুক্ত পরিবেশে এদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যৎ নেতা গড়ে ওঠে। তবে বাস্তবে সম্পূর্ণ অন্তর্বৃত্ত সম্পূর্ণ বহির্বৃত্ত মানুষ খুব কম দেখা যায়। সমাজে বেশীর ভাগ মানুষই মিশ্র প্রকৃতির বা উভবৃত্ত (ambivert)। এরা বিশেষ অবস্থায় অন্তর্বৃত্ত এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে বহির্বৃত্ত হয়ে পড়ে।

প্রকাশনার দিক থেকে মানসপ্রকৃতির পরিচয়

৩। মানসপ্রকৃতির স্বরূপ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে তার প্রভাব : (Nature of Temperament and influence on Personality development) :

মানসপ্রকৃতি জন্মগত এবং দৈহিক ও স্নায়বিক কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে কখনও কখনও সামাজিক পরিবেশ ও জাতিগত উত্তরাধিকারও (racial heredity) মানস-প্রকৃতি বা মেজাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যায়। এটি ব্যক্তিত্বের মস্তবড় উপাদান হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিসত্তার স্তর বা আয়তন নির্ধারণে মানসপ্রকৃতির খুবই প্রভাব আছে। যেহেতু মানসপ্রকৃতি মনের একটি স্থায়ী সংগঠন এবং খুব কমই পরিবর্তনশীল তাই ব্যক্তিত্ব সংগঠনে এর অপরিহার্যতা রয়েছে। বয়স, লিঙ্গ এমনকি জাতিগত উপাদানগুলি মানসপ্রকৃতি গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। তবে কার্যতঃ আমরা দেখতে পাই যে একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটে, তাই ব্যক্তিত্ব গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিকালে আমাদের সেদিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

৪। শিক্ষায় মানসপ্রকৃতির প্রভাব : (Influence of Temperament in Education) :

শিশুর আচরণকে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে উন্নত ও দৃঢ় সমন্বিত ব্যক্তিত্ব-গঠনই শিক্ষার স্বীকৃত উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শৈশবকাল থেকেই মানসপ্রকৃতির উপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হয়। বুদ্ধিমান কৃষক যেমন বীজের অঙ্কুরোদ্গম থেকে গাছে পরিণত হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার উপর গুরুত্ব দেয় তেমনি একজন সুশিক্ষককেও সকল শিশুর মানসপ্রকৃতি ও তার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীর উপর বিশেষ নজর রাখতে হয়। এ ব্যাপারে কিন্তু মিশ্র মানসপ্রকৃতি সম্পন্ন শিশুরাই নানা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। যারা পুরোপুরি কোন না কোন একটি শ্রেণীতে পড়ে তারা শিক্ষকের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয় না, কারণ তাদের জন্য বিশেষ একটি নির্ধারিত পথ নির্দেশ করা দুরূহ হয়ে ওঠে না। অথচ অপর শ্রেণীর জন্য সুচিন্তিত উপায়ে পথ নির্দেশ করতে হয়।

শিক্ষককে সর্বপ্রথম হতে হবে সহৃদয় মনের অধিকারী, তারপর হতে হবে প্রয়োজনানুগভাবে কঠোর। যদি শিক্ষক ঠিকমত ভাবে ক্রোধপ্রবণ (Choleric) ও শ্লেষ্মাপ্রবণ (Lymphatic or Phlegmatic) শিশুদের চালনা করতে না পারেন তাহলে তারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরকম মানসপ্রকৃতিসম্পন্ন শিশুদের অবাঞ্ছিত কোন

প্রতিযোগিতার মধ্যে টেনে আনা ঠিক নয়। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে তাদের জয়ী হবার মনোবৃত্তি ও জয়—দুটোর মধ্যে সমানুপাতিক ফললাভ হয় না, তাতে তাদের সামনে বিরাট বাধার সৃষ্টি হয়। তাদের সে বাধা অপসারিত করতে না পারলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য। সর্বোপরি শিক্ষকের ধৈর্য থাকা দরকার। এই ব্যাপারে শিক্ষক নিজে যদি স্নায়বিকভাবে দুর্বল হন তাহলে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।[1] অপরপক্ষে যারা আত্মপ্রবণ মানসপ্রকৃতিসম্পন্ন তাদের দিকে নজর রাখতে হবে যাতে তাদের অবিচল ও অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার অভ্যাস গঠিত হয়। সব ধরনের মানসপ্রকৃতিসম্পন্ন শিশুদের বৈশিষ্ট্যগুলি সামনে রেখে শিক্ষককে সুপরিকল্পিত পথে এগিয়ে যেতে হবে। যদি এ প্রকৃতিগুলির বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হতে না পারে তাহলে সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারবে না, শিক্ষার উদ্দেশ্যও সফল হবে না।

1. 'A nervous teacher trying to force a phlegmatic boy to action by mere nervousness is a ridiculous sight. The immobility of the one is only matched by the impatience of the other.' —*Jerome Allen*

সপ্তম অধ্যায়

চরিত্র

(Character)

'চরিত্র' শব্দের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ 'চরিত্র' ব্যক্তিত্বের মতো একটি মৌলিক ধারণা। আমরা একে বর্ণনা করতে পারি। লোকায়ত ব্যবহারে 'চরিত্র' শব্দটিকে কোন কোন ক্ষেত্রে সংগুণের অধিকারী অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, 'লোকটি চরিত্রবান্' এস্থলে 'চরিত্র' অর্থে সুচরিত্রই বোঝায়। আবার যখন বলি 'লোকটি চরিত্রহীন' তখন বুঝি লোকটি মোটেই সচ্চরিত্রের অধিকারী নয়—এর অর্থ এই নয় যে লোকটির কোন চরিত্র শক্তি নেই।

এ আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, 'চরিত্র' মন্দ এবং ভাল—এ দুটি অর্থকেই লৌকিক কথাবার্তায় আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নৈতিকতার বিচারে (in moral consideration) 'চরিত্র' শব্দকে আমরা সৎচরিত্র অর্থেই গ্রহণ করি এবং আলোচ্য অধ্যায়ে এই অর্থই গৃহীত হবে।

১। চরিত্রের স্বরূপ (Nature of Character):

চরিত্র ব্যক্তিত্বের মত দৈহিক ও মানসিক বহুগুণের সমন্বিতরূপ। ব্যক্তির আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আমরা যখন মূল্যায়ন করি তখন তার চরিত্র বিচার করি। আবার ব্যক্তির আচরণে তার ব্যক্তিত্বই ধরা পড়ে। এজন্য ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মধ্যে অনেকেই কোন মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট (*Allport*) প্রদত্ত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। অলপোর্ট বলেন, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র আসলে দুটো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা একই বস্তুর ব্যাখ্যা মাত্র। ব্যক্তিত্ব দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি গুণাবলীর সমষ্টিমূলক সংগঠন। যখন এই সমষ্টিমূলক গুণ সমন্বয়কে আমরা নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) ভাবে প্রত্যক্ষ করি তখন ব্যক্তিত্বের রূপই ধরা পড়ে। আবার এ গুণগুলিকে যখন আমরা সামাজিক, ধর্মীয় বা লৌকিক আদর্শ বা মূল্যের (ideals or values) মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করি তখন চরিত্র বিচার করি। এজন্য অলপোর্ট চরিত্রকে মূল্যনিরূপিত ব্যক্তিত্ব (personality evaluated) এবং ব্যক্তিত্বকে মূল্যনিরূপণহীন চরিত্র (character devaluated) বলে অভিহিত করেছেন।[1]

---

1. 'Character is personality evaluated and personality is character devaluated.'
—*Allport : Personality* Page 52.

চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই—বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বিচার করি, তখন সেগুলির ব্যাখ্যা করি মাত্র, সামাজিক বা নৈতিক মানদণ্ডে এগুলির কোন মূল্যায়ন করি না। কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন কোন আদর্শ বা নৈতিক মূল্যের দৃষ্টিতে বিচার করি, তখন তা চরিত্র বিচার হয়। উদাহরণ স্বরূপ ভয় বা ভীতি প্রবণতার উল্লেখ করা যায় ; আসলে উহা একটি আচরণ এবং ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ কিন্তু সামাজিক বিচারে যে ব্যক্তির ভীতিপ্রবণতা বেশি, তাকে আমরা ভীতু বা দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তি বলে অভিহিত করে থাকি।

অবশ্য ব্যক্তিত্বকে চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাও যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব চরিত্র থেকে ব্যাপকতর এবং চরিত্রকে ব্যক্তিত্বের একাধিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান মনে করা যেতে পারে। ব্যক্তিত্বে সব উপাদানের নৈতিক ও সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করা হয় না।[1]

২। সুচরিত্রের লক্ষণ (Marks of good Character) ঃ

চরিত্র বিচার বিশেষ আদর্শ বা মূল্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্ব বিচার। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে যখন আমরা বিভিন্ন মান বা মূল্যের মাধ্যমে বিচার করি তখন সুচরিত্রের লক্ষণ ধরা পড়ে। বিভিন্ন আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা সুচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গঠন করি আর বিচার করি বাস্তবে ব্যক্তিত্ব সে আদর্শচরিত্রের কতটুকু অধিকারী হল।

সাধারণতঃ আমরা তিনপ্রকার মান বা মূল্যের দ্বারা চরিত্র বিচার করি—ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলাদর্শ, সামাজিক মঙ্গলাদর্শ এবং নৈতিক আদর্শ। ব্যক্তির আচরণ যদি তার নিজস্ব মঙ্গল, সামাজিক মঙ্গল এবং নৈতিক আদর্শের দিক থেকে কাম্য হয় বা তার আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লিখিত ত্রিবিধ মূল্যের অনুগামী হয়, তবে ব্যক্তির আচরণগুলি চরিত্র বা সুচরিত্রের লক্ষণ বলে গৃহীত হয়।

(ক) **ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলজনক বৈশিষ্ট্য ঃ** ব্যক্তিকে নিজের জীবনে সুখ, শান্তি লাভের জন্য অনেকগুলি আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সৎসঙ্কল্প, সদাচার প্রভৃতি ব্যক্তির জীবনে থাকা চাই। তা না হলে ব্যক্তি অস্থিরচিত্ত ও আচরণের ভারসাম্য হারিয়ে অসদাচারী হয়ে ওঠে। নিজের মঙ্গল লাভের জন্য ব্যক্তিকে বহু লোভ, ইন্দ্রিয়সুখকর আকর্ষণ পরিহার করে চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ করতে হয়। ব্যক্তি দুর্বলচিত্ত, চপল, সঙ্কল্পহীন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হলে তার পক্ষে ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ করা অসম্ভব।

1. '.........Personality is the broader term including character as one of its aspects.' —*Thrope : Psychological Foundation of Personality.*

(খ) **সামাজিক মঙ্গলজনক বৈশিষ্ট্য :** ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গল ও সামাজিক মঙ্গল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও কোন কোন সময় ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবুও পরিণামে ব্যক্তি ও সামাজিক কল্যাণ অভিন্ন। সহযোগিতা, সহানুভূতি, সামাজিক কর্ম-চেতনা, স্বার্থত্যাগ, জনপ্রীতি ইত্যাদি সামাজিক কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী।

(গ) **নৈতিক মঙ্গলজনক বৈশিষ্ট্য :** ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ব্যক্তিকে কতকগুলি নৈতিক আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সমাজে নৈতিক বিচারে কতকগুলি আচরণকে মূল্য দেওয়া হয়। এ আচরণগুলির ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূল্য বাস্তবে নাও থাকতে পারে। কিন্তু নৈতিক বিচারে এ আচরণগুলি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কাম্য। সততা, দয়া, কৃতজ্ঞতা, মহৎ জীবনে বিশ্বাস, অন্তরের শুচিতা প্রভৃতি নৈতিক কল্যাণসাধক আচরণ। এসব আচরণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণসাধক আচরণের পরিপূরক। ব্যক্তির চরিত্রে নৈতিক চেতনামূলক আচরণ পরিণামে সামাজিক ও ব্যক্তিগত মঙ্গলই আনয়ন করে।

৩। শিক্ষা ও চরিত্র (Education and Character) :

বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ হল এই যে, এই শিক্ষা পরীক্ষার উপর খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করে এবং ছাত্রদের চরিত্রবিকাশ বা যে সব কার্যাবলীর দ্বারা শিক্ষার্থীর সুষম ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তার উপর বিশেষ নজর প্রদান করে না। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) চরিত্র শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আমরা কমিশনের বিবরণী অনুযায়ী এক্ষণে চরিত্র শিক্ষার মূল নিয়ম এবং এ সম্পর্কে বিদ্যালয়ের কতটুকু দায়িত্ব আছে তা আলোচনা করছি।

বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সহযোগিতা (Need for Co-operation between School & Community): শুরুতেই এটা আমাদের জানা উচিত যে এক বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যালয়ও একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং আমাদের জাতীয় জীবনে যে আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রভৃতি বর্তমান থাকে তারই প্রতিফলন বিদ্যালয়ে লক্ষ্য করি। তাই অনেকে বিদ্যালয়কে সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি (replica of the society) বলে অভিহিত করে থাকেন। বিদ্যালয়ে যখন আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা, কর্তব্যে অবহেলা এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখি, তখন একথা ভুললে চলবে না যে, এ সমস্ত আমাদের বৃহত্তর সমাজের ত্রুটির প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। এর অর্থ এই নয় যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের কোন দায়িত্ব নেই। শুধু সমস্যার

গভীরতা ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমরা একথা উল্লেখ করছি। আমরা বিশ্বাস করি, চরিত্রগঠনেব দায়িত্ব বিদ্যালয়েই প্রথম শুরু হওয়া চাই। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা ছাত্র-সমাজকে বৃহত্তব ও মহত্তর সমাজের সুনাগরিক রূপে গঠন করার সুমহান কাজে তাঁরা ব্রতী। নীরস প্রাণহীন পাঠ্যসূচীর উপরই কেবলমাত্র তাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন না, একথা তাঁদের স্মরণ রাখা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, চবিত্র শিক্ষার ব্যাপাবে বিদ্যালয়কে অভিভাবক ও জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্য পেতে হবে। ছাত্ররা সাধারণতঃ দিনের এক পঞ্চমাংশ সময় বিদ্যালয়ে যাপন কবে এবং বাকী সময়টুকু পরিবার ও সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষভাবে জড়িত থাকে। সুতরাং সামাজিক সকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়কে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।

তৃতীযতঃ, একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, চরিত্র-শিক্ষা একটি বিবাট সমস্যা তাই প্রতিটি শিক্ষক সুপরিকল্পনাব মাধ্যমে এই গুরুদাযিত্ব বহন করতে প্রস্তুত থাকবেন। এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের সম্মেলন, আলোচনা প্রভৃতিব প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। কমিশন মনে করেন যে, বিদ্যালয়ের সকল কাজকে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে আকর্ষণীয় কবে তুললে এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশকে উপযুক্ত করে সৃষ্টি করলে ছাত্রদেব চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে অনেক সুফল পাওয়া যাবে।

অধ্যয়ন ও চরিত্র সংগঠন (Studies and character formation): যদিও চরিত্র গঠনেব ব্যাপারে ছাত্রদের নানাবিধ সংগঠনমূলক কাজের উপর আমরা গুরুত্ব প্রদান করে থাকি, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে চরিত্র গঠনেব উপর বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। উপযুক্তভাবে পাঠ্যসূচীর উপর শিক্ষাদান, বিশেষভাবে সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে ছাত্রদেব পবিচিতি, তাদেব মনে তার আপন পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহল ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করবে। অধ্যয়নেব অভ্যাসকে উৎসাহিত করলে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে রুচি ও মূল্যবোধ নিজেই সৃষ্টি করতে পারবে।

৮। চরিত্র-শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের পন্থা (Character Training & Method of forming good character):

চরিত্র ব্যক্তিত্বের মত অনেকটা অর্জিত গুণ। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন। আর ব্যক্তিত্বকে বিশেষ মূল্যবোধে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করাই চরিত্র-শিক্ষা। সুতরাং শিক্ষা মানব চরিত্রের উন্মেষসাধন করে এতে কোন অত্যুক্তি নেই। আমাদের

গতানুগতিক শিক্ষায় বহির্জাত শৃঙ্খলা বা কতকগুলি কঠোর নিয়ম আরোপ করে চরিত্র শিক্ষার কাজ সমাধা করার চেষ্টা করা হত। কতকগুলি বিমূর্ততত্ত্ব ও নীতি (abstract principles) শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করে, শিক্ষার্থীকে সে তত্ত্বগুলি বাস্তবে মেনে চলার উপদেশ প্রদানই ছিল সেদিনকার চরিত্র-শিক্ষা। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্ব দেখিয়েছে যে এ ধরনের চরিত্র-শিক্ষার কোন গুরুত্ব শিক্ষার্থীর জীবনে স্থায়ী হতে পারে না। ব্যক্তির নিজস্ব সামাজিক ও নৈতিক কল্যাণসাধক গুণাবলী অর্জন করাই শিশুর চরিত্র গঠন, আর এগুলি শিশুর জীবনে যাতে সৃষ্টি হয় তার অনুকূলে শিক্ষা পরিচালনাই চরিত্র-শিক্ষা। বলা বাহুল্য, কতকগুলি নৈতিক অনুশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে নিতান্ত যান্ত্রিক ও অন্ধভাবে শিশুকে দিয়ে সে গুলির অনুকরণ না করানোই যুক্তিসঙ্গত। শিশুর চরিত্র শিক্ষণকে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক, যুক্তিধর্মী ও স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা চাই।

কি কি পন্থা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর চরিত্র সুগঠিত হতে পারে, নিম্নে সে পন্থাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রদান করছি। বলাবাহুল্য, এই পন্থাগুলির সার্থকতা নির্ভর করছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজ সকলের সহযোগিতার উপর।

(১) **উপযুক্ত শিক্ষাক্রম প্রবর্তন**: শিক্ষার্থীর চরিত্র সংগঠনের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় উপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। আমাদের পরীক্ষাসর্বস্ব শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র সংগঠনের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পাঠক্রমে নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষার স্থান থাকা উচিত।

(২) **পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ**: ব্যক্তির জীবনে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। এজন্য কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ে সুপরিবেশ সৃষ্টি করা চাই। পরিবেশের প্রভাবেই ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রলক্ষণগুলির বিকাশসাধন সম্ভব হয়। এ জন্য পরিবেশকে উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় যাতে শিক্ষার্থীর জীবনে অভিপ্রেত চারিত্রিক গুণাবলী বিকাশ লাভ করে।

(৩) **সদাচরণ**: সদাচরণ পরিবেশের একটি অঙ্গ। শিশুর চরিত্র সংগঠনের জন্য পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিরা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ করবেন। কারণ, শিশুর মন অনুকরণধর্মী—সে তার আশপাশে যা দেখে তাই অনুকরণ করে। সুতরাং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যাতে শিশুর অনুকরণযোগ্য হয়, সেজন্য বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুর সামনে আদর্শ আচরণে অভ্যস্ত হবেন।

(৪) **সমাজ-চেতনা সৃষ্টি**: শিশুর চরিত্র গঠনের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা হল শিশুকে সমাজ-জীবনে উদ্বুদ্ধ করা। সকলের প্রতি শিশুর অনুরাগ, আকর্ষণ বৃদ্ধিই শিশুর

সামাজিক বোধের জাগরণ। এর ফলেই শিশুর মনের মধ্যে সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তি, সহযোগিতা প্রভৃতি দানা বাঁধে। সুতরাং গৃহে এবং বিদ্যালয়ে শিশুর সমাজ-চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে।

(৫) **সহপাঠক্রমের গুরুত্ব প্রদান:** সহপাঠক্রমের অন্তর্গত কার্যাবলীর দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলপ্রীতি, নিয়মনিষ্ঠা ও সমবেত কাজের প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি বৃদ্ধি করা যায়। শিশুর জীবনে অনেক অভীষ্ট আচরণ নানা গঠন ও সৃজনমূলক কার্যাবলীর দ্বারা প্রবর্তিত করা যায়।

(৬) **বাস্তবধর্মী শিক্ষা:** চরিত্র সংগঠন করা শিশুর কাছে তত্ত্বালোচনা বা নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করা নয়। বিমূর্ত নীতি বা তত্ত্বকে ব্যাখ্যা না করে নীতিগুলির বাস্তব প্রয়োগশীলতার সার্থকতা সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করা এবং বাস্তব উদাহরণের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী শিশুর কাছে উপস্থাপিত করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

৫। চরিত্রের বিকাশ (Development of Character):

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র উভয়ই সহজাত নয়, অর্জিত। জন্মগত উপাদান ও পরিবেশের পরস্পর মিশ্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। অবশ্য শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার ব্যক্তিত্ব নানা ধারায় বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু চরিত্র গঠনের কাজ অতি শৈশবে শুরু হয় না। শিশুর মনে যখন সামাজিক ও নৈতিক বিচারবোধ জাগ্রত হতে থাকে তখনই চরিত্রের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ শুরু হবার পরে বিশেষ বিশেষ স্তরে চরিত্র বিকাশ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে ম্যাকডুগাল প্রদত্ত সংব্যাখ্যানটি উল্লেখযোগ্য। ম্যাকডুগাল মানবচরিত্রের বিকাশকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। চরিত্রকে তিনি প্রবৃত্তি (instinct) ও প্রক্ষোভের (emotion) যৌথ বিকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

ম্যাকডুগাল বলেন, অতি শৈশবে বা প্রথম পর্যায়ে শিশুর জীবনে প্রবৃত্তির প্রাধান্য বর্তমান। সুখ বা দুঃখানুভূতির দ্বারা শিশুর প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। পরিজনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক চেতনা বা সামাজিক প্রভাব চরিত্রবিকাশের প্রথম স্তরে দেখা যায় না।

দ্বিতীয় স্তরে, শিশুর জীবনে পরিবেশ বা সামাজিক প্রভাব কিছুটা ক্রিয়াশীল হয়, তার ফলে শিশুর প্রবৃত্তিতাড়িত আচরণে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ম্যাকডুগাল বলেন, দ্বিতীয় স্তরে নৈতিক রস (moral sentiment) জন্মলাভ করে। শিশুর একান্ত নিজস্ব পরিবেশ, বাড়িঘর, আপনজন ও খেলার সামগ্রীকে ঘিরে নৈতিক রস বৃদ্ধি লাভ

করে। তবে তখন কোন বিমূর্ত বিষয়ে শিশুর মন প্রধাবিত হয় না। ম্যাকডুগালের মতে চরিত্রের বিকাশ এই দ্বিতীয় স্তরেই প্রকৃত পক্ষে শুরু হয়।

তৃতীয় স্তরে, শিশুর জীবনে সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক বা আত্মীয় পরিজনের নিন্দা বা প্রশংসা শিশুর আচরণকে তখন গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এ স্তরেই বিমূর্ত বস্তু বা ধারণার প্রতি শিশুর নৈতিক রস জন্মায়। সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, সততা, দয়া প্রভৃতি বিমূর্ত ধারণার দ্বারা ব্যক্তি তখন নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ম্যাকডুগাল এই নৈতিক রসের আবির্ভাবকে চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। এই নৈতিক রস দ্বিমুখী, যে ধারণা বা বস্তুকে আমরা শ্রেয় ও প্রেয় বলে গ্রহণ করি বা নৈতিক মূল্য প্রদান করি, সে ধারণা বা বস্তুর বিপরীতধর্মী ধারণা বা বস্তুকে আমরা মূল্য দিই না এবং পরিহার করার চেষ্টা করি। এই নৈতিক রস সামাজিক চেতনা ও সমাজ-জীবনের মধ্যে পুষ্টিলাভ করে। সমাজ ছাড়া এর কল্পনা করা যায় না।

চতুর্থ পর্যায়ে, শিশুর জীবনে নৈতিক ও সামাজিক আদর্শবোধ দৃঢ় হয় এবং এদের নিয়ন্ত্রণে তার সকল আচরণ এমনকি ধ্যান ধারণাও নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্ধিত হতে থাকে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মূলতঃ চরিত্র বিকাশকে আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারি। কারণ, প্রথম স্তরটি আসলে ব্যক্তিত্বের স্তর। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র সমপর্যায়ভুক্ত নয়, যদিও ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অবিচ্ছেদ্য।

অষ্টম অধ্যায়

সংবেদন ও প্রত্যক্ষ

(Sensation and Perception)

১। সংবেদন কাকে বলে? (What is Sensation ?) :

সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপকের সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ ঘটে এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হয় এবং সেই উদ্দীপনা ঐ স্নায়ুর মাধ্যমে যখন মস্তিষ্কে পৌঁছায় তখন ঐ উদ্দীপক সম্বন্ধে যে প্রাথমিক চেতনা বা বোধের সঞ্চার হয় তাকেই সংবেদন বলে। মনোবিদ্ সালি (*Sully*) সংবেদনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন--"একটি অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হলে যখন এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় তখন তার দ্বারা সৃষ্ট সহজ মানসিক প্রক্রিয়া হল সংবেদন।"[1] পথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক ঝলক আলো চোখের উপর এসে পড়ল। আমার চোখের উপর আলো পড়তেই, সেই উদ্দীপনা চোখের মধ্যে অক্ষিপটের সঙ্গে যুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছল এবং উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধের সৃষ্টি হল।

সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ

প্রথমে আলোর যে প্রাথমিক চেতনা বা বোধ তাহল সংবেদন এবং পরে এই সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করলাম মোটর গাড়ীর হেড লাইটের বিচ্ছুরিত আলোক বলে, তখন তা হয়ে উঠল প্রত্যক্ষণ (Perception)। দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তনও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে।

সংবেদনের সংব্যাখ্যান হল প্রত্যক্ষণ

বাইরের জগতের জ্ঞান লাভ করার জন্য মানুষকে তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। বাইরের জগতের উদ্দীপক আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, যথা—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকের উপর ক্রিয়া করে। ইন্দ্রিয় ও উদ্দীপকের সন্নিকর্ষে আমাদের মনে পাঁচ প্রকারের, যথাক্রমে—দৃষ্টিগত সংবেদন, শ্রবণজাত সংবেদন, স্বাদগত সংবেদন, ঘ্রাণগত এবং ত্বকজাত সংবেদন উৎপন্ন হয়। এই সংবেদনের ফলে আমরা বস্তুর গুণগুলিকে জানতে পারি। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক

সংবেদনের তিনটি উপাদান—উদ্দীপক, স্নায়ুতন্ত্র এবং মন

1. "Sensation is a simple-phychical phenomenon resulting from the stimulation of the peripheral extremity (i. e., outer end) of an afferent nerve when this is propagated to the brain." —*Sully*,

(Stimulus) দেহের অর্থাৎ, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে মনের উপর ক্রিয়া করে এবং তারই ফলে সংবেদন সৃষ্টি হয়। সুতরাং সংবেদনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় আছে, যথা—(১) উদ্দীপক (২) দেহ অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র এবং (৩) মন।

২। উদ্দীপক কাকে বলে? (What is Stimulus?):

য দেহে উদ্দীপনা ঘটাতে সমর্থ তাকেই উদ্দীপক বলে। উদ্দীপক সংবেদনের মূল কারণ। বহির্জগতের কোন বস্তু উদ্দীপক হতে পারে বা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তনও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে। বহির্জগতের কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে এবং সেই উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে বাহিত হলে সংবেদন সৃষ্ট হয়। যেমন, বায়ু তরঙ্গ কর্ণকে উদ্দীপিত করে শব্দ সংবেদন (Sound sensation) উৎপন্ন করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক সংবেদনের (Organic sensation) ক্ষেত্রে উদ্দীপক থাকে দেহের ভিতরে। দেহগত পরিবর্তনের ফলেই এই জাতীয় সংবেদন উৎপন্ন হয়। এই উদ্দীপক দু-প্রকারের হতে পারে। পর্যাপ্ত উদ্দীপক (adequate stimulus) এবং অপর্যাপ্ত উদ্দীপক (inadequate stimulus)।

উদ্দীপক বহির্জগতের বস্তু বা দেহাভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন হতে পারে

যে উদ্দীপক স্বাভাবিকভাবেই কোন ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে একটি বিশেষ সংবেদন উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট তাকে ঐ ইন্দ্রিয়ের এবং সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক (adequate stimulus) বলে। যেমন, আলোকরশ্মি চক্ষুকে উদ্দীপিত করে দৃষ্টিগত সংবেদন, তরল পদার্থ জিভের উপর ক্রিয়া করে স্বাদগত সংবেদন, গ্যাসীয় পদার্থ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে ঘ্রাণ সংবেদন উৎপন্ন করার পক্ষে পর্যাপ্ত উদ্দীপক (adequate stimulus)। যে উদ্দীপক স্বাভাবিক ভাবে কোন উদ্দীপনা উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, অথচ তা উৎপন্ন করে সেই উদ্দীপক ঐ সংবেদনের অপর্যাপ্ত উদ্দীপক (inadequate stimulus)। যেমন দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন, গা বমি বমি করা এই দৈহিক সংবেদন উৎপন্ন করে। কিন্তু অনেক সময় কোন পচা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু দেখা মাত্রই গা বমি বমি করে। এক্ষেত্রে পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু বা গা বমি বমি করা—এই দৈহিক সংবেদনের অপর্যাপ্ত উদ্দীপক।

পর্যাপ্ত উদ্দীপক ও অপর্যাপ্ত উদ্দীপক

৩। সংবেদনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sensation):

সংবেদনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে যার মাধ্যমে তাকে আমরা অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করে নিতে পারি। যথা—

(ক) প্রত্যক্ষণ বা জ্ঞানের সরলতম উপাদান হল সংবেদন। সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়। সংবেদনের মাধ্যমেই আমরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি।

সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়

(খ) সংবেদনের উৎস কোন উদ্দীপক। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক বা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন দেহের উপর ক্রিয়া করে সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে।

উদ্দীপক সংবেদন সৃষ্টি করে

(গ) সংবেদন এক ধরনের বস্তুকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা (Objective mental state), অনুভূতিও মানসিক অবস্থা। তবে সংবেদনের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? অনুভূতি বস্তুকেন্দ্রিক নয়, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective)। আমার আনন্দ, আমার দুঃখ, আমার মনের অবস্থা কোন বস্তুর গুণ নয়। কিন্তু সংবেদন মানসিক অবস্থা হলেও বস্তুকেন্দ্রিক। যেমন, কোন রঙের সংবেদন। এই রঙ কোন বস্তুর গুণ, আমার মনের কোন অবস্থা নয়। কাজেই সংবেদনটি বস্তুনির্ভর।

সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা

(ঘ) সংবেদন মূলতঃ নিষ্ক্রিয় অবস্থা, অর্থাৎ সংবেদনের ক্ষেত্রে মন নিষ্ক্রিয়ভাবে বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে। ব্যক্তি কি ধরনের সংবেদন লাভ করবে, তা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না—তা যেন বাইরে থেকে ব্যক্তির উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। নীল রঙকে ইচ্ছা করলে সবুজ রঙ বলে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। সংবেদন সৃষ্ট হবার পর মন অবশ্য সক্রিয় হয়, কারণ মনের দ্বারা সংব্যাখ্যাত হয়ে সংবেদন প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়।

(ঙ) সংবেদন যেন জোর করেই আমাদের চেতনার রাজ্যে উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয় যদি বিকল না হয় এবং সুস্থ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি উদ্দীপকের সংযোগ ঘটে, তাহলে সংবেদন সৃষ্ট হবেই। আকাশপথে যখন উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে তখন এই শব্দ আমাকে শুনতেই হয়, আমি নিজে এই অবস্থা সৃষ্টি করি না।

সংবেদন জোর করেই চেতনার রাজ্যে উপস্থিত হয়

(চ) সংবেদনের মাধ্যমে বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করি।

৪। সংবেদনের ধর্ম বা লক্ষণ (Attributes of Sensation):

মনোবিদ্‌দের মতে সংবেদনকে পরস্পর থেকে পৃথক করতে হলে সংবেদনের তিন ধরনের ধর্ম বা লক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাগতে হবে। যথা—(ক) **গুণগত ধর্ম**

(Quality), (খ) **পরিমাণগত ধর্ম** (Quantity) এবং (গ) **স্থানীয় ধর্ম** (Local character)।

(ক) **গুণগত ধর্ম** (Quality): মনোবিদ্ টিচেনার (*Titchener*)-এর মতে কোন একটি সংবেদনের গুণ হল সেই বৈশিষ্ট্য যা তাকে অপর একটি সংবেদন থেকে পৃথক করে। এই গুণের জন্যই সংবেদনটি ঠিক যা তাই, অর্থাৎ যার জন্য লাল রঙের সংবেদন সবুজ বা নীল রঙের সংবেদন নয়। তেমনি দৃষ্টিগত সংবেদন এবং শ্রবণগত সংবেদনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বর্তমান। এই গুণগত পার্থক্য দু-প্রকারের হতে পারে—**জাতিগত** (generic) এবং **উপজাতিগত** (specific)। যেমন, শ্রবণগত এবং দৃষ্টিগত সংবেদনের মধ্যে যে পার্থক্য তা হল জাতিগত পার্থক্য (generic difference)। আবার মিষ্ট এবং তিক্ত উভয়ই স্বাদগত সংবেদন; এদের পার্থক্য উপজাতিগত পার্থক্য (specific difference)। অনুরূপভাবে সবুজ রঙ ও নীল রঙের সংবেদনের পার্থক্য হল উপজাতিগত। কিন্তু লাল রঙের সংবেদনের সঙ্গে কোন বস্তুর স্পর্শগত সংবেদনের পার্থক্য হল জাতিগত।

গুণগত পার্থক্য দুই প্রকার—জাতিগত এবং উপজাতিগত

জাতিগত পার্থক্যের কারণ হল উদ্দীপক, ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ুগুলির বিভিন্নতা; যেমন, অক্ষিমূলক স্নায়ু (optic nerve) শ্রবণমূলক স্নায়ু (auditory nerve) ইত্যাদি। এই বিভিন্ন স্নায়ুগুলি এক, না এগুলির গঠনের মধ্যে পার্থক্য আছে, সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

(খ) **পরিমাণগত ধর্ম** (Quantity): একটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের সংবেদন এবং একটা হাজার শক্তির বৈদ্যুতিক বাতির আলোকের সংবেদন উভয়ই একজাতীয় অর্থাৎ আলোক-সম্পর্কীয় সংবেদন; তবু এরা ঠিক এক নয়। এক ক্ষেত্রে সংবেদন ক্ষীণ, অন্য ক্ষেত্রে তীব্র। উভয়ের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য বর্তমান।

এই পরিমাণগত পার্থক্য তিন প্রকারের হতে পারে; যথা—(i) **তীব্রতা** (Intensity), (ii) **স্থিতিকাল** (Duration) এবং (iii) **ব্যাপ্তি** (Extensity)।

(i) **তীব্রতা** (Intensity): দুটি একই জাতীয় সংবেদন কম তীব্র বা বেশী তীব্র হতে পারে। যেমন, কোন মানুষের চুপি চুপি কথা বলার শব্দ এবং বাজ পড়ার শব্দ; উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোক এবং ক্ষীণ প্রদীপের আলোক; একটি গোলাপ ফুলের গন্ধ এবং একগোছা গোলাপ ফুলের গন্ধ—এই জাতীয় পার্থক্য হল তীব্রতার পার্থক্য। সংবেদনের শক্তি উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

(ii) **স্থিতিকাল** (Duration): প্রত্যেক সংবেদন কিছু সময় ধরে স্থায়ী হয়।

যতটুকু সময় ধরে সংবেদনটি স্থায়ী হয় তাহল সংবেদনের স্থিতিকাল। যথা—একটি রঙের দিকে এক মিনিট তাকান, আর দশ মিনিট তাকান ; একটি গোলাপ ফুলের গন্ধ এক মিনিট ধরে নেওয়া, আর দশ মিনিট ধরে নেওয়া ; একটি বাঁশী বেজেই থেমে যাওয়া, আর একটা বাঁশীর একটানা শব্দ—প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম থেকে দ্বিতীয় সংবেদনের স্থিতিকাল অধিক। অবশ্য এই স্থিতিকাল উদ্দীপকের অবস্থান সময়ের উপর অনেকাংশে নিভর করে। আবার কোন কোন সময় উদ্দীপক অন্তর্হিত হবার পরও সংবেদনের রেশটুকু থেকে যায়। এই ক্ষণস্থায়ী সংবেদনকে বলা হয় উত্তর-সংবেদন বা উত্তর-প্রতিরূপ (After-sensation or After-image)।

(iii) **ব্যাপ্তি** (Extensity): সংবেদনের ব্যাপ্তি মানে যতটুকু জায়গা জুড়ে সংবেদনটি অনুভূত হচ্ছে, অর্থাৎ দেহের কতটুকু জায়গা জুড়ে উদ্দীপনা ঘটছে তার উপর নির্ভর করছে সংবেদনের এই ব্যাপ্তি। প্রথমে আকাশে একটি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে, তারপর চাঁদের দিকে তাকালাম। উভয়ই দৃষ্টিগত সংবেদন, কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে যে প্রভেদ তাহল ব্যাপ্তির। হাতের উপর প্রথমে একটি মুদ্রা রাখলাম। তারপর পাশাপাশি আর একটি মুদ্রা রাখলাম। প্রথমে বারের তুলনায় দ্বিতীয় বারের সংবেদনের ব্যাপ্তি বেশী।

মনোবিদ্ জেমস (*James*)-এর মতে ব্যাপ্তি হল সংবেদনের একটি সাধারণ লক্ষণ। দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদন ছাড়াও শব্দ, ঘ্রাণ এবং স্বাদ জনিত সংবেদনেরও ব্যাপ্তি আছে। শব্দ কম জায়গা জুড়ে থাকতে পারে বা বেশী জায়গা জুড়ে থাকতে পারে, যেমন, চড়াই পাখীর আওয়াজ বা বাঘের গর্জনের আওয়াজ। ঘ্রাণ এবং স্বাদ সংবেদনও কম বেশী জায়গা জুড়ে থাকতে পারে। মনোবিদ্ টিচেনারের (*Titchener* -এর মতে দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনের কেবল এই লক্ষণ আছে। শ্রবণ, স্বাদ ও গন্ধ সংবেদনের নেই।

(গ) স্থানীয় ধর্ম (Local character): আমাদের ইন্দ্রিয়ের দেহগত অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের ফলে সংবেদনের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাকেই সংবেদনের স্থানীয় ধর্ম বলা হয়। আমি চোখ বুজে রয়েছি, আমার এক বন্ধু পেন্সিল দিয়ে পর পর আমার চোখ, মুখ, কান, কপাল স্পর্শ করতে লাগল। আমি চোখ বুজে থাকলেও বলে দিতে পারব দেহের কোন্ অংশটি স্পর্শ করা হচ্ছে। কারণ, দেহের বিভিন্ন অংশের স্পর্শসংবেদনের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয় ধর্ম। দেহের বিভিন্ন স্থানের স্পর্শকাতরতার ভিন্নতার ফলে এই তারতম্য দেখা দেয়।

এ ছাড়াও সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যটি হল সংবেদনের **অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য** (Hedonic or Affective tone)। কোন কোন মনোবিদের মতে প্রত্যেক সংবেদনের সঙ্গে একটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগার বোধ জড়িত থাকে। যেমন, খুব তীব্র আলোর দৃষ্টিগত সংবেদন অস্বস্তিকর মনে হয়; বিকট শব্দের সংবেদন বিরক্তি উৎপাদন করে, গোলাপ ফুলের গন্ধের সংবেদন প্রীতিপ্রদ মনে হয়। অবশ্য সংবেদনের 'অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য' সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়।

সংবেদনের অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য

৫। সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Sensations) :

সংবেদনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা—(ক) **ইন্দ্রিয় সংবেদন** (Sensorial sensations), (খ) **দৈহিক সংবেদন** (Organic sensations) এবং (গ) **পেশীগত সংবেদন** (Muscular sensations)।

(ক) **ইন্দ্রিয় সংবেদন** (Sensorial Sensations) : আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে; যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক। বাইরের জগৎ এই সকল ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে আমাদের মনে পাঁচ প্রকারের সংবেদন সৃষ্টি করে, যথা—দৃষ্টিগত (Visual), শ্রবণগত (Auditory), স্পর্শগত (Tactual), ঘ্রাণগত (Olfactory) এবং স্বাদগত (Gustatory)।

(খ) **দৈহিক সংবেদন** (Organic Sensations) : দেহের অভ্যন্তরে যেসব যন্ত্রগুলি অবস্থিত, যেমন—পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, ফুসফুস প্রভৃতির ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তনের জন্য যেসব সংবেদনের সৃষ্টি হয় তাদের দৈহিক সংবেদন বলে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতি দৈহিক সংবেদনের উদাহরণ। দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি পরিপাকক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের উৎস।

(গ) **পেশীগত সংবেদন** (Muscular Sensations) : পেশীগুলি সঞ্চালিত হবার ফলে যে সংবেদনের উদ্ভব হয় তাকে পেশীগত সংবেদন বলে। বিভিন্ন কর্ম-সম্পাদনের জন্য আমাদের অঙ্গকে সঞ্চালিত করা প্রয়োজন। এই অঙ্গ সঞ্চালনের জন্য দেহের পেশী, তন্তু এবং দেহের বিভিন্ন সংযোগস্থলে পরিবর্তন ঘটে ও তারই ফলে এই ধরনের সংবেদন আমরা পেয়ে থাকি।

এবার বিস্তারিতভাবে এই তিন শ্রেণীর সংবেদনের আলোচনা করা যাক :

(ক) **ইন্দ্রিয় সংবেদন** (Sensorial Sensations) : আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের

সাহায্যেই আমরা এই সংবেদন লাভ করি। বাইরের জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির উপর ক্রিয়া করে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেই উদ্দীপনা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছায়, তারই ফলে আমাদের মনে ইন্দ্রিয় সংবেদনের সৃষ্টি হয়। চোখ দিয়ে আমি লাল গোলাপ ফুলটি দেখি, এরই ফলে আমার দৃষ্টিগত সংবেদন হয়। কান দিয়ে কোন শব্দ শুনি, এতে আমার শ্রবণগত সংবেদন হয়। এই সংবেদনগুলির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে :

(১) এই জাতীয় সংবেদনের সাহায্যে আমরা জ্ঞান লাভ করি। বস্তুর গুণ সম্পর্কে যে জ্ঞান, তা এই সব সংবেদনের মারফত আমাদের কাছে এসে থাকে।

সংবেদনগুলি জ্ঞানের উপাদান যোগায়

রঙের সংবেদন আমাদের বস্তুর রঙ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। শ্রবণগত, স্বাদগত, ঘ্রাণগত এবং স্পর্শগত সংবেদন বাহ্যিক বস্তুর বিভিন্ন গুণগুলিকে জানতে সহায়তা করে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এ জাতীয় সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়।

সংবেদনগুলিকে পরস্পর পৃথক করা চলে

(২) এই জাতীয় সংবেদনগুলিকে পরস্পর থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা চলে এবং বাইরের জগতেই যে তাদের উৎস রয়েছে তাও নির্ধারণ করা চলে।

(৩) এই জাতীয় সংবেদনগুলি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং এদের মধ্যে মাত্রাগত তারতম্যও লক্ষিত হয়। যেমন, দৃষ্টিগত সংবেদন এবং শ্রবণগত সংবেদন

সংবেদনগুলির মধ্যে মাত্রাগত তারতম্য

—দুটি ভিন্ন সংবেদন। আবার এই দৃষ্টিগত সংবেদনের মধ্যেও মাত্রার তারতম্য আছে। যেমন, উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকের সংবেদন এবং প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের সংবেদন। চুপি চুপি কথা বলা আর মেঘের গুরু গুরু গর্জন—এগুলি একই জাতীয় সংবেদন হয়েও মাত্রাগত ভাবে পৃথক।

(৪) এই জাতীয় সংবেদন ইন্দ্রিয়নির্ভর, যেহেতু ইন্দ্রিয়গুলি বাইরের জগৎ

এই জাতীয় সংবেদন ইন্দ্রিয়নির্ভর

থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে অন্তর্মুখী স্নায়ুর সাহায্যে তাকে মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। এই বৈশিষ্ট্যই বিশেষ করে ইন্দ্রিয় সংবেদনকে দৈহিক সংবেদন থেকে পৃথক করে।

(খ) **দৈহিক সংবেদন** (Organic Sensations) : আমাদের দেহের জটিল সংগঠনকে বোঝাবার জন্য আমরা দেহকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে থাকি। কোন একটি বড় যন্ত্রের মধ্যে যেমন ছোট ছোট অসংখ্য যন্ত্র থাকে, আমাদের এই দেহের মধ্যে তেমনি অসংখ্য যন্ত্র আছে ; যেমন, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, যকৃৎ, নানা রকমের গ্রন্থি

ইত্যাদি। এই সব যন্ত্রগুলি যদি সুচারুরূপে তাদের কাজ সম্পন্ন করে তবেই দেহের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সম্ভব হয় এবং ঐ যন্ত্রগুলিব কোনটি যদি বিকল হয় তবে দেহ আর সুস্থভাবে কাজ করতে পাবে না। এই আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির মধ্যে যখন কোন পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সেই পরিবর্তনেব ফলে উদ্দীপনা যখন স্নায়ুপথ বেযে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছায় তখন আমবা যে সংবেদন পেযে থাকি তাকেই দৈহিক সংবেদন বলে। এই দৈহিক সংবেদন বিভিন্ন প্রকাবেব হতে পারে।

দেহেব অভ্যন্তবস্থ যন্ত্রগুলিব মধ্যে পবিবর্তন ঘটলে দৈহিক সংবেদনেব সৃষ্টি হয

প্রথমতঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে, যে সংবেদনের উৎসস্থল আমরা সঠিকভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ কবতে পাবি (those that are localisable)। যেমন, দেহের কোন স্থান যদি কেটে যায বা পুডে যায় তাহলে দগ্ধ স্থানটি বা ক্ষতস্থানটি আমরা সুস্পষ্টরূপে নিদেশ কবতে পারি।

কতকগুলি দৈহিক সংবেদন সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ কবা যায

দ্বিতীযতঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে, যেগুলিকে আমবা অস্পষ্টভাবে নিদেশ করতে পারি (vaguelv localisable)। যেমন—যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলীর ক্রিযাকলাপ ইত্যাদি। এই সব যন্ত্রগুলিব ক্রিযাকলাপ যখন সুস্থ বা স্বাভাবিক ভাবে হতে থাকে, তখন কোনবকম সংবেদন আমব৷ পাই না। কিন্তু যদি পাকস্থলীব কাজ স্বাভাবিকভাবে না ঘটে, তাহলেই আমবা সংবেদন পেয়ে থাকি এবং এই সংবেদনেব স্থান অস্পষ্টভাবে নির্দেশ কবতে পারি।

কতকগুলি দৈহিক সংবেদন অস্পষ্টভাবে নির্দেশ কবা যায

তৃতীয়তঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে, যেগুলির স্থান দেহের মধ্যে কোথাও নির্দেশ করা সম্ভব হয না (not localisable)। যেমন, আরাম বা অস্বস্তির অনুভূতি। এই ধবনেব সংবেদন হয় সমগ্র শরীরকে কেন্দ্র কবে। এ হল ভিন্ন ভিন্ন সংবেদনের একটি মিশ্রিত রূপ। একে *Stout* বলেছেন 'common sensibility' বা 'Coenaesthesis'. শবীবে অস্বস্তি অনুভব করছি, কিন্তু এই উৎস দেহের কোথায তা নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। এই জাতীয সংবেদনের উদাহরণ হল ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। যদিও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার সংবেদনের উৎস হল যথাক্রমে পাকস্থলী, মুখ ও নাকের পশ্চাতের যে গর্তটি, যাকে বলা হয় গল-বিল (Pharynx), তবুও সমস্ত দেহের রক্ত চলাচল এর সঙ্গে যুক্ত। ক্লান্তি, অবসন্নতা, তন্দ্রা, সজীবতা প্রভৃতিও এই জাতীয় সংবেদনের উদাহবণ।

কতকগুলি দৈহিক সংবেদনেব উৎস দেহেব কোথাও স্পষ্টভাবে নির্দেশ কবা যায না

এই সব দৈহিক সংবেদনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমতঃ, বহিঃইন্দ্রিয়গুলি যথা—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকের সঙ্গে এদের কোন সংযোগ নেই। দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই এগুলির কারণ।

দ্বিতীয়তঃ, বাইরের জগতের সংবাদ সরবরাহ করার ব্যাপারে এদের অবদান খুবই সামান্য। এগুলি শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ দিয়ে থাকে। বস্তুতঃ, এই সংবেদনগুলি দেহের সুস্থতা ও অসুস্থতা নির্দেশ করার যন্ত্রস্বরূপ।

তৃতীয়তঃ, এগুলি হল আদিমতম সংবেদন, যেগুলি সম্ভবতঃ, সর্বস্তরের জীবের মধ্যে বর্তমান।

চতুর্থতঃ, ইন্দ্রিয়গত সংবেদনের তুলনায় এগুলি অস্পষ্ট এবং পরস্পর থেকে এগুলিকে পৃথক করাও কঠিন। এগুলির পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রবণতা আছে এবং এগুলিকে সহজে ফিরে পাওয়া যায় না। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার সংবেদন স্মরণ করা খুবই কঠিন।

পঞ্চমতঃ, এই ধরনের সংবেদনের অনুভূতি-সম্পর্কীয় মূল্য জ্ঞানসম্পর্কীয় মূল্যের তুলনায় অনেকখানি। কারণ, আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখের অনেকখানি শারীরিক সুস্থতা ও অসুস্থতার উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তির দেহ সুস্থ, সে হয় কর্মক্ষম, সজীব ও প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা। আবার এই সব সংবেদন আমাদের দেহগত কামনা-বাসনার মূলে বর্তমান যা আমাদের আচরণ নির্ধারণ করে।

(গ) **পেশীগত সংবেদন (Motor or Muscular Sensations) :** পেশীগত সংবেদন এবং ত্বকজাত সংবেদন একই প্রকার সংবেদন নয়। ত্বকজাত সংবেদন হয়, যখন দেহের বহিরাবরণের সঙ্গে কোন উদ্দীপকের সংযোগ ঘটে। পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করলে যে সংবেদন পেয়ে থাকি, তাহল পেশীগত সংবেদন। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যখন সঞ্চালিত করি তখন পেশী, অস্থিবন্ধনী এবং অস্থির সংযোগস্থল থেকে যে সংবেদন উদ্ভূত হয় সেগুলিই হল পেশীগত সংবেদন। টিচেনার প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ পেশীগত সংবেদনকে চেষ্টা-বেদন বা চেষ্টার সংবেদন (Motor or kinaesthetic)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই সংবেদন কিভাবে হয়ে থাকে? আমি যখন দেহের কোন অংশ সঞ্চালিত করি তখন দেহের সেই অংশের পেশীগুলি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। পেশী, অস্থিবন্ধনী এবং অস্থির সংযোগস্থলে যেসব অন্তর্মুখী স্নায়ুর প্রান্ত এসে মিশেছে, পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সেসব স্নায়ু উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপনা যখন মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছায়, তখনই পেশীগত সংবেদন

পেশীগত ও ত্বকজাত সংবেদন ভিন্ন

হয়ে থাকে। চোখে না দেখেও যে আমাদের দেহের কোন্ অংশটিকে সঞ্চালিত করছি তা যে জানতে পারি তার কারণ এই পেশীগত সংবেদন।

আমাদের দু-ধরনের পেশী আছে, কতকগুলি পেশী ইচ্ছার অধীন (voluntary) যেমন—দেহের, স্কন্ধের এবং মুখের পেশীগুলি আর কতকগুলি পেশী আছে যেগুলি আমাদের ইচ্ছার অধীন নয় (non-voluntary); যেমন—পাকস্থলী বা হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরণের সঙ্গে যুক্ত যে পেশীগুলি।

পেশীগত সংবেদনের ক্ষেত্রে ত্বকজাত সংবেদনও বর্তমান থাকতে পারে। যখন আমাদের দেহের বহিরাবরণটি কোন কারণে সংকুচিত হয় তখন পেশীগুলিকে অত্যধিক সঞ্চালিত করার জন্য রক্ত চলাচল বেড়ে যায়, হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় এবং শ্বাস দ্রুত হয়।

আমরা পেশীগত চেতনার (muscle consciousness) কথা বলে থাকি; পেশীগত-চেতনা হল দেহের কোন একটি অংশে শক্তি সঞ্চারিত করে পেশীগুলিকে সংকুচিত ও প্রসারিত করার চেতনা এবং পেশীগত সংবেদন হল পেশী, অস্থিবন্ধনী ও অস্থির সংযোগস্থল থেকে উদ্ভুত যে সংবেদন। সুতরাং পেশীগত চেতনার মধ্যে দুটি দিক আছে, একটি সক্রিয়তার এবং অপরটি নিষ্ক্রিয়তার বোধ। আমি যখন জানালাটি খোলার জন্য ধাক্কা দিচ্ছি, তখন যে দেহে আমিই শক্তি সঞ্চার করছি সে বোধ হল সক্রিয়তার বোধ। আর এই শক্তি সঞ্চারিত করার ফলে, যে পেশী সংবেদন হয়, তাহল নিষ্ক্রিয়তার বোধ।

পেশীগত চেতনা ও পেশীগত সংবেদন

পেশীগত সংবেদনকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা—(১) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থানগত পেশীগত সংবেদন—যখন হাতটিকে না নাড়িয়ে সোজা করে ধরে রাখি, তখন হাতটির বিশেষ অবস্থানই একপ্রকার পেশীগত সংবেদনের সৃষ্টি করে। (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালনগত পেশীগত সংবেদন—যখন সামনে এবং পেছনের দিকে হাতটি নাড়াচাড়া করি, তার ফলে যে পেশীগত সংবেদন হয়। (৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাধাপ্রাপ্ত সঞ্চালনের ফলে যে পেশীগত সংবেদন—কোন মানুষকে ধাক্কা দিতে গিয়ে বা ভার উত্তোলন করার সময় এই সংবেদন হয়ে থাকে।

পেশীগত সংবেদনকে তিনভাগে ভাগ করা যায়

পেশীগত সংবেদন: গুণগত এবং পরিমাণগত, উভয় দিক দিয়েই পৃথক হতে পারে। পেশীগত সংবেদনের গুণ নির্ধারণ করা হয় তার নিষ্ক্রিয়তার উপকরণের উপর

(কারণ সক্রিয়তার দিকটি সকল ক্ষেত্রেই একপ্রকার) এবং কত জোড়া পেশীকে কাজে লাগান হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপঃ আমার ডান হাতটা ডান দিকে এবং বাম দিকে নাড়াবার সময় আমি একরকম সংবেদন অনুভব করি এবং পেছন দিকে নাড়াবার সময় ভিন্ন জাতীয় পেশীগত সংবেদন অনুভব করি, কারণ এক্ষেত্রে দুই প্রস্থ পেশীকে কাজে লাগান হয়েছে।

পেশীগত সংবেদন—গুণগত এবং পরিমাণগত

পেশীগত সংবেদনের পরিমাণ বা তীব্রতা বলতে কতটা শক্তি পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করার জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে তার বোধ এবং তার সঙ্গে নিষ্ক্রিয়ভাবে পেশীগত সংবেদন কতটুকু পাওয়া গেল, উভয়কেই বুঝতে হবে।

পেশীগত সংবেদনের ব্যপ্তি (Extensity) বলতে কতটুকু জায়গা জুড়ে সংবেদন হল তা বুঝায়। একটি আঙ্গুল নাড়লে যে সংবেদন হয় আর হাঁটু বেঁকিয়ে বসতে গেলে যে সংবেদন হয়—উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা হল ব্যাপ্তিগত।

পেশীগত সংবেদনের ব্যাপ্তি

পেশীগত সংবেদনের জ্ঞানগত মূল্য অনেকখানি। পদার্থের মৌলিক গুণ সম্পর্কে জ্ঞান এবং পদার্থের অবস্থান, বিস্তৃতি, ওজন, দূরত্বের জ্ঞান এই পেশীগত সংবেদনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পেশীগত সংবেদনের অনুভূতিমূলক মূল্যও কম নয়। পেশীগত ব্যায়াম আমাদের আনন্দ দেয়। পেশীগুলি সুস্থ থাকলে মানুষ সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে।

৬। অস্থিবন্ধনী-সম্পর্কীয় সংবেদন (The Tendinous Sensation) :

অনেকক্ষণ ধরে কোন কঠিন পেশী-সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত থাকলে, আমরা এমন এক ধরনের সংবেদন অনুভব করি যাকে ঠিক পেশী সংবেদনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা চলে না। যেমন, কুস্তি করার সময়, কোন কিছু টানাটানি করার সময় বা কোন ভার উত্তোলন করার সময় আমরা নিজেরাই সক্রিয় হই এবং আমরা যে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বা চেষ্টা করে কিছু করছি তা বুঝতে পারি। সে কারণে একে আমরা 'চেষ্টা' বা 'পরিশ্রম' (Effort or Exertion) আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু যখন আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে কোন ভারী বস্তু দেহের উপর ধরে রাখি বা একপায়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি, তখন আমরা একটা টান টান ভাব (strain) অনুভব করি। এই অভিজ্ঞতা টনটন করা, ব্যথা ইত্যাদি রূপ ধারণ করে।

অস্থিবন্ধনীই (Tendon) এই টান টান ভাব সংবেদনের উৎস। অবশ্য গল্‌গি আবিষ্কৃত পেশীদণ্ডগুলি ('Spindles of Golgi') এই ধরনের সংবেদনের মূল উৎস।[1] মনোবিদ্ টিচেনার বলেন যে, অস্থিবন্ধনী-সম্পর্কীয় সংবেদনের স্বরূপকে জানতে হলে, ত্বকজাত, পেশীগত এবং অস্থিসন্ধি (Joint) সম্পর্কীয় সংবেদনকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বুঝতে হবে। যা অবশিষ্ট থাকে তাহল একটা টান টান ভাব বা সংবেদন। এই ধরনের সংবেদনের অভিজ্ঞতা খুব সুনির্দিষ্ট নয়।[2]

৭। অস্থিসন্ধিগত সংবেদন (Articular Sense) ঃ

হাত, পা, আঙুল প্রভৃতি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন অস্থির সমবায়ে গঠিত। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করার সময় অস্থি-সন্ধিতে একটা ঘর্ষণের বোধ বা সংবেদন জাগে, একেই অস্থি-সন্ধিগত সংবেদন বলা হয়। চোখ বন্ধ করে হাতের আঙুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে হাতের কব্জিকে যদি আস্তে আস্তে সামনে পেছনে ঘোরান হয় তাহলে যে সংবেদন পাওয়া যায় তাকে সন্ধিগত সংবেদন (Articular Sense) বলে। হাতের পাতা শির শির করা বা ঠাণ্ডা বোধ করা, আঙুলের সন্ধির একপাশ থেকে আর এক পাশ পর্যন্ত তর্জনীর সম্মুখভাগে অথবা অঙ্গুলির পার্শ্বে চাপবোধ এই সংবেদনের লক্ষণ।

৮। সহ-সংবেদন (Synaesthesia) ঃ

একটি ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হওয়ার জন্য সেই ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদন ছাড়াও যখন আরও একটি ইন্দ্রিয়ের সংবেদন পাওয়া যায় তখন তাকে বলা হয় সহ-সংবেদন (Synaesthesia)। যেমন, কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশেষ ধরনের একটি শব্দ শ্রবণ করলে তাদের কাছে সেটি রঙিন বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে শব্দ-সংবেদনের (Sound sensation) সঙ্গে সঙ্গে বর্ণসংবেদনের (Colour sensation) জ্ঞান হচ্ছে, যদিও ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ই কেবলমাত্র উদ্দীপিত হচ্ছে, দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু উদ্দীপিত হচ্ছে না।

৯। প্রত্যক্ষ বলতে কি বুঝি? (What is Perception ?) ঃ

অর্থপূর্ণ সংবেদনকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। বস্তুর নিছক চেতনা বা বোধ হল সংবেদন। **সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখনই তা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ।**

সংবেদনকে ব্যাখ্যা করা হলে বস্তুর নিছক চেতনা একটা বিশেষ ধরনের জ্ঞানে পরিতৃপ্তি লাভ করে। এই বিশেষ ধরনের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।

সংবেদনকে ব্যাখ্যা করলেই তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়

সংবেদনকে ব্যাখ্যা করার অর্থ—এই সংবেদনগুলোর উৎস হিসেবে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব এবং বাহ্যবস্তুর গুণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। প্রত্যক্ষ হল সংবেদনের অর্থবোধ। পথ চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন আমায় পেছন থেকে ডাকছে। প্রথমে কানে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, কিন্তু একটু সচেতন হতেই বুঝতে পারলাম যে, এ স্বর আমার এক পরিচিত বন্ধুর। প্রথম স্তরে স্বরটি ছিল শব্দ-সংবেদন, কিন্তু বন্ধুর কণ্ঠস্বর বলে যখন তাকে বুঝতে পারলুম তখন তা সংবেদনের স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রত্যক্ষে পরিণত হল। যা প্রথমে ছিল একটি অর্থহীন শব্দ-সংবেদন, প্রত্যক্ষ করার ফলে তা হয়ে উঠল অর্থপূর্ণ।

প্রত্যক্ষের বিভিন্ন স্তর : এই প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি স্তর খুঁজে পাই।* যথা—(ক) **পৃথকীকরণ** (Discrimination) : যখন কণ্ঠস্বরটি আমার কানে এসে পৌছাল তখন শ্রবণ সম্বন্ধীয় সংবেদনটিকে দৃষ্টিগত, ঘ্রাণগত এবং স্পর্শগত সংবেদন থেকে পৃথক করলাম।

(খ) **সদৃশকরণ** (Assimilation) : অতীতে এই ধরনের যেসব শব্দ-সংবেদন পেয়েছি তার সঙ্গে এই সংবেদনটির সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। এই স্বর যে মানুষের কণ্ঠস্বর এবং পরিচিত বন্ধুর কণ্ঠস্বর—আমি তা আবিষ্কার করলাম।

(গ) **অনুষঙ্গ ও পুনরুজ্জীবন** (Association and Reproduction) : এবার আমি শ্রবণগত সংবেদনটির সঙ্গে অন্যান্য সংবেদনের সংযোগ সাধন করলাম। আমার বন্ধুটির সঙ্গে আমি অতীতে এক কলেজে পড়েছি, তাকে কতবার দেখেছি, কতবার স্পর্শ করেছি, তার সঙ্গে বসে গল্প করেছি। বন্ধুর কণ্ঠস্বরটি শুনে সেই শ্রবণগত সংবেদনের সঙ্গে দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনগুলিকে আমি সংযুক্ত করলাম। বর্তমান সময়ের সংবেদনটি অতীতের অনেক সংবেদনকে মনে পুনরুজ্জীবিত করল।

(ঘ) **বস্তুচেতনা এবং স্থান নিরূপণ** (Objectification and Localisation) : এর পরে সংবেদনটির উৎস যে কোন বহির্জগতের বস্তু, সেটি উপলব্ধি করি এবং সেই বস্তুটি যে বিশেষ স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানটিও নিরূপণ করি। যেমন, আমি কণ্ঠস্বরটি শুনে বুঝি এটি কোন্ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ও এই কণ্ঠস্বর আমার বন্ধুর এবং একটি বিশেষ স্থান থেকে অর্থাৎ পথের উপরে একটু দূর থেকে বন্ধুটি আমায় ডাকছে।

(ঙ) **বিশ্বাস** (Belief) : আমার বন্ধুই যে আমায় পথের উপর থেকে ডাকছে এই বিশ্বাস মনে জাগে বলেই ছুটে তার দিকে যাই।

প্রত্যক্ষের যে বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ আমরা করলাম তার উপর ভিত্তি করে আমরা প্রত্যক্ষের একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করব।

প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা।

প্রত্যক্ষ হচ্ছে সংবেদনের অর্থযুক্ত রূপ। **যখন কোন একটি সংবেদনকে ভিন্ন জাতীয় সংবেদন থেকে পৃথক করে, সমজাতীয় সংবেদনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নির্দেশ করে, বর্তমানে পুনরুজ্জীবিত অতীতলব্ধ সংবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করে, তার উৎস ও স্থান নির্দেশ করা হয় এবং উৎসটির বাস্তব সত্তায় বিশ্বাস স্থাপন করে সংবেদনটিকে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন এই মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বলে।**

১০। প্রত্যক্ষের স্বরূপ (Nature of Perception):

প্রত্যক্ষ উপস্থাপন-মূলক পুনরুজ্জীবন মূলক প্রক্রিয়া

প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে বলা যেতে পারে **উপস্থাপনমূলক পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া** (Presentative-Representative Process)। প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়ার দুটি দিক আছে। একটি দিক হল উপস্থাপনমূলক—বর্তমানে যে সংবেদনটি আমার কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে; যেমন, আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয় দিকটি হল পুনরুজ্জীবনমূলক —অর্থাৎ বর্তমান সংবেদনটি অতীতলব্ধ অন্যান্য যেসব সংবেদনগুলিকে আমার মনে জাগিয়ে তুলেছে। যেমন, আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর তার সঙ্গে সংযুক্ত যে দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদন আছে সেগুলিকে মনে পুনরুজ্জীবিত করছে।

অর্থাৎ বন্ধুটির কণ্ঠস্বর প্রত্যক্ষপর্যায়ে শুধু যে আমার কাছে উপস্থাপিত (presented) হচ্ছে বা বর্তমানে তা প্রদত্ত বস্তুরূপেই জ্ঞাত হচ্ছে তা নয়, উপস্থাপিত কণ্ঠস্বর প্রত্যক্ষে অস্পষ্ট স্মৃতির আকারে পূর্বেকার জানাশোনা সমজাতীয় বা বিজাতীয় বস্তুর পুনরুপস্থাপনও (representation) ঘটছে। ঐ কণ্ঠস্বর যে আমার বন্ধুরই তার সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞান না থাকলে কেবলমাত্র একটি কণ্ঠস্বরের সংবেদন হতে পারে কিন্তু তা যে আমার বন্ধুরই কণ্ঠস্বর এই প্রত্যক্ষ হতে পারে না। তাই সঠিক প্রত্যক্ষ হতে হলে ঐ স্বরের সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানের উপস্থাপিত কণ্ঠস্বরের সম্বন্ধ আমার জানা থাকা চাই। পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে যে অস্পষ্ট স্মরণ ঘটে ক্রমে ক্রমে তা স্পষ্টতর হয়ে যথাযথ প্রত্যক্ষ সম্ভাবিত হয়। তাই প্রত্যক্ষ পর্যায়ে প্রদত্ত বা উপস্থাপিত বস্তুটি প্রতিরূপের পুনরুপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে রীতিমত ব্যাখ্যাত হয়। এখন তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, কেন আমরা প্রত্যক্ষকে উপস্থাপন ও পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করি। অনেকে অবশ্য একে একটি প্রক্রিয়া না বলে একটি ভাবজট বা বস্তুকূট (complex) হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন।

প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, **প্রত্যক্ষ হল জানা ও চেনার** (Cognition and Recognition) **যুক্ত প্রক্রিয়া**। পূর্বোক্ত উদাহরণটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আমি জানছি যে এটি একটি কণ্ঠস্বর। তারপর সেই কণ্ঠস্বরটিকে আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর বলে চিনছি। জানা ও চেনা এই উভয় প্রক্রিয়া একত্রে যুক্ত হলেই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

প্রত্যক্ষ জানা ও চেনার যুক্ত প্রক্রিয়া

প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াকে আর একদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে একে **সংশ্লেষক** (Synthetic) **প্রক্রিয়াও** বলা যেতে পারে। যখন আমরা কোন একটি বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি তখন তাকে **একটি 'একক'** (unit) বা **সমগ্র** (whole) হিসেবে প্রত্যক্ষ করি, সেটি যে অংশবিশেষের সমন্বয় সেভাবে প্রত্যক্ষ করি না। একটি গাছকে প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা গাছটিকে একটি বস্তু হিসেবেই প্রত্যক্ষ করি। গাছটি যে শাখ, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলের সমন্বয় তা মনে করে প্রত্যক্ষ করি না।

প্রত্যক্ষ সংশ্লেষক প্রক্রিয়া

প্রত্যক্ষ হল **বর্তমানের সঙ্গে অতীতের এবং নতুনের সঙ্গে পুরাতনের সংমিশ্রণ**। যে সংবেদনটি আমি বর্তমানে লাভ করছি, সেটি আমার কাছে নতুন। সেই সংবেদনটি অতীতে লব্ধ পুরাতন এবং পরিচিত সংবেদন-গুলিকে আমার মনে জাগিয়ে তুলছে ও তার সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। সেই কারণেই *Angell* বলেন যে, প্রত্যক্ষ হল 'সংশ্লেষাত্মক অভিজ্ঞতা এবং পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সংযোগ সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় অংশ'।[1]

প্রত্যক্ষ বর্তমানের সঙ্গে অতিতের, নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সংমিশ্রণ

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে **অভিজ্ঞতার ভূমিকা** খুবই উল্লেখযোগ্য। অতীতের অভিজ্ঞতা যতই ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয় বর্তমানের বিষয়গুলির প্রত্যক্ষও ততই পূর্ণাঙ্গ হয়।

এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ হল **অভ্যাস-সাপেক্ষ ব্যাপার**। অবশ্য অভ্যাস বলতে এখানে অবগতিরূপ মানসিক প্রক্রিয়ার অভ্যাসের কথা বলা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা পরস্পর যুক্ত হয়ে যখন ঘটতে থাকে তখনই একটি সংবেদন অপর একটি সংবেদনকে জাগিয়ে তোলে। কোকিলের ডাক শুনতে যে অভ্যস্ত, সে ব্যক্তি কেবলমাত্র স্বরটি শুনেই বুঝতে পারে কী রকমের পাখী ডাকছে। এ স্বরের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, সেই ব্যক্তি স্বরটি যে কোকিলের স্বর তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।

প্রত্যক্ষের দুটি দিক আছে—একটি বাইরের দিক আর একটি মনের দিক। বাইরের দিকটি হল **বস্তুগত দিক** বা **ব্যক্তিনিরপেক্ষ** (Objective) **দিক**;

---

1. *Angell*: Psycholo y ; Page 153

অপরটি হল **মানসিক** বা **ব্যক্তিসাপেক্ষ** (Subjective) **দিক**। মনোযোগ, প্রত্যাশা এবং কামনা হল প্রত্যক্ষের ব্যক্তিসাপেক্ষ দিক যা প্রত্যক্ষের উপর অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।[1] পূর্ব থেকে মনোযোগী ও প্রত্যাশী হয়ে থাকার ফলে এবং বস্তুটির জন্য কামনা থাকায় আমাদের প্রত্যক্ষ কার্যটি অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। আমার পরিচিত বন্ধুর জন্য অত্যন্ত আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য মন যখন কামনায় অধীর তখন তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া তাকে পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য অতিরিক্ত মনোযোগ এবং প্রত্যাশা অমূল প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করে। যেমন, আগে থেকে সাপ দেখতে পাব—এ ভাবনা মনে এমনভাবে উদয় হতে পারে যে, পথের উপর দড়িটিকেও সাপ বলে ভ্রম হয়।

প্রত্যক্ষের দুটি দিক ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও ব্যক্তিসাপেক্ষ

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিসাপেক্ষ উপাদানগুলি (Subjective elements) কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়।

১১। সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ (Relation of Sensation to perception):

সংবেদনকে ব্যাখ্যা করলেই তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সুতরাং সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কয়েক বিষয়ে পার্থক্য বর্তমান।

সাদৃশ্য : প্রথমতঃ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই ইন্দ্রিয়নির্ভর। উদ্দীপক যদি ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে তাকে উদ্দীপিত না করে তাহলে সংবেদন বা প্রত্যক্ষ—কোনটিই সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই বহির্মুখী। বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপনা এলেই তার সংবেদন হয়ে থাকে বা প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

পার্থক্য : (১) সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক বোধ বা অনুভূতি। প্রত্যক্ষ হল সংবেদন এবং তার ব্যাখ্যা। সংবেদনে উদ্দীপনার অর্থ জ্ঞাত হয় না। প্রত্যক্ষে উদ্দীপনার অর্থ জ্ঞাত হয়। অর্থযুক্ত সংবেদনই প্রত্যক্ষ।

(২) সংবেদন জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান বা মালমশলা যোগায় মাত্র। প্রত্যক্ষ

2. Perception may be greatly influenced by the preliminary direction of our attention by expectation or by desire.' —Rex and Knight :
A Modern Introduction to Psychology : Page 103

হল বস্তুর ঘটনার জ্ঞান। মনোবিদ্ জেমস (*James*)-এর ভাষায়—সংবেদন হল কেবলমাত্র বস্তুটির সঙ্গে নিছক পরিচয় (acquaintance), প্রত্যক্ষ হল বস্তুটির সম্পর্কে সম্যক্ বা সুস্পষ্ট জ্ঞান (knowledge)। চোখে আলো এসে পড়তেই তাকে আলোর সংবেদন বলে জানলাম। কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ করলাম, তখনই বুঝলাম ধাবমান গাড়ীর হেডলাইটের তীব্র আলোক আমার চোখের উপর এসে পড়েছে।

(৩) সংবেদন হল বস্তুর গুণের চেতনা, গুণবিশিষ্ট বস্তুর চেতনা নয়। যেমন, লাল রঙের সংবেদন। প্রত্যক্ষ হল বস্তুর অস্তিত্বের চেতনা। যেমন গোলাপ ফুল—লাল রঙটি যার মধ্যে রয়েছে। সে কারণে প্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্বকে আমরা যেমন বিশ্বাস করি, সংবেদনের ক্ষেত্রে তেমন করি না।

(৪) সংবেদনের তুলনায় প্রত্যক্ষ হল অধিকতর সক্রিয় প্রক্রিয়া। প্রত্যক্ষের তুলনায় সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। সংবেদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপনাকে কেবলমাত্র গ্রহণ করি। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়ে তার ব্যাখ্যা করি।

(৫) সংবেদন হল কেবলমাত্র উপস্থাপনমূলক (Presentative)। প্রত্যক্ষ হল উপস্থাপনমূলক এবং পুনরুজ্জীবনমূলক (presentative and representative process)। সংবেদনে যা বর্তমান কেবল তাকেই পাই। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বর্তমান অভিজ্ঞতা অতীতলব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যা উপস্থিত নেই তাকেও মনে জাগিয়ে তোলে।

(৬) সংবেদনের ক্ষেত্রে বস্তুর পূর্ণরূপটি পাই না, তার অংশবিশেষকে অর্থাৎ এক বা একাধিক গুণকে পেয়ে থাকি। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তুর পূর্ণরূপটি আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। কোন লাল ফুল প্রত্যক্ষ করার সময় ফুল এবং তার লাল বর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হয় না, একটি সমগ্র বস্তুরূপে জ্ঞাত হয়। কিন্তু সংবেদনে বস্তুর অংশ বা গুণ জ্ঞাত হয়, যেমন, লাল রঙের সংবেদন।

(৭) সংবেদন ও প্রত্যক্ষের আনুষঙ্গিক দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রভেদ আছে। সংবেদনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সংবেদনকেন্দ্র সক্রিয় হয়। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এগুলি ছাড়াও সংযোগকেন্দ্র (Association area) সক্রিয় হয়ে ওঠে। মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (*Woodworth*)-এর মতে সংবেদন হল উদ্দীপকের প্রতি প্রথম প্রতিক্রিয়া, আর প্রত্যক্ষ হল উদ্দীপকের প্রতি দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া।[1]

(৮) সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়, প্রত্যক্ষ সেগুলিকে সম্বন্ধযুক্ত করে।

1. 'Sensation is the first response aroused by a stimulus,.........perception is the second response, following the sensation and being properly a direct response to the sensation and only an indirect response to the physical stimulus.'
—Woodworth: Psychology, 6th Edition; Page 422.

১২। বিশুদ্ধ সংবেদন কি সম্ভব? (Is Pure Sensation Possible?):

সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সংবেদন ছাড়া প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল বিশুদ্ধ সংবেদন, অর্থাৎ যে সংবেদন শুধুমাত্র সংবেদন এবং যা প্রত্যক্ষের স্তরে উন্নীত হয় নি; তা কি লাভ করা সম্ভব? ধরা যাক, আমি একটি ফুল দেখলাম; এক্ষেত্রে প্রথম বস্তুটির দৃষ্টিগত সংবেদন, তার পর ফুল বলে বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করা বা জানা—এই দুই ভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ঘটল কি? কোন কোন মনোবিদ্ বলেন, বিশুদ্ধ সংবেদন বা শুধুমাত্র সংবেদন সম্ভব নয়। সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে শুধুমাত্র সংবেদন লাভ করা যায় না। সংবেদন বা প্রত্যক্ষ একই মানসিক প্রক্রিয়ার দুটি ভিন্ন অবস্থা; এদের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। চিন্তা বা আলোচনা করার সময় আমরা এদের পৃথকভাবে ধরে নিতে পারি। কিন্তু যেমন কোন বস্তুর উপাদান (matter) এবং তার আকারকে (form) পৃথক করা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনিভাবে সংবেদন এবং প্রত্যক্ষকে পৃথকভাবে চিন্তা করা গেলেও বাস্তবে পৃথক করা যায় না। এই কারণে ডক্টর ওয়ার্ড (*Dr. Ward*)-এর মতে বিশুদ্ধ সংবেদন হল মনোবিদ্যার দিক থেকে অলীক বস্তু (A pure sensation is psychological myth)।

বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব নয়

অবশ্য একথা বলা হয়ে থাকে যে, সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রেই এই বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব। কিন্তু এও আনুমানিক ধারণা মাত্র; যেহেতু আমাদের শৈশবের বিষয় একেবারেই স্মরণ নেই। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব নয়। কারণ তার ক্ষেত্রে সংবেদন অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে যে, তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। কিন্তু মনোবিদ্ স্টাউট বলেন যে, আমাদের মনে সময় সময় শুধুমাত্র সংবেদন জাগতে পারে। বস্তুর সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট চেতনা সময় সময় আমরা লাভ করি। যেমন, পথ দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে হয়ত কোন বন্ধুকে কেবল দেখেই চলে গেলাম, একটু পরে খেয়াল হতে তাকে চিনতে পেরে তার দিকে ফিরে গেলাম। কাজেই প্রথমেই যে দৃষ্টিগত সংবেদন তাকে বিশুদ্ধ সংবেদন বলা যেতে পারে—কেবলমাত্র দেখা, বন্ধু বলে জানা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়

সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব, এ নিছক অনুমান

স্টাউট-এর অভিমত

যে, বস্তুটিকে চিনতে না পারলেও তাকে মানুষ বলে তো চিনেছি। কাজেই সংবেদনের তো ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একেবারে বিশুদ্ধ সংবেদন কিভাবে হল ?

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বিশুদ্ধ সংবেদন বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যেহেতু বিশুদ্ধ সংবেদন বাস্তব অভিজ্ঞতায় লাভ করা যায় না, সেহেতু এর অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না।

১৩। প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গেস্টাল্টবাদী বা সমগ্রতা-বাদীদের অভিমত (The Gestalt Theory of Perception) :

'গেস্টাল্ট' শব্দটি একটি জার্মান শব্দ। 'গেস্টাল্ট' শব্দটির অর্থ হল 'আকার' বা 'রূপ' (form), নকশা (Pattern) এবং 'সংগঠন' বা সমগ্রতা (structure or configuration)। কোয়াহ্‌লার (*Kohler*), কফকা (*Koffka*) এবং ভের্থাইমার (*Wertheimer*)—এই তিনজন এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক।

গেষ্টাণ্ট শব্দের অর্থ

আচরণবাদ (Behaviourism), অনুষঙ্গবাদ (Associationism) এবং অন্তর্দর্শনবাদ (Introspectionism)—এই তিন মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই মতবাদের উৎপত্তি।

গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, জ্ঞানের সরলতম উপাদান প্রত্যক্ষ, সংবেদন নয়। হুণ্ড (*Wundt*), টিচনার (*Titchener*) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ প্রত্যক্ষের সরলতম উপাদান রূপে সংবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কিন্তু গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে, প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একক। প্রত্যক্ষ এক সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, বিচ্ছিন্ন সংবেদন কোন ঐক্যবদ্ধ সংগঠন নয় প্রত্যক্ষই সব জ্ঞানের মূল ভিত্তি।

গেস্টাল্টবাদীরা বলেন যে, যখন আমরা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়—বিষয়টি খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাসিত হয় না। অনুষঙ্গবাদীদের মতে আমরা যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি হল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সমন্বয়। কিন্তু গেস্টাল্টবাদীরা এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন যে, কি মানসিক প্রক্রিয়া, কি বাহ্যবস্তু, কোনটিই খণ্ড খণ্ড উপাদানের সমন্বয় নয়। যেহেতু সমগ্রতা বা সংগঠনই হল মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য, সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াকে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড উপাদানে বিশ্লেষণ করলে তার যথার্থ স্বরূপটিকে কখনও জানা যায় না। যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলিকে একত্রিত করে আমরা

কোন কিছুকে সমগ্র একক হিসেবে প্রত্যক্ষ করাই মনের ধর্ম

প্রত্যক্ষ করি না। প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু সব সময়ই একটা 'সমগ্র রূপ' নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়। কতকগুলি অক্ষর নিয়েই একটি শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু আমরা যখন কোন বই পড়ি, তখন কোন শব্দকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অক্ষরের সমন্বয় মনে করে আমরা পড়তে থাকি না। সে কারণে কোন একটি শব্দের মধ্যে একটি অক্ষর বাদ পড়লেও আমরা পড়তে পড়তে এগিয়ে চলি, অনেক সময় ভুলটি আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এর কারণ সমগ্রতার দিকেই মানসিক প্রক্রিয়ার ঝোঁক, খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশের বা উপাদানের দিকে নয়।

গেস্টাল্টবাদীদের মতে আমাদের সব অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্র বস্তু। এই সমগ্রতার কিছু অংশ মূর্তিরূপে এবং কিছু অংশ পটভূমিকা রূপে ফুটে ওঠে। আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন এক বিশেষ পটভূমির সঙ্গে সেই কোন কিছুকে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ, কোন একটি বিশেষ পটভূমিতে একটি মূর্তি (A figure against a ground) হিসেবে তাকে প্রত্যক্ষ করি। বস্তুতঃ, এই 'বিশেষ ক্ষেত্র বা পটভূমি এবং মূর্তিতত্ত্ব' (Figure and Ground) গেস্টাল্টমতবাদীদের প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যার একটি মৌলিক সূত্র।

ক্ষেত্র ও মূর্তিতত্ত্ব

বিশেষ ক্ষেত্র বা 'পটভূমি' যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে মূর্তিটিরও পরিবর্তন ঘটে। আবার ক্ষেত্র ও মূর্তির তারতম্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুরও পরিবর্তন ঘটে। নীচের রেখাচিত্রে দুটি বৃত্তের আকার একই, অথচ পটভূমিকার তারতম্যের জন্য দুটি
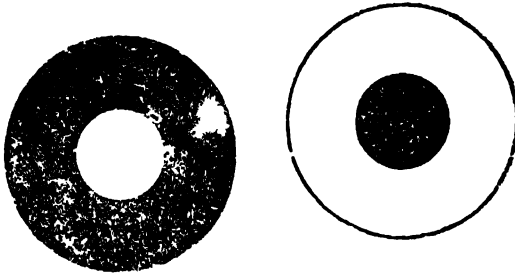
ক্ষেত্র ও মূর্তির তারতম্য অনুসারে দৃষ্ট-বস্তুর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন

বৃত্তকে পৃথক মনে হচ্ছে। প্রথমটি কালোর পটভূমিকায় সাদা বৃত্ত। দ্বিতীয়টি সাদার পটভূমিকায় কালো বৃত্ত। এইভাবে এক বিশিষ্ট পটভূমিকায় আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি। আকাশের পটভূমিকায় আমরা দূরের পাহাড়টিকে দেখি, সাদা দেওয়ালের পটভূমিকায় তার উপর লাল দাগটিকে দেখি। নবজাত শিশু যখন প্রথম তার চোখ মেলে তখন তার প্রত্যক্ষকে পরিণত বয়স্কদের

প্রত্যক্ষের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কিন্তু তাহলেও তার চোখের সামনে যে বস্তুটি থাকে, ধরা যাক কোন উজ্জ্বল লাল রঙের বস্তু, সেটি তার চারপাশের পটভূমিকায় একটি বিশেষ মূর্তি নিয়ে তার কাছে উপস্থাপিত হয়। মনোবিদ্ জেমস (*James*)-এর মতে নবজাত শিশুর চেতনা হল 'জড়াপাকানো অস্পষ্ট অব্যক্ত চেতনা' ('a big blooming, buzzing confusion') অর্থাৎ, নবজাত শিশুর প্রত্যক্ষের পটভূমিতে চেতনা কোন সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করে-না। কিন্তু গেস্টাল্টবাদীরা এই মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে নবজাত শিশুর চেতনা অস্পষ্ট নয়। নবজাত শিশুও এক বিশেষ ক্ষেত্রে বা পটভূমিকায় কোন মূর্তি প্রত্যক্ষ করে।
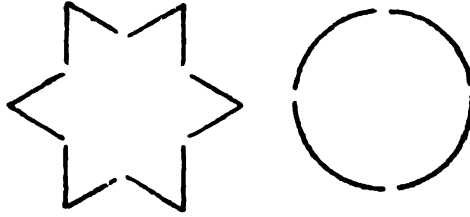
প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ভগ্নতা পরিপূরণ। উপরের বৃত্ত এবং তারকার মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে কিন্তু প্রত্যক্ষের সময় আমরা সেই অসম্পূর্ণতা অগ্রাহ্য করে মূর্তিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দেখি।

গেস্টাল্টবাদীরা বলেন যে, সমগ্রতা বা সংগঠনের দিকে মনের ঝোঁক থাকার জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি কোনরকম ছেদ (gap) বা অপূর্ণতা থাকে, তাহলে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির ভাব দেখা দেয় এবং মন কল্পনায় সেই ফাঁককে ভরাট করে বা অসম্পূর্ণতাকে মনে মনে দূর করে দিয়ে তাকে একটি 'সমগ্র' বা 'একক' (whole or unit) হিসেবে দেখতে চায়।

ভগ্নতা পরিপূর্ণ

বস্তুতঃ, যেখানেই কোনরকম ফাঁক বা অসম্পূর্ণতা আছে, কল্পনায় সে ফাঁক ভরাট করে নিয়ে তাকে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর 'একক বস্তু' হিসেবে প্রত্যক্ষ করাই মনের প্রবণতা। একেই গেস্টাল্টবাদীদের ভাষায় বলা হয় 'ভগ্নতা পরিপূরণ' (Principle of closure বা Pragnanz)।

প্রত্যক্ষ করার সময় বিষয়বস্তুগুলিকে সমগ্র একক হিসেবে প্রত্যক্ষ করার যে প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে, তার কতকগুলি কারণ গেস্টাল্টবাদীরা নির্দেশ করেছেন। যথা—

(ক) নৈকট্য (Proximity) : যে সব বস্তু পরস্পরের সন্নিকটে থাকে সেগুলি মিলে একটা সমগ্রতার সৃষ্টি করে বা দল গঠন করে। যেমন, রাত্রিবেলা আকাশের দিকে তাকিয়ে যেসব তারা কাছাকাছি দেখি, সেগুলিকে আমরা দলবদ্ধ করি এবং

কখনও ত্রিভুজ বা কখনও বৃত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে তাদের প্রত্যক্ষ করি। নিচের D রেখাচিত্রটি দেখলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।
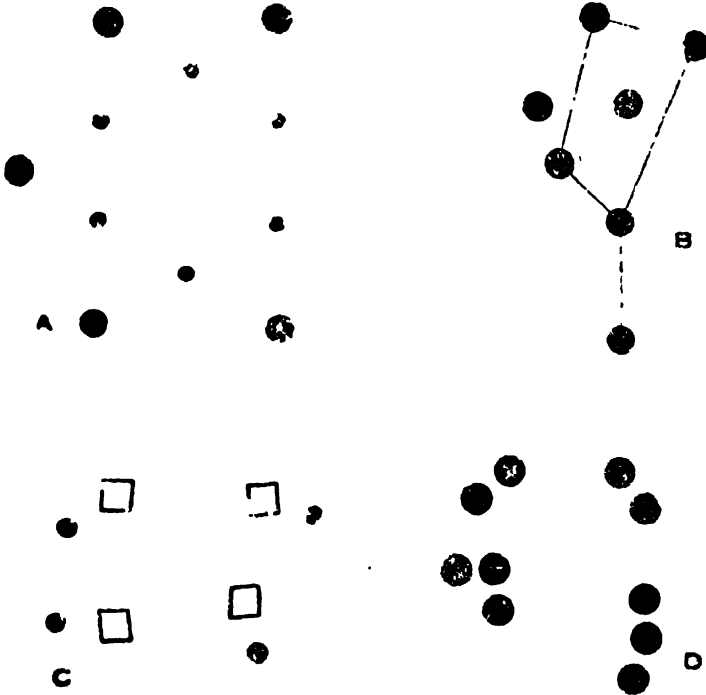
A. Inclusiveness B. Continuity. C. Similarity. D. Proximity.

(খ) **সাদৃশ্য** (Similarity): যেসব বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, সেসব বস্তুকে একটি সমগ্রতার মধ্যে এনে, অর্থাৎ দলবদ্ধ করে আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন, যদি একটি দেওয়ালের উপর কতকগুলি ত্রিভুজ, বৃত্ত এবং চতুষ্কোণ অঙ্কিত থাকে তাহলে ত্রিভুজগুলি, চতুষ্কোণগুলি এবং বৃত্তগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে দল গঠন করে এবং ঐ দলগুলি আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরে C চিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিন্দু এবং বর্গক্ষেত্রগুলি আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

(গ) **নিরবচ্ছিন্নতা** (Continuity): প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর মধ্যে যদি নিরবচ্ছিন্নতা থাকে তাহলে উপাদানগুলি সহজেই চেতনায় দলবদ্ধ হয়ে একটি 'সামগ্রিক রূপ' নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিন্দু যদি পাশাপাশি এমনভাবে সাজানো থাকে যে, বিন্দুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত

করলে একটি সরলরেখা বা একটি বৃত্ত গঠিত হয় তাহলে বিন্দুগুলিকে সেভাবেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। পূর্বপৃষ্ঠার B চিত্রটিতে বিন্দুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে আমরা একটি রেখাচিত্র প্রত্যক্ষ করি।

(ঘ) অন্তর্বেষ্টন (Inclusiveness): কোন নক্শা যদি সমস্ত অংশকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে অংশবিশেষকে দলের বহির্ভূত করে রাখে, তার তুলনায় যে নক্শা সমস্ত অংশকেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, তা সহজেই আমাদের কাছে একটি সংগঠন রূপে ধরা পড়ে। কোন একটি দল বা নক্শা (group or pattern) একটি সংগঠন রূপে তার অংশের তুলনায় সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বপৃষ্ঠার A চিত্রটি দেখলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

(ঙ) বিশেষ পরিচিতি (Familiarity): কোন একটি বিশেষ নক্শা বা রূপ (pattern) আমাদের কাছে সুপরিচিত হওয়ার জন্য একটি সমগ্র রূপ নিয়ে আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

১৪। অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (Illusion):

বিপথগামী কল্পনার প্রভাবে কোন একটি সংবেদনের অযথার্থ ব্যাখ্যার ফলে যে বিকৃত প্রত্যক্ষ ঘটে তাহা অধ্যাস। রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজত-ভ্রম অধ্যাসের দৃষ্টান্ত।

সংবেদনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করলে তা অধ্যাসে পরিণত হয়

যখন আমরা সংবেদনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করি, তখন তা হয় প্রত্যক্ষ। আর যখন আমরা সংবেদনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করি না তখন তা হয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা অধ্যাস। অধ্যাসের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষের মতনই উদ্দীপক থাকে যা সংবেদন সৃষ্টি করে। তবে সংবেদনের যথার্থ ব্যাখ্যা অধ্যাসের ক্ষেত্রে হয় না। অধ্যাসের ক্ষেত্রে বস্তুর যথার্থ জ্ঞান না হয়ে অযথার্থ জ্ঞান হয়। এক্ষেত্রে কল্পনার প্রভাব বিষয়বস্তুর যথার্থ প্রত্যক্ষের পথে বাধার সৃষ্টি করে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে বুঝে নেওয়া যাক: পথ দিয়ে যেতে যেতে যখন দড়িটাকে দড়িই দেখছি বা ল্যাম্পপোস্টটাকে ল্যাম্প-পোস্ট বলেই মনে করছি তখন তা হল প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই দড়িকেই যখন আবছা অন্ধকারে সাপ বলে মনে করছি বা ল্যাম্পপোস্টটাকে মানুষ বলে ভাবছি তখন তাহল অধ্যাস (Ilusion)। আসলে আমার ইন্দ্রিয়-পথে যে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হচ্ছে তার উৎস দড়িই, সাপ নয়। অস্বাভাবী কল্পনা সঠিক প্রত্যক্ষণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে যার জন্য সংবেদনের ব্যাখ্যা দেবার সময় তাকে সাপ বলে মনে করছি।

অধ্যাসের ক্ষেত্রে একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। অধ্যাসে যে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা

হয় তা সম্পূর্ণভাবে মনের সৃষ্টি নয়। আবার অধ্যাস নিছক কল্পনাও নয়। যে বস্তু আসলে যা, তাকে সেভাবে প্রত্যক্ষ না করে সেটি যা নয়, তা প্রত্যক্ষ করাই ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ। সুতরাং অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষে রয়েছে কোন বস্তুর সংবেদন এবং তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।

১৫। অধ্যাসের বিভিন্ন কারণ (Causes of Illusion) :

কি কি কারণে অধ্যাস ঘটে এবার সেগুলি আলোচনা করা যাক: অধ্যাসের একাধিক কারণ আছে; যেমন—(ক) **জাগতিক কারণ,** (খ) **দৈহিক কারণ** এবং (গ) **মানসিক কারণ।**

(ক) **জাগতিক কারণ :** কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দীপকের গঠন এবং প্রকৃতি এমন হতে পারে যে, তার জন্য ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা অধ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে।

(খ) **দৈহিক কারণ :** দেহ যদি অসুস্থ থাকে বা ইন্দ্রিয়ের কাজ যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে কখনও কখনও অধ্যাসের সৃষ্টি হয়। যেমন পাণ্ডুরোগী সাদা বস্তুকেও হলদে দেখে।

(গ) **মানসিক কারণ :** প্রথমতঃ, অভ্যাস অনেক সময় অধ্যাসের সৃষ্টি করে। প্রুফ রিডারদের এই ধরনের ভুল হয়ে থাকে। 'পরিত্রাণ' কথাটিকে 'পরিপ্রাণ' মনে করে সংশোধন না করেই প্রুফ রিডার এগিয়ে চলেন। অধ্যাসের জন্যই এরূপ ঘটে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা, এবং পূর্ব ধারণা অধ্যাসের সৃষ্টি করে। রামের সঙ্গে দেখা করব এই প্রত্যাশা নিয়ে যখন দাঁড়িয়ে আছি তখন অনেক সময় অপর একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে রাম বলে ভ্রম করি। আগে থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি যে সাপের দেখা পাব। তাই সামনের রজ্জুখণ্ডটিকে সর্প বলে ভ্রম হয়।

প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা এবং পূর্বধারণা

তৃতীয়তঃ, উদ্বেগ এবং ভীতিও অধ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। পাড়াতে খুব চুরি হচ্ছে, সে কারণে রাত্রিবেলায় ইঁদুরের শব্দ শুনেও মনে হয় বুঝি ঘরে চোর ঢুকেছে।

উদ্বেগ এবং ভীতি

চতুর্থতঃ, ভ্রান্ত ধারণা, সংস্কার, পক্ষপাতিত্ব, অন্ধবিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতি অধ্যাস সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, রামকে পছন্দ করি না, তার সঙ্গে হঠাৎ আমার ধাক্কা লেগে গেলেও আমি প্রত্যক্ষ করি সে যেন আমায় ঠেলে দিল।

ভ্রান্তধারণা, সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি

একই সময়ে অন্যান্য ভ্রমাত্মক সংবেদন

চিন্তাম্বিত মনে ভ্রমাত্মক সংবেদন সৃষ্টি করে

পঞ্চমতঃ, কোন বিশেষ সময়ে এক ধরনের চিন্তায় যদি মন ভরপুর থাকে তাহলে তার দ্বারা অধ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, ভূতের গল্প শোনার পরে অন্ধকার রাত্রিতে ঘরের বাইরে গেলে সর্বত্রই যেন ভূত চোখে পড়ছে এরূপ মনে হয়।

১৬। অধ্যাস সংশোধনের উপায় (Correction of Illusion) :

অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকে সংশোধন করা চলে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, মনযোগী হলে, সতর্ক হলে এবং আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে যদি যুক্তভাবে কাজ করান যায় তবে এই ভ্রম সহজেই ধরা পড়ে। চোখে যাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে, হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই সেটি যে গাছ তা বোঝা যাবে। অনেক সময় সত্য নির্ধারণ করার জন্য একাধিক ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে হয়। দূরে থাকার জন্য যে ভ্রমের সৃষ্টি হচ্ছে কাছে গিয়ে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সে ভ্রম কেটে যাবে।

১৭। অধ্যাস : সর্বজনীন ও ব্যক্তিবিশেষ (Illusion —Universal and Individual) :

এক ধরনের অধ্যাস আছে যা সর্বজনীন অর্থাৎ সকলেরই হয়ে থাকে। ধাবমান গাড়ীতে বসে সকলেরই মনে হয় গাছ, পাহাড়, বাড়ী সব বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে বা আকাশে যখন মেঘ ভেসে বেড়ায় তখন মনে হয় মেঘের সঙ্গে আকাশের চাঁদও ছুটে চলেছে।

ব্যক্তিবিশেষের অধ্যাস হল দড়ি দেখে সাপ বলে ভ্রম হওয়া; সমাধির ছায়া দেখে ভূতের ভ্রম হওয়া। এ ভ্রম কারও হতে পারে, কারও না-ও হতে পারে।

১৮। বিভিন্ন ধরনের অধ্যাস ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (Different kinds of Illusion) :

(১) জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্পর্কীয় অধ্যাস ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (Geometrical Optical Illusions) : জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্পর্কে নানারকম চাক্ষুষ ভ্রান্তি ঘটে। জ্যামিতিক রেখা, কোণ ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাপ সম্পর্কেও নানারকমের চাক্ষুষ ভ্রান্তি দেখা যায়। এই ধরনের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকেই 'জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্পর্কীয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ' বলা হয়। পরপৃষ্ঠায় কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল :

(ক) নিম্নোক্ত ১নং ছবিতে চারটি সরলরেখা সমান্তরাল, অথচ মনে হয় এরা যেন বেঁকে গেছে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাবে।
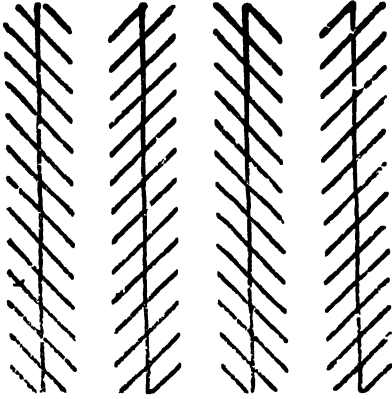
জোল্‌নার (Zollner)-এর অধ্যাস
চিত্র নং ১
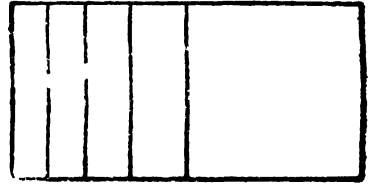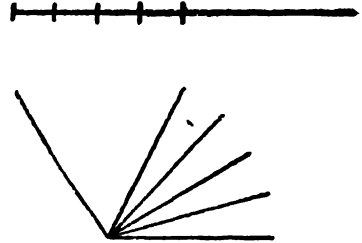
চিত্র নং ২

(খ) উপরের ২নং ছবি তিনটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একটি সরলরেখা, একটি কোণ ও একটি আয়তক্ষেত্রকে প্রথমে সমদ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু পরে রেখা, কোণ বা আয়তক্ষেত্রের যে অংশটিকে পুনরায় বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত করা হয়েছে সেটিকে অপরটির তুলনায় বড দেখাচ্ছে। অথচ রেখা, কোণ ও আয়তক্ষেত্রের দুটি অংশই সমদ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য পরস্পর সমান।
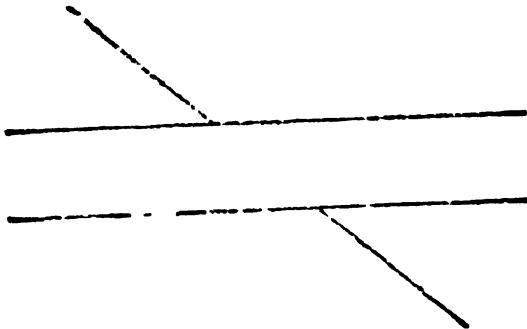
পগেনডর্ফ (Poggendorf)-এর অধ্যাস
চিত্র নং ৩

(গ) উপরের ৩নং ছবিতে দুটি তির্যক রেখাই এক রেখার অংশ অথচ দেখলে মনে হয় যেন রেখা দুটি ভিন্ন।

নিম্নোক্ত ১নং ছবিতে দুটি রেখাই দৈর্ঘ্যে সমান, কিন্তু লম্ব রেখাটিকে (vertical line) আনুভূমিক রেখার (horizontal line) তুলনায় দীর্ঘতর মনে হচ্ছে। ২নং ছবিতে আয়তক্ষেত্র দুটির বিস্তার সমান। কিন্তু ডান পাশের আয়তক্ষেত্রটির বিস্তার
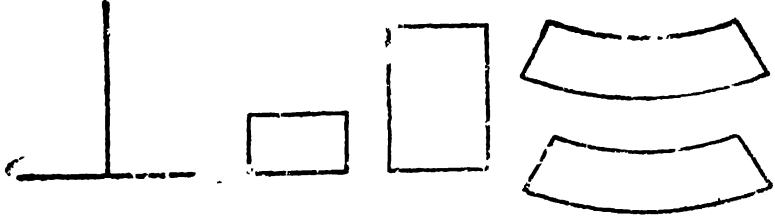
অপরটির তুলনায় বেশী মনে হচ্ছে। ৩নং ছবিতে দুটি চিত্রেরই আকার সমান, যদিও উপরেরটিকে নীচেরটির তুলনায় বড় মনে হচ্ছে।
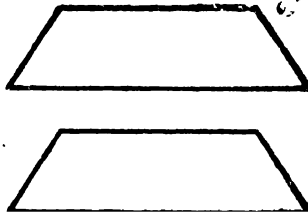
(ঘ) উপরের ছবিতে দুটি পাত্রই সমান। অথচ উপরের পাত্রটিকে নীচের পাত্রটির তুলনায় বড় মনে হচ্ছে।

(২). মুয়েলার-লায়ার-এর অধ্যাস (Muller-Lyer-Illusions) :

বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে আঁকা জ্যামিতিক রেখা অনেক সময় অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে মুয়েলার-লায়ার-এর উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।
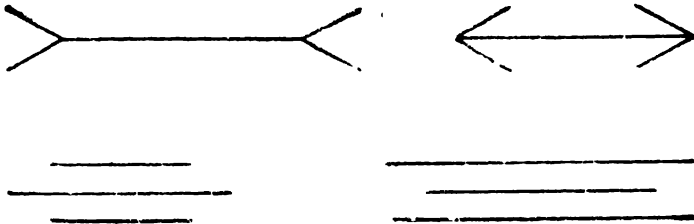
মুয়েলার-লায়ার-এর অধ্যাস

উপরের চিত্রে যদিও উপরের সমতল রেখা দুটি সমান তবু বাম দিকেরটা বড় দেখাচ্ছে। নীচের অংশে আঁকা রেখা দুটিকে অসমান মনে হচ্ছে যদিও রেখা দুটি সমান। উপরের সঙ্গে নীচের রেখার তুলনা করার জন্য এই অধ্যাস ঘটেছে।

এই অধ্যাসের কারণ কি? এর কারণ, যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, তখন তাকে সমগ্রভাবেই (unified whole) প্রত্যক্ষ করি। কোন কিছুকে তার অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ করি না।

(৩) অতীত অভ্যাস ও পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রভাবজনিত অধ্যাস :

দুটি আঙুলকে কোণাকুণি একটির উপর অপর একটি রেখে আঙুলের ফাঁকের মধ্যে একটি মার্বেল রাখা হয়েছে। যদিও একটি মার্বেলই রয়েছে তবু দুটি মার্বেল আছে বলে ভ্রম হয়। এর কারণ আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জানা আছে যে, যখন দুটি বস্তুর স্পর্শ সংবেদন লাভ করি, তখন নিশ্চয়ই দুটি বস্তু থাকবে। এখানে একটি মার্বেল থাকলেও, দুটি আঙুলে দুটি স্পর্শ-সংবেদন পাচ্ছি।
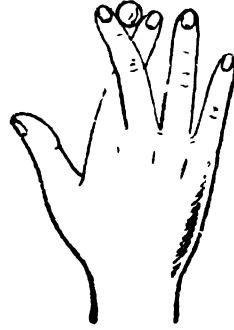
অ্যারিস্টটল (Aristotle)-এর অধ্যাস

(৪) গতি সম্পর্কে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ : শহরে পথে চলতে চলতে নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে পড়ে। কোন হোটেলের নামের দিকে যাতে
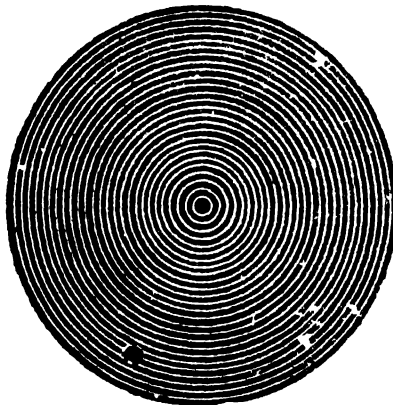
উপরের এই চিত্রটিকে যদি ঘোরান হয় তাহলে চিত্রের ভিতরকার বৃত্তগুলি গতিশীল হয়ে উঠবে এবং ঘূর্ণায়মান বৃত্তের ব্যাসার্ধ (moving radii) প্রত্যক্ষ করা যাবে।

লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তার জন্য নামের চারপাশে কয়েকটি আলোকিত তীরকে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি ছুটে চলতে দেখা যায়। এ হল গতির ভ্রান্ত

প্রত্যক্ষের উদাহরণ। আসলে এখানে আলোকিত তীরগুলি স্থিতিশীল, কিন্তু খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তীরগুলিকে একের পর এক আলোকিত করা হচ্ছে বলে গতির ভ্রম জন্মাচ্ছে।

১৯। 'স্থান' বা বিস্তার কিভাবে প্রত্যক্ষ করি (How can Space or Extension in general be Perceived ?) :

আমরা যখন কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন কোন একটি স্থানে তাকে প্রত্যক্ষ করি। প্রশ্ন হল, এই স্থানকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়? 'স্থান'-এর প্রকৃত সত্তা কি, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলে কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্থানের ধারণা আমরা কিভাবে গঠন করি, তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। স্থান দু'প্রকার —**শূন্যস্থান** (empty-space) এবং **পূর্ণস্থান** (filled space)।

স্থান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নয়

পূর্ণস্থান বলতে বুঝি যখন স্থানটি বস্তুর দ্বারা পূর্ণ। এই পূর্ণস্থানই হল বিস্তার (extension)। শূন্যস্থান হল বস্তুর অস্তিত্বের অভাব। এখন এই পূর্ণস্থান বা বিস্তার আমরা কিভাবে প্রত্যক্ষ করি?

বিস্তার প্রত্যক্ষ-ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে তিনটি উপাদান পাওয়া যাবে। (১) **ব্যাপ্তি** (Extensity), (২) **স্থানীয় বৈশিষ্ট্য** (Local signs) এবং (৩) **গতি** বা **অঙ্গসঞ্চালন** (Movement)।

প্রথমতঃ, দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনের ব্যাপ্তি আমাদের কতকগুলি বিন্দুর সহ-অবস্থান (Co existence of a number of points) সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। ধরা যাক, আমি যখন একটা লম্বা সরলরেখা প্রত্যক্ষ করছি তখন এই দৃষ্টিগত সংবেদন হল সহ-অবস্থানকারী কতকগুলি বিন্দুর সংবেদন অর্থাৎ আমি বুঝছি, কতকগুলি বিন্দু একই সময়ে পাশাপাশি অবস্থান করছে।

ব্যাপ্তি

দ্বিতীয়তঃ, দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনের 'স্থানীয় বৈশিষ্ট্য' আছে সেহেতু হাত দিয়ে স্পর্শ না করেও চোখ দিয়ে দেখে আমরা বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। আবার চোখ বুজে কেবলমাত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করেই বলে দিতে পারি বস্তুটি কি; একেই বলা হয় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। এই স্থানীয় বৈশিষ্ট্যই জানিয়ে দেয় যে, বিন্দুগুলি পরস্পরের থেকে পৃথক।

স্থানীয় বৈশিষ্ট্য

তৃতীয়তঃ, সক্রিয় অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের পেশী-সংবেদন পেয়ে থাকি। একটি বিন্দু থেকে আর একটি বিন্দুতে যেতে হলে অঙ্গ-সঞ্চালন করা দরকার এবং এই অঙ্গ সঞ্চালন করার জন্য যে পেশী সংবেদন হয় তার গুণগত

ও পরিমাণগত তারতম্যের সহায়তায় আমরা বিন্দুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ও দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনের ব্যাপ্তি, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং সক্রিয় অঙ্গসঞ্চালন একত্রে যুক্ত হলেই স্থানের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

২০। স্থানের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ (Tactual perception of Space) :

স্পর্শের সহায়তায় কিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করা যায় অথবা অন্ধ ব্যক্তি কিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করে? (How space can be perceived by touch unaided by vision. *or*, How do blind persons perceive space?)—**যে শিশু জন্মান্ধ, দৃষ্টিশক্তির অধিকারী যে নয় কেবলমাত্র স্পর্শনের সাহায্যে সে কিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করবে?** জন্মান্ধ শিশু নিষ্ক্রিয় স্পর্শন ও সক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে স্থান প্রত্যক্ষ করে।

স্পর্শন দু-প্রকারের—**নিষ্ক্রিয় স্পর্শন** (Passive Touch) এবং **সক্রিয় স্পর্শন** (Active Touch)। নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের দৃষ্টান্ত হল, যখন হাতটিকে ইতস্ততঃ চালিত না করে কোন বস্তুর উপর রাখা হয়। আর সক্রিয় স্পর্শনের ক্ষেত্রে স্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-সঞ্চালন হয়।

স্পর্শন দু প্রকার—নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয়

অন্ধ শিশুটি যখন টেবিলের উপর হাতটি রাখবে তখন হাতটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে সে একটি ব্যাপ্তির সংবেদন লাভ করবে যার দ্বারা টেবিলের বিভিন্ন স্পৃষ্ট অংশের সংবেদন এক সঙ্গেই পাবে। এই সামগ্রিক অনুভূতি বা এককালীন সংবেদনকেই মনোবিদ স্টাউট (*Stout*) **সংশ্লেষক স্পর্শন** (Synthetic Touch) নামে অভিহিত করেছেন। হাত দিয়ে টেবিলটিকে স্পর্শ করার ফলে শিশুটির করতলের বিভিন্ন স্পর্শবিন্দুগুলো (Touch Spots) টেবিলের বিভিন্ন বিন্দুর সংস্পর্শে এসে উদ্দীপিত হবে। প্রতিটি স্পর্শবিন্দুর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের (Local character) জন্য শিশুটি বুঝতে পারবে যে, একটি স্পর্শবিন্দু অন্যটির তুলনায় কোথায় অবস্থিত। যেহেতু টেবিলের বিন্দুগুলির সম্বন্ধ করতলের বিন্দুগুলির সম্বন্ধের অনুরূপ—সুতরাং শিশু বুঝতে পারবে যে টেবিলের বিন্দুগুলি, যেগুলিকে স্পর্শ করা হয়েছে, সেগুলি সহ-অবস্থানকারী (co-existing) অর্থাৎ সমকালীন এবং পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্তু বিভিন্ন অংশগুলি বা বিন্দুগুলি পরস্পরের থেকে কত দূরে বা কোন্ দিকে অর্থাৎ ডাইনে বা বামে অবস্থিত কিনা তা বুঝতে পারবে না।

নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে ব্যাপ্তি সংবেদন লাভ

স্পর্শসংবেদনের সাহায্যে বুঝা যায় বিন্দুগুলি সহ-অবস্থানকারী

সক্রিয় স্পর্শনের ক্ষেত্রে স্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-সঞ্চালন হয়। অন্ধ শিশুটি এবার টেবিলের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়ে পর্যায়ক্রমে হাতটিকে সঞ্চালিত করতে শুরু করবে। তার ফলে ধরা যাক, টেবিলের উপর যেসব কাল্পনিক বিন্দুগুলি আছে, যেমন—ক, খ, গ, ঘ, ঙ, সেই বিন্দুগুলি যে কেবলমাত্র সহ-অবস্থানকারী বা সমকালীন তা নয়, সেগুলি যে ধারাবাহিক (successive) সে জ্ঞানও সে লাভ করবে। হাতটি সঞ্চালন করার সময় বিভিন্ন স্পর্শগত সংবেদনের সঙ্গে যে পেশীগত সংবেদন (Muscle sensation) সে পাবে, সেই পেশীগত সংবেদনের পরিমাণগত পার্থক্যের দরুন সে টেবিলটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দূরত্ব এবং গুণগত পার্থক্যের দরুন টেবিলটির প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। হস্ত সঞ্চালন করার সময় যদি পেশীগত সংবেদন কম-বেশী হয় সেই অনুসারে টেবিলটির প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা হয়। যেহেতু প্রত্যেকটি সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদন ভিন্ন, সেহেতু বিভিন্ন প্রকার সংবেদনের মাধ্যমে টেবিলের অবস্থিতি, দিক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা হবে। এই সক্রিয় স্পর্শনকে স্টাউট বলেছেন—**বিশ্লেষণিক স্পর্শন** (Analytic Touch)।

সক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে ধারাবাহিকতার জ্ঞান

সুতরাং নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় স্পর্শন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তাকে বিস্তারের জ্ঞান দেবে এবং চোখে না দেখেও অন্ধ শিশুটি কেবলমাত্র স্পর্শনের সহায়তায় স্থান বা বিস্তারের জ্ঞান লাভ করবে। নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে সে জানবে বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা বিন্দুগুলি সহ-অবস্থানকারী; অর্থাৎ একই স্থানে পাশাপাশি অবস্থিত। সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে সে জানবে যে, এই অংশ বা বিন্দুগুলি শুধু যে পাশাপাশি অবস্থিত তা নয়, তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে, একটি বিন্দু আর একটি বিন্দুর আগে বা পরে অবস্থিত বা একটি বিন্দু আর একটি বিন্দু থেকে দূরে অবস্থিত।

নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় স্পর্শন পরস্পর যুক্ত হয়ে বিস্তারের জ্ঞান দেবে

২১। স্থানের চাক্ষুষ বা দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষ (Visual Perception of Space) :

স্পর্শনের মতই দৃষ্টির ক্ষেত্রেও নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি, সক্রিয় দৃষ্টি, ব্যাপ্তি, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং অঙ্গসঞ্চালনের সাহায্যে আমরা স্থানকে চক্ষুর সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি।

নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি হল যখন চোখটাকে এদিক ওদিক না ঘুরিয়ে কোন একটি বস্তুর উপর আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করি। আমরা রাত্রিবেলা আকাশের তারার দিকে এভাবে আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে অনেকগুলো তারা দেখতে পাই। দৃষ্টিগত

সংবেদনের যে ব্যাপ্তি (Extensity), তা আমাদের এই জ্ঞান দেয় যে, তারাগুলি একই স্থানে সহ-অবস্থান করছে। তারাগুলির দিকে যখনই তাকাই তখনই বিভিন্ন তারা অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশকে উদ্দীপিত করে। দৃষ্টিগত সংবেদনের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, তারাগুলো পরস্পরের থেকে পৃথক। তারপর সক্রিয় দৃষ্টির সহায়তায় অর্থাৎ অক্ষিগোলক এদিক ওদিক ঘুরিয়ে আমরা তারাগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব, অবস্থান এবং দিক নির্ণয় করতে পারি।

নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি, সক্রিয় দৃষ্টি, ব্যাপ্তি, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য এবং অঙ্গ-সঞ্চালনের সাহায্যে স্থানের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ

সুতরাং সক্রিয় দৃষ্টি এবং নিষ্ক্রিয় দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাদের স্থানেব দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষকে সম্ভব করে তোলে।

২২। দূরত্বের চাক্ষুষ বা দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষ (Visual Perception of Distance):

সক্রিয় স্পর্শন ও পেশী-সংবেদনেব সাহায্যে আমরা দূরত্ব সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পাবি। কেবল দৃষ্টির সাহায্যে আমরা দূরত্ব সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেবিয়ে বস্তুর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে না, বা দূরত্বকে মেপে নিতে পারে না। পেশী সংবেদনেব পরিমাণের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি বস্তুটি আমাদের কতখানি দূরে আছে।

স্পর্শ ও পেশী-সংবেদনেব সাহায্যে বস্তুর দূরত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়

সক্রিয় স্পর্শন, অঙ্গ সঞ্চালন এবং স্পর্শগত ও পেশীগত অভিজ্ঞতা একত্রে আমাদের দূরত্বের জ্ঞান দেয়। যখন আমরা আমাদের কাছ থেকে দূরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বস্তুগুলোকে প্রত্যক্ষ করি এবং ধীরে ধীরে তাদেব দিকে অগ্রসর হতে থাকি, তখন কতকগুলো চাক্ষুষ লক্ষণ বা সংকেত (visual signs) স্পর্শন ও পেশীগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলো যখন পরে আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন এগুলোর সহায়তায় দূরত্বটুকু কতখানি তা বুঝে নিতে পারি। এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলিব কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হচ্ছে:

(১) বস্তুর প্রকৃত আকার জানা থাকলে, বস্তুর আকারের আপাত পরিবর্তন থেকে আমরা দূরত্বটুকু বুঝে নিতে পারি। পাখী যতই উড়তে উড়তে উপরে উঠতে থাকে, ততই তাকে ছোট দেখায়। কোন বস্তু যতই কাছে আসতে থাকে, ততই তাকে বড় দেখায়। কাজেই যখন কোন বস্তুকে তার স্বাভাবিক আকার থেকে ছোট দেখি তখন সেটা যে দূরে আছে তা বুঝতে পারি।

বস্তুর আকারের আপাত পরিবর্তন

(২) যখন একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আড়াল করে, তখন যে বস্তুটি আড়াল করে তাকে কাছে এবং অপর বস্তুটিকে দূরে মনে হয়। (৩)

উপস্থাপন

দূরত্ব যত অধিক হয়, সমান্তরাল রেখাগুলোকে তত বেশী পরস্পরের সন্নিকৃষ্ট (Converged) বলে মনে হয়। দুটো রেল লাইন মনে হয় যেন দূরে মিশে গেছে। যদিও আসলে তারা সমান্তরাল এবং পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা দূরত্ব বুঝে নিতে পারি।

সমান্তরাল রেখার আপাত মিলন

(৪) আলো-ছায়ার খেলাও আমাদের দূরত্বের জ্ঞান দেয়। ছবির যেখানে আলো পড়ে, সেটা কাছে মনে হয়, যেখানে আলো পড়ে না, অর্থাৎ ছায়ায় থাকে সেটাকে দূরে মনে হয়। এই আলো-ছায়ার পার্থক্যের দ্বারা চিত্রশিল্পী কাছের এবং দূরের পার্থক্যের বোধ দর্শকের মনে সৃষ্টি করেন।

আলো-ছায়ার খেলা

(৫) সুস্পষ্টতার ও অস্পষ্টতার মাধ্যমেও দূরত্ব উপলব্ধি করা যায়। বস্তুর দৃশ্যমান অংশটি যদি সুস্পষ্ট হয় তবে মনে হয় বস্তুটি কাছে এবং যদি অস্পষ্ট হয় তবে বস্তুটি দূরে মনে হয়।

সুস্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা

(৬) ট্রেনে যখন চড়ি, তখন দেখি দূরের বস্তুগুলো যেমন পাহাড় বা গাছ আমাদের সঙ্গে ছুটে চলেছে। কিন্তু কাছের বস্তুগুলো বিপরীত দিকে সরে যাচ্ছে। একে বলা হয় লম্বন (*Parallax*) অর্থাৎ নিজেদের গতির সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তুগুলোকেও যেন গতিসম্পন্ন বলে মনে হয় তখন আমরা বস্তুগুলোর দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

দর্শকের গতির জন্য স্থিতিশীল বস্তুর আপাত গতি

(৭) নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার জন্য চোখের লেন্স (lens)-কে অধিক উত্তল (Convex) হতে হয় এবং দূরবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার জন্য চোখের লেন্সকে কম উত্তল হতে হয়। এই প্রক্রিয়াও আমাদের বস্তুর দূরত্বের জ্ঞান দিয়ে থাকে।

চোখের লেন্স-এর উপযোজন

(৮) কাছের এবং দূরের জিনিস দেখার জন্য আমাদের চোখের সিলিয়ারী (Ciliary) পেশীগুলোকে সংকুচিত এবং প্রসারিত করতে হয় এবং এর ফলে যে পেশীগত সংবেদন হয় সেগুলোও আমাদের দূরত্বের জ্ঞান দেয়।

সিলিয়ারী পেশীর সংকোচন

আমাদের উভয় চোখের সাহায্যে আমরা বস্তু প্রত্যক্ষ করি। দূরবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার সময় চোখের দৃষ্টিরেখা সমান্তরাল থাকে, তার ফলে অক্ষিগোলক

সংলগ্ন পেশীগুলোতে তেমন টান পড়ে না। কিন্তু যখন নিকটবর্তী কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করতে হয় তখন দৃষ্টিরেখাদ্বয় পরস্পর সন্নিকৃষ্ট (converged) হয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। এই জন্য চোখের পেশীগুলোকে সংকুচিত করার প্রয়োজন হয়।

চাক্ষুষ সংকেত

(৯) আমরা উভয় চোখের সাহায্যেই বস্তু প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আমাদের দুই চোখে বস্তুর যে প্রতিকৃতি পড়ে, তার মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। অভ্যাসের জন্যই আমরা দুটি প্রতিকৃতিকে এক করে দেখি। দূরবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার সময় এই প্রতিকৃতির মধ্যে পার্থক্য কমে যায় এবং নিকটবর্তী বস্তু প্রত্যক্ষ করার সময় দুটি প্রতিকৃতির পার্থক্য বেশী হয়। পার্থক্য সত্ত্বেও দুটি প্রতিকৃতিকে এক করে দেখার জন্য আমাদের মানসিক পরিশ্রম হয়। এই মানসিক পরিশ্রম দূরত্ববোধের জ্ঞাপক।

দুটি প্রতিকৃতিকে এক করে দেখার জন্য মানসিক পরিশ্রম

২৩। দূরত্বের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ (Berkeleyan Theory of Perception of Distance) :

বার্কলের মতে চক্ষুর সাহায্যে আমরা দূরত্ব সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেরিয়ে বস্তুর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। আমরা সক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ করি এবং এই সক্রিয় স্পর্শ থেকেই দূরত্বের পরোক্ষ চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। সক্রিয় স্পর্শ অর্থাৎ পেশীগত স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি বস্তুটি আমাদের কতখানি দূর আছে। দৃষ্টি আমাদের বস্তুর মধ্যে কতকগুলো চাক্ষুষ লক্ষণ (Visual signs) বা সংকেতের ইঙ্গিত দেয় যেগুলোকে ব্যাখ্যা করে আমরা দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই চাক্ষুষ সক্রিয় স্পর্শ-সংবেদনের মধ্যস্থতায় অর্জিত হয়। সুতরাং দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যক্ষ হয় তা হল অর্জিত প্রত্যক্ষ (Acquired perception)। প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ 'অর্জিত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মতবাদ' (The Theory of Acquired visual Perception) নামে পরিচিত।

বার্কলের মতে চাক্ষুষ লক্ষণের সাহায্যেই দূরত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়

বার্কলের মতের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো উপস্থাপিত করা যেতে পারে :

(১) চোখে ছানি থাকার জন্য কতকগুলো শিশু অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে চোখের ছানি অপসারিত করা হলে তারা যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় তখন তারা প্রথম প্রথম চোখের সাহায্যে দূরত্ব নির্ধারণ করতে পারে না, তাদের মনে হয় সব বস্তুই বুঝি তাদের

অন্ধ শিশুর ছানি অপারেশন

কাছে আছে। একবারে চোখের উপর এসে পড়েছে এই মনে করে অনেক সময় দূরবর্তী বস্তু দেখেও তারা পিছু সরে আসে।

(২) দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সক্রিয় স্পর্শ যুক্ত না হওয়ার জন্য নবজাত শিশু তার জন্মের পরে প্রথম কয়েকটি মাস কোন্ বস্তুটি কাছে, আর কোন্‌টি দূরে তা বুঝে উঠতে পারে না। তাই সে হাত বাড়িয়ে দূরের বস্তু হাতে পেতে চায়।

নবজাত শিশুর দূরের বস্তু পাওয়ার ইচ্ছা

(৩) চিত্রশিল্পী অনেক সময় সমান্তরাল রেখাকে সন্নিকৃষ্ট করে এবং তারপর তার বিভিন্ন অংশে আলো ও ছায়ার তারতম্য করে বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনত্বের বোধ এনে দেয় বা অনেক সময় দুটি সমান্তরাল রেখাকে সন্নিকৃষ্ট করে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়ে দূরত্বের বোধ সৃষ্টি করে। চিত্রে অঙ্কিত বস্তুর দূরত্ব এবং ঘনত্ব বোধ আমরা কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? আসলে চিত্রের সব অংশই একটি কাগজের উপর অঙ্কিত করা হয়েছে; কাজেই চিত্রে অঙ্কিত বস্তুর আসলে কোন ঘনত্ব নেই। আমরা সোজাসুজি ঘনত্ব এবং দূরত্ব এক্ষেত্রে কিছুতেই প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, কেবলমাত্র কতকগুলো 'চাক্ষুষ লক্ষণ' (Visual signs) বা সংকেত থেকে দূরত্ব এবং ঘনত্ব অনুমান করে নিই।

চিত্রশিল্পী সমান্তরাল রেখা সন্নিকৃষ্ট করে বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনত্বের বোধ আনে

(৪) আমাদের চোখের গঠন এমনি যে, চোখ সোজাসুজি স্থান বা দূরত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেরিয়ে বস্তুর কাছে পৌঁছতে পারে না বা দূরত্বটুকু মেপে নিতে পারে না। আমাদের অক্ষিপট (Retina) হল একটি পর্দার মতো এবং বাইরে থেকে ছবিটি এই পর্দার উপর প্রতিফলিত হয়। এই ছবি দ্বি-পরিসর বিশিষ্ট (Two dimensional)। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে, কিন্তু সম্মুখ-পশ্চাতের পরিসর (Front-back dimension) নেই।

চোখের গঠন

বার্কলে-এর অর্জিত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মতবাদের সমালোচনা: স্টাউট (*Stout*), অ্যাঞ্জেল (*Angell*), জেমস (*James*) প্রমুখ মনোবিদ্‌রা বার্কলের পূর্বোক্ত মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং তাঁদের মতে দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যক্ষ, তা অর্জিত প্রত্যক্ষ নয়। চোখের সোজাসুজি দূরত্ব প্রত্যক্ষ করার মৌলিক ক্ষমতা আছে। তাঁরা নিজেদের মতের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো উপস্থাপিত করেছেন:

স্টাউট, অ্যাঞ্জেল ও জেমসের সমালোচনা

(১) অনেক দূরে অবস্থিত যেসব বস্তু, যেমন—আকাশের তারা, মেঘ, পর্বত, সেই সব বস্তুর পারস্পরিক দূরত্ব নির্ধারণ করা চোখের সাহায্যেই সম্ভব, কেননা আমরা যাতে সক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে দূরত্ব অবধারণ করতে পারি, তার জন্য এই বস্তুগুলো কখনও আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে না।

বহুদূরে অবস্থিত বস্তুর পারস্পরিক দূরত্ববোধ চোখের অবদান

(২) দূরত্বের সূক্ষ্ম তারতম্য স্পর্শ অপেক্ষা চোখের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ করা যায়। পরস্পরের খুব কাছাকাছি দুটি বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান তা চোখের সাহায্যেই অবধারণ করা যায়, স্পর্শের সাহায্যে নয়।

দূরত্বের সূক্ষ্ম তারতম্য

(৩) কতকগুলো চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে এক চক্ষুর উপযোগী (Monocular) এবং দুই চক্ষুর উপযোগী (Binocular) প্রত্যক্ষে যে পেশী অভিজ্ঞতা ঘটে তা চাক্ষুষ সংকেতলব্ধ নয়, দূরত্বের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ।

বিশেষ বিশেষ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা

(৪) জেমস (*James*)-এর অভিমতানুযায়ী স্থান বা বিস্তার যেহেতু তিন-পরিসর বিশিষ্ট (three dimensional), সেহেতু চোখের পক্ষে কেবলমাত্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কেননা, হয় চোখ তিন-পরিসরবিশিষ্ট স্থান অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব তিনটিই প্রত্যক্ষ করে, নয় ত কিছুই প্রত্যক্ষ করে না।

চোখের পক্ষে কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়

সিদ্ধান্ত : পূর্বোক্ত অভিযোগগুলো আনা হলেও বার্কলের মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। স্পর্শের সাহায্য ছাড়াও শুধুমাত্র চোখের সাহায্যে দূরত্ব এবং ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। কিন্তু সেই দূরত্বপ্রত্যক্ষ, স্পর্শন ও দর্শনের সংযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে দূরত্বের জ্ঞান লাভ করা যায়, তার থেকে অনেক পৃথক। স্পর্শনের সাহায্যে যে দূরত্বের জ্ঞান লাভ করা যায়, চাক্ষুষ দূরত্ব-প্রত্যক্ষের তুলনায় তা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। কারণ, (i) শুধুমাত্র চোখের সাহায্যে আমরা যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ করি, ব্যক্তি সাপেক্ষ এবং ব্যক্তি নিরপেক্ষ কারণবশতঃ তার মধ্যে তারতম্য দেখা দিতে পারে। (ii) জন্মান্ধ ব্যক্তি স্পর্শনের সাহায্যেই দূরত্বের ধারণা করে। আবার অন্ধকারেও স্পর্শনের সাহায্যে আমরা দূরত্বের ধারণা করি।

বার্কলের মতবাদের সত্যতা

সুতরাং সক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ হল মুখ্য, চক্ষুর সাহায্যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ হল গৌণ। ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করতে গেলে চোখের সাহায্যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ হল অর্জিত প্রত্যক্ষ এবং স্পর্শনের সাহায্যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ হল মৌলিক প্রত্যক্ষ।

স্পর্শনের সাহায্যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ হল মুখ্য, চক্ষুর সাহায্যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ হল গৌণ

২৪। ঘনত্বের বা ঘনবস্তুর প্রত্যক্ষ (Perception of Solidity or Third Dimension of Space) :

বস্তুর ঘনত্ব বলতে কি বোঝায়? ঘনত্ব হল বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ থেকে পৃথক একটি তৃতীয় গুণ। ঘনত্ব হল বস্তুর গভীরতা (Depth)। আমরা স্পর্শের দ্বারা এবং চোখের সাহায্যে—উভয় প্রকারেই ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি। ঘন বস্তু ত্রি-মানবিশিষ্ট (Three dimensional)। অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা আছে

(ক) ঘনত্বের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ (Tactual Perception of Solidity) : ঘনত্ব বস্তুর সামনের দিক থেকে পিছন দিকের ব্যবধান বা দূরত্ব; ডান থেকে বাম বা উপর থেকে নীচের দূরত্ব নয়। সক্রিয় স্পর্শন বা অঙ্গসঞ্চালনের মাধ্যমে আমরা বস্তুর ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করি। হাতটিকে সামনের দিক থেকে পেছন দিকে সঞ্চালিত করে যে পেশীগত সংবেদন লাভ করি তার দ্বারা বস্তুর গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু বস্তুটি যদি বড় না হয়ে ছোট হয়, যেমন—একটা কাঠের বল, তাহলে নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে অর্থাৎ কেবল মুঠোর ভেতর নিয়েই আমরা বস্তুটির ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করি। বলটিকে মুঠোর ভেতর নেওয়াতে আমার আঙুলগুলো বেঁকে তাকে ধরে থাকে। এই বাঁকানো আঙুলের পেশীগত সংবেদন বলটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দেয়। আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন দিক থেকে এটি গতিকে প্রতিরোধ করছে।

সক্রিয় স্পর্শনের সাহায্যে ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করা

(খ) ঘনত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (Visual Perception of Solidity) : বস্তুর ঘনত্ব আমরা সোজাসুজি চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সক্রিয় স্পর্শগত অভিজ্ঞতার সাহায্যেই আমরা ঘনত্বকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি। সুতরাং চোখের সাহায্য বস্তুর ঘনত্বের যে প্রত্যক্ষ, তাহল 'অর্জিত প্রত্যক্ষ' (acquired perception), মৌলিক প্রত্যক্ষ নয়। কতকগুলো চাক্ষুষ লক্ষণ বা সংকেতের সাহায্যে আমরা এই ঘনত্ব অনুমান করে নিয়ে থাকি। এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলো স্পর্শগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য পরে স্পর্শগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও কেবলমাত্র ঐ চাক্ষুষ লক্ষণগুলিকে ব্যাখ্যা করে আমরা ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি।

চাক্ষুষ লক্ষণের সাহায্যে ঘনত্ব অনুমান করে নেওয়া যায়

নিম্নলিখিত চাক্ষুষ লক্ষণগুলি ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করে। যথা—

(i) কাছাকাছি যে সব বস্তুর অবস্থান সেগুলোর ঘনত্ব আমরা যখন প্রত্যক্ষ করতে চাই, তখন আমাদের দুটি চোখের অক্ষিপটের উপর যে ভিন্ন ভিন্ন ছবি পড়ে,

তার বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে অনুভূতিই আমাদের ঘনত্বের জ্ঞান দেয়। দুই চোখের অক্ষি-পটের উপর যে ছবি পড়ে তার মধ্যে তারতম্য হবার কারণ এই যে, প্রত্যেকটি চোখে যেন বস্তুটির একটি অংশই ধরা পড়ে, যা অপর চোখটি দেখতে পায় না।

দুটি চোখের অক্ষিপটের উপর ভিন্ন ভিন্ন ছবির বৈসাদৃশ্যের অনুভূতি
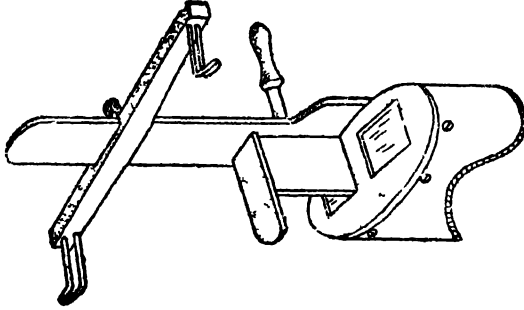
Sterescope

(ii) দুটি আলাদা আলাদা ছবিকে মিলিয়ে একটি ছবি তৈরি করার যে মানসিক প্রচেষ্টা তাও বস্তুটির ঘনত্বের ধারণা দেয়। *Wheatstone* এর ঘনদৃক যন্ত্রের (Sterescope) সাহায্যে এই বিষয়টি সহজেই প্রমাণিত হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে দুটি বিভিন্ন অবস্থান থেকে তোলা একটি ঘনবস্তুর দুটি সামান্য পৃথক ছবিকে রেখে যদি একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে বস্তুটির ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করা যাবে।

ঘনদৃক যন্ত্রের সাহায্যে একই বস্তুর দুটি পৃথক ছবি তুলে প্রত্যক্ষ করা

(iii) ঘনত্বের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চোখের পেশীগত সংবেদন বিশুদ্ধ দৃষ্টিগত সংবেদনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘনত্বের জ্ঞান দেয়।

দূরের বস্তুর ক্ষেত্রের ঘনত্ব নিম্নলিখিত চাক্ষুষ লক্ষণগুলোকে ব্যাখ্যা করে প্রত্যক্ষ করা যায়। যথা—

আলো-ছায়ার খেলা ঘনত্বের জ্ঞান আনতে পারে বা সমান্তরাল রেখাকে পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েও এই ঘনত্বের বোধ আনা যায়। চিত্রকর অনেক সময় সমান্তরাল রেখাকে সন্নিকৃষ্ট করে এবং তারপর বিভিন্ন অংশে আলো ও ছায়ার তারতম্য করে বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনত্বের বোধ এনে দেয়, যদিও আসলে তা ঘন নয়।

দূরের বস্তুর ক্ষেত্রে ঘনত্ব চাক্ষুষ লক্ষণের সাহায্যে জানা যায়

২৫। ওজনের প্রত্যক্ষ (Perception of Weight) ঃ

পেশীগত সংবেদন এবং চাপ সংবেদন একত্রে যুক্ত হয়ে আমাদের ওজন প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করে। ওজন প্রত্যক্ষ দু প্রকার—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় ওজন

প্রত্যক্ষ হয় ওজন বা ভার উত্তোলনের অনুভূতিতে। কোন একটি বস্তু যখন আমরা উত্তোলন করি, তখন হাতের উপর বস্তুটি থাকার জন্য একটা চাপ অনুভব করি এবং অপর দিকে সেটিকে উত্তোলন করার জন্য পেশীগত সংবেদন অনুভব করি। উভয় সংবেদন যুক্ত হওয়াতে ওজন প্রত্যক্ষ করতে পারি।

পেশীগত সংবেদন ও চাপ সংবেদনের সাহায্যে ওজন প্রত্যক্ষ

নিশ্চল হাতের উপর ভারী বস্তু রাখলে যে ওজন প্রত্যক্ষ হয় তাকে নিষ্ক্রিয় ওজন প্রত্যক্ষ বলে। একটি বস্তু আমার হাতের উপর রাখা হয়েছে এবং আমার হাতটি রয়েছে মাটির উপর--সেক্ষেত্রে পেশীগত সংবেদন অনুভূত হবে না কেবলমাত্র চাপ-সংবেদন অনুভূত হবে। এই চাপ-সংবেদনের সাহায্যেই বস্তুর ওজন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে।

২৬। আয়তন এবং আকারের প্রত্যক্ষ (Perception of Magnitude and figure) ঃ

(ক) **আয়তন এবং আকারের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ** (Tactual Perception of Magnitude and Figure) ঃ একটি বস্তুর আয়তন অর্থাৎ বস্তুটি ছোট কি বড তা আমরা স্পর্শনের সাহায্যে কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? বস্তুটির চতুর্দিকে হাতটিকে সঞ্চালিত করার সময় পেশীগত শক্তি কতখানি প্রয়োগ করা হচ্ছে তার দ্বারাই আমরা বস্তুটি কতখানি বড বা ছোট বুঝতে পারি। পেশীগত শক্তির পরিমাণ (quantity) বা পেশী-গুলোকে কতখানি পরিশ্রম করতে হয় তার দ্বারাই আমরা বস্তুর আয়তন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে থাকি। যদি কোন বস্তুর আয়তন বড হয় তাহলে পেশীগত পরিশ্রম বেশী হবে, বস্তুর আয়তন ছোট হলে পেশীগত শক্তির প্রয়োগ বা পরিশ্রম কম হবে, পেশীগত সংবেদনের গুণগত পার্থক্য বস্তুর আকার (Figure) সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। বস্তুর আকার বলতে বোঝায়—গোল, লম্বা, ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ। কোন একটি গোলাকার বস্তুর উপর যখন আমরা চোখ বুজে হাত সঞ্চালন করতে থাকি তখন যে স্থান থেকে হাত সঞ্চালন শুরু হয়েছিল অনবরত গতির দিক পরিবর্তন করে পুনরায় হাত হয়ত সেইখানেই ফিরে আসবে। তাছাডা, পেশীগত সংবেদনের ধারাবাহিক এবং একই প্রকৃতিবিশিষ্ট গুণগত পরিবর্তন (gradual and uniform change of quality) আমাদের মনে এই ধারণা আনবে যে, বস্তুটি গোলাকার। আবার চোখ বুজে যখন কোন চতুষ্কোণ টেবিলের উপরে হাত সঞ্চালন করছি তখন পেশীগত সংবেদনের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে আমরা

পেশীগত শক্তির পরিমাণ বস্তুর আয়তনের ধারণা দেয়

বুঝতে পারি যে টেবিলটা চৌকো। টেবিলের উপর হাতটাকে সঞ্চালিত করতে করতে টেবিলের এক কোণে এসে গতির মোড ঘুরে অন্য পথে চলতে লাগলো এবং আবার কিছু পরে অনুরূপভাবে অন্য পথে চলতে লাগলো। এইভাবে হাত সঞ্চালন করতে করতে পেশীগত সংবেদনের পরিমাণ ও গুণের দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি যে, টেবিলটা চতুষ্কোণ।

(খ) **আয়তন ও আকারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ** (Visual Perception of Magnitude and Figure) : চোখের বা দৃষ্টির সহায়তায় আমরা বস্তুর প্রকৃত আয়তনকে সোজাসুজি জানতে পারি না। যে আয়তনটি আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় সেটি প্রকৃত আয়তন নয়। স্পর্শনের সাহায্যেই আমরা বস্তুর প্রকৃত আয়তনকে (real magnitude) জানতে পারি। কোন একটি বস্তুর আয়তন চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করার সময় আমরা চোখটিকে বস্তুর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘোরাতে থাকি এবং প্রান্ত দুটিকে চোখের কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ পীত বিন্দুতে আনতে চেষ্টা করি। তার ফলে চোখের পেশীগত সংবেদন আমাদের বস্তুর আয়তন সম্পর্কে জ্ঞান দেয়।

কিন্তু চোখের মাধ্যমে আমরা যখন বস্তুর আয়তনকে প্রত্যক্ষ করতে যাই, তখন তা সঠিক হয় না। তার কারণ দূরের বস্তুকে আমরা ছোট দেখি। বস্তুটির বিভিন্ন অংশকে দেখার জন্য সেগুলোকে দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে (পীত বিন্দুতে) আনার প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুটি দূরে থাকার জন্য আমাদের চোখকে ঘোরাতে হয় এবং পেশীর সংবেদন কম হয়। যদি কল্পনা করি বস্তুটির দুটি প্রান্ত থেকে দুটি সরলরেখা পীত বিন্দুতে এসে মিশেছে তাহলে এই দুই সরলরেখা পীত বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি কোণের সৃষ্টি করবে। এই কোণটি যত বড় হবে বস্তুর আয়তন তত বড় হবে এবং এই কোণটি যত ছোট হবে বস্তুর আয়তন তত ছোট হবে। অবশ্য যদিও দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুর প্রকৃত আয়তনকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না, তবুও তাকে পরোক্ষভাবে জানা যায়। কারণ যদি দূরত্বটুকু জানা থাকে তাহলে দূরের বস্তু ছোট দেখলেও তার প্রকৃত আয়তন আমরা বলে দিতে পারি। দূরে যে বাড়িটি আছে তাকে ছোট দেখলেও বাড়িটির দূরত্ব জানা থাকলে আমরা তার প্রকৃত আয়তনটি অনুমান করে নিতে পারি। কিন্তু আকাশের তারা দূরে থাকার জন্য খুব ছোট দেখায়। দূরত্ব জানা না থাকাতে তারাগুলোর আয়তন সম্পর্কে কোন অনুমান করা সম্ভব হয় না।

চোখের পেশীগত সংবেদন বস্তুর আয়তন প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে

(গ) **গতির প্রত্যক্ষ** (Perception of Movement) : স্পর্শন এবং দৃষ্টি উভয়ের মাধ্যমেই গতি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

স্পর্শনের সাহায্যে গতির প্রত্যক্ষ: (১) নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের (Passive Touch) মাধ্যমে গতি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। কোন একটি অন্ধ লোক যদি গতিশীল বস্তুর উপর হাত রেখে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের (Local characteristics) জন্য তার স্পর্শগত সংবেদনগুলো পরিবর্তিত হতে থাকবে। যখন সে বুঝতে পারবে যে, এই পরিবর্তন তার দ্বারা ঘটছে না, তখন সে গতি প্রত্যক্ষ করবে।

নিষ্ক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে গতি প্রত্যক্ষ

(২) সক্রিয় স্পর্শনের (Active Touch) সাহায্যেও গতি প্রত্যক্ষ করা যায়। ধরা যাক, অন্ধ ব্যক্তিটি একটি গতিশীল বস্তুর উপর হাত রেখেছে। এখন এই চলমান বস্তুটির সঙ্গে সে নিজেও যদি চলতে থাকে তাহলে স্পর্শগত সংবেদনের কোন পরিবর্তন ঘটবে না, কিন্তু চলমান বস্তুর নডাচড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ ব্যক্তিটির হাতও নড়াচড়া করতে থাকবে এবং তার ফলে সে পেশী সংবেদন অনুভব করবে। পেশী সংবেদনের (muscle sensation) অবিরাম পরিবর্তনের ফলে সে বুঝতে পারবে যে, বস্তুটি চলমান বা গতিশীল। তখনই সে গতি প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে গতি প্রত্যক্ষ

চক্ষুর সাহায্যে গতি প্রত্যক্ষ ঃ যখন কোন চলমান বস্তুর উপর আমাদের দৃষ্টিকে এদিকে ওদিকে সঞ্চালিত না করে স্থিরভাবে নিবদ্ধ রাখি তখন আমরা কতকগুলো দৃষ্টিগত সংবেদন ধারাবাহিক ভাবে পাই। যেহেতু এই সংবেদনগুলো আমরা নিজেরা সৃষ্টি করি না, সেহেতু আমরা বুঝতে পারি যে, কোন একটি চলমান বস্তুর উপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

আমরা যখন একটা উড়ন্ত পাখিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনুসরণ করতে থাকি তখন চোখের পেশীগুলো নড়াচড়া করতে থাকে। কিন্তু যেহেতু পাখিটার গতির হার এবং দিকটি আমার উপর নির্ভর নয়, তখনই বুঝতে পারি যে, পাখিটি চলমান। কিন্তু পাখিটি যদি আমাদের কাছ থেকে উড়ে দূরে চলে যায় বা দূর থেকে উড়ে আমাদের কাছে আসে, কেবল একপাশ থেকে আর এক পাশে যায় না, তখন পরোক্ষভাবে দূরত্বের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে, যেমন—পাখিটির আকারের পরিবর্তন, কাছে থাকার জন্য স্পষ্টতা, দূরে থাকার জন্য অস্পষ্টতা এবং পাখির গতিকে অনুসরণ করার জন্য চোখের পেশীগত সংবেদন প্রভৃতির দ্বারা আমরা গতি প্রত্যক্ষ করি।

কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আপাতগতি বা ভ্রান্তগতি প্রত্যক্ষ করি। এইরূপ ক্ষেত্রে আসলে বস্তুগুলো স্থির বা গতিহীন, কিন্তু আমরা দেখি বস্তুগুলো গতিশীল। নিশ্চল বস্তুতে গতি প্রত্যক্ষ করার অবস্থাকে বলা হয় **আপাতগতি প্রত্যক্ষ** বা 'ফাই-

ঘটনা' (Phi-Phenomenon)। চলচ্চিত্রের সাহায্যে এই 'আপাত-গতি প্রত্যক্ষে'র বিষয়টিকে অতি সহজেই বোঝান যেতে পারে। চলচ্চিত্রে ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন অবস্থার কতকগুলো নিশ্চল ছবি একটি যন্ত্রের সাহায্যে একটি পর্দার উপব অতি দ্রুত পর পর ফেলা হয়, তার ফলে ব্যক্তি বা বস্তুগুলো গতিশীল বলে ধারণা হয়। এর কারণ, একটি চিত্রের যে দৃষ্টিগত সংবেদন মনের মধ্যে একটি অনুবেদন বা উত্তর-প্রতিরূপ (after-sensation or after-image) রেখে যায়, সেটি পরবর্তী চিত্রের দৃষ্টিগত সংবেদনের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিশ্চল ছবিগুলোর সাহায্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন চলমান ছবির ধারণা নিয়ে আসে। বিজ্ঞাপনদাতারা অনেক সময় পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একপ ঘটনার সহায়তা গ্রহণ করেন। কয়েকটি আলোকিত তীরকে পরস্পরের থেকে একটু দূরে রেখে যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্রুত জ্বালানো ও নেভানো যায় তাহলে মনে হয় যেন তীরগুলো বুঝি ছুটে যাচ্ছে। বাস্তবিক তীরগুলো নিশ্চল: কেবলমাত্র অল্প সময়েব ব্যবধানে তীরগুলোকে জ্বালানো ও নেভানোর জন্য আপাতগতির প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

ফাই-ঘটনা

চোখের সাহায্যে গতি প্রত্যক্ষ করার বিষয়টি গেস্টাল্টবাদীরা স্বীকার করে না। তাঁদের মতে গতি প্রত্যক্ষ অনুমাননির্ভর নয়। গতি প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা মনের একটা বিশেষ মৌলিক ক্ষমতা।

(ঘ) **দিকের প্রত্যক্ষ** (Perception of Direction): আমরা চোখ দিয়ে সোজাসুজি দিক প্রত্যক্ষ করতে পারি না, সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে আমরা দিক প্রত্যক্ষ করি। আমরা যখন সামনের দিকে বা পিছনের দিকে, ডাইন বা বামে ঘাডটিকে প্রসারিত করি তখন যে বিভিন্ন ধরনের পেশী সংবেদন হয়, সেই সংবেদন আমাদের দিকের জ্ঞান দেয়। যখন আমরা আমাদের হাতটিকে সামনে, পিছনে, ডাইনে বা বামে প্রসারিত করি, তখন আমরা চোখ ও হাতের এই ওঠা-নামা বা গতিকে অনুসরণ করতে থাকি। এর ফলে হাতের পেশীগত সংবেদনের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়। পরে হাতের পেশীগত সংবেদনের অভিজ্ঞতা ছাড়াও কেবলমাত্র চোখ দিয়ে আমরা কোন্‌টি দক্ষিণ দিক, কোন্‌টি বাম দিক, কোন্‌টি উপর, কোন্‌টি নীচ—প্রত্যক্ষ করতে পারি। সুতরাং দিকের দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষণ হল অর্জিত (Acquired), আসলে দিক-নির্ণয় সক্রিয়-স্পর্শননির্ভর।

সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমেই দিক প্রত্যক্ষ করা যায়

(ঙ) **দুর্ভেদ্যতার প্রত্যক্ষ** (Perception of Impenetrability): অধিকাংশ জড়বস্তুর একটি গুণ হল দুর্ভেদ্যতা। কোন জড়বস্তুর উপর চাপ দিতেই

আমরা বুঝি যে আমাদের গতি বাধা পাচ্ছে বা প্রতিরুদ্ধ হচ্ছে। এই দুর্ভেদ্যতা আমরা কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? আমরা প্রত্যক্ষ করি স্পর্শনের সহায়তায়। আমাদের গতি যখন রুদ্ধ হয়ে যায় তখনই বুঝি বস্তুটি দুর্ভেদ্য। ধরা যাক, কোন একটি টেবিলের উপর চাপ দিচ্ছি, তখন আমি বুঝতে পারি যে আমার হাত আর অগ্রসর হচ্ছে না, আমার হাতের পেশীতেও আমি চাপ অনুভব করি। সুতরাং রুদ্ধগতিই (Impeded or thwarted movement) আমাদের দুর্ভেদ্যতা (impenetrability) প্রত্যক্ষে সহায়তা করে।

স্পর্শনের সাহায্যে দুর্ভেদ্যতা প্রত্যক্ষ

২৭। মৌলিক প্রত্যক্ষ ও অর্জিত প্রত্যক্ষ (Original Perception and Acquired Perception):

প্রত্যক্ষ দুপ্রকারের হতে পারে, যথা—(১) **মৌলিক প্রত্যক্ষ** (Original Perception) এবং (২) **অর্জিত প্রত্যক্ষ** (Acquired Perception)।

আমরা হাত দিয়ে এক টুকরো বরফ স্পর্শ করলাম। বরফের টুকরোটি যে ঠাণ্ডা তা প্রত্যক্ষ করলাম। পরে আমরা চোখ দিয়ে বরফের টুকরোটির দিকে তাকালাম, বরফ ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে। প্রথমটি হল 'মৌলিক প্রত্যক্ষ' (Original Perception), দ্বিতীয়টি হল 'অর্জিত প্রত্যক্ষ' (Acquired Perception)। চোখ দিয়ে বরফের ঠাণ্ডার সংবেদন প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না। অতীতে আমরা স্পর্শনের সাহায্যে জেনেছি যে বরফ ঠাণ্ডা। এখন বরফের দিকে তাকাতেই দৃষ্টিগত সংবেদন মনে স্পর্শগত সংবেদনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে। বরফের দিকে তাকাতেই তার দৃষ্টিগত বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সঙ্গে স্পর্শগত প্রতিরূপ (Tactual image) এসে যুক্ত হচ্ছে। স্টাউট একে বলেছেন, 'বিজড়ন' (Complication); স্যালি একে বলেছেন, 'অর্জিত প্রত্যক্ষ' (Acquired Perception)।

অর্জিত প্রত্যক্ষের স্বরূপ

প্রতিটি সংবেদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু কোন কোন সময় কোন বিশেষ এক ধরনের সংবেদন যে নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাওয়া যায়, সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে না পেয়ে অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পেয়ে থাকি। আম পাকা দেখায়, গোলাপ ফুল সুগন্ধ যুক্ত দেখায়। স্পর্শনের এবং আস্বাদের দ্বারা আমরা সোজাসুজি আমটা পাকা কিনা প্রত্যক্ষ করতে পারি, ঘ্রাণের সাহায্যেও প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু যখন বলি আম পাকা দেখায় বা গোলাপফুল সুগন্ধযুক্ত দেখায়, তখন উভয় ক্ষেত্রে আমরা সংবেদনটি চক্ষুর সাহায্যে পাচ্ছি। দূরত্ব, ঘনত্ব, আয়তন, গতি—এই সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ চোখের মৌলিক প্রত্যক্ষ নয়, অর্জিত প্রত্যক্ষ।

২৮। কাল প্রত্যক্ষ কিভাবে হয় (How do we perceive time ?)

বিভিন্ন ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিই হচ্ছে কাল। নিয়ত ঘটনা ঘটে চলেছে, কোনটি আগে ঘটেছে, কোনটি পরে ঘটছে, কখনও বা দুটি ঘটনা একত্রে ঘটছে। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে পরিবর্তন ও গতি তাও কালের সাহায্যেই আমরা উপলব্ধি করি।

'স্থায়িত্ব' (Duration) ও 'পারম্পর্য' (Succession)—এই দুই বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আমরা কাল প্রত্যক্ষ করি। যখন বলি, এক ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হয়েছিল, তখন আমরা কালের এই 'স্থায়িত্ব' প্রত্যক্ষ করি।' যখন আমরা বলি একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার আগে বা পরে ঘটেছে— যেমন, আমরা বাড়িতে আসার আগে রাম বাড়িতে এসেছিল, তখন আমরা কালের পারম্পর্য প্রত্যক্ষ করি। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, বছর—এগুলির সাহায্যে আমরা কালের স্থায়িত্ব পরিমাপ করি এবং আগে, পরে, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সময়ের পারম্পর্য নির্দেশ করি। 'স্থায়িত্ব' ও 'পারম্পর্য'—সময়ের এই দুই বৈশিষ্ট্য আমরা একই সঙ্গে অনুভব করি।

স্থায়িত্ব ও পারম্পর্যের সাহায্যে কালের ধারণা

কাল এক অনাদি অনন্ত প্রবাহ। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই অনন্ত প্রবাহের তিনটি স্তর মাত্র। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এরই মাধ্যমে আমরা কাল প্রত্যক্ষ করি। আমরা কেবলমাত্র বর্তমানকেই প্রত্যক্ষ করতে পারি। সংবেদনে 'বর্তমান' প্রত্যক্ষ হয়। অতীত এবং ভবিষ্যৎকেও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। স্মৃতির সাহায্যে অতীত এবং প্রত্যাশার সাহায্যে ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ হয়। যথাযথ সংবেদনই 'বর্তমান'-এর জ্ঞান দেয়। একটি ক্ষুধার্ত শিশু খাদ্য গ্রহণ করছে, ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটছে—এই সংবেদন যখন সে লাভ করে তখনই সে বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করে। 'আর নেই' (no more) এবং 'এখনও আসেনি' (not yet come) যথাক্রমে অতীত এবং ভবিষ্যতের ধারণাকে বোঝায়। প্রত্যাশামূলক মনোযোগের মধ্যে 'এখনও আসেনি'—এই যে ভাব সেটিই ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষণের ইঙ্গিত দেয়।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—কালের তিনটি স্তর

যথার্থ সংবেদন বর্তমান এর জ্ঞান দেয়

যখন আকুল আগ্রহে খাদ্যের জন্য প্রতীক্ষা করছি, তখন আমরা এই ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করি। আবার 'আর নেই' এই বোধই অতীতের প্রত্যক্ষ ঘটায়। বেশ তৃপ্তিদায়ক একটা ভোজ খাবার পর বুঝতে পারি যে ভোজ খাওয়াটি অতীত ঘটনায়

পরিণত হয়েছে। যখন আমাদের ইচ্ছা বিলম্বিত হয় বা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন 'এখনও আসেনি'—এই ভাবটি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। আবার ইচ্ছা যখন আকস্মিকভাবে ব্যাহত হয় এবং তার ফলে মন নিরাশায় পূর্ণ হয়ে যায়, তখন 'আর নেই'—এই বোধটি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। স্মৃতি এবং কল্পনার সাহায্যেই যথাক্রমে অতীত এবং ভবিষ্যৎকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

বর্তমান হল অতীত ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র। বর্তমানকে কেন্দ্র করেই আমরা কালের অপর দুই স্তর, ভবিষ্যৎ ও অতীতের কথা ভাবতে পারি। কিন্তু আমরা যাকে বর্তমান বলি তা কোন সময়-বিন্দু নয়। ক্ষুরের ধারের মতো এই 'বর্তমান' কালকে দুটি নির্দিষ্ট অংশে—অর্থাৎ অতীত এবং ভবিষ্যতে বিভক্ত করছে না। আমরা যাকে 'বর্তমান' বলে প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যেও অতীতেরও কিছু অংশ এবং ভবিষ্যতের কিছু অংশ মিশে আছে। 'বর্তমান' এই শব্দটি উচ্চারণ করবার সময়, যখন 'ব' উচ্চারণ করছি, তখন অন্যান্য অক্ষরগুলো ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে। আর যখন শেষ অক্ষর 'ন' উচ্চারণ করছি তখন আগের তিনটি অক্ষরই অতীতের মধ্যে মিলিয়ে গেছে, কাজেই 'বিশুদ্ধ বর্তমান' (Real present) বলে কিছু নেই। আমরা যাকে সাধারণ কথায় 'বর্তমান' বলি বা 'বর্তমান' বলে প্রত্যক্ষ করি, তাহল উইলিয়ম জেমসের (*William James*) ভাষায় 'অলীক বর্তমান' (Specious present)। সে কারণেই জেমস বলেছেন, 'যাকে আমরা বর্তমান বলে প্রত্যক্ষ করি তা ক্ষুরের ধারের মতো নয়, বরং এ হল ঘোড়ার পিঠে বসার জিনের মতো, যার সামনে পিছনে নিজের কিছু বিস্তার আছে যেখান থেকে যথাসময়ে সামনে ও পিছনের দিকে আমরা তাকাতে পারি।'[1]

বর্তমান কোন সময়-বিন্দু নয়

অলীক বর্তমান

বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়নির্ভর, কিন্তু কালকে প্রত্যক্ষ করার জন্য কোন ইন্দ্রিয় নেই। কিন্তু গেস্টাল্টবাদীরা মনে করেন যে মস্তিষ্ক সোজাসুজি 'কাল সম্বন্ধ' প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং এ ক্ষমতা হল মস্তিষ্কের একটা মৌলিক ক্ষমতা।

২৯। সংপ্রত্যক্ষ (Apperception):

একটি অপরিচিত বস্তু বা ঘটনাকে যখন পরিচিত বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ করি, তখন তাকে বলা হয় সংপ্রত্যক্ষ। সংপ্রত্যক্ষ হল মনের মধ্যে সুসংবদ্ধ

1. 'In short, the practically cognised present is no knife-edge, but a saddle back, with a breadth of its own, and from which we look in two directions in in time.'—James: Principles of Psychology V. 1. 1, Page 606.

অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করা। সাধারণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতার সংযোগ থাকে, তবে এই সংযোগ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আমাদের অজ্ঞাতসারে। কিন্তু সংপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সংযোগ জ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে। কেননা, এক্ষেত্রে জ্ঞাতসারেই নতুন কোন ঘটনাকে অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। একটি নতুন অপরিচিত জন্তুকে দেখে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হল যে, জন্তুটি বিড়াল-জাতীয়, তবে বিড়ালের থেকে আকারে বড়, বন্য, হিংস্র এবং অন্য জন্তু শিকার করে। এক্ষেত্রে মনে পূর্ব থেকে বিড়ালের যে অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে বর্তমান অপরিচিত বস্তুটিকে ব্যাখ্যা করা হল।

মনের মধ্যে সুসংবদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করাই সংপ্রত্যক্ষ

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংবেদনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সংপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনের মধ্যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংবেদনকে ব্যাখ্যা করেই পরিবেশের নতুন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সংপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অতীত ধারণার সাহায্যে নতুন ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষ ও সংপ্রত্যক্ষ

জার্মান দার্শনিক হারবার্ট (*Herbart*) শিক্ষার অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে সংপ্রত্যক্ষের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে তারা পুরাতন ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে নতুন নতুন ধারণাগুলোকে বোঝার চেষ্টা করে। পাঠ্যবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি না করে, তারা যেন কেবলমাত্র সেগুলো কণ্ঠস্থ না করে বস্তুতঃ, জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিই হল অতীত অভিজ্ঞতায় পাওয়া ধারণার সঙ্গে বর্তমান ধারণাকে যুক্ত করা, জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করে তোলা। অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে না পারলে ধারণাগুলো জ্ঞানের বিচ্ছিন্ন উপাদানরূপে বিরাজ করে, যেগুলি আসলে কোন কাজে আসে না। কাজেই কোন শিক্ষকের উচিত নয় সম্পূর্ণ নতুন নতুন ধারণা দিয়ে শিশুর মনের বোঝাকে ভারি করে তোলা, কারণ সে-সব ধারণাকে শিশু অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে না বলে শিক্ষণকার্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সংপ্রত্যক্ষের গুরুত্ব

৩০। ইন্দ্রিয়ের শিক্ষণ বা ইন্দ্রিয়ানুশীলন (Sensory Training) :

শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গুলোকে শিক্ষণের সাহায্যে উপযুক্ত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভূত হয়। আমাদের সব অভিজ্ঞতার মূল ভিত্তি

হল আমাদের ইন্দ্রিয়। শিশুর সব ইন্দ্রিয়ের বিকাশ সমানভাবে ঘটে না, বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। শিশুর স্পর্শেন্দ্রিয় (Tactual sense) সর্বপ্রথমে বিকাশ লাভ করে। সে তার হাত ও পায়ের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তু স্পর্শ করতে চায়। যদি আমরা কোন শিশুকে কোলে নিই, সে বার বার আমাদের মুখ, নাক ও কান স্পর্শ করে। সে স্পর্শনের সাহায্যে প্রথমতঃ তার মাকে চিনতে শেখে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের পর চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের (Visual sense) বিকাশ ঘটে। তিন চার মাসের শিশু আলোকের দিকে আকর্ষণ বোধ করে। সে আলোকের দিকে তাকায়, আলো নিভিয়ে দিলে অনেক সময় শিশুরা কাঁদতে থাকে, আবার আলো জ্বালালে চুপ করে যায়। চক্ষু-ইন্দ্রিয় ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। শিশু দূরের জিনিস প্রত্যক্ষ করতে শেখে এবং দূর থেকে মাকে দেখে। এইভাবে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলো ধীরে ধীরে ও সুসঙ্গতভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। শিশুর ইন্দ্রিয়ের শিক্ষণের বা ইন্দ্রিয়ানুশীলনের ব্যাপারে এই বিকাশের কথা স্মরণে রাখা উচিত।

প্রথমে শিশুর স্পর্শেন্দ্রিয় ও পরে তার চক্ষু ইন্দ্রিয় বিকাশ লাভ করে

অবশ্য ইন্দ্রিয়ের শিক্ষণের পূর্বে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলো ত্রুটিমুক্ত ও সুস্থ কিনা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। যদি কোন শিশুর দৃষ্টিগত বা শ্রবণগত কোন ত্রুটির কথা জানা যায়, তাহলে শিক্ষকের উচিত হবে এই ত্রুটির কথা পিতামাতার গোচরে আনা, যাতে শিশুর এই ত্রুটি দূর করে তাকে সুস্থ করে তোলা যেতে পারে। অনেক সময় শিক্ষকেরা অজ্ঞতাবশতঃ এই দিকে যথোপযুক্ত মনোযোগ দেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না। যে সব ছাত্রদের দৃষ্টিগত এবং শ্রবণগত দোষ বা ত্রুটি রয়েছে, শিক্ষকদের উচিত তাদের শ্রেণীকক্ষের সামনের সারিতে আসন গ্রহণ করতে বলা। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে চিকিৎসক ছাত্রের সব ইন্দ্রিয়গুলো পরীক্ষা করে তাদের দোষ ত্রুটি পিতামাতা ও শিক্ষকদের গোচরে আনতে পারেন। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির ত্রুটি ছাত্রদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়; এবং ঠিক সময়ে এই ত্রুটি ধরা পড়লে উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে ছাত্রকে সুস্থ করে তোলা যেতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক কুশলতা শারীরিক সুস্থতা ও কুশলতার উপর একান্তভাবেই নির্ভর।

উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে শিশুর দৃষ্টিগত ও শ্রবণগত ত্রুটি দূর করা প্রয়োজন

যেহেতু আমাদের জ্ঞানের একটা বিরাট অংশের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ, সেহেতু ইন্দ্রিয়ের শিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ফ্রয়েবেল (*Froebel*) এবং মন্টেসরি (*Montessori*) ইন্দ্রিয়-শিক্ষণের (sensory training)

উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মণ্টেসরির নাম এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইন্দ্রিয়-শিক্ষণের বিষয়টিকে একটি পদ্ধতির পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। তিনি মনে করেন আড়াই বছর থেকে সাত বছরের শিশুদের প্রয়োগমূলক এবং প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা দরকার। মণ্টেসরির খেলার ছলে শেখা পদ্ধতি (play-way method)-র মধ্যেও এই ইন্দ্রিয় শিক্ষণের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, স্বয়ংশোধনযোগ্য 'didactic' উপাদানের মাধ্যমে শিশুদের ইন্দ্রিয়গুলোকে শিক্ষিত করার কথা তিনি বলেছেন। দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষণের যাথার্থ পরীক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন বর্ণের রেশমী কাপড়ের সাহায্যে বর্ণের পার্থক্য নির্ধারণ, উচ্চতা, ঘনত্ব ও ওজনের পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠের টুকরো ব্যবহারের কথা বলেছেন। এগুলিই হল didactic materials-এর উদাহরণ। তিনি মনে করেন এর মাধ্যমে শিশু যে শুধু আনন্দই পায় তা নয়, শিশুর মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতির বিকাশ ঘটে এবং তার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষণ সূক্ষ্ম হয়। অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে, আসলে যাকে শিক্ষিত করে তোলা হয় তা হল শিশুর প্রত্যক্ষ করার, পৃথক করার ও সংবেদন ব্যাখ্যার ক্ষমতাকে। শৈশবে এ জাতীয় শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ এই জাতীয় ইন্দ্রিয়-শিক্ষণই শিক্ষার পরবর্তী কালের বুদ্ধিগত বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দেয়। তবে কোন কোন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর মতে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-পৃথকীকরণ যদি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে না।

মণ্টেসরির এই ইন্দ্রিয়-শিক্ষণের বিষয়টিকে অনেকে গ্রহণ করতে নারাজ হলেও, এই পদ্ধতির উপকারিতা অস্বীকার করা চলে না। ইন্দ্রিয়ের শিক্ষণ বা ইন্দ্রিয়ানুশীলন জ্ঞানকে গভীর করে এবং বস্তুর সম্পর্কে যথার্থ ও সুসংহত জ্ঞান দান করে। পর্যবেক্ষণ যত সুনির্দিষ্ট হয় চিন্তাও তত সুনির্দিষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের শিক্ষণের মাধ্যমেই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকতর করে তোলা যেতে পারে। শহরের ছেলেরা গাছ-পালা, নদী, পাখী সম্পর্কে অনেক রকম অজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং এ সম্পর্কে পাঠ্যবিষয়গুলো ঠিক পরিষ্কারভাবে বুঝে উঠতে পাবে না। বাস্তব ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধুমাত্র বই পড়ে জ্ঞান যথার্থ হয় না। সে কারণে শিক্ষক ও পিতামাতার উচিত শিশুদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে উৎসাহিত করা এবং বাস্তব জগতের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাদের পরিচিত করে তোলা ও সেই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা।

৩১। পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের শিক্ষণ বা অনুশীলন (Observation and Training in Observation) :

ইন্দ্রিয়ের শিক্ষণ অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি তা কোন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়। পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়েই ইন্দ্রিয়গুলোকে শিক্ষিত করা দরকার। মনোবিজ্ঞানী শালি (*Sully*) বলেন, পর্যবেক্ষণ হল সুনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষণ। পর্যবেক্ষণ হল নিবিড়ভাবে কোন বস্তুর দিকে তাকান, তার বিভিন্ন অংশ বা বিশদ বিবরণের প্রতি মনোযোগী হওয়া। পর্যবেক্ষণ হল উদ্দেশ্যমূলক প্রত্যক্ষ, উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন কিছুর দিকে তাকান নয়। পথে বেরোলে আমরা অনেক কিছুর দিকে তাকাই, অনেক শব্দই কানে শুনি। এ পর্যবেক্ষণ নয়, প্রত্যক্ষণ মাত্র। যখন কোন বিশেষ নামের দোকান থেকে কোন কিছু কেনার উদ্দেশ্যে আমরা একের পর এক দোকানগুলো প্রত্যক্ষ করতে থাকি, তখন তা হল পর্যবেক্ষণের উদাহরণ। কেননা, এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যমূলক, একটা পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে এই প্রত্যক্ষ অগ্রসর হয় এবং এই প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। পর্যবেক্ষণ চিন্তামূলক এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ধারণা প্রয়োগ করা হয়। পর্যবেক্ষণ করার সময় বিশদ বিবরণ লক্ষ্য না করে, উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর উপর মনোযোগ নিবিষ্ট করা হয়। মনোযোগ, নির্বাচন, বিশ্লেষণ ও শ্রেণীবিন্যাস প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে।

পর্যবেক্ষণের প্রকৃতি

শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের অনুশীলনের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা সমধিক। পর্যবেক্ষণের ফলে মনোযোগের ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ ঘটে এবং বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। যুক্তির পর্যালোচনার সামর্থ্যের ভিত্তি হল পর্যবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্দ্রিয়ের যাথার্থ ই পর্যাপ্ত নয়। কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে, অবশ্য অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, পর্যবেক্ষণের কুশলতা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর, যে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার সঙ্গে পরিচিতি, পর্যবেক্ষিত পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান এবং পরিস্থিতিতে আগ্রহ ও সতর্কতামূলক মনোযোগ।

শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের অনুশীলনের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা

শিশুদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নত করার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের বস্তু পর্যবেক্ষণ করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। পিতামাতা ও শিক্ষকদের এ ব্যাপারে সব রকম সহায়তা দিতে হবে। শিশুর জ্ঞান সীমিত কাজেই শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তারা বস্তুর সকল দিকের সঙ্গে পরিচিত হতে সমর্থ হয় না।

শিশুর পর্যবেক্ষণশক্তিকে উন্নত করার বিভিন্ন পদ্ধতি

শিশুদের একই পরিবেশ বা পরিস্থিতির সঙ্গে প্রায়ই পরিচিত করান উচিত যাতে তারা বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক সহজে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে

পারে। দ্বিতীয়তঃ, গভীর জ্ঞান পর্যবেক্ষণের সহায়ক। যিনি ঘড়ি মেরামত করেন তিনি আমার ঘড়িটি খারাপ হয়ে গেলে তার দোষত্রুটি সহজেই নির্ণয় করতে পারেন, যা আমি পারি না। এ ব্যাপারে তাঁর গভীর জ্ঞান পর্যবেক্ষণের সহায়ক হয়। তৃতীয়তঃ, আগ্রহ ও মনোযোগ পর্যবেক্ষণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। যাতে আমাদের আগ্রহ নেই, তা আমরা পর্যবেক্ষণ করি না।

শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের মধ্যে গভীর জ্ঞানের একান্ত অভাব। শিশুরা অনুসন্ধিৎসু হয়। সব ব্যাপারেই তাদের গভীর কৌতূহল। তাদেব কৌতূহল মেটাবার জন্য তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে পিতামাতা ও শিক্ষকদের বিব্রত করে। এর ফলে অনেক পিতামাতা ও শিক্ষক মনে করেন যে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। আসলে তা নয়, যদি তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নত করা যায় তাহলে তারা আরও বেশী কৌতূহলী হবে এবং নিজেদের কৌতূহল নিজেরাই মেটাতে সমর্থ হবে।

শিশুদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নত করতে হলে যথেষ্ট সতর্কতা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু তার কাছে উপস্থাপিত করতে হবে, প্রথমতঃ, কেন শিশুকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। দ্বিতীয়তঃ. পর্যবেক্ষণ যেহেতু নির্বাচনমূলক, শিশুদের কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ-বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দিতে বলতে হবে। এই বিশদ বর্ণনার দিকে প্রত্যক্ষভাবে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, কার্যকর প্রশ্ন ও সংকেতের সাহায্যে তার মনোযোগ ও আগ্রহকে সেদিকে আকৃষ্ট করতে হবে। তৃতীয়তঃ, বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণের পর সে সম্পর্কে আলোচনা এবং পড়াশোনার উপর গুরুত্ব দিতে হবে, প্রয়োজনমত আনুষঙ্গিক পুস্তকাদির সহায়তা গ্রহণ করে সিদ্ধান্তগুলোতে প্রমাণিত করতে হবে।

পর্যবেক্ষণের শিক্ষণের বা অনুশীলনের পক্ষে যা বিশেষভাবে সহায়ক তা হল বিদ্যালয় থেকে প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থা, যাদুঘর পর্যটন, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, অঙ্কন, চিত্রকলা প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে শিশুর নিজের পক্ষে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়। তবে কোন বিশেষ পরিকল্পনার সঙ্গে এদের যুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। ডালটন পরিকল্পনা (Dalton Plan) এবং প্রকল্প পদ্ধতির (Project method) ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের বিকাশ সাধনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্প পদ্ধতির মধ্যে কাজ করার মাধ্যমে শেখা (Learning by doing)—কৌশলের যে রূপায়ণ ঘটেছে, সেই পদ্ধতিতে শিশুকে তার পর্যবেক্ষণশক্তির উন্নতির জন্য দায়ী করা হয়। পর্যবেক্ষণ করার পর শিশুকে তার ঈপ্সিত কাজ সম্পাদন

করতে হয়। প্রকল্প পদ্ধতিতে কাজ করার মাধ্যমে শেখার (learning by doing) যে নীতি অনুসরণ করা হয়, সেটি পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নত করবার যে পদ্ধতি তারই প্রকার ভেদ মাত্র। শিক্ষণ সম্পর্কে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার ভিত্তি এই সক্রিয়তার মাধ্যমে শেখার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি পর্যবেক্ষণের সঙ্গে গতির সংযোগ ঘটে, অর্থাৎ শিশু যখন পর্যবেক্ষণ করে তখন যদি শিশু সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে থাকে তাহলে জ্ঞান গভীর ও প্রয়োগমূলক হয়ে ওঠে।

৩২। শিশুর প্রত্যক্ষের ক্রমবিকাশ (Perceptual Development in Children) :

অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই মানুষের প্রত্যক্ষ। ব্যক্তি ভেদে যেহেতু অভিজ্ঞতা পৃথক হয়, ব্যক্তির প্রত্যক্ষও পৃথক হয়। দুজন ব্যক্তি একই ইন্দ্রিয়ের অধিকারী এবং উভয়ের ইন্দ্রিয়ই ত্রুটিমুক্ত তবু উভয়ের প্রত্যক্ষ সমান হয় না। তারা বস্তুর বিভিন্ন দিকের প্রতি মনোযোগী হয়. নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার ব্যাখ্যা দেয় এবং ফলতঃ বিভিন্ন বস্তু প্রত্যক্ষ করে। শিশুর অভিজ্ঞতা স্বল্প, কাজেই আমাদের প্রত্যক্ষ ও শিশুর প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কাজেই শিশুর প্রত্যক্ষের সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্কের প্রত্যক্ষের পার্থক্য এবং শিশুর প্রত্যক্ষের ক্রমবিকাশের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অভিজ্ঞতাই প্রত্যক্ষের ভিত্তি

নবজাত শিশুর পরিবেশের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না, সেহেতু কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষও তার হয় না। বস্তু,বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক, বস্তুর গুণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে তার ইন্দ্রিয় তখনও উপযুক্ত হয়ে ওঠে না। মনোবিদ্ জেমস (*James*)-এর মতে নবজাত শিশুর চেতনা হল একধরনের 'জটপাকানো অস্পষ্ট অব্যক্ত চেতনা' (a big blooming, buzzing confusion') অর্থাৎ নবজাত শিশুর প্রত্যক্ষের পটভূমিতে চেতনা কোন সুস্পষ্ট মূর্তি ধারণ করে না। শিশু যত বড় হতে থাকে, ততই তার বিভিন্ন ধরনের অনুভূতির অভিজ্ঞতা হতে থাকে। অনুভূতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রত্যক্ষও বিকশিত হতে থাকে। তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সাহায্যে সে পরিবেশের বিশ্লেষণ করে, কতকগুলো গুণকে নির্বাচিত করে, মনোযোগের সহায়তায় তাদের অনুসংবদ্ধ করে এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য করতে শেখে। শিশুর ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে, যার জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শুরুতে তার প্রত্যক্ষ খুব উচ্চস্তরের হয় না। এই স্তরে সে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

শিশুর প্রত্যক্ষ ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত হয়

করতে পারে না। আগুনের গুণাগুণ সম্পর্কে সে যথার্থ সিদ্ধান্ত করতে পারে না বলেই আগুন দেখলে সে ছুটে যায়। চার পাঁচ বছর বয়স হলে শিশু বুঝতে পারে যে আগুনের সাহায্যে রান্না হয়। দশ এগার বছর বয়সে সে বুঝতে পারে যে আগুনকে অনেক কাজে লাগান যেতে পারে। অভিজ্ঞতার অভাববশতঃ শিশু কোন বিষয়ে তার মনকে নিবিষ্ট করতে পারে না। অথচ মনের একাগ্রতার উপরই প্রত্যক্ষের ভিত্তি। প্রত্যক্ষের তিন চতুর্থাংশ হল অনুমান। অতীত অভিজ্ঞতা এবং মনের একাগ্রতার সাহায্যেই এই অনুমান করা হয়। প্রাপ্ত বয়স্কের সঙ্গে তুলনায় শিশুর মধ্যে এই দুই ক্ষমতা খুব অল্প পরিমাণেই থাকে, যার জন্য প্রাপ্ত বয়স্কের প্রত্যক্ষের মতো তার প্রত্যক্ষ যথাযথ হয় না।

প্রাপ্ত বয়স্কের প্রত্যক্ষের তুলনায় শিশুর প্রত্যক্ষ কম বিশ্লেষণমূলক (analytical) এবং অনেক বেশী অনির্দিষ্ট হয়। ছোট শিশু দড়ি বা ফিতে, কলম বা পেন্সিলের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য নির্ধারণ করতে অসমর্থ বলেই সে সবকিছুই তার মুখে পুরে দেয়।

পরের পোশাক, বাসনপত্র বা পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয় না। ছোট শিশুর অঙ্কন-কার্য দেখলেই বোঝা যায় যে বস্তুর বিশদ প্রত্যক্ষ তাদের ক্ষেত্রে হয় না। বিনে (Binet) এর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, কোন মানুষের আঁকা ছবি থেকে নাক, চোখ, কান, আঙুল বাদ পড়লেও, তারা সহজে সেগুলো ধরতে পারে না। এর কারণ তাদের অভিজ্ঞতা সীমিত, মনোযোগ অস্থির, বিভিন্ন বস্তুর ধারণা করবার ক্ষমতা অনুন্নত এবং তাদের প্রত্যক্ষে বিশদ বিবরণ, যাথার্থ, সুনির্দিষ্টতা ও যৌক্তিক সংহতির অভাব।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাপ্তবয়স্কের প্রত্যক্ষের তুলনায় শিশুর প্রত্যক্ষের জন্য অনেক শক্তিশালী উদ্দীপকের (Stimulus) প্রয়োজন। যে বস্তু খুব উজ্জ্বল নয়, বা যে শব্দ খুব জোরালো নয় সেগুলো শিশুর নজরে পড়ে না। অনেক সময় বস্তুকে খুব জোরালো আলোকে শিশুর কাছে উপস্থাপিত করতে হয় এবং তাও বারবার করতে হয় যাতে শিশু প্রত্যক্ষ করতে পারে। তৃতীয়তঃ, শিশুর প্রত্যক্ষ তার স্মৃতি ও কল্পনার সঙ্গে মিশে যায় যার জন্য তার প্রত্যক্ষ বস্তুর যথাযথ স্বরূপের প্রত্যক্ষ হয় না। সে কারণে শিশুর প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক উপযোগিতাসাধনে কম সমর্থ। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যথাযথ-ভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং সেই প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে উপযোগী হয়। শিশুর প্রত্যক্ষ যেহেতু উদ্দেশ্যসিদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং যেহেতু তার লক্ষ্য ও লক্ষ্যসাধনের উপায় সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব, সেহেতু তার প্রত্যক্ষ

স্বতঃস্ফূর্ত ; যা শিশুর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, যা তার নজরে আসে, তাই সে প্রত্যক্ষ করে।

নবম অধ্যায়

স্মৃতি

(Memory)

আমাদের জীবনের চলার পথে এমন অনেক জিনিস আমরা দেখি বা এমন অনেক ঘটনার আবর্তে পড়ি যেগুলো আমাদের মনে রেখাপাত করে অর্থাৎ ছাপ রেখে যায়। প্রয়োজনমত সেগুলোকে আমরা মনে সংরক্ষিত করি তারপর তার পুনরুদ্রেক ঘটিয়ে বহুর ভেতর থেকে আসল জিনিসটিকে চিনে নিই। আমরা আমাদের চেতনার আলোতেই অনেক প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে যাচাই করে নিতে পারি। তাই জীবনে মনে রাখা আর ভুলে যাওয়াকে আমরা এত বেশি করে মূল্য দিই। যে ক্ষমতার সাহায্যে আমরা মনে রাখি আর যার অভাবে আমরা ভুলে যাই তাকে বলি স্মৃতি (Memory)। মনোবিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে সাম্প্রতিক এই ক্ষমতা অর্থাৎ মানসিক শক্তিটিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু সুপ্রাচীনকাল থেকে আমরা স্মৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনে এসেছি। তাই এর প্রাচীন মতবাদ বা ধারণা ও আধুনিক সংব্যাখ্যান আলোচনার সুযোগ আছে।

১। স্মৃতি সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদঃ (Old view of Memory) :

অন্য অনেক জিনিসের মত স্মৃতি সম্বন্ধে ধারণারও একটা বিবর্তন আছে। এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে, এর স্বরূপ সম্পর্কে প্রত্যয়িত ধারণা দিতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। সবচেয়ে প্রাচীনপন্থী মনোবিজ্ঞানীরা স্মৃতিকে একটি মৌলিক মানসিক শক্তি (original mental power or faculty) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা মনকে কল্পনা, স্মৃতি, চিন্তন ও বিচারকরণ ইত্যাদি কতকগুলো শক্তির সমষ্টি বলে মনে করেছেন। তাঁদের মতে এগুলোর উপযুক্ত অনুশীলনের মাধ্যমে মনকে পুষ্ট করা যায় আর অনুশীলনের অভাবে এগুলো দুর্বল হয়; পক্ষান্তরে মনই দুর্বল হয়ে পড়ে। এদের বলা হত চেষ্টিতবাদী মনোবিজ্ঞানী (Faculty Psychologists); এরা মনকে বায়ুরোধী প্রকোষ্ঠে (airtight compartment) বিভক্ত বলে মনে করতেন। প্রতিটি শক্তিকে অন্যটি থেকে নিরপেক্ষ ও সুনির্দিষ্ট বলে ধরে নিতেন। স্মৃতিকেও তাঁরা এজাতীয় মানসিক বৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাই তার উন্নতির জন্য কবিতা মুখস্থ ও আবৃত্তির উপর জোর

দিয়েছিলেন। ব্যাপক গবেষণার ফলে এ মতবাদ বর্তমানে বাতিল বলে গণ্য করা হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে একদল মনোবিজ্ঞানী মনের উৎপাদক বিশ্লেষণের (Factor Analysis) উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। থার্স্টোন প্রবর্তিত মনের সাতটি মৌলিক শক্তির[1] কল্পনায় হয়ত চেষ্টিতবাদীদের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে তথাপি এগুলোর ভিত্তি হল পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সিদ্ধ। প্রাচীন শক্তিগুলোর কর্মপরিধি ছিল সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট; কিন্তু আধুনিক শক্তিগুলোর কর্মপরিধি অনেক ব্যাপক এবং আমাদের মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে কাজ করে। সহপরিবর্তন (correlation) নির্ণয়ের জটিল গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে এদের বিশ্লেষণ ও অস্তিত্ব নির্ণয় করা হয়েছে।

২। **স্মৃতির আধুনিক সংব্যাখ্যান** (Modern concept of Memory)**:** 'স্মৃতি' কথাটি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ্যপদ নয়, এটি মনোযোগের মতো একটি ক্রিয়াপদ। এর মধ্যে একটি মানসিক ক্রিয়া রয়েছে। মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ (*Woodworth*) স্মরণ করার কাজটিকে চারটি পৃথক পৃথক কাজের ধারাবাহিকতার সমষ্টি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমন :

(ক) শিখন বা লিপিবদ্ধকরণ (Registration), (খ) ধারণ বা সংরক্ষণ (Retention), (গ) পুনরুদ্রেক (Recall) এবং (ঘ) প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition).

(ক) **শিখন:** এটি স্মৃতির প্রাথমিক পর্যায়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি তার একটা প্রতিচ্ছবি (Image) আমরা মনের খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখি। এ পর্যায়ের আগেই আসে শিখন। যা শেখা হয়নি তাকে লিপিবদ্ধ করার প্রশ্নই উঠে না। শিক্ষিত বস্তুগুলির প্রত্যেকটির ছাপ মস্তিষ্কে থেকে যায়, এগুলিকে বলা হয় স্মৃতিছাপ (Memory trace)। উপযুক্ত উদ্দীপকের সহায়তা পেলে সেগুলো আবার জীবন্ত হয়ে উঠে।

স্মৃতিছাপ

(খ) **ধারণ বা সংরক্ষণ:** এটি স্মৃতির দ্বিতীয় পর্যায়। স্মৃতিছাপগুলোকে মনের মধ্যে ধরে বা সংরক্ষিত করে রাখতে হয়। শিক্ষালব্ধ বা অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুটি আমাদের মনের চেতন স্তর থেকে অবচেতন স্তরে গিয়ে সংরক্ষিত হয়।

1 : V=Verbal Comprehension
N=Number Facility
M=Memory
P=Perceptual Ability
S=Space
W=Word Fluency
R=Inductive Reasoning

স্তরের কল্পনা ছাড়া স্মৃতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তাই এ মতবাদকে সমর্থন না করে পারা যায় না।

(গ) **পুনরুদ্রেক বা মনে করা:** মনে সঞ্চিত বা সংরক্ষিত অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজনমত উজ্জীবনকে মনে করা বা পুনরুদ্রেক বলে। আসলে অব্যক্ত প্রতিরূপকে এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। কোনো উদ্দীপক সূত্র বা অভিভাবনের (Suggestion) সাহায্যে পুনরুদ্রেক সম্ভাবিত হয়। উদ্দীপক প্রতিরূপগুলোকে অতীত অভিজ্ঞতার ক্রম, সম্বন্ধ, বিন্যাস অনুযায়ী পুনরুদ্রেক ঘটায়। যে সম্বন্ধের ফলে উদ্দীপক একাজ করতে পারে তাকে আমরা অনুষঙ্গ (Association) বলি।[1]

অনুষঙ্গ

প্রত্যভিজ্ঞা: অতীত অভিজ্ঞতায় পুনরুজ্জীবনই যথেষ্ট নয়। মনে সেই অভিজ্ঞতার পুনরুৎপাদনের প্রতিরূপই যে পূর্ব অভিজ্ঞতারই প্রতিরূপ—এ জ্ঞানই স্মৃতির অন্যতম অঙ্গ। যে বিষয়টি পূর্বে জানা হয়েছিল, তাকেই আবার জানা হচ্ছে বলে এ প্রক্রিয়াকে আমরা পুনঃপরিজ্ঞান ও জ্ঞানকে বলেছি প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)[2]। এটি একটি পরিচিতির বোধ যার অভাব ঘটলে স্মরণক্রিয়া যথাযথ হয় না।

৩। শিক্ষণের ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ নীতির গুরুত্ব (Importance of laws of association in teaching):

অনুষঙ্গের স্বীকৃত তিনটি নীতির ভিত্তিতে আমরা পুনরুদ্রেক প্রক্রিয়া চালাই। এ প্রসঙ্গে পূর্বে বিশদালোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত নীতি তিনটির মধ্যে সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য নীতি দুটি শিক্ষণক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিভাবে বিদ্যালয় কক্ষে এ দুটি কাজ করে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হল:

সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নীতির ক্রিয়াকলাপ: (Working of the law of Contiguity)। (ক) কোন জিনিসের নামের সঙ্গে সেই জিনিসের অনুষঙ্গ স্থাপন কি ভাবে হয় (The association of the name of a thing with the thing itself)। 'গরু' এ কথাটি ধরা যাক। যে শিশু কোন দিন গরু নামে প্রাণীটিকে দেখেনি বা কথাটি

দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ কেন?

1. 'used generally of the principle, in accordance with which ideas, feelings, and movements are connected in such a way as to determine their succession in the mind or in the actions of an individual, or of the process of establishing such connections.' —Dictionary of Phychology

3. 'perceiving (or recalling) an object, accompained by a feeling of familiarity or the conviction that the same object has been perceived before.' —Dict, of Psy. —*Drever*

শোনেনি তার কাছে প্রাণীটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; এমন কি যদি প্রাণীটিকে সে কখনও দেখে বা শুধু তার নাম শোনে তাহলেও তার শিখন হবে না। কিন্তু যদি কথাটির সঙ্গে প্রাণীটিকে একসঙ্গে চিনে নিতে পারে তাহলে তার শেখা অনেক সহজ হয়। সান্নিধ্য নীতির বলেই শিশু নামানুসারে ঠিক জিনিসকে শিখে নিতে পারে। 'গরু' শব্দটি কেবলমাত্র উচ্চারণ করলে তার কোন অর্থবোধ হয় না। তাই বর্তমানে শিখনকে সহজতর করার জন্যে দৃষ্টি নির্ভর শিক্ষাসহায়ক উপকরণের ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) আদেশসূচক শব্দের পালন হয় কিভাবে ? (Obedience to the word of command) : 'বাইরে দাঁড়াও', 'ভেতরে এস' কিংবা 'পেছনে যাও' ইত্যাদি আদেশ এত বেশিবার শিশুরা শোনে যে তারা শোনামাত্রই ঠিক সেই মতো কাজ করে। এটা এত স্বাভাবিক পর্যায়ে যায় যে তারা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতো উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

(গ) ক্রমের পুনরাবৃত্তি শেখা (Learning to repeat a sequence) : শব্দের ক্রম বা বাক্যের ক্রম এমন কি নামতা শেখা কাজটিও এ নীতির ফলে সম্ভব হয়।

ক্রম শেখা হয় কিভাবে ?

(ঘ) মৌখিক সমষ্টি (The verbal aggregate) : শিশু হয়ত ইংরেজী 'Cow' কথাটা পেল এবং জোরে পড়তে লাগল। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে খুব সহজ মনে হলেও ততটা সহজ নয়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে—প্রথমতঃ, তার 'cow' কথাটির সম্বন্ধে চাক্ষুষ কল্পমূর্তি (visual percept) তৈরি হল। এটি হল চাক্ষুষ স্মারক (visual sign)। দ্বিতীয়তঃ, সান্নিধ্যের বলে চাক্ষুষ চিহ্নটি তার জিহ্বা, স্বরযন্ত্র ইত্যাদিকে শব্দটি ঠিকমত উচ্চারণ করতে সাহায্য করল। এটি হল কণ্ঠোচ্চারিত স্মারক (vocal sign)। তৃতীয়তঃ, উচ্চারিত স্বরটি তার শ্রবণযন্ত্রে একটা ঝংকার তোলার ফলে সে বুঝতে পারল যে শব্দটির উচ্চারণ ঠিকমত হয়েছে। এটি শ্রবণ স্মারক (Auditory sign)। চতুর্থতঃ, চাক্ষুষ, কণ্ঠোচ্চারিত ও শ্রবণ স্মারকগুলো শব্দানুসারী প্রাণীটি সম্বন্ধে স্মৃতি-প্রতিরূপ গড়ে তুলল। এটি হল মানসিক চিহ্ন। একেই আমরা ধারণা (concept) বলছি। কল্পমূর্তি (Percept) এভাবে ধারণায় পরিণত হয়।

মৌখিক সমষ্টি কি ?

সমস্ত প্রক্রিয়াটাই কিন্তু একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেকটি স্মারকের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই যদিও তারা একই সময়ে উদ্ভূত হয়েছে। তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজ করছে তাহল পারস্পারিক সান্নিধ্য। অবশ্য যে কোন একটি স্মারকই

অপরটি জাগিয়ে তুলতে পারে। এভাবে 'cow' কথাটি শোনার পরই অন্য প্রতীক-গুলো কিভাবে জেগে ওঠে তা ক্রমানুসারে আলোচনা করা হচ্ছে :

প্রথমতঃ, মানসপ্রতীক (Mental symbol)—'Cow' সম্বন্ধে ধারণা।

দ্বিতীয়তঃ, কণ্ঠোচ্চারিত প্রতীক (Vocal symbol)—অনেক সময় দেখা যায় যে উত্তেজনার মুহূর্তে শ্রোতা বক্তার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে।

তৃতীয়তঃ, চাক্ষুষ প্রতীক (Visual symbol) ছাপার অক্ষরে লেখা 'Cow' কথাটি।

সমস্ত ধাপগুলো উপস্থিত থাকলে মন খুবই সক্রিয় থাকে, তাই যখন জটিল কোন অনুচ্ছেদের অর্থবোধ করতে চাওয়া হয় তখন অনেক সময় নীরব পাঠের বদলে সরব পাঠ করানো হয়। সেজন্য নিচের দিকের শ্রেণীতে সরবপাঠের মূল্য বেশি। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক সমষ্টি পর্যায়ে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪। সাদৃশ্য অনুষঙ্গের ক্রিয়াকলাপ (Working of the law of similarity) :

(ক) শিশু-বিদ্যালয়ে রঙ মেলানো : (Matching colours in a kindergarten Exercise) : সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করেই কিণ্ডারগার্টেন বা নার্সারির বিদ্যালয়সমূহে শিশুদের বিভিন্ন রঙ মেলাতে বলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য যে শিশুরা যেন রঙগুলোকে ঠিকমত চিনে নিতে পারে। তাদের ইন্দ্রিয়ানুশীলনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে।

(খ) বিশেষ কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ সূত্র নির্ণয় (Obtaining a law or general rule from the observation of particular cases) : জল, দুধ, স্পিরিট, পেট্রোল ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠদানের পর এদের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন পদার্থকে যে তরল পদার্থ বলে এবং এদের বিভিন্ন ধর্ম (Properties) সাধারণ সূত্র নির্ণয় করা যায়।

(গ) তারিখ শেখা (Learning of Dates) : অনেক সময় ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে তারিখগুলো শেখানো হয়, ও আবার শুধু ঘটনাগুলো দিয়ে তারিখ-গুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়। যেমন—

পলাশীর যুদ্ধ—১৭৫৭ খ্রীঃ

সিপাহী বিদ্রোহ—১৮৫৭ খ্রীঃ

বাবরের মৃত্যু—১৫৩০ খ্রীঃ

ভারতের প্রজাতন্ত্রদিবস—২৬শে জানুয়ারী

(ঘ) **সাদৃশ্য দেখে চিনতে পারা (Recognition by similarity):** কালিদাসের কথা পড়তে গিয়ে শেক্সপীয়রের কথা স্মরণে আনা। অথবা কোন কবির দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে পূর্ব পরিচিতি থাকলে বর্তমানের পাঠ্যবস্তুতে অনুরূপ অনুভূতি ঘটলে সেই অনুভূতির আলোকে উদ্ভাসিত করা।

৮। সান্নিধ্য ও সাদৃশ্যনীতি একসঙ্গে কিভাবে কাজ করে? (Conjoint working of similarity and contiguity):

(ক) একজন শিক্ষক একটি ছেলের নাম ভুলে গিয়ে উপস্থিতির খাতায় পাতার নামগুলো মনে করতে করতে ছাত্রটির নাম মনে করতে পারেন এবং তাকে (সান্নিধ্য) চিনতে পারেন (সাদৃশ্য)।

(খ) অন্য ছাত্রের কেনা নতুন সাইকেলটি দেখে (সাদৃশ্য) একটি ছাত্র তার নিজের হারানো সাইকেলে চড়ে ভ্রমণের (সান্নিধ্য) মধুর স্মৃতি উপভোগ করে।

(গ) ব্যক্তি বিশেষের নাম (সাদৃশ্য) ছাত্রের মনে নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনার (সান্নিধ্য) পুনরুদ্রেক ঘটায়।

সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য অনুষঙ্গের আপেক্ষিক শিক্ষাগত মূল্য (The relative educational Values of Association by contiguity and association by similarity): একটি ছোট ছেলে দুধের সঙ্গে জলের অনুষঙ্গ স্থাপন করতে পারে কারণ সে দেখেছে যে তার মা তাকে খেতে দেওয়ার আগে দুধে জল মিশিয়ে দেন। এই অনুষঙ্গ সান্নিধ্যসূচক। জল ও দুধ সহজেই তার কাছে তখন এক মনে হতে পারে। পরবর্তী কালে সে যখন বাড়ীতে বা বিদ্যালয়ে দেখে যে জল বা দুধ যখন ঢালা হয় তখন তার তল থাকে, সেটা গড়িয়ে যায় কিংবা যে পাত্রে রাখা যায় তার আকার ধারণ করে তখনই সে দুটি বস্তুর পারস্পরিক সাদৃশ্য আবিষ্কার করে। বিশেষ যুক্তি এর পেছনে কাজ করে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সে দেখতে পারে যে অন্য পদার্থের এ সকল ধর্ম আছে কিনা। সান্নিধ্য-সূচক অনুষঙ্গ তাই অনেকটা বিধি বহির্ভূত অনুষঙ্গ। এর প্রকৃত অর্থ বিশেষ নেই। পক্ষান্তরে সাদৃশ্যসূচক অনুষঙ্গস্থাপনে মনের উন্নত শক্তিগুলোর ক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। এটা মনকে নানারকম এষণায় নিযুক্ত করে। তাই সাদৃশ্য-সূচক অনুষঙ্গে উন্নততর বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বিজ্ঞানশিক্ষা ভাষাশিক্ষা অপেক্ষা উন্নত শক্তির জন্ম দেয়; কারণ ভাষাদ্বারা আমরা সান্নিধ্য অনুসন্ধান করি; অপর পক্ষে বিজ্ঞান দ্বারা আমরা সাদৃশ্য খুঁজে ফিরি।

৬। ধারণার শর্তাবলী (Conditions of Apprehension) :

ধারণা এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে মন নতুন জিনিস গ্রহণ করে। বিচ্ছিন্ন কোন ভাব আমাদের মনে স্থায়িত্ব অর্জন করে না। একে অপর কোন না কোন ভাব বা বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ভাবের অনুষঙ্গ (Association of Ideas) ধারণার এক অপরিহার্য শর্ত।[1] কোন এক বিখ্যাত বাগ্মীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনার মতে সুন্দর বাগ্মিতার শর্ত কি? উত্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, প্রথমতঃ, ক্রিয়া (Action)। দ্বিতীয়তঃ, ক্রিয়া, তৃতীয়তঃ, ক্রিয়া। অনুরূপভাবে জোরের সঙ্গে বলা যায় যে, শিক্ষণের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ শর্তই হল—অনুষঙ্গ। সুতরাং এটি যত দৃঢ়বদ্ধ হয় ততই মঙ্গল।

৭। অনুষঙ্গের শক্তির বিভিন্ন শর্তাদি (Conditions determining strength of Association) :

(১) অনুষঙ্গের প্রকারভেদ (The kind of Association) : আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, সাদৃশ্য অনুষঙ্গ সান্নিধ্য অনুষঙ্গের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী বা উন্নততর। সুতরাং শিক্ষককে প্রথমেই বিভিন্ন বস্তুর বা তথ্যের পাঠদান কালে স্মরণে রাখতে হবে যে সাদৃশ্যের নিয়মাবলী কতখানি তিনি পালন করতে পারবেন। অর্থাৎ তাঁর ছাত্ররা ইতিমধ্যে নতুন পাঠ্যবস্তুর বা তথ্যের অনুরূপ কোন তথ্যের সঙ্গে পরিচিত আছে কিনা? তাঁকে তাই "জানা থেকে অজানা"র (From known to unknown) দিকে পা বাড়াতে হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সাদৃশ্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন সাদৃশ্যনীতি প্রয়োগ করা যাবে না তখনই সন্নিধির প্রশ্ন তুলে ধরা যেতে পারে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক :

জানা থেকে অজানা বস্তুতে যাওয়া

একজন শিক্ষকমহাশয় পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি বোঝানোর সময় ব্ল্যাকবোর্ডে লিখলেন যে পৃথিবীর ব্যাস—৮০০০ হাজার মাইল।

" পরিধি—২৫,০০০ হাজার মাইল।

এভাবে তিনি দুটোর মধ্যে সান্নিধ্য স্থাপন করে দেখলেন যে, পরিধি ব্যাসের তিন-গুণের কিছু বেশি।

অপর একজন শিক্ষকমহাশয় গোল চাকার মতো একটা জিনিস নিলেন। তারপর ছাত্রের হাতে একটা সুতো দিয়ে তার ব্যাস ও পরিধি মাপতে বললেন। দেখা

1. Association of Ideas is an indispensable condition of Apprehension.
—Dexter and Garlick : Psychology in the school room

গেল ছাত্রটি নিজে হাতে মেপে আবিষ্কার করল যে কোন গোলাকার জিনিসের পরিধি তার ব্যাসের তিনগুণের কিছু বেশি। সে একটি বল নিয়ে এটি পরীক্ষা করতে পারে। বলের সঙ্গে পৃথিবীর সাদৃশ্য বুঝে সে নিজেই ঠিক করতে পারে যে, যদি পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল হয় তাহলে যেহেতু পৃথিবী গোলাকার তার পরিধিও ব্যাসের তিনগুণের কিছু বেশি হবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাটি প্রথমটির চেয়ে ভাল। কারণ (ক) ছাত্ররা নিজেরা পর্যবেক্ষণ করে সক্রিয় হয়ে উঠ্ছে, (খ) সাদৃশ্যসূত্র প্রয়োগ করে নিশ্চিত ফললাভ করতে পারছে।

সক্রিয়তা ও আবিষ্কার

(২) **অনুষঙ্গের পৌনঃপুনিকতা** (The frequency of the Association) : প্রাচীন যুগের শিক্ষকরা পুনরাবৃত্তির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মনকে সে যুগে এমন এক বিরাট ভাঁড়ার ঘর মনে করা হত যেখানে সবকিছু ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এ মতবাদের উপর বিশ্বাসের পরিবর্তনের ফলে আমরা আর এক প্রান্তে সরে গেছি। আমরা আমাদের শিক্ষণকে স্বচ্ছ ও জীবন্ত করতে চেয়েছি, অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছি কিন্তু ভুলে গেছি যে পুরোনো জিনিস মনে দৃঢ়বদ্ধভাবে না গেঁথে দিলে নতুন জিনিস সেখানে দেওয়া যায় না। তাই পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এই নতুন-পুরাতনের সংযোগ স্থাপন করতে হয়।

পুনরাবৃত্তি

(৩) **অনুষঙ্গের শক্তি** (The force of Association) : অনুষঙ্গের শক্তি যত বেশি হয় ততই তা মনে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারে। চাঞ্চল্যকর উদাহরণ এবং সাগ্রহ প্রভাব অনুষঙ্গকে প্রভূত শক্তি দেয়। বস্তু, মনকে কথার চেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। *Pestalozzi*-র অনুকরণে আমরা বলতে পারি 'কথার চেয়ে বস্তু দিয়ে শেখাও'।[1]

বস্তুভিত্তিক শিক্ষা

একারণ শব্দ অপেক্ষা দৃশ্য, স্পর্শ অপেক্ষা শব্দ অনেক বেশি কার্যকর। তাই বানান শেখাতে গিয়ে শিক্ষক মহাশয় কানের চেয়ে চোখের মূল্য বেশি দেবেন। ইন্দ্রিয়ানুশীলনের (Sense Training) তাই এত প্রয়োজন।

(৪) **শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা** (The Mental Condition of the learner) : শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী দুই-ই হতে পারে। যদি তা প্রতিকূল বা ক্ষণস্থায়ী হয় তাহলে সাময়িকভাবে পরিবর্তন আনার চেষ্টা

1. 'Teach things rather than words.'—Pestalozzi

করতে হবে, আর যদি দীর্ঘস্থায়ী বা অনুকূল হয় তাহলে শিক্ষণীয় বস্তুর পুনরাবৃত্তি করে তা অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। তাই অতিরিক্ত অনুশীলনের (Extra drilling) প্রয়োজন।

অতিরিক্ত অনুশীলন

৮। স্মৃতির তারতম্যের কারণসমূহ (Causes of differences in memory) :

স্মৃতির তারতম্য অংশতঃ জন্মগত (native), অংশতঃ শিক্ষালব্ধ (due to education)। শিশুর মধ্যে জন্মগতভাবে বা শিক্ষাপ্রভাবে এটা দেখা দিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার কারণে শিশুর স্মৃতি দুর্বল হয় এবং দোষটা চাপানো হয় তার প্রকৃতির উপর।

৯। স্মৃতিচর্চার উদ্দেশ্য (Aims in the culture of Memory) : স্মৃতি চর্চার উদ্দেশ্য দু'প্রকার। যথা—(১) যতটা সম্ভব জ্ঞান অর্জন করা (To acquire as much knowledge as possible) :

(২) অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্য স্মৃতিকে শক্তিশালী ও বর্ধিত করা (To strengthen and develop the memory so as to make it the efficient instrument for the acquisition of more knowledge) :

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানই শক্তি (knowledge is power) —এই প্রবাদবাক্যকে মূল্য দিতে গিয়ে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠেছে। তাই প্রয়োগ অপেক্ষা তত্ত্বকেই আমরা বেশি মূল্য দিয়েছি। 'কতটা জ্ঞান দিতে পারা গেল' —এর চেয়ে কিভাবে তা দেওয়া হল সেটাই বেশি অর্থবহ। অধিকতর জ্ঞানার্জনই শক্তি নয়, বরং জ্ঞানকে কতখানি বাস্তবে প্রয়োগ করা গেল সেটাই মূল্যবান। আমরা সাধারণতঃ স্মৃতিকে প্রকাশ করতে চাই, তাকে সুগঠিত করতে চাই না।

১০। স্মৃতির বিকাশ (The growth and development of memory) :

শিশুর বিদ্যালয়-জীবনে স্মৃতির বিকাশের উপর গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের উপায় নেই। তাই কিভাবে তার স্মৃতির বিকাশ হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

(ক) **শৈশবকালে** [১—৩ বছর] : আমাদের তিনবছর বয়সের আগে কি ঘটে গেছে তা মনে করতে অনেকেই পারি না বলে আমরা তিনবছরের আগে স্মৃতির অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকি। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে তিন বছরের শিশুও তার মাতৃভাষা কিছু পরিমাণে আয়ত্ত করে, এর দ্বারা স্মৃতির

অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, পরন্তু তার সচেতন প্রয়াস এসময়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রকাশ পায়। সচেতন প্রয়াসেই সে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ করতে পারে। এটা তার স্মৃতির অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। অনেকে মনে করেন যে, প্রথম তিনবছরে শিশু যা শিখতে পারে পরবর্তী তিনবছরে সে তার চেয়ে অনেক কম শেখে।

(খ) **বাল্যকাল** [৪—৯ বছর]: এসময় বালকবালিকাদের মন অনায়াসে পূর্ণ হয়। তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জনে সদা ব্যস্ত থাকে।

স্মৃতিও তার ভাঁড়ারে' অনেক কিছু সমন্বয় করতে সাহায্য করে। তাদের মন এ সময় এতই সহজে প্রভাবিত হয় যে অনেকে মনে করেন যে এ সময়টা হল 'স্মৃতির নমনীয়তার কাল' (Plastic period of memory)। এসময় মন সক্রিয় অপেক্ষা নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা রূপ কাজ করে। মনে যে ভাবে বিভিন্ন ঘটনার ছাপ পড়ে ঠিক সেভাবে থাকে। এগুলোর কোন বিন্যাস বা শ্রেণীবিভাগ হয় না। এ সময়ও সান্নিধ্য অনুষঙ্গের কাজ বেশি। শিক্ষক মহাশয় এ কালের শেষের বছরগুলোয় ধীরে ধীরে এবং সংযতভাবে যুক্তির ক্ষমতা শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন।

(ক) **কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকাল** [১০—১৬ বছর]: এ সময় যুক্তি-ক্ষমতা দৃঢ় হয়। মৌখিক স্মৃতির ঘটনাবলীকে তারা অপছন্দ করে। স্মৃতি আর নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা না থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে সংযোগ অনুসন্ধান করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সাদৃশ্য সূত্র সান্নিধ্য সূত্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকে, যৌক্তিক স্মৃতির (logical memory) ভিত্তিভূমি রচিত হতে থাকে।

দশম অধ্যায়

কল্পনা

(Imagination)

১। [1]কল্পনার স্বরূপ (Nature of Imagination) :

অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপকে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়ে যখন নতুন কোন মানস চিত্র মনের সামনে তুলে ধরা হয় তখন তাকে বলা হয় কল্পনা। বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার পর তার একটা প্রতিচ্ছায়া আমাদের মনে থেকে যায়, তাকে বলা হয় প্রতিরূপ (image)। এই প্রতিরূপগুলোকে সংযুক্ত বা বিযুক্ত করে যে মানসিক চিত্র মনের সামনে তুলে ধরা হয় তাকে কল্পনা বলে। আমরা পক্ষীরাজ ঘোড়া বা সোনার পাহাড়ের কথা কল্পনা করি। প্রথম ক্ষেত্রে পাখি এবং ঘোড়া উভয়ই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। পরে পাখির ডানার প্রতিরূপকে ঘোড়ার প্রতিরূপের সঙ্গে যুক্ত করে কল্পনাতে পাই পক্ষীরাজ ঘোড়ার মানস চিত্র। অনুরূপভাবে সোনা এবং পাহাড় উভয়ের প্রতিরূপের সাহায্যে পাহাড়ের একটি মানস চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরি।

অতীত অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সাজিয়ে যখন নতুন মানসিক চিত্রগঠন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় কল্পনা

কল্পনা হল গঠনমূলক বা সৃষ্টিধর্মী (constructive or creative)। যেমনটি দেখেছি ঠিক তেমনটি যদি মনে পুনরুজ্জীবিত করি, তবে তা কল্পনা হবে না, হবে স্মৃতি (memory)। কল্পনার ক্ষেত্রে নতুন করে অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়। অতীত অভিজ্ঞতার কোন প্রতিরূপ বর্জন করে, কখনও বা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে, কখনও বা বাড়িয়ে, কখনও কমিয়ে কল্পনার কাজ চলতে থাকে।

1. "কল্পনা" শব্দটিকে তিনটি অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে : (১) ব্যাপক অর্থে কল্পনা হল যে কোন ধরনের প্রতিরূপের (image) সহায়তায় চিন্তা করা। এই অর্থে কল্পনা স্মরণ-ক্রিয়াকেও বোঝায়, বিভিন্ন বিষয় স্মরণ করার জন্য আমরা প্রতিরূপের সহায়তা গ্রহণ করি। (২) সঙ্কীর্ণ অর্থে 'কল্পনা' হল অতীত অভিজ্ঞতার উপাদান গ্রহণ করে নতুনভাবে সাজিয়ে নতুন চিত্র সৃষ্টি করা, যার অভিজ্ঞতা আমরা আগে লাভ করি নি। যেমন, সোনার পাহাড়। (৩) তৃতীয় অর্থে কল্পনা হল একেবারে অবাস্তব কল্পনা। এক্ষেত্রে এমন মানসিক চিত্রের কথা কল্পনা করা হচ্ছে, যার উপাদান আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে গ্রহণ করা হয়নি, যা নিছক কল্পনা। এর উদাহরণ আমরা কবি-কল্পনায় দেখতে পাই। যেমন, হিং টিং ছট্।

সাধারণতঃ কল্পনাকে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করা হয়।

কল্পনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of imagination)**ঃ** কল্পনার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া থেকে তাকে পৃথক করা যায়। কল্পনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতাও একেবারে অবাধ নয়, তারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। কল্পনা হল অতীত অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিরূপ গ্রহণ করে তাকে নতুনভাবে সাজানো। সুতরাং প্রতিরূপের জন্য কল্পনাকে অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়। কল্পনার ক্ষেত্রে আমরা যেসব প্রতিরূপের ব্যবহার করে থাকি, সেগুলো আমরা সৃষ্টি করি না, সেগুলোকে গ্রহণ করি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে। যা আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি নি, যার অভিজ্ঞতা আমরা পূর্বে লাভ করি নি, অর্থাৎ যা পূর্বে প্রত্যক্ষ করা হয়নি, তা কল্পনা করা সম্ভব নয়।

'কল্পনা' শব্দটিকে, দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত

এই কারণে কল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অতীতে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এমন বস্তুর প্রতিরূপগুলোর সংযোজন, বিয়োজন, বৃদ্ধি, হ্রাস ও নানা-প্রকার বিন্যাসের মাধ্যমেই কল্পনা সম্ভব হয়। শিংওয়ালা খরগোশের কল্পনায় শিঙের প্রতিরূপ ও খরগোশের প্রতিরূপ সংযোজিত ও বিয়োজিত করা হয়। কুড়ি ফুট দীর্ঘ মানুষের কল্পনায় সাধারণ মানুষের প্রতিরূপের বৃদ্ধি এবং লিলিপুটের কল্পনায় ঐ প্রতিরূপের হ্রাস লক্ষ্য করা যায়। যখন রামের গায়ে শ্যামবাবুর পোশাক ও যদুবাবুর ছাতার কল্পনা করি তখন বিভিন্ন প্রতিরূপগুলোর বিচিত্র বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। কল্পনায় এমন বস্তুর প্রতিরূপ ব্যবহার করা যায় না যে বস্তুর প্রত্যক্ষ পূর্বে ঘটে নি। কাজেই কল্পনা যত বলবতী হোক না কেন তাকে অতীত প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করতেই হয়। আমরা এমন কোন ফুলের কল্পনা করতে পারি না যা একই সময়ে রক্তবর্ণ ও রক্তবর্ণ নয়। কল্পনার পক্ষে তর্কবিদ্যার চিন্তার মূলসূত্রগুলো অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

কল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষের সম্পর্ক

কল্পনা অনেক সময় উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের বিভিন্ন সংকল্পকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য আমাদের পূর্ব থেকেই অনেক কিছুই কল্পনা করে নিতে হয়। মনোবিদ্ মারফি (*Murphy*) বলেন, "আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমরা কল্পনা করি।"[1] একটি পাঠাগারের জন্য নতুন একখানা বাড়ির প্রয়োজন। আমরা পূর্ব থেকেই বাড়িটির একটা নকশা বা কল্পিত রূপ আমাদের মনের সামনে তুলে ধরি। অবশ্য এক্ষেত্রেও পূর্ব অভিজ্ঞতাই উপাদান যুগিয়ে দেয়।

কল্পনা উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়

1. 'We imagine in order to satisfy needs.'
—Murphy : A Briefer General Psychology, Page 396.

কতকগুলো বস্তু এবং তার আনুষঙ্গিক গুণ এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত যে একটিকে কল্পনা করতে হলে আর একটিকেও কল্পনা করতে হয়, একটি থেকে আর একটিকে বিচ্ছিন্ন করে কল্পনা করা যায় না। যেমন, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি, দুগ্ধ ও তার শুভ্রতা।

২। **কল্পনার শ্রেণীবিভাগ** (**Classification of Imagination**) :

কল্পনা নানা ধরনের হতে পারে। ইচ্ছা, মৌলিকতা, উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাস—এই চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কল্পনার নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যথা,

(ক) **নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় কল্পনা** (**Passive or Active Imagination**) : ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছাড়া যখন কল্পনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয় তখন তাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় কল্পনা। নিষ্ক্রিয় কল্পনার ক্ষেত্রে প্রতি[illegible]গুলো আপনা আপনিই মনে এসে উপস্থিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন একটি ছবির সৃষ্টি করে। দিবা-স্বপ্ন, অলীক-কল্পনা দৈনন্দিন জীবনে খুবই স্বাভাবিক। ঘরে বসে অলস মুহূর্তে, শূন্যে কত সৌধই না আমাদের মনে ভীড় করে আসে। প্রতিভাবান লোকের কল্পনাশক্তি স্বতঃস্ফূর্ত, তবে সেক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় কল্পনার সঙ্গে এসে মেশে সক্রিয় কল্পনা। আমাদের শৈশব জীবনে এই নিষ্ক্রিয় কল্পনার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই।

নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় কল্পনা

সক্রিয় কল্পনার ক্ষেত্রে মন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, নতুনভাবে বিন্যস্ত করে, নতুন ছবি মনের সামনে তুলে ধরে। যেমন—অতীতে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে এমন কতকগুলো বাড়ির প্রতিরূপ স্মরণ করে নতুন একটি বাড়ির পরিকল্পনা করা হয়।

(খ) **সৃজনশীল ও গ্রহণক্ষম কল্পনা** (**Creative and Receptive Imagination**) : কল্পনার মধ্যে মৌলিকতা আছে কি নেই, তারই ভিত্তিতে কল্পনার এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে।

যখন কোন ব্যক্তি নিজের মন থেকে উপাদান গ্রহণ করে নতুন কোন মানসিক চিত্র কল্পনা করেন তখন তার কল্পনা হল সৃজনশীল। সৃজনশীল কল্পনা হল মৌলিক কল্পনা। মৌলিক কল্পনার ক্ষেত্রে যে প্রতিরূপগুলো সৃষ্টি করা হয় সেগুলো কারও কাছ থেকে পাওয়া নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব। সাধারণতঃ কবি, লেখক, ঔপন্যাসিকদের কল্পনা হল মৌলিক কল্পনা। মেঘদূত কাব্যে কবি কালিদাসের যে কল্পনা তাহল সৃজনশীল কল্পনা (Creative Imagination), অপরের কল্পনার অনুকরণ নয়।

যখন কোন ব্যক্তি নিজের মন থেকে উপাদান আহরণ না করে অপর ব্যক্তির কাল্পনিক চিত্রগুলোকে যথাযথভাবে মনের মধ্যে প্রতিফলিত করে, তখন সে কল্পনাকে বলা হয় **গ্রহণক্ষম কল্পনা** (Receptive Imagination)। গ্রহণক্ষম কল্পনার কোন মৌলিকতা নেই এবং মন স্বাধীন ও মৌলিকভাবে কোন নতুন কাল্পনিক চিত্র সৃষ্টি করে না। এক্ষেত্রে কল্পনার বিষয়বস্তু বাইরের থেকে মনে এসে হাজির হয়। কল্পনার প্রতিরূপগুলো অপরের কাছ থেকে পাওয়া, নিজস্ব নয়। কালিদাসের 'মেঘদূত' পাঠ করার সময় যখন আমরা কবির কল্পনাকে অনুসরণ করে, কবির কল্পিত ছবিগুলোকে মনের মধ্যে তুলে ধরি তখন আমাদের কল্পনা হল গ্রহণক্ষম।

(গ) বুদ্ধিবিষয়ক, সৌন্দর্যবিষয়ক এবং ব্যবহারিক কল্পনা (**Intellectual, Aesthetic and Practical Imagination**) : উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কল্পনার এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যথা—

(i) **বুদ্ধিবিষয়ক কল্পনা** (Intellectual Imagination) : বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করার জন্য যখন কল্পনা বুদ্ধিকে সহায়তা করে এবং জ্ঞানের অগ্রগতি ও সত্যের সন্ধানে সাহায্য করে তখন তাকে বলা হয় বুদ্ধি-বিষয়ক কল্পনা। বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে যেসব প্রকল্প (Hypothesis) বা আনুমানিক ধারণা বৈজ্ঞানিকেরা করে থাকেন সেগুলো এই জাতীয় কল্পনার উদাহরণ। নিউটন (*Newton*) আপেল মাটিতে পড়া দেখে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন। জগতের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে কল্পনা, দার্শনিকদের বুদ্ধিবিষয়ক কল্পনার উদাহরণ।

(ii) **সৌন্দর্যবিষয়ক কল্পনা** (Aesthetic Imagination) : সৌন্দর্য সৃষ্টি ও সৌন্দর্যের সমাদর করার জন্য আমরা যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করি তাকে সৌন্দর্য-বিষয়ক কল্পনা বলে। এ কল্পনা অবস্থা বিশেষে সৃজনশীল বা গ্রহণক্ষম হতে পারে। ভাস্কর যখন কোন নতুন মূর্তি গঠনের পরিকল্পনা করে, চিত্রশিল্পী যখন কোন নতুন চিত্র অংকন করার কল্পনা করে, তখন তা হল এই সৌন্দর্যবিষয়ক কল্পনার দৃষ্টান্ত এবং সে কল্পনা সৃজনশীল। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রকাব্যের যখন রসাস্বাদ করি, তখন আমাদের সৌন্দর্যবিষয়ক কল্পনা হয় গ্রহণক্ষম।

(iii) **ব্যবহারিক কল্পনা** (Practical Imagination) : যে কল্পনা আমাদের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তাকে বলা হয় ব্যবহারিক কল্পনা। যখন কোন ইঞ্জিনীয়ার কোন সেতু বা বাড়ি নির্মাণ করাব আগে পরিকল্পনা করে বা আমরা যখন কোন বনভোজনের পরিকল্পনা করি, তখন এ কল্পনা হল ব্যবহারিক কল্পনা।

(ঘ) বিশ্বাসযুক্ত ও বিশ্বাসবিযুক্ত কল্পনা (**Imagination with Belief and Imagination without Belief**) : যদি কল্পিত বস্তুর অস্তিত্বে আমাদের

বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই কল্পনাকে বলা হয় বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা। এ জাতীয় কল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস থাকে যে, আমাদের কল্পনা অবাস্তব নয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে কল্পনা, অণু-পরমাণুর অস্তিত্ববিষয়ক কল্পনা হল বিশ্বাসযুক্ত কল্পনার উদাহরণ। ভূগোলে যখন বিভিন্ন দেশের খবর পাঠ করে সেগুলো আমরা কল্পনা করি, তখন সেগুলোর যাথার্থে বিশ্বাস করি।

বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা

বিশ্বাসবিযুক্ত কল্পনা হল সেই কল্পনা, যেখানে কল্পিত বস্তুর অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস নেই ; এ একেবারে অলীক কল্পনা। রূপকথার কাহিনী পড়ার সময় যে-সব বিষয়বস্তু আমরা মনে মনে কল্পনা করি, তার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাসী নই।

বিশ্বাসবিযুক্ত কল্পনা

৩। কল্পনা ও স্মৃতির সম্বন্ধ (Relation of Imagination to Memory) :

অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক করাকে স্মৃতি (Memory) বলা হয়। কোন একটি কবিতা পাঠ করে তার যথাযথ পুনরাবৃত্তি করা স্মৃতির উদাহরণ। অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরাবৃত্তি না করে, যখন তার থেকে প্রতিরূপ গ্রহণ করে, নতুনভাবে সাজিয়ে নতুন কোন মানস চিত্র গঠন করা হয়, তখন তাকে বলা হয় কল্পনা। যেমন—পক্ষীরাজ ঘোড়া।

স্মৃতি এবং কল্পনা

সময় সময় স্মৃতিকে পুনরুদ্রেকমূলক কল্পনা (Reproductive Imagination) বলা হয়। স্মৃতি ও কল্পনা ; তবে স্মৃতি হল বিষয়বস্তুকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে ঠিক সেভাবে কল্পনা করা। আমার বাড়ির ঘরগুলোকে ঠিক যেমন ইতিপূর্বে দেখেছি সেভাবে যদি স্মরণ করি, তাহলে তা হবে স্মৃতি। কিন্তু মনে মনে ঘরগুলোকে যদি অদল বদল করে একটু নতুন করে সাজিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা মানস চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরি, তবে তা হবে কল্পনা।

স্মৃতি হল পুনরুদ্রেক-মূলক কল্পনা

স্মৃতি এবং কল্পনা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত। তবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কোথায়, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় এবং উভয়ের পারস্পরিক সংমিশ্রণ কিভাবে হয়ে থাকে।

(i) **স্মৃতি এবং কল্পনার বৈসাদৃশ্য :** (ক) স্মৃতির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বা অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক করা হয়, কোন রকম পরিবর্তন করা হয় না, কল্পনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রূপান্তর লাভ করে। স্মৃতির ক্ষেত্রে ঘটনার পারম্পর্য

পরিবর্তিত হয় না, কল্পনার ক্ষেত্রে তাকে পরিবর্তিত করা হয়। রামের চেহারা যেমনটি দেখেছি ঠিক সেভাবে তাকে মনে করা হল স্মৃতি। সোনার পাহাড়ের কল্পনা যখন করছি তখন সোনা আর পাহাড়কে পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করলেও যুক্তভাবে প্রত্যক্ষ করি নি; কল্পনায় দুটিকে মিশিয়ে একটা নতুন চিত্র মনের সামনে তুলে ধরেছি।

অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক হল স্মৃতি, অভিজ্ঞতার রূপান্তর হল কল্পনা

(খ) স্মৃতির ক্ষেত্রে যা মনে উদিত হয় তাকে চিনে নিতে হয়, একেই বলে প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)। কল্পনার ক্ষেত্রে এই চিনে নেওয়ার কোন ব্যাপার নেই।

স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রত্যভিজ্ঞা আছে, কল্পনার ক্ষেত্রে তা নেই

(গ) স্মৃতির সঙ্গে অতীতের সম্পর্ক রয়েছে। সুনির্দিষ্ট হোক বা না হোক স্মৃতিতে অতীতের নির্দেশ থাকা চাই। কল্পনা হল স্বাধীন, কালের সঙ্গে এর সম্পর্ক সকল সময় থাকে না। রামের কথা মনে পড়ল। রামকে যে পূর্বে দেখেছি এ বোধ না থাকলে স্মৃতি অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। যখন পরীর কল্পনা করছি তখন কোন্ সময় পরী দেখেছিলুম—এটা ভাববার কোন প্রয়োজন নেই।

স্মৃতির সঙ্গে অতীতের সম্পর্ক আছে, কল্পনার নেই

(ঘ) আমরা যখন কোন কিছু স্মরণ করি তখন তার একটি প্রতিরূপ মনে জেগে ওঠে। আবার যখন কোন কিছু কল্পনা করি তখনও একটা প্রতিরূপ মনের সামনে হাজির হয়। পরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে, স্মৃতি-প্রতিরূপ (Memory-Image) পরিবর্তনশীল; কিন্তু কল্পনার প্রতিরূপ (Image of Imagination) হল স্থির।[1]

স্মৃতি-প্রতিরূপ হল পরিবর্তনশীল, কল্পনার প্রতিরূপ হল স্থির

(ii) **স্মৃতি এবং কল্পনার মধ্যে সাদৃশ্য :**

(ক) স্মৃতি এবং কল্পনা উভয়েরই কাজ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া প্রতিরূপ নিয়ে। এমন কথাও বলা যেতে পারে যে, কল্পনার উপাদান যোগায় স্মৃতি। কল্পনার ক্ষেত্রে প্রতিরূপগুলোকে নতুন করে সাজান হয় মাত্র; স্মৃতি প্রতিরূপগুলোকে মনে যুগিয়ে দেয়। যে বিষয়ের অভিজ্ঞতা নেই, তা কল্পনা করা যায় না। জন্মান্ধ ব্যক্তি রং-এর যথাযথ কল্পনা করতে পারে না। যখন পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা কল্পনা করছি তখন পাখির ডানার আর ঘোড়ার প্রতিরূপ স্মৃতিতে

স্মৃতি এবং কল্পনা—উভয়ের কাজ অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ নিয়ে

1. "Popular psychology regards the memory image as a stable copy of past perception and the image of imagination as subject to kaleidoscopic change. In fact, it is the memory-image that varies and the image of imagination that is stable".

—Titchener: A Text-book of Psychology; Page 417.

সঞ্চিত আছে। কল্পনায় উভয়কে যুক্ত করে, নতুন একটা চিত্র মনের সামনে তুলে ধরা হয়।

(খ) কল্পনা ও স্মৃতির কাজের পদ্ধতি একই রকম। প্রত্যক্ষণের সময় আমরা যেমন কোন বস্তুকে স্থান এবং কালে প্রত্যক্ষ করি, ঘটনাকে কার্যকারণ সম্পর্কের মাধ্যমে বিচার করি বা বস্তু ও তার গুণের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বস্তুর বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করি, তেমনি কল্পনা ও স্মৃতিতেও আমরা ঐ একই পদ্ধতিতে কাজ করি। কল্পনা এবং স্মৃতির ক্ষেত্রেও আমাদের অভিজ্ঞতা কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা বিষয়বস্তুকে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে মনে মনে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করি।

কল্পনা ও স্মৃতির কাজের পদ্ধতি একই রকম

(iii) স্মৃতি এবং কল্পনার সংমিশ্রণ :

অনেক সময় স্মৃতি এবং কল্পনা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। একই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে তিনজন ব্যক্তি, অথচ তার বর্ণনা দিতে গিয়ে দেখা গেল তিনজনের বর্ণনার মধ্যে মিলের অভাব। এর কারণ তারা অতীত অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে স্মরণ করতে পারছে না অর্থাৎ স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা এসে মিশে গেছে। আদালতে যখন সাক্ষী অতীত বিষয় স্মরণ করে তা বর্ণনা করতে যায় তখন দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে কল্পনা স্মৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়াতে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার গল্প বা উপন্যাস পড়তে গিয়ে দেখি যে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক স্মৃতি সেই কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে অর্থাৎ স্মৃতি কল্পনার সঙ্গে মিশে গেছে।

অনেক সময় স্মৃতি এবং কল্পনা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, স্মৃতি ও কল্পনা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ।

৪। প্রতিরূপ কাকে বলে ? (What is Image ?)

প্রতিরূপ হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মানস-প্রতিচ্ছবি বা অনুলিপি। সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণের সাহায্য বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করে থাকি। সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুর সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে বস্তুর একটি রূপ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং সেই রূপটি আমাদের মনোজগতে সংরক্ষিত হয়। সেই রূপেরই একটি প্রতিচ্ছবি বা অনুলিপি আমরা প্রয়োজন হলে কল্পনায় আমাদের মনের সামনে তুলে ধরতে পারি ; একেই বলা হয় প্রতিরূপ (Image)। একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে

বুঝে নেওয়া যাক: আমি আগ্রার তাজমহল দেখতে গিয়েছিলাম। আগ্রা থেকে ফিরে আসার পরদিন পূর্বে দেখা তাজমহলের সেই রূপটিকে কল্পনায় আমার মনের সামনে ধরতে পারি। আমার মানসচোখের সামনে তাজমহলের যে প্রতিচ্ছবি বা অনুলিপি ভেসে ওঠে তাই তাজমহলের প্রতিরূপ। অবশ্য এ ছবি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ, তাহলেও এ ছবি আমার দেখা তাজমহলেরই প্রতিচ্ছবি, তারই প্রতিরূপ।

প্রতিরূপ হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মানস প্রতিচ্ছবি বা অনুলিপি

৫। **বস্তুর প্রত্যক্ষরূপের প্রতিরূপে রূপান্তর (Transition from Percept to Image):**

যখন বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে থেকে অপসারিত হয়, তখন সেই বস্তুর প্রত্যক্ষণের ক্রিয়াটিও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে বস্তুর প্রত্যক্ষরূপগুলো আমাদের চেতনালোক থেকে চলে যাবার পরেও তাদের মাঝে মাঝে চেতনালোকে আবির্ভূত হওয়ার প্রবণতা থাকে এবং মাঝে মাঝে চেতনার কেন্দ্রলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু চেতনালোকে আবির্ভূত হবার এই প্রবণতা যখন প্রত্যক্ষরূপগুলোর আর থাকে না, তখন সেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর চেতনালোকে আবির্ভূত হতে পারে না। তারপর তাদের স্মৃতির সাহায্যে চেতনলোকে টেনে নিয়ে আসতে হয় এবং এইভাবে যখন চেতনায় তাদের পুনরুদ্রেক ঘটে, তখন তাদের বলা হয় স্মৃতি-প্রতিরূপ (Memory-Image)।

স্মৃতি-প্রতিরূপ

প্রত্যক্ষরূপের (Percept) তিরোভাব এবং স্মৃতি-প্রতিরূপের (Memory-Image) আবির্ভাবের মধ্যে কতকগুলো স্তর আছে। যেমন, উত্তর-প্রতিরূপ (Afterimage) বা অনুসংবেদন, পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ (Recurrent), প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ (Primary memory Image) ইত্যাদি।

৬। **প্রতিরূপের প্রকারভেদ (Types of Imagery):**

(ক) **ইন্দ্রিয়গত প্রতিরূপ** (Sensual Image): আমাদের ইন্দ্রিয় সংবেদন পাঁচ প্রকারের। এই পাঁচ প্রকারের ইন্দ্রিয় সংবেদন অনুযায়ী ইন্দ্রিয়গত প্রতিরূপও পাঁচ রকমের হতে পারে। আমি চোখ দিয়ে একটি সুন্দর ছবি দেখলাম, তারপর কল্পনায় সেই ছবিরই একটি প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে তুলে ধরলাম। যে গানের সুর এর আগে শুনেছি, সেই শোনা সুরটাকে কল্পনায় আবার শুনলাম; এ হল শ্রবণগত প্রতিরূপ। জিভ দিয়ে যে মিষ্ট দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছি, কল্পনায় সেই মিষ্টদ্রব্য আবার

পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়: সংবেদন অনুযায়ী ইন্দ্রিয়গত প্রতিরূপও পাঁচ রকমের হয়

আস্বাদ করলাম; এ হল স্বাদগত প্রতিরূপ। অনুরূপভাবে মিষ্ট ফুলের ঘ্রাণটিকে দ্বিতীয়বার যখন কল্পনায় পাই এবং কল্পনায় গরম পাত্রের স্পর্শগত সংবেদন মনে যখন জেগে ওঠে তখন তাহল যথাক্রমে ঘ্রাণগত এবং স্পর্শগত প্রতিরূপের দৃষ্টান্ত। এ ছাড়াও আছে বেদনা এবং পেশী-সঞ্চালনগত সংবেদনের প্রতিরূপ। দুর্ঘটনার ফলে দেহে যে আঘাত লেগেছিল, তার বেদনাবোধের প্রতিরূপ এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে দেহের পেশী সঞ্চালনের সংবেদনের যে প্রতিরূপ তাও মনে উদিত হতে পারে। এই ইন্দ্রিয় প্রতিরূপগুলোর প্রত্যেকটিই সমান স্পষ্ট নয়; দর্শনগত প্রতিরূপগুলো সাধারণতঃ সবচেয়ে স্পষ্ট।

(খ) **উত্তর-প্রতিরূপ (After-image):** অনেক সময় উদ্দীপক রহিত সংবেদনকে বলা হয় উত্তর-প্রতিরূপ। অবশ্য উত্তর-প্রতিরূপকে উত্তর-সংবেদন বা অনুবেদন (After-sensation) বলাই উচিত; যেহেতু উদ্দীপকটি অপসারিত করার পরও যে প্রতিচ্ছবি আমরা পেয়ে থাকি তাহল আসলে সংবেদন, যা উদ্দীপকটি অপসারিত করার পরও আমরা পেয়ে থাকি।

এই উত্তর-প্রতিরূপ আবার দুরকমের হতে পারে—(১) **সবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ** (Positive after-image) এবং (২) **অসবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ** (Negative after-image)।

(১) **সবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ:** কোন কিছু খাবার পর ভাল করে মুখ ধুয়ে ফেললেও আস্বাদটা যেন মুখে লেগে আছে, বা সুগন্ধযুক্ত বস্তু থেকে অনেক দূরে যাবার পরও গন্ধটা যেন আমাদের নাকে লেগে রয়েছে বলে মনে হয়।

(২) **অসবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ:** এর দৃষ্টান্ত হল, সাদা দেওয়ালে আটকান এক টুকরা লাল কাগজের দিকে আধ মিনিট তাকাবার পর যদি আমরা পাশের সাদা দেওয়ালটির দিকে তাকাই তাহলে দেওয়ালটিতে নীল-সবুজের আভা দেখা যাবে।

(গ) **পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ** (Recurrent Image): যে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ বস্তু অপসারিত হবার পরও বার বার মানস চোখে ভেসে ওঠে, তাকেই বলা হয় পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ। যেমন—আমার প্রিয় বন্ধুটিকে বিদায় জানালাম এবং ট্রেনটি বন্ধুকে নিয়ে স্টেশন ছেড়ে চলে গেল, তারপরও বন্ধুটির মুখের প্রতিচ্ছবি বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কোন বস্তু অধিক সময় ধরে দেখবার পর সেই বস্তুটির প্রতিচ্ছবি বার বার ঘুরে ঘুরে চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

উত্তর-সংবেদন বা উত্তর প্রতিরূপের সঙ্গে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের পার্থক্য হল, প্রথমটি অবিরামভাবে এবং দ্বিতীয়টি সবিরামভাবে চলতে মানস চোখে ভেসে উঠতে থাকে। প্রথমটির আবির্ভাব ও তিরোভাব স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয়টির তা বোঝা যায়।

(ঘ) **প্রকৃত স্মৃতি-প্রতিরূপ** (Memory Image Proper): কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর যখন স্মরণ-ক্রিয়ার সাহায্যে তারই একটি প্রতিচ্ছবি আমার মানস চোখের সামনে তুলে ধরা হয় তখন তাকে বলা হয় স্মৃতি-প্রতিরূপ। আমার যে বন্ধুটি আজ দূর দেশে রয়েছে তার কথা চিন্তা করার সময় তার মুখের একটা প্রতিচ্ছবি আমার মনে ভেসে ওঠে; এটি প্রকৃত স্মৃতি-প্রতিরূপ।

(ঙ) **প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ** (Primary Memory Image): সময় সময় স্মৃতি-প্রতিরূপ প্রত্যক্ষিত বস্তুর মতো এত স্পষ্ট ও সজীব হয়ে ওঠে যে তাকে তখন স্মরণ করার জন্য কোন ইচ্ছাকৃত চেষ্টার দরকার হয় না, তখন তাকে বলা হয় প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ (Primary Memory Image)। পদার্থতত্ত্ববিদ্ ফেক্‌নার (*Fechner*) এই প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপের নামকরণ করেছেন।

যখন দুটি বস্তুর ওজনের পারস্পরিক তুলনা করার জন্য তাদের একের পর একটিকে হাতে তুলে নিয়ে প্রথম বস্তুটির ওজনের স্মৃতি-প্রতিরূপের সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুটির ওজনের যে প্রত্যক্ষ তার তুলনা করা হয় তখন প্রথম বস্তুটির যে স্মৃতি-প্রতিরূপ তাকে বলা হয় প্রাথমিক স্মৃতি-প্রতিরূপ। এই প্রতিরূপ আপনা থেকেই মনে আসে, ইচ্ছা করে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না।

(চ) **আইডেটিক বা ভাব-প্রতিরূপ** (Eidetic Image): জার্মান মনোবিদ্ ই. আর. যেনেশ (*E.:R. Jaensch*) এক নতুন ধরনের প্রতিরূপ আবিষ্কার করেছেন। ভাব-প্রতিরূপ হল এমন একটি দৃষ্টি সম্পর্কীয় প্রতিরূপ যাকে বাস্তব প্রত্যক্ষ থেকে পৃথক করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা এই প্রতিরূপ দেখতে পান না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বার থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিরূপ দেখতে পায়। যদি এই বয়স্ক ছেলেমেয়েদের খুব মনোযোগের সঙ্গে একটি ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে বলা হয় এবং অনেকক্ষণ তাকাবার পর একটি সাদা পর্দার উপর দৃষ্টি ফেরাতে বলা হয় তাহলে তখন দেখা যায় যে, ছেলেমেয়েরা ছবির একটি হুবহু প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে দেখতে পায়। প্রতিচ্ছবিটি যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চোখের সামনেই হাজির হয়। এই জাতীয় প্রতিরূপকেই বলা হয় আইডেটিক বা

আইডেটিক বা ভাব-প্রতিরূপ

ভাব-প্রতিরূপ (Eidetic Image)। এই ভাব-প্রতিরূপ ও অমূল প্রত্যক্ষণের (Hallucination) মধ্যে প্রভেদ এই যে, যাদের মনে এরূপ প্রতিরূপ জাগে তারা প্রতিরূপটির বাস্তব সত্তায় বিশ্বাস করে না, অর্থাৎ এগুলো যে ব্যক্তিসাপেক্ষ, বস্তুনির্ভর নয় সে বোধ থাকে। সেই কারণে এগুলোকে বলা হয় কপট অমূল-প্রত্যক্ষ (Pseudo-Hallucination)।[1]

৭। সংবেদন ও প্রতিরূপ (Sensation and Image) ঃ

উদ্দীপক অপসারিত করার পরও সংবেদন আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়ে মনে প্রতিরূপ জাগিয়ে তুলতে পারে। সে কারণে মনোবিদ্‌রা প্রতিরূপকে 'অনুবেদন' (After-Sensation) বলতে চান। তবু সংবেদন ও প্রতিরূপের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রভেদ লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(ক) সংবেদন উদ্দীপক নির্ভর। উদ্দীপক (দেহের ভিতরেই হোক বা বাহিরেই হোক) সংবেদনের উৎস। ইন্দ্রিয়গত সংবেদনের ক্ষেত্রে বাইরের জগতের উদ্দীপক ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে সংবেদনের সৃষ্টি করে ; যেমন, রঙের সংবেদন বা আলোর সংবেদন। প্রতিরূপ সকল ক্ষেত্রে উদ্দীপক নির্ভর নয়। যেমন, স্মৃতি-প্রতিরূপের ক্ষেত্রে (Memory-Image) কোন রকম উদ্দীপক ছাড়াই আমি কোন বন্ধুর মুখের একটি প্রতিরূপ আমার মনে জাগিয়ে তুলতে পারি।

(খ) উদ্দীপক অপসারিত হলে সংবেদনও অন্তর্হিত হয়। কিন্তু প্রতিরূপের ক্ষেত্রে উদ্দীপক অপসারিত হলে প্রতিরূপটি মনের মধ্যে জেগে থাকতে পারে। যেমন, গোলাপ ফুলটি থেকে দৃষ্টি অপসারিত করার ফলে দৃষ্টিগত সংবেদন বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বন্ধুর বিদায় নেবার পরও তার প্রতিরূপটি ঘুরে ঘুরে মনে জাগতে পারে।

(গ) সংবেদন সকল ক্ষেত্রে ইচ্ছানির্ভর নয়। কিন্তু প্রতিরূপ আমাদের ইচ্ছা-নির্ভর। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রায় সময়ই নানা ধরনের ইন্দ্রিয়গত সংবেদন হচ্ছে। আমরা এগুলোকে বন্ধ করতে পারি না। উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে এলে, উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সংবেদন জাগাবেই। প্রতিরূপ আমাদের ইচ্ছানির্ভর। আমি যখন ইচ্ছা করব তখনই প্রতিরূপটি আমার মনে জাগবে।

(ঘ) সংবেদনগুলোকে প্রায় সময়ই মিশ্র অবস্থায় পেয়ে থাকি। দর্শনগত সংবেদন ও শ্রবণগত সংবেদন মিশে থাকতে পারে। যেমন—উড়ন্ত পাখিটার দিকে

1. 'Eidetic image differs from hallucinations in that the eidetic person does not believe in the objective reality of the phenomena. Eidetic images therefore, have been called pseudo-hallucination.'

—Murphy : Historical Introduction to Modern Psychology ; Page 438.

যখন তাকাচ্ছি তখন কেবল যে দৃষ্টিগত সংবেদন পাচ্ছি তা নয়, পাখির ডাক কানে আসতে শ্রবণগত সংবেদনও পাচ্ছি। কিন্তু কোন প্রতিরূপ অন্যান্য প্রতিরূপের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও মনে উদিত হতে পারে।

(ঙ) সংবেদন সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। প্রতিরূপ সংবেদনের তুলনায় সাধারণতঃ অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও ক্ষণকাল স্থায়ী।

(চ) যদিও সংবেদন ও প্রতিরূপের মধ্যে পূর্বোক্ত পার্থক্য বর্তমান, তবু অনেক সময় সংবেদন ও প্রতিরূপের মধ্যে প্রভেদ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মনোবিদ্‌ টিচ্‌নার-এর মতে পেশীগত প্রতিরূপকে পেশীগত সংবেদন থেকে প্রভেদ করা খুবই কঠিন। ("kinaesthetic images are extremely difficult to distinguish from kinaesthetic sensations"—*Titchener.*)

৮। প্রত্যক্ষরূপ ও প্রতিরূপ (Percept and Image):

প্রত্যক্ষরূপ বলতে আমরা বুঝি, যে বস্তুটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি বা করেছি তার বাস্তব রূপটি। যেমন—গোলাপ ফুলের প্রত্যক্ষে আমার চোখের সামনে যে গোলাপ ফুলটি রয়েছে, সেটি হল প্রত্যক্ষরূপ (Percept)। প্রত্যক্ষ শেষ হয়ে গেলেও তার একটি প্রতিচ্ছায়া আমার মনে থেকে যায়, এটিই হল প্রতিরূপ। সুতরাং প্রত্যক্ষরূপ হল কোন কিছুর বাস্তব রূপ আর প্রতিরূপ হল তার মানস রূপ। স্মৃতি-প্রতিরূপ হল প্রত্যক্ষরূপের পুনরুজ্জীবিত রূপ (Percept revived or reproduced)।

উভয়ের পার্থক্য: (ক) প্রত্যক্ষ রূপ হল কোন কিছুর উপস্থাপন (Presentation), আর প্রতিরূপ হল কোন কিছুর পুনরুজ্জীবন (Representation)।

প্রত্যক্ষরূপ হল কোন কিছুর উপস্থাপন আর স্মৃতি-প্রতিরূপ হল কোন কিছুরপুনরুজ্জীবন

প্রত্যক্ষ-রূপের ক্ষেত্রে বস্তু সরাসরি আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়, আর প্রতিরূপের ক্ষেত্রে বস্তুটি অনুপস্থিত থাকে, তার একটি মানসিক চিত্র স্মৃতিতে পুনরুজ্জীবিত হয়। অবশ্য প্রত্যক্ষও উপস্থাপনমূলক ও পুনরুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া (Presentative and Representative Process)। কিন্তু প্রত্যক্ষের পুনরুজ্জীবনমূলক উপাদানটি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে এবং সংবেদন-বহির্ভূত পৃথক প্রতিরূপের অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করে না।

(খ) প্রত্যক্ষরূপ বাইরের জগৎ ও ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। বাইরের জগৎ যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তখনই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। কিন্তু

প্রত্যক্ষরূপ ইন্দ্রিয়-নির্ভর, প্রতিরূপ নয়

প্রতিরূপের ক্ষেত্রে বাইরের জগতের উদ্দীপনা বা ইন্দ্রিয়ের সহায়তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি চোখ বুজে যে গোলাপ ফুলটি আমার সামনে উপস্থিত নেই তার একটা প্রতিরূপ মনের সামনে ধরতে পারি।

(গ) প্রত্যক্ষরূপ সজীব, স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষরূপের তুলনায় ক্ষীণ, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। চোখে যে গোপাল ফুলটি দেখি সেটি তার সবটুকু সৌন্দর্য নিয়ে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ও সজীব রূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু যখন পরে এই ফুলটিরই প্রতিরূপ মনে জাগিয়ে তুলি তখন সেটি প্রত্যক্ষরূপের তুলনায় তেমন সজীব ও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় না।[1]

প্রত্যক্ষরূপ স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ; প্রতিরূপ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট

(ঘ) প্রত্যক্ষরূপ হল সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। প্রতিরূপ হল অসম্পূর্ণ, ভগ্ন ও খণ্ডাত্মক (Fragmentary)। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তুটির সামগ্রিক রূপ আমরা লাভ করি ; বস্তুটিকে তার নির্দিষ্ট পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করি এবং একাধিক সংবেদন পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়াতে বস্তুটির একটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। কিন্তু প্রতিরূপের ক্ষেত্রে যে ছবি আমাদের মনে উদিত হয় তা অসম্পূর্ণ, ভগ্ন ও খণ্ডাত্মক। যখন আমি ঘরে বসে তাজমহলের একটি প্রতিরূপ আমার মনে জাগিয়ে তুলি, তখন যে পরিবেশে তাজমহলকে দেখেছিলাম, তাজমহল দেখার সময় অন্যান্য যেসব সংবেদন সেই দর্শনগত সংবেদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার দেখাকে আরও বেশী মনোরম করে তুলেছিল, প্রতিরূপে সেসব কিছুই খুঁজে পাই না।

প্রত্যক্ষরূপ সম্পূর্ণও পূর্ণাঙ্গ, প্রতিরূপ অসম্পূর্ণ, ভগ্ন ও খণ্ডাত্মক

(ঙ) প্রত্যক্ষরূপের মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে, যা প্রতিরূপের নেই। কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার সময় সেটি যে তীব্রতা (intensity) বা শক্তি নিয়ে মনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রতিরূপের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। প্রতিরূপ হল চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল, প্রত্যক্ষরূপ অপেক্ষাকৃত স্থির এবং অচঞ্চল। প্রত্যক্ষের ধারাবাহিকতা প্রতিরূপে নেই। যখন চোখের সামনে ফুলটিকে দেখছি তখন আমার প্রত্যক্ষণ কার্য অবিরতভাবে চলছে। প্রত্যক্ষীভূত বস্তুটিও স্থিরভাবে চোখের সামনে আছে, তার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু আমার বন্ধুর মুখের যে প্রতিরূপটি মনে আমি তুলে ধরেছি, সেটি ঘুরে ঘুরে মনে আসছে ; সেটি চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল ; কখনও স্থির থাকছে, কখনও মন থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যক্ষরূপের তুলনায় প্রতিরূপ চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল

1. হিউম (Hume)-এর মতে প্রত্যক্ষরূপ প্রতিরূপের তুলনায় বেশী স্পষ্ট। হিউমের মতে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষরূপের একটি ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র, একই মানসিক প্রক্রিয়ার স্পষ্ট ও অস্পষ্ট রূপ। কিন্তু মনোবিদ্ ষ্টাউট (Stout)-এর মতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয় জাতিগত বা প্রকারগত। প্রতিরূপ একটি স্বতন্ত্র মানসিক প্রক্রিয়া।

(চ) প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের তুলনায় মানসিক সক্রিয়তার বেশী প্রয়োজন হয়। যদিও প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মন সক্রিয় তবু তাকে মনে স্থির-ভাবে ধরে রাখার জন্য ঐচ্ছিক মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। একটি প্রতিরূপকে মনে ধরে রাখতে হলে যতখানি মনোযোগী ও সক্রিয় হতে হয়, প্রত্যক্ষের তুলনায় তা অধিক।

প্রতিরূপের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষের তুলনায় সক্রিয়তার বেশী প্রয়োজন

(ছ) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পেশীগত সংবেদনের প্রয়োজন হয়, প্রতিরূপের ক্ষেত্রে তা হয় না। আমি যখন কোন কিছু দেখতে চাই বা স্পর্শ করতে চাই, তখন আমাকে প্রয়োজনমত চোখটা ঘোরাতে হয় বা আঙুল দিয়ে বস্তুটিকে স্পর্শ করতে হয়, তার জন্য পেশী সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোন বস্তুর প্রতিরূপ যখন মনে জাগিয়ে তুলি তখন পেশী সঞ্চালন করার কোন প্রশ্ন জাগে না।

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পেশীগত সংবেদনের প্রয়োজন হয়, প্রতিরূপের ক্ষেত্রে হয় না

(জ) গতি বা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু প্রতিরূপের ক্ষেত্রে এই প্রকারের পরিবর্তন ঘটে না। আমরা ঘর ছেড়ে যেই পথে বেরিয়ে পড়লুম ঘরের বস্তু আর চোখের সামনে থাকল না। কিন্তু ঘরের প্রতিরূপটি আমার মনে স্থির ও অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

নড়াচাড়া করলে প্রত্যক্ষরূপের পরিবর্তন ঘটে, প্রতিরূপের ক্ষেত্রে ঘটে না

(ঝ) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেই, কিন্তু প্রতিরূপ গঠন করার ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। বাইরের জগৎ যা আমার সামনে উপস্থাপিত করছে আমার ইন্দ্রিয় তা গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু আমি স্বাধীনভাবে যে কোন বস্তুর প্রতিরূপ আমার মনের সামনে তুলে ধরতে পারি।

প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেই, প্রতিরূপ গঠন করার ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে

উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ : প্রত্যক্ষরূপ ও প্রতিরূপের মধ্যে উপর্যুক্ত পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের মানসরূপ। যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় নি, তার প্রতিরূপ হয় না। সুতরাং প্রতিরূপ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। আবার প্রত্যক্ষের (perception) জন্যও প্রতিরূপের প্রয়োজন হয়। প্রত্যক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় পৃথকীকরণ (differentiation), সদৃশীকরণ (assimilation) প্রভৃতি প্রক্রিয়া প্রতিরূপের সাহায্যেই ঘটে। একটি কমলালেবুকে প্রত্যক্ষ করার সময় তাকে অন্য সংবেদন থেকে পৃথক ও অতীতের অনুরূপ সংবেদনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন হয়। তখন অতীত সংবেদনের প্রতিরূপ সহায়তা করে।

৯। প্রত্যক্ষরূপের উপর প্রতিরূপের প্রভাব (Influence of Image on Percept) :

যদিও প্রত্যক্ষরূপ থেকেই প্রতিরূপগুলো সাধারণতঃ উদ্ভূত, তবু প্রত্যক্ষরূপের উপর প্রতিরূপের প্রভাব বিদ্যমান। কোন পূর্ব-পরিচিত বস্তু প্রত্যক্ষ করার সময় বস্তুটির বর্তমান প্রত্যক্ষীভূত রূপটি তার প্রতিরূপটির সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন একটি নতুন রূপ লাভ করে। ধরা যাক্, পথে যেতে যেতে কোন একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। বন্ধুটিকে দেখামাত্র তার একটি প্রতিরূপ তার বাস্তব রূপটির সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে যেন আরও পরিচিত করে তোলে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষরূপের পূর্বে মনে উদিত হয়ে প্রত্যক্ষীভুত রূপকে বিকৃত করে অধ্যাসের (Illusion) সৃষ্টি করতে পারে। টিচ্‌নার বলেন, "এটি একটি সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে, কোন বিকারগ্রস্ত অবস্থায় প্রতিরূপ 'অমূল প্রত্যক্ষণে পরিণত হতে পারে, অর্থাৎ সেটা স্পষ্ট এবং তীব্র সংবেদনের সকল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পারে।"[1] কোন একটি পথ দিয়ে যেতে যেতে একবার একটি সাপ দেখেছিলাম। পুনরায় যখন সেই পথ দিয়ে যাচ্ছি তখন সাপের প্রতিরূপটি মনের মধ্যে আগে থেকে উদিত হয়ে একগাছা দড়িতেও সাপের অধ্যাসের সৃষ্টি করতে পারে। আবার, যখন কোন বন্ধুর প্রত্যাশায় পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছি তখন আগের থেকে মনে জেগে-ওঠা প্রতিরূপটি বন্ধুটিকে চিনতে সহায়তা করে বা এমন হতে পারে যে, অপর কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বন্ধু বলে ভুল করতে পারি। বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার পূর্বে এই জাতীয় কল্পনার প্রস্তুতিকে 'প্রাক্-প্রত্যক্ষণ' (Pre-perception) বলা যেতে পারে।

প্রত্যক্ষরূপের উপর প্রতিরূপের প্রভাব বিদ্যমান

প্রাক্-প্রত্যক্ষণ

১০। প্রতিরূপ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual Difference in Imagery) :

কতখানি সুস্পষ্টতার সঙ্গে প্রতিরূপকে মনে জাগিয়ে তোলা যেতে পারে, সে ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে তাঁরা মনের মধ্যে যে প্রতিরূপগুলোকে জাগিয়ে তুলতে পারেন সেগুলো মূল সংবেদনের

1. "It is also a matter of common knowledge that in certain pathological states, the image may become what is called hallucination, that is, may take in all the characters of clear and intensive sensation.'

—Titchener : A Text book of Psychology. Page 199

মতনই বাস্তব ও নিখুঁত। আবার অনেকে মনের মধ্যে প্রতিরূপ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারটাকেই পুরোপুরি অস্বীকার করতে চান। তাঁরা বলেন, অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত ঘটনাগুলোকে তাঁরা স্মরণ করতে পারেন, কিন্তু সেসব ঘটনার কোন প্রতিরূপ বা মানস প্রতিচ্ছবি তাঁরা মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন না।

আবার কোন্ ধরনের সংবেদন সুস্পষ্টভাবে পুনরুদ্রেক করা যেতে পারে, তাকে কেন্দ্র করেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, যেমন, কোন অভিনয়ের প্রতিরূপ মনে জাগিয়ে তুলতে গিয়ে কেউ বা অভিনেতাদের উজ্জ্বল পোশাকের মানস প্রতিচ্ছবিগুলো মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন, আবার কেউ বা শুধুমাত্র অভিনয়ের সংলাপ, সঙ্গীত ও বাদ্য প্রভৃতিই স্মরণ করতে পারেন। আবার কেউ বা শুধুমাত্র নাচ বা অভিনেতাদের চলাফেরার মানস প্রতিচ্ছবিগুলো মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন। মনোবিজ্ঞানে সেকারণে ব্যক্তি বিশেষকে দুটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'যাঁরা প্রতিরূপের পুনরুদ্রেকে সক্ষম' (imagery types), 'যাঁরা অতীত বিষয় স্মরণে সক্ষম' (memory types)। কেউ বা দৃষ্টি সম্পর্কীয়, কেউ বা শ্রবণ সম্পর্কীয়, আবার কেউ বা গতি সম্পর্কীয় প্রতিরূপ পুনরুদ্রেকে সক্ষম, সেই পরিপ্রেক্ষিতেও ব্যক্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

কিছুকাল পূর্বেও শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিরূপ পুনরুদ্রেকের বিষয়টিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। তখন এরূপ ধারণা করা হত যে প্রতিটি শিশুই কোন একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত স্মৃতি-প্রতিরূপগুলোকেই (memory images) সুস্পষ্টভাবে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে। কাজেই সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সে অনেক বেশী বিষয় শিক্ষা করতে পারে।

যেসব শিশু দৃষ্টি সম্পর্কীয় স্মৃতি-প্রতিরূপগুলোকে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে তাদের দৃশ্যের মাধ্যমে, যারা শ্রবণ সম্পর্কীয় স্মৃতি প্রতিরূপগুলোকে জাগিয়ে তুলতে পারে তাদের ধ্বনির মাধ্যমে এবং যারা গতি সম্পর্কীয় প্রতিরূপগুলোকে জাগিয়ে তুলতে পারে তাদের গতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়াই উচিত।

বর্তমানে এরূপ অভিমত বর্জন করা হয়েছে। পিণ্টনার (*Pintner*) এর অভিমতানুসারে শিক্ষকদের উচিত এই জাতীয় শ্রেণী বিভাগকে অস্বীকার করা, কারণ শিশুরা বিশেষভাবে কোন্ ধরনের প্রতিরূপের সাহায্য নেয়, তা নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়। প্রতিরূপ পুনরুদ্রেকের ভিত্তিতে শিশুদের শ্রেণীভুক্ত করার প্রচেষ্টা তাই পরিবর্জিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত শিশুদের সামনে উপাদান এমন কার্যকর-ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিশুর পরবর্তী জীবনে প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াগুলোকে সহজেই জাগিয়ে তোলা যায়।

১১। কল্পনার ক্ষেত্রে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Children and Adults in Imagery) :

বয়সের জন্যও প্রতিরূপ পুনরুদ্রেকের ব্যাপারে বৈষম্য দেখা দেয়। শিক্ষার দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে, কল্পনার ব্যাপারে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বস্তু প্রতিরূপ বা মূর্ত প্রতিরূপ (Concrete-image) এবং আক্ষরিক প্রতিরূপ বা শব্দ প্রতিরূপ (Verbal image) ব্যবহারের ব্যাপারে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। শিশুরা অক্ষর বা শব্দ প্রতিরূপের তুলনায় বস্তু প্রতিরূপের সহায়তা গ্রহণ করে বেশী। প্রাপ্তবয়স্কেরা বস্তু প্রতিরূপের তুলনায় শব্দ প্রতিরূপের ব্যবহার করে বেশী। শিশুদের মধ্যে বস্তু এবং বাস্তব ঘটনার মাধ্যমেই চিন্তা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাপ্ত-বয়স্কদের শব্দ ব্যবহারের দিকেই ঝোঁক বেশী। শিশুরা সংবেদনের মাধ্যমেই তাদের অধিকাংশ জ্ঞান অর্জন করে, কাজেই বস্তুর ছবিকে কেন্দ্র করেই তাদের চিন্তা। প্রাপ্তবয়স্করা গ্রন্থ এবং ভাষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান লাভ করে, কাজেই বস্তুর পরিবর্তে তারা ভাষা সংকেতের (Language symbols) ব্যবহার করে।

বস্তু প্রতিরূপের তুলনায় শব্দ প্রতিরূপে সুবিধা অনেক বেশী। প্রথমতঃ, শব্দ একাধিক বস্তুর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়াতে তার একটা ব্যাপকতার অর্থ আছে এবং কোন বস্তুর একাধিক মূর্ত প্রতিরূপ জাগিয়ে তুলতে পারে। শব্দ প্রতিরূপের মাধ্যমেই অমূর্ত চিন্তন সম্ভব এবং চিন্তার ক্ষেত্রে গতি সৃষ্টি করাও সম্ভব। শব্দ এবং প্রতীকের মাধ্যমে চিন্তা করলে অযথা সময়ের অপচয়ও নিবারিত হয়।

অনেক শিক্ষক শব্দ প্রতিরূপের মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে শিশুদের বস্তু প্রতি-রূপের বদলে শব্দ প্রতিরূপের ব্যবহারের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, শব্দ প্রতিরূপ ছাড়া ফলপ্রসূ চিন্তন সম্ভব নয়। কিন্তু এই ব্যাপারে শিক্ষকদের উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা-বিযুক্ত শব্দ-প্রতিরূপের ব্যবহার শিক্ষার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ বা কার্যকর হতে পারে না। বাস্তব অভিজ্ঞতার ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত করেই শব্দ প্রতিরূপের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত। আবার শুধুমাত্র কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে গেলেও সে শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় না।

শব্দের ব্যবহার ছাড়া ছাত্র অমূর্ত-চিন্তনে অভ্যস্ত হয় না, অমূর্ত ধারণা এবং সাধারণ নিয়ম গঠনে সক্ষম হয় না। ছাত্রের পক্ষে যেটা প্রয়োজন সেটা হল দরকার হলেই ছাত্র যেন তার অভিজ্ঞতাকে শব্দ এবং প্রতীকের মাধ্যমে আর শব্দ ও

প্রতীককে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি থেকে অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করাতেই আপত্তি।

অনেক সময় শিশু বাস্তবে যা ঘটেছে এবং যা ঘটেছে বলে তারা কল্পনা করে, এ দুটির মধ্যে গুলিয়ে ফেলে। বাস্তব ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে তারা যা ঘটেনি তার কল্পনাকে বর্ণনার মধ্যে টেনে নিয়ে এসে ঘটনার বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করে। কল্পনা প্রবণতার আতিশয্যবশতঃ অনেক সময় শিশুরা মিথ্যা কথনের আশ্রয় গ্রহণ করে যদিও কোনরূপ প্রতারণা বা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করার ইচ্ছা তাদের আদৌ থাকে না। আসল কথা শিশুরা স্মৃতি এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

নসওয়ার্দি (*Nosworthy*) এবং হুইট্‌লে (*Whitley*) মনে করেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের গঠিত প্রতিরূপ অনেক বেশী তীব্র ও সুস্পষ্ট। আবার এও সত্য যে, শিশুদের মানসিক বিকাশের কোন এক স্তরে শিশুদের পক্ষে স্মৃতি-প্রতিরূপ (memory-image) এবং কল্পনার প্রতিরূপের (images of imagination) মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার কোন কোন শিশু, প্রতিরূপ (image) এবং প্রত্যক্ষরূপের (percept) মধ্যেও প্রভেদ করতে পারে না। পূর্বোক্ত মনোবিজ্ঞানীদের শেষোক্ত অভিমতের সত্যতা স্বীকার করে নিলেও শিশুদের গঠিত প্রতিরূপ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিরূপের তুলনায় অনেক সুস্পষ্ট—এ অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এমন কথাই বলা যেতে পারে যে, শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যেহেতু খুব দুর্বল এবং প্রত্যক্ষরূপ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট, তাদের প্রতিরূপ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিরূপের মতন তেমন সুস্পষ্ট নয়। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষরূপের উপর নির্ভর করে। প্রাপ্তবয়স্কদের পর্যবেক্ষণশক্তি যেহেতু শিশুদের পর্যবেক্ষণশক্তির তুলনায় অনেক উন্নত, সেহেতু প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিরূপও শিশুদের প্রতিরূপের তুলনায় সুস্পষ্টতর। শিশুদের কল্পনার সঙ্গে আজগুবি বিশ্বাস জড়িয়ে থাকে। যার জন্য শিশু-মন এমন এক কল্পনার-জগৎ নিজে নিজে সৃষ্টি করে, যেখানে তার ইচ্ছা অতি সহজেই পরিতৃপ্তির পথ খুঁজে পায়। এই জাতীয় আজগুবি কল্পনা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে যে দেখা যায় না তা নয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে এ হল মনোবিকারের উদাহরণ। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এ হল ব্যাধিস্বরূপ, শিশুদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

১২। বিকারগ্রস্ত কল্পনা (Abnormal Imagination) :

স্বাভাবিক কল্পনা এবং বিকারগ্রস্ত কল্পনা

কল্পনাকে সাধারণতঃ আমরা দু-শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি : (ক) **স্বাভাবিক কল্পনা** (Normal Imagination) এবং (খ) **বিকারগ্রস্ত কল্পনা** (Abnormal Imagination)।

ইতিপূর্বে আমরা কল্পনার স্বাভাবিক রূপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। স্বাভাবিক কল্পনায় আমাদের মনের এই জ্ঞান থাকে যে, যে কাল্পনিক চিত্রগুলো বা প্রতিরূপগুলো আমাদের মনের দ্বারাই সৃষ্ট অর্থাৎ প্রতিরূপগুলোর বাস্তবে অস্তিত্ব নেই এবং কোন অস্তিত্বশীল বস্তুর সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের কোন কোন সংযোগে এরা সৃষ্ট হচ্ছে না। এই হল স্বাভাবিক কল্পনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অনেক সময় মনে সৃষ্ট কাল্পনিক চিত্রগুলোকে আমরা বাস্তবে অস্তিত্বশীল বলে ধারণা করি। আসলে এসব ক্ষেত্রে আমরা কল্পনাকেই প্রত্যক্ষ বলে ধারণা করি। আমরা মনে করি, আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করছি—যদিও আসলে আমরা করছি কল্পনা। বিকার-গ্রস্ত কল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে ; যথা—(ক) **অধ্যাস** বা **ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ** (Illusion), (খ) **অমূল প্রত্যক্ষ** (Hallucination), (গ) **স্বপ্ন** (Dream), (ঘ) **দিবা-স্বপ্ন** (Day-dream) এবং (ঙ) **স্বতঃক্রিয় চিন্তন** (Autistic Thinking) ইত্যাদি।

(ক) **অধ্যাস** বা **ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ** (Illusion) : বিপথগামী কল্পনার প্রভাবে কোন একটি সংবেদনের অযথার্থ ব্যাখ্যার ফলে যে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ঘটে, তাকে অধ্যাস বলে। যেমন, রজ্জুকে সর্পরূপে প্রত্যক্ষ করা।

(খ) **অমূল প্রত্যক্ষ** (Hallucination) : বিকারগ্রস্ত কল্পনার প্রভাবের জন্য বিনা উদ্দীপনায় যখন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ঘটে তখন তাকে বলা হয় অমূল প্রত্যক্ষ। অমূল প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা থাকে, কিন্তু কোন বস্তুগত ভিত্তি থাকে না। এই প্রত্যক্ষ বস্তুনিষ্ঠ নয়, ব্যক্তিনিষ্ঠ। যেখানে কোন কিছুর উপস্থিতি নেই, সেখানে কোন কিছু প্রত্যক্ষ করাই হল এর বৈশিষ্ট্য। ঘরে বসে বই পড়ছি, হঠাৎ মনে হল আমার এক মৃত বন্ধু যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। একটু খেয়াল করতেই তাকে আর দেখতে পেলাম না। মনে হল যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। খোঁজ করে জানলুম আসলে ঘরে কেউ আসে নি। ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে এই যে ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করা হল, এ হল অমূল প্রত্যক্ষের দৃষ্টান্ত অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোন উদ্দীপক নেই যা সংবেদন বা প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি প্রতিরূপ এতই স্পষ্ট ও সজীব হয়ে ওঠে যে তাকে প্রত্যক্ষরূপ (Percept) বলে ভ্রম হয়। প্রতিরূপটি বাইরের জগতে এতই স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয় যেন মনে হয় প্রকৃত কোন ব্যক্তি বা বস্তু প্রত্যক্ষ করছি। তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে অধ্যাস অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে ; কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষ অধ্যাসের মতো নয়, কদাচিৎ ঘটে থাকে।

অমূল প্রত্যক্ষের সংজ্ঞা

অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কোন সংবেদন থাকে না

অদ্ভুত শব্দ শোনা, অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখা যদিও সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, তবু উন্মাদ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অমূল প্রত্যক্ষ তীব্রভাবে দেখা দেয়। এই জাতীয় উন্মাদ ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ করে যে তাদের শত্রু তাদের আক্রমণ করতে আসছে বা কেউ তাদের ভীতি প্রদর্শন করছে বা হত্যা করছে বা হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে।

অমূল প্রত্যক্ষের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত

মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*) বলেন যে, "একটি প্রত্যক্ষ অংশতঃ অধ্যাস এবং অংশতঃ অমূল প্রত্যক্ষ হতে পারে। তাই, যখন আমরা এক প্রস্থ কাপড়-চোপড় দেখছি তখন মানুষ দেখছি বলে ভ্রম করছি।"[1]

মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*) অমূল প্রত্যক্ষের কারণও নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের প্রকৃতি ও পরিমাণের কতকগুলি পরিবর্তন এবং মস্তিষ্ক-পদার্থের বিকারের জন্য এই অমূল প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। রক্তের মধ্যে অ্যালকোহল, আফিং, ইথার, ক্লোরোফর্ম বা ঐ জাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হয়ে স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। ঘুমের সময় যদি শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে না হয়, তাহলে অনেক সময়ে রক্তে কার্বলিক এসিড সঞ্চিত হয়ে মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। অমূল প্রত্যক্ষের পূর্বোক্ত দৈহিক কারণ ছাড়াও মানসিক কারণ আছে। কোন বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে অবিরত চিন্তা করতে থাকলেও অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে। যেমন, কোন ব্যক্তি তার মৃত আত্মীয়ের কথা অবিরত চিন্তা করার জন্য সেই মৃত ব্যক্তির সশরীরী আবির্ভাব দেখতে পায়। ফ্রয়েডের (*Freud*) মতে নির্জ্ঞান মনের কামনা বাসনাও অমূল প্রত্যক্ষ ঘটাতে পারে। মনোবিদ্ স্টাউট (*Stout*)-এর মতে ইন্দ্রিয়ের উপর স্বাভাবিক কোন উদ্দীপক ক্রিয়া করার ফলে এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ ব্যবস্থা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অমূল প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে অমূল প্রত্যক্ষ অংশতঃ অধ্যাসে পরিণত হয়। অনেক সময় পাঁজরাতে কোন ব্যথা অনুভূত হলে, ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে, কোন ব্যক্তি তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করছে বা কোন কুকুর তাকে কামড়াচ্ছে।[2]

অমূল প্রত্যক্ষের কারণ

কল্পনার বিকারের ফলেও অমূল প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, যার জন্য কাল্পনিক প্রতিরূপ প্রত্যক্ষরূপ বলে ভ্রম হয়। সে কারণে, মানুষ কল্পনাকেই প্রত্যক্ষ বলে ভুল করে।

'অমূল প্রত্যক্ষের' (hallucination) সঙ্গে 'কপট অমূল প্রত্যক্ষের' (Pseudo-hallucination) প্রভেদ আছে। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হল এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই যা নেই, তাই প্রত্যক্ষ করা হয়। কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে কোন রকম চেতনা থাকে না; অর্থাৎ আমি যে কাল্পনিক কিছু প্রত্যক্ষ করছি এ বোধ একেবারেই আসে না। কপট অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে একটা চেতনা থাকে যে, যা প্রত্যক্ষ করছি তা আসলে কাল্পনিক। স্বপ্ন দেখার সময় এ রকম অনুভূতি অনেক সময় হয়ে থাকে।

অমূল প্রত্যক্ষ ও কপট অমূল প্রত্যক্ষ

১৩। স্বপ্ন (Dream):

সচেতন জাগ্রত অবস্থা এবং গভীর অচেতন নিদ্রিত অবস্থার মধ্যবর্তী স্তরে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা ও বাস্তবতা নিয়ে যে নিষ্ক্রিয় কল্পনা দেখা দেয় তাকেই স্বপ্ন বলে। স্বপ্ন হল নিদ্রাকালীন চেতন অবস্থা। স্বপ্নে আমরা জেগে আছি এমন কথা বলা চলে না; আবার একেবারে অচেতন, একথাও বলা যায় না। স্বপ্নের মধ্যে অধ্যাস (Illusion) এবং অমূল প্রত্যক্ষের (hallucination) সংমিশ্রণ ঘটে।

স্বপ্ন হল নিদ্রাকালীন চেতন অবস্থা

স্বপ্ন যদিও আমরা সবাই দেখে থাকি, তবু স্বপ্নের প্রকৃতি ও স্বরূপ এখনও রহস্যাবৃত। স্বপ্নের কতকগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আমরা এর স্বরূপকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি:

স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য

(১) স্বপ্ন-অবস্থায় আমরা কতকগুলো প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করি। এই প্রতিরূপগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের সচেতন স্তরে আবির্ভূত হয়।

(২) নিদ্রিত অবস্থায় বিচারশক্তি সতেজ ও সক্রিয় থাকে না। সে কারণে প্রতিরূপগুলো অসংলগ্ন, অবিশ্বাস্য ও উদ্ভটভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, যার জন্য স্বপ্নে আমরা অনেক অসম্ভব আজগুবি জিনিস দেখি।

(৩) স্বপ্নে মনে হয় যেন প্রতিরূপগুলো বাইরের জগতেরই বস্তু বা বাস্তব ঘটনা এবং প্রতিরূপগুলোর অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। বিচারশক্তি সক্রিয় না থাকার জন্য স্বপ্নের মধ্যে যে অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় সেগুলোকে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না।

(৪) স্বপ্নের প্রতিরূপগুলো খুব সুস্পষ্ট ও সজীব মনে হয়, এতই সুস্পষ্ট ও সজীব যে সেগুলোকে প্রত্যক্ষরূপ (Percept) বলে ভুল করা হয়। স্বপ্ন দেখার সময় প্রতিরূপগুলোকে কখনও অবাস্তব বা অমূলক বলে ধারণা করা হয় না।

স্বপ্নের কারণ কি ?ঃ স্বপ্নের কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে আমরা কতকগুলো জাগতিক, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা উল্লেখ করতে পারি, যে অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপ্নের আবির্ভাব ঘটে।

(১) সময় সময় স্বপ্ন দেখার মূলে থাকে বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক। এ হল স্বপ্নের জাগতিক উৎস। কোন লোক ঘরের মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমোবার জন্য স্বপ্ন দেখলে, তার ঘরে আগুন লেগেছে।

স্বপ্নের জাগতিক কারণ

(২) নিদ্রাকালে পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্তচলাচল প্রভৃতি দেহযন্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়ার ব্যাঘাত, স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারে। এগুলো স্বপ্নের দৈহিক বা শারীরিক উৎস। নিদ্রাকালে তৃষ্ণা অনুভূত হলে অনেকে প্রবহমান স্রোতস্বিনীর স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্নের দৈহিক কারণ

মনোবিদ্ জেমস-এর মতে স্বপ্নের সময় মস্তিষ্ক আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। এই অবস্থায় কতকগুলো মস্তিষ্ক পথ (brain path) অবরুদ্ধ থাকায় স্বাভাবিক অনুষঙ্গ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কোন বিষয় চিন্তা করলে স্বাভাবিকভাবে যে প্রতিরূপগুলো দেখা দেবার কথা সেগুলি দেখা দেয় না।

(৩) চিন্তা, আবেগ ও ইচ্ছার আধিক্য স্বপ্ন সৃষ্টি করতে পারে। পরীক্ষার পূর্বে কোন ছাত্র হয়ত আসন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে এত বেশী চিন্তা করছে যে, সে রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে যে সে পরীক্ষা দিচ্ছে।

স্বপ্নের মানসিক কারণ

মনোবিদ্ সালির (*Sully*) মতে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপ্ন অধ্যাসের (Illusion), আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অমূল প্রত্যক্ষের (Hallucination) রূপ গ্রহণ করতে পারে। যখন স্বপ্নের পেছনে কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে, অর্থাৎ স্বপ্নের উৎস কোন বাহ্যবস্তুর সংবেদন, সেক্ষেত্রে স্বপ্ন অধ্যাসের রূপ নেয়। আবার যখন কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে না, তখন স্বপ্ন অমূল প্রত্যক্ষের রূপ নেয়। এছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপ্নের মধ্যে অধ্যাস এবং অমূল প্রত্যক্ষের সংমিশ্রণও ঘটে থাকে।

স্বপ্ন সম্বন্ধে মনোবিদ্ ফ্রয়েড (*Freud*)-এর মতবাদ মনোবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্য এর পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন।

১৪। স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডের অভিমত (Freud's Theory of Dreams):

মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "*The Interpretation of Dreams*" গ্রন্থে স্বপ্ন সম্বন্ধে এক অভিনব মতবাদ প্রবর্তন করেন। অভিনবত্বের

জন্য এই মতবাদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আধুনিক চিন্তা জগতে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

অতৃপ্ত কামনা-বাসনা স্বপ্নে পরিতৃপ্তি সন্ধান করে

ফ্রয়েডের মতবাদের মূল বক্তব্য হল, আমাদের অতৃপ্ত কামনা-বাসনাই স্বপ্নে পরিতৃপ্তি সন্ধান করে। বাস্তব জীবনে যেসব ইচ্ছা পরিতৃপ্ত হতে পারে না, স্বপ্নের মধ্যেই সেগুলোর পূরণ হয়।[1] মনের নির্জ্ঞান স্তরই প্রতিরূপগুলোর উৎস।

ফ্রয়েড স্বপ্নকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—শিশুদের স্বপ্ন (Child's dream) এবং পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির স্বপ্ন (Adult's dream)।

স্বপ্নের মাধ্যমে শিশুর অবদমিত ইচ্ছার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তি

শিশুমনে নানারকম ইচ্ছা জাগে, কিন্তু সব ইচ্ছাই বাস্তবে পূরণ হয় না। যেসব ইচ্ছা পূরণ হয় না, সেগুলোকে শিশু পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের মতো মনের মধ্যে অবদমিত করে রাখে না। তার কারণ শিশুর মধ্যে কোন অপরাধ-বোধ (guilt-consciousness) নেই এবং সে তার বাসনাগুলোকে [illegible] মনে করে না। শিশুর অবদমিত ইচ্ছা নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় নেয় না, [illegible] সংজ্ঞান (Conscious) স্তর পরিত্যাগ করে প্রাকসংজ্ঞান (Pre conscious) [illegible] গ্রহণ করে। কিন্তু শিশুর এই ইচ্ছাগুলো স্বপ্নে [illegible] ভাবে ও অবিকৃতভাবে চরিতার্থতা লাভ করে। ইচ্ছাগুলোকে কোনরকম ছদ্মবেশ ধারণ করে মনের চেতন স্তরে আসতে হয় না। কোন শিশুর পাহাড়ে ওঠার খুব সাধ, বাস্তবে সেই ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। সে শিশু রাত্রে স্বপ্ন দেখে যে সে পাহাড়ে উঠেছে। এ হল স্বপ্নের মাধ্যমে শিশুর অবদমিত ইচ্ছার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তি (Direct fulfilment of unrepressed wishes)। শাসনের ভয়ে অনেক শিশুর কোন কোন ইচ্ছা অবদমিত হয়। এই অবদমিত ইচ্ছাও স্বপ্নে পূর্ণতা লাভ করে।

পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের স্বপ্ন

পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের স্বপ্ন হল ভিন্ন প্রকৃতির [illegible] পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের মনের মধ্যে অনেক সময় এমন কামনা বাসনা জাগে যেগুলোকে সমাজ অনুমোদিত পথে পূরণ করা সম্ভব নয়। মানুষ সামাজিক জীব। সভ্য সমাজে বাস করতে হলে তাকে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে তার কাজের সঙ্গে সমাজ-সম্মত নৈতিক আদর্শের সঙ্গতি থাকে। কাজেই যখন সে তার বাসনাগুলোকে পূরণ করতে পারে না তখন সেগুলোকে অবদমন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু অবদমিত হলেই বাসনাগুলো মন থেকে মুছে যায় না। সেগুলো মনের নির্জ্ঞান

1. ... ."wish-fulfilment is a main characteristic of dreams.'
—*Freud : Introductory lectures on Psycho Analysis*

স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সর্বদা সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে পরিতৃপ্তির উপায় অনুসন্ধান করে।

পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের জাগ্রত অবস্থায় কোন কোন বাসনা নীতিবুদ্ধি রূপ মনের প্রহরীর (Censorship of Reason) বা অধিশাস্তার (superego) সতর্ক দৃষ্টির জন্য চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে যখন প্রহরীর বা অধিশাস্তার ততখানি সতর্ক দৃষ্টি থাকে না, তখন তারা মনের সংজ্ঞান স্তরে (Conscious) প্রবেশ করে এবং কোন রকম ছদ্মবেশ ধারণ না করেই সোজাসুজি স্বপ্নের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি খোঁজে। যেমন, কোন একজন লোভী ব্যক্তি মনে মনে তার জনৈক ধনী আত্মীয়ের মৃত্যু কামনা করে—যাতে তার মৃত্যুর পরে সে তার সব সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। জাগ্রত অবস্থায় সে নিজের কাছেই বিষয়টি স্বীকার করতে চায় না। অথচ এই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল যে তার আত্মীয়টি মারা গেছে এবং সে তার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে। এ হল পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছার সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তি (Direct fulfilment of repressed wishes)।

পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছার সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তি

কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের অসামাজিক, অবদমিত বাসনাগুলো স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এরকম প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের পূরণ করতে পারে না। কেননা, নীতিবুদ্ধিরূপ মনের প্রহরীর বা অধিশাস্তার দৃষ্টি মাঝে মাঝে কিছু শিথিল হলেও, অধিকাংশ সময়ে হয় না। তার দৃষ্টি প্রায় সব সময়ই সজাগ থাকে এবং অবদমিত ইচ্ছার সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তির পথে বাধার সঞ্চার করে। সে কারণে ইচ্ছাগুলো প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে নানারকম কৌশল অবলম্বন করে ভদ্রতা বা শালীনতার মুখোশ পরে ছদ্মবেশে সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত স্বপ্নটিই ভিন্ন আকারে তখন নিজেকে প্রকাশ করে।[1] ঐ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে সে কোন একজন নামজানা অথচ খুব পরিচিত নয় এমন এক ধনী ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার পাশে বসে আছে এবং সেই ব্যক্তিটি তার সমস্ত সম্পত্তিই তাকে উইল করে দিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নে দেখা ঘটনাস্থল এবং ব্যক্তি সবই খুব এলোমেলো যদিও স্বপ্নের প্রতিটি উপাদান অতীত অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই স্বপ্নের ব্যক্ত রূপটি (Manifest Content) যতই অসংলগ্ন এবং দুর্বোধ্য

স্বপ্নের মাধ্যমে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির ইচ্ছার পরোক্ষ পরিতৃপ্তি

1. "Omission, modification," re-grouping of material, these then are the modes of the dream censorship's activity and the means employed in distortion,—Freud : Introductory lectures on Psycho-Analysis. Page 117.

হোক না কেন, এই স্বপ্নের যেটা অব্যক্তরূপ (Latent Content) অর্থাৎ স্বপ্ন প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির তার আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার ইচ্ছা—সেইটি স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ। **প্রত্যেক স্বপ্নের দুটি রূপ আছে—ব্যক্ত রূপ আর অব্যক্ত রূপ।** স্বপ্নের নির্জ্ঞান রূপ তার অব্যক্ত রূপ (Latent Content) এবং সংজ্ঞান মনে এই নির্জ্ঞান রূপেরই প্রকাশিত রূপকে বলে ব্যক্ত রূপ (Manifest Content)। আর স্বপ্নের নির্জ্ঞান রূপটি ছদ্ম বা বিকৃত বেশে সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয়। স্বপ্নের অব্যক্ত রূপটির মধ্যে স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ নিহিত থাকে। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে পরিণত বয়স্কব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা স্বপ্নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিতৃপ্ত হচ্ছে, (Indirect fulfilment of repressed wishes)। স্বপ্ন অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছার সংজ্ঞানে ছদ্ম ব্যক্তরূপ।

স্বপ্নের দুটি রূপ—ব্যক্ত ও অব্যক্ত রূপ

ফ্রয়েডের (*Freud*) মতে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে যেসব কামনা অত্যন্ত বলবতী এবং সাধারণতঃ যেগুলো অবদমিত হয় সেগুলো কামজ বা **যৌন কামনা**। পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের প্রায়ই স্বপ্নের পেছনে থাকে এই যৌন কামনা। স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড প্রায় স্বপ্নেরই পেছনে কোন-না-কোন যৌন ইচ্ছার প্রেরণা আবিষ্কার করেছেন। যে পদ্ধতি অবলম্বন করে ফ্রয়েড স্বপ্নের আসল অর্থ আবিষ্কার করেছেন, সেই পদ্ধতিকে বলা হয় মনঃসমীক্ষণ (Psycho-Analysis)। কামজ ইচ্ছা ছাড়াও ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি সম্পর্কীয় কামনাও স্বপ্নে চরিতার্থতা লাভ করতে পারে।

অবদমিত কামনাগুলো যৌন কামনা

যেসব কৌশল অবলম্বন করে অবদমিত নির্জ্ঞান ইচ্ছা সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে একটি হল প্রতীকতা (Symbolism)। ফ্রয়েডের নির্জ্ঞান স্তরের কামনা যখন স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, তখন কতকগুলো প্রতীকের (symbol) সহায়তা গ্রহণ করে। ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে এই সব প্রতীকের এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। বাড়ি মনুষ্যমূর্তির প্রতীক; সম্রাট, সম্রাজ্ঞী এবং রাজা-রাণী পিতা-মাতার প্রতীক; মনুষ্যেতর প্রাণী, শিশু ভাইবোনের প্রতীক; ভ্রমণের দৃশ্য মৃত্যুর প্রতীক; জলের দৃশ্য জন্মের প্রতীক; কাপড় এবং পোশাক নগ্নতার প্রতীক ইত্যাদি। স্বপ্নের অধিকাংশ প্রতীকই হল যৌন বিষয়ক প্রতীক। লাঠি, ছাতা গাছ, ছুরি, ছোরা, বল্লম, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, পেন্সিল, পেন-হোল্ডার, হাতুড়ি, বেলুন, এরোপ্লেন, চাবি, জলের কল প্রভৃতি পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। ফ্রয়েডের মতে এই প্রতীক স্বপ্নের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[1]

---

1. "Symbolism is perhaps the most remarkable part of our theory of dreams.' —Freud : Introductory Lectures on Psycho-Analysis. page 226.

প্রতীক ছাড়াও আরও নানাভাবে ব্যক্তির আসল ইচ্ছা আত্মগোপন করে এবং স্বপ্নের মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশিত হয় যাতে ব্যক্তির ইচ্ছার প্রকৃত রূপটি ধরা না পড়ে।[1] সংক্ষেপণ (condensation), অভিক্রান্তি (displacement), নাটকীকরণ (dramatisation), বর্জন (omission) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বপ্নের অব্যক্ত রূপটি ব্যক্ত রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয় যার জন্য প্রকৃত অর্থ অনেক সময় নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মনঃসমীক্ষক এই সব প্রক্রিয়ার পেছনে স্বপ্নের যে প্রকৃত অর্থটি অব্যক্ত থাকে সেটি নির্ধারণ করার চেষ্টা করেন।

---

1. (ক) সংক্ষেপণ (Condensation) : সংক্ষেপণের অর্থ অব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানের (latent dream content) ব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানে (manifest dream content) সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করা। স্বপ্নে প্রতিরূপগুলো অনেক সময় সংক্ষিপ্ত আকারে নিজেকে প্রকাশ করে, যার জন্য স্বপ্নের ব্যক্ত রূপটি দুর্বোধ্য মনে হয় এবং ব্যক্তির গোপন ইচ্ছা বা অব্যক্ত অংশটি নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, স্বপ্নে একজন লোককে দেখলুম, যার সঙ্গে রামের আকারগত সাদৃশ্য আছে, যে শ্যামের পোশাক পরেছে, যার পেশা হল যদুর পেশা, অথচ সারাক্ষণ মনে হচ্ছে এ লোকটি হচ্ছে আসলে মধু। আসলে স্বপ্নে দেখা লোকটি চারটি লোকের বিশিষ্ট সংক্ষেপিত রূপ।

(খ) অভিক্রান্তি (Displacement) : অভিক্রান্তির অর্থ অব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানের ব্যক্ত স্বপ্নরূপ স্থান পরিবর্তিত করা। অব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানে যেটি মুখ্য, সেটি ব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানে গৌণ ; অব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানে যেটি গৌণ, সেটি ব্যক্ত স্বপ্ন উপাদানে মুখ্য স্থান গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ার দুইটি রূপ আছে। প্রথমতঃ, বাস্তব জীবনে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আমাদের যে অনুভূতি, স্বপ্নে তা অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ধাবিত হতে পারে। যেমন—মনে মনে রামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব নিয়ে ঘুমুতে গেলাম ; স্বপ্নে দেখলাম যে আমি রামকে আঘাত করছি, বাস্তব জীবনে যার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। দ্বিতীয়তঃ, গোপন ইচ্ছার প্রধান অংশটুকু প্রাধান্য লাভ না করে একটি অপ্রধান বিষয় স্বপ্নের ব্যক্ত রূপের মাধ্যমে অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করে। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে একজন ব্যক্তি এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে যে তার দিকে সবটুকু মনোযোগ ধাবিত হয়। কিন্তু স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ সেই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, যে ব্যক্ত অংশ অপ্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

(গ) নাটকীকরণ (Dramatization) : স্বপ্নের অব্যক্ত অংশের বিষয়গুলি নাটকীয় দৃশ্যের আকারে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে প্রকাশ পায়। অনেক সময় স্বপ্নে প্রতিরূপগুলি অসংবদ্ধ অবস্থায় নাটকীয় ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে, যার জন্য স্বপ্নের ব্যক্ত অংশটুকু দুর্বোধ্য মনে হয়। স্বপ্নদর্শনকারীর মনে সংঘাত এবং বিক্ষোভ স্বপ্নের কোন ঘটনার মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বপ্নদর্শনকারী হয়ত কোন একটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন—স্বপ্নে তিনি দেখলেন যে তিনি এক গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন, কোন অজানা বন্যপ্রাণীর সম্মুখীন হয়েছেন, বন্য প্রাণীটি তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত ইত্যাদি।

(ঘ) অনুযোজনা (Secondary Elaboration,) : ফ্রয়েডের মতে এই প্রক্রিয়ায় স্বপ্নের অসংবদ্ধ প্রতিরূপগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র ক্রিয়া করে। তখন সমস্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণ আকারে এবং নাটকীয় ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে। এর জন্যই ঘটনাটির ব্যক্ত অংশ চিত্তাকর্ষক ঘটনারূপে দেখা দেয়। স্বপ্ন দেখা এবং তার বর্ণনা, এই উভয় প্রক্রিয়ার অন্তবর্তী সময়ে এটি ঘটে থাকে।

(ঙ) বর্জন (Omission) : অব্যক্ত অংশের অংশবিশেষ এমনভাবে পরিত্যক্ত হয় যে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশটুকু দুর্বোধ্য মনে হয়।

সমালোচনা :

ফ্রয়েডের মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য যে নিহিত আছে তা অস্বীকার করা যায় না। অবদমিত ইচ্ছা যে স্বপ্নের মধ্যে পরিতৃপ্তি খোঁজে তা অস্বীকার করা চলে না। কোন কোন স্বপ্নে অবদমিত যৌন কামনার প্রকাশ ঘটে। এই সব যৌন কামনার পূরণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকারেই সম্পন্ন হতে পারে এবং স্বপ্নের কোন কোন প্রতীক যে যৌন বিষয়ক তাও সত্য।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের সত্যতা

কিন্তু ফ্রয়েডের মতবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করা চলে না। সব স্বপ্নই অবদমিত যৌন কামনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পূরণ নয়। সব স্বপ্নের মূলেই যৌন কামনাব অস্তিত্ব স্বীকাব করা যায় না। স্বপ্নেরও প্রকাবভেদ আছে। স্বপ্ন মাত্রই ব্যক্তির শৈশবের কোন সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এ বিষযে ফ্রয়েডেব সঙ্গে অনেকে এক মত নন।

ফ্রয়েড যৌন প্রেবণা'ব উপব অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয। যৌন প্রবৃত্তি ছাড়াও আমাদের অবদমিত আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি স্বপ্নের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি সন্ধান করতে পাবে। অ্যাডলাব (Adler এর মতে স্বপ্ন কোন ব্যাহত আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির পূরণ। ইয়ুং (*Jung*) এব মতে কোন কোন স্বপ্নে ব্যক্তিব বর্তমান জীবনের সমস্যাগুলো বা জীবনেব প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীব বিষয পবিস্ফুট হয।

ফ্রয়েডীয় মতবাদেব ত্রুটি

কোন কোন স্বপ্নে নিছক অলীক কল্পনার প্রকাশ ঘটে, কোন অবদমিত ইচ্ছার প্রত্যক্ষ পূরণ নয়। অনেক ইচ্ছা সম্পূর্ণ নির্দোষ অর্থাৎ সব ইচ্ছার মূলেই যৌন কামনা নেই।

মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (*Woodworth*)-এব মতে ফ্রয়েড নির্জ্ঞান মনের বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করেছেন। অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা মাত্রেই ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় লাভ করে, এ কথা যথার্থ নয। স্বপ্নের মাধ্যমে আমাদের অপরিতৃপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটলেও, এগুলো সম্পর্কে আমরা সচেতন।

ফ্রয়েড (*Freud*) কতকগুলো বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিব স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে তাঁর মতবাদটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে কারণেই তিনি মনে করেন প্রত্যেক অবদমিত গোপন কামনাই যৌনভাবমূলক। ফ্রয়েডের এই পদ্ধতি যথার্থ নয়, কেননা সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তি থেকেই অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের দিকে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে ম্যাকডুগালের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "স্বপ্ন ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের সূত্রটি কোন কোন স্বপ্ন সম্পর্কে সত্য হতে পারে ; বিশেষ

করে স্নায়বিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বপ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি স্বপ্নকে ফ্রয়েডীয় সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই।'[1]

১৫। দিবাস্বপ্ন (**Reverie or Day Dream**) :

সাধারণতঃ নিদ্রিত অবস্থায় ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে কিন্তু দিবাস্বপ্ন হল জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখা। স্বপ্নের মতো এখানেও নিষ্ক্রিয় কল্পনা ক্রিয়া করে, কারণ এ ক্ষেত্রে কাল্পনিক প্রতিরূপগুলো মনের সামনে তুলে ধরার জন্য ব্যক্তিকে কোন পরিশ্রম করতে হয় না। বাস্তবে যেসব কামনা-বাসনা পরিতৃপ্ত হবার সুযোগ পায় না স্বপ্নদর্শনকারী বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এক কাল্পনিক জগতে নিজেদের এই অপরিতৃপ্ত কামনা-বাসনাগুলোকে পূরণ করতে চায়। দিবাস্বপ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেগুলো ব্যক্তির গভীর আকাঙ্ক্ষা, আশা এবং জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সুনির্দিষ্ট প্রেষণার (Motive) সঙ্গে যুক্ত। এই দিক থেকে স্বপ্নের সঙ্গে দিবাস্বপ্নের সাদৃশ্য আছে। অনুষঙ্গের প্রভাবে একটির পর একটি প্রতিরূপ মনের মধ্যে উদিত হয়। কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে দিবাস্বপ্নের পার্থক্য হল, স্বপ্নের প্রতিরূপগুলোর মতো দিবাস্বপ্নের প্রতিরূপগুলো অত সজীব ও স্পষ্ট হয় না এবং স্বপ্নের প্রতিরূপগুলোতে ব্যক্তি যেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে, দিবাস্বপ্নের প্রতিরূপগুলোতে সে সেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে না। অবশ্য দিবাস্বপ্ন যদি দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে তাহলে ভ্রান্তির (delusion) সৃষ্টি হয় এবং এই ভ্রান্ত মনে দৃঢ়মূল প্রোথিত করে দেয়। যদিও বাস্তবের সঙ্গে সে ভ্রান্তির অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় তবু তার মধ্যে আত্মবিরোধ থাকে না।

স্বপ্নের প্রতিরূপগুলোর মত দিবাস্বপ্নের প্রতিরূপগুলো অত সজীব ও স্পষ্ট নয়

দিবাস্বপ্নের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে—(১) দিবাস্বপ্নের আবির্ভাব তখনই হয় যখন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব জোরালো নয়। (২) দিবাস্বপ্ন সুখদায়ক। (৩) দিবাস্বপ্ন আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে সময় সময় সহায়ক হতে পারে। দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে পারি।[2] স্বপ্ন সুখদায়ক এবং দুঃখদায়ক উভয় প্রকারেরই হতে পারে কিন্তু দিবাস্বপ্ন সব

1 'Freud's formula for the interpretation of dreams may be true of some dreams, more especially of some dreams of some neurotics; but there is no sufficient ground for trying to force the interpretation of every dream to fit the formula.'

McDougall: Outlines of Abnormal Psychology. Page 186 87.

2. G. D. Boaz: General Psychology, Page 357.

ক্ষেত্রেই সুখদায়ক এবং ব্যক্তির মনে সুখের অনুভূতি সৃষ্টি করে। মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (*Woodworth*) বলেন, "দিবাস্বপ্নের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একজন নায়ক থাকে এবং এই নায়ক হল স্বপ্নদর্শনকারী নিজে।" আরব্য উপন্যাসের আলনাস্করের গল্প দিবাস্বপ্ন বিলাসিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দিবাস্বপ্ন সব ক্ষেত্রেই সুখদায়ক

দিবাস্বপ্ন তিন ধরনের হতে পারে—(১) অনেক সময় স্বপ্নদর্শনকারী নিজেকে একজন বিজয়ী নায়কের (**Conquering hero**) ভূমিকায় কল্পনা করে এবং স্বপ্ন দেখে যে, সে অনেক বিস্ময়কর কার্য বা সব রকম বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে বহু দুঃসাহসিক কার্য সম্পন্ন করেছে। (২) অনেক সময় স্বপ্নদর্শনকারী নিজেকে একজন দুঃখজর্জরিত নায়কের (**Suffering hero**) ভূমিকায় কল্পনা করে এবং স্বপ্ন দেখে যে, তার জীবনে সবরকমের পরাজয় ঘটেছে এবং সকলে তার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করছে। (৩) তৃতীয় ধরনের দিবাস্বপ্নের লক্ষণ হল স্বপ্নদর্শনকারী কল্পনা করে যে, কেবলমাত্র তার জীবনেই সব রকমের দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়। এই ধরনের দিবাস্বপ্নের লক্ষণ হল—সব সময় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটান। এই ধরনের দিবাস্বপ্ন স্বপ্নদর্শনকারীর মানসিক বিকারের ইঙ্গিত দেয়।

১৬। স্বতঃক্রিয় চিন্তন (Autistic Thinking) :

স্বতঃক্রিয় চিন্তন হল একপ্রকার অনৈচ্ছিক কল্পনা যা ব্যক্তির নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যার সঙ্গে বাস্তব জগতের কোন সংযোগ থাকে না। নিজেকে কেন্দ্র করেই ব্যক্তির কল্পনা প্রকাশ পায়।

স্বতঃক্রিয় চিন্তন স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোন সমালোচনার অধীন নয়

মনোবিদ্ উডওয়ার্থ (*Woodworth*)-এর মতে, 'স্বতঃক্রিয় চিন্তন হল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোন সমালোচনার অধীন নয়। স্বতঃক্রিয় চিন্তন কোন ইচ্ছা পূরণ করে এবং এটুকুই যথেষ্ট। এই প্রকার চিন্তন কি অপরের বা কি নিজের সমালোচনা স্বীকার করতে চায় না এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করার ইচ্ছা বোধ করে না।'

স্বতঃক্রিয় চিন্তন হল নিজের মধ্যে নিজে মগ্ন বা লীন হয়ে থাকা। এই জাতীয় চিন্তন স্বাভাবিক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, যারা নিজেদের কল্পিত জগতের মধ্যে নিমগ্ন করে রাখে। আবার বাতুলরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যায় এমন অনেক আছে যারা নিজেদের অলীক জগতের মধ্যে আত্মসমাহিত রেখে আনন্দ পায়, বাস্তব জীবনের কোন ধার ধারে না। এই জাতীয় চিন্তনের বৈশিষ্ট্য হল যে, ব্যক্তি কোন রকম সমালোচনার ধার ধারে না—কি সমাজের, কি নিজের। বস্তুতঃ, দিবাস্বপ্ন (**Reverie or Day Dream**) স্বতঃক্রিয় চিন্তনেরই একটি রূপ।

স্বতঃক্রিয় চিন্তনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলার কারণ এই যে, নিজের দিক থেকে এর মধ্যে কোন অপূর্ণতা নেই। ব্যক্তির খেয়ালকে পরিতৃপ্ত করার পক্ষে এ যথেষ্ট; যদিও অন্য সব দিক থেকে এ একেবারেই ভ্রান্ত।

স্বতঃক্রিয় চিন্তনের কোন অপূর্ণতা নেই

কোন একটি বাসনা বা খেয়াল এই স্বতঃক্রিয় চিন্তনের মূল উৎস, তারপর নিষ্ক্রিয় কল্পনার প্রভাবে কল্পনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস এই চিন্তন ক্রিয়ার অনুগামী। এ চিন্তনও নানা প্রকারের হতে পারে; যেমন, শিশুর একটি লাঠিকে ঘোড়া মনে করে তাতে আরোহণ করা বা উন্মাদ ব্যক্তির নিজেকে রাজা মনে করা ইত্যাদি। এ জাতীয় চিন্তনের ক্ষেত্রে কল্পনার গতি খুবই অসংবদ্ধ, বিশৃঙ্খল এবং এলোমেলো।

এ-জাতীয় চিন্তনের ক্ষেত্রে কল্পনার গতি খুবই অসংবদ্ধ, বিশৃঙ্খল এবং এলোমেলো

এ জাতীয় চিন্তন একেবারেই অযৌক্তিক ও অবাস্তব। বাস্তবভিত্তিক চিন্তনের সঙ্গে এর পার্থক্য হল, বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই; সামাজিক চিন্তনের সঙ্গে এর পার্থক্য হল, অপরের চিন্তার সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি রক্ষার প্রশ্ন ওঠে না এবং আত্ম-সমালোচনা-মূলক চিন্তনের সঙ্গে এর পার্থক্য হল, এ জাতীয় চিন্তা আত্ম-সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

স্বতঃক্রিয় চিন্তন, বাস্তব চিন্তন ও সামাজিক চিন্তনের মধ্যে পার্থক্য

১৭। শিশুর শিক্ষায় কল্পনার স্থান (The role of imagination in the education of a child):

শিশুর শিক্ষায় কল্পনার যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অনেক মনোবিজ্ঞানীই তা স্বীকার করেন। কল্পনাকে আশ্রয় করেই শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়ার শুরু। শৈশবে কোন কিছু চিন্তা করতে গেলেই শিশু প্রতিরূপের (image) মাধ্যমে চিন্তা করে। একটা কুকুর, বাড়ী বা লোকের কথা চিন্তা করার সময় বস্তু বা ব্যক্তিটির একটি প্রতিরূপ শিশু মনের সামনে তুলে ধরে। যেহেতু শিশুরা সংবেদনের মাধ্যমেই তাদের জ্ঞান অর্জন করে, সেহেতু তাদের চিন্তন-প্রক্রিয়া বিশেষ করে প্রতিরূপভিত্তিক। কিন্তু শিশুর বয়স যতই বাড়তে থাকে তার কল্পনা প্রবণতার আধিক্য কমে আসে, চিন্তার ক্ষেত্রে প্রতিরূপের ব্যবহার হ্রাস পায়। যৌবনে শিশুর চিন্তন-প্রক্রিয়ায় কল্পনার প্রভাব তীব্রভাবে দেখা দেয়। অনেক সময় এই কল্পনাপ্রবণতা এত অতিরিক্ত মাত্রায় দেখা দেয় যে ব্যক্তি অলীক, উদ্ভট কল্পনা করে আনন্দ পায়। আজগুবি দিবাস্বপ্নে

শিশুর চিন্তন-প্রক্রিয়া কল্পনাভিত্তিক

মেতে থাকার জন্য এই সময়ের কল্পনা হয়ে পড়ে অসঙ্গত ও অবাস্তব। কল্পনা এবং অলীক কল্পনা বা আজগুবি দিবাস্বপ্ন, এ দুটোকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। কল্পনা সুস্থ মানসিক প্রক্রিয়া, আজগুবি দিবাস্বপ্নে মত্ত হয়ে থাকা মনোবিকারের লক্ষণ। কারণ এক্ষেত্রে একটা আত্ম-প্রতারণার ভাব আছে। এর কারণ বাস্তবে যেসব কামনা-বাসনাকে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত করার সুযোগ পায় না, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এক কাল্পনিক জগতকে সে তার অপরিতৃপ্ত কামনা-বাসনাগুলোকে পূরণ করতে চায়। পরিণত বয়সে এই জাতীয় অবাস্তবতার ও অলীক কল্পনা প্রবণতার প্রাবল্য অনেকটা কমে এলেও, একেবারে মিলিয়ে যায় না।

রূপকথা, উপকথা প্রভৃতি শোনার বিরুদ্ধে অভিযোগ

অনেক শিশুর মধ্যেই অলীক ও অবাস্তব কল্পনার তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। রূপকথা, উপকথা ও অবাস্তব কাহিনী থেকে শিশুরা এই অবাস্তব কল্পনার উপাদান সংগ্রহ করে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই শিশুর এই জাতীয় অবাস্তব কাহিনী শোনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। খ্যাতনামা শিশু-শিক্ষাবিদ্ মণ্টেসরী (*Montessori*) শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এই জাতীয় অবাস্তব কাহিনীকে নির্বাসন দেবারই পক্ষপাতী।

মণ্টেসরীর মতে শিশু স্বভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ। কাজেই তার কল্পনাশক্তিকে আরও বিকশিত করার চেষ্টা করে লাভ নেই। শিশুর মনে যদি অবাস্তব কাল্পনিক ধারণা বাসা বাঁধে তাহলে পরবর্তীকালে সেগুলোকে দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁর মতে অলীক ও অবাস্তব কল্পনা শিশুর মানসিক পরিণতি ব্যাহত করে। তিনি তাই শিশুদের রূপকথা, উপকথা প্রভৃতি শোনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এই জাতীয় কাহিনী শিশুকে এক অলৌকিক ও অবাস্তব জগতে টেনে নিয়ে যায়, তার মনে উদ্বেগ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বাস্তব সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার করে, যার ফলে পরবর্তী জীবনে বাস্তবের মুখোমুখী হতে সে ভয় পায়। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে শিক্ষা দেওয়া, তার মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে তাকে জীবনে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তোলা। কিন্তু এই জাতীয় অবাস্তব কাহিনী শিশুর পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান ব্যাহত করে, তার আত্মবিশ্বাস শিথিল করে, তাকে দুর্বলচিত্ত করে তোলে এবং তার ব্যক্তিত্বের সুষম সংগঠনকে ব্যাহত করে। অবশ্য সব শিক্ষাবিদই শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে রূপকথা বা উপকথাকে নির্বাসন দিতে রাজী নন্।

রূপকথা শোনা সম্পর্কে মণ্টেসরী ও অন্যান্য শিক্ষাবিদ্দের অভিমত

অ্যাডলার (*Adler*)-এর মতে রূপকথার মধ্যে ক্ষতিকারক, কুসংস্কারমূলক এবং নীতি

বিগর্হিত যেসব উপাদান থাকে সেগুলোকে বর্জন করাই যুক্তিসঙ্গত। কোন কোন শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে দৈত্য, দানব, ডাইনীর গল্প শিশুর মনে দ্বন্দ্ব ও ভয়ের সৃষ্টি করে, কাজেই শিশুর পাঠ্যবিষয় থেকে সেগুলো বর্জন করা উচিত। শিশুশিক্ষাবিদ্ মণ্টেসরী ভিন্ন অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌রা রূপকথা, উপকথাকে একেবারে বর্জন না করে সেগুলোর সংস্কার সাধনেরই পক্ষপাতী, কিন্তু শিক্ষাবিদ্ মণ্টেসরীর মতে কল্পনা সত্যাশ্রয়ী বা বাস্তবতাভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞানে (positive sciences) যখন কল্পনার সহায়তা গ্রহণ করা হয়, তখন সে কল্পনা বাস্তবতাভিত্তিক। কাজেই কোন অবাস্তব কাহিনী শিশুর পাঠ্যাবস্থায় স্থান পাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু মণ্টেসরীর অভিমত অনেকে সমর্থন করেন না। অনেকে মনে করেন যে, মণ্টেসরী শিশুর স্বাভাবিক প্রকৃতিকেই অগ্রাহ্য করেছেন। শিশুর জগৎ কল্পনার জগৎ। বাস্তব জগতের বাস্তবতায় তার আকর্ষণ কম। জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাল্পনিক বিষয়ে আকর্ষণ স্বভাবতঃই তার কমে আসে।

মনোবিজ্ঞানী ড্রেভার (*Drever*) মনে করেন যে শিশুর পক্ষে কিছু মাত্রায় অলীক কল্পনারও প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ, শিশুর জীবনে অবাস্তব কল্পনার প্রয়োজনীয়তাকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। অবাস্তব কাল্পনিক জগতে শিশু তার অপরিতৃপ্ত বাসনাকে পরিতৃপ্ত করার সুযোগ পায় বলেই তার মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে এই অবাস্তব কল্পনার আধিক্য কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা তাহলে শিশু বাস্তববিমুখ হয়ে পড়ে এবং বাস্তব জীবনের কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে, সে চায় কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করে বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে। এই পলায়ন মনোবৃত্তি, এই প্রত্যাবৃত্তি (regression) শিশুর জীবনীশক্তির যথার্থ স্ফুরণের পথে বাধার সঞ্চার করে এবং শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

ড্রেভার-এর অভিমত

শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনমূলক ও সংগঠনমূলক কল্পনার গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। শিশু-শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ হল শিশুর অবাস্তব কল্পনাকে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত করে তাকে বাস্তবাভিমুখী করে তোলা। উদ্ভট, অবাস্তব কল্পনা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে না। বিজ্ঞান ও শিল্পের আবিষ্কার, কবি, লেখক, ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি, এদের মূলে রয়েছে সৃজনশীল ও সংগঠনমূলক কল্পনা। শিশুর উদ্ভট অবাস্তব কল্পনাকে একটা লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে তাকে বাস্তবধর্মী করে তোলা শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত শিশুকে রূপকথার

শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনমূলক ও সংগঠন-মূলক কল্পনার স্থান

গল্প পড়তে দেওয়া যেতে পারে। তারপরে কল্পনার জগৎ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে এসে বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোর সঙ্গে তাকে পরিচিত করে তুলতে হবে, যাতে শিশু তার কল্পনাকে বাস্তবমুখী করে তুলতে পাবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের বাস্তব সমস্যা-গুলোর সমাধান করতে পারে। শিশুর কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিশুকে বৃহত্তর পরিবেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেওয়া। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, বৃহত্তর পরিবেশের প্রভাব শিশুর কল্পনাকে সংগঠনমূলক, প্রয়োগমূলক ও বাস্তবানুগ করে তোলে।

বাস্তবধর্মী কল্পনার সুফল

বাস্তবধর্মী কল্পনার সহায়তায় শিশু তার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সম্ভাব্য ফলাফল বুঝে নিতে পারে, বিভিন্ন কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি অধিক কার্যকর হবে অনুমান করে নিতে পারে। বাস্তবধর্মী কল্পনা শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক হয়।

শিশুর মধ্যে সুস্থ ও সংগঠনমূলক কল্পনার বিকাশ শিশু শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের কল্পনা মূর্ত বস্তুকে আশ্রয় করেই উদ্দীপিত হয়, কারণ তখনও পর্যন্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই তাদের অভিজ্ঞতায় প্রাধান্য বিস্তার করে। কাজেই ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনের (Sensory training) দ্বারা শিশুর কল্পনা-প্রবণতাকে শক্তিশালী করে তোলা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন প্রতিরূপগুলোকে মনের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। প্রতিরূপ কল্পনার বিকাশে সহায়তা করে। সৃজনমূলক কল্পনার জন্য ইন্দ্রিয়ের অনুশীলন একান্তভাবে প্রয়োজন। মণ্টেসরীর শিশু শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে তা বিশেষ যুক্তিযুক্ত।

শিশুর কল্পনার বিকাশসাধন

শিশুর কল্পনার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে শিশুর খেলাধুলা। সেকারণে শিক্ষকের উচিত শিশুকে স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করার পর্যাপ্ত সুযোগ দান করা। খেলাধুলা করতে গিয়ে যখন বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন শিশু নিজেকে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভূমিকায় কল্পনা করে নেয়। যেমন, খেলার সময় একটা লাঠিকে ঘোড়া মনে করে তাতে চেপে বসে বা কখনও আবার তাকে রাইফেল কল্পনা করে কাঁধে চাপিয়ে দেয়।

কল্পনার বিকাশের সঙ্গে ভাষা জ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। শিশু যখন কথা বলতে শেখে, তখন তার কল্পনা বিকশিত হতে থাকে। কাজেই পিতামাতা ও

শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে শিশুর ভাষার বিকাশে কোনরকম বাধা দেখা না দেয়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে গল্প বলা খুবই কার্যকর হয়। শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীকে গল্প বলবেন তেমনি শিক্ষার্থীদেরও গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন। সৃজনশীল কল্পনাকে উদ্দীপিত করার জন্য শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা কিছু কিছু গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করে সেগুলোর অভিনয় করে। ইতিহাস এবং ভূগোল শিক্ষা দেবার সময় যদি ছবির সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলে শিশু দূরবর্তী সময় ও স্থানকে কল্পনা করে নিতে পারবে। যেখানে মৌখিক বর্ণনা বা নিছক পুস্তকের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয় সেসব ক্ষেত্রে দৃষ্টি ও শ্রুতি নির্ভর সহায়ক উপকরণের (audio-visual aids) সাহায্য নেওয়া উচিত। ছবি, মানচিত্র, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন, ফিল্ম প্রভৃতির সাহায্যে শিশুর কল্পনাকে বাস্তবধর্মী করে তোলা যেতে পারে।

কল্পনার বিকাশের সঙ্গে ভাষা জ্ঞানের নিকট সম্পর্ক

শিল্পকলাসম্পর্কীয় (artistic) ও নান্দনিক (aesthetic) কল্পনার উন্মেষের জন্য প্রয়োজন সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলায় শিশুর অনুরাগ সৃষ্টি করা এবং শিল্পকলা সমালোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে সূক্ষ্ম রসানুভূতি সৃষ্টি করা, ও তার মনে রসোপলব্ধির ক্ষমতা জাগ্রত করা। তবে শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে প্রয়োগমূলক কল্পনাকে (pragmatic imagination) উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নান্দনিক কল্পনার বিকাশের দিকেই লক্ষ্য রাখা না হয়। সেক্ষেত্রে কল্পনার বিকাশ হবে একমুখী। নান্দনিক কল্পনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগমূলক কল্পনার বিকাশেও শিক্ষককে যত্নবান হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত করা, খ্যাতনামা চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, ইন্‌জিনিয়ার প্রভৃতির জীবন-চরিতের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

শিল্পকলাসম্পর্কীয় ও নান্দনিক কল্পনা

সুতরাং শিশুর কল্পনাকে উপযুক্ত পথে বিকশিত করা শিক্ষার বড় অঙ্গ এবং এই সুমহান দায়িত্ব বিশেষ করে শিক্ষক ও পিতামাতার উপর ন্যস্ত। শিশুর মধ্যে কল্পনা যথেষ্ট মাত্রায় বর্তমান থাকে, শিক্ষক ও পিতামাতার দায়িত্ব সেই কল্পনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করে তাকে সংগঠনমূলক পথে পরিচালিত করা।

১৮। কল্পনার বিকাশসাধনে শিক্ষকের ভূমিকা (The role of the teacher in the Development of Imagination) :

শিশুমনের বিচিত্র কল্পনার বিচিত্রতর প্রকাশ আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। তাদের স্বাধীন মন বাস্তবের দাসত্ব করতে একান্ত নারাজ। তাদের কল্পনার

পক্ষীরাজ ঘোড়া ভাবজগতের হাল্কা হাওয়ায় ডানা মেলে উড়ে চলে। শিশুমন সকল সম্ভব-অসম্ভবের বাধা পেরিয়ে কোন্ সুদূরে ছুটে চলে। কখনও সে কল্পনা করে সে মস্ত এক বীরপুরুষ।*—এমনি কত না উদ্ভট, কত না বিলাসী কল্পনা শিশুর মনোজগতে স্বচ্ছন্দে বিহার করে। তাদের কল্পনাকে ঠিক পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব শিক্ষকের উপর বর্তায়। তাই তাঁর ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে কতকগুলো করণীয় বিষয় উপস্থাপিত করা হল :

(১) **শিক্ষক মূর্ত থেকে বিমূর্ত বস্তুতে এগিয়ে যাবেন (From concrete to abstract) :** শিশুর অভিজ্ঞতা মূর্ত বস্তুকে আশ্রয় করে সঞ্চিত হয়। কাঠের ঘোড়ায় সে চাবুক চালায়। বারান্দার রেলিংগুলো ছাত্র মনে করে শাসায়। নিজে মাষ্টার সেজে বেড়ালছানাকে পোড়ো করে। তাই শিক্ষককেও মূর্ত বস্তু থেকে বিমূর্ত বস্তুতে যেতে হবে। শিশুরা যাকে দেখে তার বৃত্তিই অবলম্বন করতে চায়। কল্পনাবিলাসবাদ (make believe) তাদের স্বভাবিক ধর্ম। তাই ডাকঘরের অমলের মতো কখনও সে পাহারাওয়ালা কখনও দইওয়ালা, কখনও বা ভবঘুরে হতে চায়। আবার কখনও কাবুলিওয়ালার মিনি বা মেওয়াওয়ালা সাজতে চায়। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবরুদ্ধ কল্পনার প্রকাশে সাহায্য করার প্রয়োজনে খেলাভিত্তিক চিকিৎসা (Play therapy) গড়ে উঠেছে। নানা ধরনের ছবি, মডেল, প্রদীপন ইত্যাদি মূর্ত জিনিসের সাহায্যে শিক্ষক বিমূর্ত ধারণা শিশুর মনে গড়ে তুলবেন।

মূর্ত থেকে বিমূর্ত বস্তুতে যাওয়া

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা

(২) **কল্পনার বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge of development of**

---

* "মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে
তুমি যাচ্ছ পাল্কিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে
রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোর মেঘ উড়িয়ে আসে।'
... ..
'আজ আমি কানাই মাষ্টার
পোড়ো মোর বেরাল ছানাটি ....'
. ...
"ভাবে শিশু বড় হলে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি যতেক খেলনা।"

Imagination): কল্পনার যথাযথ বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। কল্পনা যদি বাঞ্ছিত পথে এগিয়ে না যায় তাহলে তা অসার বস্তুতে পরিণত হয় এবং শিশুকে অকালপক্ক করে তোলে। এখানে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ এবং অভিজ্ঞতা ও বিচারের আলোকে কল্পনার বিন্যাস ঘটানো উচিত।[1] এজন্যে শিক্ষককে মাঝে মাঝে নানা জাতীয় অভীক্ষা প্রয়োগ করে কল্পনার বিকাশ পরীক্ষা করা উচিত। চিত্র সম্পূর্ণকরণ (Picture completion), বাক্য সম্পূর্ণকরণ (Sentence Completion) বা রর্শার কালির ছাপ অভীক্ষা (Rorschach Ink-blot Test) বা কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ অভীক্ষা (Thematic Apperception Test) ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুষ্ঠু কল্পনার বিকাশ

(৩) **অবাস্তব কল্পনা নিয়ন্ত্রণ করা ও শিল্পকলা শিক্ষণ** (Control of absurd imagination and Training in art and craft): শিল্প ও নান্দনিক শিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিশুদের অবাস্তব কল্পনার গতিপথ পরিবর্তিত করা যেতে পারে। তাই তাদের বয়স ও ক্ষমতা অনুসারে ছবি আঁকা, বিভিন্ন প্রকার আকৃতি (Design) গড়া, পুতুল তৈরী করা, নাচগান, হাতের লেখা অভ্যাস করা বা গল্প লিখতে দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়ে লিখিত এবং কথ্য ভাষার মধ্য দিয়ে বালকবালিকাকে তার কল্পনার রূপ দিতে বলা দরকার। কেবলমাত্র পঠিত বিষয়বস্তুর পুনরুল্লেখ না করে তার নিজস্ব কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিজ্ঞতানুসারী চিন্তাবিকাশে সাহায্য করা প্রয়োজন। শিশুর কল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতে গেলে তার মনে ছন্দ, সুষমা, লালিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। এজন্যে নাচ, গান, ছবি আঁকা প্রভৃতি নানা শিল্পকলা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া দরকার। তার কল্পনাকে উন্নততর করার আর একটা উপায় হল কলাসৌন্দর্য উপভোগ ও কলাশিল্পের সমালোচনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে তাকে সাহায্য করা। এর দ্বারা তার আবেগ ও যুক্তি দুটোই পরিশীলিত হতে পারে। শিল্প-শিক্ষার মধ্যে দিয়েই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যা উন্নততর, যা শ্রেয়ঃ, যা উৎকৃষ্ট তার সঙ্গে পরিচয় ঘটানো যায়। সৌন্দর্য-কল্পনাকে বিকশিত করার জন্যে শ্রেণীকক্ষ সাজানো, নানা উৎসবানুষ্ঠানে বিদ্যালয় গৃহকে সাজানো, হলঘরে আলপনা দেওয়া, বিদ্যালয়ের বাগান তৈরী করা প্রভৃতি কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।

সঙ্গীত, শিল্পকলা, সৌন্দর্য শিক্ষা

(৪) **স্মৃতি ভারাক্রান্ত বক্তৃতা বর্জন করে কল্পনাবিকাশের সুযোগ দিতে হবে** (Avoidance of memory taxing lecture and scope for

1. তুলনীয়: 'Uncontrolled by experience and judgement, a child's imagination runs riot in fancy'. —Dexter & Garlick—Psychology in the School room.

development of imagination) : ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ও কলাশিক্ষকদের স্মরণে রাখতে হবে যে উল্লিখিত বিষয়সমূহ শিক্ষার্থীদের কল্পনাবিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করে। তাই এ সমস্ত বিষয়গুলোর সাহায্যে ধীরে ধীরে কাছের জিনিস থেকে দূরের জিনিসে (from known to unknown) যেতে হবে। অনাবশ্যক বক্তৃতা দিয়ে তাদের মন ভরানোর চেয়ে, ক্রিয়াশীল কাজের মধ্যে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। সত্য শিব ও সুন্দরের আদর্শকে তাদের সামনে তুলে ধরার কাজটুকুই শিক্ষকের। শিক্ষার্থীদের কাজ হল এই আদর্শকে সামনে রেখে তাদের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করা। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতা না থেকে সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠার যোগ্যতা অর্জনের প্রেরণা যেন পায়।

সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ প্রতিষ্ঠা

একাদশ অধ্যায়

চিন্তন

(Thinking)

১। চিন্তার রূপ (Nature of Thinking) :

'চিন্তা' শব্দটি ব্যাপক এবং সংকীর্ণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে 'চিন্তা' 'শব্দটি প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় অবধারণ এবং যুক্তিপদ্ধতি—সবগুলোকেই বোঝায়। সংকীর্ণ অর্থে 'চিন্তা' শব্দটি কেবলমাত্র সামান্য ধারণা, অবধারণ এবং যুক্তিপদ্ধতি এই তিনটিকেই বোঝায়। সংকীর্ণ অর্থে চিন্তন প্রক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি কোন বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্টভাবে অবধারণ করার জন্য বা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য যে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে থাকি তাকে। এই অর্থে চিন্তন-প্রক্রিয়া হল আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করা; বিশেষ বা সীমিত অভিজ্ঞতার সুদৃঢ় গণ্ডী অতিক্রম করে তার মধ্যে যে সাধারণতা বা সার্বিকতা (universality) আছে তাকে প্রত্যক্ষ করা; দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে, দূরবর্তী অতীত, অপ্রত্যক্ষগোচর বর্তমান এবং সুদূর ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে এই জগতের এক সুসংহত ও সুসম্বদ্ধ জ্ঞান লাভ করা।

'চিন্তা' শব্দটির ব্যাপক এবং সংকীর্ণ অর্থ

চিন্তার তিনটি দিক আছে। অর্জনমূলক (acquisitive), সংরক্ষণমূলক (preservative) এবং সংগঠনমূলক (constructive)। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ সাহায্যে চিন্তার উপাদান সংগৃহীত বা অর্জিত হয়, স্মৃতিতে ও কল্পনাতে এই সংগৃহীত উপাদান সংরক্ষিত হয় এবং সামান্য ধারণা, অবধারণ, যুক্তি প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া চিন্তার সংগঠনমূলক দিকটি প্রকাশ করে।

চিন্তনের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা আমাদের চিন্তার যথার্থ স্বরূপকে বুঝে নিতে এবং প্রত্যক্ষণ ও কল্পনা থেকে চিন্তার পার্থক্য নির্ধারণ করতে সহায়তা করবে।

চিন্তার বৈশিষ্ট্য

(ক) **চিন্তা হল সাধারণ (General)**: চিন্তা বিষয়বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে অবধারণ করতে চায়। চিন্তা 'বিশেষ' অপেক্ষা 'জাতি' বা 'শ্রেণী-(Class)' নিয়ে অধিক আলোচনা করে। প্রত্যক্ষণ এবং স্মৃতির কাজ হল বিশেষকে নিয়ে। আমরা বিশেষ বস্তুকে (Particular object) ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় প্রত্যক্ষ করি বা স্মৃতির সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুর কথা মনে পুনরুজ্জীবিত করে তুলি। কিন্তু 'চিন্তা', বিশেষের মধ্যে যে সার্বিকতা বোধ নিহিত আছে তাকেই

অবধারণ করে। যেমন, কোন বিশেষ মানুষকে আমি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি কিংবা কোন বিশেষ মানুষের প্রতিরূপ মনের সামনে তুলে ধরি। কিন্তু আমরা 'মানুষ' এই সামান্য ধারণা সম্পর্কে 'চিন্তা' করি এবং অনুধাবন করি যে, মানুষ 'বুদ্ধিবৃত্তি' ও 'জীববৃত্তি'—এই দুই গুণের সংমিশ্রণ।

(খ) **চিন্তা ভাবের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়** (Thought is ideational): প্রত্যক্ষণের জন্য বস্তুর উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু চিন্তা ভাবের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয়। কিন্তু চিন্তা করার সময় বাহ্যবস্তুর বর্তমান পরিস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই, পূর্বলব্ধ ধারণা বা ভাব এবং প্রতিরূপের সাহায্যেই চিন্তন প্রক্রিয়া সম্ভব। এই ভাব হল কোন কিছুর প্রতীক (Symbol)।

(গ) **চিন্তনের বিষয়বস্তু হল বিমূর্ত** (Thought is abstract): মূর্ত বস্তু সম্পর্কেই প্রত্যক্ষণ এবং স্মৃতি সম্ভব। 'সাহসিকতা' এই গুণটিকে প্রত্যক্ষণ করা বা এর কোন স্মৃতি প্রতিরূপ মনের মধ্যে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কোন সাহসী ব্যক্তির সাহসিকতাকে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে 'সাহসিকতা' এই গুণ সম্পর্কে চিন্তা করা সম্ভব।

(ঘ) **'চিন্তা' বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক** (Thought is analytical and synthetical): চিন্তার দুটি দিক আছে—বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ। চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা কোন একটি বস্তুর গুণকে সেই বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ করি। যেমন, আমরা টেবিলের দৈর্ঘ্যকে টেবিল থেকে আলাদা করে চিন্তা করতে পারি। চিন্তার সংশ্লেষণমূলক দিক হল কোন বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা বা বিভিন্ন বস্তুকে তাদের সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্যের ভিত্তিতে পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে অবধারণ করা।

(ঙ) **চিন্তা হল সক্রিয় অবধারণ প্রক্রিয়া** (Thought is the most active form of knowing): প্রত্যক্ষণ এবং কল্পনার ক্ষেত্রে মন সক্রিয়, কারণ প্রত্যক্ষণ এবং কল্পনার বেলায়ও আমাদের মনোযোগী হতে হয়। কিন্তু চিন্তার বেলায় আমাদের বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করতে হয়। সততা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বিমূর্ত ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে চিন্তার এই সক্রিয়তার দিকটি খুব সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

(চ) **চিন্তা ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়** (Thinking requires the medium of language): প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি এবং কল্পনা ভাষা-নির্ভর নয়, কিন্তু

সংকীর্ণ অর্থে চিন্তা বলতে আমরা বুঝি সামান্য ধারণা, অবধারণ এবং যুক্তি পদ্ধতি। ভাষা ছাড়া এই সব প্রক্রিয়া কখনও সম্ভব হয় না। মনে মনে যখন আমরা কোন যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই তখন আমরা অনুচ্চারিত শব্দের সহায়তা গ্রহণ করি।[1]

(ছ) **চিন্তা হল উদ্দেশ্যমূলক** (Thought is purposive) : চিন্তা উদ্দেশ্যমূলক। চিন্তার উদ্দেশ্য হল জ্ঞান লাভ করা—কোন সমস্যার সমাধান করে ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধন করা।

২। চিন্তন কার্যের বাহন (Tools of Thinking) :

যে যে বিষয়কে আশ্রয় করে চিন্তন কার্য সাধিত হয় সেগুলো হল চিন্তন কার্যের বাহন। এই বাহন নানা প্রকারের হতে পারে; যথা—(ক) **প্রত্যক্ষরূপ** (Percept) (খ) **প্রত্যয়** (Concept), (গ) **অবধারণ** (Judgment) এবং (ঘ) **প্রতীক ও সঙ্কেত** (Symbols and Signs)।

(ক) **প্রত্যক্ষরূপ** (Percept) : যা প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু তাকেই আমরা প্রত্যক্ষরূপ বলি। বাহ্য জগতের বিভিন্ন বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু সেহেতু এগুলো প্রত্যক্ষরূপ। এই প্রত্যক্ষরূপগুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের মনে নানা ধরনের চিন্তা উদ্ভূত হয়। বাহ্য জগতের বিভিন্ন বস্তু হল বিশেষ এবং মূর্ত।

(খ) **প্রত্যয়** (Concept) : চিন্তন ক্রিয়া কেবলমাত্র বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয় না, প্রত্যয় বা সামান্য ধারণাকে কেন্দ্র করেও চিন্তনকার্য সাধিত হয়। যেমন, 'সাধুতা,' 'মানুষ', 'ফুল,' 'কর্ম,' ইত্যাদি। এই প্রত্যয় ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে হতে পারে বা পদের গুণ, ক্রিয়া এবং সম্পর্ক সম্বন্ধেও হতে পারে। যে পদের দ্বারা আমরা একটা জাতি এবং তার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণ বা গুণাবলীকে বুঝি তাকেই প্রত্যয় বলে। যেমন, 'মানুষ'; মানুষ বলতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং মানুষ পদের অন্তর্ভুক্ত 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি' এই দুই গুরুত্বপূর্ণ গুণকে বুঝি।

(গ) **অবধারণ** (Judgment) : প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রত্যয়ের সম্বন্ধ হল অবধারণ। 'মানুষ হয় মরণশীল' এটি একটি অবধারণ। অবধারণ চিন্তার বাহন। 'সকল মানুষ হয় মরণশীল,' 'রাম হয় একজন মানুষ,' সুতরাং 'রাম হয় মরণশীল'-এই চিন্তন পূর্বোক্ত তিনটি অবধারণ দ্বারা গঠিত।

(ঘ) **প্রতীক এবং সঙ্কেত চিহ্ন** (Symbols and signs) : আমাদের চিন্তন কার্য কতকগুলো প্রতীককে আশ্রয় করে সম্পন্ন হয়। আসল বস্তুটি যখন

1. তুলনীয় : 'Thinking is sub vocal talk.'

উপস্থিত নেই, তখন অন্য কোন বস্তুকে তার জায়গায় উপস্থাপিত করে আমাদের চিন্তন কার্যে অগ্রসর হতে থাকে। একেই আমরা প্রতীক নামে অভিহিত করি। প্রত্যক্ষ বস্তুর সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে অভিব্যক্ত করাই প্রতীকের কাজ। মনোবিদ্ উডওয়ার্থ এবং মারকুাইস্ *Woodworth and Marquis*-এর ভাষায় ('···symbols, which are present objects used to stand for absent objects')। যেমন, কোন দুর্ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলি, "মনে কর, আমার এই বইটা একটা মোটর গাড়ী আর ওপাশের ঐ বইটা আর একটা মোটরগাড়ী।" এখানে মোটর গাড়ীর জায়গায় বইকে আমি মোটর গাড়ীর প্রতীক রূপে ব্যবহার করছি। বস্তুকে অনুধাবন করার জন্য আমরা প্রতীকের ব্যবহার করি। ভাষার ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলি কোন বস্তু বা ভাবের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য 'শব্দ' সঙ্কেত চিহ্নরূপেও ব্যবহৃত হতে পারে ; যখন 'রাম' এই নামে রামকে ডাকি তখন রাম সাড়া দেয়। অনেক সময় রেখাচিত্র Diagram) প্রতীকের কাজ করে।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। যেমন, 'পদক', বিজয়ীর সম্মানের প্রতীক, আবার বিদ্যালয়ে ছাত্রকে যখন 'গাধার টুপি' পরানো হয় তখন সেই গাধার টুপি, মূর্খতার প্রতীক। লাল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আলোকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করে বড় বড় শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

প্রতীক এক হিসেবে সংকেত-চিহ্ন, কিন্তু প্রতীক ছাড়াও আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত কতকগুলো সঙ্কেত চিহ্ন (Signs) আমাদের চিন্তার বাহনরূপে কাজ করে। যেমন, দূরে পাহাড়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে অনুমান করি যে পাহাড়ে আগুন আছে। এখানে ধোঁয়া হল সাঙ্কেতিক-চিহ্ন (Sign) যা আগুনের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। প্রত্যক্ষ ধূম হল অপ্রত্যক্ষ আগুনের প্রতীক। ঘরের মধ্যে কান্না শুনলে আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারি যে সেখানে কোন মানুষ আছে।

সঙ্কেত-চিহ্ন বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সম্ভাবনা নির্দেশ করে, প্রতীক বস্তুকে অনুধাবন করতে সহায়তা করে। সব প্রতীকই সঙ্কেত-চিহ্ন। কিন্তু সব সঙ্কেত-চিহ্ন প্রতীক নয়। ভ্রূকুটি, গর্জন, বদ্ধমুষ্টি প্রভৃতি ক্রোধের সংকেত-চিহ্ন, প্রতীক নয়। কিন্তু বন্ধুকে দেওয়া আমার আঙটিটি আমার ভালবাসার প্রতীক। সঙ্কেত-চিহ্ন বস্তু নির্দেশ করে, প্রতীক সেই বস্তুকে বুঝতে বা ধারণা করতে সহায়তা করে। 'শব্দকে' (Word) সঙ্কেত এবং প্রতীক উভয়ভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে তা বলে

সঙ্কেত-চিহ্ন ও প্রতীকের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই, তা নয়। 'রাম' এই নামটি রাম নামধারী ব্যক্তির প্রতীক, আর এই নাম ধরে যখন রামকে ডাকি, তখন এটি একটি সঙ্কেত-চিহ্নের কাজ করে।

সঙ্কেত-চিহ্ন হল কোন কাজ করার ইঙ্গিত বা কোন কাজ করার নির্দেশের ইঙ্গিত। প্রতীক হল চিন্তনক্রিয়ার বাহন।

৩। চিন্তা এবং ভাষা (Thought and Language) ঃ

আমাদের চিন্তা সাধারণতঃ ভাষায় প্রকাশিত হয়, সে কারণে ভাষাই হল চিন্তার বাহন। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভাষা কি ? ভাষা হল কতকগুলো প্রতীকের সুবিন্যস্ত রূপ (Language is a system of symbols)। এই প্রতীক দুপ্রকারের হতে পারে : (১) ভাবভঙ্গী, (২) লিখিত এবং কথা ভাষা। আদিমকালে মানুষ ভাবভঙ্গীর সাহায্যেই নিজের মনোভাবকে প্রকাশ করত। বর্তমান যুগেও অসভ্য জাতির মধ্যে ভাবভঙ্গীর সাহায্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অনেক সময় বিদেশীর কাছে আমরা অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে নিজেদের মনোভাবকে প্রকাশ করি। শিশু, মূকবধির প্রভৃতি ভাবভঙ্গীর সাহায্যে নিজেদের মনোভাবকে প্রকাশ করে। কিন্তু অর্থপূর্ণ শব্দের সাহায্যে বা সেই শব্দের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত লিপি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশের পদ্ধতিই বর্তমানে প্রচলিত। ভাষা লিখিত এবং কথা (written and spoken) উভয় প্রকারই হতে পারে। ভাষাতে যে অর্থপূর্ণ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো কতকগুলো ভাবের প্রতীক। কাজেই ভাষার সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক আলোচনা করার সময় আমরা ভাষাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার না করে, তাকে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ কথা ও লেখা ভাষাকেই বুঝি।

ভাষা প্রতীকের সুবিন্যস্ত রূপ

ভাষা দু প্রকার—ভাবভঙ্গী এবং লিখিত বা কথাভাষা

ভাষার প্রধান কাজ হল চিন্তাকে প্রকাশ করা ও চিন্তার আদান প্রদান সম্ভব করে তোলা। ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের মনোভাবকে অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারি। আমরা মনে মনে যাই চিন্তা করি না কেন, আমাদের চিন্তাকে অপরের বোধগম্য করে তোলার জন্য তাকে ভাষায় প্রকাশ করা দরকার।

---

1. The sign is something to act upon, or a means to command action, the symbol is an instrument of thought. —Langer : Philosophy in a New Key, Page 63.

আবার ভাষা আছে বলেই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে চিন্তার আদান প্রদান করতে পারে। সুতরাং ভাষার ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় প্রকার মূল্য আছে। ভাষার সহায়তায় জটিল বিষয়কে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। ভাষার সাহায্যে সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় গঠন করা যায়। ভাষার সহায়তায় চিন্তার পদ্ধতিকে সংক্ষিপ্ত করা যায়।

ভাষার প্রধান কাজ চিন্তার প্রকাশ এবং চিন্তার আদান প্রদান

ভাষা চিন্তাকে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করে। শিক্ষককে যখন পাঠ্য বিষয় ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হয় তখন তাঁকে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করে নিতে হয়। প্রথমে চিন্তা তারপর ভাষার মাধ্যমে চিন্তার প্রকাশ। চিন্তা না থাকলে ভাষা কাকে প্রকাশ করবে ? এছাড়াও ভাষা চিন্তন ক্রিয়াকে নানাভাবে সহায়তা করে। যুক্তিতর্ক, বিষয়ের বিচার ও আলোচনা, চিন্তিত বিষয়ের বর্ণনা প্রভৃতি ভাষার সহায়তায় অল্প সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়।

ভাষা চিন্তাকে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করে তোলে

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লিখিত ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থের মধ্যে মানুষের চিন্তাধারাকে সংরক্ষিত করা হয় এবং এই গ্রন্থগুলোই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। এই সব গ্রন্থ পাঠ করে আমরা অনেক মনীষীর চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসি ; আবার অনুরূপ ভাবে গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের চিন্তা অপরের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজনীয়তা

ভাষা সুসংবদ্ধ চিন্তন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করতে গেলে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার একান্ত প্রয়োজন এবং ভাষার মাধ্যমে এই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

ভাষা সুসংবদ্ধ চিন্তন প্রক্রিয়ার সহায়তা করে

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ভাষা ছাড়া চিন্তন সম্ভব কিনা ? প্রত্যক্ষণ এবং কিছুমাত্রায় 'স্মৃতি ও কল্পনা ছাড়া সম্ভব হলেও সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় সম্পর্কীয় চিন্তন (Conceptual thought) ভাষা ছাড়া সম্ভব নয়।

প্রত্যয় সম্পর্কীয় চিন্তন ভাষা ছাড়া সম্ভব নয়।

একারণে অনেকে মনে করেন যে, চিন্তা এবং ভাষা বুঝি একই বিষয়। মনোবিদ্ ওয়াটসন্-এর মতে চিন্তন হল মনে মনে কথা বলা (thought is the same as inner speech), চিন্তন হল অস্পষ্ট এবং অনুচ্চারিত ভাষার ব্যবহার। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁরা বলেন, যে কোন ব্যক্তিই স্বীকার করবে যে, যখন সে কোন কঠিন

সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে তখন সে মনে মনে কথা বলতে থাকে। যদি সে একাকী থাকে তাহলে অঙ্গভঙ্গী করে। জোরে জোরে কথা বলাও তার পক্ষে এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। এই সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, চিন্তা এবং ভাষা সমব্যাপক এবং চিন্তন-প্রক্রিয়া মনে মনে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কারও কারও মতে চিন্তন হল মনে মনে কথা বলা

কিন্তু পূর্বোক্ত অভিমত যুক্তিসঙ্গত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চিন্তা করার সময় আমরা মনে মনে কথা বলি, কিন্তু তাই বলে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে না যে, 'চিন্তা' ও 'মনে মনে কথা বলা' সমব্যাপক। অনেক সময় দেখা যায় মনের চিন্তা প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা আমরা খুঁজে পাই না। চিন্তন-ক্রিয়া যখন দ্রুত চলতে থাকে তখনও তার দৈন্য আমরা উপলব্ধি করি। অনেক সময়ে কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলেও তার নাম অর্থাৎ তার ভাষারূপ আমরা স্মরণ করতে পারি না। সময় সময় আমরা কোন বিষয় না বুঝেও তা আবৃত্তি করে যেতে পারি। আবার কোন একটি বিষয় ভাষায় প্রকাশ করার সময় আমরা অন্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। অনেক সময় কোন একটি বিশেষ শব্দের অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা উপযুক্ত শব্দটি খুঁজে পাই না। এর থেকে বোঝা যায় চিন্তা ভাষার পূর্বগামী—কোন মতেই তার সঙ্গে অভিন্ন নয়। সুতরাং চিন্তা = ভাষা, একথা বলা চলে না। তাহলে ভাষা = চিন্তন—এই সমীকরণ স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু এ সত্য নয়। একেবারে চিন্তা না করে বিদেশী ভাষায় লিখিত কোন কবিতা আবৃত্তি করা সম্ভব নয়। মনোবিদ্ উডওয়ার্থের মতে, চিন্তা = মনে মনে মনে কথা বলা, এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। ন্যায় অনুমানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভাষা অনেক সময় সুস্পষ্ট চিন্তার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। উপযুক্ত শব্দের অভাবের জন্যই আমাদের রেখাচিত্রের (diagram) সাহায্য নিতে হয়। ভৌগোলিককে মানচিত্রের এবং ইঞ্জিনিয়ারকে ব্লু-প্রিন্টের (ফটোগ্রাফের সাহায্যে মুদ্রিত নকশা) সাহায্যে নিতে হয়। এগুলো নিঃসন্দেহে প্রতীক, কিন্তু এই প্রতীকগুলোকে বস্তুগত ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যবহার করা হয়, ভাষার নিয়মকানুনের দিকে লক্ষ্য রেখে নয়। ভাষা হল কতকগুলি সংকেত-চিহ্নের সমন্বয় এবং চিন্তা এই সব সঙ্কেতের অর্থ নির্ধারণ করে।

চিন্তা এবং ভাষা সমব্যাপক—এই অভিমতের সমালোচনা

৪। শিশুদের ভাষার বিকাশ (Development of Language in children) :

ভাষার বিকাশের সঙ্গে যেহেতু মানসিক বিকাশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রয়েছে,

সেহেতু পিতামাতা এবং শিক্ষক শিক্ষিকাকে শিশুর ভাষার বিকাশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, শিশুর ভাষার বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে এবং এই ব্যাপারে তার কোন সাহায্যের বা নির্দেশের প্রয়োজন নেই। শিশুর ভাষা জ্ঞান ধীরে ধীরে উন্নত হয়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে শিশুর অণুকরণপ্রবৃত্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশু প্রথমে যে শব্দগুলো প্রায়ই শোনে, সেগুলো উচ্চারণ করে। সুরুতে শিশু কতকগুলো অর্থহীন অক্ষর বা শব্দ উচ্চারণ করে এবং তার মাধ্যমে অপরের কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে চায়। যদিও এই সব অক্ষর বা শব্দের সঙ্গে তার প্রকাশিত মনোভাবের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, তবু সে সেগুলোর ব্যবহার করে।

শিশুর ভাষার বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে

ছোট ছোট শিশু অনেক সময় অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করে। যদিও শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সে অবহিত নয়. অণুকরণবৃত্তির সাহায্যেই শিশু এইজাতীয় শব্দগুলোর শিক্ষা করে। কোন শিশু হয়ত পর পর ১, ২, ৩, গুণতে পারে না, কিন্তু তার সামনে যদি ১৫, ১৬, ১৭ বলা হয় সে ১৮, ১৯, ২০ পর পর বলে যেতে পারে আসলে অর্থ না বুঝে অণুকরণের সাহায্যে সে এই সংখ্যা আবৃত্তি শিক্ষা করেছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সব শিশুর মধ্যে ভাষার বিকাশ একই সময়ে ঘটে না, ভাষার বিকাশের ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন শিশুর মধ্যে বছরখানেকের মধ্যেই ভাষার সন্তোষ-জনক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আবার দু-তিনবছর কেটে যাবার পরেও কোন কোন শিশুর মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায় না।

ভাষার বিকাশে অণুকরণবৃত্তির গুরুত্ব

ভাষার বিকাশ একই গতিতে এগিয়ে চলে না। কিছুদিন ধরে ভাষার বিকাশে সন্তোষজনক উন্নতি দেখা গেল। তারপর এই গতি যখন একটু ধীরে হয়ে আসে তখন মনে হয় যে ভাষার বিকাশ হয়ত রুদ্ধ হল, কিন্তু তা নয়। মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অণুকরণে বেশী পটু, কাজেই ছেলেদের তুলনায় তারা দ্রুত ভাষা শিক্ষা করতে সমর্থ হয়। আবার প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় এই অণুকরণবৃত্তি শিশুদের মধ্যে অধিক। শিশুরা সমবয়সীদের বিশেষ করে অণুকরণ করে থাকে। কোন শিশু তার সমবয়সী কোন সঙ্গী পেলে, খুব তাড়াতাড়ি ভাষা শিক্ষা করতে পারে। কিন্তু সঙ্গীর অভাব ঘটলে তার ভাষা শিক্ষা ক্ষমতা তেমন সন্তোষজনকভাবে বিকশিত হয় না। শিশুর ভাষার বিকাশ যদি ব্যাহত হয় তাহলে তার মানসিক বিকাশও ব্যাহত

হয়। কাজেই শিক্ষক ও পিতামাতার শিশুকে ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা দরকার। শিশু দিনে অনেক শব্দ শিক্ষা করে, কিন্তু তার সবগুলিই সে মনে করে রাখতে চায় না। যে শব্দগুলোর প্রতি সে আকর্ষণ বোধ করে সেগুলোই সে শিক্ষা করে, আকার-ইঙ্গিত বা অংগভংগী এবং সংকেত চিত্রের সাহায্যে শিশুর ভাষা-বিকাশ দ্রুত বর্ধিত হয়।

যে শব্দগুলি শিশুর ভাল লাগে সেগুলিই সে শিক্ষা করে

মনোবিদ্‌রা শিশুর ভাষা-বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে কতকগুলি স্তর আবিষ্কার করেন; যে স্তরগুলোর মধ্যে দিয়ে শিশুর ভাষা শিক্ষা এগিয়ে চলে।

শিশুর ভাষা বিকাশে বিভিন্ন স্তর

প্রথম স্তরে শিশু কতকগুলো অক্ষর উচ্চারণ করতে শেখে, যেগুলো অর্থবোধক নয়। প্রথমে সে স্বরবর্ণগুলো উচ্চারণ করতে পারে, তারপর ম এবং ন এবং আরও পরে প এবং ব উচ্চারণ করতে পারে। তারপরে ধীরে ধীরে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলো উচ্চারণ করতে শেখে। এই স্তরে ভাষাশিক্ষার জন্য শিশুর কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। অনেকটা যান্ত্রিকভাবেই শিশু এই অর্থহীন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারে। চার মাস বয়সে শিশু এই জাতীয় অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই স্তরকে প্রতিবর্তক স্তর (Reflex stage) রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রথম স্তরে কতকগুলো অক্ষর উচ্চারণ করতে পারে

দ্বিতীয় স্তরে শিশু অপরের উচ্চারিত শব্দ অনুকরণ করে, সেটি উচ্চারণ করতে শেখে এবং একই শব্দ বার বার উচ্চারণ করে চলে যেমন, মা, মা, মা, মা। এই স্তরে শিশু যে শব্দ বা কথা শোনে তাই আবৃত্তি করে। এই স্তরকে অনুকরণ পুনরাবৃত্তির স্তর (Imitation-Repetition Stage রূপে গণ্য করা হয়।

দ্বিতীয় স্তরে অপরের উচ্চারিত শব্দ অনুকরণ করে

তৃতীয় স্তরে প্রায় এক বছর বয়স থেকে শিশুর শব্দের অর্থবোধ ঘটে। এই সময় শিশু অর্থযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে শিক্ষা করে। এই স্তরে শিশু 'ক্রিয়ার' ব্যবহার করতে পারে না। সে যেসব শব্দ ব্যবহার করে সেগুলো 'বিশেষ্য' (nouns)। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তু শিক্ষা করার স্তর হল এটি। এই সময় শিশু তার চারপাশের বিভিন্ন দ্রব্যের নাম শিক্ষা করে। এই সময় শিশুর সামনে যত অধিক বস্তু উপস্থিত করা হবে, তার শব্দভাণ্ডারও তত বেড়ে যাবে। এই স্তরকে অর্থবোধের স্তর (Comprehension stage) রূপে অভিহিত করা হয়।

তৃতীয় স্তর হল অর্থবোধের স্তর

চতুর্থ স্তরে শিশুর ভাষার ব্যবহারে বিশেষ সচেতনতা দেখা যায়। শিশু বিশেষ শব্দের সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুকে সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং তার মনের

ভাব প্রকাশ করতে পারে। দেড় বৎসর বয়স থেকে শিশু বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে তার অভাব ব্যক্ত করতে পারে। যেমন, তৃষ্ণা পেলে সে বলে 'জল'। এই স্তরে শিশু নিজে ভাষা ব্যবহার করতে শেখে এবং অপরের ব্যবহৃত ভাষা বুঝতে পারে। এই স্তরকে বলা যেতে পারে ভাষা-সচেতনতার স্তর (Language Sense Stage)।

চতুর্থ স্তর ভাষা-সচেতনতার স্তর

পঞ্চম স্তরে শিশু ছোট ছোট সরল বাক্য ব্যবহার করতে শেখে। এই স্তরে শিশুর বয়স হয় দুই থেকে চার বৎসর। এই স্তরে শিশু তার বাক্যে ক্রিয়া (verb) এবং বিশেষণ (adjective) ব্যবহার করতে শেখে। সাধারণতঃ তার ব্যবহৃত বাক্যগুলো তিন চারটি শব্দের দ্বারা গঠিত। যেমন, শিশু বলে, 'আমি দুধ খাব', 'আমি জল খাব'। এই স্তরে শিশুর স্থানকালের জ্ঞান জন্মায়, শিশু বলতে শেখে, 'বাবা বাজারে গেছে', 'তুমি কালকে আসবে ইত্যাদি। এই স্তরকে বাক্য-কথন স্তর (Sentence speaking stage) রূপে অভিহিত করা চলে।

পঞ্চম স্তরে ছোট সরল বাক্য ব্যবহার করতে পারে

ষষ্ঠ স্তরে শুরু হয় চার বছর বয়স থেকে। এই সময় তার মনে বিভিন্ন ধারণা বাসা বাঁধে। শিশু যে কোন ঘটনা দেখে তার কারণ জানতে চায়। সরল বাক্য ব্যবহার ছাড়াও সে বিমূর্ত শব্দ (abstract terms) এবং বড় বড় বাক্য ব্যবহার করতে শেখে।

ষষ্ঠ স্তরে শিশু বিমূর্ত শব্দের ব্যবহার শিক্ষা করে

শিশুর **পঠন ও লিখনের** (Reading and writing) **স্তর** শুরু হয় ছয় বছর বয়স থেকে। তবে সমাজের প্রচলিত প্রথা বা নিয়মের উপর এই সময় নির্ভর করে।

শেষ স্তর, পঠন ও লিখনের স্তর

৫। কল্পনা ও চিন্তনের সম্বন্ধ (Relation of Imagination to Thought) :

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, নতুন ভাবে তাকে সাজিয়ে যখন একটা নতুন চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় তাকে বলা হয় কল্পনা। চিন্তন হল প্রতীকের (symbol) মাধ্যমে ক্রিয়া করা। মান্ (*Munn*) এর কথায় "চিন্তন হল ভেতর থেকে প্রতীক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জগৎটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করা।" প্রতীক বলতে কি বুঝায়? প্রতীক হল সঙ্কেত বা চিহ্ন। বাস্তব জগতে আমি হাত দিয়ে দরজাটা খুলছি। আবার চিন্তার সাহায্যে মনে মনে এই কাজটা করি। মনে মনে যখন ঐ কাজ করি তখন আমি হাত ও দরজার প্রতীকের সাহায্য নিয়ে থাকি, অর্থাৎ হাত ও দরজার প্রতিরূপ

কল্পনা ও চিন্তনের পার্থক্য

(image) মনের সামনে তুলে ধরি। চিন্তন যে প্রতীকের ব্যবহার করে তা নানা প্রকার হতে পারে, যেমন—প্রতিরূপ (image), ধারণা (idea), ভাষা (language) ইত্যাদি।

কল্পনা হল এক ধরনের চিন্তন। কল্পনার ক্ষেত্রে প্রতিরূপগুলোকে (images) আমরা নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করে নতুন ছবি গড়ে তুলি। চিন্তনের ক্ষেত্রেও প্রতিরূপের ব্যবহার করা হয়। তবে প্রতিরূপ ছাড়াও চিন্তন সম্ভব। বিমূর্ত (abstract) চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রতিরূপের ব্যবহার করি না। চিন্তার অন্যতম উপাদান হল ধারণা, আবার ধারণা হল প্রতিরূপ ও তার ব্যাখ্যা। কল্পনা ও চিন্তন উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিরূপের ব্যবহার করা হয়। তবে চিন্তনের ক্ষেত্রে প্রতিরূপ ছাড়াও অন্যান্য প্রতীকের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চিন্তন ও কল্পনার পারস্পরিক নির্ভরতা

চিন্তার জন্য কল্পনার প্রয়োজন হয়। আমরা অনেক সময় নিজেদের কোন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান গ্রহণ করে তাকে নতুন করে সাজিয়ে একটি অভিনব কিছু সৃষ্টি করি যা আমাদের ভবিষ্যৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী। চিন্তার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। কল্পনার ক্ষেত্রে তা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। আমি আমার একটি বই হারিয়েছি; কল্পনায় তাকে একবার এখানে দেখছি. একবার ওখানে দেখছি। কিন্তু কিভাবে হারালাম এই নিয়ে যখন চিন্তা করছি তখন বইটিকে ফিরে পাবার জন্য নানারকম সূত্র মনে মনে অনুসন্ধান করছি।

চিন্তনের ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ

চিন্তার ক্ষেত্রেও অনুষঙ্গ (Association) আছে, কল্পনার ক্ষেত্রেও আছে। কিন্তু চিন্তার, বিশেষ করে যে চিন্তার ভিত্তি যুক্তির উপর, তার ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ভাব বা ধারণার অনুষঙ্গ তা উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত, কল্পনার মতো অবাধ বা উদ্দাম নয়।

চিন্তা ধারণার মাধ্যমে কাজ করে

চিন্তা ধারণার মাধ্যমে কাজ করে। ধারণা বিশেষ (Particular) হতে পারে, সামান্য (General) হতে পারে। একাধিক বিশেষ ধারণা থেকেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সামান্য ধারণা গঠন করি। আবার বিশেষ ধারণাগুলো এক একটি প্রতিরূপ মনে জাগিয়ে তোলে অর্থাৎ প্রতিরূপ থেকেই ধারণার সৃষ্টি, আর এই প্রতিরূপ নিয়েই কল্পনার কাজ।

চিন্তার অন্যতম বাহন হল ভাষা—সে ভাষা উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত উভয়ই হতে পারে। কল্পনার সঙ্গে ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই।

৬। প্রতিরূপহীন চিন্তন কি সম্ভব? (Is imageless thought possible?)ঃ

আমরা যখন চিন্তা করি তখন কি প্রতিরূপের সাহায্যে চিন্তা করি, **না প্রতিরূপ ছাড়াও চিন্তন সম্ভব?**—এই সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে।

প্রতিরূপ ছাড়া চিন্তন কি সম্ভব?

ধারণাবাদী বা প্রত্যয়বাদীদের (Conceptualists) মতে সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়গুলোর কোন প্রতিরূপ নেই। আমরা যখন 'মানুষ' এই সামান্য ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করি তখন আমরা 'মানুষ' এই সামান্য ধারণার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে দুটি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণ অর্থাৎ 'জীববৃত্তি' ও বুদ্ধিবৃত্তি আছে তার কথা চিন্তা করি। কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতিরূপ মনের মানস পটে তুলে ধরবার প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের মূর্তির কথা চিন্তা না করেও আমরা 'মানুষ' এই সামান্য ধারণার কথা চিন্তা করতে পারি।

ধারণাবাদীদের অভিমত

নামবাদীদের (Nominalists) মতে প্রতিরূপ ছাড়া চিন্তন ক্রিয়া সম্ভব নয়। মনের ধারণামাত্রই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর ধারণা। আমরা যখন কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করি তখন আর একটা নাম দিয়ে থাকি এবং এই নামের কথা চিন্তা করলেই সেই নাম যে বস্তুর নির্দেশ করে তার একটা প্রতিরূপ আমাদের মনের সামনে ভেসে ওঠে। নামবাদীদের মতে আসলে সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়ের (Concept) কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের সব ধারণাই বিশেষের (Particular) ধারণা। যখন আমরা 'মানুষ' এই সামান্য ধারণার কথা চিন্তা করি, তখন বিশেষ কোন একটি মানুষের প্রতিরূপ আমাদের মনের মধ্যে জেগে উঠে—সে যে-কোন মানুষের প্রতিরূপ হতে পারে।

নামবাদীদের অভিমত

নামবাদীদের উপরিউক্ত অভিমত নিম্নোক্ত কারণে যুক্তিযুক্ত নয়ঃ

প্রথমতঃ, আমাদের চিন্তা অনেক সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রতিরূপ ছাড়া যদি চিন্তা অসম্ভব হয় তাহলে দ্রুতগতিতে চিন্তা করা কিভাবে সম্ভব?

নামবাদীদের সমালোচনা

দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞান যেসব সার্বিক নিয়ম নিয়ে আলোচনা করে, বা দার্শনিকদের আত্মা, মন, ঈশ্বর সম্পর্কীয় তত্ত্বমূলক চিন্তা বা বিভিন্ন বিজ্ঞানে যেসব মূল নীতিকে স্বীকার্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়—এই জাতীয় বিমূর্ত চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রতিরূপের ব্যবহার করি না।

তৃতীয়তঃ, সামান্য ধারণা চিন্তা করার সময়ও যদি বিশেষ কোন প্রতিরূপের মাধ্যমে চিন্তা করতে হয় তাহলে সামান্য ও বিশেষের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।

চিন্তা করার জন্য প্রতীকের প্রয়োজন হয়। প্রতিরূপ হল একজাতীয় প্রতীক। তবে প্রতিরূপ ছাড়াও আমরা অন্য প্রতীকের সাহায্যে চিন্তা করতে পারি। কুল্পে (*Kulpe*), স্টাউট (*Stout*), বিনে (*Binet*), উডওয়ার্থ (*Woodworth*) প্রভৃতি মনোবিদ্‌গণ প্রতিরূপহীন চিন্তন স্বীকার করেছেন। মনোবিদ্ টিচনার (*Titchner*) প্রতিরূপহীন চিন্তনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।

প্রতিরূপ ছাড়াও চিন্তা করা সম্ভব

৭। প্রত্যয়ের স্বরূপ (Nature of Concept) :

আমরা যেমন বিশেষ বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করি, তেমনি সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়ের সাহায্যেও চিন্তা করি। এখন প্রশ্ন হল, প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: যেমন, 'মানুষ' এবং 'একটি মানুষ'। একটি মানুষ বললে আমরা বিশেষ কোন মানুষের কথা চিন্তা করি—রাম, শ্যাম, যদু, মধু বা হরি যে কোন মানুষের চিন্তা। কিন্তু 'মানুষ' শব্দটির দ্বারা মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি মানুষকেই বুঝি। ব্যক্তিগত ভাবে একজন মানুষ আর একজন মানুষ থেকে যতই পৃথক হোক না কেন 'মানুষ' বলতে আমরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকেই বুঝি। আবার মানুষ বলতে আমরা মানুষের যে দুটি সাধারণ গুণ আছে; যেমন, 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি' তাদেরও বুঝি। কাজেই প্রত্যয় বলতে আমরা একটা জাতির বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা ব্যষ্টিকে বা তাদের যে সাধারণ গুণাবলী আছে তাদের বুঝি। প্রত্যয়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে:

প্রত্যয় কাকে বলে

প্রথমতঃ, প্রত্যয় সংবেদনের বিষয়বস্তু নয়। কেননা, প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগের কোনো প্রশ্ন উঠে না। আমরা ব্যক্তিবিশেষকেই ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু 'মানুষ' এই প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়-সংযোগ সংগঠিত হতে পারে না।

প্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্ মান্ (*Munn*)-এর কথায় 'প্রত্যয়' হল অতীত অভিজ্ঞতার সংক্ষেপণ। বিভিন্ন বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, একটিমাত্র ধারণার সহায়তায় সেগুলো আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষণলব্ধ বিভিন্ন পরস্পর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা চলে। যেমন—বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন স্থানে আমি প্রায়

একই ধরনের কতকগুলো প্রাণী লক্ষ্য করলাম। একটি বিশেষ প্রত্যয়ের সাহায্যে আমি এই প্রাণীর কোন একটি বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে পারি।

চতুর্থতঃ, কোন কোন প্রত্যয় বিনা চেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়। আবার, কোন কোন প্রত্যয় বিচারবুদ্ধির সাহায্যে গঠন করতে হয়।

পঞ্চমতঃ, সব প্রত্যয়েরই যে-কোন বাস্তব ভিত্তি আছে তা নয়। এমন অনেক প্রত্যয় আমরা ব্যবহার করি, যেগুলোর কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই ; যেমন—মৎস্যকন্যা, পরী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাক্ষস, ভূত, প্রেত ইত্যাদি।

ষষ্ঠতঃ, কেবলমাত্র বস্তু এবং ব্যক্তিরই যে প্রত্যয় হয়, তা নয়, তাদের গুণ, ক্রিয়া এবং পারস্পরিক সম্বন্ধেরও প্রত্যয় হয়।[1]

সর্বশেষে, কোন বস্তুর প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বীকৃত সংজ্ঞার সর্ব বিষয়ে মিল নাও থাকতে পারে। কারণ আমাদের প্রত্যয় অনেক সময় বস্তুর সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণের দিকে লক্ষ্য না রেখে আমাদের জ্ঞান, বিশ্বাস এবং মানসিক প্রবণতার ভিত্তিতে গঠিত হয়। সে কারণে কোন একটি বিশেষ প্রত্যয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, এক একজন এক এক রকম ধারণার মাধ্যমে সেই প্রত্যয়ের অর্থ ব্যাখ্যা করে থাকে

৮। প্রত্যয় কিভাবে গঠিত হয়? (How Concepts are formed ?) :

প্রত্যয় দুভাবে গঠিত হতে পারে—(১) বিনা চেষ্টায় বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রত্যয় সংগঠিত হতে পারে, বা (২) প্রচেষ্টার সাহায্যে অর্থাৎ বিচার বিবেচনার সাহায্যে প্রত্যয় গঠিত হতে পারে। লৌকিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রত্যয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা বিনা চেষ্টাতেই গঠিত হয় এবং বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ক্ষেত্রে প্রত্যয় বিচার বিবেচনার উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি মনোবিজ্ঞানসম্মত। কারণ এই প্রক্রিয়াটি মানুষের মনে কিভাবে প্রত্যয় গঠিত হয় তা নির্দেশ করে। দ্বিতীয় ধরনে প্রক্রিয়াটি হল যুক্তিশাস্ত্রসম্মত। কেননা, এই প্রক্রিয়া প্রত্যয় কিভাবে গঠিত হওয়া উচিত তা নির্দেশ করে

প্রত্যয় গঠনের বিভিন্ন স্তর

(ক) আমরা দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি সম্পর্কেই আলোচনা করব। প্রত্যয় গঠনের ব্যাপারে নিম্নলিখিত স্তরগুলো উল্লেখযোগ্য :

(i) **পর্যবেক্ষণ (Observation) :** কয়েকটি বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করা।

---

1. 'There are concepts not only of things and persons but also of their qualities, actions and inter-relations.'
—Woodworth and Marquis : Psychology ; Page 591

(ii) **বিশ্লেষণ** (Analysis) : বিভিন্ন ব্যক্তির গুণগুলো বিশ্লেষণ করা, যেমন—কোন ব্যক্তির মধ্যে আছে জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, সামাজিকতা, ভীরুতা, কারও মধ্যে আছে জীববৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, সদাশয়তা, সাহসিকতা ইত্যাদি।

(iii) **তুলনা** (Comparison) : যেসব ব্যক্তি বা বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করা হল তাদের গুণগুলোর পারস্পরিক তুলনা করা এবং তাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে তা লক্ষ্য করা। যেমন, কয়েকজন মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেল যে, যদিও নানা গুণের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে তবু দুটি গুণের দিক থেকে তাদের মধ্যে মিল আছে। যেমন, 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'।

(iv) **পৃথকীকরণ** (Abstraction) : যে গুণগুলোর দিক থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মিল রয়েছে সেগুলোকে মনে মনে পৃথক করে নেওয়া এবং তার উপর মনোনিবেশ করা। যেমন, পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে মানুষের অন্যান্য গুণের মধ্য থেকে জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আমরা পৃথক করে এই গুণ দুটির উপর মনঃসংযোগ করি।

(v) **সামান্যীকরণ** (Generalisation) : যে গুণগুলো পৃথক করে নেওয়া হল সেগুলো যে কেবলমাত্র যেসব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই উপস্থিত আছে তা নয়, ঐ জাতীয় সমস্ত বস্তুর মধ্যেই উপস্থিত আছে এরূপ অনুমান করা হয়। যেমন, হয়ত একশত জন মানুষকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সকলের মধ্যেই 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'—এই দুই সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণ বর্তমান। অনুমান করতে হবে যে, বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যেই এই গুণ দুটি বর্তমান।

(vi) **নামকরণ** (Naming) : প্রত্যয়টির একটি নাম দিতে হবে, যাতে প্রত্যয়টিকে সহজে মনে রাখা যায়। নামটি হবে, সেই প্রত্যয়টি যে ধারণা নির্দেশ করে, তার প্রতীক (The name seeming as a verbal sign of the idea); যেমন—'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি'—এই দুটি গুণের সমষ্টিকে 'মানুষ' নামে অভিহিত করা হল।

(খ) যেখানে প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা, প্রচেষ্টা ভিন্ন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়, সেখানে নিম্নলিখিত দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায় :

(i) **জাতীয় প্রতিরূপ সংগঠন** (Formation of Generic Image) : যখন একই ধরনের অনেকগুলো বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, যেমন—বিভিন্ন ধরনের গরু, তখন সেই বস্তুগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো মনের উপর গভীর ছাপ মুদ্রিত করে

দেয় এবং বৈসাদৃশ্যগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। এই সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সুস্পষ্ট প্রতিরূপের আকার লাভ করে; একে বলা হয় জাতিগত প্রতিরূপ (Generic Image)। দু একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক্: যেমন—'কলম,' 'কমল,' 'কপট,' 'কখন,' 'কটক'—এই পদগুলো যদি একটি আর একটির উপর লিখিত হয় তাহলে সমস্ত পদগুলোর মধ্যে যে সাধারণ অক্ষর 'ক' আছে, সেটি খুব গভীরভাবে ফুটে উঠবে, অন্য অক্ষরগুলো অস্পষ্ট ও হিজিবিজি হয়ে উঠবে। আরও একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে: এই জাতীয় প্রতিরূপ সংগঠনের বিষয়টিকে ক্যামেরায় একই জাতীয় বিভিন্ন ব্যক্তির ফটো তোলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। যেমন, অপরাধী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত দশজন ব্যক্তির ফটো যদি পর পর একই প্লেটের উপর নেওয়া হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত যে ফটোটি পাওয়া যাবে সেটি দশজনের কোন একজনের ফটো নয়—এমন একটি ছবি যেটি দশজনের মিলিত একটি প্রতিচ্ছবি। সংযুক্ত ফটোগ্রাফ গ্রহণ পদ্ধতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই মতবাদকে 'Composite Photograph Theory' বলা হয়।

জাতিগত প্রতিরূপ সামান্য ধারণা নয়

(ii) কিন্তু জাতিগত প্রতিরূপকেই সামান্য ধারণা বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত হবে না, কেননা জাতিগত প্রতিরূপ এখনও সামান্য ধারণার স্তরে উন্নীত হয় নি। জাতিগত প্রতিরূপ, বিশেষ-প্রতিরূপ (Particular Image) এবং প্রত্যয়ের (Concept) মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত; কেননা জাতিগত প্রতিরূপ কোন বিশেষ প্রতিরূপ নয়; আর প্রতিরূপটি কোন জাতির প্রতিনিধি এরূপ চেতনাও থাকে না। জাতিগত প্রতিরূপটি প্রত্যয়ে পরিবর্তিত হয় যখন অন্যান্য বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বিশেষ একটি বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। যে শিশু কেবলমাত্র সাদা গরু দেখে সে নিষ্ক্রিয়ভাবে এবং অনৈচ্ছিক ভাবে গরুর একটি জাতিগত প্রতিরূপ গঠন করে; কিন্তু যখনই সে একটি কালো রঙের গরু প্রত্যক্ষ করে তখনই সেই বিভিন্ন জন্তুগুলোর সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টির প্রতি তার দৃষ্টি ধাবিত হয় এবং তখনই তুলনা, পৃথকীকরণ, সামান্যীকরণ, নামকরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে প্রত্যয় গঠন করে।

৯। প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা (Use of Concepts):

আমাদের চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যয়ের নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা যেতে পারে:

(i) প্রত্যয়ের মাধ্যমেই চিন্তার মিতব্যয়িতা সংগঠিত হয়, প্রত্যয় মানসিক পরিশ্রম লাঘব করে। অনাবশ্যক বিবরণের বোঝাকে স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখার প্রয়োজন থেকে প্রত্যয় স্মৃতিকে ভারমুক্ত করে। যদি প্রতিবারই আমাদের প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বস্তুকে বিচ্ছিন্ন ভাবে মনে রাখতে হত তাহলে আমাদের মানসিক পরিশ্রমের সীমা থাকত না। কিন্তু বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বস্তুতে পৃথকভাবে মনে না রেখে প্রত্যয়ের মাধ্যমে মনে রাখা অনেক সহজ।

চিন্তার মিতব্যয়িতা

(ii) প্রত্যয় চিন্তার প্রয়োজনীয় বাহন। আমাদের ধারণাগুলোকে প্রত্যয়ের সহায়তায় শ্রেণীবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ করা সহজ হয়। আমরা প্রথমে একটি প্রত্যয়ের সাহায্যে একাধিক বস্তুকে শ্রেণীবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ করি। যেমন, 'গরু'—এই প্রত্যয়ের সাহায্যে ঐ জাতীয় সব জীবকে শ্রেণীভুক্ত করি। আবার ব্যাপকতর একটি প্রত্যয়ের সাহায্যে সংকীর্ণতর অনেকগুলো প্রত্যয়কে সুসংবদ্ধ করি। যেমন, 'প্রাণী' এই পদের সাহায্যে গরু, কুকুর, ছাগল প্রভৃতি সব প্রাণীকেই শ্রেণীভুক্ত করি। এই ভাবে কম ব্যাপকতা বিশিষ্ট প্রত্যয়কে ব্যাপকতর প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করি। আমাদের বিভিন্ন ধারণা যখন এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন জ্ঞানের সংহতি (System of knowledge) রচিত হয়। প্রত্যয় হল শ্রেণীকরণের ভিত্তি।

প্রত্যয় চিন্তাকে শ্রেণীবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ করে

(iii) প্রত্যয় বা সাধারণ ধারণা চিন্তাকে বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অতীত ও ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তাকে প্রসারিত করে। 'মানুষ' এই প্রত্যয়ের সম্পর্ক শুধু বর্তমানে দেখা কয়েকজন মানুষকে নিয়ে নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের সব মানুষকে নিয়ে। প্রত্যয়ের সাহায্যে আমরা বর্তমান ছাড়াও অতীত ও ভবিষ্যৎ মানুষ সম্পর্কে অনেক বিষয় অনুমান করতে পারি।

(iv) যুক্তি বা অনুমান গঠন করতে হলে প্রত্যয় অবশ্যই প্রয়োজনীয়। অনুমানের জন্য প্রয়োজন একাধিক তর্কবাক্য এবং প্রতিটি তর্কবাক্য একাধিক প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠিত হয়।

অনুমানের জন্য প্রত্যয়ের প্রয়োজন

১০। প্রত্যয় এবং প্রত্যক্ষরূপ (Concept and Percept) ঃ

প্রত্যয় এবং প্রত্যক্ষরূপের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় : প্রথমতঃ, প্রত্যয়ের সম্পর্ক জাতি এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলোকে নিয়ে প্রত্যক্ষরূপের সম্পর্ক হল ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে। প্রত্যয় হল সার্বিক এবং বিমূর্ত, প্রত্যক্ষরূপ হল বিশেষ এবং মূর্ত।

প্রত্যয় ও প্রত্যক্ষরূপের মধ্যে পার্থক্য

পূর্বোক্ত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও প্রত্যয় ও প্রত্যক্ষরূপ পরস্পরনির্ভর। প্রত্যয় গঠন করার জন্য বিশেষ বস্তু বা ঘটনার পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। যেমন, শিশু, লাল বাড়ি, লাল কোট, লাল গোপালফুল দেখে 'লাল' এই প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা গঠন করে। আবার প্রত্যয় গঠিত হবার পর প্রত্যক্ষরূপ প্রত্যয়গুলোকে সুস্পষ্ট করে তুলতে এবং তার উপর মনঃসংযোগ করতে সহায়তা করে। যেমন, জ্যামিতির বৃত্ত বা ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করার সময় ত্রিভুজ বা বৃত্তের রেখাচিত্র (Diagram) আমাদের আলোচনাকে বুঝতে সহায়তা করে। 'বিড়াল' এই সামান্য ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে কোন বিশেষ বিড়ালকে পর্যবেক্ষণ করার সময় সেটি বিড়াল কিনা বুঝতে পারি।

প্রত্যয় ও প্রত্যক্ষরূপ পরস্পর নির্ভর

তবু 'প্রত্যয়' এবং 'প্রত্যক্ষরূপ' এক বা অভিন্ন নয়। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে 'সামান্য' বা সার্বিকের (Universal) চেতনা প্রচ্ছন্ন থাকে অর্থাৎ বিশেষের মধ্যে মিশে থাকে, কিন্তু প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার ক্ষেত্রে আমরা সামান্যের কথা সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করি। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রাধান্য আর প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকরণ প্রক্রিয়ার প্রাধান্য। কোন গরুকে প্রত্যক্ষ করার অর্থ তাকে বিড়াল, কুকুর, ছাগল প্রভৃতি জীবজন্তু থেকে পৃথক করে দেখা, কিন্তু 'গরু' এই প্রত্যয় সম্পর্কে ধারণা করার অর্থ বিভিন্ন গরুর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তার সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা।

প্রত্যয় এবং প্রত্যক্ষরূপ অভিন্ন নয়

১১। প্রত্যয় এবং প্রতিরূপ (Concept and Image):

প্রত্যয় এবং প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য আছে, প্রত্যয় হল সার্বিক এবং বিমূর্ত, প্রতিরূপ হল বিশেষ এবং মূর্ত। কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতিরূপ আমাদের মনের সামনে আমরা তুলে ধরতে পারি। কিন্তু আমরা 'মানুষ' এই প্রত্যয় সম্পর্কে চিন্তা করি। প্রত্যয় হল মনের সক্রিয় সৃষ্টি। বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের সাধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলোকে আমরা জানতে চাই; প্রত্যয়ের কোন প্রতিরূপ সম্ভব নয়। আমরা 'মানুষ' সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি, কিন্তু 'মানুষ' এই সামান্য ধারণার কোন প্রতিরূপ গঠন করতে পারি না। সুতরাং কল্পনার (Imagination) তুলনায় সামান্য ধারণা গঠন প্রক্রিয়া উচ্চস্তরের প্রক্রিয়া।

প্রত্যয় এবং প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য

তবে প্রত্যয় এবং প্রতিরূপের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, কি ভাবে বিভিন্ন সদৃশ বস্তুর প্রতিরূপ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতিগত প্রতিরূপ (Generic image) গঠিত হয় এবং তারপর কি ভাবে এই জাতিগত

প্রতিরূপ প্রত্যয়ে পরিবর্তিত হয়। প্রত্যয় গঠন করার সময় জাতিগত প্রতিরূপের প্রয়োজন না হলেও অতীতে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিরূপগুলোর প্রয়োজন হয়, কেননা প্রত্যয় গঠনের একটি স্তরে রয়েছে বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক তুলনা এবং তার জন্য অতীত প্রতিরূপগুলির প্রয়োজন। তাছাড়া, প্রত্যয়গুলোর সুস্পষ্ট উপলব্ধির জন্যও প্রতিরূপের প্রয়োজন। যেমন, 'সাহসিকতা' এই ধারণাটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য আমরা মনের সামনে কোন বিশেষ ব্যক্তির কোন সাহসিকতার কাজের একটা ছবি তুলে ধরতে পারি।

প্রত্যয় এবং প্রতিরূপের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

সুতরাং প্রত্যয়ের চিন্তা করার জন্য প্রতিরূপ ব্যবহার করতেই হবে এমন কথা বলা চলে না। তবে কারও কারও মতে প্রত্যয়ের চিন্তার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রতিরূপ না থাকলেও 'শব্দ-প্রতিরূপ' (Word-image) থাকেই। কোন ধারণা সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় আমরা মনে মনে তার আনুষঙ্গিক শব্দটির পুনরাবৃত্তি করি ; এগুলোই হল শব্দ প্রতিরূপ। কিন্তু মনোবিদ্ স্টাউট-এর মতে এরূপ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমাদের অনেক চিন্তা আছে যেগুলোকে আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না ; বা কোন একটি বই পড়ার পর, গল্প বা গান শোনার পর যখন আমরা সামগ্রিকভাবে একটা ধারণা করি অথচ ভাষার সাহায্যে তাকে প্রকাশ করতে পারি না, তখন সেই জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে স্মৃতি-প্রতিরূপ বা শব্দ-প্রতিরূপ কোনটিই উপস্থিত থাকে না। একেই স্টাউট (*Stout*) বলেছেন বিমূর্ত বা প্রতিরূপহীন চিন্তা (**Imageless thought**)।

প্রত্যয়ের চিন্তা করার জন্য প্রতিরূপের ব্যবহার

সুতরাং বলা যেতে পারে, কোন কোন প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরূপের অস্তিত্ব দেখা যায়। অধিকাংশ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে শব্দ-প্রতিরূপের বা ভাষা-প্রতিরূপের (**Verbal image**) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এবং কোন কোন প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রতিরূপের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

১২। শিশুর প্রত্যয় বা ধারণার বিকাশ (Development of Concept in the Child) :

বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা থেকেই শিশু ধারণা বা প্রত্যয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। লোকের মুখে শিশু শোনে ঘোড়া একটি জন্তু, একটা গরুকে দেখার পরে সে জানতে পারল যে গরুও একটি জন্তু। আবার একটা কুকুরকে দেখার পরে সে শুনল তাকেও সবাই জন্তু বলছে। যদিও তিনটি জন্তু বা প্রাণী প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক তবুও যে তাদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য

খুঁজে পেল, যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর দিক থেকে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিল রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে সে 'জন্তুর' একটা ধারণা মনে মনে তৈরী করে নিল। তারপর যখন সে একটি কুকুর দেখল, তখন সে নিজেই তাকে 'জন্তু' বলে বুঝতে পারল। এইভাবে শিশু তার অভিজ্ঞতায় যেসব বস্তু বা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলো সম্পর্কে ধারণা গঠন করে।

বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান শিশুকে ধারণা গঠনে সাহায্য করে

শিশুকে নির্ভুল প্রত্যয় বা ধারণা গঠন করতে শেখান শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীকে নির্ভুল ধারণা বা প্রত্যয় গঠন করতে শেখানো হয়। ধারণা বা প্রত্যয় গঠনের তিনটি পদ্ধতি আছে, আরোহ পদ্ধতি, অবরোহ পদ্ধতি এবং মিশ্র পদ্ধতি।

আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method): এই পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ বস্তু, ঘটনা বা দৃষ্টান্ত শিশুর সামনে উপস্থিত করা হয় এবং শিশু নিজে নিজে চেষ্টা করেই তার ধারণা গঠন করে। বিভিন্ন বস্তুর পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতা থেকে শিশু সাধারণ অভিজ্ঞতায় (General experience) উপনীত হয় বলে একে আরোহ পদ্ধতি বলা হয়। অবশ্য প্রত্যয় গঠন অন্যান্য শিক্ষার মতনই প্রচেষ্টা ও ভুলের (trial and error) মাধ্যমে শুরু হয়। পরে শিশু তার অন্তর্দৃষ্টির (Insight) সাহায্যে সহজেই ধারণা গঠন করতে পারে।

আরোহ পদ্ধতি

অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method): এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীকে সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতায় উপনীত হতে শিক্ষা দেওয়া হয়। একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো শিশুর কাছে ব্যাখ্যা করার পর তাকে ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে চিনতে সাহায্য করা হয়।

অবরোহ পদ্ধতি

মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Method): আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতি দুটিকে একসঙ্গে যুক্ত করে, একটি মিশ্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ঘটনা শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা হয় এবং সেই সেই বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে অবরোহ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীকেই প্রত্যয় বা ধারণাটিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষার্থী প্রত্যয় সম্পর্কে নির্ভুল ও বাস্তব জ্ঞান লাভ করে।

১৩। বিচারকরণ (Reasoning) ঃ

চিন্তন-প্রক্রিয়ার উন্নত স্তর হল বিচারকরণ। মন যখন সুসংহত হয়, তখনই মনের বিচারকরণের ক্ষমতা আসে। ছোট শিশুর মন সুসংহত নয়, সেকারণে সে উচ্চস্তরের বিচারকরণে সমর্থ হয় না। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যক্তিই কম বেশী বিচার করার ক্ষমতা লাভ করে। কারণ বিচারকরণ হল চিন্তনেরই একটি বিশেষ শ্রেণীমাত্র এবং সব ব্যক্তিই চিন্তা করতে সক্ষম। যখন মন ধারণা এবং সিদ্ধান্ত গঠনে সমর্থ হয়, তখনই উন্নত ধরনের বিচারকরণ সম্ভব হয়।

বিচারকরণ চিন্তনেরই একটি বিশেষ শ্রেণী

বিচারকরণের লক্ষ্য হল নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিবিধান করা এবং একটু উন্নত স্তরে বিচারকরণের লক্ষ্য কোন সমস্যার সমাধান করা। মানুষ যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখনই সে বিচারে প্রবৃত্ত হয়। ডিউই (*Dewey*)-এর মতে কোন সংশয়ের উপস্থিতি এবং কোন কিছু আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বিচারকরণের উদ্ভব। সমস্যা দুভাবে সমাধান করা যেতে পারে—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সাহায্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে অথবা প্রতীকের সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শেষোক্ত পন্থায় সমস্যার সমাধান হল বিচারকরণ।

সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ বিচার করে

বিচারকরণও এক ধরনের শিক্ষা, বিচারকরণের মাধ্যমে কোন সমস্যা সমাধানের পর ব্যক্তি পুরনো আচরণ ধারার পরিবর্তন এনে নতুন আচরণধারা অনুসরণ করে। বিচারকরণের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল প্রক্রিয়া এবং অন্তর্দৃষ্টি দুইই কাজ করে; তবে প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিক্ষা করা এবং বিচারকরণ, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাজে লাগে।

বিচারকরণ এক ধরনের শিক্ষণ

মানুষের মধ্যে বিচার করার ক্ষমতা কিভাবে বিকশিত হয়েছে, মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে তা রহস্যময়। কারও কারও মতে বিচার করার ক্ষমতা মানুষের মনের এক অসাধারণ গুণ। বিচারকরণে মানুষের সংগঠনমূলক কল্পনা ক্রিয়া করে। বিচার করার সময় অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন পরিস্থিতিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করা হয়। নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বিচারকরণের লক্ষ্য। বিচারকরণের ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমানের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা হয়।

ডিউই (*Dewey*)-র মতে বিচারকরণের সময় সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে পাঁচটি

স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রথম স্তরে ব্যক্তি কোন অসুবিধার বা সমস্যার সম্মুখীন হয়। সমস্যা দেখা না দিলে বিচারকরণের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। দ্বিতীয় স্তরে সমস্যাটিকে বা পরিস্থিতিকে যত্ন সহকারে পরীক্ষা করে দেখা হয়। প্রায়ই সমস্যাটিকে এক বা একাধিক অবধারণের (Judgment) মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়। তৃতীয় স্তরে সমস্যাটি সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হয়। সমস্যাটি সমাধানের জন্য ব্যক্তি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তগুলো বা তথ্যগুলো অনুসন্ধান করে এবং এক একটি করে সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখে। চতুর্থ স্তর প্রকল্প (hypohesis) গঠনের স্তর। এই স্তরে ব্যক্তি সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে একটিকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করে। সাময়িকভাবে গৃহীত সমাধান বা তথ্যটিকে প্রকল্প বলা হয়। পঞ্চম স্তরে প্রকল্পটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তার যাথার্থ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই পরীক্ষণের কাজটি সম্পন্ন করা হয় মানসিক স্তরে। যদি সাময়িকভাবে গৃহীত প্রকল্পটির সাহায্যে সমস্যাটির সমাধান সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ঐটিই সমস্যাটির যথার্থ সমাধান। আর যদি ঐ প্রকল্পটি প্রয়োগ করে সমস্যাটির সমাধান না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে প্রকল্পটি ভুল। তখন নতুন একটি সম্ভাব্য সমাধানকে প্রকল্প রূপে গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে। প্রকল্প যথার্থ বলে প্রমাণিত হলে সেটিকে সমস্যা সমাধানের জন্য চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করা হয়।

ডিউই-র মতে সমস্যা সমাধানের পথে পাঁচটি স্তর বর্তমান

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক : বাড়ি ফিরে মা দেখল তার বাচ্চাটি ভীষণ ভাবে কাঁদছে। মার মন অশান্ত হয়ে পড়ল। কেন বাচ্চাটি কাঁদছে, এটিই হল মার কাছে সমস্যা। তখন তিনি শিশুটিকে খুব যত্ন করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য শিশুটির কোন আঘাত লেগেছে কি না বা শিশুটির ক্ষিধে পেয়েছে কি না। তিনি ভালকরে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, শিশুর কোন আঘাত লাগেনি। শিশুকে দুধ খাওয়ালেন, তবু তার কান্না থামল না। তখন তিনি অনুমান করলেন যে শিশুটির পেট ব্যথা করছে। এটিই হল প্রকল্প রচনার স্তর। এরপরে তিনি শিশুটিকে পেট ব্যথার ঔষধ খাইয়ে দিলেন। শিশুটির কান্না একটু পরে থেমে গেল। তখন মা সিদ্ধান্ত করলেন যে পেটে ব্যথার জন্যই শিশু কাঁদছিল। এভাবে ঘটনা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে মা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

অনুমান (Inference) : বিচারকরণের একটা উপায় হল অনুমান প্রক্রিয়া। অনুমান হল জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত তথ্যে উপনীত হওয়া। অনুমান হল

একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা এক বা একাধিক বচনের (proposition) ভিত্তিতে এবং এই এক বা একাধিক বচনের দ্বারা সমর্থিত হয়ে একটি নতুন বচন লাভ করি। ভোরবেলায় ঘরের বাইরে এসে দেখি যে মাটি ভিজে। তখন এই প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত করি যে, 'গতকাল রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছিল।' এখানে জানা তথ্য থেকে অজানা তথ্যে উপনীত হলুম।

অনুমান দুপ্রকার, আরোহ ও অবরোহ। আরোহ অনুমানে (Inductive Reasoning) কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তের উপরে ভিত্তি করে একটি সাধারণ নিয়ম বা সত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার যখন একটি সাধারণ সত্য নিয়ে শুরু করে আমরা বিশেষ দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগ করি তখন সেই অনুমান হল অবরোহ (Deductive)। মা আরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করে তার বাচ্চাটির অসুখের কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন। একটি প্রকল্প গঠন করে সেটি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মা একটি সাধারণ নিয়ম (general principle) নিয়েও শুরু করতে পারতেন যে পেটে ব্যথা হলেই শিশুরা কাঁদে এবং তারপরে তাঁর শিশুর ক্ষেত্রে সেটিকে প্রয়োগ করে প্রমাণ করে দেখতে পারতেন। শেষের পদ্ধতিটি হল অবরোহ পদ্ধতি। আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঘটনার মধ্যে সঠিক সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়।

আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ থেকে সামান্য সত্যে উপনীত হই। অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা একটি সামান্য বচন নিয়ে শুরু করি এবং নতুন দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে সেটিকে প্রয়োগ করে তার যাথার্থ প্রমাণ করার চেষ্টা করে। আরোহ অনুমান আবিষ্কারের পদ্ধতি, অবরোহ অনুমান হল প্রয়োগ এবং প্রমাণের পদ্ধতি। এই দুই পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী নয়, একই যুক্তি পদ্ধতির বা অনুমানের দুটি ভিন্ন দিক।

অবরোহ ও আরোহ একই যুক্তি পদ্ধতির দুটি দিক

অবরোহ অনুমান বা যুক্তি পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমস্যাটি উপস্থিত হয়। আমরা সমস্যাটি সমাধান করতে চাই। সমাধানটি খুঁজে বার করতে গিয়ে আমরা অতীত অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই এবং সন্তোষজনক সমাধানটি পাবার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মটি খুঁজে বার করতে চেষ্টা করি। অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে একটা সাধারণ সত্য গ্রহণ করি এবং তারপরে সেটিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, কিন্তু আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম থেকেই একটি সার্বিক নিয়মকে গ্রহণ করে অগ্রসর হই না। অবরোহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে তথ্যগুলোকে বিশেষ সতর্কতার

সঙ্গে পরীক্ষা করি এবং আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সংগ্রহ করি। তারপরে তাদের শ্রেণীভুক্ত করে একটি সাধারণ নিয়ম গঠন করি। সাধারণ নিয়মটি বা সত্যটি সংগঠন করার পরে আমরা পরীক্ষণের সাহায্যে তার যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষণের ভিত্তিতে একটি নতুন সত্য গঠন করা হয়। অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে যখন সমস্যা সমাধান করতে পারি না, তখনই আরোহ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু যখন অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় তখন আমরা অবরোহ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করি। খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রই আরোহ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয়। কাজেই প্রয়োজন শিক্ষকের পক্ষে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র এই পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণে উৎসাহিত হয়।

আরোহ ও অবরোহের পার্থক্য

১৪। শুদ্ধ চিন্তা এবং অশুদ্ধ চিন্তা (Correct Thinking and Incorrect Thinking) ঃ

আমাদের চিন্তা যখন অভ্যন্তরীণ বিরোধমুক্ত হয় এবং চিন্তার সঙ্গে বাস্তব জগতের সামঞ্জস্য থাকে, অর্থাৎ তর্কবিদ্যার ভাষায় চিন্তার যখন আকারগত ও বস্তুগত সত্যতা (formal and material truth) থাকে, তখন সেই চিন্তাকে আমরা শুদ্ধ বা যথার্থ চিন্তা বলে অভিহিত করতে পারি। যেমন, 'সোনার পাথরবাটি'—এই চিন্তা অশুদ্ধ। কেন না এই চিন্তা অভ্যন্তরীণ বিরোধমুক্ত নয়, অর্থাৎ এই চিন্তার কোন অভ্যন্তরীণ সঙ্গতি নেই। আবার যদি বলা হয় 'জলকন্যারা ভাল সাঁতার কাটে' তাহলে এই চিন্তাও অশুদ্ধ। যেহেতু এই চিন্তার সঙ্গে বাস্তব জগতের কোন মিল নেই। আবার যে চিন্তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই, সে চিন্তা শুদ্ধ হতে পারে না। যেমন, 'আজ রাত্রে ঘরে চোর ঢুকতে পারে, কাজেই কারও জেগে থাকা চলবে না, সবাইকে বেশ করে ঘুমুতে হবে,' এই জাতীয় চিন্তা শুদ্ধ চিন্তা নয়। কেননা এই চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোন সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নেই। সুতরাং চিন্তার যদি আকারগত ও বস্তুগত সত্যতা থাকে এবং চিন্তার বিভিন্ন অংশ সুসংবদ্ধ ও সুসামঞ্জস্য হয় তাহলে সেই চিন্তাকে শুদ্ধ চিন্তা বলা যেতে পারে। যেমন, 'একটু আগে খুব বৃষ্টি হয়েছে, তাই মাটি ভেজা'—এই চিন্তা যথার্থ চিন্তা। যে চিন্তার মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিরোধ আছে, যে চিন্তার সঙ্গে বাস্তব জগতের মিল নেই এবং যে চিন্তার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে সুসংবদ্ধ হয়ে জ্ঞানের সংহতি (system of knowledge) রচনা করে না, সে চিন্তা অশুদ্ধ।

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চিন্তার স্বরূপ

চিন্তার শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয় তা যুক্তিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। অশুদ্ধ চিন্তা কিভাবে ঘটে, মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কেবলমাত্র এক্ষণে আমরা তাই আলোচনা কবব।

অশুদ্ধ চিন্তার কারণ

(i) যুক্তিশাস্ত্রে শুদ্ধ চিন্তনের জন্য যেসব নিয়মের উল্লেখ আছে, সেগুলো যদি স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করি তাহলে চিন্তা অশুদ্ধ হবে।

(ii) সংস্কার, বদ্ধমূল ধারণা, পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তাকে অশুদ্ধ করে তুলতে পারে।

(iii) উদ্বেগ, ভয়, বাতিক, উত্তেজনা, আবেগ প্রবণতা, ক্রোধ শুদ্ধ চিন্তনের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে চিন্তনকে অশুদ্ধ করে।

(iv) মনের অবদমিত কামনা-বাসনা, স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, সেহেতু স্বপ্নের বা স্বপ্নের মধ্যে আমরা আমাদের চিন্তার অসংবদ্ধ ও অযথার্থ রূপ প্রত্যক্ষ করি।

v) চিন্তা ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। অনেক সময় উপযুক্ত ভাষায় চিন্তাকে প্রকাশ করার অসামর্থ চিন্তাকে অশুদ্ধ করে তোলে।

(vi) কোন বিষয় সম্পর্কে প্রযোজনীয় জ্ঞানের অভাবও চিন্তার ক্ষেত্রে অশুদ্ধতা নিয়ে আসে। বস্তুতঃ, অনেক কাজের বিজ্ঞানসম্মত কারণ জানা না থাকার জন্য আমরা কার্যগুলোকে অবিজ্ঞানোচিত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে থাকি।

(vii) শুদ্ধ চিন্তনের জন্য যে ধৈর্য, মানসিক স্থিরতা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাস থাকা প্রয়োজন, তার অভাব ঘটলেও মানুষের চিন্তা সাধারণতঃ অশুদ্ধ বা অযথার্থ হয়।

১৩। চিন্তন ও বিচার-করণের অনুশীলন (Training in Thought and Reasoning) ঃ

শিশুকে নিজে নিজে চিন্তা করতে ও বিচার করতে শিক্ষা দেওয়া আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিশু নিজে নিজে চিন্তা করতে শিখলে পরিবর্তনশীল জগতের ততোধিক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এই ব্যাপারে শিক্ষকের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। কোন একটি সমস্যা উপস্থিত হওয়া মাত্র শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর হয়ে সেটি সমাধানের জন্য এগিয়ে যান, শিক্ষার্থীকে চিন্তা করার সুযোগটুকু না দেন তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বাধীন চিন্তন (Independent thinking) ও বিচারকরণের

শিশুর স্বাধীন চিন্তা-শক্তির বিকাশ শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিক

(reasoning) ক্ষমতা কখনই বিকাশ লাভ করতে পারে না। কাজেই শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তাঁকে অন্ধের মতো অনুসরণ না করেন। শিক্ষার্থী যাতে সমস্যা সমাধানের জন্য নিজে নিজেই চিন্তা করতে পারে; অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিস্থিতিকে পরীক্ষা করে নিজেই বিচার করতে পারে, তার জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভর হতে শিক্ষা দিতে হবে, তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলতে হবে। শিক্ষণ হল গতিশীল প্রক্রিয়া; তাই শিক্ষার্থীর সামনে নতুন নতুন তথ্য উপস্থাপিত করতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করতে হবে। শিক্ষক বাঁধা নিয়ম অনুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে যেতে বললেই তার চিন্তনশক্তির যথাযথ স্ফুরণ হবে না। শিক্ষার্থীর সামনে নতুন নতুন সমস্যা উপস্থাপিত করে তাকে সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য চিন্তন ও যুক্তিতর্ক করতে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার্থী যাতে নিজে নিজে কোন বিষয় পড়ে সেটি বোঝার চেষ্টা করে তার জন্য পাঠের সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। পরে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থী বিষয় সম্পর্কে নিজে কতখানি চিন্তা করেছে, সেটুকু বুঝে নেবার চেষ্টা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলতে হবে

শিক্ষণ প্রক্রিয়া অবরোহাত্মক (deductive) হবে, না আরোহাত্মক (inductive) হবে, এটিও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষক কি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত নিয়ে শুরু করে শিক্ষার্থীকে সাধারণ নিয়মটি আবিষ্কার করতে শেখাবেন, না, নিয়ম বা সংজ্ঞাটি সোজাসুজি তার সামনে উপস্থাপিত করে তাকে সেটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিক্ষা দেবেন? পুরনো ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অবরোহাত্মক (deductive)। শিক্ষক সংজ্ঞা, নিয়ম, সূত্র প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করতেন, সেগুলো তাদের মুখস্থ করতে বলতেন, তারপর উদাহরণের সাহায্যে সেগুলো ব্যাখ্যা করতেন। পদের সংজ্ঞা, ব্যাকরণের নিয়ম, গণিতের সূত্র প্রভৃতি বার বার আবৃত্তি করতেন যাতে শিক্ষার্থীরা সেগুলো মুখস্থ করতে পারে এবং যান্ত্রিকভাবে সেগুলো প্রয়োগ করতে পারে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের সময়ের অপচয় বন্ধ হয় সত্য, কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটে না, পাঠ্যবিষয়টি শেখানো সত্ত্বেও সেই শিক্ষা তেমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে না। অর্জিত ধারণাগুলো তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না এবং সাধারণ সত্য বা নিয়মগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থও তেমন সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীর কাছে

পুরনো ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা অবরোহাত্মক

অবরোহ পদ্ধতির ত্রুটি

ধরা পড়ে না। অপরপক্ষে, আরোহপদ্ধতি (inductive method), মনকে সেই পথেই চালিত করে, যে পথে মনকে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে চলার সুযোগ দিলে মন এগিয়ে চলতে পারে। আরোহ পদ্ধতি পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করা হয় এমন কতকগুলো বাক্য শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করেন এবং শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করেন কোন্ ব্যক্তি বা বস্তুর কথা বাক্যে বলা হয়েছে। বাক্যের উদ্দেশ্য, বিধেয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীকেই সংজ্ঞা তৈরী করতে বলেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে যে তারা নিজেরা চেষ্টা করেই ধারণা গঠন করেছে, বা নিয়মটি আবিষ্কার করেছে। নিজেরা সচেষ্ট হলে যে জ্ঞানের ভাণ্ডারকে ব্যাপকতর করে তোলা যায়, এই ধারণাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে।

অবরোহ পদ্ধতির সুবিধা

শিক্ষণের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল আরোহ এবং অবরোহ পদ্ধতির যুক্ত রূপ। উভয় পদ্ধতি, একটি অপরটির পরিপূরক। দুটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শিক্ষক জ্ঞানকে প্রাণবন্ত ও বাস্তবধর্মী করে তোলার জন্য আরোহ পদ্ধতি এবং জ্ঞানকে সুসংহত ও ব্যাপকতর করার জন্য অবরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। সব পাঠ্য-বিষয়ই উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে এবং সব পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই কতকাংশে অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

মনোযোগ

(Attention)

১। মনোযোগের মাত্রা নিয়ন্ত্রা নীতিসমূহ (Laws regulating degress of Attention) :

[পাঠে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা একটা সমস্যা। বাল্য ও কৈশোরে সদা চঞ্চল মনকে কিছু সময়ের জন্য পাঠ্যবস্তুতে ন্যস্ত রাখতে গেলে শিক্ষককে মনোযোগের মাত্রানিয়ন্ত্রা কতকগুলো নীতির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেরূপ কতকগুলো নীতির আলোচনা করা হল।]

(ক) **মনোযোগের তীব্রতা তাৎক্ষণিক সক্রিয় কর্মশক্তির উপর নির্ভরশীল।** (The intensity of an act of attention is dependent on the active energy disposable at that time.) : শিশুরা সবসময়ে সবকাজে একই ধরনের মনোযোগের তীব্রতা দেখাতে পারে না। সকালের দিকে যখন তাদের শরীর ও মন দুই-ই প্রফুল্ল ও সতেজ থাকে তখন যে পরিমাণ মনোযোগ তাদের কাছ থেকে আদায় করা যায়, বিকালের দিকে তা পারা যায় না। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, সারাদিনের কর্মক্লান্তি যথেষ্ট পরিমাণে তাদের শক্তি ক্ষয় করে দেয়। তাই যেসব কাজে গভীর মনোযোগের প্রয়োজন সেগুলো মনোযোগের তীব্রতা যে সময় বজায় থাকে সে সময় করা উচিত। শিক্ষককে তাই শিক্ষার্থীর তাৎক্ষণিক সক্রিয়তা বা কর্মশক্তির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হতে হয়। এ প্রসঙ্গে শারীরিক সুস্থতার কথাও এসে পড়ে। শরীর সুস্থ ও সবল থাকলে শক্তির মাত্রা বেশি হয়, দুর্বল শরীরে কর্মশক্তিও দুর্বল হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, শ্রেণীকক্ষে দুর্বল বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে সাময়িক ভাবে অপারগ ছেলেরা পাঠে অমনোযোগী হয়ে পড়ে।

(খ) **মনোযোগের তীব্রতা উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভরশীল** (The intensity of an act of attention depends on the strength of the stimulus which arouses the attention.) : আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি মনোযোগের কতকগুলো বাহ্যিক নির্ধারক রয়েছে। এ ধরনের বাহ্যিক নির্ধারকগুলো

ছাড়াও কতকগুলো অন্তর্জাত নির্ধারকও মনোযোগ আকর্ষণ করতে খুবই কাজ করে। সুতরাং শিক্ষককে এ জাতীয় নির্ধারকগুলোর উপর সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

রঙিন ছবি এক ধরনের ক্ষমতাশালী বাহ্যিক নির্ধারক, আবার শ্রেণীতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার ইচ্ছা উচ্চাভিলাষী ছাত্রের কাছে ক্ষমতাশালী অন্তর্জাত নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে কোন উদ্দীপক কি মাত্রায় মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে তা যাচাই করে দেখতে হবে। শিশুদের মধ্যে অন্য ধরনের আন্তর উদ্দীপকও জাগানো যেতে পারে, যেমন :—

(i) নিজেদের কাজ দিয়ে শিক্ষক বা পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করা : এটা দ্বারা অপরে তার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে সে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

(ii) দৈহিক ও মানসিক শাস্তির ভয় নিবারণে এবং দুষ্ক্রিয়তা প্রতিরোধে সাহায্য ক'রে।

(iii) সত্য বা ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি : এটা থেকে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ দৃঢ় হয়।

(iv) আবিষ্কারের আনন্দ : এটা থেকে আপন সৃষ্টির মূল্যবোধ জাগে।

(v) অপরের উপর প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করা : এটা থেকেই নেতৃত্বের চেতনা মনে আসে।

(গ) মনোযোগের তীব্রতা বিশেষ ধরনের উদ্দীপকের সঙ্গে পূর্ব-সামঞ্জস্য বিধানের উপর নির্ভরশীল (The intensity of an act of attention is dependent on the pre-adjustment of the attention to the particular kind of stimulus) : বিশেষ ধরনের উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার জন্যে আগে থেকে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান।

অনেক সময় আমরা কিছু বলবার আগে "Look here" বা "Listen to me" অর্থাৎ 'দেখ' বা 'শোন' ইত্যাদি কথা বলে ছাত্রদের দৃষ্টি বা শ্রুতি আমাদের দিকে ফিরিয়ে আনতে চাই। এটা অনেক সময় তাদের মানসিক প্রস্তুতি গঠন ক্রিয়ায় সাহায্য করে। বিশেষ বা জরুরী কোন কিছু দেখার বা শোনার জন্য তারা তৈরী হয়। মানসিক প্রস্তুতি ঠিকমত না হলে শিক্ষকের পাঠদান প্রক্রিয়া সফল নাও হতে পারে। আবার শিক্ষার্থীর দিক থেকে বলা যায় যে, সে পাঠে ঠিকমত মনোযোগ নাও দিতে পারে। বিশেষ করে দৃষ্টিনির্ভর, শ্রুতিনির্ভর বা দৃষ্টি-শ্রুতি-নির্ভর উপকরণের সাহায্যে কোন তথ্য পরিবেশনকালে এ ধরনের মানসিক প্রস্তুতি অপরিহার্য।

২। মনোযোগের প্রতিবন্ধক সমূহ (Obstacles to Attention) :

মনোযোগের বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধক আছে। মোটামুটি ভাবে এদের দু'টো শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(ক) শারীরিক—{ অন্তর্জাত, বহির্জাত (খ) মানসিক—{ মেজাজগত, অনুপযুক্ততা সংক্রান্ত

(ক) শারীরিক প্রতিবন্ধকসমূহ (Physical obstacles) : (i) **দৈহিক ক্ষমতার দুর্বলতা :** জন্মগত (hereditary) অথবা দীর্ঘকাল ধরে অপুষ্টি, অসুস্থতার কারণে (Prolonged illness or malnutrition) কোন শিক্ষার্থীর দৈহিক গঠন ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল হতে পারে। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন দুটো কারণ একসঙ্গে বর্তমান থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রায়ই অবস্থার দাসে পরিণত হন কারণ এসব শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে সমস্যা উপস্থিত করে। এখানে প্রশংসা বা শাস্তি কোনটাই কাজে আসে না। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ করা শিক্ষকের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা খুব লাজুক বা ভীরু প্রকৃতির হয় বা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের বিষাদগ্রস্ত, অমনোযোগী হতে দেখা যায়। এদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনা বা এদের কম্পনশীল মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যাওয়ার মত করে পড়ানো রীতিমত কঠিন ও অসম্ভব।[১] এসব ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগের (involuntary attention) সাহায্য নিতে হয়। আগ্রহ সৃষ্টি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া ধৈর্য ধরে ও ধীরে ধীরে তাদের নিয়ে কাজ করলে তবেই সুফল আশা করা যায়। এটিকে অন্তর্জাত শারীরিক বাধা বলেও অভিহিত করা যেতে পারে।

(ii) **অনুপযুক্ত পরিবেশ :** শিশুর মনোযোগ বাইরের পরিবেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। তাই শ্রেণীকক্ষে বা পাশের শ্রেণীতে অথবা বাইরে কোন গোলমাল দেখা দিলে তার মনোযোগ সহজেই বিকর্ষিত হয়। শিক্ষক হয়তো কোন একটা বাছাই করা উদ্দীপকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছেন; কিন্তু অন্য ধরনের নানা উদ্দীপকও তখন শিক্ষার্থীর সামনে দেখা দিয়ে তার মনোযোগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। একারণে শ্রেণী বা বিদ্যালয় এমনভাবে সংগঠন করা প্রয়োজন যে মনোযোগ বিকর্ষণকারী বস্তুগুলো

১। তুলনীয় : 'It is as impossible to make lasting impressions upon a quaking mind as it is to trace firm characters upon a quivering sheet of paper.' —Locke

যেন কম হয়। শ্রেণীকক্ষে জোরে বা সমস্বরে কথাবলা, পাশের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের দরব চীৎকার, রাস্তার-ধারের গোলমাল—সবই মনোযোগ বিকর্ষণকারী বাহ্যিক উদ্দীপকের কাজ করে। নীরবতা শিক্ষার্থীর মনোযোগের সর্বপ্রধান সহায়ক। তাকে এমন পরিবেশে রাখতে হবে যাতে কোনো মতেই মনোযোগ বিকর্ষিত বা বিঘ্নিত না হয়।

(iii) **অত্যধিক গরম ও অবাধ বায়ুচলাচলের অনুপযোগী শ্রেণীকক্ষ:** এরূপ পরিবেশ শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তসঞ্চালন প্রক্রিযার পক্ষে ক্ষতিকর। এতে তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মনোযোগের মাত্রারও তারতম্য ঘটে। শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাধারণ অবসন্নতা লক্ষ্য করেন তাহলে তাঁর সতর্ক হওয়া উচিত। এরূপ পরিবেশ শুধু মনোযোগ বিনাশকারীই নয়, স্বাস্থ্যহানিকরও বটে। তাই শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় দরজা, জানালা বা বায়ুচলাচলকারী রন্ধ্র থাকা উচিত।

(iv) **একই দেহভঙ্গীতে দীর্ঘকাল বসে থাকা:** গতিশীলতা শিশুর স্বাভাবিক ধর্ম। শিশু অনেকক্ষণ একই অবস্থায় বসে থাকতে পারে না—চায়ও না। তাদের দীর্ঘকাল ধরে একই দেহভঙ্গিতে নিশ্চল করে রাখা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। শিশুরা তাই পডাশোনার সময়ও সচল থাকতে চায। এ বযসে নিশ্চলতা আশা করা অন্যায়। সে যতক্ষণ শ্রেণীকক্ষে থাকে ততক্ষণ তাকে প্রস্তর মূর্তির মতো বা পিনবদ্ধ প্রজাপতির মতো বসিয়ে রাখাও ঠিক নয। শিক্ষকের পক্ষে একটা জিনিস স্মরণ রাখা দরকার যে, দেহ সঞ্চালনকারী কোন ভঙ্গি অমনোযোগী হওযার লক্ষণ বলে মনে করা ঠিক নয়। শিক্ষক যদি সেরূপ কিছু মনে করেন তাহলে তিনি পডানো বন্ধ করে শিক্ষার্থীকে বিষযটি পুনরাবৃত্তি করে বা প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন যে, সত্যিই সে অমনোযোগী হযেছে কিনা বা দেহকে সচল রাখার জন্যেই কোন অঙ্গভঙ্গি করেছে কিনা। তবে এটা ঠিক যে যথেচ্ছ গতিশীলতা কোনমতেই বরদাস্ত করা যায না। এজন্যে এর বিকল্প কোন কোন ব্যবস্থা, যেমন—দাঁড করিযে প্রশ্নোত্তর জিজ্ঞেস করা বা ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে এনে কিছু লিখতে বলা কিংবা মানচিত্রে বা অন্য কোন সহায়ক উপকরণের কাছে নিয়ে এসে কিছু নির্দেশ দান করা ইত্যাদি খুবই উপযোগী।

(খ) **মানসিক প্রতিবন্ধক সমূহ** (Psychical obstacles): (১) **শিক্ষার্থী সম্পর্কিত:** (i) **অলস মানস প্রকৃতি:** (Sluggish Temperament)—অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পডাশোনা বা সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় সম্পর্কে উদাসীন, যদিও খেলাধুলো বা অন্য কোন ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ

উদাসীন নাও হতে পারে। অথচ এমন শিক্ষার্থী সত্যিই দুর্লভ, যার কোন-না-কোন ব্যাপারে আগ্রহ নেই। যার খেলাধুলোয় আগ্রহ সে ব্যায়াম বা খেলাধুলো সংক্রান্ত পাঠে মনোযোগী ও উৎসাহী হবে। তাই এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সংযোগ রেখে পাঠদান করতে হবে। সুতরাং পাঠক্রম এমনভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন যাতে সকল রকমের ক্রিয়াকলাপের সুযোগ থাকে। সহানুভূতিশীল ও প্রাণবান শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট পরিমাণে সজীবতায় উজ্জীবিত করতে পারেন।

(ii) **প্রাণচঞ্চল মানসপ্রকৃতি** (Vivacious temperament): অনেক সময় বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীরা শ্রেণীর কাজকর্ম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করে। তখন শ্রেণীতে প্রত্যাশিত বা দীর্ঘস্থায়ী স্থির মনোযোগ (sustained attention) দান তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ ধরনের শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করার জন্যে শিক্ষক নতুন বিষয়ের অবতারণার পর প্রশ্ন করতে পারেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোঝা যাবে যে সে সত্যিসত্যিই বুদ্ধিমান, না বুদ্ধিমান সেজে আছে এবং পাঠে ঠিকমত মনোযোগ দিচ্ছে না। সে তখন শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের কাছে ছোটো বা অপদস্থ হবার চেয়ে অন্যদের মতো মনোযোগ দিতে থাকে।

(iii) **সাময়িক মানসিক অবস্থা** (Learner's mental set): এটা যেমন শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল তেমনি পারিবেশিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) **শিক্ষক ও পাঠ সম্পর্কিত:** আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করেছি যে, আগ্রহ মনোযোগের প্রধান উদ্‌বোধক (incentive) হিসেবে কাজ করে। কোন পাঠের পূর্বপ্রস্তুতি না থাকার জন্যে অনেক সময় শিক্ষার্থীর কাছে সে পাঠ দুরূহ বলে মনে হতে পারে। সেকারণ সে অমনোযোগী হয়! আবার অনেক সময় অগ্রসর শিক্ষার্থীর কাছে কোন পাঠ বেশি সহজ বা পুরোনো নীরস বলে মনে হতে পারে। তখনও স্বাভাবিকভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। যখন পাঠের দ্বারা নতুন কোন বিষয়বস্তু শিক্ষক উপস্থাপিত করতে পারেন না তখনই এ সমস্যা দেখা দেয়। পরিবেশনার দোষে সহজ বিষয়বস্তুও অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ বলে প্রতীয়মান হয়। সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশি। তিনি যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে পাঠদান বা পদ্ধতি প্রয়োগ না করলে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হবেন। সুচিন্তিত পাঠ পরিকল্পনার তাই অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষকের সহানুভূতি এবং সুচিন্তিত কৌশল শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করে। শিক্ষার্থীরা তখন কোন পাঠে মনোযোগ না দিয়ে পারে না।

এ পর্যন্ত আমরা যেসব বিষয়ে আলোচনা করলাম, তার উপর যথাযোগ্য দৃষ্টি না দিলে পাঠদান গতানুগতিকতার পর্যায়ে এসে পড়ে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

ইচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগের শিক্ষাগত মূল্য (Educational value of voluntary and involuntary attention): প্রাচীনকালের শিক্ষকগণ ইচ্ছাকৃত মনোযোগের উপর অসীম গুরুত্ব আরোপ করতেন। শিক্ষণকে আগ্রহভিত্তিক করার দিকে তাঁদের তত বেশি দৃষ্টি ছিল না, শিক্ষণকে মনে করা হত প্রচেষ্টা ও খুব কষ্টের বিষয়। নানাভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে শিশুর মনকে বেঁধে রাখা হত। শিক্ষাপ্রক্রিয়াই তখন ছিল অশ্রুজল মিশ্রিত। বর্তমানের শিক্ষক মূলতঃ 'আগ্রহ'কে অধিক মূল্য দেন। কারণ, তিনি জানেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল নয়, তাই কোন কাজে তারা বেশি সময় ও চেষ্টা দিতে পারে না। তাছাড়া তারা প্রধানতঃ অনুভূতিশীল, তাই তাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হয়। মনোযোগের মাত্রার গুণে তাদের মনে কোন জিনিসের ছাপ গভীরতা লাভ করে। মনোযোগের কারণ অপেক্ষা তাই মাত্রার দিকে বেশি নজর দিতে হয়। অবশ্য এটা ঠিক যে ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ আকর্ষণ সব সময়ে বাঞ্ছিত ফল দেয় না। তাই ইচ্ছাকৃত মনোযোগের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। পুরোনো এবং সেকেলে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বাদ দিলেও 'মনোযোগের অভ্যাস গঠনের' প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আর এই অভ্যাস গঠন ইচ্ছাকৃত মনোযোগের বিভিন্ন ক্রিয়ার সাহায্যেই সম্পাদিত হয়।[1]

বিদ্যালয়ে মনোযোগের বিকাশ (Development of Attention in School): শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন সে তার অপরিণত ইচ্ছাকৃত মনোযোগের ক্ষমতা নিয়ে আসে। তার মনোযোগ তখন সহজে বিক্ষিপ্ত, ক্ষণস্থায়ী ও দোদুল্যমান হয়। বুদ্ধিমান শিক্ষক তাই শিশুর কাছে স্থির মনোযোগ সহজে আশা করেন না। অনেক সময় শাসন বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে তা আদায় করেন এটা হয়ত সাময়িকভাবে কিছুটা কাজে লাগে কারণ শিশুমন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে পাঠে মন দিতে পারে না। যদিও পাঠে মন দিতে পারে, তাহলে ও বেশিক্ষণ মনকে বিষয়বস্তুতে সংযুক্ত রাখতে পারে না। আগ্রহ না থাকলে একাজ কখনই সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষককে ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ আনতে হয়। এজন্যে শিক্ষকে

1. তুলনীয় : 'Without doubt we must guard against the dangers of an educatio which is too compliant, too easy, which makes an abuse of what is diverting, an which excludes effort.—Compayres.

পক্ষে বিমূর্ত জিনিস অপেক্ষা মূর্ত জিনিসের সাহায্য নেওয়া উচিত। শিশুদের দীর্ঘ সময় ধরে পাঠদান করা উচিত নয় বরং পাঠ সংক্ষিপ্ত ও বিরতিমূলক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ধীরে ধীরে ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ যেন ইচ্ছাকৃত মনোযোগে পরিণত হতে পারে তার অভ্যাস গঠন করতে হবে।

বিচিত্রতা বা **নতুনত্ব মনোযোগ আকর্ষণের অন্যতম নির্ধারক** (Variety or Novelty is one of the determiners of attention) হলেও শিক্ষক অযথা একরোখা মনোযোগ আকর্ষণকারী বস্তুসম্ভার নিয়ে শ্রেণীকক্ষে বস্তুভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা (Object lesson) করবেন না। যে সমস্ত বস্তুর তাৎক্ষণিক সরাসরি প্রয়োজন নেই সেগুলো শিক্ষার্থীর দৃষ্টির আড়ালে রাখাই ভাল। এক্ষেত্রে শিক্ষককে নজর রাখতে হবে উত্তেজনা ও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে শিক্ষার্থীরা যেন অযথা উঁকিঝুঁকি না দেয়। একটা পাঠের পারম্পর্য রাখার সময় প্রয়োজনমত দৃশ্য ও শ্রাব্য দু-ধরনের উপকরণ ব্যবহার করলে পাঠ একঘেয়ে হয় না, উপরন্তু শিক্ষার্থীদের মনোযোগও বিক্ষিপ্ত হওয়ার কম সুযোগ থাকে।

নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য

মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে বা **আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে** শিক্ষক যে-সব পন্থা অবলম্বন করতে পারেন সেগুলি হল —

মনোযোগ ও আগ্রহ-সৃষ্টির পন্থা

(১) **প্রশংসা করা:** মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন বিনয়ী ও লাজুক শিক্ষার্থীরা এতে উৎসাহিত হয়।

(২) **সুস্থ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা:** এ ব্যবস্থা উচ্চাশাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুবই উপযোগী।

(৩) **শাস্তির ভয় দেখানো:** দৈহিক শাস্তিদান সর্বশেষ অস্ত্র এবং তার প্রয়োগ বিলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে যারা একগুঁয়ে, বলিষ্ঠ দুষ্কৃতকারী বা জন্মকুঁড়ে তাদের পক্ষে এটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বারবার **অভ্যাসের** বা **চর্চার** ফলে মন সুদৃঢ় হয়। ইচ্ছাকৃত মনোযোগ ধীরে ধীরে ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগের স্থান দখল করে। শিশু ক্রমেই মনোযোগের অভ্যাস গঠন করে। সে তার পরিচয়ের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন জিনিসের সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ অনায়াসে মনোযোগ দিতে শেখে। এভাবে বিদ্যালয়ে মনোযোগের বিকাশ সম্ভব হতে পারে।

মনোযোগের অভ্যাস

প্রশ্নাবলী

1. Mention the laws of regulating the degrees of Attention.
2. Discuss the obstacles to attention. How can they be minimised ?
3. How can a teacher help a learner in developing his attention in school ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিখন

(Learning)

১। শিখন ও পরিণমন (Learning and Maturation) :

শিশু যখন পৃথিবীতে জন্ম নেয় তখন দেহে ও মনে সে নিতান্ত অসহায়। সার্বিক অপরিণতি তাকে অপরের উপর পরিপূর্ণ মাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে। তার প্রতিপালন হয় পরিবারের বড়দের হাতে। তারপর ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে এক পূর্ণবয়স্ক মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে থাকে। দুটি প্রক্রিয়া তার এরূপ বৃদ্ধির পেছনে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায়। অতীতের শিশু বর্তমানের মানুষে রূপান্তরিত হয় শিখন (Learning) আর পরিণমনের (Maturation) সম্মিলিত ক্রিয়া-কুশলতায়।

পরিণমন কি ? (What is Maturation ?) : দুটো প্রক্রিয়ার কাজের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে অনেক সময় বোঝা দুরূহ হয়ে পড়ে যে শিশুর বৃদ্ধি কিসের ফল—শিখনের, না পরিণমনের। তাই অনেক মনোবিজ্ঞানী এ দুটিকে নির্দিষ্ট সীমারেখার দ্বারা পৃথক করতে চান না। তবে এ দুটির যত মূলগত ঐক্যই থাকুক না কেন প্রকৃতিগত যথেষ্ট বিভিন্নতা থেকে গেছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, এক বছরের শিশু যেভাবে দৌড়াতে পারে, দু-তিন বছরের শিশু তার চেয়ে ভালভাবে পারে। পাঁচ বছরের শিশু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে দৌড়াতে পারে। শুধু এ ব্যাপারেই নয়, নতুন আচরণের ক্ষেত্রে, কথা শেখার ব্যাপারে ও নতুন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বয়সের একটা প্রভাব আছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুশীলন ও শিখনের উপর নির্ভর না করেও সকলের মধ্যেই কতকগুলো পরিবর্তন আসে। এটা দেহমনের অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক পরিণতি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। তাই এই স্বাভাবিক পরিণতি বা পরিপক্বতাকেই ম্যাক্‌গিয়ক (*McGeoch*) পরিণমন বলেছেন। স্কিনারের (*Skinner*) মতে পরিণমন হল এক ধরনের বিকাশ যা পারিবেশিক অবস্থার ব্যাপক তারতম্য থাকলেও মোটামুটি নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয়।[1] গেসেল (*Gesell*) বলেন যে, স্বকীয় ও অন্তর্জাত বৃদ্ধিই পরিণমন। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র নিজস্ব অন্তর্জাত বৈশিষ্ট্য অনুসারে

1. 'Maturation, then from the present writer's viewpoint, is development that will proceed fairly regularly even in the face of wide variations in environmental conditions.' —*S*kinner. Edual Pry.

বৃদ্ধি পায় এবং আচরণের প্রাথমিক স্তর প্রকাশ পায়। এ পর্যায়ে বাহ্যিক কোন উদ্দীপনা কাজ করে না, এমন কি পূর্ব অভিজ্ঞতাও নয়।[1] এসব মতামতের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষা-নিরপেক্ষভাবে যে অভ্যন্তরীণ দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন ও পূর্ণতা আসে তাই-ই পরিণমন (Maturation)। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে মানুষের দেহমনের পরিণমন শিক্ষণ, অভ্যাস, পুষ্টি ও নানা পারিবেশিক প্রভাব দ্বারাও অনেক সময় প্রভাবান্বিত হয়।[2]

শিখন কি ? (What is learning ?) : শিখন (Learning) বিশেষধর্মী প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। এগুলির বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন শিশুর শিখনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। শিখন অভিজ্ঞতাজাত ; তাই অভিজ্ঞতার তারতম্য ব্যক্তির মধ্যে এর প্রকৃতির তারতম্য নিয়ে আসে। অপরপক্ষে পরিণমন অভিজ্ঞতা নির্ভর নয় বলে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ অনুযায়ী সকল শিশুর ক্ষেত্রে তা প্রায়শঃই একই প্রকৃতির হয়। সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, লিখতে-পড়তে পারা বিশেষধর্মী প্রচেষ্টা বা অভিজ্ঞতা লাভের উপর নির্ভরশীল বলে এগুলো শিখনজাত , অন্য দিকে হাঁটা, দৌড়ানো বা সিঁড়িভাঙ্গা প্রভৃতি পরিণমনের ফল।

শিখন ও পরিণমন দুই-ই শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে।[3] সুতরাং শিখন সম্বন্ধে যেমন বিস্তৃত আলোচনা আমরা করেছি, এখানে তেমনি পরিণমন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ও গবেষণার উল্লেখ করছি।

পরিণমন বনাম **বিশেষ শিক্ষণ** (Maturation Versus specific training): শিশুর শিক্ষাগত বিকাশে পরিণমন ও বিশেষ শিক্ষণ কোনটির প্রভাব বেশি এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার অন্ত নেই। এগুলোর দ্বারা প্রধানতঃ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে শিক্ষণের সাহায্যে পরিণমনের কাজ করা যায় কিনা বা তাকে ত্বরান্বিত করা চলে কিনা।

1. 'The nervous system grows according to its own intrinsic pattern and thereby establishes the primary forms of behaviour. These forms are not determined by stimulation from outside world. Experience has nothing specific all to do with them···This intrinsic growth is maturation.'
—Gesell : Maturation and the patterning of behaviour

2. Maturation will necessarily be affected to some extent by teaching, training, practice, nutrition, health and so forth ; but granted this, it must be assumed the power of growth is genetically determined.—Lovell.

3. তুলনীয় : it must be remembered that the greater part of children's behaviour probably comes though the interaction of maturation and learning.
—Lovell

গেসেল ও থমসন (*Thompson*) এক সমকোষী যমজ শিশু নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। এদের মধ্যে একজনের যখন সাড়ে এগার মাস বয়স তখন তাকে ছয় সপ্তাহ ধরে দৈনিক সিঁড়িতে ওঠার বিশেষ শিক্ষণ দিয়েছিলেন। অথচ এসময় অপর জনকে সে শিক্ষণ দেওয়া হয়নি। যে শিক্ষণ পেয়েছিল তার তের মাস বয়সের সময়ে সে কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে পারত। এ বয়সে শিক্ষণ বিহীন শিশুটি চল্লিশ সেকেণ্ডে সমসংখ্যক সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারত। তাকে দু-সপ্তাহের বিশেষ শিক্ষণ দেবার পর সে দশ সেকেণ্ডে আবার ঐ সিঁড়িগুলো বেয়ে উঠত। ৫৫ সপ্তাহ বয়সে শিক্ষণবিহীন শিশুর সিঁড়ি ভাঙ্গার দক্ষতা, শিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুর ৫২ সপ্তাহ বয়সের কৃতিত্ব অপেক্ষা অনেক বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছিল। যদিও একজন অপরজনের চেয়ে সাত সপ্তাহ আগে এবং তিনগুণ বেশি শিক্ষণ পেয়েছিল। এই দক্ষতাকে তাঁরা তিন সপ্তাহ কালের পরিণমন প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি বলে মনে করেছেন।[1]

হিলগার্ড (*Hilgard*) এক পরীক্ষণমূলক দলকে (Experimental group) নিয়ে জামার বোতাম লাগানো, কাঁচি দিয়ে কাটা, সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা ইত্যাদি কাজের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, একটা বিশেষ সময় যাবার পর নিয়ন্ত্রিত দল (Controlled group) অর্থাৎ যারা কোনরকম বিস্তৃত পরীক্ষণের সুযোগ পায়নি তারাও স্বল্প শিক্ষণে পরীক্ষণমূলক দলের সমান পারদর্শিতা দেখতে পারে। ম্যাকগ্রও (*McGraw*) জিমি ও জনি নামক যমজ শিশু নিয়ে চলাফেরা, দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়ার সঙ্গতিবিধান, বসা, দাঁড়ানো, বল ছোঁড়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। স্টেয়ার (*Stayer*) সমকোষী যমজের উপর শব্দ মালার উৎকর্ষের বিষয় পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সমান মানসিক শক্তিসম্পন্ন বলে তারা দুজনেই শিক্ষণকালের বিভিন্নতা থাকা সত্বেও সমকক্ষতা অর্জন করেছে।

উপরের সবগুলো পরীক্ষায় এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে সরল দৈহিক কুশলতা অর্জন ও সমন্বয় স্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষণ অপেক্ষা জৈবিক পরিণমনের প্রভাব বেশি।

এপর্যন্ত শিশুদের উপর গবেষণার উল্লেখ করা হল। এখন ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধে গবেষণার উল্লেখ করা হচ্ছে। স্পল্ডিং (*Spalding*) সোয়ালো পাখীর ছানাদের নিয়ে এক পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে তারা জন্মাবার পরে খাঁচায় বদ্ধ থাকলেও এবং অন্যেকে উড়তে না দেখেও, উড়বার উপযুক্ত বয়স হলেই তারা উড়তে পারে। অবশ্য

1. A. Gesell, in Murchison (as quoted by Skinner)

সবাই যে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যেতে পারে তা নয় তবে একটু চেষ্টার পর তারা সবাই উড়ে যায়। লিওনার্ড কারমাইকেল (*Leonard Carmichael*) ব্যাঙাচিদের নিয়ে গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে তাদের সাঁতার শেখার ক্ষেত্রে পরিণমনই সবচেয়ে বেশি কাজ করে, শিক্ষণ বা অভ্যাস সেখানে খুব বেশ প্রভাব রাখতে পারে না। ক্রুজ (*Cruz*) মুরগী ছানাদের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে খুঁটে খাবার বা জটিলপথ (Maze) থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে তাদের স্বাভাবিক পরিণতি প্রক্রিয়া খুবই কার্যকর। এর থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ইতর প্রাণীর বেলায় শিখন পরিপূর্ণ মাত্রায় পরিণমনের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক জৈবিক পরিণতি এখানে সবচেয়ে বেশি কাজ করে।

এ তো গেল সহজ, সরল আচরণ দক্ষতার প্রশ্ন, কিন্তু জটিল আচরণের বেলায় কি মানবশিশু, কি ইতর প্রাণী সবাই নির্ভর করে বিশেষ ধরনের শিক্ষণের উপর। এ সম্বন্ধে ম্যাকগ্র দেখিয়েছেন যে, স্বাভাবিক পরিণতি না ঘটলেও ৩৫০ দিনের অর্থাৎ এক বছরের কম বয়স্ক শিশুকে স্কেটিং করতে উপযুক্ত বিশেষ শিক্ষণ দিলে সে দু' বছরের কম সময়ে এবিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাতে পারে। এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শিশু যখন সবেমাত্র ভারসাম্যদায়ক নিয়ন্ত্রণ শক্তি অর্জন করছে তখনই স্কেটিং শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত সময়। এতে সময়ের অপব্যয় কম হয়।[1] বিশেষ ধরনের বাজপাখী (buzzard) পরিণমনের একটা বিশেষ স্তরের পরেও অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের সুযোগ না পেলে শিকার ধরার ব্যাপারে পেছনে পড়ে থাকে। জটিল ধাঁধাঁর পথ খুঁজে পাওয়ার বা বল গড়িয়ে দেওয়ার কৌশল অর্জনের ক্ষেত্রেও বিশেষ শিক্ষণের প্রভাব পরিণমনের থেকে অনেক বেশি।

উল্লিখিত পরীক্ষাগুলোর থেকে সাধারণভাবে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পরিণমন শিক্ষণের থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক প্রক্রিয়া। শিক্ষণের দ্বারা পরিণমনকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা সময়ের ও পরিশ্রমের অপব্যয়েরই নামান্তর।

অবশেষে বলা যায় যে, শিশুর আত্মবিকাশে ও শিক্ষাকর্মে শিখন ও পরিণমন উভয়েরই মিলিত প্রভাব আছে। দৈহিক ও মানসিক পরিণমন মূলতঃ আত্মবিকাশ ও সরল আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবে জটিলতর আচরণ-দক্ষতা অর্জনের পক্ষে শিক্ষাগত অনুশীলন, অভ্যাস ও বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। তবে পরিণত অবস্থা না এলে কেবলমাত্র অনুশীলন করে প্রত্যাশিত বা বাঞ্ছিত ফল লাভ

---

1. 'the most economical time to learn skating is when the baby is just beginning to gain equilibratory control,' McGraw (as quoted by Skinner)

করা যায় না। কোন্ বয়সে শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়টি শিক্ষা দিতে হবে এবং কিভাবে প্রচেষ্টা করলে অল্প আয়াসে সুফল লাভ করা যাবে তার জন্যে জৈবিক পরিণমনের উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়। ঠিক সময় সঠিক বিষয়ানুশীলনের গুরুত্ব তাই শিক্ষার্থীর জীবনে অনস্বীকার্য। শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলো বিকশিত হতে থাকে এবং সে ক্রমশঃ জটিলতর আচরণে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এজন্যে বয়সানুযায়ী শিখন-ব্যবস্থা ও ক্ষমতার মান অনুসারে পাঠক্রম নির্ধারণ করা উচিত। পাঁচবছরের শিশুকে ভগ্নাংশ না শিখিয়ে তাই গণিতের সাধারণ সূত্র শেখানো উচিত। আবার ঐ বয়সে কিছু না শিখিয়ে শুধু পরিণতির উপর নির্ভর করা সমীচীন নয়। তাই শিশুর শিক্ষা যেমন একদিকে পরিণমন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে অন্যদিকে তেমনি শিখন-প্রক্রিয়াকেও উপযুক্ত সময়ে আরম্ভ করে সংহতিপূর্ণ প্রচেষ্টায় চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সুতরাং এই দুয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা ভাবা যায় না। শিখন ও পরিণমন তাই শিশুর শিক্ষাকে সার্থকতার পথে নিয়ে যায়।

শিক্ষণ ও পরিণমণের মিলিত প্রভাব

২। জ্ঞান ও নৈপুণ্যের বিকাশ (Development of knowledge and skill) ঃ

নৈপুণ্য অর্জন সম্পর্কে পূর্বে বিশদালোচনা করা হয়েছে। জ্ঞানার্জন বা বিকাশ সম্বন্ধে দীর্ঘায়ত আলোচনার তাই অবকাশ রয়ে গেছে। এখানে আমরা জ্ঞানের বিকাশ ও জ্ঞান অর্জনের কথাই বিশেষ করে আলোচনা করব।

'জ্ঞান' কথাটির ব্যঞ্জনা খুবই ব্যাপক। এর বিকাশ সমগ্র জীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়া। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করে থাকি। জ্ঞানকে আলো বা শক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই একে বিমূর্ত এক সত্তা বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান মূর্ত ও বিমূর্ত দু'ধরনের বস্তু সম্পর্কেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষণ, প্রত্যয় গঠন, সামান্যীকরণ অনুষঙ্গ মূলক শিক্ষণ ও মূল্য নিরূপণের মধ্যে দিয়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করে থাকি। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে আমরা মূর্ত জ্ঞান লাভ করে থাকি আর প্রত্যয় গঠন ও সামান্য ধারণার মধ্যে দিয়ে সুনির্দিষ্ট ও সুসংহতভাবে জ্ঞান লাভ করি। এটি বিমূর্ত জ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে। জ্ঞানের অনুভূতির দিকও আছে আর তা নির্ভর করে মূল্য নিরূপণের উপর। আমাদের আদর্শ বা মূল্য বোধ (system of values) জেগে ওঠে এমন এক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে।

প্রত্যক্ষজ শিখন (Perceptual learning): **প্রত্যক্ষজ শিখন কাকে বলে?** (What is meant by perceptual learning?)—কবিগুরু বলেছেন, "ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।" সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ রাখলে মানুষ তার নিজের ও জগতের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ করতে পারে না। ইন্দ্রিয়গুলোকে তাই জ্ঞানের দ্বার বলে আমরা মনে করেছি। আমাদের মানস-জীবনের ভিত্তিরূপে ইন্দ্রিয়গুলোর অবদান অনেক। এরাই বেছে দেয় কোন্ উদ্দীপকের প্রতি আমাদের সাড়া দেওয়া উচিত। আর কোন উদ্দীপকের প্রতি সার্থক সাড়া দেওয়া যে শিখন তা আমরা আগেই দেখেছি। এ জগতের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ নানাভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে উদ্দীপিত করতে চায়; কিন্তু যতক্ষণ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের একটিও ঠিকমত উদ্দীপনা অনুভব না করে ততক্ষণ সাড়া জাগে না, মন সক্রিয় হয় না। সংবেদন হল উদ্দীপকের দ্বারা সঞ্চারিত স্নায়ুমূলক অনুভূতি। এককথায় এটিকে শিক্ষাহীন এক প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করা যায়। এটি প্রত্যক্ষজ জ্ঞানের (Perceptual knowledge) সরলতম উপাদান এবং এটি একটি বিমূর্ত মানসিক অবস্থা। অপরপক্ষে সংবেদনের তাৎপর্যবোধ ঘটলে তা হয় প্রত্যক্ষণ। সংবেদনগুলো বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও পরস্পর সংযোগ বিহীন হতে পারে কিন্তু তাকে সমন্বিত করে যে ঐক্যস্থাপন করা হয় তাই-ই প্রত্যক্ষণ (Perception)। ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতা যখন সংবেদনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলে দেশকালে অবস্থিত কোন বস্তুর বোধ জন্মাতে সাহায্য করে, তখনই তা প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সংবেদনের সংব্যাখ্যান ও বোধই প্রত্যক্ষণ। এর সাহায্যে শিশু প্রথম পরিবেশ পরিচিতি লাভ করে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণ থেকে মানুষের মনে নানা রূপ প্রতিরূপ (Images) সৃষ্টি হয়। সামান্যীকরণ ও পার্থক্য নির্ণয়ের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও প্রতিরূপগুলোর সম্বন্ধে ধারণা (Concept) গড়ে ওঠে। কাজেই মানসিক বিকাশে ও জ্ঞান অর্জনে প্রত্যক্ষণের অপরিসীম অবদান আছে। তাই আমরা প্রত্যক্ষণ শিক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নরূপ আলোচনা রাখছি।

প্রত্যক্ষণ শিক্ষণ (Training in Perception): শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞান, বুদ্ধি বা চেতনার বিকাশে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মূল্য নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হয়েছে। কমেনিয়াস থেকে রুশো, পেস্তালৎসি, ফ্রয়েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদরা এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। আধুনিক যুগের অন্যতম মহিলা শিক্ষাবিদ্ মন্তেসরিও ইন্দ্রিয় শিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে শিক্ষাজগতে "দৃষ্টি-শ্রুতিনির্ভর

শিক্ষা সহায়ক উপকরণ" (Andio Visual aids) ব্যবহার 'যুগান্তকারী চেতনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। যদিও একথা ঠিক যে শিশুর প্রত্যক্ষণ-ক্ষমতা ধীরে ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তবুও তাকে ত্বরান্বিত ও ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়াসে নিয়মিত শিক্ষার মধ্যে আনতে হয়। কোন কোন বিষয়ে শিশুর প্রত্যক্ষণ-শিক্ষার প্রয়োজন আছে তা সর্বাগ্রে আমাদের জানা দরকার। স্থান, কাল, দূরত্ব, গভীরতা ত্রি আয়তন বস্তুর অন্তরালবর্তিতা (linear perspective), গতি, বর্ণ, বায়বীয় যথানুপাত বা দর্শনানুপাত (aerial perspective), লম্বন (parallax), শব্দ, ওজন, আয়তন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুকাল থেকেই যদি এ সমস্ত বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষণ দেওয়া না যায় তাহলে শিশুরা যথাযথ প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করতে পারে না। এসব দিকের কথা চিন্তা করে পেষ্টালৎসি বস্তুপাঠ (object lesson) দানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ফ্রয়েবেলের উপহারগুলো (gifts) উদ্ভাবিত হয়েছিল শিশুর ক্রীড়াপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও আত্মসক্রিয়তার চাহিদা মেটাতে। এগুলোর দ্বারা তিনি ইন্দ্রিয় শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। মন্তেসরি প্রচলিত আত্ম-সংশোধক যন্ত্রগুলো (Didactic apparatus) ইন্দ্রিয় শিক্ষণের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী ছিল। ছবি আঁকা, রঙ মেলানো, লেখা-পড়াও বস্তুনির্ভর পাঠের মাধ্যমে বস্তুর আকৃতি প্রত্যক্ষণ (form perception) সম্ভব হয়। এ ছাড়া দৃশ্যজ ও স্পর্শজ প্রত্যক্ষের জন্য কাগজ কাটা, কাদা বা প্লাষ্টিসিন দিয়ে মূর্তি গড়া, ছুঁচের কাজ কাঠের বা ধাতুর কাজ ইত্যাদি বহু রকমের কাজের সুযোগ রাখা প্রয়োজন। ডিউই, তাঁর ভাবশিষ্য কিলপ্যাট্রিক (*Kilpatrick*) এবং পরবর্তীকালে ষ্টিভেনসনের (*Stevenson*) প্রবর্তিত সমস্যা পদ্ধতি (Problem method) ও প্রকল্প-পদ্ধতির (Project method) সাহায্যে আর গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার সেবাগ্রাম পদ্ধতিতে (Sevagram method) ইন্দ্রিয়-শিক্ষণের ব্যাপক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ, হাতে কলমে শিক্ষা ও পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের সাহায্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা দান করা প্রয়োজন। শিক্ষার সকল স্তরেই ব্যাপক ইন্দ্রিয় উদ্দীপক উপকরণের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এ ব্যাপারে যথাযোগ্য নির্দেশনা করা দরকার।

এখন আমরা প্রত্যয়গঠন বা ধারণা সৃষ্টির আলোচনা করব।

প্রত্যয়ের বিকাশ (Development of Concept) **:** প্রত্যক্ষগঠনকে অনেকে জাতিজ্ঞান বলে আভহিত করেছেন। কারণ প্রত্যয় বলতে আমরা একটা জাতির বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝি বা তাদের মধ্যেকার একটা সাধারণ

গুণাবলীকে বুঝি। প্রত্যক্ষরূপ ও প্রত্যয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। প্রত্যক্ষরূপ ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত আর প্রত্যয়ের সম্পর্ক হল জাতি ও জাতির অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলোর সঙ্গে। প্রত্যয় হল সার্বিক ও বিমূর্ত আর প্রত্যক্ষরূপ হল মূর্ত ও বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা যে কেবল বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি, প্রাণী, বিষয়, ঘটনা অভিজ্ঞতা বা মানসিক প্রতিচ্ছবি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারি তা নয় আমরা এসবের গুণ, দোষ, ধর্ম, অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিমূর্ত জ্ঞান অর্জন করি। এ ধরনের বিশেষ বিশেষ বস্তু, বিষয় ও ঘটনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে তাদের মধ্যেকার গুণ বা তাদের থেকে বিচ্যুত বিমূর্ত সাধারণ জ্ঞানকে জাতিজ্ঞান (Concept) বলে।[1] প্রত্যয় জাতিজ্ঞান বা ধারণার (ইংরাজী প্রতিশব্দ 'Concept') ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'আমি একত্র করি।' (Latin : *Con*=together, *cipio ceptum*=I take)। ধরা যাক, কুকুর কথাটি। এটি একটি প্রাণীর সাধারণ নাম; একটি প্রাণীর শ্রেণীর নাম (common noun)। এটি কিভাবে ধারণায় পৌঁছায়। কুকুর নামধেয় সেই প্রাণী যার চারটে পা আছে, গতি আছে, ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। এই সাধারণ ধর্ম নিয়ে প্রাণী বা এই জাতীয়প্রাণীকে 'কুকুর' নামে অভিহিত করা যায়। তাই অনেকে 'প্রত্যয়'-কে বর্গীয় প্রতিরূপ (generic image), সাধারণ ধারণা, জাতিগত ধারণা, শ্রেণী ধারণা বা ভাব বলে মনে করেন।[2] ধারণা করা একটা মানসিক প্রক্রিয়া যা প্রত্যয় গঠনে পরিণতি পায়।[3] এটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তি থেকে শ্রেণীতে পরিব্যাপ্ত হয়। অনেক তখন একটিতে পরিণত হয়। বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান ধারণার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে কাজ করে। এ জ্ঞান প্রথমে থাকে ব্যক্তিক এবং মূর্ত, পরে তা সাধারণ ও বিমূর্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। এখন প্রশ্ন হল, প্রত্যয় আমরা কিভাবে পাই? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে এটুকু বলা যায় যে, বংশানুক্রমে আমরা কতকগুলো অতি সাধারণ জ্ঞান নিয়ে পৃথিবীতে আসি। স্থান ও কাল সম্বন্ধে জ্ঞান মোটামুটিভাবে সহজাত ও সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্গত। সহজাত সাধারণ জ্ঞানের পরিমাণ ও প্রত্যয়ের সংখ্যা প্রথমে নিতান্ত অল্প থাকে। পরবর্তীকালে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা অধিকাংশ প্রত্যয় লাভ করি। একই ধরনের

1. তুলনীয় : 'A concept is a representation in our minds answering to general name.'—Sully

2. Concepts are variously termed generic images, general notions, group notions, class notions or ideas—Dexter and Garlick.

3. Conception is a mental process which results in a concept.—Dexter and Garlick : Psychology in the school room.

জিনিসের গুণাগুণের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করে আমরা এদের অত্যাবশ্যক সাধারণ ধর্ম আরোপ করি এবং তারপর সেগুলো সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হই। প্রত্যয়ে সাধারণ ধারণায় ব্যষ্টির সুসংহতি ও অন্তর্ভুক্তির পরিমাণই বেশি, বিমূর্তের মধ্যে মূর্ত জিনিসের প্রকাশও বেশি। সুতরাং **প্রত্যয় গঠন এক ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া** (**Concept-building is a gradual process**)। প্রত্যক্ষ, প্রতিরূপ ও প্রত্যয়ের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা রাখা যেতে পারে।

প্রত্যক্ষ (Percept)	**প্রতিরূপ** (Image)	**প্রত্যয়** (Concept)
(১) সংবেদন ভিত্তিক	প্রত্যক্ষভিত্তিক	প্রতিরূপভিত্তিক
(২) বর্ণনামূলক	পুনঃ সংব্যাখ্যানমূলক	পুনঃ পুনঃ সংব্যাখ্যান মূলক
(৩) কোন জিনিসের উপস্থিতির সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়।	কোন জিনিসের স্মারক বা স্মৃতি চিহ্ন বোঝায়	শ্রেণী বা জাতি সম্পর্কে জ্ঞান দেয়
(৪) একটি 'বাস্তব' বস্তু	একটি 'চিত্রকল্প'	একটি প্রতীক'

সংবেদন—→প্রত্যক্ষ—→প্রতিরূপ—→প্রত্যয়

ধারণা'র বিভিন্ন স্তর (Stages in Conception)**:** নিম্নোক্ত চারটি স্তরের মধ্যে ধারণা জন্মায়, যেমন—

(ক) পর্যবেক্ষণ (Observation)

(খ) তুলনাকরণ (Comparison)

(গ) বিমূর্তিকরণ (Abstraction)

(ঘ) সামান্যীকরণ (Generalisation)

প্রথম স্তরে: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি এক বা ততোধিক বিষয়ে একে অপরের সদৃশ হয় তাহলে প্রত্যক্ষ বা প্রতিরূপ হিসেবে তাদের একত্র করা হয়—এটা পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় স্তরে: একই প্রত্যক্ষ বা প্রতিরূপ যখন মনে উপস্থাপন করা হয় তখন সহজাত প্রবণতার বলে তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খোঁজা হয় এবং সাদৃশ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়—এটা তুলনাকরণের ফলশ্রুতি।

তৃতীয় স্তরে: সাদৃশ্য কল্পনার উপর যে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে সেটা বৈসাদৃশ্য থেকে পৃথক করে নেওয়ার কারণে বিমূর্তিকরণ করা হয়। বিমূত

গুণগুলো প্রত্যয় গঠনের উদ্দেশ্যে একত্র করা[1] হয়—এটা বিমূর্তিকরণে ফলশ্রুতি।

চতুর্থ স্তরে : প্রত্যয় এবার মনে দৃঢবদ্ধভাবে উজ্জ্বলতর হয় এবং তখন এব জাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয় যে, উক্ত প্রত্যয়ানুযায়ী গুণগুলে তাদের মধ্যে বর্তমান আছে কিনা, ক্রমশঃ সেই শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়—এটা সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি।

শুদ্ধ প্রত্যয়ের কতকগুলো 'লক্ষণ' (Some marks of good concept) শুদ্ধ প্রত্যয়ের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

(ক) মূর্ত বস্তু বা উদাহবণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(খ) ব্যাপক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল—এতে সম্ভাব্য অশুদ্ধ ধারণাকে পরিহার করা যায়।

(গ) এটি স্পষ্ট সীমাযুক্ত বা নির্দিষ্ট। এব লক্ষণগুলো মনে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিভাত হয় এবং তার জন্যে এক জাতীয় বস্তুর প্রত্যয়ের মধ্যে কোনরকম বিভ্রম ঘটার ব একাঙ্গীভবনের (coalescence) ঝুঁকি থাকে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যয় গঠনেব অপরিসাম অবদা থেকে গেছে।

৩। কান্তরস সম্ভোগ (Aesthetic appreciation) ঃ

অনন্ত সৌন্দর্যের আধার এই পৃথিবীর বুকে মানুষ যেদিন প্রথম পদচারণা শুরু করল সেদিন থেকেই তার মনে জাগল রহস্যঘন নানা জিজ্ঞাসা। এক দিকে তা জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর চাহিদা, অন্যদিকে অপরূপ সৌন্দর্যের লীলানিকেতন পৃথিবীর প্রাণ আকুল করা হাতছানি। তাই জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর পবেই তা মন চাইল সম্ভোগের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তি। জীবনকে পূর্ণতর ও আনন্দময় করতে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। অচেনাকে চেনার, অজানাকে জানার ও তৃপ্তির স্বাদনার আকুল আগ্রহে সে চারিদিকে চোখ মেলে তাকাল। তাব আদিম চোখে সে দেখল বনানী স্নিগ্ধ ছায়া, বিস্তীর্ণ উদার নীলাকাশের নীলিমা, নাম-না জানা কত ফুলের সমারোহ কান পেতে শুনতে পেল নদীর কল্লোলোচ্ছ্বাস, বিহগের কলতান, বনের মর্মর ধ্বনি। অপরূপ সুন্দর সৃষ্টির, কান্ত রমণীয় রূপের সম্ভোগের চেষ্টায় তাব মন আন্দোলিত হতে লাগল। আদিম যুগেও তাব সে প্রয়াস আমরা দেখতে পাই

1. **'abstraction is the withdrawing of attention from certain things in order to fix it on others'—Sully.**

ফুল চয়ন করে আপন সাথীকে সাজানোর মধ্যে, বিচিত্র বর্ণে, আভরণে, চিত্রে জেকে অলঙ্করণের মধ্যে। তার পরিতৃপ্তি সে যুগে ছিল স্থূল, কলাকৌশল বর্জিত। ধুমাত্র ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যেই তার অবলুপ্তি ঘটেছিল। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। াপরিক্রমার পথে পথে সে নতুন করে সঞ্চয় করেছে তার তৃপ্তির স্বাদ, সম্ভোগের ানন্দ। তার সে প্রয়াস পরিবর্তিত হয়েছে, পরিশীলিত মনের সুচারু ভঙ্গীতে 'র্জিত হয়ে তার সৌন্দর্য সম্ভোগস্পৃহা জন্ম দিয়েছে বিচিত্র চারুকলার। আজ াই আমাদের সামনে অনির্বচনীয় আনন্দের উপচার সাজানো রয়েছে। অতি ক্ষ্ম, বিদগ্ধ ও লোকোত্তর সৌন্দর্য সম্ভোগরীতি, অনুভূতি, ভঙ্গী আজ আমাদের ংস্কৃতির আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে। বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে মানুষ আজ আপনসৃষ্টির ানন্দে বিভোর। তার সৃজনীপ্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর মেলে সাহিত্যে, শিল্পকলায়, ঙ্গীতে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে ও চারুকলায়। সৌন্দর্য সম্ভোগের সুবিপুল দেহবল্লরী আজ াই সুশোভিতা, সালঙ্কারা। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যময় রাজ্যে আজও চিরসুন্দরের খেলা েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাই বলা যায়, "ষড়ঋতুর উৎসবের বিচিত্র লীলার মধ্যে রম সুন্দরের (সৃষ্টিকর্তার) লীলা, ঘনমেঘে তাহার চরণ, শ্রাবণের ধারায় তাহার েহবাণী, কদম্বের বনে তাহার গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়, শরতের আলোক শতদলের উপর াহার চরণ, বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় তাহার স্পর্শ, বৃক্ষরাজি মৃত্তিকার মর্তপটে সুন্দরের প্রাণমূর্তি।" তাকে উপভোগ না করে মানুষের পার নেই। যা সুন্দর তা চিরায়ত ানন্দের আধার'[1]। তাই প্রকৃতির রমণীয় অবদান ও মানুষের সৃজনী প্রতিভার ৌন্দর্যসত্তার উপভোগ আমাদের পরম কাম্য। তা না হলে বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব সম্ভাবিত হবে না এবং আমাদের জীবন পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়ে ঠবে না। এসব কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে কান্তিবিদ্যা সম্বন্ধীয় উপলব্ধির গুরুত্ব রয়েছে। এর মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি, লক্ষণ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা শুধু আমাদের পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের কৌশল ায়ত্ত করা মাত্র নয়; এটা আজ আমাদের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও ান্দনিক বিকাশের সহায়ক বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

কান্তিবিদ্যা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব কাকে বলে? (What is aesthetics?): কান্তিবিদ্যার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Aesthetics' শব্দটি গ্রীকভাষার Aisthetikos াতুটি থেকে নিষ্পন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ প্রত্যক্ষ দেখা (to perceive)। এদিক দিয়ে Aisthetikos ধাতুটি সংস্কৃত 'ঈক্ষ' ধাতুর সমগোত্রীয়। Aisthetikos ধাতুটি

1. তুলনীয়: A thing of beauty is a joy for ever.—Keates

প্রাধানতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে বোঝায় এবং গৌণতঃ যে কোন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, এমন কি মানসিক সঙ্কলন বা সঙ্কল্প পর্যন্ত বুঝিয়ে থাকে। 'ঈক্ষ' ধাতুটিও এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ থেকে মানসিক সঙ্কল্প ও অনুভব পর্যন্ত বুঝিয়ে দেয়। দার্শনিক কাণ্ট অবশ্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধকে বোঝানোর উপর জোর দিয়েছেন তাই তিনি স্বজ্ঞা (intuition) কথাটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাছে বিষয়োপলব্ধি (empirical intuition) গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এটি এমন এক উপলব্ধি যা অপ্রতিহতভাবে আপন স্বাচ্ছন্দ্যে বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। দার্শনিক ক্রোচে aesthetic বলতে বীক্ষা শাস্ত্রকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে পর চিন্ময় তত্ত্বের (spirit) বীক্ষাশক্তি দ্বারা (aesthetic activity) যে উপলব্ধি হ তাকেই বিষয়োপলব্ধি বলে। 'কান্তি' কথাটির ব্যুৎপত্তি হল √কম্+ক্তি, অর্থা লাবণ্য বা সৌন্দর্য। সুতরাং 'সৌন্দর্য'-বিজ্ঞানই হল ইংরেজী 'aesthetics সৌন্দর্য কি? একথাব সহজ উত্তর খুব সহজে মেলে না। তবে এটুকু বলা য সৌন্দর্যসৃষ্টির মূলে আছে পরমসত্তার সর্বব্যাপী অভিব্যক্তি। আধ্যাত্মিক পটভূমি রেখে এ প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ভগবানের আনন্দ সৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত, মানবহৃদয় আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি।"[2] তবে ইংরেজী 'aesthetic' শব্দটির প্র প্রয়োগ করেন জার্মান শিল্প সমালোচক আলেকজাণ্ডার গট্‌লিয়েব বোমগার্টেন কান্তিবিদ্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে দার্শনিকদের মধ্যে সু তর্কবিতর্কের অন্ত নেই। তাই সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্দেশ না কর আমরা বলতে পারি রামধনুর সাতরঙের শোভা আমাদেব মুগ্ধ করে, শিল্পী আঁকা ছবির সুষমা মন ভোলায়, লীলায়িত ভঙ্গিব নাচেব ছন্দ মনে দোলা দে মধুর সঙ্গীতের সুর-মূর্চ্ছনা মন আবেশে ভবিয়ে রাখে, কবির মনের মাধু মেশানো কবিতার রসে আমাদের মন আপ্লুত হয়। আমরা অনুভব করি, উপল করি, সম্ভোগ করি, ভাবাবেগে ব্যাকুল হই আর মনে সঞ্চাবিত হয় এক স্থায়িভা যাকে বলি বসাস্বাদন। স্রষ্টার সঙ্গে রসিকজনেব একাত্মতা বা অভেদীকর (indentification) সৌন্দর্য উপভোগের মূলকথা। যার সৌন্দর্যানুভূতি নেই ত

---

1. তুলনীয় : Intuition is the immediate apprehension of a content which as giv is due to the action of an independently real object upon the mind. —Ka

2. 'সাহিত্যের তাৎপয।'

তুলনীয়: a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infin 'I A M'.—Coleridge (as quoted by S, K. Bhattarcharyya in এরিষ্টটলের পোয়েটিক সাহিত্যতত্ত্ব)

কাছে সৌন্দর্যের আবেদন ব্যর্থ হয়ে যায়। সৌন্দর্যানুভূতি মানুষের সহজাত জিনিস। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর প্রভূত সাক্ষ্য প্রমাণ মিলবে। সত্য ও শিব সুন্দরের দূত। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, "যে কোন জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকে সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।" সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের বোধশক্তিকে জাগ্রত করা দরকার। এই সৌন্দর্যবোধ কি করে আমাদের মনে জাগে তা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

সৌন্দর্যবোধ কি? (What is aesthetic appreciation?): সৌন্দর্য সম্ভোগ চিত্তের অনুভূতি দিয়েই সম্ভব, বুদ্ধি দিয়ে একে বিচার করতে যাওয়া ভুল।

ভালেন্টিনের মতানুযায়ী সৌন্দর্যবোধকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি।[1]

(ক) সৌন্দর্য উপলব্ধিতে কোন প্রক্ষোভ জাগে।

(খ) সেই প্রক্ষোভকে আমাদের রীতিমত ভাল লাগে—

(গ) অবশ্য যা ভালো তাই যে সুন্দর তা নয়। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাই এখানে বড়। দুঃখ বা বেদনাজনিত অভিজ্ঞতাও অনেকের কাছে তৃপ্তি নিয়ে আসে। তবে একে সর্বজনীন ভালোলাগা বলা যায় না। আনন্দ ও সৌন্দর্য সম্ভোগ তাই এক কথা নয়।

(ঘ) সৌন্দর্য উপলব্ধির স্বতন্ত্র কোন প্রক্ষোভ নেই। অনেকগুলো প্রক্ষোভের সুসঙ্গত সমাবেশে একটি বিশেষ প্রতিন্যাস গড়ে ওঠে। তাই আমরা সুরের ঐকতান (symphony) ভালবাসি, কোন জিনিসের সামগ্রিক ছান্দিক সুষমায় আকৃষ্ট হই।

(ঙ) সৌন্দর্য সম্ভোগের ক্ষেত্রে সব সময় যে আমাদের ব্যক্তিক অনুভূতির (subjective feeling) প্রাধান্য থাকবে এমন কথা নেই। কোন দৃশ্য বা চিত্র দেখতে দেখতে আমরা এত বেশি দৃশ্য বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করি যে তাতেই আমরা হারিয়ে যাই; তখন আর নিজের কথা, বস্তুর মূল্যবিচারের কথা চিন্তা করি না। তাই আমাদের প্রতিন্যাস তখন অনেকটা নিরাসক্ত হয়ে পড়ে।

(চ) আমাদের মনকে ধরে রাখার জন্যে দৃশ্যমান বস্তুতে কিছুটা জটিলতা থাকা প্রয়োজন অথচ বোধের সুবিধার জন্যে সেখানে সংহতি বা ব্যাপকতাও থাকবে, না হলে আমাদের কান্ত প্রতিন্যাস বিচারের মায়াজালে বিভ্রান্ত হতে পারে।

---

1. (a) There is some stimulation of emotion or at least of some feeling.
   (b) This feeling is usually pleasent to a high degree.
   (c) Yet pleasure and aesthetic enjoyment are not identical.

৪। কান্তরস সম্ভোগ: মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (Psychological interpretation of aesthetic appreciation) ঃ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে কান্তরসের উপলব্ধিতে সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, রস ও প্রতিন্যাস ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলেই আমরা জগতকে, জীবনকে দেখি। জীবন বিকাশের প্রাথমিক স্তরে আমরা সুন্দর অসুন্দরের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করতে পারি না। আমরা তখন যা দেখি, যা শুনি, যা আস্বাদন করি, স্পর্শ করি, আঘ্রাণ নিই—সবই নতুন, তাই অবাক বিস্ময়ে সবই মনোহর বলে মনে করি।

মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

তারপর ক্রমশ: জীবন-পথ পরিক্রমায়, সমাজের ব্যাখ্যায়, পরিবেশের শিক্ষায় আর ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে চিনতে পারি কোন্‌টা শ্রেয়:, কোন্‌টা সুন্দর, কোনটা গ্রহণীয় আর কোনটা অসুন্দর বলে হেয় এবং বর্জনীয়। আমাদের স্থূল প্রবৃত্তি গুলো ক্রমে উন্নত, সভ্য ও পরিমার্জিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পরিশুদ্ধ হয়, উৎকর্ষিত হয়। পরিশীলিত সুচারু দৃষ্টিভঙ্গিতে তা স্থায়ী মনোভাবে পরিণত হয়। সুন্দরকে আশ্রয় করে আমাদের প্রক্ষোভ জাগে, প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে রস, রস থেকে রুচি জন্ম নেয়, রুচি গড়ে তোলে প্রতিন্যাস। সৌন্দর্যবোধের প্রতিন্যাস গড়ে উঠলেই বিশ্বজগৎ ও মানবসৃষ্ট সৌন্দর্য সম্ভার আমাদের কাছে সম্ভোগের আবেদন নিয়ে আসে। আমাদের গ্রহণাত্মক মন কল্পনার নৌকায় ভর দিয়ে সৌন্দর্যের সাগরে ভেসে বেড়ায়। সুতরাং সৌন্দর্য সম্ভোগে প্রতিন্যাস ও কল্পনার মিলিত ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কান্তরসাশ্রয়ী ব্যাখ্যা

সৌন্দর্য রূপ মূর্ত ও বিমূর্ত দুইই হতে পারে। যখন তা বিমূর্ত ভাববস্তুকে কেন্দ্র করে সঞ্চারিত হয় তখন তাকে বলে কান্তরস।

(d) There is however, unique emotion which we can lebel the aesthetic emotion. The essential thing is rather a harmonious blend of feelings and a certain attitude of mind.

(e) Our attitude towards something beautiful is essentially 'disinterested'. In the moment of true aesthetic appreciation we are not thinking of ourselves, or of the cash value of the object. the more complete our aesthetic appreciation is, the more our attention is concentrated on the object itself.

(f) To hold our attention for more than a few moments there must be a certain degree of complexity in the object. and yet, to facilitate apprehension, there must be unity and comprehensibility in the object —Valentine—Psychology and its bearing on Education.

তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখি :

'স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি সব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে কণ্ঠস্বরে
জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায়
বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়।'

এখানে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ, বিশ্বসৌন্দর্য দেখে পরম বিস্ময়, প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে অসীমকে ব্যক্ত হতে দেখা, নিবিড় গভীর সৌন্দর্যবোধ ও বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রবাহিত আনন্দ ধারাকে আপন অনুভূতির মাঝে পাবার জন্যে কবির অন্তবিহীন আকুতি।

কবি সমর সেনের লেখায় পাই :

'অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসংগতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপর ঝরুক মহুয়ার ফুল—
নামুক মহুয়ার গন্ধ।'

এখানে কবি হৃদয়েব আকুতি চমৎকাবভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

শেলীর কবিতায় দেখি :

'Thy light alone like mists o'er mountains driven
...or monlight on a midnight stream
Gives grace and truth to life's unquiet dreams.'

উপরি উল্লিখিত সব কটি উদ্ধৃতিতেই সৌন্দর্যরসাশ্রয়ী রসের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। কবিরা সুন্দর বস্তুকে উপভোগ করে আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছেন। কান্তরস গড়ে ওঠে কোন জিনিসের সুসঙ্গত গঠন পারিপাট্যে, বর্ণ সুষমায়, ধ্বনি বৈচিত্র্যে, লীলায়িত ছন্দ ভঙ্গিমার সঙ্গে নিবিড় আত্মিক যোগাযোগ, সান্নিধ্য ও পরিচয়ের মধ্য দিয়ে।

৫। কান্তরসের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of aesthetic appreciation) :

কান্তরসের বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে, যেমন :

(১) কান্তরস লোকোত্তর, অতীন্দ্রিয় আনন্দের আধার। এ রস নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম ও কোন স্থূল উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত নয়।

(২) ব্যক্তিক দৈনন্দিন জীবনের কালিমা একে স্পর্শ করতে পারে না, তাই এর সর্বজনীন আবেদন আছে। সুন্দর বস্তুকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিক অভিব্যক্তি কালক্রমে নৈর্ব্যক্তিকতায় পরিণত হয়।

(৩) এ রসের সম্ভোগে উপভোগের স্পৃহা বাড়ে বই কমে না। তাই কবিকে বলতে শুনি—"ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে।"

(৪) এ রস নিঃস্বার্থতা ও ইন্দ্রিয় উপলব্ধিজনিত হয় বলে—দৃষ্টি ও শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ ও ধ্বনি একে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে।

(৫) এ রসের উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় ও সুসঙ্গত রসসৃষ্টিতে অপরিহার্য বলে গণ্য হয়।

(৬) রসবস্তু বা ভাবকেন্দ্রিক চিত্তবৃত্তি সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐ বস্তুর প্রতি একটা স্থায়ী অনুরাগ গড়ে তোলে। এতে রস বিকাশের সহায়তা ঘটে।

(৭) কান্তরসে প্রতিরূপধারা ও চিন্তাধারার অপূর্ব ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। চরম উৎকর্ষের পর্যায়ে কান্তরস মহিমান্বিত এক রসের সৃষ্টি করে তাই সুন্দর বস্তুকে কেন্দ্র করে শ্রদ্ধা ও ভয়মিশ্রিত অনুভূতি মনকে আপ্লুত করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী
গিরিশৃঙ্গ মালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী
অন্নপূর্ণা তুমি, সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।[1]

অথবা,

Thou glorious mirror where the Almighty's form
Glasses itself in tempests, in a time—
Calm or convulsed ; in breeze, or gale or storm ,
Iching the pole or in torrid clime
Dark evening—boundless, endless, sublime,[2]

(৮) কান্তরসের উপলব্ধিতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরিচিতির প্রয়োজন আছে।

(৯) এ রস সম্ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যও আছে কারণ সবাই একই

1 'পৃথিবী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

. 'Childe Harold'— Lord Byron.

বস্তুর থেকে সমান উপভোগ্যতা লাভ করতে পারে না। সকলে আবার চিত্রকলা, সঙ্গীত, কাব্যপাঠ বা ছন্দ ইত্যাদির প্রতি সমানভাবে আকৃষ্ট হয় না।

অতীন্দ্রিয় (Mystic) অনুভূতি কান্তরসের এক মূল্যবান উপাদান। এ অনুভূতি সহজলভ্য নয় তবে কখনও কখনও এ অনুভূতি আমাদের মনকে গ্রাস করে তখন দৃশ্য বা শ্রুত কোন বস্তুর খণ্ড খণ্ড রূপ আমাদের সামনে থাকে না, তা এক অখণ্ড ঐক্যসত্তায় পরিণত হয়। প্রতিটি চেতনা মিলেমিশে এক চেতনার জন্ম দেয়। ঐ একাত্মতা প্রসন্ন সৌন্দর্যের আলোকে উদ্ভাসিত।

৬। কান্তরস উপলব্ধির শিক্ষাগত-তাৎপর্য (Educational significance of aesthetic appreciation) :

কান্তরস কি, তার স্বরূপ কি ও বৈশিষ্ট্য কি কি তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এখন আমাদের সামনে একটা প্রশ্ন, তাহল এর শিক্ষাগত কোন তাৎপর্য আছে কি? এই আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ করে জীবনকে প্রাণরসে রসায়িত করতে হয়। ব্যক্তির জীবনকে যদি সার্থকতায় ভরিয়ে তুলতে হয় তাহলে পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শিক্ষা এই প্রস্তুতির মস্ত বড় হাতিয়ার। তাই তার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে 'ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিকে' আমরা পেয়েছি।[1] ব্যক্তির জীবনে তাই কান্তরসের সম্ভোগ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। উপরন্তু ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং তার বিকাশেও সৌন্দর্যবোধের মূল্য আছে। সৌন্দর্যবোধের বিকাশের মধ্য দিয়ে স্থূল কামনা-বাসনা ও নিতান্ত জৈবিক চাহিদাজনিত গ্লানি আমরা দূর করতে পারি। কান্তরসের উৎকর্ষে চিত্তবৃত্তির উদ্‌গতিসাধন হয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অজস্র সহস্রবিধ হৃদয়াবেগ ও কামনা পরিতৃপ্তির অভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। এই অবরুদ্ধতার এবং অপরিতৃপ্তির ফলে মানসিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়। কোন সৌন্দর্য-বোধক শিল্পের মাধ্যমে অতৃপ্ত কামনাবাসনাকে তৃপ্তির পথে চালনা করা যায়। বাসনাময়ী কল্পনা শিল্প সৌন্দর্যের উপভোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে। এর ফলে চিত্ত বিক্ষোভ প্রশমিত হয়। মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে এবং অস্মিতাগঠন সুসমঞ্জস হয়। সে জন্যে কান্তরস সম্ভোগকে ব্যক্তিজীবনে বিরেচন বা ভাব-মোক্ষণের (Catharsis) অন্যতম পন্থা বলে বর্ণনা করা যায়। আমরা

1. 'Education is the preparation for complete living in future,'
—Herbert Spencer.

দেখি যে শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনে, ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশে ও মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখার পশ্চাতে কান্তরস সম্ভোগের অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

৭। কান্তরস সম্ভোগের শিক্ষণ (Training in aesthetic appreciation):

ইংরেজী সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক এক সময় বলেছিলেন যে, এক যুবককে ভালবাসতে শিক্ষা দেওয়া তাকে সাহিত্যরসোপলব্ধির শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে সহজ কাজ। একথা দৃশ্যশিক্ষণ ও সঙ্গীতের রসসম্ভোগের পক্ষেও সমভাবে সত্য। কান্তরস সম্ভোগের শিক্ষাদানে কতকগুলো নীতি ও পদ্ধতি স্থির করা যেতে পারে। সেগুলো হল:

(ক) সৌন্দর্যবোধের বিকাশে ব্যক্তিগত বৈষম্য নীতিকে স্বীকার করে নিয়ে উপযুক্ত ইন্দ্রিয় শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

(খ) সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থীকে নানা সুন্দর বস্তু ও ভাবের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। বস্তু বা ভাবের সান্নিধ্যই তাদের রস-সম্ভোগের পথ সুগম করবে।

(গ) নানা রকম সহ-পাঠক্রমিক বাঞ্ছিত কর্মধারার মধ্য দিয়ে কান্তরস-সম্ভোগের রুচি ও প্রতিন্যাস গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের পরিমার্জনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

(ঘ) সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদর্শন ও কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে নন্দনরসবোধ জাগাতে হবে। সুসঙ্গতিবোধ, গঠনপরিপাট্য এবং প্রকাশভঙ্গির ওপর জোর দেওয়া বিশেষ দরকার। যথাযথ অনুরাগ সৃষ্টি, রম্য রস উপলব্ধি ও সহৃদয় হৃদয় সংবাদীমন ও অনুভূতি কান্তরস সম্ভোগের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান, একথা কখনোই ভোলা উচিত নয়।

(ঙ) সৃজনীমূলক কল্পনার সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে নৃত্যকলা শিক্ষা, সঙ্গীত শিক্ষা, সাহিত্য পাঠ, আলোচনা চক্র, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার, কারণ এগুলোর মধ্য দিয়েই সার্থক সৃজনী কল্পনার বিকাশ সাধিত হয়।

(চ) কান্তরসসম্ভোগে অভিভাবনের (suggestion) বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। শিক্ষক শিক্ষিকার সত্যিকার উৎসাহ-উদ্দীপনা শিক্ষার্থীর কাছে পরশ পাথরের মতো কাজ করে। তাঁদের অভিভাবন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে নন্দনরস সংগঠিত করে।

(ছ) শিক্ষার্থীরা এ রসসম্ভোগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সার্থক অবসব যাপনেব শিক্ষা লাভ করে। আলোচিত পদ্ধতিগুলো সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তাই বিদ্যালয় ও বৃহত্তর পরিবেশে উপযুক্ত ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কান্তরসের সম্ভোগ-শিক্ষার সুপরিকল্পিত সূচী প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

৮। মানুষের শিখনে প্রভাবশীল উপাদান সমূহঃ (Influencing factors in Human Learning):

বহু উপাদান মানুষের শিখনকে সহায়তা করে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান কারণগুলোকে নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:

(ক) মনোবৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহ (Psychological factors)
(খ) শারীরবৃত্তীয় উপাদানসমূহ (Physiological „)
(গ) ভৌত উপাদানসমূহ (Physical „)
(ঘ) সামাজিক উপাদানসমূহ (Social „)

(ক) **শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহ**: মানুষেব শিখনেব ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহ সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবী করতে পারে; কারণ প্রকৃতপক্ষে শিখণ একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। এর মধ্যে নিম্নোক্তগুলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য:

(i) **সাধারণীকরণ** (Generalisation): যখন কোন ব্যক্তি বহু সদৃশ ও তুলনামূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় তখন সে সেগুলোব মধ্যে একটা সাধারণ উপাদান (common element) উপলব্ধি কবাব চেষ্টা করে এবং তার ভিত্তিতেই একটা সাধারণ সূত্র গঠন করে। এই সাধারণীকরণ পববর্তী কালে তার আচরণকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। এ প্রক্রিয়াটি প্রত্যয গঠনের স্তরে খুবই কার্যকর।[1]

(ii) **সরলীকরণ** (Facilitation): শিখনের পক্ষে সরলীকরণ প্রক্রিযাবও অবদান স্বীকার করতে হয, কারণ নানা প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সহজ ও উপযোগী অভিজ্ঞতা অর্জন। যে সমস্ত ক্রিযাকলাপ তার কাছে সরল, কৌতূহলোদ্দীপক বলে মনে হয় সেগুলো সে যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে শেখার চেষ্টা করে। সহজ সরল জিনিস শিখতে বা তাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন কবতে স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধকবা শিখন-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এটি মনোযোগের নিদেশনাব ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[2]

---

1. 'a thought process at the conceptual level through which a general concept is formed.
2. 'used for the effect of direction of attention in giving prior entry to the stimulus attended to.'—Drever.

(iii) **পৃথকীকরণ** (Differentiation) : মানুষ দু'টি বস্তুর বা কাজের মধ্যে সাদৃশ্যস্থাপন করার চেষ্টা এবং তার ভিত্তিতে নিজের অভিজ্ঞতা গঠন করার সময়ই তাদের মধ্যেকার বৈসাদৃশ্যের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব করে। তাই সাধারণীকরণের সঙ্গে সঙ্গে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াও চালাতে থাকে। তখন তার মন ব্যক্তি, বস্তু বা কাজের মধ্যে অন্তর্নিহিত বৈসাদৃশ্যকে প্রকাশ করার জন্য তুলনামূলক বিচারের চেষ্টা করে। এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তার বিচার ক্ষমতা দৃঢ় হয় এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে শিক্ষণকে বিচিত্র ও বহুমুখী করে তোলে।[1]

(iv) **বাধ** (Inhibition) : এটি প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী এক মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান। এর নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটি কোন-না-কোন মানসিক প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রকাশকে বাধা দেয়। একে কোন সময় প্রান্তীয় (Peripheral) আবার কোন সময় কেন্দ্রীয় (Central) ব্যাপার বলে মনে হয়। উৎপত্তির ও প্রকাশের দিক দিয়ে 'বাধ'—শারীরিক ও মানসিক দুই-ই হতে পারে। এর ফলে শিখনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং শিখনসঞ্জাত বাঞ্ছিত ফললাভ সম্ভব হয় না।[2]

(v) **সমন্বয়ন** (Integration) : এটি এমন এক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে শিখনের বিভিন্ন স্তর বা উপাদানকে সামগ্রিক রূপ দিতে পারে। এটি না থাকলে জটিল শিখন ক্রিয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, উপরন্তু ব্যক্তিত্ব সংগঠনের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ার অপরিসীম গুরুত্ব থেকে গেছে। এটির বলেই মানুষ তার শেখা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত অন্তর্দৃষ্টির উন্নতি করতে পারে।

(vi) **প্রত্যাশা** (Expectancy) : প্রত্যাশা মানসিক প্রস্তুতির পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। শিখন-প্রক্রিয়ায় তাই এর প্রভাব রয়ে গেছে। শিখনের উপযুক্ত ফললাভের প্রত্যাশা শিক্ষার্থীকে নানা বিভ্রান্তকর আকর্ষণের হাত থেকে রেহাই দেয়। তাই শিখন-বিষয়ে উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্যে প্রত্যাশা জাগানোর এত প্রয়োজন।

(খ) **শারীরবৃত্তীয় উপাদান সমূহ :** শিখন একটি নিছক বিশুদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ামাত্র নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে এক দেহমনগত প্রক্রিয়া। কারণ শিক্ষক ব্যক্তির দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাই শারীরবৃত্তীয় উপাদানগুলোর

1. 'progressive change, in evolution or in development.'
2. Condition where a function or some circumstances prevents the manifestation of some other function or activity or mode of expression, the phenomenon may be either peripheral or it may be central and may be physical or mental in manifestation.—Dictionary, of Psychology :—Drever.

আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এ জাতীয় উপাদানের উল্লেখ করা হল :

(i) **অবসাদ** (Fatigue) : অবসাদগ্রস্ত হলে ব্যক্তির শিখন হ্রাস পায় এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল শিখনলব্ধ অভিজ্ঞতাও দ্রুত বিস্মৃতি। অবসাদ মানসিক, শারীরিক, স্নায়বিক সব দিক থেকেই আসতে পারে। তাই শক্তি, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা দরকার। পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে না পারলে শিখন যথাযথ হয় না।

(ii) **ভেষজ উপাদান ও মাদকদ্রব্য** (Drugs and Intoxicants) : শিখনের উপর এদের প্রভাব খুবই অশুভ ফল দেয়। মাদ্রকদ্রব্যগুলো সকল সময়ই এমন বাধার সৃষ্টি করে যে সুষ্ঠু শিখন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভেষজ উপাদান প্রয়োগ করে ব্যক্তির শারীরিক ক্ষমতা অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে পেশীর বা কায়িক শ্রমের নৈপুণ্য দেখাবার (Dexterity) প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে ভেষজ উপাদান সাময়িকভাবে কার্যকর হতে পারে; কিন্তু মাদকদ্রব্য সবতোভাবে বর্জন করা উচিত।

(iii) **অসুস্থতা** বা **রোগ** (Illness or Disease) : শারীরিক বা মানসিক যে ধরনের অসুস্থতাই হোক না কেন তা শিখনের পক্ষে বাধা স্বরূপ। অপর পক্ষে সুস্থতা শিখনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গ্রহণ-ক্ষমতা বা কার্যক্ষমতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কখনই পৌঁছুতে পারে না।

(iv) **উত্তেজিত শারীরিক অবস্থা** (Excited physical condition) : প্রাক্ষোভিক উত্তেজনা শিখনকে ব্যাহত করে। শরীরের উত্তেজিত অবস্থা ব্যক্তিকে এত বেশি বিব্রত করে যে তার মনঃসংযোগ ক্রিয়া সঠিক হয় না ফলে শিখনও ত্রুটিপূর্ণ হয়। মনের উত্তেজিত অবস্থায় ব্যক্তি শিখনের বিভিন্ন স্তরে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়।

(v) **যৌন পার্থক্য** (Sex differences) : যদিও অনেকে এটিকে খুব একটা প্রভাবশীল উপাদান হিসেবে গণ্য করেন না তবুও কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এই পার্থক্য থাকার দরুন বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জনে স্ত্রী-পুরুষের ক্ষমতার তারতম্য ঘটে থাকে।

(vi) **বয়স ও পরিণমনের পার্থক্য** (Difference of age and maturity) : বিশেষ বিশেষ শিখন বা কাজের ক্ষেত্রে পরিণমনের একটা বিশেষ স্তর অতিক্রম করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বয়স, পরিণমন প্রক্রিয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে কাজ

করে। সব বয়সেই এক ধরনের শিখন-প্রক্রিয়া চালানো যেমন মনোবিজ্ঞান সম্মত নয় তেমনি জটিল শিখনের ক্ষেত্রে পরিণমনের বিশেষ ভূমিকাও স্মরণে রাখতে হয়।

(গ) **শিখনের ভৌত উপাদান সমূহ :** মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে। এই পরিবেশ তার শিখন ও সামগ্রিক আচরণ ধারাকে প্রভাবিত করে, সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের বহু উপাদান মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। উদাহরণস্বরূপ, বিশুদ্ধবায়ু, তাপমাত্রা, আলোর পরিমাণ, বাহ্যিক কোলাহল, আর্দ্রতার অনুপাত এবং অন্যান্য আবহাওয়া সংক্রান্ত বহুবিধ প্রভাবের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ঘ) **শিখনের সামাজিক উপাদান সমূহ :** মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক পরিস্থিতি প্রভূত পরিমাণে তার আচরণ ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন তার শিখনকে প্রভাবিত করে, সামাজিক উপাদানগুলোও তেমনই শিখনের গতি, প্রকৃতি ও স্বরূপকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়। কয়েকটি বিশেষ সামাজিক উপাদান নিম্নে উল্লিখিত হল :

(i) অনুকরণ (Imitation)

(ii) অভিভাবন (Suggestion)

(iii) সহানুভূতি (Sympathy)

(iv) প্রশংসা ও নিন্দা (Praise and blame)

(v) প্রতিযোগিতা (Competition)

(vi) সহযোগিতা (Co-operation)

উপরি উল্লিখিত সামাজিক উপাদানসমূহ ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা দলগত শিখনের ক্ষেত্রে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এদের সম্বন্ধে পূর্বে বিশদালোচনা করা হয়েছে।

শিখনের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়া (Genetic process in Learning) : মানুষের শিখনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই প্রতিভাত হয় যে এটি একটি উদ্ভব সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ এর উৎপত্তির বিবর্তন বিকাশ ও পরিণতি আছে। এর দ্বারা শিখনকে সংগঠিত ও সুসংবদ্ধ (organise and systematize) এবং এর মূল নীতিগুলোকে কতখানি ফলদায়ক করে তোলা যায়। উদ্ভবের দিক থেকে শিখন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ মৌল উপাদানসমূহকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে :

(১) **শিক্ষার্থীর সচেতন প্রয়াস** (Orientation of the educand) : শিখনের সমস্যাগুলোকে গোচরে আনা ও পরীক্ষা করার মধ্যে এই সচেতনতার

আভাস থেকে যায়। শিক্ষার্থী সমস্যাসমাধানে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তা তাকে কোন পরিস্থিতির বোধ ও উপলব্ধির ব্যাপারে প্রভূত সহায়তা করে থাকে। শিখনের পূর্বে তাই শিক্ষার্থীকে এর উদ্দেশ্য, প্রতিবন্ধকতা, প্রয়োজনীয় উপাদান সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। উদ্দেশ্য সফল করার পথে সকল বাধা দূর করার জন্যেও প্রস্তুতি আনতে হয়। এতে অযথা শক্তি-সামর্থের অপচয় রোধ করা যায়। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা কাল্পনিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এর মধ্যে কিছু প্রতিবন্ধকও থাকে। এই বাধাগুলো লক্ষ্যের দিক থেকে নঞর্থক ফল দেয়। এগুলো উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রতিকূল। তাই শিক্ষার্থীকে শিখনের উদ্দেশ্য এবং তার প্রতিবন্ধকগুলো সম্বন্ধে সচেতন করার দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর এসে পড়ে।

(২) **শিক্ষার্থীর আবিষ্কার প্রয়াস** (Exploration): শিখনের পক্ষে সহায়ক অবস্থার খোঁজে শিক্ষার্থী উদ্দেশ্যসাধক সমস্ত উপাদানগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে। দক্ষতা অর্জন করার জন্যে সে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে তারও ব্যাপক সন্ধান তাকে চালাতে হয়। শিক্ষার্থী যদি ঠিক ঠিকমত সচেতনতা আনতে পারে তাহলে তার আবিষ্কার প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হয়। শিক্ষকরা এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়োজনানুগ নির্দেশনা দেবেন কিন্তু সূত্র খোঁজার ভারটা সবটাই যেন শিক্ষার্থীর উপর পড়ে। এতে তার আত্মপ্রয়াস জাগে এবং সে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ পায়।

(৩) **শিক্ষার্থীর সম্প্রসারণ প্রয়াস** (Elaboration): আবিষ্কার প্রয়াসের দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখেনর সমস্যাবলী সমাধানের সম্ভাব্য পথ খুঁজে পায় এবং তাদের সম্প্রসারণশীলতার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। এ প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করেই শিক্ষার্থী পরবর্তী পর্যায়ে চিন্তার উচ্চতর ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টাগুলোকে সংহত এবং প্রয়োজনমত সম্প্রসারণ করে। এবার সে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। এমন কি সেগুলোর সঙ্গে তার নিজের কি সম্পর্ক আছে তার মূল্যায়ন করতে চায়। শিক্ষক এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন-প্রয়াসে সাহায্য করতে পারেন।

(৪) **উপায়ের গ্রন্থিলতা** বা **স্পষ্টতা নির্ণয়** (Articulation of the means): আবিষ্কার ও সম্প্রসারণের ফলে শিক্ষার্থী লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় নির্ধারিত করে। এরপর তার কাজ হল যে, শিখনের অভীষ্ট লক্ষ্যের পথে যে সমস্ত গৌণ উদ্দীপক থাকে তাদের সংখ্যা কমানোর বা মাত্রা হ্রাস করার (Cue reduction) চেষ্টা করা। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে তার উপায়গুলোকে সংহত ও গ্রন্থিভুক্ত করতে হয়। প্রতিটি গৌণ উদ্দীপককে বিশ্লেষণ করে দেখে ঠিক করতে হয় কোনটা

সত্যকার সূত্র (True cue) হিসেবে লক্ষ্যের অভিমুখে যাওয়ার সুবিধা করে আর কোনটা বিভ্রান্তিকর সূত্র হিসেবে (False cue) বাধা দেয়। এ কাজটার উপরই তার শিখনের উদ্দেশ্যসিদ্ধি নির্ভর করে। শিক্ষকরা এখানে সন্তোষজনক সূত্র চিনে নেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে পারেন।

(৫) **সরলীকরণ** (Simplification): এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষার্থী বাধাদানকারী সূত্র থেকে তার মনোযোগ ফিরিয়ে নিতে পারে। উপযুক্ত পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এ কাজ সম্পন্ন করে। জটিল কোন শিখন পরিস্থিতির উপলব্ধিতে সরলীকরণ পদ্ধতি খুবই কার্যকর। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশ দানের মাধ্যমে শিখনের কাজ ত্বরান্বিত করতে পারেন।

(৬) **শিক্ষার্থীর স্বয়ংক্রিয়তা** (Automatisation): সরলীকরণ ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর লক্ষ্যে পৌঁছাবার বোধ প্রচেষ্টাপদ্ধতিও প্রয়োজনীয় দক্ষতা আপনা থেকেই সম্ভব হয়। এর জন্যে সে অনেক পরিশ্রম বাঁচাতে পারে। পরবর্তী কালে অন্য কোন সৃজনধর্মী কাজের জন্যে শক্তি সঞ্চয় তার পক্ষে সম্ভব হয় স্বয়ংক্রিয়তা অর্জন করা যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই এ স্তরে উপনীত হবার আগে পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে প্রভূত শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হয়। তবে একবার এ স্তরে এসে গেলে তার পক্ষে শিখন অনেক সহজ হয়ে যায়। সরল থেকে জটিল আচরণ সম্পাদনের মধ্য দিয়েই তাই শিক্ষার্থীকে এগিয়ে যেতে হয়।

(৭) **পুনরুদ্দীয়মানতা** (Reorientation): এটির মধ্যে নতুন ভাবে সাধারণীকরণের (new generalisation) প্রয়োজন হয়। শিখনের কোন সমস্যা সমাধানের পরই এই প্রক্রিয়া সম্ভব। একই প্রকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন শিখন পরিস্থিতির যথাযথ মোকাবিলা করার জন্যে পুনরুদ্দীয়মান প্রচেষ্টার প্রয়োজন। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে একে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন। এটা শিখনের সমস্যা সমাধানকল্পে শিক্ষার্থী যে দক্ষতা বা নৈপুণ্য অর্জন করে তাকে শক্তিশালী ও পরিবর্ধিত করে তোলে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সংশয়াতীতভাবে বলা যায় যে শিখনের উদ্ভব ও তার বিকাশ এবং পরিণতিতে শিক্ষার্থী যাতে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্যে শিক্ষককে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

৯। শিখনের সঞ্চালন (Transfer of training or learning):

বিদ্যালয়-পাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন (Transfer in School-subjects): বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সঞ্চালনধর্মিতার উপর বহু গবেষণা হয়েছে।

পূর্বে শিখনের সঞ্চালন মাধ্যম হিসেবে কাজ করার উপযুক্ততা বিচার করে বহু বিষয় পাঠক্রমভুক্ত করা হয়েছিল। অনেকে মনে করতেন পাঠ্যবিষয়ের সঞ্চালন ক্ষমতার উপর শিখনের সাফল্য নির্ভর করে। ব্রিগস্ (*Briggs*), উইঞ্চ (*Winch*), থর্নডাইক (*Thorndike*), ওয়েসম্যান (*Wesman*), রাগ (*Rugg*) প্রমুখ বহু গবেষক এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। তাঁদের গবেষণা থেকে বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ের সঞ্চালন প্রকৃতি সম্বন্ধে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

প্রথমেই ব্যাকরণ পাঠের প্রসঙ্গে আসা যাক। মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্বের প্রবক্তারা একথা জোরের সঙ্গে দাবী করতেন যে ব্যাকরণ পাঠে যুক্তিক্ষমতা বা বিচার শক্তি পরিপুষ্টি লাভ করে। কিন্তু ব্রিগস দেখিয়েছেন যে, সমবুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের দুটি দলে বিভক্ত করে তিন মাস ধরে একদলকে ভাষা ও রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং অপর একদলকে কেবলমাত্র ব্যাকরণ পড়ানো হয়েছিল। তিন মাস পরে উভয়-দলকেই পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ব্যাকরণ পড়া-দল কেবলমাত্র সাদৃশ্য ও বৈষম্য নির্ধারণ যোগ্যতা ছাড়া ভাষা শিক্ষার অন্য কোন দিকে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করতে পারেনি। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সাদৃশ্য ও বৈষম্য ধরতে পারার ক্ষমতা ছাড়া ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে কোন গুণ সঞ্চালিত হয় না। ভাষা শিক্ষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিচার করলে এই সঞ্চালনকে নিতান্ত নগণ্য বলতে হয়। গণিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা সঞ্চালিত করা। এমন কি গণিতের হিসাব-গণনার উপর বিশেষ শিক্ষণ দিলে তা বিচারকরণ ক্ষমতা বাড়াতে সঞ্চালিত হয় কিনা তাও দেখা দরকার। এই উদ্দেশ্যে উইঞ্চ গণিতের বিচারমূলক প্রশ্নাবলী সমাধানের সমযোগ্যতাসম্পন্ন দশ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি পরীক্ষা চালান; তাতে দেখা যায় যে গণিতের হিসাব-গণনা শিক্ষা (Computation) গাণিতিক বিচারক্ষমতায় (Arithmetical Reasoning) সঞ্চালিত হয় না। অন্যান্য অনেক জিনিসের উপর এটা নির্ভরশীল। তাই অনির্দিষ্ট এই সঞ্চালনের উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতা ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধির উপর পাঠ্য বিষয় অধ্যয়নের কোনরূপ সঞ্চালন প্রভাব আছে কিনা এ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এর ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়ের সঞ্চালন ক্ষমতার চেয়ে এ ব্যাপারে বুদ্ধির প্রভাব অনেক বেশি। মানসিক বা বৌদ্ধিক যোগ্যতা বৃদ্ধিতে এক বছর ধরে অধীত কোন পাঠ্যবিষয়েরই তেমন সঞ্চালন প্রভাব নেই। (মাত্র শতকরা ২৩ ভাগ উন্নতি বা সাফল্য সূচিত হয়)। সাম্প্রতিক কালে

ওয়েসম্যানের পরীক্ষা থেকে অবশ্য সঞ্চালনের প্রভাব পাওয়া গেছে। তিনি বুদ্ধি অভীক্ষা ও সম্পাদনী-অভীক্ষার সহ পরিবর্তনের সূচক থেকে এটা প্রমাণ করেছেন যে একবছর ধরে পাঠ্যবিষয়ে অধ্যয়ন করার পর বুদ্ধির ক্ষেত্রে পাঠ্যবিষয়ের কিছুট সঞ্চালন প্রভাব পড়েছে।

বিশেষ বিশেষ পাঠ্যবিষয়ের সঞ্চালন প্রভাব নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এং থেকে অনেকে বলেছেন যে মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে গণিতের শৃঙ্খলাগত মূল (disciplinary values) সর্বাধিক। রাগের (Experimental Determinatior of Mental Discipline in School Studies) বর্ণনা মূলক জ্যামিতি (descriptive geometry) সঞ্চালন-পরীক্ষণ এ বিষয়ে অন্ত্যর্থক সঞ্চালনের প্রমা রেখেছে। হেউইন্সের (*Hewins*) উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধীয় পরীক্ষণও এ বিষয়ে স্মরং করা যেতে পারে। তবে এঁদের পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে সমগুণ সম্পন্ন বিষয়ে উপরে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই এই সঞ্চালন সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যাপকভাবে তাকে সমগ্র পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব আজও হয়নি।

'ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার মূল্য' সম্বন্ধে থর্নডাইকের পরীক্ষাই অত্যুত্তম (classical বলে মনে করা যেতে পারে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি প্রমা করেছেন যে ল্যাটিন ভাষার সঞ্চালন ক্ষমতা অনেক বেশি। শিখনের সঞ্চালন ক্ষেত্রে ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব আছে। ল্যাটিন ভাষা শিখেছে এমন শিক্ষার্থীরা নতুন শব্দশেখা, পঠনের উন্নতি, ইংরেজী জ্ঞানবৃদ্ধি, বানান শুদ্ধভাবে লেখা ইত্যাদি ব্যাপারে যারা ল্যাটিন শেখেনি তাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতির পরিচয় রেখেছে। অর্থাৎ ল্যাটিনের শিক্ষা অন্যান্য দিকেও প্রভূত পরিমাণে সঞ্চালিত হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের সুবিধা মাত্র দু-এক বছর স্থায়ী হয়। তারপর আধুনিক ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে উভয় দলই সমান যোগ্যতার পরিচয় রেখেছে। ইংরেজী ভাষা শিখতে ফরাসী ভাষা সঞ্চালক হিসেবে কাজ করতে পারে কিনা এ নিয়ে উডি (*Woody*) পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে কেবলমাত্র ইংরেজী পঠনের ব্যাপারে সামান্য সঞ্চালন হলেও বাক্যগঠন ও শব্দভাণ্ডার পুষ্ট করার ক্ষেত্রে এর প্রভাব অতি নগণ্য।

তবে এটা বলা যায় যে সঞ্চালনের মূল নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে যদি শিখন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় তাহলে পাঠ্যবিষয়ের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সঞ্চালন সম্ভব। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা বিশ্বাস করেন যে, বিদ্যালয়ের সমস্যা, ক্রিয়া, উদ্দেশ্য, কৌশল, অভ্যাস ও বাস্তবজীবনের সমস্যা, ক্রিয়া ইত্যাদির অনুরূপ হবে ততই শিক্ষায় সার্থক সঞ্চালন ঘটবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনভিত্তিক হয়ে উঠবে। শিক্ষায়

সঞ্চালন একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া নয়। তবে এটি একটি বাস্তব ঘটনা। পরীক্ষায় একেবারে শূন্য থেকে শতকরা বিরানব্বই ভাগ পর্যন্ত সঞ্চালনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এটি আবার নঞর্থকও হতে পারে।

বর্তমানকালে শিক্ষাক্ষেত্রে জীবন ও চাহিদাভিত্তিক বিষয় নির্বাচনের নানা দাবী উঠেছে। যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয় (minimum essential) সেটুকু না শেখালেই নয়। তার অর্থ এই নয় যে সঞ্চালনের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেসব বিষয়ে উপাদানের ঐক্য বেশি সেখানে সঞ্চালন-প্রক্রিয়া সম্ভব বলে শিক্ষায় বাস্তব জীবনের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা দরকার। ভবিষ্যতে জীবন-পরিবেশে শিক্ষার্থীকে যে ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হবে সেগুলোকে আগে থেকে আন্দাজ করে নিয়ে তার উপযোগী করে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তমানের শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই কোন্ বিষয়ের সঞ্চালন ক্ষমতা বেশি সে নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়েও কার্যকর হচ্ছে কোন্ বিষয় জীবনপরিবেশে উপযোগী তা বিচার করা।

চতুর্দশ অধ্যায়

শিশুর জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর

(Different Stages of Childrens' Development)

১। শারীরিক বিকাশের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational significance of physical development) ঃ

আধুনিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশ, রুচি, আগ্রহ, অনুরাগ, প্রবণতা ইত্যাদির উপর দৃষ্টি দান। শিশু আজ আর বয়স্ক মানুষের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ নয়। যে কোন স্তরের শিক্ষাসূচী প্রণয়নে তাই আজ একথা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাই শিশুদের জন্য বিদ্যালয়-পাঠক্রমে আমরা তাদের বয়স, বুদ্ধি ও সামর্থানুযায়ী ক্রিয়াকলাপের সমাবেশ দেখতে পেয়েছি। নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিশুর শারীরিক বিকাশজনিত চাহিদা মেটানোর অনেক রকম ব্যবস্থা হয়েছে। আজ শিশুবিদ্যালয়গুলোতে শিশুকে আর দীর্ঘ সময় একটানা বসে থেকে পড়াশোনা করতে হয় না। শিক্ষকশিক্ষিকাও আগের চেয়ে যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি দিয়ে শিশুর শারীরিক অসুস্থতা বা ত্রুটি দূর করতে যত্নপর। মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থাও রয়েছে। বহু বিদ্যালয়ে অপুষ্টি দূর করার জন্যে নানা পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। খেলাধূলা ও ব্যায়াম চর্চার মধ্য দিয়ে বিকাশমান শিশুর শারীরিক চাহিদা মেটানো হয়।

শিশুদের জন্য এত ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও বালক ও কিশোরদের বিদ্যালয়গুলোতে আরও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কারণ, শারীরিক বৃদ্ধি এ দুটি স্তরেও যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে থাকে। আজও প্রাক্ বয়ঃসন্ধি, বয়ঃসন্ধি ও বয়ঃসন্ধি উত্তর কালের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধির ও শরীর গঠনের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে নানা ধরনের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করা হয়নি। এই স্তরগুলো অতিক্রম করার সময় ব্যক্তিজীবনে যে সমস্যা দেখা দেয় তার মূল কারণ হল, শারীরিক বিকাশ ও প্রাক্ষোভিক সঙ্গতিবিধানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার অভাব। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালের দ্রুত শারীরিক পরিবর্তন শিক্ষার্থীর জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থী আপন পরিবর্তনের আকস্মিকতায় এমনই বিভ্রান্ত হয় যে অনেক সময় তার মানসিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়। দৈহিক বৃদ্ধিজনিত নানা কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্ন

তাদের মনে জাগে। যৌনতাবোধ এসময় পূর্ণতালাভের দিকে এগিয়ে চলে। বাল্যকালের দৈহিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠন পরিবর্তিত হতে থাকার ফলে শিক্ষার্থী নিজেকে অসহায় বলে মনে করে তাই নিরাপত্তার জন্য সে পরনির্ভরশীল হয়ে উঠতে চায়। বিদ্যালয়-পরিবেশে, গৃহ-পরিবেশে ও বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশে তার সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা দেখা দেয়। আধুনিক কালে তাই এ সমস্ত ব্যাপারে বিদ্যালয়গুলোকে উদাসীন হলে চলে না। শিক্ষক অভিভাবক ও বিদ্যালয় সংগঠকদের এদিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিতে হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামনে যখন একই সমস্যা তখন ব্যাপকভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শারীর শিক্ষা, ব্যায়াম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখা উচিত। একথা ভুললে চলবে না যে শরীরকে গঠন করার এটাই হল উপযুক্ত সময় এবং তার স্থান হল বিদ্যালয়। বিদ্যালয় পরিচালনাগার, চিকিৎসাগার, ব্যায়ামাগার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শরীরকে গঠন করতে হবে, ত্রুটিপূর্ণ বৃদ্ধির প্রতিরোধ করতে হবে। কোন অঙ্গের ত্রুটিপূর্ণ বৃদ্ধি দেখলে তা দূর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। 'সুস্থ দেহ সুস্থ মনের আধার'—তাই সুস্থ ও সবল দেহ গড়ে তোলাও শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষকের কাজ। সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠনের অন্যতম উপায় হল যথাযোগ্য শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ। শিক্ষার সাফল্য শারীরিক বিকাশের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

২। সামাজিক বিকাশের শিক্ষাগত তাৎপর্য (Educational significance of social development) :

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির আচরণকে পরিমার্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করা। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির শৈশবাবস্থা থেকেই শিক্ষার শুরু এবং তা তার সমগ্র জীবনব্যাপিয়া চলে। সামাজিক পরিবেশে ব্যক্তি কিভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে এবং সামাজিক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করে তা তার শিক্ষার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষাকে তাই ব্যক্তির সামাজিকীকরণের অন্যতম প্রক্রিয়া হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। গৃহ, বিদ্যালয় বা যে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশে ব্যক্তি থাক না কেন তাকে কতকগুলো সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। তার সামাজিক আচরণগুলো শিক্ষার সাহায্যে সংগঠিত হয়। তাই শিক্ষার সঙ্গে তার সামাজিক বিকাশের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। বিদ্যালয় সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তাবোধ জাগাতে বহু কার্যাবলী গ্রহণ করে থাকে। পর পৃষ্ঠায় কয়েকটি পর্যায়ে এই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হল :

(ক) শিশুর সামাজিক বিকাশ ও বিদ্যালয়ের প্রভাব (Influence of school and social development of a child) :

অনেকে মনে করতেন যে অত্যন্ত অল্প বয়সে শিশুদের নার্সারি বিদ্যালয়ে পাঠানোর অর্থ তাদের গৃহের যত্ন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া। আবার অনেকে ভাবতেন বাড়িতে মায়েদের কিছু সময় রেহাই দেওয়ার জন্যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নার্সারি বিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত। একথা অবশ্যই সত্য যে শিশুর সামাজিক শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয় গৃহে। তবুও শিশু তার খেলার সাথীদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে সামাজিক গুণাবলী অর্জন করে। নার্সারি বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যে এসে সে দলগত জীবনের পাঠ নেয়। সে দলের একজন এবং দলের প্রতি তারও একটা করণীয় আছে—এই অনুভূতি তখন থেকেই তার মনে জাগে। বাড়িতে হয়তো অনেক কাজের মধ্যে তার চাহিদার প্রতি নজর দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না, কিন্তু শিশু-বিদ্যালয়ে তাদের নানা চাহিদা মেটানোর বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই কর্মধারার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব কর্মচাঞ্চল্যের ভিতর দিয়ে তার শারীরিক ও সামাজিক বিকাশ সম্ভাবিত হয়। এখানে সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে এবং পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে থেকে 'আমিত্ব'কে ধীরে ধীরে বিলিয়ে দিয়ে 'আমাদের' একজন হয়ে ওঠে। সকল শিশু অবশ্য সমানভাবে সামাজিক বিকাশ লাভ করে না, তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াজনিত পার্থক্য দেখা যায় তবুও নিজের ও দলের অন্যান্যদের চাহিদার প্রতি সে সজাগ হতে পারে। ব্যক্তিগত সাহচর্যের মধ্য দিয়ে তার 'মন্দন' (retardation) দূর করতে শিক্ষিকা যত্নপর হন। সাধারণভাবে বলা যায় যে নার্সারি বিদ্যালয়ে যোগদান ও পাঠাভ্যাস করার সূত্রে শিশু সামাজিক হয়ে ওঠে। কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ও একই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশুকে অফুরন্ত ও অবাধ স্বাধীনতা দান করে। এ ধরনের বিদ্যালয়ে শিশুকে আর একটু বেশি নিয়মমাফিক দৈনন্দিন সময় তালিকার অনুসরণ করে চলতে হয়। হয়ত তার দলের প্রয়োজনে অনিয়ন্ত্রিত আচরণকে কিছুটা সংশোধন ও সঙ্কোচন করতে হয়, তবুও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সে কতকগুলো আচরণ দক্ষতা অর্জন করে এবং সুঅভ্যাস গঠন করে।

নার্সারি ও কিণ্ডার-গার্টেন বিদ্যালয়ের প্রভাব

(খ) বাল্যকালের সামাজিক বিকাশ ও বিদ্যালয়ের প্রভাব (Influence of the school and the social development in boyhood) : শিশু-বিদ্যালয়ে যে কাজের শুরু, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেই কাজের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে হয়।

সাধারণত ৬-১০ বছরের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। এখানেও দলগত কর্মোদ্যোগের মধ্য দিয়ে তাদের নানা কৌতূহল মেটাবার প্রয়োজন দেখা দেয়। আগ্রহ ও অনুরাগভিত্তিক কর্মধারার মাধ্যমে তাদের আত্ম ও সমাজ-চেতনার যথাযথ বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে। শুধু মাত্র পাঠ্যবিষয়ে জ্ঞানদানই এখানে বড় কথা নয়। সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সুস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ছেলেমেয়েদের যূথবদ্ধতার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এ বয়সেব ছেলেমেয়েদের উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাবল্যকে ঠিক পথে পরিচালনা কবার দায়িত্ব অনেক।

(গ) বয়ঃসন্ধিকালে সামাজিক বিকাশ ও বিদ্যালয়ের প্রভাব (Influence of the school and social development in Adolescence) : সুপরিকল্পিত বিদ্যালয়-পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের নানা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রকল্পের অংশ গ্রহণের ব্যাপক সুযোগ থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে তাদের আত্মবিকাশেব চাহিদা যেমন সুপরিস্ফুট হয় তেমনি সমাজচেতনার বিকাশও হয় গভীর। তারা মূলতঃ স্বাধীনতাপ্রিয় ও নিয়ন্ত্রণবিমুখ হয়ে ওঠে, তাই এ চাহিদাগুলোকে মেটানোব জন্যে সহানুভূতিশীল ও কুশলী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ে 'স্বায়ত্তশাসন' ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পাবে। প্রতিটি শিক্ষার্থী বিদ্যালয়-পরিবেশে যেন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি, চালচলন, জনসমষ্টি ও প্রথাপ্রকরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান দান করার জন্যেই বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়গুলোকে কাজে লাগাতে হবে। পৌরবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা তাদের সমাজ-সচেতনতার নানা উপাদান যোগাতে পারে। বিদ্যালয়েব সামগ্রিক পরিবেশের সামাজিকীকরণ তাই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তারা যাতে স্বাধীন ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষার্থীর সমস্যামূলক বা অসামাজিক আচরণ দেখাদিলে তার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। গণতান্ত্রিক জীবনধারার বিচিত্রমুখী কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্যে বহুবিধ গঠনমূলক প্রকল্পের ব্যবস্থা রাখা দরকার। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এ সময় ধৈর্যশীল, কর্তব্যপরায়ণ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হতে হবে। তাঁদের সহানুভূতি, নির্দেশনা ও সযত্নপ্রয়াস এ বয়সের শিক্ষার্থীদের কাছে অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। এখানে মনে রাখা দরকার যে বয়ঃসন্ধিকালেব চেতনা শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে নানাভাবে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের অনুশাসন ও মুক্ত শৃঙ্খলা'র দ্বৈত প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর পরিণত

জীবনের দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়। তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চাহিদা মেটানোর জন্যে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বৃত্তি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাদের যৌনচেতনার সুস্থ বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে উপযুক্ত যৌনশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সবশেষে তাদের বলিষ্ঠ জীবনদর্শন গড়ে তুলতে শিক্ষক, অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালকদের সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে। তাদের কল্পনাবিলাসী মনকে বাস্তব-অভিমুখী করার জন্যে অভিজ্ঞতাশ্রয়ী কার্যাবলীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ সময় নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে না শিখিয়ে নানা কাজের মধ্য দিয়ে তার ভাবসংহত বৈশিষ্ট্যকে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তবেই সুষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও সংহত সামাজিক বিকাশ সম্ভব হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যৌনশিক্ষা
(Sex Education)

শিক্ষাকে অনেকে ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্তুতি বলে মনে করেছেন।[1] পরিণত বয়সে শিশুকে যে সব আচরণ করতে হবে, যেসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, তার জন্যে তাকে ঠিকভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বারা এই প্রস্তুতি সম্ভব হয়। এ মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন হারবার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*)। তাঁর অভিমত হল যে বয়স্ক জীবনে মানুষকে সমাজে যে সব কাজ করতে হয়, শিশুকালে তাদের অনুরূপ বা সময়বিশেষে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া দরকার। পারিবারিক জীবনযাপন করা মানুষের অনেক কাজের অন্যতম। পারিবারিক জীবনে নরনারীর যৌনসম্পর্ক স্থাপন, সন্তান জন্মদান, তার লালনপালন করা ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এসব কাজের জন্য পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা আছে অথচ আমাদের শিক্ষাসূচীতে বা সামগ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনায় যৌনশিক্ষা বা সুখী পারিবারিক জীবনের প্রস্তুতির কোন ব্যবস্থা নেই। স্পেন্সার তাই মন্তব্য করেছিলেন যে, আমাদের শিক্ষাসূচী পর্যালোচনা করে গ্রহান্তরের সুসভ্য অধিবাসীরা মনে করতে পারে যে পৃথিবী নামক গ্রহের সুসভ্য সমাজ সকলকে ব্রহ্মচারী তৈরি করতে চায়, এখানে বোধহয় নরনারীর যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষাকে যদি বাস্তবের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, যদি তাকে জীবনকেন্দ্রিক করে তুলতে হয় তাহলে বাস্তবজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তা করতে হবে। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষাসূচীতে তিনি যৌন-শিক্ষাদানের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

হার্বার্ট স্পেন্সারের দৃষ্টিতে শিক্ষা

১। যৌনতার স্বরূপ (Nature of Sex) :

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে যৌনতাকে শুধুমাত্র বংশপ্রবাহ অব্যাহত রাখার একটি শক্তি বলে মনে করা হত। সে সময় ধারণা ছিল যে যৌনতা কেবল পরিণত বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের আচরণেই লক্ষ্য করা যায়। যৌনতাকে কেবল

---

1. Education is the preparation for complete living in future.
—Herbert Spencer.

যৌনমিলনের বিষয় বলে মনে করা হত, তাই তার উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হত। ভ্রান্ত এই ধারণার ফলে যৌনতাকে নিষিদ্ধ বিষয় বলে চিহ্নিত করতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই নি। আমাদের নৈতিক জীবনেও যৌনতাকে সর্বতোভাবে দমন করার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এসেছে। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণবাদের ফলে বর্তমানে আমরা যৌনতাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে পেরেছি। এর ফল হয়েছে এই যে, আজ যৌনতাকে আমরা নিষিদ্ধ ফলের মতো দূরে রাখতে পারিনি।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে যৌনতা

পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি

ফ্রয়েড (*Freud*) ও তাঁর অনুগামীরা দেখিয়েছেন যে জন্মের পর থেকেই শিশুর জীবনে যৌনসচেতনতা দেখা যায়। বহু তথাকথিত আচরণের মধ্য দিয়ে শিশু যৌনতৃপ্তি লাভ করে থাকে। আর ব্যক্তির জীবনে যৌনতা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে এবং শিশুর দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির উপর যৌনতার অপরিসীম প্রভাবও স্বীকৃত হয়েছে। তাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যৌনতা অশ্লীল বা গর্হিত কোন বিষয় বলে মনে করা হয় না। কামপ্রবৃত্তি (Sexual instinct) আজ মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে সর্বজনবিদিত। এই সহজাত প্রবৃত্তিটির বৃদ্ধি ও বিকাশ কিভাবে ঘটে এবং তার ফলে ব্যক্তিজীবনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তার আলোচনা করা প্রয়োজন। তাই মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে যৌনতার ব্যাখ্যা করা হল।

২। যৌনতার বিকাশ (Development of Sex) :

মানুষের জীবনে যৌনতার বা যৌন আবেগের প্রভাব অসীম। ফ্রয়েডের মতে, আমাদের মানসিক সক্রিয়তা, সুবিপুল প্রাণশক্তির উৎস হল লিবিডো (Libido)।[1] এটি সম্পূর্ণ যৌনধর্মী। মানুষের সবকিছু ক্রিয়াকলাপ যৌন প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে ঘটে থাকে। তাই ফ্রয়েড 'যৌন' কথাটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে কোন দৈহিক ও মানসিক সুখকে বলেছেন যৌন অভিব্যক্তি। এর অর্থ মাতাপিতা বা সান্তেনর প্রতি স্নেহ ভালোবাসা, প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তিকে আদর করা, অচেতন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা সবই মূল যৌন প্রবৃত্তি বা লিবিডোর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সকল প্রকার কামনা, বাসনা ও সুখকল্পনা মূলতঃ কামজ (Sexual)।

ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যান

1. 'employed in a wide sense, in psychoanalytic theory, to cover all the impulses included under sexual, as opposed to ego instinct.
—Drever : Dictionary of Psychology.

'কাম' কথাটিকে ফ্রয়েড কেবলমাত্র যৌনমিলনেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। যদিও সংকীর্ণ অর্থে কামের চরম অভিব্যক্তি হয় যৌনসম্ভোগ ও প্রজনন ক্রিয়ার মধ্যে, এটা একেবারে অপরিহার্য নয়। শিশুজীবনে কামের যে প্রভাব বা প্রকাশ তা ফ্রয়েডের আগে কেউই দেখান নি। ব্যক্তির জন্মমুহূর্ত থেকে লিবিডোর বিকাশ ঘটতে থাকে এবং পরবর্তীকালে জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে তা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে।

শিশুর যৌন আবেগ বা কামপ্রবৃত্তি বা লিবিডোর বিকাশে ফ্রয়েড মূলতঃ দুটি স্তরের উল্লেখ করেছেন, যথা :

লিবিডোর ক্রমবিকাশ

(১) প্রাক্‌লৈঙ্গিক স্তর (Pre-genital stage)। (২) লৈঙ্গিক স্তর (Genital stage)। প্রাক্‌লৈঙ্গিক স্তরে জননেন্দ্রিয়ের কোন যোগাযোগ নেই। এ সময় 'কাম' বা 'যৌন' আবেগ শিশুর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে থাকে। শিশুর জীবনে সবচেয়ে প্রথমে যে অঙ্গ বিশেষ সক্রিয়ভাবে যৌন আবেগ বিকাশে সাহায্য করে তা হল মুখ বা ঠোঁট। এই স্তরে স্তন্যপান, চোষণ, চর্বণ প্রভৃতি মৌখিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যৌন আবেগ প্রশমিত হয়। মুখই তখন সুখ দেওয়াব যৌন স্থান (erogenerous, zone)[2]। যৌন প্রবৃত্তি বিকাশে ফ্রয়েড এই স্তরটির নাম দিয়েছেন অন্যাশ্রয়ী যৌনতা (onaclytic type of sex)। এর অপর নাম মৌখিক রতির স্তর (oral phase or oral erotic stage)।

মৌখিক রতির স্তব

এই সময় শিশু যা পায় তাই মুখে দেওয়াব চেষ্টা করে। এরই একটু দীর্ঘস্থায়ী ও বিকৃত রূপ হল আঙ্গুল চোষা (Sucking of fingers)। জন্ম থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত এ পর্যায় স্থায়ী হয়। এর পরের স্তরে শিশু মল নিঃসরণ ও মল সংরক্ষণ প্রক্রিয়াদির মধ্য দিয়ে লিবিডোর তৃপ্তি আনার চেষ্টা করে। পায়ুদেশের সঙ্কোচন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে শিশু আনন্দ লাভ করে। এ সময় লিবিডো স্থান পরিবর্তন করে মুখ থেকে পায়ুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেজন্যে এই স্তরকে পায়ুরতির স্তর (Anal erotic stage) বলে। শিশুর ১৮ মাস বয়স থেকে ৪ বছর বয়স পর্যন্ত এ পর্যায় স্থায়িত্ব লাভ করে।

পায়ুরতির স্তর

1. A term used by psycho-analysts originally, in its usual sense of sexual desire, but later, in the most general sense of vital impulse or energy.

2. Sensitive regions of the body, where tactile and warm stimuli evoke sexual feelings and responses. In psycho-analytical literature stress is laid on the fac that such regions function as a substitute for the genital organs.

—Drever : Dictionary of Psychology

এরপর লিবিডো পায়ুদেশ থেকে এসে জননেন্দ্রিয়ে আশ্রয় নেয়। এই স্তরে প্রধান যৌনস্থান হয় জননেন্দ্রিয়। শিশু আবিষ্কার করে যে যৌনইন্দ্রিয় থেকেই যৌনতৃপ্তি আসে। অন্যান্য যৌনস্থান থেকে প্রাপ্ত সুখানুভূতি তখন গৌণ হয়ে যায়। তাই মূত্রত্যাগ ও ধারণ করার মধ্য দিয়ে সে আনন্দ লাভ করতে চায়। এই স্তরে লিবিডো তার স্বস্থানে কেন্দ্রীভূত হয় এবং তার ক্রমবিকাশের প্রথম তরঙ্গ এইখানে শেষ হয়। এর পর থেকে তার কাম স্বাভাবিক পথ ধরে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

লৈঙ্গিক রতির স্তর

যৌনস্থানের সংস্থানানুযায়ী নামকরণ করে যৌনজীবনের স্তর ভাগ দেখানো হল। এবার অন্য দিক থেকে যৌনবিকাশ বিবেচনা করা যেতে পারে, সেটিকে আমরা আসক্তির দিক থেকে ভাগ করতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কামনা, বাসনা বা ভালবাসার চাহিদা থাকে এবং কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই তা বিকশিত হয়। শিশুর কামনার প্রথম বস্তু হল মাতৃস্তন। নিতান্ত প্রাণ ধারণের জন্যে তার কাছে মাতৃস্তন অপরিহার্য। তারপর এই মাতৃস্তনের প্রতি আসক্তি স্থান পরিবর্তন করে তার নিজের দেহকে আশ্রয় করে। এই সময় সে নিজের দেহকেই ভালবাসে, দেহকে নিয়েই মশগুল থাকে। তার দেহকে ঘিরেই সমস্ত আনন্দ অভিব্যক্ত হয়। খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করে ও নানারকম সাজসজ্জা করে সে আনন্দ অনুভব করে, তাই এই অবস্থাকে স্বতঃকাম বা আত্মকামিতা (Auto eroticism) বলে। এই পর্যায়ে শিশু নার্সিসাসত্বের (Narcissism) মধ্য দিয় এগিয়ে যায়। নার্সিসাস ছিলেন গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত এক সুন্দর যুবা পুরুষ, তিনি কোনদিন কোন মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন নি। একদিন বেড়াতে বেড়াতে দীঘির স্বচ্ছ জলে নিজের ছায়া দেখে নিজ দেহের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তখনই নিজের ভালোবাসায় পড়েন। তাই আত্মরতি নার্সিসাসত্ব হিসাবেও অভিহিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই প্রাথমিক আত্মরতি তার অহং বোধকে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু শিশু শৈশবেই সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। একটি ছেলে তাই অন্য একটি ছেলেকে এবং একটি মেয়ে অন্য একটি মেয়েকে গভীরভাবে ভালবাসে। বন্ধুপ্রীতি এই স্তরে প্রবল হয় আর বন্ধুদের সঙ্গও তাদের মনে খুব আনন্দের খোরাক জোগায়। যৌন জীবনের এই স্তরকে বলা হয় সমকাম স্তর বা সমকামিতা (Homo sexual stage)। এর পর আসে ভিন্ন কামস্তর বা

আত্মরতি স্তর

নার্সিসাসত্ব

সমকামিতা

বিষমকামিতা (Hetero sexual stage)। এই সময় সমলিঙ্গের ব্যক্তি ছেড়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে। এই সময় যৌবনাগম হয় এবং বাল্যকালের যৌনশক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই স্তরে বালক বালিকাকে এবং বালিকা বালককে ভালবাসে ও তারা পরস্পরের প্রতি প্রবল দৈহিক আকর্ষণ অনুভব করে। এই বিষমকামিতার প্রকাশ অন্যভাবে দেখা যায়। এই সময় ছেলে মায়ের প্রতি এবং মেয়ে বাবার প্রতিও আকৃষ্ট হয়। ছেলে এবং মেয়ে যথাক্রমে বাবা এবং মাকে তাদের ভালোবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। মায়ের প্রতি ছেলের এই আসক্তিকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন ঈডিপাস গূঢ়ৈষা (Oedipus Complex) এবং বাবার প্রতি মেয়ের আসক্তির নাম দিয়েছেন ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা (Electra Complex)। ফ্রয়েডের মতে শৈশবের এই যৌনচেতনা এবং পিতামাতার প্রতি আকর্ষণ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে ও ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমশঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সামাজিক অনুশাসন ইত্যাদির ফলে তার মনের সচেতন স্তর থেকে পিতামাতার প্রতি যৌন আসক্তি দূর হয়ে তার অধিসত্তা (Super Ego) গঠিত হয়। শৈশবের পর আসে বাল্যকাল। এ সময় লিবিডোর বাহ্যিক প্রকাশ সহজে দেখা যায় না। সামাজিক বিধিনিষেধের ফলে অনেক সময় শৈশবের যৌন আচরণগুলো অবদমিত হয় এবং কামপীড়ন কম হয়, তাই ঐ সময়কে বলা হয় লিবিডোর প্রসুপ্তিকাল (Latent period)। তারপর কৈশোরে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তি বিকাশের দ্বিতীয় তরঙ্গের আঘাত তাকে সহ্য করতে হয়। এই সময় যৌনাঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে, দৈহিক নানা যৌন লক্ষণ দেখা দেয়, প্রজনন ক্ষমতার বিকাশ হয়, আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয় লিবিডোর পরিণতি লাভ। এই স্তরেই নানা অস্বাভাবিক অবস্থান পরিবর্তন করে লিবিডো জননেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। কামপ্রবৃত্তির বিচিত্র গতিপ্রকৃতির পরিণতি ঘটে সুসংহত লক্ষ্যে, যৌনমিলনে এবং প্রজনন প্রক্রিয়ায়। এই স্তরকে বলা হয় লৈঙ্গিক বা উপস্থ স্তর (Genital stage)। এই স্তরকে মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর বলে বিবেচনা করা হয়েথাকে। বয়ঃসন্ধিকাল ব্যক্তির দেহ-মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে আর সেই পরিবর্তনের উদ্দাম স্রোতের আঘাতে সে নানা দিক দিয়ে বিব্রত হয়। এই সময় তাকে ঠিকমত পরিচালনা করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়।

বিষমকামিতা

ঈডিপাস ও ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা

যৌনতার বিকাশ আলোচনা শেষে এটুকু বোঝা যায় যে মানুষের জীবনে যৌনতার প্রভাব ও তাৎপর্য দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে,

ফ্রয়েড যে দৃষ্টিভঙ্গিতে যৌনতার মতকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন তা একেবারে অভ্রান্ত বলে সবাই মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর শিষ্যরাও বিশেষ করে এ্যাডলার (*Adler*) এবং ইয়ুং (*Jung*) তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী লিবিডোর স্বরূপ মানতে রাজী হন নি। তাঁরা যৌন-কামকেই সকল প্রাণ-শক্তির উৎস বলে স্বীকার করেন নি। এ্যাডলারের মতে কর্মশক্তির উৎস হল হীনতাবোধ (**sense of inferiority**), ফ্রয়েড বর্ণিত যৌনমানস শক্তি নয়। তিনি যৌন ইচ্ছার চেয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাকেই মানুষের জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি বলে মনে করেছেন। তাই তিনি ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সাগ্রহ চেষ্টাকেই মানুষের জীবনের মূল প্রেষণা-শক্তি বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[1]

এ্যাডলারের মত

পক্ষান্তরে ইয়ুং শুধু ফ্রয়েডের যৌন বা অ্যাডলারের অহং প্রবৃত্তিকে মানুষের জীবনের মৌলিক প্রবৃত্তি বলে মেনে নেন নি। তাঁর মতে মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি হল জীবনপ্রেরণা (**urge to live**)। একেই তিনি যৌনতা বিবর্জিত লিবিডো (**Desexualised libido**) বলেছেন। মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল (***McDougall***) তাঁর প্রবৃত্তির তালিকায় প্রজনন প্রবৃত্তি ও কামকে স্থান দিয়েছিলেন। যৌনতা একটি প্রবৃত্তি (**Mating**)-এর প্রক্ষোভ কাম (**Lust**)[2]। পরবর্তীকালে তিনি প্রবণতা ও তার কাজ (**Propensity and its function**) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যৌনপ্রবণতাকে সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কামনা করা ও তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা হিসেবে ব্যক্ত করেছেন।[3] সুতরাং যৌনতা আজ অশ্লীল বা একান্ত গোপনীয় নিষিদ্ধ কোন বস্তু নয়। একে স্বাভাবিক বিকাশের অন্যতম ধারা বলে মনে করা হয়। শিশু-মনে যে যৌন কৌতূহল দেখা দেয় তাই বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা আবেগ ও মানসিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে নানা আচরণ সৃষ্টি করে এবং সে কৌতূহল পরিতৃপ্তি ও সদ্ব্যবহারের উপর ব্যক্তির অস্মিতা গঠিত ও বর্ধিত হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে তাই যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকৃত হয়েছে।

ইয়ুং-এর মত

ম্যাক্‌ডুগালের মত

৩। যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Sex Education) :

আধুনিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল শিশুর জীবনকেন্দ্রিকতা, চাহিদা-কেন্দ্রিকতা। মানবজীবনের সকল সহজাত প্রবৃত্তি, চাহিদা, শক্তি, সামর্থ ও প্রবণতা

1. 'the principal motive force in life is a striving for superiority and power.' —Page T. D.—Abnormal Psychology.
2. McDougall : Outlines of Psychology
3. McDougall : The energies of man

ইত্যাদির উপর শিক্ষা নির্ভর করে এবং প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্ভাবনার সার্থক রূপায়ণ শিক্ষায় কাম্য। যৌন প্রবৃত্তি প্রাণী তথা মানুষের একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রবৃত্তি। বংশধারার প্রবাহকে অব্যাহত রাখা, ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সমাজ-জীবন, ব্যক্তির আবেগমূলক সংগঠন, ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ও জীবনাদর্শের বিকাশ যৌনতার সার্থক পরিণতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং শিক্ষাকে স্বাভাবিক (natural), জীবনধর্মী, প্রবৃত্তি প্রক্ষোভমুখী করে তুলতে হলে যৌন কৌতূহলকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখার কোন যুক্তি নেই।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক অপরাধবিজ্ঞান (Criminology) দেখিয়েছে যে যৌন কৌতূহলের অবদমন, বিকৃত যৌনজ্ঞান, কুসংসর্গে অর্জিত বিকৃত অভিজ্ঞতা বহু অপরাধের মূলে কাজ করে। সুতরাং শিক্ষায় যৌনশিক্ষাকে বর্জন না করে, বরং গ্রহণ করে শিশুর যৌন কৌতূহল বা যৌনাবেগকে উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা নানা সৃজনশীল কর্মধারায় প্রভাবিত করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ফ্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণে দেখা যায়, অবদমিত কামনার দ্বারা নির্জ্ঞান স্তরে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্ট হয়, তা ব্যক্তিকে অপপ্রতিযোজনশীল (maladjusted) করে তোলে। ফ্রয়েডের সংখ্যাব্যান অনুসারে আমাদের সকল কামনা-বাসনা যৌনপ্রবৃত্তির দ্বারা সংগঠিত। সমাজ-জীবনে এসব কামনা-বাসনা প্রকাশ-পথ না পেয়ে এবং অবদমিত হয়ে নানা মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। যৌন কৌতূহল নিষিদ্ধ পাপ, যৌনাবেগ পোষণ করা ঘৃণাজনক ইত্যাদি কুসংস্কারেব দ্বারা শিশুমনে আমরা পাপানুভূতি (sense of guilt) সঞ্চারিত করে থাকি। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে ইহা মোটেই অভিপ্রেত নয়। সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সুপরিকল্পিত ভাবে যৌনশিক্ষার আয়োজন করা উচিত।

চতুর্থতঃ, শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে তার যৌন প্রবৃত্তিজনিত আবেগ, কৌতূহল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যৌনাবেগ বা যৌন কৌতূহল অতৃপ্ত এবং অবদমিত থাকার ফলে নানা যৌন বিকার (sex complexes) শিশুমনে উপস্থিত হতে পারে। আর এর ফলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ প্রতিহত হয়ে যায়। এদিক থেকে বিবেচনা করলেও যৌনশিক্ষার অপরিহার্যতা পরিদৃষ্ট হয়।

পঞ্চমতঃ, নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক না জানার ফলে ব্যক্তিচরিত্রে অনেক অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা দেয়। নরনারীর যৌনাবেগকে কেন্দ্র করে যে স্বাভাবিক মার্জিত ও স্বাস্থ্যকর আচরণ সংগঠিত হবার কথা যৌনশিক্ষার অভাবে ব্যক্তি সেসব থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে বহু কুযৌনাচার, বিকৃত, অসঙ্গত আচরণ জন্ম নেয়।

ব্যক্তিকে এ অবাঞ্ছিত আচরণের সম্ভাবনা থেকে দূরে রাখা সার্থক যৌন শিক্ষার দ্বারা সম্ভব।

ষষ্ঠতঃ, যৌনতা সম্বন্ধে কুসংস্কার বর্জন করা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। এ শিক্ষা ব্যক্তির বিবাহিত জীবন, সন্তান পালন প্রভৃতির সার্থক রূপায়নে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। আধুনিক যৌনবিজ্ঞান দেখিয়েছে যে যৌনশিক্ষার অভাবের ফলেই অনেক বিবাহিত জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, সন্তান-সন্ততিকে সুপরিচালিত করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং মানবজীবনের সার্থক পরিণতি ও বহু দায়িত্ব সম্পাদনের সঙ্গে যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৪। যৌনশিক্ষার স্তরবিন্যাস (Stages of Sex Education) :

শিশুর জীবনবিকাশের যে স্তরগুলো রয়েছে তার মধ্যে তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—বাল্য, কৈশোর ও যৌবনাগম। যৌনশিক্ষাকেও এই তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

বাল্যকালে শিশুর যৌন-অনুভূতি দেহকেন্দ্রিক। যৌনবিষয়ক কৌতূহল নিজের দেহকে ঘিরেই বর্ধিত হতে থাকে। যৌনবিষয়ে কৌতূহলী হয়ে শিশু মাতাপিতার সামনে নানা নির্দোষ প্রশ্ন তুলে ধরে। সহজ, সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট উত্তর দিয়ে এইসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত। আসলে শিশুরা উত্তর পেলেই খুশী।

বাল্য

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত মায়ের উত্তর দেওয়া স্মরণ করা যেতে পারে। খোকা জানতে চায় সে কোথা থেকে এসেছে আর মা উত্তর দেয় যে, তার (মার) মনের মধ্যে ইচ্ছে হয়ে সে (খোকা) এতদিন ছিল।[1] খোকার এ প্রশ্ন নীতিবাগীশদের কাছে অশ্লীল বা নিষিদ্ধ কথা বলে মনে হতে পারে ; কিন্তু এটাই তো শৈশবের নিতান্ত স্বাভাবিক নির্দোষ প্রশ্ন।

কৈশোরে ছেলেমেয়েদের যৌন কৌতূহল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই-সময় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি যৌন-সচেতন হয়। তাদের দেহে নানা রকম পরিবর্তন দেখা দেয়। মেয়েদের রজঃসৃষ্টি ও ছেলেদের স্বপ্নদোষ দেখা

কৈশোর

দিলে তাদের প্রাক্ষোভিক জীবনে তীব্র আন্দোলন দেখা দেয়। এদুটি যে শারীরিক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও পূর্ণতার আভাষ তা বলে বোঝাতে পারলে তারা সমস্যা-পীড়নের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। কৈশোর কালের যৌন-চেতনা যেন বিকৃতির পথ না ধরে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

১। 'জন্মকথা' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যৌবনাগমে দেখা যায় যে কৈশোরের অবদমিত বা অতৃপ্ত কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ছেলেমেয়েরা নানা উপায়ে তথ্য আহরণ করার চেষ্টা করে। বাঞ্ছিত পথে তাদের কামপ্রবৃত্তি না মিটলে তারা নানা অসামাজিক বা বিকৃত পথ ধরে যৌন আচরণে লিপ্ত হয়। যৌবনাগমের যৌনচিন্তা বা আচরণ যেন সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে অনেক সময় অসম্পূর্ণ ধারণা বা যৌনবিষয়ক তথ্যের অজ্ঞানতার ফলে নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। কল্পনাপ্রবণ যুবক-যুবতীরা ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের সুখকল্পনায় বিভোর থাকে অথচ যৌনশিক্ষার অপর্যাপ্ততা বা অভাবের ফলে তাদের যৌনজীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই বিপথ-গামিতার সম্ভাবনা থেকে যায়। যৌন প্রবৃত্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা হ্রাস করলে প্রাপ্ত যৌবনদের সুস্থ যৌবনজীবন গড়ে তোলা দুরূহ ব্যাপার নয়।

যৌবনাগম

যৌন শিক্ষাদানের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে দেখা দিতে পারে তাহলে কারা এই শিক্ষা দেবেন? এর উত্তরে এক কথায় বলা যায় যে, ব্যক্তির জীবনে পরিবার ও পরিবেশ উভয়ের গুরুত্ব রয়েছে। তাই যৌনশিক্ষা দেবার ব্যাপারে পারিবেশিক প্রভাব ও বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের অন্যতম অংশ বিদ্যালয়ের প্রভাব সমানভাবে রয়েছে। যৌনশিক্ষার যে স্তরবিন্যাস করা হয়েছে তা থেকেও একথা সহজে প্রমাণ করা যায়।

৫। যৌন বিষয়ে শিক্ষাদাতার যোগ্যতা (Qualification of a Sex-educator) :

পিতামাতা ও শিক্ষক শিশুর শ্রদ্ধার পাত্র। তাই যৌন বিষয়ক শিক্ষাদানে এঁদের উৎসাহী হতে হবে। শিশুর আস্থাভাজন ব্যক্তিকে দিয়ে যৌনশিক্ষা না দিতে পারলে তা ফলপ্রসূ হয় না। পিতামাতা বা শিক্ষক যাঁরাই শিক্ষা দিন না কেন তাঁদের মনে রাখতে হবে যে সহজ, সরল ও যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে যৌন শিক্ষার বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করতে হবে। তাঁদের নিজেদের ধারণা যদি সহজ ও সুস্থ না হয়, যদি তাঁদের মধ্যে লজ্জা, বাধা বা সংকোচ থাকে তাহলে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা সম্ভব হবে না। শিক্ষাদাতার মনোভাব শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তার মনকে প্রভাবিত করে ; তাই সকল স্বাভাবিকতাকে মেনে নিয়ে সঠিক যৌনজ্ঞান দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। খোলাখুলি আলোচনা অবাঞ্ছিত কৌতূহলকে দূর করে। আলোচনার পরিধি ও প্রকৃতি এমন হবে যাতে একে শিশু, কিশোর ও

নবযুবক-যুবতীরা নিছক আনন্দ লাভের মাধ্যম হিসেবে মনে না করে ; আবার একে একটা গোপন, নিষিদ্ধ, পাপ বা ভীতিজনক বিষয় বলে গণ্য না করে। ভয়, শঙ্কা বা বাধা পেলে নানা অসুস্থ প্রতিন্যাসের সৃষ্টি হয় এবং নানা অবাঞ্ছিত উপায়ে তারা কৌতূহল মেটাতে উদ্যোগী হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, যাঁরা যৌনশিক্ষা দেবার যোগ্যতা রাখেন তাঁদের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি স্বাভাবিক ও সহানুভূতিশীল না হয়ে শাসনধর্মী ও শাস্তি কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে শিক্ষাদাতাদের যথেষ্ট সংযমী, ধৈর্যশীল হতে হয়। তাঁদের উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বাক্‌-কৌশল ও সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ থাকা প্রয়োজন। তাঁদের যৌন মনোবিজ্ঞান, (Sexual Psychology), যৌন শারীরবিজ্ঞান (Sexual physiology) ও যৌন রোগবিজ্ঞান (Sexual pathology) বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।'[1]

এই বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হল বিকৃত তথ্য ও তত্ত্ব যথেষ্ট কুণ্ঠা ও দ্বিধার সঙ্গে পরিবেশন করার চেয়ে একেবারে কিছু পরিবেশন না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজে সঠিক জেনেই অপরকে জানাতে যাওয়া ভাল আর অযথা কূট-কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

৬। যৌনশিক্ষা ও গৃহের প্রভাব (Influence of home on Sex education) :

আজ থেকে দুহাজার বছরেরও আগে সক্রেটিস বলেছিলেন যে ব্যক্তির জীবনের আরম্ভের কালই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এ সময় সে যা শেখে তার ছাপ মনে দীর্ঘকাল সঞ্চিত থাকে এবং তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আজও এ কথার পুনরাবৃত্তি করে আমরা বলতে পারি যে শৈশব অতি গুরুত্বপূর্ণ কাল।

শিশুর শিক্ষা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তার গৃহ পরিবেশে। এই পরিবেশের যাঁরা নিয়ন্ত্রা তাঁদের সুস্থ মানসিকতা ও প্রাতন্যাস শিশুর জীবনে অপরিসীম প্রভাব রাখে। পরিবারের লোকজনদের তাই আচার-আচরণে, দৃষ্টিভঙ্গিতে ও যৌন-বিষয়ক শিক্ষাদানে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তাঁদের অভিজ্ঞতা যদি বলিষ্ঠ না হয়, তাঁদের ধারণা যদি নির্ভুল না হয় তাহলে তাঁদের দিয়ে শিশুকে যৌনশিক্ষা দেওয়া

1. To fulfil his functions adequately, the master in the art of sexual hygiene must answer three requirements .... he must have a sufficing knowledge of the facts of sexual Psychology, sexual physiology and sexual pathology······he must have a b oad moral outlook, with a same idealism which refrains from demanding impossibilities····· finally, a genuine sympathy with the young, an insignt into their sensitive shyness, a comprehension of their personal difficulties, and the skill to speak to them sympathetically and frankly and humanely.

—Havelock Ellis (as quoted by C. Bibby in Sex Education).

চলে না। তাঁদের অসুস্থ মানসিকতা শিশুর মনে অবাঞ্ছিত বহু ভাবের জন্ম দেয়। যৌনশিক্ষা বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ব্যাপার। এই বিষয়ে কোন রকম বিকৃতি ভ্রান্তি, সংশয় ও লজ্জা শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হয়। তাই মাতাপিতা ও পরিবারের অন্যান্যদের যৌনবিষয়ে সুস্থ ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা প্রয়োজন।

শিশু পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে আগে চেনে তার মাকে, তারপর বাবাকে। বাবা মার পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্পর্ক পারিবারিক জীবনের প্রাথমিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা, সুস্থতা শিশুর বিকাশমান জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে সুস্থ যৌনজীবনের উপর। তাঁদের যৌন জীবনের বা দাম্পত্য জীবনের কোন সমস্যাই যেন শিশুকে স্পর্শ না করে। অনেক সময় দেখা যায় যে পিতামাতা খোলাখুলি ভাবে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যৌনবিষয়ক আলোচনা করতে চান না। সুকৌশলে শিশুর যৌনবিষয়ক প্রশ্ন এড়িয়ে যান বা ধমক দিয়ে তাকে সাময়িক ভাবে নিবৃত্ত করতে চান। হয়ত তাঁরা মনে করেন যে এই আলোচনা অশ্লীলতার নামান্তর বা পারস্পরিক সম্পর্কের পক্ষে লজ্জাকর। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে পিতামাতা যথেষ্ট সংযমী না হয়ে অসতর্ক মুহূর্তে এমন আচরণ করে বসেন যা শিশুকে অযথা কৌতূহলী করে তোলে। শিশু সবসময়ই পরবর্তী অনুরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়। এতে তার মানসিকতা বিকৃতির প্রান্ত সীমায় গিয়ে পড়ে। এরপর পারিবারিক নানা সম্পর্কের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

মাতাপিতার পারস্পরিক সম্পর্ক

যদি কোন পরিবারে শিশু দেখে যে তার মা বা বোনেরা কেবল বাবা বা বড় ভাইদের আদেশ পালন করেই চলেছে কিংবা পরিচারিকার মতো সারাদিন গৃহস্থালীর কাজ করে চলেছে তাহলে তার মনে মার, এমন কি স্ত্রীজাতির সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। সে ভাবতে থাকে যে নারী কেবল পুরুষের আদেশ পালন করে সব রকমের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপাদান যোগাবার জন্যই পরিবারে রয়েছে। এই ধারণার ফলে ছেলে-মেয়েদের মনে লিঙ্গগত বৈসাদৃশ্য অনুযায়ী বিরূপতার সৃষ্টি হয়। সুস্থ মানসিকতা গঠনে এই বোধ খুবই ক্ষতিকর। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গি নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। পারিবারিক সম্পর্ককে তাই সরল ও সমমর্যাদা সম্পন্ন করে তোলার চেষ্টা করা উচিত। এটা পরিষ্কারভাবে ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে পরিবারজীবনে প্রত্যেকের আপন আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এই সম্পর্ক সম্পূর্ণ সুস্থ, প্রীতিকর ও মর্যাদাপূর্ণ।

পরিবারের অন্যান্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক

আরও কতকগুলো বিষয়ে পরিবারের সকলকেই সতর্ক হতে হয়, তাহল— শিশুকে অতিরিক্ত আদর করা, চুমো দেওয়া ও উলঙ্গ থাকতে দেওয়া। শিশুদের যৌন বিকাশ কিভাবে ঘটে থাকে পূর্বে তার আলোচনা করা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা যদি অসংযমী হয়ে শিশুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন, চুমো দেন তাহলে সে যৌন উত্তেজনা অনুভব করে। তাকে উলঙ্গ থাকতে দেওয়া, তার লিঙ্গ স্পর্শ করতে সুযোগ দেওয়াও তার যৌন উত্তেজনার কারণ হয়, তাই এইসব ব্যাপারে বড়দের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের নিজেদের আচরণেও যথেষ্ট সংযম ও সতর্কতা দেখানো দরকার। শিশুর যৌন উত্তেজনা জাগাতে পারে এমন আচরণ অযথা না করাই বাঞ্ছনীয়।

সংযম ও সতর্কতা

পরিবারের নানা আনন্দানুষ্ঠান ও সামাজিক উৎসবের মধ্যে দিয়ে ছেলে-মেয়েদের পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে। যৌনবিষয়ক চিন্তা যাতে নীতি বিগর্হিত পথে প্রধাবিত না হয়ে বাঞ্ছিত পথে চলতে পারে তার জন্য খেলাধুলা, শিক্ষাকর নানা অনুষ্ঠান, জন্মদিন পালন, পুতুলের বিয়ে দেওয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে মেলামেশা করে প্রাক্কৌভিক আনন্দ লাভ করে। অনেক সময় শিশুদের মা-বাবা খেলা, বউ বউ খেলা বা ডাক্তার সেজে রোগী পরীক্ষা খেলার মধ্যে দিয়ে যৌনতা বোধ প্রকাশ পায়। নিজের দেহকে নগ্নভাবে অপরের সামনে তুলে ধরে কিংবা অন্যান্য যৌন আচরণের মধ্যে দিয়ে তারা যৌন তৃপ্তি লাভ করে। হয়ত অনেক সময় এটা নির্দোষ আনন্দ লাভের জন্যেও করে থাকে, কিন্তু এই বিষয়ে খুব বেশি মগ্ন হতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আবার বাল্যকালে ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ পৃথকভাবে খেলতে দেওয়াও সহজে মেনে নেওয়া যায় না। তাদের এই সময়ের সম্পর্ক যৌনতা বিবর্জিত, স্বতঃস্ফূর্ত ও অকৃত্রিম। বয়স্ক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের আলাদা করে দেওয়া উচিত নয়। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে যৌনগত পার্থক্য আছে এটা জোর করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার নেই এই সময়ের স্বাস্থ্যকর, প্রীতিপূর্ণ মেলামেশা তাদের পরবর্তী জীবনের সম্পর্ককে সহজতর করে তোলে। বিষমকামিতার এই প্রথম পর্যায়ে যৌনগত পার্থক্যের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করে তাদের বিভ্রান্ত করা উচিত নয় বরং সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনার উপরই জোর দেওয়া দরকার।

আনন্দানুষ্ঠান ও সামাজিক মেলামেশা

সুস্থ মানসজীবন গড়ে তুলতে দৈহিক যত্ন নেবার প্রয়োজন আছে। এই দায়িত্ব পরিবারকেই পালন করতে হয়। শিশুরা যাতে পুষ্টিকর সহজপাচ্য খাবার ও পর্যাপ্ত

বিশ্রাম পায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। অযথা বেশী খাওয়া, ঘুমানো বা খেলাধুলা করতে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। এই বয়সে যেন কোন যৌন বদভ্যাস তারা গঠন করতে না শেখে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েদের স্বমেহন (masturbation) করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এতে তাদের যৌন জীবন স্বাভাবিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। তাই পিতামাতা ও পরিবারের অন্যদেরও এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। তাদের এর ফলাফল ব্যাখ্যা করে মনে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি করার প্রয়োজন রয়েছে। ছেলেমেয়েদের মনে অকালে যাতে যৌন পরিপক্কতা (Precocious) না আসে তার দিকেও নজর রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়েদের রজঃসৃষ্টির সময় তারা রীতিমত বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত বোধ করে। এই সময় তাদেরবুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে এটা অত্যন্ত এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেকটি মেয়ের জীবনেইএটা ঘটতে বাধ্য এ বোধ তার মনে সৃষ্টি করতে হবে। ছেলেদের ক্ষেত্রেও কিশোর বয়সে বীর্যস্খলন (Seminal emission) ঘটে থাকে। তাদেরও শিক্ষা দেওয়া উচিত যে এটা কোন দোষের বা রোগের ব্যাপার নয়। এই সমস্ত ব্যাপারে পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব মা-বাবার। তাঁরা স্বাভাবিকতা বজায় রেখে যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারেন তাহলে ছেলেমেয়েরা নানা জটিলতার হাত থেকে পরিত্রাণ পায়। কমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের আঙুল চোষা (sucking) আর একটা বদঅভ্যাস। এটা শৈশবকালীন যৌনতাবোধের প্রলম্বিত অভিব্যক্তি। একে দূর করার জন্যে মা-বাবাকে যত্নপর হতে হয়। বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের এই বদঅভ্যাস দূর করা যায়।

দৈহিক যত্ন

সবশেষে বলা যায় যে পরিবারের সকলকেই মোটামুটি পরিকল্পিত উপায়ে যৌনশিক্ষা দেবার চেষ্টা করতে হবে। কখনই ছেলেমেয়েদের নিতান্ত শিশু বা যৌনবিষয়ক জ্ঞান পাবার মতো বয়স হয়নি বলে দূরে রাখা ঠিক নয়। যৌনতার বোধকে নোংরামি, অসভ্যতা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া বা উদাসীন থাকাও কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। গৃহ পরিবেশে পালিত প্রাণীদের যৌনমিলন বা যৌন-ক্রিয়াও অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে, এই ব্যাপারে সদাজাগ্রৎ দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ আছে। তারা যেন এই ঘটনাকে বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে না শেখে। আসল কথা হল যে কোন যৌনবিষয়ক চেতনাকে সহজ ও স্বাভাবিক পর্যায়ে এনে শ্লীল ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিশুদের যৌন কৌতূহলতৃপ্তির ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। তাহলেই পরিবারের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

৭। যৌনশিক্ষা ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব (Sex education and Responsibility of school) ঃ

যৌন শিক্ষাদানের ব্যাপারে গৃহের যে পরিমাণ দায়িত্ব আছে, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব তার চেয়ে কিছু কম নয়। শৈশবে ও বাল্যে যৌনশিক্ষার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের যে কর্তব্য পালন করতে হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও অনুরূপ কর্তব্য পালন করতে হয়। তার অর্থ এই নয় যে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে কোন একটি বিষয় সংযোজনা কবতে হবে; অথবা মাঝে মাঝে এই বিষয়ের উপর কিছু পাঠ দিলেই হবে। যৌনশিক্ষা, স্বাস্থ্যশিক্ষা বা চরিত্রগঠন শিক্ষার মতো সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ারূপে পরিগণিত করতে হবে। বিশেষ একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার উপর এই দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করে বিদ্যালয়-জীবনের অন্যান্য কার্যাবলীর সঙ্গে সম্পর্কে রেখে পাশাপাশি যৌন শিক্ষা দিতে হবে। একে বিচ্ছিন্ন করে শেখাবার চেষ্টা অপচেষ্টারই নামান্তর। বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষার স্তর অনুযায়ী কিভাবে শিক্ষাদান করা যেতে পারে তার আলোচনা করা হল :

নার্সারি ও শিশু বিদ্যালয় : এই ধরনের বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে যৌনশিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করানোর মাধ্যমে শিশুর যৌনানুভূতি নিয়ন্ত্রিত করা উচিত। শিশুরা এই সময় যাতে নিজের শরীরের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেয়, সুঅভ্যাস গঠন করে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অনেক সময় এই বয়সের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলাধূলোর মধ্যে, পোষা পাখি বা পশুর পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে যৌনবিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠে। এদের শারীরবিদ্যা ও জীব-বিদ্যার সাধারণ ও প্রাথমিক বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত করালে তাদের যৌন কৌতূহল প্রকারান্তরে নিবৃত্ত হতে পারে। তাই শিশু বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে গ্রুয়েন বার্জের মানবজন্মের বৃত্তান্তের মতো বিষয়ও গল্প করে পড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই সময়ে তারা যাতে দেহের প্রতিটি অঙ্গের নাম নির্ভুলভাবে শিখতে পারে তার সুযোগ রাখা দরকার। শিক্ষিকারা ধৈর্য নিয়ে, দ্বিধা বা জড়তা কাটিয়ে যৌনশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান দেবার চেষ্টা করবেন। শৈশবের যৌনানুভূতি ও যৌনাঙ্গ স্পর্শ করাকে তথাকথিত নিন্দার্হ ঘটনা বলে মনে করা উচিত নয়। সহজভাবে এটিকে গ্রহণ করে বোঝানো দরকার যে এ ধরনের অভ্যাস তার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। আঙুল চোষা বা

সবকিছু মুখে দেওয়াও সুঅভ্যাস গঠনের পক্ষে উপযোগী নয়। তাই তাদের বুঝিয়ে দেওয়া ভাল যে স্বাস্থ্যের কারণে এই সব অভ্যাস বদলানো দরকার। একথাও সঙ্গে সঙ্গে যেন শিক্ষিকারা স্মরণে রাখেন যে এই সব অভ্যাস প্রাক্ষোভিক চাহিদার অভিব্যক্তি বিশেষ। তাই তাদের প্রক্ষোভিক বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর দিকেও তাঁরা যত্নপর দৃষ্টি দেবেন। যৌন-কৌতূহলমূলক প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার ব্যাপারে শিক্ষিকাদের কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। এই ধরনের বিদ্যালয়ে শিশুদের যে ধরনের যৌন প্রতিন্যাস গড়ে তুলতে হবে তার পরিচয় দেওয়া হল:

(১) নগ্নতা চূড়ান্ত পর্যায়ের অসভ্যতা না হলেও সব ক্ষেত্রে এটা প্রকাশ করা সমীচীন নয়।

(২) নতুন শিশুর জন্ম একটা পারিবারিক স্বাভাবিক ঘটনা, এতে তাদের বিচলিত হবার বা আদর কমে যাবার সম্ভাবনা নেই।

(৩) তার জিনিস অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া ও অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করায় আনন্দ আছে।

(৪) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও বিস্ময়বোধ করা সুস্থতায় পরিচয় রাখে।

(৫) নিয়মিত মলমূত্র নিঃসরণের মধ্যে দিয়ে শারীরিক সুস্থতা বজায় থাকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়: এই ধরনের বিদ্যালয়ে প্রকৃতিবীক্ষণ পাঠ, যৌন ও প্রজনন সংক্রান্ত শিক্ষা (study of sex and reproduction) দেওয়ার মূল্যবান সূত্র। ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তার কাজ, পরাগমিলন, পুংকেশর, গর্ভকেশর ইত্যাদি বিষয়ের পরিচিতির মাধ্যমে যৌনশিক্ষা দেওয়া যায়। বীজের ভ্রূণাবস্থা এবং ভ্রূণকে রক্ষা করার কৌশল উদ্ভিদ জগতে কিভাবে ঘটে থাকে তা লক্ষ্য করার মধ্যে দিয়ে তাদের যৌনবোধ পরিষ্কার করে দিতে হয়। ব্যাঙের বা পাখির জন্ম বৃত্তান্তের মধ্যে দিয়ে, প্রজনন তত্ত্বের সরল ও সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। তারা পায়রা বা অন্য পোষা স্ত্রী বা পুরুষ পাখির যৌন আচরণ প্রত্যক্ষ করে বা গরু, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর বাচ্চাদের গা চেটে দেওয়া দেখে স্বভাবতঃই কৌতূহলী হয়ে ওঠে। যৌন-মিলনের বিষয় খোলাখুলি ব্যক্ত না করেও সহজ ভাষায় তাদের বোঝানো যায় যে যৌনক্রিয়া প্রজনন ও সন্তান বাৎসল্য অত্যন্ত স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়া এবং এটা প্রাণিজাতির একটা বৈশিষ্ট্য। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পশু-পাখি পোষার ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে। ক্রমশঃ তারা, পুরুষ-স্ত্রী, যৌনমিলন, জন্ম, স্তন্যপান ইত্যাদি কথা নিজেদের শব্দ ভাণ্ডারে সঞ্চয় করতে পারবে। এই স্তরে যৌন-চেতনার উন্মেষে

বা যৌন শিক্ষাদানে জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা সুস্থ প্রতিন্যাস গঠনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এতে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি উন্নত হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যৌনশিক্ষার বা জন্ম বৃত্তান্তের উপর কোন পাঠ না দিলেও চলবে। যৌনবিষয়ে সজ্ঞান ও তাদের সচেতন কৌতূহল জাগার আগেই এই সব বিষয় জ্ঞান দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে একটি ছাত্রীর উক্তি উদ্ধৃত করা হল :

"আমি মনে করি যে নয় বা দশ বছরে সকল ছেলেমেয়েই জন্মবৃত্তান্ত সংক্রান্ত ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হবে তার কারণ হল যদি তারা সহজ স্বাভাবিকভাবে এটা না শেখে, তাহলে নানা উদ্ভট ও বিকৃত জ্ঞান অর্জন করার প্রবণতা দেখায়। শিশুদেরও শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া উচিত তা না হলে তারা অজ্ঞ থেকে যায় আর তার ফলে অনেক রকম সমস্যার উদ্ভব হয়। নতুন ভাই বা বোন জন্মানোর পর ছেলে-মেয়েরা স্বভাবতঃই একটু বিচলিত হয়, তাই তাদের মনকে এ বিষয় আগে থেকে তৈরী করা দরকার।" এই ধরনের বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ ছয় বছর বয়সে পড়তে আসে। এই বয়সে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব করার একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। তবে আট বছর বয়স হবার পূর্বে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তারা লিঙ্গভেদ করে না। তারপর থেকে তারা সাধারণতঃ সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে ও মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পছন্দ করে। দশ এগার বছর বয়স হলেই তারা বিষমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। সুতরাং এই সময় থেকে তাদের মনোভাব ও প্রতিন্যাস পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই বয়সে তাদের মধ্যে একেবারে লিঙ্গগত বিভেদের প্রাচীর না তুলে নানা কাজের মধ্যে মিলিত হবার সুযোগ করে দেওয়া ভাল। সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে তারা পরস্পরের প্রতি আন্তরিক সৌহার্দ্য ও সম্ভ্রমসূচক মনোভাব পোষণ করবে। জোর করে তাদের দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করাতে গেলে অনেক সময় নানা অবাঞ্ছিত যৌন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যৌনশিক্ষা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় : যৌন শিক্ষাদানের ব্যাপারে শৈশব ও বাল্যে বিদ্যালয়ের দায়িত্বের পাশাপাশি গৃহের ভূমিকা ও দায়িত্বও যথেষ্ট ; কিন্তু কিশোর ও নবযৌবন স্তরে যৌনশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যৌনশিক্ষার ব্যাপক কর্মসূচী থাকা দরকার। যে বয়সে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে সে বয়সে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। তাই এই স্তরে তাদের

শারীরিক বৃদ্ধিজনিত দৈহিক পরিবর্তনের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সঙ্গে পরিচিত করাতে হয়। অনেক সময় তারা এসবের প্রকৃত অর্থ না জানার কারণে ভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। ছেলেদের বীর্যোৎপাদন ও মেয়েদের রজঃসৃষ্টির রহস্য, সন্তান জন্মদানের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান দেওয়া দরকার। তাদের প্রাক্ষোভিক জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে প্রেম, ভালবাসা, কাম প্রভৃতি বিষয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন। সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাতে পারস্পরিক উদার ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে তার দিক সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই সময় তাদের যৌনজীবনে বহু রকমের কৌতূহল ও কামনা জাগে, সেইজন্যে যৌনবোধকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করার দিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। ছেলেমেয়েরা পরস্পর বিষমলিঙ্গের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। তারা নিজেদের সম্বন্ধে এত বেশি চিন্তা করে যে অপরের চোখে নিজেকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, ভাল লাগাবে তার অবিরাম চেষ্টা করে। ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের সুখ কল্পনাও এই সময় তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অনেক সময় তারা উদ্দেশ্য-বিহীন আত্মসুখ চিন্তায় (aimless hedonism) বিভোর হয়ে থাকে। তারা ভাবে বড়রা তাদের ঠিক বুঝতে পারছে না। তাই তাদের সমস্যা এমনি জটিল, এমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরই তা সমাধান করতে হবে একারণে মানসিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করে। আত্মসম্মানবোধ এতই তীব্র হয় যে, তারা হয় আক্রমণধর্মী, না হয় অভিমানী হয়ে ওঠে। মেয়েদের বা ছেলেদের সঙ্গে পারস্পরিক মেলামেশার ব্যাপারে প্রাথমিক দ্বিধা, সঙ্কোচ, লজ্জা কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় নেয়। একদিকে বিষমলিঙ্গের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কামনায় আকুলতা, অন্যদিকে সমাজের অনুশাসন, অবাধ মেলামেশায় হস্তক্ষেপ, যৌনবিষয়ে অসম্পূর্ণ অথবা বিকৃত জ্ঞান—সব মিলিয়ে তাদের প্রাক্ষোভিক ও যৌনজীবনে একটা রীতিমত সমস্যার পরিবৃত্ত রচিত হয়। তাই দ্বন্দ্ব, অবদমন, যৌন আকর্ষণ ও প্রবণতা ইত্যাদি তাদেরকে অনেক সময় বিপথগামী করে তোলে। এই অবস্থার পটভূমিতে তাদের যৌনশিক্ষা দিতে হবে। তাই দুরূহ এক কর্তব্যভার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকা ও কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত। এই স্তরে পাঠক্রমে জীববিজ্ঞান (Biology), শারীরবিজ্ঞান (Physiology and Hygiene), পরিবার জীবনগঠন (Family life education), ইতিহাস (History), ভূগোল (Geography), অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান (Economics and Civics), ভাষা ও সাহিত্য (Language

and Literature), ধর্মীয় শিক্ষা (Religious instruction), দেহচর্চা (Physical culture) ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া নানা সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়েও তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক কামনা-বাসনার উদ্গতি সাধন করা যায়। এই স্তরে যৌনশিক্ষার ব্যাপারে উপরিলিখিত বিষয়গুলো কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা আলোচনা করা হল :

জীববিজ্ঞান : জীবিত প্রাণী যৌনমিলন ও প্রজননের মধ্যে দিয়ে বংশরক্ষা করে। ফলে পুরুষ, স্ত্রী, ডিম্বাণু, শুক্রকীট, জননেন্দ্রিয়, যৌনমিলন, রজঃসৃষ্টি, ভ্রূণ, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি কতকগুলো শব্দের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে জলচর, উভচর এবং স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীর পুনরুৎপাদী প্রক্রিয়ার (reproductive process) ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এছাড়া বিভিন্ন প্রাণীর পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানলাভ করে।

শারীর বিজ্ঞান : শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম, পরিচয়, গঠন প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া সম্ভব। অনেক সময় বিভিন্ন অঙ্গের অবস্থান বা শারীরস্থান (Anatomy) জানা খুবই প্রয়োজন হয়। স্ত্রীপুরুষের দেহের পার্থক্য ও গঠন বৈচিত্র্য, গ্রন্থিগুলোর রসরক্ষণের বিশিষ্টতা—সবই এই বিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়।

'গৃহবিজ্ঞান' একটি সঙ্কীর্ণ বিষয়। এটিকে আর একটু ব্যাপক অর্থে পরিবার জীবনগঠন শাস্ত্র বলা ভাল। তাই পারিবারিক সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সন্তান জন্মদান, সন্তান পালন, গৃহসজ্জা, গৃহের পরিচর্যাবিধি ইত্যাদি শেখানোর জন্যে এই বিষয়ের সাহায্য নিতে হয়। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজ আর মেয়েদের শুধু সন্তান পালনবিদ্যা (mother craft) বা ছেলেদের অনুরূপ কোন বিদ্যা আলাদা করে না শেখানোর চেয়ে ব্যাপক ভাবে গৃহ বা পরিবার-সংগঠন-বিজ্ঞান (home craft) শেখানো উচিত।

ইতিহাস : ইতিহাস আজ কেবল খবরের বোঝা নয়, রাজা-মহারাজাদের কুলপঞ্জী (geneology) সংরক্ষণের শাস্ত্রও নয়। ইতিহাস আজ বিবর্তনের মহাসাক্ষী। পরিবারের বিবর্তন, সমাজে নারী জাতির প্রভাব, স্থান, ভূমিকা, পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিভিন্ন সমাজের যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, গোষ্ঠী জীবনের মূল সুর ইত্যাদির মাধ্যমে যৌনশিক্ষার উপাদান ও বিষয়বস্তু শেখানো যেতে পারে। আসলে সমাজ ও তার উৎপত্তি (Genesis) জানতে হলে ইতিহাসের সাহায্য নেওয়া দরকার।

ভূগোল : প্রাকৃতিক ও পারিবেশিক অবস্থা যৌনজীবনে কি প্রভাব বিস্তার করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের যৌনচেতনা, সংস্কার, যৌনবিকাশ ও বিকার ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য ভূগোলের সাহায্য প্রয়োজন। স্থানীয় ভূগোলের (Local geography) সাহায্যে গৃহসংস্থান, সামাজিক সংস্কার বিবরণ, গৃহপরিবেশের অবস্থা, মাতৃসদন শিশুসদন জানা সম্ভব। মানবিক ভূগোল, কোন লোকসমাজে সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক কাঠামো, যৌন নিষেধবিধি (Sex taboo), ধর্মীয় বিশ্বাস, ব্যষ্টি স্বাস্থ্য ইত্যাদি জানতে সাহায্য করে।

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান : বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নাগরিক শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পটভূমিতে সবল সুস্থ নাগরিক তৈরী হতে ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা করা বিদ্যালয়ের অন্যতম কাজ। কিভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করতে হবে, পরিবারের ব্যয়সংস্থান করতে হবে, সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করতে হবে, নিজেদের পছন্দমত বৃত্তি গ্রহণ করতে হবে, তার শিক্ষালাভ করা একান্ত প্রয়োজন। জনসংখ্যা-তত্ত্ব (Theory of population), জন্ম, মৃত্যুর হার নির্ণয়, সীমিত পরিবার পরিকল্পনা যৌনশিক্ষার ব্যাপক উদ্দেশ্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

ভাষা ও সাহিত্য : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষা ও সাহিত্য সুস্থ যৌনচিন্তা ও বিষয়বস্তু প্রতিফলিত করে। সুস্থ ও সুসঙ্গত যৌনবোধ কি এটা না জানা পর্যন্ত ব্যক্তি-মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ছাত্রছাত্রীদের মানসলোককে উন্নত ও পরিশীলিত করতে ভাষা ও সাহিত্য সবচেয়ে কার্যকর। সাহিত্যরসসমৃদ্ধ বিষয়বস্তু ব্যক্তিমানসে উন্নততর রস সৃষ্টি করে; তার ফলে আদিম প্রবৃত্তি, প্রবণতা ও অনুভূতিগুলো পরিশুদ্ধ হয়ে এক সৌন্দর্য-পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়। কবিতায় ও নাটকের ভাবমোক্ষণ (catharsis) পর্যায়ে মানুষের কামনার, রিপু-তাড়নার ঊর্ধ্বগতি সাধিত হয়। প্রাক্ষোভিক অনুভূতিগুলো (Emotional feelings) নানা রসে (Sentiment) পরিণত হয়ে ব্যক্তিত্ব-সংগঠনের উপাদানে পরিণত হয়। সুরুচি গঠনে, সৌন্দর্য শিক্ষায়, কান্তরসোপলব্ধিতে যৌনজীবনের শুচিতা আসে। তাই যৌনশিক্ষায় ভাষা ও সাহিত্যের অবদান অগ্রাহ্য করা চলে না।

ধর্মীয় শিক্ষা : ধর্ম এক সময় আমাদের যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। মানুষের যৌনজীবনে নানা অবদমন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ধর্মীয় অনুশাসনের অজস্র সহস্রবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করা হত। যৌনতাকে মনে করা হত নিষিদ্ধ পাপ। গোঁড়া ধর্ম-শিক্ষকরা (staunch religious teachers) যৌন কথাটাকে উচ্চারণ করতেই সঙ্কুচিত বা দ্বিধাগ্রস্ত হতেন। 'নারী' ছিল তাঁদের কাছে 'নরকের দ্বার'। তাই নর-

নারীর সুস্থ জীবন-সম্পর্ক তাঁদের কাছে গর্হিত বলে বিবেচিত হত। আজীবন ব্রহ্মচর্য বা কৌমার্য পালন করে যৌন চাহিদাকে বা কামনাকে সর্বপ্রকারে অবদমন করাই ছিল ধর্মের মূল মন্ত্র।

সুখের কথা আজ আর ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে মানুষের জীবনে তেমন করে আরোপিত করা হয় না। ধর্মের নীতি আজ উদার ও মহৎ প্রাণের জয়গান শোনায়। 'পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে' আজ মানুষের নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার অপচেষ্টা রোধ করার প্রচেষ্টা চলেছে। ধর্মকে আজ উদার ও কল্যাণময় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জীবন আজ নীতির কশাঘাত জর্জরিত না হয়ে সুস্থ কল্পনার, পরিশীলিত ভাবের, পরিশুদ্ধ চেতনার অভিব্যক্তি স্বরূপ হয়ে উঠেছে। সঙ্কীর্ণতার তমিস্রা ভেদ করে জীবন দৃষ্টির স্বচ্ছতা ফুটে উঠেছে। তাই আজকের ধর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়েও যৌনজীবনে বলিষ্ঠ চেতনার জন্ম দেওয়া সম্ভব হবে।

শারীর শিক্ষা: দেহচর্চা আজ শারীর শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। তাই যৌনশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার কথাও স্বীকৃত হয়েছে। শারীর শিক্ষার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন সুস্থ শরীর ও মন গঠন করার কথা ভাবা হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি নীতিনিষ্ঠা, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা, নেতৃত্ব, সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনদর্শন সবই গঠন করার চেষ্টা হচ্ছে। আজ শারীর শিক্ষাতেও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিশেষ ক্রিয়াকলাপ, গ্রন্থিসমূহের রসক্ষরণ, সুস্থ যৌন সম্পর্কের শারীরিক ভিত্তি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাই আধুনিককালে যৌনশিক্ষার সূচীতে শারীর শিক্ষার বিশেষ স্থান রয়েছে।

৮। যৌন শিক্ষার বিষয়বস্তু (Subject matter of Sex Education):

প্রাপ্তযৌবনের জন্য রচিত যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে যে যে বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হওয়া উচিত নীচে তার উল্লেখ করা হল:

(ক) যৌনবিষয়ক তথ্যাদির বিস্তৃত আলোচনা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান-বিষয়ক যাবতীয় প্রক্রিয়াদির বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানদান।

(খ) যৌনবিষয়ে সুস্থ, উদার ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

(গ) ভ্রান্ত, বিকৃত, কুরুচিপূর্ণ যৌনতার ধারণা দূর করা। অপরপক্ষে সুস্থ, স্বাভাবিক, সরল, অকপট, সত্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করা।

(ঘ) ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ ও হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ দান।

(ঙ) স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা। সুখী গৃহকোণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আনন্দ-উজ্জ্বল দাম্পত্য জীবন-যাপনের শিক্ষাদান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সুখী ও পরিকল্পিত দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা।

(চ) সন্তান পালনের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় বিধিসমূহের আলোচনা।

(ছ) যৌনব্যাধির কারণসমূহ ও তাদের প্রতিকার সম্বন্ধে স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যাখ্যা ও জ্ঞানদান।

(জ) নানা সৃজনমূলক সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যমূলক আলোচনা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও দলগত কর্মোদ্যোগের ব্যবস্থা করা।

(ঝ) মাঝে মাঝে যৌনবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা, চলচ্চিত্র, প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

৯। যৌনশিক্ষার পদ্ধতি (Method of sex Education) :

যৌনশিক্ষার কোন আদর্শ পদ্ধতি আজও নির্ণীত হয়নি, তবে কয়েকটি উপায়ে যৌনশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেগুলো নীচে উল্লিখিত হল :

(ক) যৌনশিক্ষা মূলতঃ ব্যক্তিক। তাই যথাসম্ভব ব্যক্তিগতভাবে এই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা দরকার। একই বয়সের ছেলেমেয়েদের যৌনচেতনার তারতম্য থাকতে পারে, সমস্যার বিভিন্নতা থাকতে পারে ; তাই সমষ্টিগত শিক্ষা না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(খ) যৌনশিক্ষার প্রকৃতি হবে সহজ, খোলাখুলি, সত্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক। অনুমান, অর্ধসত্য ও কল্পিত কোন ধারণা বা জ্ঞানের ভিত্তিতে যৌনশিক্ষা দেওয়া চলতে পারে না। এ কথা সব সময় মনে রাখা দরকার যে এই শিক্ষার সবচেয়ে বড় দিক হল সুস্থ ও বলিষ্ঠ প্রতিন্যাস গঠন। তাই শিক্ষার্থীর মনে যেন কোন্ রকমে অহেতুক ভয়ভীতি, সঙ্কোচ বা দ্বিধা না জন্মায় আর তারা অবাঞ্ছিত কৌতূহলের সহজ শিকার না হয়।

(গ) যৌনশিক্ষক সর্বতোভাবে আবেগ ও ভাবপ্রবণতা বর্জিত হবেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তরগুলোও যেন যথাযথ ও নির্ভুল হয়। তাদের প্রশ্নগুলোর সোজাসুজি উত্তর দেওয়াই আসল কথা। অযথা শাসন বা নিপীড়ন করে ছাত্রছাত্রীর কৌতূহল দমন করার চেষ্টা করা ভুল। অনেক সময় তাদের নির্দোষ প্রশ্নকে শিক্ষকশিক্ষিকা অকালপক্কতার প্রকাশ বলে মনে করে থাকেন, তাই শাস্তি দিয়ে তা প্রতিরোধ করতে চান। এক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তার সংশোধন তো হয়ই না বরং অবাঞ্ছিত জটিলতার সৃষ্টি হয়।

(ঘ) যৌনবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরদান পদ্ধতি যেন সবসময় তথ্যভিত্তিক হয়।

(ঙ) স্বমেহন (masturbation) নগ্নতাবোধ, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, দেওয়াল নোংরা করা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা বা আচরণ করা ইত্যাদি বিষয়ে অবদমনমূলক শৃঙ্খলার (Repressive discipline) পরিবর্তে উদ্‌গতিমূলক (sublimation) কার্যধারার আশ্রয় নিতে হবে। এক্ষেত্রে দলগত ভাবে শিক্ষাদানও চলতে পারে।

(চ) প্রয়োজনানুগভাবে দৃষ্টি ও শ্রুতিনির্ভর বিবিধ উপকরণের সাহায্যে কিংবা উদাহরণ সহযোগে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাদের যৌনশিক্ষা দেওয়া ব্যবস্থা করা দরকার।

একটা কথা মনে রাখা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে, বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের প্রকৃষ্ট স্থান। সুতরাং এখানে উপযুক্ত জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তুলতে হবে। যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে যৌনশিক্ষা সমগ্র বিদ্যালয়-কর্মসূচীর একটি বিশেষ অঙ্গ। এটিকে বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক ভাবে না শিখিয়ে সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শেখানো উচিত।* যৌনতাবোধ স্বভাবজাত জৈবিক এক প্রক্রিয়া। একে স্বভাবের নিয়মেই শেখাতে হবে। অস্বাভাবিক নীতিনিষ্ঠ, শাসনপীড়িত দৃষ্টি দিয়ে যৌনতাবোধের প্রয়োজন মেটাতে চাইলে তা কল্যাণকর হবে না। বিদ্যালয়ের দায়িত্বের পাশাপাশি গৃহেরও দায়িত্ব রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে পিতামাতা, পরিবারের অন্যান্য গুরুজন, বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকা, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সমাজকল্যাণমূলক ও পরিবার পরিকল্পনায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও পরোক্ষভাবে তথ্যসমৃদ্ধ বিজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা, বিতর্ক, ফিল্ম প্রদর্শন, ব্যক্তিগত নির্দেশনা সব কিছুর সাহায্যে সুস্থ সবল যৌনজীবন গঠন করার চেষ্টা করবেন। রাষ্ট্রেরও এ ব্যাপারে অনেক কিছু করার আছে। সমাজের গুরুতর শৃঙ্খলাহীনতা, নীতিভ্রষ্টতা ও বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে দূরে রাখতে হলে যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অসীম। আর সকলের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারাই এই প্রয়োজন সিদ্ধ করা সম্ভব।

ষোড়শ অধ্যায়

বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক পরিচালনা

(Vocational and Educational Guidance)

১। সুপরিচালনার অর্থ (Meaning of Guidance) :

'সুপরিচালনা' শব্দকে আমরা নানা অর্থে প্রয়োগ করে থাকি ; যেমন, নির্দেশ (direction), এগিয়ে দেওয়া (leading), সাহায্য, সহায়তা (help) ইত্যাদি। কিন্তু এসব কোন শব্দই সুপরিচালনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে না। সুপরিচালনার মধ্যে আমাদের লক্ষ্য থাকে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভের জন্য, ব্যক্তির সুষম বিকাশসাধনে সহায়তা করা। সুপরিচালনা এমন এক ধরনের সাহায্য যার দ্বারা ব্যক্তিমনে কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানোর আত্মনক্রিয়তার ও আত্ম-নির্দেশের ক্ষমতা আমরা জাগ্রত করি। এ অর্থে সুপরিচালনা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত করা বা সমস্যা সমাধান করা বোঝায় না। সুপরিচালনার দ্বারা আমরা ব্যক্তিকে পরিচালকের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে চাই না। বরং, ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চাই। এটা হচ্ছে ব্যক্তিকে ব্যক্তির সাহায্য--কোন ব্যক্তির সামর্থ্য, প্রবণতা ইত্যাদি বিচার করে পরিচালক ব্যক্তিকে যে নির্দেশ প্রদান করেন তা হচ্ছে সুপরিচালনা। ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ, তার সকল আচরণ সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুপরিচালনা ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে জড়িত—এবং এ অর্থে সুপরিচালনার লক্ষ্য সমগ্র সমাজের প্রগতি।

অনেক ক্ষেত্রে সুপরিচালনাকে আমরা বৃত্তিমূলক নির্দেশ (vocational guidance) বলে মনে করে থাকি। ব্যক্তির সামর্থ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বিশেষ বৃত্তির জন্য নির্দেশদানই সুপরিচালনা। কিন্তু এ অর্থে সুপরিচালনার উদ্দেশ্য ও অর্থকে সীমিত করা হয়। সুপরিচালনার ক্ষেত্র অতি ব্যাপক, জীবনের নানাদিকে সুপরিচালনায় প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সুপরিচালনা একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সুপরিচালনার দ্বারাই সাধিত হতে পারে। এজন্য শিক্ষার সকল স্তরে সুপরিচালনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হচ্ছে।

২। বিভিন্ন ধরনের সুপরিচালনা (Several kinds of Guidance) :

সুপরিচালনার ব্যাপক অর্থ বোঝাতে গেলে নানা ধরনের সুপরিচালনার কথাই উল্লেখ করতে হয়। আমরা নিম্নে বিশেষ বিশেষ সুপরিচালনার উল্লেখ করছি :

(১) **শিক্ষামূলক সুপরিচালনা** (Educational guidance): শিশুর শিক্ষাগত সুপরিচালনা বলতে দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা বোঝায়। শিশু ইন্দ্রিয়ানুশীলন এবং নানারকম প্রক্ষোভ ও অনুভূতি দ্বারা নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সে তখন সব কিছুকে জানবার জন্য ব্যাকুল এবং কৌতূহলী হয়ে ওঠে। শিশুর সামর্থ্য অনুসারে তার সকল কৌতূহল ও চাহিদা শিক্ষার দ্বারা কিভাবে মেটান যায় এটাই শিক্ষামূলক পরিচালনার অর্থ।

(২) **বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা** (Vocational guidance): বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা বলতে আমরা বুঝি শিক্ষার্থীকে বিশেষ একটি বৃত্তি (vocation) গ্রহণে এবং এ জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে, এমন কি সেই বৃত্তিতে উন্নতিসাধনে পরামর্শ দান ও সহায়তা করা।

(৩) **স্বাস্থ্যরক্ষামূলক সুপরিচালনা** (Health guidance): শিশু বিদ্যালয়ে শিশুকে তার মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাপারে নির্দেশ দান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। শিশুর দেহকে রোগমুক্ত এবং কর্মক্ষম করে তোলার জন্য তার কি ধরনের দেহানুশীলনের প্রয়োজন, কি ধরনের খাবার গ্রহণ করা উচিত, কি পরিমাণ বিশ্রাম করা উচিত প্রভৃতি ব্যাপারে পরামর্শ দান স্বাস্থ্যরক্ষামূলক সুপরিচালনার অঙ্গীভূত।

শিশুর মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোন ত্রুটি থাকলে সেগুলোকে অপসারিত করা চাই। এজন্য শিশুদের আলাদা হাসপাতাল থাকা দরকার। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের হাসপাতালের খুবই অভাব। ১৯৫৫ খ্রী: ভারত সরকারের স্বাস্থ্য-মন্ত্রণালয় দিল্লীর নার্সিং কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত একটি শিশু-পরিচালনাগার হাসপাতাল (Child Guidance Clinic) স্থাপন করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে এই প্রথম প্রচেষ্টা। শিশুর মানসিক ও দৈহিক ত্রুটি অনেক সময় অসামঞ্জস্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পাঠে তাকে অনগ্রসর করে তোলে। তখন সে সমস্যামূলক শিশু হয়ে ওঠে; শুধু তাই নয়, সময় সময় সে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সুতরাং শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে এসব সুপরিচালনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

(৪) **অবসরযাপনমূলক সুপরিচালনা** (Leisure-time guidance): অবসরযাপনমূলক সুপরিচালনা হল বিদ্যালয়ের আর একটি কর্তব্য। শিক্ষার্থীরা কিভাবে তাদের অবসর সময়কে সার্থক ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে, কিভাবে পাঠের বা কাজের একঘেয়েমি (boredom) দূর করতে পারে এবং

উদ্যমশীলতাকে সদাজাগ্রত রাখার জন্য অবসর সময় কিভাবে সুব্যবহার করতে পারে তার নির্দেশনাও প্রয়োজন।

(৫) **নাগরিকতামূলক সুপরিচালনা** (Civic guidance): নাগরিকতামূলক সুপরিচালনা হল বিদ্যালয়ের সামাজিক কর্তব্য পালনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে যে রাষ্ট্র বা সমাজের নাগরিক হয়ে জীবন যাপন করবে, ঐ রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্বপালন এবং সামাজিক মঙ্গলসাধনে তাদের উপযুক্ত করে তুলতে সুপরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে।

(৬) **নৈতিকতামূলক সুপরিচালনা** (Moral guidance): নৈতিকতামূলক পরিচালনার প্রকৃত অর্থ হল প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনে নৈতিক চেতনা জাগ্রত ও শক্তিশালী করে তোলা। মানুষ প্রাকৃতিক পৃথিবীতে জন্মে, কিন্তু তাকে সৎজীবন যাপনের জন্য নৈতিক পৃথিবী আবিষ্কার করতে হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালে সমবেত হয়। কৈশোর বা বয়ঃসন্ধিকালেই ব্যক্তি আদর্শসন্ধানী হয়ে ওঠে। ঐ সময় তার মনে নানা আদর্শের সংঘাত উপস্থিত হয়। তখন যদি তাকে নৈতিকতায় দীক্ষিত ও সুপরিচালিত করা না হয়; তবে অনেক সময় সে সমাজদ্রোহী হয়ে পড়ে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সব বিভিন্ন ধরনের সুপরিচালনার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। একটি সুপরিচালনা অন্য একটি সুপরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কেবিজড়িত। মানুষের জীবন অখণ্ড, সুতরাং তার জীবনে বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক বলে আলাদা আলাদা কোন বিভাগ নেই। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে লক্ষ্য করেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে যেমন জীবনের বিশেষ কোন দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তেমনি সুপরিচালনার লক্ষ্যও শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন-বিকাশে সহায়তা করা।

আমরা এক্ষণে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রস্তাব করছি:

৩। শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা (Educational and Vocational Guidance): *

সার্থক শিক্ষার সঙ্গে সুপরিচালনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষাকে যদি শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বলে ব্যাখ্যা করা যায় তবে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরিবর্তিত পরিবেশ এবং চাহিদার সঙ্গতিসাধন করবে। প্রতিটি শিশুর নিজস্ব কতকগুলো আগ্রহ ও প্রবণতা থাকে। এগুলোকে সুপরিচালিত না করলে শিক্ষার্থীর

ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। এ অর্থে শিক্ষার সঙ্গে সুপরিচালনার একটি অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বর্তমান।

শিক্ষার সঙ্গে সুপরিচালনার এই স্বাভাবিক সম্পর্ক ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের ফলে সুপরিচালনা একটি বিশেষ কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) বলেন : "বহুমুখী শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষাক্রম ও জীবনের ধারা নির্বাচন করতে সুপরিচালনার একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালকদের উপর এসে পড়েছে। সুশিক্ষার আসল কথা হল, প্রতিটি ছাত্রকে তার মেধা ও প্রবণতা বুঝতে সহায়তা করা ; যথাযথভাবে সামাজিক সঙ্গতিসাধনে ও উপযুক্ত বৃত্তি অন্বেষণে শিক্ষার্থী কিভাবে এবং কতটুকু নিজেকে বিকশিত করে তুলতে পারে তার নির্দেশ দান করা।"[1]

শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা মোটেই কোন যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। কতকগুলো বিশেষ প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে কয়েকটি মাত্রায় (grade) বিভক্ত করা এবং কতকগুলো বৃত্তির জন্য চিহ্নিত করা সুপরিচালনার অর্থ নয়। সুপরিচালনা অত্যন্ত কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ ব্যাপার। ছাত্ররা মেধা, আগ্রহ ইত্যাদি অনুসারে কিভাবে শিক্ষাক্রম নির্বাচন করতে পারে, কিভাবে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং বিশেষ জীবিকা গ্রহণ করতে পারে—এসব বিষয়ে সহায়তার মাধ্যমে ছাত্রদের সক্রিয় এবং সক্ষম করে তোলাই সুপরিচালনার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, সুপরিচালনা শুধু কয়েকজন বিশেষজ্ঞের কাজ নয় এবং কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক বা পাঠ্যসূচী নির্বাচনমূলক ব্যাপারেই সুপরিচালনা সীমিত নয়। সুপরিচালনা শিক্ষক, অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক এবং পরিচালন অধিকর্তা (Guidance Officer) ইত্যাদি সকলের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বারা যথার্থভাবে সম্পাদিত হয়। ছাত্রের জীবনের সকল সমস্যার জন্য সুপরিচালনার প্রয়োজন সর্বজনস্বীকৃত।

(ক) **শিক্ষামূলক সুপরিচালনা** (Educational Guidance) : শিশুর শিক্ষাগত সুপরিচালনা বলতে দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা ও নির্দেশনা

বোঝায়। শিশু ইন্দ্রিয়ানুশীলন এবং নানা রকম প্রক্ষোভ ও অনুভূতি দ্বারা নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সে তখন সব কিছুকে জানবার জন্য ব্যাকুল এবং কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এ সময়েই সে নানা বিষয়ে তার রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, দক্ষতা ইত্যাদি প্রদর্শন করতে থাকে। শিশু-শিক্ষায় যাতে এসবের মূল্য ও প্রাধান্য স্বীকৃত হয় তা শিক্ষক লক্ষ্য করবেন; শিশুকে তার মানসিক ও দৈহিক চাহিদা অনুসারে শিক্ষা দেবেন এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করবেন। আধুনিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদান পদ্ধতি (Method of individualised instruction) শিক্ষাগত সুপরিচালনারই একটি অঙ্গ। শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা এবং সামর্থানুযায়ী তাকে পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে বলা হবে। এ ব্যাপারে শিশুর অসুবিধা দেখা দিলে তা দূরীকরণে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে।

শিক্ষাগত সুপরিচালনায় কেবল শিশুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সমস্যার নির্দেশনা থাকবে তা নয়, শিশুকে সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত করে তুলতে ও তার সামাজিক গুণাবলী বিকশিত করতে সকল প্রকার সহায়তা করার ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে থাকবে। বিদ্যালয়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা শিশুর চারিদিকে দেখা দেয় এবং তাতে শিশু-মনে নানা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে তার সহপাঠীদের প্রভাবও তার উপর বিস্তার লাভ করে। যে বয়সে শিশু নার্সারিতে যায়, সে বয়সে শিশু প্রধানতঃ অহংপ্রিয় এবং আত্মকেন্দ্রিক থাকে। এজন্য সকলের সঙ্গে তার সঙ্গতিসাধন সহজ ও সম্ভব হয়ে ওঠে না। কাজেই শিশুকে সমাজ-জীবনে বা বিদ্যালয়-জীবনে অন্যের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করানো চাই। তা নাহলে পরিণত জীবনে সে অপপ্রতি-যোজনশীল হয়ে পড়বে। বিদ্যালয়েই যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, সমবেত অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, সহানুভূতি, একাত্মবোধ, সমাজ-চেতনা প্রভৃতি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শিশুকে বিদ্যালয়ের কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ করাতে না পারলে শিশু সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারবে না।

তারপর দেখতে হবে শিশু পাঠে অনগ্রসর হয়ে পড়ছে কিনা। শিশুর অনগ্রসরতা তার জীবন-বিকাশের মোটেই সহায়ক নয়। তার অনগ্রসরতা তাকে দল থেকে আলাদা করে দিতে পারে। ফলে শিশুর মনে হীনমন্যতা বোধ জাগতে পারে এবং সে অসামাজিক হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং পাঠে অনগ্রসর ছাত্রের জন্যও সুপরিচালনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

(খ) বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা (Vocational Guidance): বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা বলতে আমরা বুঝি শিক্ষার্থীকে তার ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত একটি বৃত্তি

গ্রহণে এবং সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে, এমনকি সেই বৃত্তিতে উন্নতিসাধনে পরামর্শ দান ও সহায়তা করা। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার অতি নিকট সম্পর্ক লক্ষণীয়। যে বয়সে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে এসে পৌঁছায়, সে বয়স তাদের বয়ঃসন্ধিকাল। তাদের মধ্যে তখন আত্মপ্রতিষ্ঠা, স্বনির্ভরতার একটি তাড়না উপস্থিত হয়। একে অনেকেই বিশেষ বৃত্তিগ্রহণের চাহিদা বলে অভিহিত করেন। শিক্ষার্থীকে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে অপরিহার্য।

আধুনিক যান্ত্রিক যুগে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ব্যক্তিকে একটি বৃত্তিমূলক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করা। কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় গতানুগতিক ভাবে শিক্ষার্থী পিতৃপুরুষের জীবিকা গ্রহণ করত। কিন্তু শিল্প যুগে আমাদের সমাজ এবং জীবিকা জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাছাড়া মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রসারের ফলে একথা আজ স্বীকৃত যে নিজের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুসারে বৃত্তি গ্রহণ না করলে ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, আর কার্য-সম্পাদনে সন্তুষ্টি (job satisfaction) পায় না। অন্যদিকে বিভিন্ন বৃত্তি তার নিজস্ব চাহিদা (job requirements) নিয়ে উপস্থিত। এমতাবস্থায় বৃত্তিমূলক সুপরিচালনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক নির্দেশনা না থাকলে শিক্ষার ফলশ্রুতি ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি।

বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার তিনটি দিক বর্তমান—(১) কোন একটি বৃত্তি নির্বাচনের নির্দেশ, (২) বৃত্তিগত পরিবেশের সঙ্গে উপযুক্তভাবে সঙ্গতিসাধনের জন্য প্রস্তুত করা, (৩) কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষণ (training) নির্বাচন করা।

ব্যক্তিত্বের উন্নতিসাধনে ব্যক্তির কি কি দুর্বলতা এবং কি কি সামর্থ্য বর্তমান তা বিবেচনা করতে হয়। উপযুক্ত বৃত্তি-নির্বাচনে ব্যক্তিত্বের এ দুটি দিক সমানভাবে বিবেচ্য। শিক্ষার্থীর ত্রুটি ও কৃতিত্ব উভয় দিক পর্যবেক্ষণ করে তাকে উপযুক্ত বৃত্তির জন্য প্রস্তুত করা বৃত্তিমূলক সুপরিচালনার প্রথম দিক।

বৃত্তি এবং শ্রম পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বিজড়িত। সুতরাং যে বৃত্তি শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে চাইবে, সে বৃত্তির উপযুক্ত পরিশ্রম করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হবে। এছাড়া, বৃত্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িত শ্রম, নিয়ম, বেতন, নানা শ্রমিক সংস্থার সংবাদ, বিশেষ বিশেষ বৃত্তিমূলক জীবনের সমস্যা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করার জন্য শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দান সুপরিচালনার দ্বিতীয় দিক।

তারপর যে বৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করা হল, সে বৃত্তির জন্য শিক্ষণ যোগ্যতা তাকে প্রদান করতে হবে। শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। বৃত্তিমূলক স্থপারচালনার তৃতীয় দিক হল, শিক্ষণ যেন তার আগ্রহ, প্রবণতা ও সামর্থ্যের উপযোগী হয়।

বিদ্যালয়ই বৃত্তিমূলক নির্দেশের উপযুক্ত স্থান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাইতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্রদেব নিকট অধিকতর আস্থাভাজন—কেননা, একমাত্র ছাত্রদের মঙ্গল ও উন্নতিসাধনই বিদ্যালয়ের অভিপ্রেত লক্ষ্য। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বিদ্যালয়েই সম্ভব এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, আগ্রহ, পারিবারিক আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষক মোটামুটি পরিচয় লাভ করেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক স্থপবিচালনার উপযুক্ত বয়স। যে বয়সে ছাত্রবা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপনীত হয়—সে বযসে আত্মনির্ভরশীতার ইচ্ছা তাদের মধ্যে জাগে এবং বৃত্তি শিক্ষাব নির্দেশ তখনই বিদ্যালয়ে দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের এসব স্থবিধা থাকার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা কলেজে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনা।

৪। **পরিচালনার নিয়মাবলী (Principles of Guidance) :**

যিনি শিক্ষার্থীকে স্থপরিচালিত করেন তাঁর অনেকগুলো যোগ্যতা থাকা উচিত। কিশোরমনকে অনুধাবন করা এবং তাদের সমস্যাগুলোর সঙ্গে পবিচিত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। যিনি কৈশোরের চাহিদা এবং সমস্যার সঙ্গে পরিচিত নন তাঁর পক্ষে স্থপবিচালনার কর্তব্য বহন করা অসম্ভব। গভীর সহামুভূতি-সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিচালক শিক্ষার্থীকে বিচার-বিবেচনা করবেন। এজন্য মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব এবং শিক্ষাতত্ত্বে পরিচালকের গভীর দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনার জন্য আধিকারিককে (officer) বৃত্তি-শিক্ষার বিভিন্ন বৃত্তির চাহিদা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং এসব ব্যাপারে সকল তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে রাখা দরকার। তাছাড়া বিভিন্ন বৃত্তির যোগ্যতা সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আধিকারিক শুধু ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন তা-নয়, বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক ইত্যাদি সকলের সঙ্গে তাঁব সংযোগ ও সহযোগিতা রাখা দরকার। এজন্য তাঁকে প্রচুর সময় অতিবাহিত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

স্থপরিচালকের সাধারণ গুণাবলী আমরা আলোচনা করেছি—স্থপরিচালনার জন্য পরিচালককে আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে

হয়। এক্ষণে সুপরিচালনার কতকগুলো সাধারণ নিয়ম আমরা আলোচনা করার প্রস্তাব করছি।

সুপরিচালনার ব্যাপারে আমাদের কতকগুলো পরীক্ষিত নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত বৈষম্য-নীতি স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ ব্যক্তিগত বৈষম্য শিক্ষার্থীর স্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বৃত্তি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যথাযথ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ শিক্ষার্থীর কাছে পরিবেশন করতে হয়। উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ সুপরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। তৃতীয়তঃ, শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক পরিচালনা ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন স্তরে প্রদান করতে হয়। তার কারণ শিক্ষার্থীর আর্থিক অবস্থা এবং তার আগ্রহ ও প্রবণতার বিভিন্ন স্তরে নানা পরিবর্তন ঘটে। চতুর্থতঃ, কোন শিক্ষার্থীকেই তাড়াহুড়া করে কোন বৃত্তি নির্বাচন করতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ বৃত্তিনির্বাচনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবনের সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং ধীর-স্থির ভাবে বিচার-বিবেচনা ও প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিক্ষার্থীর বৃত্তিনির্বাচন করা উচিত।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যতিক্রমী শিশু ও তাদের শিক্ষাগত চাহিদা
(Exceptional children and their educational needs)

১। ব্যতিক্রমী কারা? (Who are exceptional ?) :

মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিগত বৈষম্য-নীতি স্বীকৃত হওয়ার আগে বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকেই সাধারণ (normal) বলে অভিহিত করা হত। একান্তভাবে যারা অস্বাভাবিক (abnormal), ত্রুটিপূর্ণ (handicapped) বা দুষ্কৃতকারী (delinquent) তাদের বলা হত ব্যতিক্রমী (exceptional)। অবশ্য যারা সাধারণের থেকে উপরে বা নীচে পড়ে তাদের উভয় শ্রেণীকেই ব্যতিক্রমী বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে শিক্ষায় পরিমাপের প্রয়োগ হওয়ার ফলে দেখা যায় যে সাধারণের সংখ্যাই বেশি ; তবে উপরের ও নীচের উভয় প্রান্তেই কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিক সম্ভাবনার লেখচিত্রে (Normal Probability Curve) যদি একদল শিক্ষার্থীর যে কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে প্রায় শতকরা ৬৮·২৬ ভাগ এই সাধারণ শ্রেণীতে পড়বে এবং দুই প্রান্তে শতকরা ১৫·৮৭ করে পড়বে। তবে এটা একটা আদর্শচিত্র, সুতরাং এমন নিখুঁত বিস্তার আর চিত্র খুব কমই পাওয়া যাবে। তাই আমরা লক্ষ্য করি বিশুদ্ধ সাধারণ মানুষ (purely normal) পৃথিবীতে মেলে কম, তবুও যার মধ্যে যত বেশি মাত্রায় সাধারণ গুণ বর্তমান থাকে তাকে তত বেশি স্বাভাবিক বা সাধারণ বলে মেনে নিই। এর ব্যত্যয়ীরা সবই অস্বাভাবিক।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক

কোন দুটি শিশু এক রকমের নয়। তাদের মধ্যে নানা দিক থেকে বৈষম্য থাকতে পারে। তেমনি একই শ্রেণীর একদল ছাত্রের মধ্যে কেউ তীক্ষ্ণধী, কেউ মন্দধী, কেউ পড়াশোনায় ভাল, আবার কেউ ভাল নয়, কেউ চটপটে, কেউ বা ধীর। এত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এক একটা শ্রেণীকে আমরা এক একটা নাম দিয়ে শিক্ষা দান করে থাকি। তবে যদি এই শ্রেণীর মধ্যে একান্ত অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমী কেউ থেকে যায় তার জন্যে আলাদা শিখন-ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। আবার সকল ব্যতিক্রমীর সমস্যা এক নয়। যারা বেশী গুণসম্পন্ন তাদেরকেও বলা হয় ব্যতিক্রম ; আবার যারা অল্প গুণসম্পন্ন তাদেরও তাই বলা হচ্ছে। সুতরাং এদের সমস্যা ভিন্নতর হতে বাধ্য।

২। ব্যতিক্রমের শ্রেণীবিভাগ (Classification of exception) :

ব্যতিক্রমকে প্রকৃতির দিক থেকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি :

(ক) **দৈহিক ক্রটিজনিত ব্যতিক্রম।**

(খ) **মানসিক ক্ষমতা ও বুদ্ধির তারতম্যজনিত ব্যতিক্রম।**

সমস্যামূলক শিশুর দৈহিক ক্রটি নানা ধরনের হতে পারে, যেমন :

(১) বধিরতা বা প্রায়-বধিরতা (Deafness বা near deafness)

(২) অন্ধতা বা প্রায়ান্ধতা (Blindness বা near blindness)

(৩) বিকলাঙ্গতা (Physical handicap)

(৪) তোতলামি (Stammering) বা বাক্য উচ্চারণে ক্রটি (Speech defect)

মানসিক ক্ষমতার তারতম্য ও বুদ্ধিজনিত কারণে বহু প্রকারের ব্যতিক্রমও দেখা যায়, যেমন :

(১) জড়বুদ্ধি (Idiot)

(২) অল্পধী (Imbecile)

(৩) হীনধী (Moron)

(৪) বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বা অসামান্যতা (Genius)

উপরের দুই শ্রেণীর বালকবালিকারা ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হয়। তাই প্রয়োজনমত প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য রাখতে হয়।

(ক) **দৈহিক ক্রটিজনিত ব্যতিক্রম** (Exception owing to physical defects) : (১)**বধিরতা** বা **প্রায় বধিরতা :** বধিরতা জন্মগত বা আকস্মিক দুই-ই হতে পারে। জন্মগত বধিরতা দূর করা কঠিন। আকস্মিক বধিরতা নানা রোগের কারণে, বিশেষ করে গলার ও নাকের রোগ, হাম, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি কারণে জন্মাতে পারে। তবে এই জাতীয় বধিরতা চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় করা সম্ভবপর হয়। যারা প্রায়-বধির তাদের অবস্থার মধ্যে অসহায়তা ফুটে ওঠে। কেউ কেউ খুবই মনমরা বা বিষণ্ণ প্রকৃতির হয়। খুব মনোযোগ দিয়ে এরা অপরের মুখভঙ্গী ও উচ্চারণ লক্ষ্য করে যাতে ঠোঁট নাড়া দেখে কথা অনুমান করে নিতে পারে। আজকাল নানা যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বধিরতা দূর করার চেষ্টা চলেছে। যারা একেবারে বধির তাদের জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। শিক্ষকেরা আঙুলের সঙ্কেত করে বা ঠোঁট নেড়ে এদের কথা বুঝতে সাহায্য করে থাকেন। যারা

কানে একটু কম শোনে এমন ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষের সামনের সারিতে এনে বসালে শিক্ষকের কথা শুনতে পায়; উপরন্তু শারীরিক ত্রুটির জন্য তাদের যে মানসিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তারও নিরসন হতে পারে। যারা জন্মগতভাবে বধির তারা কথাও বলতে পারে না। ইশারায় মনের ভাব বোঝায়। মূকবধির বিদ্যালয়ে (Deaf and dumb school) এদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যেও অনেকে নানা ধরনের হাতের কাজ শিখে জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেয়। এদের উপহাস বা ঘৃণা করা, লজ্জা বা শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে সবসময় সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে এদের বোঝানো দরকার যে এরা সমাজের বোঝা নয়।

(২) **অন্ধতা** বা **প্রায়ান্ধতা ঃ** অন্ধতা দুরকম কারণে ঘটতে পারে। জন্মগতভাবে, নানা উপদংশ রোগে আক্রান্ত হলে অন্ধতা আসতে পারে। সেক্ষেত্রে এরা পিতামাতার ভুলের মাশুল দেয়, আবার অনেক সময় টাইফয়েড, বসন্ত, ঘাম ইত্যাদি রোগের কারণে ও বার্ধক্যজনিত অন্ধতা বা দৃষ্টিহীনতা দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিহীনতা উপযুক্ত চিকিৎসার সাহায্যে দূর করা যায় তবে মস্তিষ্কের জটিল রোগহেতু ও চোখের শিরার শুষ্কতার জন্য যে প্রায়ন্ধতা তা নিরাময় করা রীতিমত কঠিন। তীব্র আবেগভূতিক সংঘাত ও অবদমনের ফলে সাময়িকভাবে অন্ধতা দেখা দিতে পারে।

অন্ধতার বা দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণগুলোকে দূর করে এই ধরনের অসহায় শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকশিক্ষিকা যদি দেখেন যে কোন শিক্ষার্থী চোখ পিটপিট (blinking) করে বা কপাল কুঁচকে (frowning) তাকিয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন যে তার চোখের দোষ হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় যে, মাথা বাঁকা করে কেউ দেখছে বা দেখার সময় একটু পরে পরেই চোখ মুছছে, এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং বিদ্যালয়ের তরফ থেকে অভিভাবকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা থাকলে এসব দোষত্রুটি প্রথমেই ধরা পড়তে পারে এবং চিকিৎসার ফলে নিরাময়ও সম্ভব হয়।

যারা একেবারে অন্ধ তাদের জন্য ব্রেলের উদ্ভাবিত অক্ষরমালার (Braille's Alphabets) সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্ধদের শিক্ষার জন্য অন্ধ বিদ্যালয় (Blind School) স্থাপিত হয়েছে। এদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়-শিক্ষার মধ্যে দিয়েও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা সম্ভব।

(৩) **বিকলাঙ্গতা:** যারা জন্মগতভাবে বিকলাঙ্গ বা আকস্মিক কোন দুর্ঘটনায় অঙ্গ হারিয়েছে তারা অন্যান্য সুস্থ ছেলেমেয়েদের মতো বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির অধিকারী হতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শারীরিক বিকলঙ্গতার কারণে মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেক্ষেত্রে অপরের উপহাস, ঘৃণা বা উপেক্ষা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। অনেক ক্ষেত্রে এরা নিরাশায় ও হীনমন্যতায় ভোগে। এদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত। এদের শারীরিক অক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের ছেলে-মেয়েদের সাধারণ বিদ্যালয় থেকে একেবারে পৃথক করলে অসুবিধা হতে পারে। যে সমস্ত কাজে খুব বেশি শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, সেসব কাজে ও নানা সাহিত্য ও গবেষণামূলক কাজে এদের নিয়োগ করা যেতে পারে। অধুনা কাজের মধ্যে দিয়ে চিকিৎসা (occupational therapy) ব্যবস্থার মাধ্যমে এদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলেছে।

(৪) **তোতলামি:** বাক্য উচ্চারণে ত্রুটি, অস্পষ্টতা ইত্যাদিও সাধারণের থেকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য হতে পারে। অবশ্য এই ত্রুটিগুলো খুব মারাত্মক না হলেও সাময়িকভাবে ব্যক্তিকে উপহাসের পাত্র করে তুলতে পারে, ফলে ব্যক্তির সাফল্য বা সুষম বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তোতলামি বা উচ্চারণে অস্পষ্টতা জন্মগত কারণে ও আকস্মিক রোগজনিত উপায়ে দেখা দিতে পারে। জন্মের সময় অনেক শিশুর উপরের ঠোঁট কাটা বা তালু বিভক্ত অবস্থায় দেখা যায়, এদের উচ্চারণ অস্পষ্ট হতে বাধ্য, আবার কণ্ঠনালীর রুগ্নতা, ভারী জিহ্বা বা ফাঁকা-ফাঁকা দাঁত হওয়ার কারণে বা অন্য কোন গুরুতর রোগের কারণে বাক্য উচ্চারণে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। অনেক সময় তীব্র মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেও এই ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। এগুলো চিকিৎসার দ্বারা দূর করা সম্ভব। অনেক সময় ভাষা-শিক্ষার সময় ঠিকমত উচ্চারণ শিক্ষা না করতে পারার কারণেও বাগ্‌যন্ত্রের অপরিণত বিকাশের ফলে শিশুদের মধ্যে নানা ধরনের অসুবিধা আমরা লক্ষ্য করে থাকি। রীতিমত অভ্যাস, সঙ্কোচহীন অনুশীলন, মানসিক শান্তি, উৎসাহ ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার সকল রকমের ত্রুটি দূর করতে পারে। এদের আলাদা করে রেখে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হয় না, তবে সব ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে অনুশীলন করানোর দরকার হয়ে পড়ে।

(খ) **মানসিক ক্ষমতা ও বুদ্ধির তারতম্যজনিত ব্যতিক্রম:** (Exceptions owing to differences in Intelligence or mental powers): সব

রকমের মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করে ব্যতিক্রম নির্ণয় করার বৈজ্ঞানিক উপায় এখনও আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়নি। সাধারণভাবে আমরা বুদ্ধিকেই এমন একটি মানসিক ক্ষমতা বলে মনে করেছি যার তারতম্য পরিমাপ করার নানা উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। তাই সাধারণের চেয়ে শ্রেয়ঃ (Super normal) ও ন্যূন (Subnormal)[1] যারা তাদের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে যে সমস্যা দেখা দেয় তার আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে টারম্যান (*Terman*) ও লভেল (*Lovell*) বুদ্ধ্যঙ্কের (Intelligence Quotient) পরিমাপ অনুযায়ী যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন পরপর তার উল্লেখ করা হল :

	বুদ্ধ্যঙ্ক	শ্রেণী	
টারম্যান-প্রদত্ত শ্রেণী বিভাগ	১৫০ ও তার উপরে	প্রতিভাবান (Geuius)	
	১৩০—১৪৯	অত্যন্ত উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন (Very superior)	ব্যতিক্রমী
	১১৫—১২৯	উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন (Superior)	
	৮৫—১১৪	সাধারণ (Normal)	
	৭০—৮৪	অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন (Dull)	
	৫০—৬৯	ক্ষীণবুদ্ধিসম্প (Feble minded or Moron	ব্যতিক্রমী
	২০—৪৯	নির্বোধ (Imbecile)	
	২০ ও তার নীচে	জড়বুদ্ধি (Idiot)	
লভেল-প্রদত্ত শ্রেণী বিভাগ	১৩০—১৬০	উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন (Superior)—ব্যতিক্রমী	
	৮৫—১২৯	সাধারণ (Normal)	
	৭০—৮৪	অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, নিষ্প্রভ (Dull)	
	৫৫—৬৯	ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন	ব্যতিক্রমী
	২৫—৫৪	নির্বোধ (Imbecile)	
	২৫-এর নীচে	জড় বুদ্ধি (Idiot)	

উপরের দুটি শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যাদের

1. Above average, or normal in respect of intellectual or other ability ; sometimes employed in a sense approaching that of supernatural, but usually without the implication of inconsistency with natural law.

Below normal ; frequently used of intelligence which is markedly below average. Drever : Dictionary of Psychology.

বুদ্ধ্যঙ্ক ১৩০-এর উপর বা ৭০-এর নীচে তারাই ব্যতিক্রমী শিশু। এবার এদের মানসিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ৫০ থেকে ৭০-এর মধ্যে যারা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন তাদেরকে ইংলণ্ডে feeble-minded আর আমেরিকাতে Moron বলা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য হল :

অল্পবুদ্ধি ব্যতিক্রমীদের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা

(ক) সীমাবদ্ধ মনঃসংযোগ ক্ষমতা
(খ) অল্প উৎসাহ ও উদ্দীপনা
(গ) অসংলগ্ন চিন্তা
(ঘ) অপসঙ্গত চিত্তবৃত্তি
(ঙ) লক্ষণীয় অপরাধপ্রবণতা।

সুতরাং এদের দিকে নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এরা শিক্ষাগত দিক থেকে সাধারণের চেয়ে পিছনে পড়ে থাকে। স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে বা একই শ্রেণীতে পড়ে এরা লাভবান হতে পারে না। শ্রেণীব পাঠ আয়ত্ত করা এদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরা অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ে বলে অনেক সময় হীনমন্যতায় ভোগে এবং নিজেকে ধিক্কার দেয়। প্রতিরক্ষণ কৌশল হিসেবে এরা শ্রেণীকক্ষে গোলমাল করে এবং সামাজিকভাবে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। কার্ক ও জনসনের (*Kirk and Johnson*) মতে এরা মানসিক দিক থেকে পশ্চাদ্‌গামী, তবে শিক্ষা গ্রহণের কিছুটা যোগ্যতা রাখে (educable but mentally handicapped)। এদের নির্বাচিত কিছু বিষয় শিক্ষা দিলে উপযুক্ত ভাবে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। চাষের কাজ, কাঠের কাজ বা যন্ত্রপাতি চালানোর কাজ, সেলাই বা বোনার কাজ, বেতের বা বাঁশের ঝুড়ি বোনার কাজ শিখলে এদের জীবিকা অর্জনের সমস্যা মেটে। সাধারণ শিক্ষায় এরা বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তবে কোথাও কোন ভুল করলে এরা সহজেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাই এদের জন্য সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠক্রম তৈরী করা দরকার। এদের বিমূর্ত জিনিস অপেক্ষা মূর্ত জিনিস দিয়ে শেখানো উচিত। বার বার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এদের অভ্যাস গঠন, অল্প লেখাপড়া ও হিসাবপত্র শেখাতে হবে যাতে এরা জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানে যোগ্য হয়ে উঠে। অবশ্য এর জন্যে বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। বেশী সময় নিয়ে অল্প দায়িত্বের কাজ দিয়ে এদের শিক্ষাগত প্রয়োজন মেটাতে হবে।

প্রাত্যহিক জীবনের নানারকম তালিকাবদ্ধ কাজ (Routine duty) করিয়ে নিলে এরা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পাতে পারে। পিট্যুইট্যারি ও অন্যান্য

গ্রন্থির রসরক্ষণের ক্রটি থাকাতে এদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না। ট্রেডগোল্ডের মতে এরা মঙ্গোলিয়ান[1] শ্রেণীভুক্ত।

এরপর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে সেই সব শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। সাধারণভাবে এদের নির্বোধ (Imbecile) বলা হয়ে থাকে। মানসিক বিকাশের দিক থেকে এরা নীচু স্তরের। এদের দৈহিক বিকৃতিও লক্ষ্যণীয়। এদের বৈশিষ্ট্য হল :

নির্বোধদের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা

(ক) এরা কৌতুহল ও মনঃসংযোগের ক্ষমতাহীন।

(খ) এদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল ও চিন্তাশক্তি নেই।

(গ) এরা মানসিক দিক থেকে অপসঙ্গত।

(ঘ) এরা নিজেরা নিজেদের ভার বহন করতে পারে না।

(ঙ) এদের লেখাপড়া শেখানো যায় না।

তবে এদের ভাল করে শেখালে এরা পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে পারে। স্নান করতে ও খেতে পারে। সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও কিছুটা কাজ চালানো গোছের হিসাবপত্রও করতে পারে। বুদ্ধি দিয়ে এরা পরিবেশকে বুঝতে পারে না বলে অনেক সময় অর্থহীনভাবে হাসে ও সঙ্গত কারণ ছাড়াই কাঁদে। বেশি বয়সেও এরা শিশুর মতো অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। যত্ন নিয়ে শেখালে এরা কিছু কিছু কথা বলতে পারে। ট্রেডগোল্ড (Tredgold) এদের হাইড্রোসেফালিক[2] (Hydrocephalic) পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এদের মাথা দেহের তুলনায় বড়, এদের মস্তিষ্কের কোষগুলো নষ্ট হওয়ার কারণে বুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২৫-এর নীচে তাদের জড়বুদ্ধি বলা হয়ে থাকে। এরা পূর্ণবয়স্ক হলেও, এদের মানসিক বয়স ২ বছরের বেশি হয় না। এদের নানা ধরনের দৈহিক বিকৃতি দেখা যায়। দেহের তুলনায় এদের মাথা ছোট ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধি বা বিকাশ ঘটে না। এদের মুখ দিয়ে লালা পড়ে। চোখের কোণে পিচুটি জমে থাকে। আকৃতির দিক দিয়ে অনেক সময় এদের মানুষ বলে মনে হয় না। জন্মগত কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়বুদ্ধি শিশু দেখা যায়। এরা এদের পিতামাতার যৌনব্যাধি, অতিরিক্ত পানাসক্তি ইত্যাদির ফল। নানা গুরুত্বপূর্ণ রোগের কারণেও জড়বুদ্ধি শিশু দেখা যায়। এরা

জড়বুদ্ধি শিশুদের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা

তুলণীয় :
1. A type of congenital defective (moron or imbecile). So named because of facial character Is pies.
2. Excessive amount of fluid in skull, resulting in abnormal enlargement of head and limited mentality.

প্রায়ই স্বল্পায়ুবিশিষ্ট হয়। যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন এরা সকলের বোঝাস্বরূপ গণ্য হয়, কারণ তারা না পারে ভালভাবে কথা বলতে, না পারে নিজেদের দেহের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে। প্রাক্ষোভিক দিক থেকে কখনও হা হা করে হাসে, কখনও কাঁদে, আবার কখনও রেগে গোঁ গোঁ বা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। এদের লেখাপড়া শেখানোর কথা বা জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন কাজ শেখানো প্রায় অসম্ভব। এদের জন্যে প্রতিষ্ঠানগত তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন। খুব ধৈর্যশীল হয়ে হয়ত এদের দু-একটা সহজ কাজ শেখানো যেতে পারে। এদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া মানবিক কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ওয়ালিন (*Wallin*) এদেরকে মাইক্রো সেফালিক (Microcephalic)[1] আখ্যা দিয়েছেন।

তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবানদের বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা

উন্নতবুদ্ধি ও প্রতিভাবানদেরও ব্যতিক্রমী শিশু বলা হয়ে থাকে। জনসাধারণের শতকরা (২+১)=৩ ভাগ মাত্র এই শ্রেণীতে পড়ে। সাধারণের চোখে এরা ঈর্ষার পাত্র। অবশ্য বুদ্ধ্যঙ্কের বিচারে তাদের একটা বিশেষ শ্রেণী থাকলেও তারা নতুন পর্যায়ের মানুষ বা দেবতা বলে বিবেচিত হতে পারে না। তবে এদের যে কতকগুলো উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাই বিদ্যালয়ে এদের নিয়েও কতকগুলো সমস্যার উদ্ভব হয়। যে যে বৈশিষ্ট্যে এরা বৈশিষ্ট্যবান তার উল্লেখ করা হল :

(১) **শারীরিক বৈশিষ্ট্য :** লেটা হলিংওয়ার্থ (*Leta Hollingworth*), বল্ডউইন (*Baldwin*) এবং টারম্যান (*Terman*)-এর মতানুসারে এরা সাধারণ ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা লম্বা ও ওজনে বেশী। সাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় এরা এক বা দেড় মাস আগে হাঁটতে এবং দুই বা আড়াই মাস আগে কথা বলতে শেখে। এদের ইন্দ্রিয়শক্তি খুব প্রখর এবং দৈহিক শক্তির দিক থেকেও এরা উন্নত শ্রেণীর।

(২) **মানসিক বৈশিষ্ট্য :** এদের স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি, বিচারকরণ ও ইচ্ছাশক্তি প্রবল। স্মৃত্যুপস্থান (*Mneme*)[2], এষণা (*Horme*)[3] ও আসঞ্জন (Cohesion)[4] ক্ষমতাও উপযুক্তভাবে বিকশিত হয়। এদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, চিন্তনক্ষমতা ও

---

1. Abnormal smallness of head and brain.—J. Drever.

2. Term employed by Semon to designate basic memory in the individual or the race, the conservation characteristic pervading all life.

3. Term devoting animal impulse. This is a Greek word. It is the relative characteristic.

4. A Synonym for 'association' (It has been referred earlier).

বিচিত্রতর বিষয়ে আগ্রহ আছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় এদের অনেক কম নির্দেশ দিতে হয়। এদের শব্দ ভাণ্ডার ও সাধারণ জ্ঞান ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

(৩) **সামাজিক বৈশিষ্ট্য:** হ্যারিয়টের (*Hariot*) মতানুসারে এরা উদার ও মহৎ প্রাণবিশিষ্ট হয়। প্রাক্ষোভিক সমতা থাকার দরুন অনেক সময় দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়। টারম্যানের মতানুসারে এরা দয়ালু, সৎ এবং পরার্থবাদী হয়। অনেক অল্প বয়সেই এদের মধ্যে নেতৃত্বের বিবিধ সংলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ অপেক্ষা খেলাধূলায়, স্বতঃস্ফূর্ততায় বন্ধুত্বে এবং অন্যান্য সামাজিক সংলক্ষণে বিভূষিত হয়। এই জাতীয় ছেলেরা রোমাঞ্চকর ও রহস্যজনক ঘটনায় বেশী আগ্রহী হয় আর মেয়েরা সুরুচিসম্পন্না ও গৃহকর্মনিপুণা হয়ে গৃহ-পরিচর্যায় অধিক আনন্দ পায়। এরা নিজেদের অধিকারবোধ, স্বাধীনতা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন।

(৪) **শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য:** এরা কোন বিষয়ের অর্থবোধে অস্বাভাবিক দ্রুততর পরিচয় দিতে পারে। দীর্ঘ মনঃসংযোগের ক্ষমতার অধিকারী হয় বলে পাঠ্যবিষয়ে এদের তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা সাধারণের তুলনায় অনেক উন্নত বলে এদের পরিচালনা করা বা আগ্রহ উপযোগী পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কঠিন ও দুরূহ বিষয়ের গভীরে নেমে তার থেকে রস সংগ্রহ করতে এবং তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের অনুসন্ধান করতে তারা সব সময় ঔৎসুক্য দেখায়। মৌলিক চিন্তার প্রকাশে ও কৌতূহল বিকাশে এরা সব সময় অত্যন্ত তৎপর।

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে পৃথিবীর কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিভাবানদের বুদ্ধ্যঙ্কের উল্লেখকরা যুক্তিযুক্ত মনে করি:[1]

বিখ্যাত ব্যক্তি		বুদ্ধ্যঙ্ক
স্যার ফ্র্যান্সিস গল্টন	(Sir Francis Galton)··· ··· ...	২০০
জন স্টুয়ার্ট মিল	(John Stuart Mill)...	১৯০
জোহান গ্যেটে	(Johann W. Von Goethe)... ...	১৮৫
স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ	(Samuel Taylor Coleridge) ···	১৭৫
ভলটেয়ার	(Voltaire) ···	১৭০
আলেকজাণ্ডার পোপ	(Alexander Pope) ···	১৬০

1. Selected from Cox C.C. (later Mrs. Miles). The early Mental Traits of Three Hundred Geniuses. (As quoted by Munn N. L.) in Introduction to Psychology.

বিখ্যাত ব্যক্তি			বুদ্ধ্যঙ্ক
লর্ড টেনিসন	(Lord Tennyson)	...	১৫৫
মোজার্ট	(Mozart)	...	১৫০
ভিক্টর হুগো	(Victor Hugo)	...	১৫০
লর্ড বায়রন	(Lord Byron)	...	১৫০
জন মিল্টন	(John Milton)	...	১৪৫
বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন	(Benjamin Franklin)	...	১৬৫
আলেকজাণ্ডার ডুমা	(Alexander Duma)		১৪০
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট	(Napoleon Bonaparte)		১৩৫
এডমণ্ড বার্ক	(Edmund Burke)	...	১৩৫

আমরা তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবানদের নানা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার কিভাবে এদের শিক্ষা-পরিকল্পনা করা যায় তার আলোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার যে সাধারণ বিদ্যালয়ে একই পাঠক্রমের সাহায্যে ও সাধারণ শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রতিভাবান ও উন্নতবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে যাওয়া নিরর্থক। এদের বিচিত্র ও বহুমুখী চাহিদা, শক্তি-সামর্থ্য, আগ্রহ, প্রবণতা, রুচি, অনুরাগ ইত্যাদির কথা স্মরণে রেখেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। এরা সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধার একথা মনে রেখে উন্নত ধরনের শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। পৃথিবীর নানা প্রগতিশীল দেশে এই ধরনের শিক্ষার্থীদের সত্যকার কল্যাণ করার জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন কমিশন এই ধরনের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে দরিদ্র উন্নতবুদ্ধি বা প্রতিভাবানদের এই ধরনের বিদ্যালয়ে স্থান না হয়ে ধনীদের অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানরাই সেই বিদ্যালয়ের সুযোগ নিচ্ছে। এর ফলে সমাজে একশ্রেণীর উন্নাসিক, আত্মঅহঙ্কারী, সবজান্তা তথাকথিত আত্মঅহংকারী একটি দল সৃষ্টি হচ্ছে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মূল্যবোধে এদের অনাস্থা, তীব্র আত্মাভিমানবোধ, নিজেকে অপরের থেকে বিশেষ করে দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হচ্ছে। দেশ ও সমাজের সঙ্গে তাদের আত্মিক যোগাযোগ ঘটছে না বরং বিজাতীয় বৈশিষ্ট্যে তারা স্বতন্ত্র শ্রেণীকৌলিন্য দাবি করে বসছে। এই মনোভাব ও আদর্শ গণতান্ত্রিক দেশের সামগ্রিক আদর্শের পরিপন্থী। তাই আমরা সমাজ-বিচ্ছিন্ন পরিবেশে বিদেশী আদর্শের অনুকরণে, দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাসহীন একদল মানুষ তৈরী করার চিন্তা ও পন্থাকে সমর্থন করতে

পারি না। আমরা মনে করি উপযুক্তভাবে শিক্ষা সংগঠন করে, সাধারণ বিদ্যালয়ের কর্মসূচীকে বিভিন্নতর করে এবং এদের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করে সমাজ-জীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে নীচে কতকগুলো বাস্তব পন্থার উল্লেখ করা হল :

(১) **শ্রেণীবিন্যাসকরণ** (Classification) ও **নির্বাচন** (Selection) : প্রতিভাবানরা যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজের মূল্যবান সম্পদ তাই তাদের বাছাই ও নির্বাচন করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে বুদ্ধি-পরীক্ষা (**Intelligence test**), সম্পাদনী অভীক্ষা (**Achievement test**) ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সত্যকার ক্ষমতা যাচাই করে নেওয়া উচিত। এমনভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা দরকার যাতে একই শ্রেণীতে মোটামুটি সমবুদ্ধিবিশিষ্ট একটি দলেব (**Homogeneous Group**) স্থান হয়। এর সঙ্গে উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের স্থান দিতে হবে।

(২) **ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টিদান** (Individual attention) : অনেক সময় দেখা যায় শ্রেণীতে কোন কোন শিক্ষার্থী কোন বিশেষ বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেয় বা অত্যন্ত আগ্রহ দেখায়। আবাব অনেক সময় কোন শিক্ষার্থী অনেক বিষযে ও বিচিত্র কর্মে আগ্রহ দেখায় বা উৎসাহ পায়। এই জন্যে ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টিদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আসল কথা তারা যাতে সহজে ও দ্রুত কোন বিষয় শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৩) **পাঠক্রমের ব্যাপকতা** (Variety of Curriculum) : পাঠক্রমকে গতানুগতিক না করে তার মধ্যে সরল থেকে জটিল, সাধারণ থেকে ক্রমোন্নত এবং বৈচিত্র ও বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত করা উচিত। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিবেশ ও কর্মসূচী থেকে যাতে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা, আচরণ-দক্ষতা ও পরিচালন-ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। পাঠক্রমের বিষয়গুলোকে এমনভাবে স্থান দিতে হবে যেন প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীই তার মধ্যে থেকে উপকার পেতে পারে। নানা সৃজনমূলক কাজের মাধ্যমে তাদের সৃষ্টি-ধর্মিতা বিকশিত হবে। পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমস্যামূলক ও প্রয়োজন বোধে নানা ব্যক্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে ফল পাওয়া যাবে। বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ সমাজ-জীবন গঠনেও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সংগঠনে এদের নেতৃত্বের সুযোগ দিতে হবে। তাহলে এরা এক দিকে যেমন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে অন্য দিকে তেমনিই এদের সৃষ্টিকুশলতা ও সাংগঠনিক শক্তির বিকাশ সম্ভব হবে। এদের উন্নত শ্রেণী

পাঠদান পদ্ধতির মাধ্যমে বা ডাল্টন প্রণালীর কর্মনির্দেশের (assignment) মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়ের প্রগতিতে সাহায্য করা যায়। পাঠ্যপুস্তকসদৃশ ও পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বিচিত্র তথ্য ও জ্ঞানসমৃদ্ধ পুস্তকপাঠে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তদারকী পাঠের (supervised study) ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শ্রেণীর অন্যান্য সাধারণ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশায় পর্যাপ্ত সুযোগ দিলে তারা স্বভাবতঃই নিজেদের আত্মাভিমানকে, স্বাধীনতার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখবে। একটা ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার, তাহল, এই ধরনের শিক্ষার্থীরা যেন কোন ক্রমেই গর্বিত বা অপরের থেকে অনেক বেশী উন্নত এই দৃষ্টিভঙ্গি না গড়ে তোলে। অনেক সময় এদেরও নানা দুষ্টামি বা দুষ্কৃতির পরিচয় পাওয় যায় সেক্ষেত্রে অন্য সকল শিক্ষার্থীর প্রতি যে ধরনের ব্যবহার করা হয় তেমন ব্যবস্থা নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। নাহলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলারাখার ব্যাপারে তারতম্য আসতে পারে। সেটা নিতান্তই অমনোবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে। এদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্যে শিক্ষক ও অভিভাবককে যত্নপর হতে হবে। প্রকল্প-পদ্ধতির (Project method) সাহায্যে তাদের এ বিষয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। এদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের অধিকতর গুণসম্পন্ন হতে হয় না হলে এদের সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সাহিত্য আলোচনা, বিতর্কসভা ও বিদ্যালয়-স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সাহায্য করা যায় আধুনিক কালে বহুমুখী শিক্ষাধারা সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক করা প্রয়োজন।

(৪) **বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন** (Development of proper attitudes): এই ধরনের শিক্ষার্থীদের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন গঠনেও শিক্ষাকর্মীদের সাহায্য করতে হবে। এরা যেন বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় বীতস্পৃহ না হয়ে পড়ে। সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এদেরকে আপন আপন রুচি ও প্রবণতা অনুসারে প্রতিভাবিকাশের সুযোগ দিতে হবে। একথা ভুললে চলবে না যে প্রতিভাবানদের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। তাই সুষ্ঠু সঙ্গতিস্থাপনে ও সমাজ পরিবেশে সামঞ্জস্যবিধানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার।

(৫) **গৃহ ও বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ** (Close connection between home and school): এই শ্রেণীর সার্থক শিক্ষার ব্যাপারে গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। এদের চাহিদা কি, এ সম্পর্কে পিতামাতা

দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব কি এবং ভবিষ্যতে এরা কিভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার দিকে ঠিকমত দৃষ্টি দিতে গেলে বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অভিভাবকরা যা চান, শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাকে কতখানি মর্যাদা দিতে পারেন বা উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্যে বিদ্যালয়ের পরিকল্পিত ব্যবস্থায় অভিভাবকরা কতখানি সক্রিয় সহযোগিতা দান করতে পারেন তার জন্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের গুরুত্ব রয়েছে। তাই অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলের মধ্যে একটা নিবিড় যোগ সূত্র থাকা প্রয়োজন।

অবশেষে আমরা বলতে পারি যে, উভয় প্রান্তের ব্যতিক্রমীরা সব সময়ই সমাজের কাছ থেকে যত্নপর দৃষ্টি ও পরিপোষণ আশা করে ; তাই এদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিকল্পনা করতে না পারলে সামাজিক দায়িত্বপালনে গুরুতর ত্রুটি থেকে যাবে। আধুনিককালে যখন নবশিক্ষার রূপায়ণে আমরা ব্রতী হয়েছি তখন আমাদের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠোর হিতব্রত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। ব্যতিক্রমীদের কল্যাণ প্রকারান্তরে সমাজেরই কল্যাণ—এই বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত করা একান্তভাবে কাম্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বুদ্ধি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ত্ব

(Theories of Intelligence)

১। প্রাচীন মতবাদ (Traditional Views) :

বুদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে মনোবিদ্‌দের বিভিন্ন মতবাদ 'বুদ্ধি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব' নামে পরিচিত। বুদ্ধি বলতে কি একটি মাত্র শক্তিকে বোঝায়, না একাধিক শক্তিকে বোঝায়, এ সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (১) বুদ্ধি সম্পর্কীয় রাজতন্ত্র মূলক ধারণা (Monarchic view), (২) বুদ্ধি সম্পর্কীয় সামন্ততন্ত্র মূলক ধারণা (Oligarchic view), (৩) বুদ্ধি সম্পর্কীয় নৈরাজ্য মূলক ধারণা (Anarchic view)।

প্রাচীন তত্ত্বগুলির শ্রেণীবিভাগ

(১) **বুদ্ধি সম্পর্কীয় রাজতন্ত্র মূলক ধারণা :** এই ধারণা অনুসারে বুদ্ধি হল এমন এক কেন্দ্রীয় মানসিক শক্তি যা মানুষের সকল রকম ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি হল এমন এক মানসিক শক্তি যার পরিচালনায় অন্যান্য মানসিক শক্তিগুলি ক্রিয়া করে। বুদ্ধি যেন রাজা, অন্যান্য মানসিক শক্তিগুলি তার অধীনস্থ প্রজা। বুদ্ধির দ্বারা অন্যান্য শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়।

রাজতন্ত্র মূলক ধারণা

(২) **বুদ্ধি সম্পর্কীয় সামান্ততন্ত্র মূলক ধারণা :** এই ধারণা অনুসারে বুদ্ধি কোন একক মানসিক শক্তি নয়, যা অন্যান্য মানসিক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই ধারণা অনুযায়ী বুদ্ধি হল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির সমন্বয়। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তি সমবেতভাবে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সামন্ততন্ত্র মূলক ধারণা

(৩) **বুদ্ধি সম্পর্কীয় নৈরাজ্য মূলক ধারণা :** এই ধারণা অনুসারে মনের মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম মানসিক শক্তির অস্তিত্ব আছে, যেগুলির সম্মিলিত শক্তিই হল বুদ্ধি। বুদ্ধি কোন একক শক্তি বা বিশেষ বিশেষ শক্তির সমন্বয় নয়।

নৈরাজ্য মূলক ধারণা

উপর্যুক্ত মতবাদগুলি নির্ভরযোগ্য নয়, কেন না এগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত মনে করা হয় না। এইগুলি অনুমান প্রসূত, পরীক্ষণ-নির্ভর নয়। কিন্তু আধুনিক কালে মনোবিদ্‌গণ বুদ্ধি সম্পর্কে যে তত্ত্বগুলি প্রকাশ করেছেন, গাণিতিক সংব্যাখ্যানের উপর সেগুলি প্রতিষ্ঠিত। যদিও তাদের মধ্যে প্রাচীন ধারণাগুলি বর্তমান। আমরা এক্ষণে তিনটি আধুনিক বুদ্ধি সম্পর্কীয় তত্ত্ব আলোচনা করছি।

২। আধুনিক মতবাদ (Modern views):

(ক) স্পীয়ারম্যান-এর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Spearmans' Two Factor Theory):

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিদ্ স্পীয়ারম্যান ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তার বুদ্ধি সম্বন্ধীয় তত্ত্বটি সম্পূর্ণভাবে গাণিতিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত করেন। তাঁর মতে প্রত্যেক ব্যক্তির একটা সাধারণ মানসিক শক্তি (general ability) আছে যেটি তার বিভিন্ন কার্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই সাধারণ মানসিক শক্তির তিনি নাম দিয়েছেন 'g'। আর এই সাধারণ মানসিক শক্তি ছাড়াও বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য একএকটা বিশেষ মানসিক শক্তি (Special ability) আছে যার নাম তিনি দিয়েছেন 's'। কোন ব্যক্তির সব রকম কাজ করার সমান শক্তি থাকে না; কোন কাজে তার কম দক্ষতার, কোন কাজে বেশী দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, কোন ব্যক্তির নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতিতে যথেষ্ট নৈপুণ্য থাকতে পারে, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে বা বিজ্ঞানে তেমন দক্ষতা নেই। আবার কোন ব্যক্তির অঙ্কশাস্ত্রে দক্ষতা দেখা গেলেও সঙ্গীতশাস্ত্রে কোন দক্ষতা দেখা যায় না। ব্যক্তির সব বুদ্ধিমূলক কাজেই 'g'-এর প্রয়োজন; বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য 's'-এর প্রয়োজন।

সাধারণ মানসিক শক্তি

বিশেষ মানসিক শক্তি

যেমন, সঙ্গীতের জন্য প্রয়োজন কিছুটা 'g' + সঙ্গীতের 's'; অঙ্কের জন্য প্রয়োজন কিছুটা 'g' + অঙ্কের 's' ইত্যাদি। কোন ব্যক্তির বুদ্ধি হল তার সাধারণ মানসিক শক্তি এবং বিশেষ মানসিক শক্তির যোগফল। মানুষের প্রত্যেকটি বুদ্ধিমূলক কাজকে বিশ্লেষণ করে একটি সাধারণ উপাদান এবং একটি বিশেষ উপাদান, এই দুই উপাদান পাওয়া যায় বলে একে বলা হয় দ্বি-উপাদান তত্ত্ব।

[1]মনোবিদ বুচার (*H. J. Butcher*) স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে তাঁর এই তত্ত্ব মনোবিদ্দের মানুষের সাধারণ বুদ্ধির (general inteliigence) গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে।

চারের মন্তব্য

[2]রেক্স এবং নাইট (Rex and Knight) স্পীয়ারম্যান-এর দ্বি-উপাদান তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, এই মতবাদের উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এই

1. H. J. Butcher: Human intelligence; Its nature and measurement.
2. Rex and Knight: Intelligence and Intelligence Tests. Page 13.

যে, আমাদের সমস্ত বৌদ্ধিক কাজের এবং চিন্তার একটা সাধারণ উপাদানকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, একে আমরা বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করতে পারি। স্পীয়ারম্যান নিজেই এর নাম দিয়েছেন 'g'। অবশ্য স্পীয়ারম্যান সাধারণ মানসিক শক্তিকে বুদ্ধি বলে আখ্যাত করেন নি। কিন্তু একাধিক ক্ষেত্রে তিনি এই সাধারণ মানসিক শক্তিকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেছেন।

রেক্স এবং নাইটের মন্তব্য

বুদ্ধি সম্পর্কে প্রাচীন রাজতন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্বটির কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রাচীন ধারণার মত স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্বটি অনুমান মাত্র নয়। তিনি গাণিতিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে তাঁর এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। স্পীয়ারম্যান অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর পরীক্ষণ কার্য চালান এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক-কার্য সম্পাদন করতে দেন। তিনি এই বিভিন্ন ধরনের বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করলেন। রাশি-বিজ্ঞানের (statistics) ভাষায় এই সম্পর্ককে বলা হয় সহগতি (correlation)। স্পীয়ারম্যান বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে একটা বিশেষ নিয়ম অনুসরণ করে, পারস্পরিক সহগতি নির্ণয় করে এবং গাণিতিক গণনার সাহায্যে তাঁর বিখ্যাত বুদ্ধি সম্পর্কীয় তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রাচীন রাজতন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারম্যানের তত্ত্বের পার্থক্য

সমালোচনা: স্পীয়ারম্যানের এই মতবাদ কেউই সমর্থন করেননি এবং সকলেই এই মতবাদের সমালোচনা করেছেন। আমেরিকায় থর্নডাইক (*Thorndike*) সর্বপ্রথম এই মতবাদের সমালোচনা করেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মন হল অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ স্বাধীন ক্ষমতার সমন্বয় (a host of highly particularised and independent faculties)। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর এই মত বর্জন করেন এবং আমাদের বিভিন্ন বৌদ্ধিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি একক বা সাধারণ উপাদানের (a unitary factor or general factor) সন্ধান করেন।

থর্নডাইকের সমালোচনা

ব্রিটেনে স্পীয়ারম্যানের মতবাদের সমালোচনা করেন থমসন (*Godfrey Thomson*)। তাঁর মতে স্পীয়ারম্যানের পূর্বোক্ত মতবাদের সহায়তা ছাড়াও আমাদের বৌদ্ধিক কাজকে অন্যভাবে খাড়া করা যেতে পারে। তাঁর মতে আমাদের সমস্ত বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে একটিমাত্র

থমসনের সমালোচনা

সাধারণ উপাদান ক্রিয়া করছে একথা বলা যেতে পারে না। কতকগুলি ক্ষমতা বা উপাদান দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এই দলবদ্ধ উপাদানগুলি (group factors) আমাদের বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায়।

থমসনের এই সমালোচনা স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব প্রথম যেভাবে উপস্থাপিত হয় কেবলমাত্র তার বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা, পরবর্তী-কালে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে Royal society-র কাছে যেভাবে স্পীয়ারম্যান মতবাদটি উপস্থাপিত করেন এবং তাঁর 'The Abilities of Man' গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, তাতে পূর্বোক্ত বিষয়টিকে তিনি স্বীকার করে নেন। তাঁব মতে যখন অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয় তখন সাধারণ মানসিক শক্তি (general factor) এবং বিশেষ মানসিক শক্তি (special factor) ছাড়াও এক ব্যবহারিক উপাদান (practical factor) আমাদের কাজে ও চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করতে চায়, সেক্ষেত্রে তার মাধাবণ মানসিক শক্তি বা 'g', ভাষা শিক্ষা করার জন্য বিশেষ মানসিক শক্তি বা 's' এবং তাছাড়াও বাচিক শক্তি অর্থাৎ বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করাব জন্য মানসিক শক্তির (Verbal ability) প্রয়োজন। শেষের শক্তিটি হল ব্যবহারিক উপাদান (practical factor) কেননা বাক্যের অর্থ বোঝার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবরকম মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই শেষের শক্তিটির প্রয়োজন।

স্পীয়ারম্যান-এর মত-বাদের পরিবর্তিত রূপ

(খ) থার্সটোন-এর মৌলিক ও মানসিক শক্তি সম্বন্ধীয় তত্ত্ব (Thurstone's Primary Mental Ability Theory) : প্রসিদ্ধ মার্কিন মনোবিদ্ থার্সটোন কোন একটি বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর মতে বুদ্ধি বলে কোন একক শক্তি নেই। তিনি স্বীকার করতে চান না যে, আমাদের সব রকম বৌদ্ধিক কাজের মধ্যে একটি সাধারণ মানসিক শক্তি ক্রিয়া করে। তার পরিবর্তে তিনি সাতটি মৌলিক মানসিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। থার্সটোন ৫৬ রকমের বিভিন্ন বুদ্ধির অভীক্ষা নিয়ে প্রায় ২৪০ জন শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বুদ্ধি কতকগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রাথমিক মানসিক শক্তির দ্বারা গঠিত। এই সাতটি মৌলিক মানসিক শক্তি হল :

সাতটি মৌলিক মানসিক শক্তির অস্তিত্বের স্বীকৃতি

(১) বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করার মানসিক শক্তি (Verbal comprehension বা V)।

(২) দ্রুত শব্দ ব্যবহার করার ক্ষমতা (Word fluency বা W)।

(৩) সংখ্যা ব্যবহার করার ক্ষমতা (Number fluency বা N)।

(৪) স্মৃতি বা বিষয়বস্তু মনে সংরক্ষণের ক্ষমতা (Memory বা M)।

(৫) দ্রুত প্রত্যক্ষ করার শক্তি (Perceptual ability বা P)।

(৬) স্থানগত সম্বন্ধ নিরূপণের ক্ষমতা (Ability to visualise relation in space বা S)।

(৭) যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা (Reasoning বা R)।

থার্সটোনের মতে বুদ্ধি বলে কোন বিশেষ মানসিক শক্তির অস্তিত্ব নেই। বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত সাতটি শক্তির একটি সম্মিলিত রূপ। কোন একটি কাজের জন্য যে সবকয়টি শক্তিরই প্রয়োজন হবে এমন কোন কথা নেই। কোন একটি কাজের জন্য হয়ত দ্রুত প্রত্যক্ষ করার শক্তি (P), যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা (R) এবং স্মৃতিশক্তি (M) এই তিনটি মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়। আবার অন্য একটি কাজ করার জন্য হয়ত সংখ্যা ব্যবহার করার ক্ষমতা (N), স্মৃতিশক্তি (M) এবং যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতার (R) প্রয়োজন হয়। যখন যেরকম প্রয়োজন, সেইরকমভাবেই মানসিক শক্তিগুলি সম্মিলিত হয়।

বুদ্ধি সাতটি শক্তির সম্মিলিত রূপ

যদিও পরবর্তীকালে থার্সটোনের মতবাদের নানারকম সমালোচনা করা হয়েছে তবুও আজকাল অনেক বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test) এই তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে।

(গ) থমসনের বাছাই তত্ত্ব (Thompson's Sampling Theory) :

ব্রিটিশ মনোবিদ্ গডফ্রে থমসনও মনে করেন যে, আমাদের সব বুদ্ধিমূলক কাজের পেছনে কোন একটি বিশেষ মানসিক শক্তি ক্রিয়া করে না। মনের মধ্যে অগণিত শক্তিকণার অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেকটি শক্তিকণা বুদ্ধির একক (unit)। কোন একটিমানসিক কাজ করার সময় এই শক্তিকণা-গুলির মধ্যে কতকগুলি শক্তিকণা একত্র হয়ে একটি দল বাঁধে এবং আমাদের মধ্যে ঐ কাজটি সম্পন্ন করার সামর্থ্য সৃষ্টি করে। কোন্ বিশেষ কাজে কতকগুলি শক্তিকণা একত্র হয়ে একটি দল গড়ে তুলবে, কাজের প্রকৃতি এবং মানসিক শক্তিকণাগুলির নিজ নিজ ক্ষমতার উপর সে বিষয়টি নির্ভর করে। কোন কাজে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বলতে এই শক্তিকণাগুলির দলকেই বোঝায়। কোন কাজে

অগণিত শক্তি কণার অস্তিত্ব

কতকগুলি শক্তিকণার প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করে বাছাই (Sampling)-এর নীতির উপর।

মন্তব্য: পূর্বোক্ত বুদ্ধিসম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন তত্ত্বই এককভাবে সন্তোষজনক নয়, যেহেতু কোন তত্ত্বই বুদ্ধিকে সার্থক ভাবে বিশ্লেষণ করে বুদ্ধির যথার্থ স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করতে পারেনি। মানুষের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে কতটুকু সহজাত বা কতটুকু পরিবেশের দ্বারা বিকাশপ্রাপ্ত পূর্বোক্ত তত্ত্বগুলি তার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। থার্সটোন যে সাতটি মৌলিক মানসিক শক্তির কথা বলেছেন তার সবকয়টিই সহজাত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। যেমন, বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করার মানসিকশক্তি কি সহজাত, না পরিবেশজাত? এই শক্তির উপর পরিবেশের প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা যেতে পারে না। উত্তম পরিবেশেই ব্যক্তির এই জাতীয় ক্ষমতার যথাযথ প্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা।

স্ট্যাগনার এবং কারোস্কি (*Stagner and Karwoski*) স্পীয়ারম্যান ও থার্সটোনের মতবাদের সমন্বয় সাধনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে স্পীয়ারম্যানের বিশেষ মানসিক শক্তি যাকে তিনি **'I'** বলে অভিহিত করেছেন। শিশুদের মানসিক সংগঠনের বর্ণনায় এবং থার্সটোনের সাতটি মৌলিক মানসিক শক্তিসম্পর্কীয় মতবাদ বয়স্ক ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের বর্ণনায় প্রযোজ্য।

স্ট্যাগনার এবং কারোস্কির মন্তব্য